সেরা তারাশঙ্কর

সেরা তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
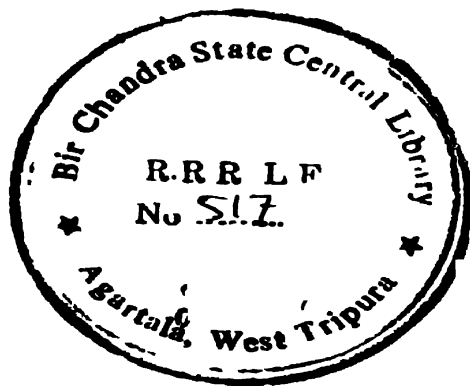
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ - কলিকাতা পুস্তকমেলা
মাঘ, ১৩৬৭

—একশো পনেরো টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—গৌতম রায়
মুদ্রণ—রাজা প্রিন্টার্স

SERA-TARASANKAR
A collcction of bcst works by Tarasankar Bancrjce
Publishcd by : Mitra & Ghosh Publishcrs Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dcy Strcct, Calcutta-73.

Price Rs. 115/-

ISBN : 81-7293-088-7

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পেজমেকার্স, ২৩বি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা - ৭০০ ০২৬ হইতে কম্পোজ করিয়া মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০০৬ প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্ভার সুবিশাল। ১৯০টির মতো গল্প, ৬৬/৬৭ খানি উপন্যাস, নাটক ১৩/১৪ খানি ; এছাড়া আত্মজীবনীমূলক লেখাও আছে ৮/৯ খানি, আর আছে, অজস্র প্রবন্ধ।

এতসব লেখার মধ্যে থেকে 'কবি' আর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-এই দুটি উপন্যাসকে বিশেষভাবে বেছে নিলাম কেন তার একটা কৈফিয়ৎ দেবার নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়।

এই প্রলোভন বা অনুপ্রেরণা আমার হয়েছিল অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের 'কালিকলমে' প্রকাশিত 'কবি তারাশঙ্কর' রচনাটি পাঠ করে। তিনি লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ কবিমানসের যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সেগুলি হ'ল বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা'। উদাহরণ স্বরূপ তিনি লিখেছেন—"মৃত্যুই মর্ত্যলোকে মানুষের অনিবার্য নিয়তি।...... এই মানব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহাকবি বেদব্যাস বলেছেন—কিমাশ্চর্য মত পরম ?....

কবিমানসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—প্রেমের মুখ্য গুন হ'ল অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরকে, সামান্যের মধ্যেও অসামান্যকে দেখা—

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যার ঘেরে ছোটকণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।....

কবি মানসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল কল্পনা। অপরকে আপন করার অপরের মধ্যে প্রবেশ করার শক্তি।"

এমনিই দৃষ্টিভঙ্গীর আভাষ পাই কবিশেখর কালিদাস রায়ের লেখাতেও এবং তাঁর মনোভাবে। তিনি লিখেছেন—"কেবলমাত্র Realistic representation of life মাত্রই সাহিত্য হতে পারে না, তাতে একটা romance সৃষ্টি করতে হয়।.... তারাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাসে অদ্ভুত একটা Romance সৃষ্টি হয়েছে।" (কথা সাহিত্য—শ্রাবণ ১৩৫৭) আলোচনা প্রসঙ্গে এই উপন্যাস দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন—বলতেন 'সার্থক রসোত্তীর্ণ রচনা'।

এই বইদুটিতে ওগুলির সঙ্গে আমি আরও কিছু পেয়েছি। প্রকৃতি এবং মানুষে মাখামাখি হয়ে মিশে গেছে—অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। কবিয়াল নিতাই কৃষ্ণচূড়াগাছের তলায় বসে— 'রাঙা ফুলে ভরা গাছ, চিরোল চিরোল পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল' আকাশপানে চেয়ে প্রতীক্ষা করছে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মতো 'ঠাকুরঝি'র আবির্ভাবের। আবার কাহার পাড়ার জীবন-যাত্রার সঙ্গে এখানকার আদিম প্রকৃতি চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ। কোপাই নদী, "মা-মরা ছোট মেয়ের মত শুকনো মুখে, দুর্বল শরীরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বয়ে যায়—আষাঢ় মাস থেকেই তার শরীর যৌবনে ভরে যায়—একদিন হঠাৎ ডাকিনী হয়ে

উঠে দুকূল ভাসায়।" বাঁশবাদির গ্রাম, সেখানকার নরনারীর 'অভ্র' সেখানকার হলুদমণি পাখীর প্রেম—এদের কাউকে কি সেখানকার রূপোলী বাঁক এবং তার প্রকৃতি এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়?

এই সব অজ্ঞাত, অনুন্নত অবহেলিত সমাজের মানব-মানবীর-সুখেদুঃখে, প্রেমে বিরহে, ব্যথায় আনন্দে ঝরে পড়া দুফোঁটা চোখের জল, সেও তো অসীম সমুদ্র বারিধির মতোই লবনাক্ত, আর গভীরতায় অতলান্ত সমুদ্রের চেয়ে কি কম কিছু? উপন্যাস দুটিকে আমার মনে হয়েছে—বাঙলার রস-টইটম্বুর প্রেমকাব্যগাঁথা।

আমার মাস্টারমশাই প্রমথনাথ বিশী বলতেন, 'রবীন্দ্রোত্তর যুগে সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ এবং মঞ্চসফল দুটি নাটকের কথা। একটি রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুল এবং অন্যটি তারাশঙ্করের দুই পুরুষ।' 'দুইপুরুষ' নাটকে সেই আদিম ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীগত বিভিন্নতা। একদিকে জমিদার, তার দম্ভ অত্যাচার বিপরীতে অত্যাচারিত মহাভারত ও দৃঢ়ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আদর্শে বিশ্বাসী নুটুবিহারী। এই আদর্শবাদী নুটুবিহারীও একদিন ধনগর্বের মত্ততায় বিপরীত শ্রেণীর কুক্ষিগত হতে চলেছিলেন। এমনিই হয়—?

'জলসাঘর' গল্পটি তারাশঙ্করের অন্যতম বিখ্যাত সৃষ্টি। যুগধর্মের সামাজিক রূপান্তরের আঘাতে সামন্ত-তন্ত্রের বিদায় পথের দিকে চেয়ে—জীর্ণ শীর্ণ বনস্পতিকে কালবৈশাখীর ঝড়ে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে—শিল্পীসত্তা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও নতুনের বিজয় কেতনকে অন্তরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়। তাকে আহ্বান জানান শিল্পী সাগ্রহে। 'অস্কার প্রাপ্ত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় এটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে এর ব্যাপ্তি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

কয়েকটি গান সঙ্কলিত করা হয়েছে—প্রথমটিতে পাওয়া যাবে—তাঁর 'জীবন-জিজ্ঞাসা', অন্য দুটিতে 'উপলব্ধ অনুভূতি' এবং শেষেরটিতে—'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধনহে' তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে' সেই পরমমুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা—এতে আমরা পাব তাঁর 'জীবন-বোধ'।

—শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কবি

এক

শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই *নয়* রীতিমত এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল; রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে, তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছম ছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যিই বলিল—এ একটা বিস্ময়। রীতিমত!

অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল—নেতাইচরণ তাক্ লাগিয়া দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ। তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিসের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিস কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে। হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডাবেড়ীর লোহা প্রত্যক্ষ; এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ—গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে।

ইহাদের উর্ধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিস-রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত

ইতিহাস।

এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিন, পেশী দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া জোড় হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্গে ঠোঁটের রেখায় ঈষৎ একটু লজ্জিত হাসি।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস--একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব : এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় চিরকাল জমজমাট কবিগানের পাল্লা হয়। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্ণ বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ।

সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি নোটনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না- জিনিস না, পত্তর না - সব ভোঁ-ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। লোকেরা হৈ হৈ করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল।—যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

* * *

কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হইবে যে নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার। বাবা সকল, আসছে বার। আসছে বার পাওনার আগেই তোমাদের দু-বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখনও তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি

জবা ফুল, এবং আশীর্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক।

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক জন অনেকেই সেখানে বসিয়াছিল—অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয় লইয়া। মোহন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যাণ্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—দাও না, তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা। দেখ এমন খাতক আর মিলবে না। এ খাতকের কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে—ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারপরেই মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নতন একটা বায়না আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা কবিগানের আসরে নোটনদাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে। আর যদি এখানে কোনরকমে শেষের দিনের গাওনাটা না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। সেক্ষেত্রে দক্ষিণার কাঞ্চনমূল্যও ওজনে ভারী হইবে

নোটন হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—জয় মা চামুণ্ডা। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো। বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—তা হ'লে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের তো আর দেরি নেই।

নোটন হাসিয়া বলিল—আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি?

লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হ'লে এখানকার কি হবে?

নোটন বলিল—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভাল, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে। আমি তা হ'লে টাকা কিন্তু বেশী নোব।

লোকটা সোৎসাহে বলিল—আচ্ছা বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

—আজই। এখুনি তোর সঙ্গে। এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল—এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলী ও দোহারদের বলিল—ওঠ। লোকটাকে বলিল—টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে। এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার এই শেষ।

*　　　*　　　*

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আপসোস করিতেছিল। আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনও সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল। তাহাকে বলিলে কি সেও যাইত না।

আসরের জনতা ক্রমশঃ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। মোহন্ত চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—তারা, তারা।

নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না,—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙা জলরাশির জলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর মজা পাঁকের মত জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা।

ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখনি পাইক লাঠিয়াল ভেজিয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতই তাহারা লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। এই জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতই সে দুর্মদ ও দুর্দান্ত—সে হঠাৎ মালকোঁচা সাঁটিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল—দুটো লোক। বলিয়া দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল—দোঠো আদমী হামারা সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ রাস্তা। আরে দশ কোশ তো দুলকীমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন দুলকী চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেন রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়—বাড়ী যাই—ভাত খাই গিয়ে। ওরে নোটনদাস ভাগলবা, পালিয়েছে। কবি হবে না।

—না। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বল হরি—। সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী

আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো—ল। অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণদেহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কে? কে রে বেটা?

—ধর তো বেটাকে, ধর তো! হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো বেটাকে।

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকেই সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা!

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়। ও রাখহরি নয়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল—খবর-দা—র!

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ। রঙ তামাশা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল—জাড়া গাঁয়ে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল—"কি ক'রে তুই বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারদিকেতে বাঁশের বন। কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ডু কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ডু—সামনে আছে মুলোকুণ্ডু করগে মুলোর দরশন।" তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই, খুশীই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা-যা-যাঃ। কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে।

—আরে, তুষ হ'লেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু'তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—'কবিয়াল ভাগলবা'; তা ঠাট্টা ক'রে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগো না।

মোহন্ত এখন মোহান্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার-সেরেস্তার কূটবুদ্ধি নায়েব ছিলেন। গাঁজা তিনি চিরকালই খান। তিনি এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে কবিগানের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, কবিগানই হবে। চিন্তা কি তার জন্যে? চিন্তামণি যে পাগলী বেটীর দরবারে বাঁধা, তাঁর চিনির ভাবনা! বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হইয়াছে, চিনির সন্ধান মিলিয়াছে।

কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার কথাও নয় সময়ও নয়! সুতরাং সে প্রশ্ন না করিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল।

মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। অতঃপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—তাই হোক—গুরু-শিষ্যেই যুদ্ধ হোক। রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণ-অর্জুনের যুদ্ধ কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হ'ল অষ্টাদশ পর্ব।

শোরগোল উঠিল—মহাদেব! মহাদেব! ও হে কবিয়াল! ওস্তাদজী হে শোন শোন।

দুই

দায়ে পড়িয়া মহাদেব প্রস্তাবটায় সম্মতি না দিয়া পারিল না।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন এবং চারিদিকে প্রমত্ত জনতা। অতঃপর সম্মত না হইয়া উপায় কি। কিন্তু আর একজন ঢুলী ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়েই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল—প্রভু, অধীনের একটি নিবেদন আছে—আপনাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই মহাদেব কবিয়ালই বলিয়া উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে; তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে। কি রে, পারবি না?

নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিয়ালরা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত, কখনও কাঁসি বাজাইত আর দোয়ারের কাজে তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বেগার দিয়া যাইত।

বাবুদলের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাট করা বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন। চালটিও তাঁহার বেশ ভাবিক্কী, তিনি খুব উঁচুদরের পায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই। তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা। আর দেরি নয়—আরম্ভ ক'রে দাও তা হ'লে। তিনি হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—এখনই তো তোমার—। ক'টা বাজল?

কে একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া আগাইয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন -আঃ! দরকার নেই আলোর। রেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এত সব রেডিয়ম-ফেডিয়মের ধার ধারে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। কাক—কাকই সই। তোর গানই শুনি।

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কুড়ুতাক কুড়ুতাক কুড়ুম কুড়ুম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল।

আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবিগানের পাল্লা। সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ডা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরনের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা বলিল—দূর দূর! ভিজে ভাতের মত গান। এই শোনে! সাঁট ক'রে পাল্লা হচ্ছে। চল বাড়ী যাই। দুই-চার জন আবার উঠিয়াও গেল।

অপর দল বলিল—মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভাল কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল,

ভাল কবিয়াল। টকাটক জবাব দিচ্ছে।

নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল। প্রশংসা পাইবার মত নিতাইচরণের মূলধন আছে। তাহার গলাখানি বড় ভাল। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। মহাদেবের দোয়ারকে পিছনে ফেলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে দুই-চার কলি গাহিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

বাবুরা ইহাতে তাহাকে উৎসাহ দিলেন—বলিহারি বেটা, বলিহারি। বলিহারি।

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা।

এক কোণে মেয়েদের জটলা। এ মেয়েরা সবই ব্রাত্য সমাজের। তাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে—ও মা গো। নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত। ও মা গো।

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোল-সতের বছরের মেয়েটি, পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসচিস তু। শোন কেনে।

রাজা বন্ধু-গৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত দুলিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল—দেখতা হ্যায় ঠাকুরঝি? ওস্তাদ কেয়সা গান করতা হায়, দেখতা?

রাজা এই শ্যামিকাটিকে বলে ঠাকুরঝি। নিতাইও তাহাকে বলে—ঠাকুরঝি। শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে। এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশী। যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে গল্পের উটের মত নাসিকা-প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল এবং নিজেই সে স্বাধীন-ভাবে গান আরম্ভ করিল। আ-করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুয়াটাকে পর্যন্ত পাল্টাইয়া দিয়া সেই সুরে ছন্দে নিজেই নতন ধুয়া ধরিয়া দিল। এবং নিজের সুন্দর কণ্ঠের প্রসাদে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ফেলিল।

মহাদেবের দোয়ার, সে-ই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ। সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল-অ্যাই। ও কি? ও কি গাইছ তুমি? অ্যাই—নেতাই। অ্যাই।

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি থুথু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়াই চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে তখন গাহিতেছিল—

হুজুর—ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি জানি—

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুৎ আচ্ছা। বাহবা। বাহবা। নেতাই বলছে ভাল।

সাধারণ শ্রোতারাও বলিল—ভাল। ভাল। ভাল হে।

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিয়া বলিল—অ্যা-ই কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল—ধিকড় তা-তা-ধেন্‌তা—তা-তা-ধেন্‌তা—গুড়-গুড়-তা-তা-থিয়া—ধিকড় ; হাঁ— । বলিয়া সে তাহার নূতন স্বরচিত ধুয়াটায় ফিরিয়া আসিল—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পরধারিণী
গ-য়ে গোমাতা সুরভি—গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। বহুৎ আচ্ছা। হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইলেই বলিল -বলি দোয়ারগণ।

মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোন দোয়ারও ছিল না। কেহই সাড়া দিল না। নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই বলিল—দোয়ারগণ। গোমাতা শুনে সবাই হাসছে। বলছে, গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া।

ঢুলীটা এবার বলিল—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।—বলিয়া সে ছড়ার সুরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতেছিল না, রাজাকেও সে লক্ষ্য করিল না, সে আপন মনে ছড়াতেই বলিয়া গেল—

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন॥
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন॥

রব উঠিল—ভাল। ভাল। ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল—ডুডুম।

নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই॥
তেঁই গোলকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী॥

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক ; রাজার

বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।

নিতাইয়ের তখনো শেষ নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আরও আছে মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিত জনে॥

এবার বাবুরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরে লোকেরা হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

নিতাই বিজয়গর্বে ঢুলীটাকে বলিল—বাজাও।

এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ! স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।

তরুণী ঠাকুরঝিটির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিলচৈতন্যের মত নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। রাজা তাহার অসম্বৃতবাস বিস্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, রূঢ়স্বরে বলিল—অ্যাই! ও ঠাকুরঝি, মাথায় কাপড় দে!

রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়া বলিল—মরণ, সাড় নাই মেয়ের!

ঠাকুরঝি এবার জিভ কাটিয়া কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া বলিল—আচ্ছা গাইছে বাপু ওস্তাদ।

ওদিকে বাবুদের মহলেও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই কলিকাতা-প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত স্বীকার করিলেন—Yes। এ রীতিমত একটা বিস্ময়! Son of a Dom—অ্যাঁ—He is a poet!

দুর্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলে রুদ্র, তুষ্ট হইলে আশুতোষ—মানসিক অবস্থার এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকাপ্রসাদে ব্যোমমার্গে নিমেষ-মধ্যেই যাওয়া-আসা করিয়া থাকে, সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক! বলিহারি রে!

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন—আমার পাগলী বেটীর খেয়াল বাবা। নিতাইকে বড় করতে মা আমার নোটনকে তাড়িয়েছেন।

ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা। মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল। ব্যাপারটা দেখিয়া শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া গান ধরিল—ব্যঙ্গে, রঙ্গে, গালিগালাজে নিতাইকে শূলবিদ্ধ করিয়া তিলে তিলে বধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সরস, অশ্লীলতা-ঘেঁষা গালিগালাজে সমস্ত আসরটা হাস্যরসে মুখর হইয়া উঠিল। নিতাই আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এবং মনে মনে গালিগালাজের জবাব খুঁজিতেছিল।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইল রাজা। সে মিলিটারী মেজাজের লোক, বন্ধুকে গালিগালাজগুলো তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা মেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল। রাজার স্ত্রী প্রচুর হাসিতেছিল। ঠাকুরঝি মেয়েটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, সেও এবার বিরক্তিভরে বলিল—হাসিস না দিদি! এমনি করে গাল দেয় মানুষকে!

মহাদেব ছড়া বলিতেছিল—

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল॥
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে॥
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই॥

একজন ফোড়ন দিল—

অল্প জলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস না—

দোয়াবেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গাহিল—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগগে যাবার আশা গো।
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা—স্বগগে যাবার আশা গো॥
হায় রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—স্বগগে যাবার আশা গো॥

অকস্মাৎ মহাদেব বলিয়া উঠিল—আঁ, জ্বালাতন রে বাপু। বলিযাই সে আপনার পায়ে একটা চড় মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাহিল—

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড়।
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন—চড়িবেন কার উপর॥

মহাদেবের দোয়ার—যাহাকে নাকচ করিয়া নিতাই কবিয়াল হইয়াছে সে-ই এবার ফোড়ন দিয়া উঠিল—চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বগগে যাবার আশা গো।

ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল, মহাদেবের তাণ্ডব ততই বাড়িয়া গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালিগালাজে নিতাইকে সে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মহাদেবের এই শূল-প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে জর্জর ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না। খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল। সে গালিগালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কাটিয়া বলিল—

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য॥
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করি না মনে॥

লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়। মহাদেব গালিগালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোন গ্লানি ছিল না। বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বলিল—হুজুরগণ, অধীন মুখ্যু ও ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না। খুব ভাল, ভাল গেয়েছিস তুই। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল—জিতা রহো, জিতা রহো রে বেটা। জিতা রহো!

চাকুরে বাবুটি করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ! এ পোয়েট! ইউ আর এ পোয়েট!

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলল—আজ্ঞে?

বাবু বলিলেন—তুই তো একজন কবি রে।

নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে মহাদেবকে বলিল—মার্জনা করবেন ওস্তাদ। আমি অধম। বলতে গেলে আমি মশকই বটে।

মহাদেব অবশ্য প্রতিপক্ষের এ বিনয়ে লজ্জিত হইল না, সে বরং নিতাইয়ের বিনয়ে খুশী হইয়া বলিল - আমার দলে তুই দোয়ারকি কর রে! এর পর নিজেই দল বাঁধতে পারবি। তা ছাড়া তোর গলাখানি খুব মিষ্টি।

নিতাই মনে মনে একটু রূঢ় অথচ রসিকতাসম্মত জবাব খুঁজিতেছিল; মহাদেবের গালিগালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ-পিতামহ তুলিয়া গালিগালাজগুলি তাহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিবার পূর্বেই পিছন হইতে দশ-বিশজন একসঙ্গে ডাকিল—নেতাইচরণ, নেতাইচরণ! ওহে।

ডাক শুনিয়া নিতাইচরণ পুলকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। আজই সে 'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' হইতে নিতাইচরণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ডাকিতেছিল, তাহারা অদূরবর্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল—বাবুরা ডাকছেন। মোহন্ত ডাকছেন।

মোহন্তজী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি সিন্দুরলিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোছা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ, খুব ভাল। মা তোমার উন্নতি করবেন। মায়ের মেলায় একরাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরাদ্দ হইল। সুন্দর গলা তোমার।

চাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে। তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—You are a poet! অ্যাঁ! এ একটা বিস্ময়।

নিতাই দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিলেন—কিন্তু খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি—a poet!

হাতজোড় করিয়া এবার নিতাই বলিল—আজ্ঞে প্রভু, চুরি জীবনে আমি করি নাই! মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর, নেশা পর্যন্ত আমি করি না। জাত-জ্ঞাত মা ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার। ঘর তো ঘর, আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাজ্য করেছি একরকম। আমি থাকি ইষ্টিশানে রাজন পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে। কুলিগিরি ক'রে খাই।

এ গ্রামের চোর, সাধু, ভাল-মন্দ সমস্ত কিছুই ভূতনাথের নখদর্পণে, সে সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল—হাজারোবার! সাচ্চা সাধু আচ্ছা আদমী নিতাই।

নিতাই আবার বলিল—এই মাচণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে আমার মাথায়।

তিন

নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই। সত্যই নিতাই জীবনে কখনও চুরি করে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন গভীর রাত্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে নির্ভয় বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে, সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সম্মুখীন থেসিয়ান দস্যুর মত ন্যায়ের তর্ক এখানকার বীরবংশীরা জানে না বটে, তবে নীতি ও ধর্মের কথা শুনিয়া তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া হাসে। এবং নিতাইয়ের এই চৌর্যবৃত্তি-বিমুখতার জন্য তাহারা তাহার মধ্যে আবিষ্কার করে একটি ভীরুতাকে, এবং তাহার জন্য তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে।

কেমন করিয়া সে এমনটা হইল তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। তাচ্ছিল্যভরে কেহ লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই সম্ভবত অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবে একটি ঘটনা লোকের চোখে বার বার পড়িয়াছিল। এবং ঘটনাটি লোকের চোখে এখনও ভাসে। রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইস্কুলে চলিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিতেছিল। সেকালে ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্বে ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাই-ই থাকিয়া গেল। নিতাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা এবং তাহার সঙ্গে একটা লণ্ঠন পাইল। এই প্রাপ্তিযোগের জন্যই সকলে পাঠশালা ছাড়িলেও নিতাই ছাড়ে নাই। সে সময় ছেলে কাপড়, জামা ও লণ্ঠন চার দফা পুরস্কার পাওয়াতে নিতাইয়ের মাও বেশ খানিকটা গৌরবই অনুভব করিয়াছিল। বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল। ইহার পর আরও বৎসর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল। এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জামা, গামছা, লণ্ঠন ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খানকয়েক বই—শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ। নিতাই সুযোগ পাইলে আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটিই উঠিয়া গেল। অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবিগানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি

অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্দমিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক দেওয়া কৌতুকও তাহার ভাল লাগে।

মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত—পণ্ডিত মশায়! এইবার তাহারা তাহাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অর্থাৎ রাত্রির অভিযানের দলে তাহারা তাহাকে লইতে চাহিল।

মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। সে বোনকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—নিতাইকে এবার বেরুতে বল। নেকাপড়া তো হ'ল।

গৌরচরণের গম্ভীর ভাবের কথার অর্থ—তাহার আদেশ। নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল—তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে।

নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ছি! ছি! ছি! গভ্যধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে।

নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলছিস মাকে? হচ্ছে কি?

নিতাই তখন পুরনো খাতাটায় রামায়ণ দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল। সে নির্ভয়ে বলিল—লিখছি।

—নিকছিস? গৌর আসিয়া খাতাটা ও বইখানা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম খুঁজিয়া সেই দিনই সে ঘনশ্যাম গোসাঁইয়ের বাড়ীতে মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।

গোসাঁইজী বৈষ্ণব মানুষ, ঘরে সন্তানহীনা স্থূলকায়া গৃহিণী, উভয়েরই দুগ্ধপ্রীতি মার্জারের মত। ঘরে দুইটি গাই আছে, গাই দুটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিয়া দুধ দিত। কিন্তু ইদানীং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে তাহার গাভী দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে। বাধ্য হইয়া গোসাঁইজী গাভী পরিচর্যার জন্য লোক খুঁজিতেছিলেন। নিতাইকে পাইয়া বাহাল করিলেন। নিতাইয়ের সহিত শর্ত হইল, সে গাভীর পরিচর্যা করিবে, বাসন মাজিবে, প্রয়োজনমত এখানে ওখানে যাইবে, রাত্রে বাড়ীতে প্রহরা দিবে। গোঁসাইজীর সুদী কারবারে মূল এক শত মণ ধান এখন সাত শত মণে পরিণত হইয়াছে। ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তূপ বারোমাস জড়ো হইয়াই থাকে। খাতকেরা রোজই কিছু কিছু ধান শোধ দিয়া যায়। গোঁসাইজী স্ফীতোদর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিতাই গোসাঁইজীর বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

দিন কয়েক পরেই, সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে গোসাঁই ডাকিলেন—নিতাই।

বাহিরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে জাগিয়াই ছিল, সে ফিসফিস করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি শুনেছি।

—গোলমাল করিস না, উঠে আয়। গোসাঁইজী অগ্রসর হইলেন। নিতাই শীর্ণকায় গোসাঁইজীর অকুতোভয়তা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। গোসাঁই আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে চারজন লোক, তাহাদের মাথায় বোঝাই-করা চারটি বস্তা। ভারে উত্তেজনায় লোকগুলি হাঁপাইতেছে এবং থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দরজা খুলিতেই নিঃশব্দে লোক চারিজন ঢুকিয়া উঠানের ধানের গাদায় বস্তা চারিটা ঢালিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সোনার মত রং প্রত্যক্ষ করিল। লোকগুলিকেও সে চিনিল, তাহার আত্মীয় কেহ না হইলেও প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধানচোর।

সকালবেলাতেই জোড়হাত করিয়া গোসাঁইজীকে নিতাই বলিল—প্রভু, আমি মশায় কাজ করতে পারব না।

—পারবি না।

—আজ্ঞে না।

—এক পয়সা মাইনে আমি দেব না কিন্তু। আর এ কথা প্রকাশ পেলে তোমাব জ্ঞান থাকবে না।

নিতাই কথাব উত্তর করিল না। তাহার কাপড় ও দপ্তর লইযা সে বাহির হইয়া পড়িল। আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে।

স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজা বায়েন তাহার বন্ধু। রাজালাল একটু অদ্ভুত ধবণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাঁটার মত ডিউটি করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চীৎকার করে, স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের, অর্থাৎ রাজার এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ, সে প্রায় তিন বৎসর আগের ঘটনা।

নিতাই সেদিনও, অর্থাৎ প্রথম আলাপের দিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল, রাজার ছেলেটা ট্রেন আসিবার ঘন্টা বাজিতেই হাঁকিতে শুরু করিয়াছিল—হট যাও। হট যাও। লাইনের ধারসে হট যাও।

নিতাইয়ের ভারি ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিয়াছিল—বাহা রে। কাদের ছেলে হে তুমি?

—আমি রাজার ছেলে।

—রাজার ছেলে? কেয়াবাৎ। তবে তো তুমি 'যোবরাজ'।

রাজা ছিল কাছেই, সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছিল। ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়ার্টারে আনিয়া হাজির করিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিল—আমার বন্ধুনোক।

উমদা আদমী। ফটকেটাকে বলে—রাজার বেটা যোবরাজ! বলিয়া সে কি তাহার হা-হা করিয়া হাসি!

নিতাই উৎসাহভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া, মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা যোবরাজ, তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে!

রাজা লাফ দিয়া ঘরের ভিতর হইতে তাহার পৈতৃক ঢোল ও তাহার নিজের কাঁসি বাহির করিয়া আনিয়া নিজে লইয়াছিল ঢোলটা—ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায়। সেদিন দ্বিপ্রহরেই কবিগান জমিয়া উঠিয়াছিল রাজার ঘরে। নিতাই রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল—

রাজার ঘরের ঘরণী যিনি—তিনি মহামান্যা রাণী—
তিনি খান বড় বড় ফেনী—
সর্বলোকে বলে।

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়। মোটা সুতার খাটো কাপড়খানির আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানির স্বাভাবিক খাঁজগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়ামাটির পুতুলের মত দেখায়। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। রাজার স্টেশনে গাড়ী আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া, আর এই মেয়েটি আসে—পশ্চিমসমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সূর্যের অগ্রগামিনী ছায়ার মত। মেয়েটির সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত। সেদিন সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ এই সরল মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—অসঙ্কোচ খিলখিল হাসি।

রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে, সে বোনকে ধমক দিয়াছিল—হাসিস না ফ্যাক ফ্যাক ক'রে। বেহায়া কোথাকার!

মুহূর্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত হয় নাই, স্বচ্ছন্দে শাসন মানিয়া লওয়ার মত বেতসলতাসুলভ একটি নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই শুধু লতার মত নয় মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।

নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরিবার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। এবং মেয়েটিকে বলিল—দেখতা কেয়া ঠাকুরঝি?

হামারা মিতা ! ওস্তাদ আদমী ! হামারা নাম হ্যায় রাজা, তো ফটককো নাম দিয়া যোবরাজ, তোমারা দিদিকো নাম দিয়া রাণী !—বলিয়াই অট্টহাসি।

এবার অট্টহাসির ছোঁয়াচে রাণীও হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল আবার সে হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল, চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, তবু তাহার সে হাসি থামিল না।

হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল—ওস্তাদ ! ই কালকুট্টি হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়। ইসকো কেয়া নাম দেগা ভাই ?

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর দোসরা নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আমাদের সবারই ঠাকুরঝি। কেমন ভাই ঠাকুরঝি।

রাজা নিতাইয়ের তর্ক-যুক্তিতে অবাক হইয়া গিয়াছিল। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিয়াছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। ই বাত তো ঠিক হ্যায়। ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি।

তাহার পর রাজা পাড়িয়াছিল মদের বোতল—আও ভাই ওস্তাদ !

নিতাই হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর ভাই রাজন। ও দব্য আমি ছুঁই না।

—তব্ ? তব্ তুমি কি খায়েগা ভাই ?

ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—দুধ খাবা, দুধ ? বলিয়া আবার সেই খিল খিল হাসি।

নিতাই হাসিয়াছিল—তা খেতে পারি। এমন দব্য কি আছে ভো-মণ্ডলে ? দেবদুল্লভ।

ঠাকুরঝি সত্যই বড় ঘটী হইতে মাপের গেলাসে পরিপূর্ণ একগ্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পলাইয়া গিয়াছিল।

এ সব পুরনো কথা।

রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্ত।

সেই সূত্রেই গোসাঁইজীর চাকরিতে জবাব দিয়া নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিল—ঠিক কিয়া ওস্তাদ। বহুৎ ঠিক কিয়া ভাই।

—আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে।

—আলবৎ দেগা। জরুর দেগা।

—এইখানে থাকব, আর ইষ্টিশানে মোট বইব। তাতেই আমার একটা পেট চ'লে যাবে।

রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি এ লাইনের একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সে সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখন পড়িয়াই আছে। তাহারই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিল। নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয়, নামাইয়া লয়, গ্রামান্তরেও মোট

বহিয়া লইয়া যায়, উপার্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে নামাইতে-চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্য কুলীদের অপেক্ষা নিতাইয়ের উপার্জন বেশী। কারণ তাহার সহায় স্বয়ং রাজা।

স্টেশন-স্টলটি তাহাদের একটি আড্ডা ; স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে—রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানে সজীব-বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট, অতি-প্রগলভ বিপ্রপদ বলে—বয়স্য কি রে বেটা, বয়স্য কি ? সভাকবি, রাজার সভাকবি।

নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করিয়া মুখে দেয়, সভাকবি কথাটিতে ভারী খুশী হইয়া উঠে। বিপ্রপদকে বড় ভাল লাগে তাহার। এত যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না। বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া মামার দোকানে আড্ডা লয়, বেঞ্চিতে বসিয়া অনর্গল বকে, লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া উঠে—চা-গ্রো-ম। চা-গ্রো-ম ? দেহ তাহার যত আড়ষ্ট, জিহ্বা তত সক্রিয়। উৎকট রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মেজাজের মানুষ। মামার দোকানে সকালবেলায় আসিয়া বিপ্রপদ চা বিড়ি খাইয়া খাইয়া বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে খাইবার জন্য। খাইয়া খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বেলা তিনটায় আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে। যায় রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়া তবে। বিপ্রপদর সঙ্গে নিতাইয়ের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে, বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদ করে—

ভব কপি, মহাকবি দগ্ধানন সলাঙ্গুল—

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলে—প্রভু, কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ হাসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া বলে- ও। কপি নয়, কপি নয়, কবি, কবি। আমারই ভুল। আচ্ছা, কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি—শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেল দুর্যোধন, বাজী বাখলে যুধিষ্ঠির, কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকচ মরল কোন পাপে ?

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিগান আরম্ভ করিয়া দেয়। বাঁ হাত গালে চাপিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া সুর ধরিয়া আরম্ভ করে—আহা—আ-হা-রে—ঘটোৎকচ মরল কোন পাপে ?

রাজা ভাবে, ঢোলকটা পাড়িয়া আনিবে নাকি ? কিন্তু সে আর হইয়া উঠে না। ইতিমধ্যে বারোটার ট্রেনের ঘন্টা পড়ে।

দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই [illegible] রাজার সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকেই লইয়া থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।

মজুরির দরদস্তুর করিতে নিতাই সবিনয়ে বলে -প্রভু, গগনপানে দিষ্টি করেন একবার। গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন। বর্ষায় বলে—কিষ্ণবন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্তা। শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু।

মামার দোকানে বসিয়া বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে, বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তো সব শাল-দোশালা আছে, ওর যে কোন শালাই নাই। ওর কষ্টের কথা বিবেচনা করুন একবার।

দ্বিপ্রহরে বাহিরে যাইতে হইলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়—রাজন, ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখো।

এখানে থাকিলে বারেটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েন্টের কাছে লাইনের ধারে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি আছে তাহার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিপ্রহরে তখন রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে। নিতাই নিবিষ্ট মনে, যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। স্বর্ণবর্ণ-বিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। ক্ষারে কাচা তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাট করিয়া পরা সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ; এবং তাহার মাথায় একটি তকতকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটী। ঘটীটি সে ধরে না—এক হাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে। কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।

নিতাই নেশা করে না ; কিন্তু দুধ তার প্রিয়বস্তু। চায়েও আসক্তি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে। ঠাকুরঝির কাছে সে নিত্য একপোয়া করিয়া দুধ যোগান লইয়া থাকে। দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয়। মামার দোকানে চা খাইলে দাম দিতে হয় দু পয়সা কাপ। বিপ্রপদর মত বিনা পয়সায় চা খাইবার অধিকার তাহাব নাই। তা ছাড়া জমে না। কেমন ছোট ছোট মনে হয়।

স্টেশনে নিত্য নানা স্থানের লোকজনের আনাগোনা। আশপাশের খবর স্টেশনে বসিয়াই পাওয়া যায়। খবরের মধ্যে কবিগানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া উঠে। সেদিন সন্ধ্যাতেই লালপেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাতকাটা জামাটি পরিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া সাজে এবং গুন-গুন করিয়া কবিগান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদা দেয়। মিলিটারী রাজা সাড়ে আটটার ট্রেন পার করিয়াই বলে—ফাইভ মিনিট ওস্তাদ।

পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে কোম্পানির দেওয়া নীল কোর্তাটা চড়াইয়া স্টেশনের একমুখো বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে। ভোর হইবার পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসে। শুধু কবিগানই নয়, যাত্রাগান, মেলা—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে। আহা, আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা তাহার কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

মনের এই বাসনাটুকু সে দুই কলি গানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নির্জন প্রান্তর পাইলেই গাহিয়া সে নিজেকেই শুনায় ; আর শুনায় কোন রসময় ভাইকে। সে রসময় ভাই তাহার রাজন।
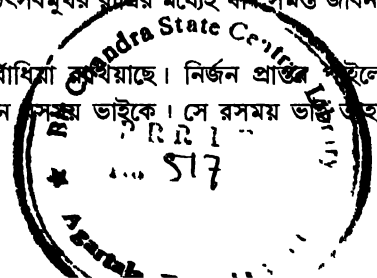
সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায় রে।
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাই রে।
ও রসময় ভাই রে।

রাজা শুনিয়া বাহা বাহা করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে—ওস্তাদ তুম ভাই গানা তৈয়ার করো। আচ্ছা গানা আতা তুমারা।

গান তাহার অনেক আছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না।

হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে এই নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল।

চার

কবিগানের পাল্লার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুরমাখানো শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই মেলা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল রাজদত্ত মাল্যকণ্ঠে সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। যেন একটা ভাবের নেশার ঘোরের মধ্যে পথ চলিতেছিল। মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল যে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে একজন কবি।

সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এতদিন তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিত না, আজ তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতে করিতে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহাদের কল-কোলাহলের কিছুই কিন্তু তাহার কানে আসিতেছিল না।

রাজা আসিতেছিল তাহার গা ঘেঁষিয়া। ওস্তাদের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে পথ চলিতেছিল সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল—হট যাও, হট যাও। এতনা নগিচমে কেও আতা হ্যায় হট যাও। উৎসাহের প্রাবল্যে আজ তাহার ভুল-হিন্দী বলার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরঝি একটু পিছনে আসিতেছিল। নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল—তোমরা তো মা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এই তো ইষ্টিশান, তোমাদের বাড়ীর দুয়োর থেকে দেখা যায়; কই, কোন দিন নেতাইয়ের খোঁজ করেছ?

ঠাকুরঝি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া, যে যখন কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। পাশের গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ী, মেলা উপলক্ষে সে আজ দিদির বাড়ী আসিয়াছে, রাত্রে এইখানে থাকিবে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে। —তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে? দিদির ঘরে গায়েন করতে, আমরা হাসতাম। বাবা, এত লোকের ছামুতে—ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে।—বাবা। কল্পনা মাত্রেই রাত্রির অন্ধকার আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিতেছিল।

চণ্ডীতলা হইতে ডোমপাড়ার ভিতর দিয়াই স্টেশনের পথ। নিতাইয়ের কয়েকজন আত্মীয়

আজ তাহাকে আহ্বান করিল—বাড়ী আয়।

নিতাইয়ের মা এখানে আর থাকে না, সে তাহার কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়ীতে থাকে। জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল। রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রয় করে, ভাঙ্গা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায় ও সের দরুনে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয়—এই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে। নিতাই একবার নিজের ভাঙ্গা ঘরটার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল,—না, আমার আস্তানাতেই যাই।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই একটা রূঢ় কণ্ঠের কয়েকটা কঠিন কঠিন বাক্য অতি অতর্কিতে কোন নিষ্ঠুর হাতের ছোঁড়া কয়েকটা পাথরের টুকরার মত নিতাইকে আসিয়া আঘাত করিল,—এই শূয়ার—যাবি কোথা? দাঁড়া।

এ তাহার মামার কণ্ঠস্বর। মামা এখানকার কুলাধিপতি। তাহাদের স্বজাতিদের নৈশাভিযানের দলপতি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

নিতাই চমকিয়া উঠিল।

পাড়ার গলিমুখ হইতে মামা নামিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল—প্রহ্লাদের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর মত। এবং খপ করিয়া তাহার টুটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল—তোর বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি খাওয়ালি—আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি ক্যানে আসরের মধ্যিখানে? শূয়ারের বাচ্চা শূয়ার।

একমুহূর্তে হতভম্ব হইয়া গেল সকলে। রাজন পর্যন্ত। নিতাইয়ের মামার হাত সাঁড়াশীর চেয়েও শক্ত। লোহার তালা ওই হাতের মোচড়ে মট করিয়া ভাঙিয়া যায়। নিতাইয়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে কবিগান করিলেও ওই মামারই ভাগিনেয়, ওই বংশেরই সন্তান। দেহে শক্তি তাহারও কম নয়। তার উপর প্রথম জোয়ান বয়স। সে দুই হাত দিয়া মামার হাতখানা টানিয়া ধরিল। পরমুহূর্তে রাজন আগাইয়া আসিল—ছোড়ো—।

মামার হত্যা করিবার সঙ্কল্প ছিল না। ইচ্ছা ছিল শাসনের। তাই নিতাইয়ের গলা ছাড়িয়া দিয়া কথা বলিল—যাঃ। আর এ-পাড়ার পথ মাড়াবি না। মহাদেব কবিয়াল ওই একটা কথা ঠিক বলেছে। আস্তাকুঁড়ের এঁটো (এঁটো) পাতার স্বগগে যাবার আশা গো।—বলিয়া সে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল—তেমনিই চকিতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়াই ছিল—স্তব্ধ হইয়াই রহিল। রাজন শুধু চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল—ই ক্যা হ্যায়? ই ক্যা বাত? আঁঃ। কেয়া, মগকে মুল্লুক হ্যায়?

পাড়ার ভিতর হইতে আর একটা হুঙ্কার আসিল—যাঃ—যাঃ, চেঁচাস না রে বেটা কুলী।—

নিতাই রাজনের হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল—রাজন চুপ কর। চল। ই আমার পাপ ভাই। চল। বলিয়া হাসিয়া বলিল—আজ থেকে অকূলে ভাসলাম। সে অকূলে তুমিই আমার ভেলা।

রাজন তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল—তুম সাচ্চা আদমী ওস্তাদ।

নিতাই আবার একটু হাসিল। পেছনে ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল ঠাকুরঝি।

রাজনের স্ত্রী বলিল—মরণ! কানছিস ক্যানে লো?

ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছে। সঙ্গের লোকজন আপন আপন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিল। কোয়ার্টারে আসিয়া রাজা বলিল—কুছ্ খা লেও ভাই ওস্তাদ।

নিতাই বলিল—গান শুনবে ভাই রাজন! ভাল গানের কলি এসেছে মনে। শুনবে?

রাজন বলিল—ঠ্যয়রো! ঢোলটো—

নিতাই হাত চাপিয়া ধরিল—না। শুধু গান।

বলিয়াই তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপিয়া গাহিল—

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে॥

রাজন বলিল—বাঃ, বাঃ, বাঃ! উসকা বাদ?

নিতাইয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে জল মুছিতে মুছিতে বলিল—আর নাই।

তারপর সে সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। মনের মধ্যে অনেক কথা। মামার হাতে লাঞ্ছনার কথাটা তাহার কাছে খুব বড় নয়। মামার কাছে অনেক লাঞ্ছনাই সে ভোগ করিয়াছে। ওটা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ও ছাপাইয়া সে ভাবিতেছিল কবিগানের কথা।

বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের কথা। তারণ কবি যে-আসরে গান করিয়াছে, সে আসরে কত লোক! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে। সে যেবার প্রথম তারণ কবির গান শোনে সেবারকার সে ছবি এখনও তাহার মনে জ্বলজ্বল করিতেছে।

এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই, সে কি জনতা, আর সে কি গোলমাল! তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক! চার পাঁচটা চাপরাসীই তখন মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বহাল করা হইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই-চারিজন বাবু। তবু সে কি গোলমাল! নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল, কলরবমুখর জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল, আলোকোজ্জ্বল আসরের মধ্যে তখন তারণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই লম্বা মানুষটি, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, বুকে সারি সারি মেডেল, লাল চোখ। তারণ কবির আবির্ভাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল। আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়াছিল, তাহারা পর্যন্ত চুপ করিয়া গিয়াছিল। আর সে কি গান!

তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে, সেইখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারণ কবির পায়ের ধূলাও লইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার সাধ, কবিয়াল হইবে। ইচ্ছা ছিল তারণ কবির দলে দোয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তারণ মরিয়া গেল। মদ খাইয়াই নাকি তারণ মরিয়াছে। তারণ কবির ওই একটা বড় দোষ ছিল, ভীষণ মদ খাইত। আসরেই তাহার বোতল গেলাস সকলের সম্মুখে যে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া মদ খাইত। ওই তারণ কবি সেদিন গানে গাহিয়াছিল—

"তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন,
তোমার চরণধূলা আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের শাপবিমোচন,
খালাস, খালাস, খালাস, আমি খালাস নিলাম হে।"

সেদিন পালাতে তারণ হইয়াছিল বিভীষণ এবং প্রতিপক্ষ বিষ্ণু সিং হইয়াছিল রাবণ। সেই কথাটাই আজ বার বার করিয়া মনে পড়িতেছিল। সে আজ খালাস। খালাস। খালাস।

এক এক সময় তাহার মনে হয় তারণ কবি তাহারই কপালদোষে মরিয়া গেল। সে গুরু পাইল না। এমন ভাল গুরু না হইলে কি ভাল কবি হওয়া যায়। শাস্ত্রের কি অন্ত আছে? পড়িয়া শুনিয়া সে সব শিখিতে গেলে এ জীবনে আর কবিয়াল হওয়া হইয়া উঠিবে না। রামায়ণ মহাভারত—। সহসা তাহার মনে হইল, মহাদেব আজ রামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়াছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। আলো জ্বালিল।

ছোট্ট একটা চৌকির উপর যত্নের সহিত রঙিন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুঁথিগুলি রাখিয়া থাকে। দপ্তর খুলিয়া সে রামায়ণ বাহির করিল। দপ্তরের মধ্যে একগাদা বই। পাঠশালা হইতে আজ পর্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহার আছে। পথেঘাটে উড়িয়া বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা, তাহারও অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া নিতাই রাখিয়াছে।। কাগজ দেখিলেই সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক, ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি—সে প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে। আর আছে খান দুইয়েক খাতা, ভাঙা স্লেট-পেন্সিল, একটা লেডপেন্সিল, ছোট একটুকরা লাল নীল পেন্সিল। আর কিছু ছেঁড়া পাতা, খোলা কাগজ।

সেই রাত্রেই সে নিবিষ্ট মনে রামায়ণের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক, মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার মানাইয়াছে। ভুল তাহার নয়, মহাদেবই ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে। হাসিয়া সে মহাদেবের প্রশ্নের উত্তরের ঠাঁইটা বন্ধ করিয়া রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডার অধ্যায়টা খুলিল। পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। রগের শিরা দুইটা দপ দপ করিয়া লাফাইতেছে কানের পাশে। এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ উঠিতেছে, ধীরে ধীরে শব্দগুলা মৃদু হইতে হইতে একসময় নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙিল রাজার ডাকে।

মিলিটারী রাজা রাত্রি জাগিয়াও ঠিক সকাল ছয়টায় উঠিয়াছে। সাতটায় এ লাইনের ফার্স্ট ট্রেন এ-স্টেশন অতিক্রম করিবে। যুদ্ধ-ফেরত রাজা চা খায়, চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে সিগন্যাল দিয়া ও ঘন্টি মারিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল—ওস্তাদ। ওস্তাদ।

ওস্তাদ না হইলে চা খাইয়া সুখ হয় না। বউটা এখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুরঝি কিন্তু ঠিক আছে, সে রাজার পূর্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরঝির শাশুড়ীটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়। রাজা মনে মনে এখন আপসোস করে,—বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল। ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত। ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।

নিতাইয়ের সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল—হো ওস্তাদ।

এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল—উঁহু।

—চা হো গেয়া ভেইয়া।

—উঁহু।

—আরে ট্রেন আতা হ্যায় ভেইয়া।

—উঁহু।

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে আজ বেচারার একটু ঘুম দরকার।

* * *

বেলা নয়টা নাগাদ নিতাই উঠিল। হাসিমুখেই উঠিল। বোধ হয় গত রাত্রের কথা স্বপ্ন দেখিয়াই, একটু মৃদু হাসি মুখে মাখিয়া উঠিয়া বসিল। এবং প্রথম কথাই মনে হইল যে কলিকাতার সেই চাদরে বাবুটি আজ তাহাকে দেখিলেই বলিবেন—আরে তুই একজন কবি রে, অ্যাঁ। তাহার পর ইংরেজীতে কি একটা—

ভতনাথবাবু তারিফ করিবেন—বাহবা রে নিতাই, বাহবা।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত-দৃষ্টি মুখগুলি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। বিপ্রপদ ঠাকুর তো একেবার কোলাহল জুড়িয়া দিবে। স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয়। এই সাড়ে নটার ট্রেনেই বিপ্রপদর মারফৎ তাহার কবিখ্যাতি এ: গারে কাটোয়া পর্যন্ত আজই পৌঁছিয়া যাইবে। বাসি দুধ চা চিনি ঘরেই আছে, তবু সে আজ ঘরে চা তৈয়ারী করিল না। চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশ..-স্টলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখে সেই মৃদু হাসি।

বিপ্রপদ হৈ হৈ করিয়া উঠিল—এই। এই। চোপ. সব চোপ। তারপর তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল—বলিহার বেটা বলিহার। জয় রামচন্দ্র। কাল নাকি সত্যি সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর।

আশ্চর্যের কথা, বিপ্রপদর পুরানো রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপ্রপদর সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না প.ইয়া আবার বলিল—ধুয়ো কি ধরেছিলি বল্ দেখি? 'উঁপ। উঁপ। খ্যাকোর—খ্যাকোর উঁপ। চুপ রে বেটা মহাদেবা চুপ চুপ চুপ।' না কি? বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

নিতাই এবার হাত জোড় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ,

ছোট জাত ; বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুবান যা বলেন তা-ই সত্যি। বলিয়াই সে আপনার মগটি বাড়াইয়া ভেণ্ডার বেনে মামাকে বলিল—কই গো, দোকানী মাশায় ; চা দেন দেখি। সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সা দিবার জন্য খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল।

দোকানী বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—মাতুল না ব'লে দোকানী বলছিস, সম্বন্ধ ছাড়ছিস নাকি নিতাই?

নিতাই কথার উত্তর দিল না। বেনে মামাই বলিল—নাঃ, কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে। সে যাই বলুন আপনি।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা ঘুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইতে পরাইতে বলিল—তার জন্যে কপিবরকে একটা মেডেল দোব।

কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়াই নিতাই চায়ের মগটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে সাড়ে নযটার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই বোধ হয মোটের সন্ধানে গেল। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ। ওস্তাদ।

সাড়া না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়া আসিল। বেনে মামা বলিল—এই তো উঠে গেল। প্ল্যাটফর্মে নাই?

এদিক ওদিক চাহিয়া রাজার নজরে পড়িল, গাছপালার আড়ালে আড়ালে নিতাই চলিয়াছে বাসার দিকে। সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল।

—গাঁওকে একঠো মোট হ্যায় ভেইয়া, একঠো বেগ আওর ছোটাসে একঠো বিস্তারা।

নিতাই ঘাড় নাড়িযা বলিল—না।

—আরে, বড়াবাবুকে জামাই। উমদা বকশিশ মিলে গা। দো আনা তো জরুর।

—না।

—কেয়া, তবিয়ৎ কুছ খারাপ হ্যায়?

—না।

—তব? রাজা বিস্মিত হইয়া গেল।

নিতাই গম্ভীরভাবে বিষণ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিল—কুলিগিরি আর করব না রাজন।

রাজা এবার বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

পাঁচ

নিতাই বাসায় আসিয়া হঠাৎ রামায়ণখানা খুলিয়া বসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানি খুলিল। বিপ্রপদর কথায় সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে বার বার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে—ব্রাহ্মণবংশের মূর্খ কি বুঝিবে। কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হয় নাই। তাই সে রামায়ণখানা টানিয়া লইয়া বসিল। বইখানা খুলিয়া সে বাহির করিল দস্যু রত্নাকরের কাহিনী। বহুবার সে এ কাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু আজ এ

কাহিনী নূতন রূপ নূতন অর্থ লইয়া তাহার মনের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিল। বই হইতে পড়িবার পূর্বেই জানা কাহিনী তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে জলও আসিয়াছে। চোখ মুছিয়া সে এবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর॥"

বাহির হইতে রাজা তাহাকে ডাকিল—ওস্তাদ!

উদাসভাবেই মুখ তুলিয়া নিতাই তাহাকে আহ্বান করিল—এস, রাজন এস।

রাজা আসিয়া বসিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিল—কেয়া হুয়া ভাই তুমারা? কাম কেঁও নেহি করেগা?

নিতাই হাসিয়া বলিল—শোন, আগে এই কাহিনীটা শোন।

রাজা বলিল—দূ-রো, ওহি লিখাপড়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।

নিতাই তখন পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজা অগত্যা একটা বিড়ি ধরাইয়া শুনিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তন্ময় হইয়া গেল।

"বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপনা ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥"

পড়া শেষ করিয়া নিতাই রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা তখন গলিয়া গিয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—সীয়ারাম! সীয়ারাম! তারপর নিতাইয়ের তারিফ আরম্ভ হইল—আচ্ছা পড়তা হ্যায় তুম ওস্তাদ! বহুৎ আচ্ছা!

নিতাই এবার গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন, এইবার তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ।

রাজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

জানালা দিয়া রেললাইনের রেখা ধরিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না মানুষ মারতেন?

রাজা বলিয়া উঠিল—আরে বাপ রে বাপ রে! এইসা কভি হো' সকতা হ্যায় ওস্তাদ!

—তা হলে? কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখ। চারিদিকে তো র'টে গেল কবিয়াল ব'লে!

—আলবাৎ! জরুর!

—তবে? আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মুনির কথা ছেড়ে দাও। কার সঙ্গে কার তুলনা! ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁরা। কিন্তু আমিও তো কবি। না হয় ছোট।

এতক্ষণে এইবার রাজা সমস্তটা বুঝিল এবং একান্ত শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে নিতাইয়ের মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বল রাজন, আর কি আমার কুলিগিরি করা শোভন হবে? লোকে ছি ছি করবে না? বলবে না—কবি মোট বহন করছে!

—হাঁ, ই বাত ঠিক হ্যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হইয়া রাজা বলিল—লেকিন একঠো বাত ওস্তাদ—

—বল, রাজার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল।

—লেকিন রোজগার তো চাহিয়ে ভাই ; খানে তো হোগা ভেইয়া।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া নিতাই বলিল—সে আমি ভাবি না রাজন। দুবেলা না হয়, একবেলা খেয়েই থাকব, তাও যেদিন না জুটবে, সে দিন না হয় উপবাসীই থাকব। অতঃপর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কণ্ঠস্বরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করিয়া সে বলিল—তা ব'লে ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—। নিতাই বার বার অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না—না—না। তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর বহিবে না।

রাজাও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার পরিষ্কার বাংলায় বলিল—না ওস্তাদ, ছোট কাজ আর তোমার করা হবে না। উঁ-হুঁ। নাঃ।

.রাজার উপর নিতাইয়ের প্রীতির আর সীমা রহিল না। গভীর আবেগের সহিত সে বলিল—তুমি আমার সত্যকার মিত্র রাজন।

—ধন্য হোগেয়া ওস্তাদ, তুমারা মিত্র হোয়কে হাম ধন্য হোগেয়া। রাজনেরও আবেগের অবধি ছিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই এবার বলিল,—আজ বড় দুঃখ পেয়েছি রাজন।

—দুখ? কৌন দুখ দিয়া ভাই?

—ওই তোমার বিপ্রপদ ঠাকুর। আমাকে বললে কি না—কপিবর, মানে হনুমান। আমি হনুমান রাজন?

রাজা মুহূর্তে সোজা হইয়া বসিল। তাহার মিলিটারী মেজাজ মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল নিতাইকে—জবাব কেঁও নেহি দিয়া তোম?

—জবাব জিহ্বার অগ্রভাগে এসেছিল রাজন, কিন্তু সামলে নিলাম। ব্রাহ্মণ বংশের মূর্খ বলীবর্দ অপেক্ষা কপি অনেক ভাল রাজন।

—জরুর। আলবৎ। লেকিন বলীবর্দ কিয়া হ্যায় ভাই?

নিতাই বলিল—বলদকে বলে ভাই।

তারপর নিজেই রচনা করিয়া বলিল—

সংসারে যে সহ্য করে সে-ই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম নয়॥"

কবিতা আওড়াইয়া নিতাই বলিল—বুঝলে রাজন, ক্ষমা করেছি আমি। একে ব্রাহ্মণ, তায় রোগা লোক, তার উপর মূর্খ; ওকে আমি ক্ষমা করেছি।

রাজন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—সাদা বাংলায় বলিল—ভালই করেছ ওস্তাদ। তারপরই সে আবার বলিল—তাহ'লে কি করবে ওস্তাদ? একটা কিছু করা তো চাই ভাই। পেটের তুল্য অনবুঝ তো নাই সংসারে।

—আমি একটা দোকান করব ওস্তাদ?

—দোকান?

—হ্যাঁ, দোকান। বিড়ির দোকান, নিজেই বিড়ি বাঁধব আর ইষ্টিশানের বটতলার বসে বেচব। দু-এক বাক্স সিগারেটও রাখব।

রাজন উৎসাহিত হইয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা হোগা ওস্তাদ।

নিতাই কিন্তু এবার একটু ম্লান ভাবেই বলিল—বণিক মাতুল একটু রুষ্ট হবে আমার ওপর। কিন্তু—

—কেয়া কিন্তু ? উ গোসা করনেসে কেয়া হোগা ? জাস্তি ভাত খায়েগা আপনা ঘরমে।

—না রাজন। কারও ক্ষতি করতে আমার ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া আমার হাতের পান, চা জল এ তো কেউ খাবে না। বলিতে বলিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।—আচ্ছা রাজন, বাঁশ কিনে যদি মোড়া সাজি বেশ শৌখীন করে তৈরি করি, তাহ'লে কেমন হয় ?

—উ সবসে আচ্ছা।

--কিন্তু বিপ্রপদ বলবে কি জানো ? ডোমবৃত্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—বেটা ডোম।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া রাজন বলিল—একদিন ঠেসে কান দুটো মলে দেবো বেটা বামুনের।

—না। না। না। হাজার হ'লেও ব্রাহ্মণ। রাজন "ব্রাহ্মণ সামান্য নয়, ব্রাহ্মণে করিলে ক্রোধ হইবে প্রলয়।" শাস্ত্রের কথা ভাই। তা ছাড়া—

রাজা বাধা দিয়া বলিল—ধ্যে-ৎ। ব্রাহমন। সাতশো ব্রাহমন একঠো বকপাখীকে ঠ্যাং ভাঙনে নেহি শকতা হ্যায়। ব্রাহমন।

নিতাই হাসিয়া বলিল—না-না-না। বলুক ডোম। ডোমেই বা লজ্জা কি ? ডোমই বা ছোট কিসে ? ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ।

—বাস—বাস—বাস। কেয়া হরজ। বোলনে দেও ডোম। রাজনেরও আর কোন আপত্তি রহিল না—বহুৎ আচ্ছা কাম, দোকান লাগাও, আওর একঠো সাদী করো ওস্তাদ। সনসার পাতাও।

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া নিতাই বলিল—দূর।

—দূর কেঁও ভাই ? উ হাম নেহি শুনেগা।

—আচ্ছা তার আগে একটা কাহিনী বলি শোন।

কাহিনীতে রাজনের পরম অনুরাগ, সে বিড়ি ধরাইয়া জাঁকিয়া বসিল। নিতাই আরম্ভ করিল লেজকাটা শেয়ালের গল্প। গল্প শেষ করিয়া নিতাই বলিল—তুমি লেজ কেটেছ বলে আমি লেজ কাটছি না রাজন।

রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকটা হাসিল, তারপর কিন্তু বলিল—উ বাত তুমারা ঠিক নেহী হ্যায়। সনসারমে আয়কে সাদী নেহি করেগা তো কেয়া করেগা ?

নিতাই এবার বলিল—তুমি ক্ষেপেছ রাজন। বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ব শেষে। আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিদ্যের মর্ম বোঝে ? কেবলই খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করবে দিনরাত। তা ছাড়া ধরগা তোমার—, কথা শেষ হইবার পূর্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ ? ফিক করকে হাসতা কেঁউ ?

—হাসবো না ? তোমার, তেমন মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে ? বেশ মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে-তাতে ধরবে না রাজন।

রাজা এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাজার উচ্চহাসি উৎকট এবং বিকট। রাজার সে হাসি কিন্তু অকস্মাৎ আবার বন্ধ হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া সে বার বার ঘাড় নাড়িয়া যেন এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই বলিল—ঠিক বাত ওস্তাদ, ঠিক বাত বোলা হ্যায় ভাই। লড়াইমে গিয়া, দেখা, আ-হা-হা একদম ফুলকে মফিক জেনানা। ইরাণী দেখা হ্যায় ওস্তাদ, ইরাণী? ওইসা, লেকিন উস্‌সে তাজা।

রাজার কথা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু স্মৃতির ছবি ফুরাইল না। সে উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। যেন বসরার সেই রূপসীদের শোভা--ওই ধূ ধূ-করা কৃষিক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নিতাইও চাহিয়া ছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইনের সমান্তরাল শাণিত দীপ্ত দীর্ঘ রেখা দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে, সেই বিন্দুটির দিকে। সহসা এক সময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু, যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। চকিতে চকিতে একটা ছটা ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিতেছে। রাজা এখানে বসিয়া আড্ডা দিতেছে, তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য রাখিয়া, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

—ছি রে, ছি রে আমার অদেষ্ট! সকালবেলা থেকে বেলা দোপর পর্যন্ত মানুষের ঘর ব'লে মনে থাকে না! অদেষ্টে আমার আগুন লাগুক, পাথর মেরে এমন নেকনকে (কপালকে) ভেঙ্গে কুচিকুচি করি আমি।

রাজার মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া পড়িল। নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ?

—আতা হ্যায়। আভি আতা হ্যায়। সে চলিয়া গেল।

—রাজন! রাজন! নিতাই পিছন পিছন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরই রাজা ফিরিল সেই উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে। হাসিয়া সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল। নিতাই প্রশ্ন করিল—হ'ল কি?

রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্য ছেদও পড়ে না এবং এমন টানা হাসির মধ্যে কথাও বলা যায় না। তবুও বহুকষ্টে রাজা বলিল—ভাগা হ্যায়। মাঠে মাঠে—। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকট উচ্চহাসি।

নিতাই বুঝিল। গালিগালাজ-মুখরা রাজার স্ত্রী রুদ্রমূর্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিয়াই বিপরীত দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখার অভিনয় করিয়া বলিল, এইসা করকে দেখতা; হাম এক পাঁও গিয়া তো ফিন দৌড় লাগায়া। অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড় দিয়াছে, আবার কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর এক পা বাড়াইয়াছে, দৌড়িয়া যাইবার ভঙ্গি করিয়াছে, অমনি রাজার বউও ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজার কিলকে ভাঃ বড় ভয়। বলিতে বলিতে রাজা আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই মুহূর্তটিতেই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল সেই ঠাকুরঝি। পরনে সেই ক্ষারে

ধোয়া ধবধবে মোটা সুতোর খাটো কাপড়, মাথায় পরিচ্ছন্ন মাজা পিতলের ঘটি। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।

নিতাই সাদরে আহ্বান করিল—এস ঠাকুরঝি, এস।

ঠাকুরঝি রাজাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিয়া বিপুল কৌতুক অনুভব করিল। সকৌতুকে সে রাজার দিকে আঙুল দেখাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচন-ভঙ্গিতে—এই, এই জামাই এত হাসছে কেনে ?

—শুধাও ভাই জামাইকে। নিতাই হাসিল।

—অই। অই। ই কি হাসি গো। এমন করে হাসছ কেন গো জামাই ? সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়া গেল। সেও হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি। হি-হি-হি। অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মত হাসি।

রাজার হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসার জন্য সে ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল মেয়েটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ভীষণ চটিয়া রাজা ধমক দিয়া উঠিল -অ্যাও।

ধমক খাইয়া মেয়েটির হাসি বাড়িয়া গেল।

রাজা বলিল -আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের ক'রে হাসছে দেখ। লজ্জা নাই তোর ?

এবার মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সে বলিল—লাও বাপু, দুধ লাও। আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্তে বকবে।

রাজা বলিল তোকেও একদিন ঠ্যাঙানি দিতে হবে দেখছি। দিদির মত মাঠে মাঠে—। আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরঝি কিন্তু এবার হাসিল না। সে নীরবে নতমুখে ঘটি হইতে মাপের গ্লাসে দুধ ঢালিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদা দিল—কই [illegible], কড়াই পাত।

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের কড়াটি পাতিয়া দিয়া বলিল—রাগ করলে ঠাকুরঝি ? না না, রাগ ক'রো না।

ঠাকুরঝি উত্তর দিল না, মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল। পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝি আমার ডাকগাড়ি গেল। বাবা রে, বাবা রে, ছুটেছে। পোঁ- ভস-ভস ভস-ভস। বাবা রে।

ঠাকুরঝি কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না।

নিতাই বলিল—না রাজন, এ-প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হ'ল না।

কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না। কিসের অনুচিত ? সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল—ধে—ৎ।

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ীর ঘন্টা দিতে হইবে। এই সময়টি নির্ণয়ে ঠাকুরঝি তাহার সিগনাল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয়, মধ্যপথেই শুনিতে পায় মাস্টার হাঁকিতেছে—রাজা।

রাজা নিত্য সাড়া দেয়, আজও দিল—হাজির হ্যায় হুজুর।

ঠাকুরঝি এবং রাজন দুজনেই চলিয়া গেল। নিতাই একটু বিষণ্ণ হইয়াই বসিয়া রহিল। না-না, এমন ভাবে ওই মিষ্টি মেয়েটিকে রাজনের এমন কটু কথা বলা উচিত হয় নাই। সংসারে সুখ ভালবাসায়, মিষ্টি কথায়। কাল রাত্রে গাওয়া গানখানি আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল।

"আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জলে রে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গিয়াছে : চা খাইতে হইবে। সে উনান ধরাইতে বসিল। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় না; তা ছাড়া শরীরটাও আজ ভাল নাই। গত রাত্রির পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, অনিদ্রায়—আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল-কাঁসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর একটু চা না হইলে জুত হইবে না।

উনান ধরাইয়া কেৎলির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল। নাঃ, রাজনের এমন কটু কথা বলা ভাল হয় নাই। ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভাল। আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত। বলিবার ছিল যে। গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরঝি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত। মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে, তাই সে কথাগুলি না বলিয়াই চলিয়া গেল। 'আলকাতরার মত রঙ'—। ছি, ওই কথাই কি বলে। কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, চুল কালো—আহা-হা। আহা-হা। বড় সুন্দর বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে। হায়, হায়, হায়।

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

কেন কাঁদ?

ছয়

বড় ভাল কলি হইয়াছে। নিতাইয়ের নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল।—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

বাহবা, বাহবা, বাহবা। কেন কাঁদ?

ওদিকে চায়ের জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই-করা লোহার থালা চাপা দিল। 'ফুটন্ত জলে প্রত্যেক জনের জন্য এক চামচ চা দিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন'—বেনে মামার স্টলে নিতাই চা প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞাপন পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার পর কি?

চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলি আর

মনোমত হইতেছে না। সে জানালা দিয়া বাহিরের যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তবু পছন্দসই দ্বিতীয় কলি আসিল না। অন্য দিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায়, তারপর দুধ চিনি দেয়। আজ আর সে হইয়া উঠিল না, কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিল। অকস্মাৎ তাহার চায়ের কথা মনে হইতে সে দুধ চিনি দিয়া চা ছাঁকিয়া লইল। কলাই-করা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান। ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মত গাছটি ; নিতাই বলে—'চিরোল-চিরোল পাতা'। তাহার উপর যখন চৈত্রের শেষ হইতে থোপা-থোপা লাল ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন নিতাই প্রায় অহরহই গাছটির তলায় বসিয়া থাকে। ফুলের লোভে ছেলের দল আসে, নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়া বিদায় করে, গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না।

স্টেশন হইতে রাজার হাঁক-ডাক আসিতেছে। এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ী থাকে, এখানকার মাল থাকিলে গাড়ী কাটিয়া দিয়া যায়—সেই গাড়ী শান্টিং হইতেছে। নিতাইও আগে নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ী ঠেলিত। সহসা তাহার মনের গান চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা। কুলিগিরি সে আর করিবে না, সে কবিয়াল। কুলিগিরি না করিলে অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া?

এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ চোখে পড়িল লঘু দ্রুত গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে মোটা কাপড় পরা, হাল্কা কাশফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি ; মাথায় সোনার টোপরের মত ঝকঝকে পিতলের ঘটি। ঠাকুরঝির কথাও যেমন দ্রুত, চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে। ঢ্যাঙা নয়, অথচ সরস কাঁচা বাঁশের পর্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখজুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী। যতবারই সে ঠাকুরঝিকে দেখে ততবারই এই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে সাড়া তোলে।

ঠাকুরঝি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে। নিতাই মনে মনে একটু হাসিল- তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি এমন হনহন করিয়া চলিয়াছে। শক্তি থাকিলে ঠাকুরঝি নিশ্চয় মাটি কাঁপাইয়া পথ চলিত। কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভাল হয় নাই। আলকাতরার মত রঙ হইলেও ঠাকুরঝি তো মন্দ দেখিতে নয়। মন্দ কেন, ভালই। কালো রঙে কি আসে যায়।

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'

নিতাই ডাকিল—ঠাকুরঝি। অ ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি গ্রাহ্য করিল না, সে হনহন করিয়াই চলিয়াছে।

—আমার দিব্যি। নিতাই হাঁকিয়া বলিল।

ঠাকুরঝি থমকিয়া দাঁড়াইল।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি বলিল—না, আমার দেরি হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন।

—না। ওইখান থেকে বল তুমি।

—আমার দিব্যি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুরঝি এবার আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার দিব্যি যদি আমি না মানি?

—না মানলে মনে বেথা পাব, আর কি ঠাকুরঝি। নিতাই ছলনা করিয়া বলিল না, আন্তরিকতার সহিতই বলিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরেই এবার মেয়েটি বলিল—লাও কি বলছ, বল?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—রাগ কবেছ?

মুহূর্তে ঠাকুরঝি ভীরু চকিত দৃষ্টিভরা চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—কালো আছি, আমি আপনার ঘরে আছি। কেউ তো আমাকে খেতে পরতে দেয় না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আমি কিন্তু কালো ভালোবাসি ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির মুখের কালো রঙে লাল আভা দেখা যায় না, তবু তাহার লজ্জার গাঢ়তা বোঝা যায়। নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না, সে গালে হাত দিয়া মৃদু স্বরে গান ধরিয়া দিল—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।

লজ্জিতা ঠাকুরঝি এবার সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল, বলিল নতুন গান? বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—কাল তুমি বাপু ভাল গান করেছ।

—ভাল লেগেছে তোমার?

—খুব ভাল।

—এস, এস, একটুকুন চা আছে—খাবে এস।

—না না। ঠাকুরঝির চা খাইতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগাব কথা না কি বলিতে নাই। ছি।

নিতাই আবার দিব্যি দিল—আমার দিব্যি। নিতাই বাসার দিকে ফিরিল। বাজনেব জন্য যে চাটুকু ছাঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেটা উনানের উপরে বসানোই ছিল, সেই দুইটা পাত্রে ঢালিয়া একটা ঠাকুরঝিকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি আবার সলজ্জ ভাবে বলিল—না, না, তুমি খাও।

—না, তা হবে না। তাহলে বুঝব, তুমি এখনও কোধ করে আছ।

বাটিটা টানিয়া লইয়া সকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—কোধ কি গো? কোধ?

—রাগ। 'কোধ' মানে হ'ল গিয়ে তোমার রাগ। কয়ে রফলা ও-কার ধ, কোধ। 'হিংসা কোধ অতি মন্দ কভু নহে ভাল'। বুঝলে ঠাকুরঝি, এই কারুর হিংসে করো না। কোধের নাম হ'ল চণ্ডাল।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে?

গভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি। নইলে কবিয়াল ক'রেও তিনি আমাকে 'ডোম'-কুলে পাঠালেন কেনে, বল?

নীরব বিস্ময়ে মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখের উপর ভাসিতেছিল—শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে।

অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সবই তাঁর লীলা। না হলে আমাকে ঠাট্টা ক'রে কপিবর, মানে হনুমান বলে।

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল—কে? কে বটে, কে?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সে আর শুনে কি করবে বল? লাও, চা খাও? জুড়িয়ে গেল।

ঠাকুরঝি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল, জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনও কিছু খায় না। পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল—না, বলতে হবে তোমাকে। কে বটে, কে সে? জামাই বুঝি? জামাই প্রথে রাজন।

—না না, ঠাকুরঝি, রাজন আমার পরম বন্ধু, বড় ভাল নোক।

—হ্যাঁ, ভাল নোক না ছাই। যে কটকটে কথা।

—না, না। আজ তোমাকে ওটা পরিহাস ক'রে বলেছে। তুমি শালী, পরিহাসের সম্বন্ধ?

—পরিহাস কি গো?

—ঠাট্টা ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে তো ঠাট্টার সম্বন্ধ।

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল, নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ঠাকুরঝির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বলিল—তা বটে। জামাই আমাদের রাগীদার হোক, নোক ভাল।

-ভারি ভাল নোক।

—কিন্তু তোমাকে উ কথা কে বললে, বলতে হবে। সে মুখপো কে বটে, কে?

--গাল দিয়ো না ঠাকুরঝি, জাতে ব্রাহ্মণ। ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে 'বক্র' মুনির মত বসে থাকে আর ফরফর করে বকে। ওই বিপ্রপদ ঠাকুর।

—কেন উ কথা বলবে?

—ছেড়ে দাও কথা। জাতে ব্রাহ্মণ, আমি ছোট জাত—তা বলে বলুক।

—আঃ ভারি আমার বাম্ভন। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি, একবার দেখি। উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বা-বা-বা! ভারি মানিয়েছে তো ঠাকরঝি!

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুল এলো খোঁপায় এক থগা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। লজ্জায় মেয়েটি সচকিতা হরিণীর মত তাহার খসিয়া-পড়া ঘোমটাখানি ক্ষিপ্র হস্তে, দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে খপ করিয়া হাতখানি ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল—দেখি। দেখি। বা-বা-বা!

মেয়েটি লজ্জায় অধোমুখ ও কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল, বলিল—ছাড়ো। ছাড়ো।

মুহূর্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নতমুখে ছুটিয়া পলাইয়া গেল—বাটিটা ধুইবার অজুহাতে। নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। ছি। ছি। ছি। এ কি করিল সে?

চুপ করিয়াই সে বসিয়া ছিল, হঠাৎ ঠুং শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল—ঠাকুরঝি বাটিটা নামাইয়া দিয়া আপনার ঘটিটি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরঝির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটায় কচি পাতার মত ঝলমলে হইয়া উঠিয়াছে। চোখাচোখি হইতেই ঠাকুরঝি হাসিয়া চট্ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘোমটা খসিয়া গেল। ঠাকুরঝি এবার ছুটিয়া পলাইয়া গেল, ঘোমটা তুলিয়া না দিয়াই;—তাহার রুক্ষ কালো চুল লাল কৃষ্ণচূড়া পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মত জ্বলিতেছে।

নাঃ, ঠাকুরঝি রাগ করে নাই। ওই যে যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিতেছে। কিন্তু কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়া বড় চমৎকার মানাইয়াছে।

ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ছোট হইয়া পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল। নিতাই বসিয়া আপন মনেই ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিয়াছে।

"কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

সাত

কালো কেশে রাঙা কুসুমের শোভা দেখিয়া গান রচনা করিয়া কবি হওয়া চলে, কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলা চলে না। নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল—বিষম হুঁচোট। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটার চারিপাশ কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। সে ওই গানখানা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চণ্ডীতলায় চলিয়াছিল। নির্জন পথ—বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিয়া নিতাই বেশ উচ্চ কণ্ঠেই গান ধরিয়া চলিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করিয়া যেন 'কালো চুলে রাঙা কুসুমের' শোভাটি কাহাকেও দেখাইয়া দিতেছিল; যেন দ্রুতপদে ঠাকুরঝি তাহার আগে আগেই চলিয়াছে এবং তাহার রুক্ষ কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটি ঝলমল করিতেছে।

হঠাৎ আঙুলে হুঁচোট খাইয়া বেচারী বসিয়া পড়িল। দুর্বল শরীরে চোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন নিতাই এখন একবেলা খাইতেছে। উপার্জন নাই, পূর্বের সঞ্চয় যাহা আছে সে অতি সামান্য; সে সঞ্চয় আবার দোকানে লাগাইতে হইবে। সেই জন্য নিতাই একবেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে; একেবারে অপরাহ্ণ বেলায় সে এখন কোনদিন রাঁধে পায়েস, কোনদিন খিচুড়ি। কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই, ঠাকুরঝিকেও না। তাহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলবে। রাজা হয়ত পাঁচ-সাত টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া

বলিবে—চালাও পানসী—বানাও খানা—ফিন্ দরকার হোনেসে দেগা।

রাজার মত বন্ধু আর হয় না। এদিকে রাজা সত্য-সত্যই রাজা। বিপ্রপদ যে-সব নাম তাহাকে দিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয়, কেবল একটি ছাড়া—সে নামটি হইল সভাকবি, রাজার সভাকবি। রাজার কাছে কোন লজ্জাই তাহার নাই; কিন্তু রাজার স্ত্রী রাণী নয়, সে রাক্ষুসী। বাপ রে! মেয়েটার জিভে কি বিষ! সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয়। মিলিটারী রাজা কণ্ঠির আঘাতে মেয়েটার পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—তবু তাহার জিভ বিষ ছাড়াইতে ছাড়ে না; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে।

মর্মভেদী জ্বালা-ধরানো নিষ্ঠুর গালিগালাজ। পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ, মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাত দেয়। ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন, সকলকেই গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে। সেই গালিগালাজগুলি স্মরণ করিয়া নিতাই দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। রাজার বউয়ের গালিগালাজের বাঁধুনী বড় চমৎকার, কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনী বাঁধিয়া গালিগালাজ দিতে পারে না। কালই ট্রেনখানাকে অভিসম্পাত দিতেছিল—পুল ভেঙে প'ড়ে যমের বাড়ী যাও, যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' 'হাঁকিড়ে' চলছ—এই আগুনের তাতে অঙ্গ তোমার গ'লে গ'লে পড়ুক। যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলো সেই চাকা মুড়মড়িয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক—যে চোঙার গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উলটিয়ে পড়, পালটিয়ে পড়; নরকে যাও। বলিহারি বলিহারি! মহাদেবের আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা কোথায় লাগে ইহার কাছে?

রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে, তাই তাহার আক্রোশ নিতাইয়ের উপর কিছু বেশী। রাজার অনুপস্থিতিতে নিতাইকে শুনাইয়া কোন অনামা ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে। সে হাসে। রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না। রাজা দিতেও ছাড়িবে না, গোপনও করিবে না এবং রাণী জানিতে প   বই। সে জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির চা খাওয়া রাণী দেখিয়াছে। চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল। রাজার বউ বোধ হয় কোথাও যাইতেছিল, হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে একসঙ্গে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নিতাইও। পরমুহূর্তেই বাড়ীর বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

"হাসিস না লো কালীমুখী—আর হাসিস না,
লাজে মরি গলায় দড়ি—লাজ বাসিস না?"

ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় নাই, চা জুড়াইয়া গিয়াছিল, জুড়ানো চা রাখিয়া সে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খাইয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

হুঁচোটের ধাক্কাটা সামলাইয়া নিতাই কোনমতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল। চণ্ডীমাকে

প্রণাম করিয়া সে মোহন্তের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মোহন্ত সস্নেহেই বলিলেন—এস, কবিয়াল নিতাইচরণ এস।

নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে মোহন্তকে প্রণাম করিল।

—জয়োস্তু। তারপর, সংবাদ কি ?

—আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দেবেন বলেছিলেন।

—মেডেল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, সে হবে। পাবে ? মোহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সহসা চণ্ডীদেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন--কালী কৈবল্যদায়িনী মা।

নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। এমন ভাবাবেশের মধ্যে মোহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডীর দাওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল--ঠং।

মোহন্ত মুহূর্তে উঠিয়া পড়িলেন। ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে, বোধহয় একটা প্রণামী ছুঁড়িয়াছে।

মোহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোড় করিয়া বলিল বাবা।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মোহন্ত বলিলেন—বলেছি তো পরে হবে। আসছে বার মেলার সময়, সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে।

নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, বিদায় কিছু দেবেন না ?

—বিদায়। টাকা ?

—আজ্ঞে।

মোহন্ত সকৌতুকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির আর সীমা রহিল না। অকস্মাৎ মোহন্ত কথা বলিলেন—ভালা রে ময়না, ভাল বুলি শিখেছিস তো। টাকা। মায়ের স্থানে টাকা। গান গাইতে পেয়েছিস সেইটে ভাগ্যি মানিস না ?

মোহন্তের কথার সুরে যেন চাবুকের জ্বালা ছিল : সে জ্বালায় নিতাই চমকিয়া উঠিল। লজ্জার আর সীমা রহিল না তাহার। সত্যিই তো—গান গাহিতে পাইয়া সে-ই তো ধন্য হইয়া গিয়াছে। আবার টাকা চায় কোন মুখে।

ইহার পর কোন কথা না বলিয়া সে একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। ফিরিবার পথে অকস্মাৎ তাহার চোখে জল আসিল ; অকস্মাৎ মহাদেব কবিয়ালের ছড়াটা মনে পড়িয়া গেল—সেদিন গানের আসরে মহাদেব বলিয়াছিল, 'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগগে যাবার আশা গো।' ঠিক কথা, মহাদেব কবিয়াল,—আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বর্গে যায় না, যাইতে পারে না। কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও গুণী লোক, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাহার কবি হওয়ার আশা আর আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতার স্বর্গে যাইবার আশা—এ দুই-ই সমান।

আপন মনেই সে বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজেকে শুনাইয়াই বলিয়া উঠিল—দ্-রো।

অর্থাৎ নিজের কবিয়ালত্বকেই দূর করিয়া দিতে চাহিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করিল আবার এই বারোটার ট্রেন হইতেই সে 'মোট-বহন' আরম্ভ করিবে।

বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে, তা করুক। করিয়াল হইয়া তাহার কাজ নাই। সে মনকে বেশ খোলসা করিয়াই সকৌতুকে গান ধরিল, মহাদেবের সেই গানটি—

'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগগে যাবার আশা গো।
ফরাৎ করে উঠল পাতা—স্বগগে যাব র আশা গো।
হায়রে কলি—কিই বা বলি—গরুড় হবেন মশা গো।'

খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে একটা শব্দ আসিয়া ঢুকিল। ট্রেন আসিতেছে না? হ্যাঁ, ট্রেনই তো। সঙ্গে সঙ্গে চলার গতি সে দ্রুততর করিল। রাজা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়ে হাজির হইয়াছে। সিগন্যাল ফেলিবে, ট্রেনের ঘন্টা দিবে। ঠাকুরঝি বোধহয় তালাবন্ধ ঘরের সম্মুখে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তো আজ কিছুতেই রাজার বাড়ী যাইবে না। কাল ছড়ার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত রাজার স্ত্রী করিয়াছে। সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল ট্রেনখানা তখন বিসর্পিল গতিতে সবে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নিতাই হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। রোজগার ফসকাইয়া গেল, ঠাকুরঝি চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ পাশে থাকিয়া কে তাহাকে ডাকিতেছে—নিতাই।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া ডাকিতেছে—নিতাই, নিতাই।

বাতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বহুকষ্টে দেহসমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাসিতেছে,—সেও ডাকিল, কপিবর, কপিবর।

নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্যই সে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক মাতুল কিন্তু বেশ খানিকটা খুশী সুরেই বলিল—নাঃ, সত্যিকারের গুণীন বটে আমাদের নিতাই। ওরে তোর কাছে যে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল। বায়না আছে কোথায়। গাওনা করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে। বায়না আছে। অকস্মাৎ তাহার সে বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল রাজনের চীৎকারে। উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজন প্রায় গগনস্পর্শী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—ওস্তা-দ। ওস্তা—দ।

রাজনের সঙ্গে একজন লোক। মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার। এই মেলায় আসরেই সে গান করিয়া গিয়াছে। নিতাই তাহাকে চিনিল।

—বায়না, ওস্তাদ, বায়না আয়া হ্যায়। রাজা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

লোকটি নিতাইকে নমস্কার করিয়া বলিল—ভাল আছেন?

এতক্ষণে নিতাই প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের কুশল? ওস্তাদ ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই পাঠালেন আপনার কাছে। একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ,

আপনাকে দলে দোয়ারকি করতে হবে। মহাদেব কবিয়ালের শরীর ভাল নাই। গলা বসেছে। আপনার গলা ভাল। ওস্তাদ আপনাকে দিয়ে গাওয়াবে। আপনি নিজেও গাইবেন—এই আর কি।

রাজা বলিল—জরুর, জরুর, আলবৎ, আলবৎ যায়েগা। চলিয়ে তো বাসামে, বাৎচিৎ হোগা, চা খায়েগা।

নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল, আজ তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে—বায়না আছে। সেও বলিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয়। আসুন, বাসায় চা খেতে খেতে কথা হবে।

বাসার দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, একটি ঝোপের আড়ালে—কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়াতলে, ও কে বসিয়া।

ঠাকুরঝি।

উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরঝি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল—কোথা গিয়েছিলে বাপু, আমি দুধ নিয়ে বসে আছি সেই থেকে।

নিতাই বলিল—কাল একটুকু সকাল ক'রে দুধ এনো বাপু। কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব। তার আগেই যেন—

রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল—হাঁ, হাঁ ঠিক আয়েগি ; ঘড়িকে কাঁটাকে মাফিক আতি হ্যায় হাম্যারা ঠাকুরঝি। আজ রাজাও ঠাকুরঝির উপর খুশী হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরঝির মুখখানিও সেই খুশীর প্রতিচ্ছটায় মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল। ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠে ; আবার মেঘ উঠিলে আঁধার হয়—কে যেন কালি গুলিয়া দেয়।

ঠাকুরঝি সেই খুশীর ছটামাখা মুখে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল তুমি কবিগান গাইতে যাবে কবিয়াল ? বায়না এসেছে ?

কথাটা ঠাকুরঝিও শুনিয়াছে।

নিতাই ফিরিল পাঁচদিন পর। ট্রেন হইতে যখন সে নামিল, তখন তাহার ভোল পাল্টাইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের একজোড়া নূতন জুতা, ময়লা কাপড়-জামার উপর ধপধপে সাদা নূতন একখানা উড়নি চাদর। মুখে মৃদুমন্দ হাসি—কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম। ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিয়াছে, স্টেশন-মাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে।

—এই যে নিতাই। আরে বাপ রে, চাদর জুতো। এই যে, বাপ রে তাকে চেনাই যায় না রে।

উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

—আজ্ঞে, চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন। আর জুতো জোড়াটা কিনলাম।

শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা ; জুতা-চাদর দুইই নিতাই নগদমূল্যে খরিদ করিয়াছে।

গেরুয়া না পরিলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, 'ভেক নহিলে ভিখ মিলে না' ; চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না। নগ্নপদ জনকে পদবী মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চায় না। তাই নিতাই পাদুকা ও চাদর কিনিয়াছে। স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশাভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও কেহ যেন তাহাকে দেখিল না, সম্ভাষণ দূরের কথা, কেহ একটা প্রশ্নও করিল না। যে প্রশ্ন করিবার একমাত্র মানুষ, সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্তব্যে ব্যস্ত ছিল। মালগাড়ী শান্টিং হইবে। গাড়ী কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল—এই। হট যাও, এই—বুড়বক। হটো—হটো।

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল। মানুষ বৈরাগ্যভরে যেমন জনতাকে জনবসতিকে পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া আপথে সকলের অলক্ষিতে অগোচরে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই সে স্টেশনের মেহেদীর বেড়ার পাশের অপরিচ্ছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে। মনটা তাহার মুহূর্তে উদাস হইয়া গিয়াছে ; শুধু মনই নয়, সারা দেহেই সে যেন গভীর অবসন্নতা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ কানে ঢুকিল—গুন গুন সুর।

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?' গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে। ওই ঝোপটার আড়ালে ; কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। মুহূর্তে ভাটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ি বান ডাকিয়া গেল। ঠাকুরঝি। তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি। রবার-সোল ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল এবং অনুরূপ মৃদুস্বরে গাহিল

'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে ?'

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সচকিত বন্য কুরঙ্গীর মত।—বাবা রে। কে গো ?

পরমুহূর্তেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। কবিয়াল।

নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরম স্নেহভরে সে অনুরাগিণীটিকে বলিল—এস, চা খেতে হবে একটু।

ঘরে আসিয়া নিতাই চাদরখানি গলা হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল। কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—খুলো না, খুলো না ; দাঁড়াও দেখি ভাল ক'রে।

ভাল করিয়া দেখিয়া ঠাকুরঝি বলিল—আচ্ছা সাজ হইছে বাপু। ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে। ভারি সোন্দর দেখাইছে।

নিতাই বলিল—বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা।

—ম্যাডেল ? ম্যাডেল দেয় নাই ?

—সে আসছে বার দেবে। মেডেল কি দোকানে তৈরী থাকে ঠাকুরঝি।

—তা চাদরখানা আচ্ছা হইছে। তুমি বুঝি খুব ভাল গায়েন করেছ, লয় ?

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কহিল—খুব ভাল। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানখানাও গেয়ে দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে কালো মেয়েটির মুখখানিও কেমন হইয়া গেল ; চোখের পাতা দুইটা নামিয়া

আসিল। সে দুইটা যেন অসম্ভব রকমের ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নত চোখে সে বলিল—না বাপু ; ছি। কি ধারার নোক তুমি।

নিতাই হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

—কি ?

—চোখ বোজ দেখি। তা নইলে হবে না।

—কেনে ?

—আঃ, বোজই না কেনে চোখ। তারপর চোখ খুললেই দেখতে পাবে। ঠাকুরঝি চোখ বন্ধ করিল ; কিন্তু তবু সে তাহারই মধ্যে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল। নিতাই পকেটে হাত পুরিয়াছে।

—উ কি, তুমি দেখছ। নিতাই ঠাকুরঝির চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। বোজ, খুব শক্ত করে চোখ বোজ।

পরক্ষণেই ঠাকুরঝি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িল। কি। চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরঝি দেখিল, সুতার মত মিহি, সোনার মত ঝকঝকে একগাছি সুতা-হার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

ঠাকুরঝি বিস্ময়ে আনন্দে যেন বিবশ ও নির্বাক হইয়া গেল।

—সোনার ?

—না, সোনার নয় কেমিকেলের। সোনার আমি কোথায় পাব বল ? আমি গরীব।

ঠাকুরঝির অন্তর তারস্বরে বলিয়া উঠিল তা হোক, তা হোক, এ সোনার চেয়েও অনেক দামী। হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নতন কচিপাতার মত।

—ওস্তাদ। ওস্তাদ।

রাজা আসিতেছে ; ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম হইতে হাঁকিতে হাঁকিতে আসিতেছে।

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল মুহূর্তে ঠাকুরঝি গলার সুতা-হারখানি খুলিয়া ফেলিল। শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল জামাই আসছে।

নিতাইও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল- তা হ'লে ?

পরমুহূর্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও তাহার গলায় চাদর, পায়ে জুতা। খানিকটা আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল –রাজন, আপনার শরীর কুশল তো ?

রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আরে, বাপ রে, বাপ রে। গলামে চাদর—

বাধা দিয়া নিতাই বলিল—শিরোপা।

—শিরোপা।

—হ্যাঁ। বাবুরা গান শুনে খুশী হয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।

—আরে, বাপ রে, বাপ রে। রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর বলিল—আও ভাই কবিয়াল, আও।

—কোথায় ?

—আরে, আও না। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে।

—মামা! বনাও চা! লে আও মিঠাই।

বেনে মামাও অবাক হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া। বাতে-পঙ্গু বিপ্রপদ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া নিতাইকে দেখিল, তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে সুপ করিয়া টানিয়া লইল। তারপরে সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—চাঁদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু

বেনে মামা বলিল—আমাদিগকে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই

—নিশ্চয়। খাও না মাতুল, সন্দেশ তো তোমার দোকানেই, দাম দেব

—নেহি দাম দেঙ্গে মামা। বানাও ঠোঙ্গা। কাঠের একটা প্যাকিং-বাক্স টানিয়া রাজা চাপিয়া বসিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল—বইঠ যাও।

এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল, সে আজ আর রসিকতা করিল না, ঠাট্টাও করিল না, সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল তারপর গাওনা কি রকম হ'ল বল দেখি নিতাই ?

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল ; বিপ্রপদকে সে আজ জয় করিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বড় কিছু সে কল্পনা কামনা করিতে পারে না। সে আবার একবার বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, গাওনা আপনার চরম। দু'দিকেই দুই বাঘা কবিয়াল- এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ ; একদিকে ছিষ্টিধর, অন্যদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি আর মেলাও তেমনি।

বেনে মামা ঠোঙায় মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল--খেতে খেতে গল্প হোক। খেতে খেতে। সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল। কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই- কথার সঙ্গে তাহার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে।

বিপ্রপদও এতক্ষণে ধীরে ধীরে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, সে চট করিয়া বেনে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল—ভাগ বেটা বেরসিক বোকা! কবিরা সন্দেশ খায় কোন কালে ? কবিরা চাঁদের আলো খায়, ফুলের মধু খায়, কোকিলের গান খায়। তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তারপর নিতাইচরণ ? একদিকে ছিষ্টিধর, একদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি। তারপর ? বলিয়া সে দুই হাতে ঠোঙা ধরিয়া মিষ্টি খাইতে আরম্ভ করিল।

নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু উহাতে দমিত হইল না। সে সমান উৎসাহেই বলিয়া গেল—একদিন, বুঝলে প্রভু, মহাদেবের নেশাটা খানিকটা বেশী হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন—মহাদেব হয়েছে কেষ্ট, ছিষ্টিধর রাধা। ছিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে—"কালো টিকেয় আগুন লেগেছে—তোরা দেখে যা গো সাধের কালাচাঁদ।" গালাগালির চরম করে গেল। ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে। দোয়াররা সব মাথায় জল ঢালছে। আমি সেই ফাঁকে এসে ধরে দিলাম ধুয়ো—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?" ব্যাস, বুঝলেন প্রভু, বাবুভাই থেকে আরম্ভ করে সে একেবারে 'বলিহারি, বলিহারি' রব উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিরোপা এই চাদরখানা গলার ওপরে ঝপাং করে এসে পড়ল।

কথাটা সত্য। নিতাই ধুয়াটা ধরিয়াছিল এবং লোকে সত্যই ভাল বলিয়াছে, কিন্তু শিরোপার কথাটা ঠিক নয়।

তবে শিরোপা পাইলে অন্যায় হইত না। নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার-দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদেব সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যিই তো—কালো যদি মন্দই হইবে—তবে কালো চুলে সাদা রঙ ধরিলে—মন তোমার উদাস হইয়া ওঠে কেন ? নিতাই বার বার এই প্রশ্নটির জবাব চাহিয়াছিল। ছিষ্টিধর খ্যাতিমান কবিয়াল—সে মানুষকে জানে এবং চেনে—সে এ প্রশ্নের জবাব রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। গাহিয়াছিল—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদি ক্যানে ?

কাঁদি না রে। কলপ মাখি।

কলপ মাখি,—না হয়, বউ তুলে দেয় হ্যাঁচকা টানে।"

লোকে খুব হাসিয়াছিল বটে কিন্তু ওই অদ্ভুত প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত সকৌতুক বিষণ্ণ তত্ত্বটি কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। পালা শেষেব পর বহুজন পরস্পবের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছে--

"কালো যদি মন্দ তবে—কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে ?"

পরের দিন আসরে নিতাইকে মহাদেব ইচ্ছা করিয়াই ছিষ্টিধরের মুখের কাছে আগাইয়া দিয়াছিল। সেদিন ছিষ্টিধর দ্রোণ, মহাদেব একলব্য। আগের দিন প্রচুর বমি করিয়া মহাদেবের শরীরও ভাল ছিল না, গলাটাও বসিয়া গিয়াছিল। এবং ছিষ্টিধরের কাছে হারের ভয়ও ছিল। তাই সম্বন্ধ পাতাইবার পর মহাদেব উঠিয়া আসর বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল--

আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হলো—
ব্যাধের ব্যাটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোলো,
আমাকে কি মানায় তাই ? তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য
একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য।

বলি—মানাবে ভাল হে।

—ইহার উত্তরে ছিষ্টিধর উঠিয়া প্রথমেই কপালে চাপড় মারিয়া গাহিয়াছিল—

—টাকা কড়ি চাইনে কো মা—তোর দণ্ডসাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুর বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে—
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে—

আমায় বলিস বধতে তারে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে।

তাহার পর মহাদেব এবং নিতাইকে জড়াইয়া গালাগালির আর আদি অন্ত রাখে নাই ছিষ্টিধর। মূল সুর তাহার ওই। নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয় তবে তাঁহারা অন্ত্যজ ব্যাধও নয়, তাহারা অসুর ; মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুর আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা!

—হায় অসুরের শ্বশুরবাড়ীর ঠিক-ঠিকানা নাই—

গরুর পেটে হয় দামড়া

গায়ে তাহার বাঘের চামড়া

বিধাতা সে অধোবদন—এ ব্যাটা ঠিক তাই।

সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কোপাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটা! মহাদেবও অধোবদন হইয়াছিল। ভাঙা গলা লইয়া জবাব দিবার তাহার উপায় ছিল না। কিন্তু নিতাই দমে নাই। সে উঠিয়া গান ধরিয়া দিয়াছিল অকুতোভয়ে। তাহার আর হার-জিতের ভয় কি? সে গান ধরিয়াছিল—

ভাণ্ড পুত্ত দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হে!

—মহাশয়গণ আমাকে উনি জন্তুপুত্ত বলে গাল দিলেন। কিন্তু ওঁর জন্ম ভাণ্ডে—মাটির কলসীতে।

নারিকেল নিন্দে করেন—ও কষুটে গুবাক হে।

—মানে সুপুরী। মশাই সুপুরী।

কিন্তু আর যোগায় নাই। ইহার পর সে উল্টা পথ ধরিয়াছিল। নিজেই হার মানিয়া লইয়া—মার খাওয়ার লজ্জাকে লঘু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ছড়া ধরিয়াছিল—

বাম্ভন প্রধান ওহে দ্রোণাচায্য

গুরু হয়ে তোমার এ কি অন্যায় কায্য

আমি একলব্য নহি সভ্য ভব্য

না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য

কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য।

দশের সাক্ষাতে—পা নিলাম মাথাতে—

বলিয়াই ছিষ্টিধরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—এখন রণং দেহি হারজিৎ হোক ধায্য। এবং একেবারে শেষ পালাতে হারিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—

পভুগণ! শুনুন নিবেদন!

আমি হেরেছি হেরেছি সত্য এ বচন।

হেরেই কিন্তু হয় সার্থক জীবন।

ছিষ্টিধর বলিয়া উঠিয়াছিল—নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহার কারণ,—

মুণ্ডু কাটা যায় ধুলাতে গড়ায়

জিব বাহির হয় উল্টায় নয়ন।

এবং নিজেই জিব বাহির করিয়া চোখ উল্টাইয়া ভঙ্গি করিয়া অবস্থাটা প্রকট করিয়া দেখাইয়া

দিয়াছিল। লোকে হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই এই হাসির রোলের উপরেও এক তান ছাড়িয়াছিল—

—আ—আহা—।

তাহার সুস্বরের সেই সুর-বিস্তার মুহূর্তে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের কৌতুক-উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। বর্ষার জলো হাওয়ার মাতামাতির উপর ছড়াইয়া পড়া গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মত বলিলে অন্যায় বলা হইবে না, কারণ নিতাইয়ের গলাখানি তেমনই বটে। এবং গান ধরিয়া দিয়াছিল। খাঁটি গান। আপনার মনে অনেক সময় সে অনেক গান বাঁধে—গায়। তাহারই একখানি গান।

আহা—ভালবেসে—এ বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে।
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা।
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে।
আমায় ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে।

উহাতেই আসরময় বাহবা পড়িয়া গিয়াছিল।

ছিষ্টিধর বলিয়াছিল--তোর এমন গলা নিতাই—যাত্রার দলে-টলে যাস না কেন ? কবিগান করে কি করবি ?

নিতাই আবার তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিযাছিল—সে তো পরের বাঁধা গান গাইতে হবে ওস্তাদ।

সবিস্ময়ে ছিষ্টিধর প্রশ্ন করিয়াছিল—এ তোর গান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ওস্তাদ।

ছিষ্টিধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—তাহার পর বলিয়াছিল—হবে, তোর হবে। কিন্তু—

—কিন্তু কি ওস্তাদ ?

—কবিয়ালিও ঠিক তোর পথ নয়। বুঝলি। কিন্তু তু ছাড়িস না। ভগবান তোকে মূলধন দিয়েছেন। খোয়াস না। বুঝলি।

ইহার পর নিতাইয়ের সে রাত্রে কি উত্তেজনা। সারারাত্রি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কত স্বপ্ন।

পরের দিন মেলায় বাহির হইয়া নিজেই চাদর জুতা কিনিয়া সাজিয়া-গুজিয়া, আয়নায় বার বার নিজেকে দেখিয়া, মনে মনে অনেক গল্প ফাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাবুরা শিরোপা দিয়েছেন। সুখ্যাতির অজস্র সম্ভার সে তো দেখাইবারই নয়—তবে শিরোপাই তাহার প্রমাণ।

দেখ, তোমরা দেখ।

শিরোপার গল্প শেষ করিয়া চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের মনে হইল ঠাকুরঝির কথা। সে কি এখনও ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে? নিতাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতেই উঠিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের লাইনের উপর দাঁড়াইল। সমান্তবরাল শাণিত দীপ্তির লাইন দুইটি দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

কই। সেখানে তো স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ চলন্ত কাশফুলের মত তাহাকে দেখা যায় না।

তবে? সে কি এখনও ঘরে বসিয়া আছে?

দোকানে বসিয়া রাজা হাঁকিতেছিল--ওস্তাদ। ওস্তাদ।

হাঁ, আসছি, আসছি। বাড়ী থেকে আসছি একবার।

নিতাই দ্রুতপথে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকল। হাঁ, এখনও সে বসিয়া আছে। নিতাইকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হল। নিতাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল -রাগ করেছ?

মেয়েটি মুহূর্তে কাঁদিয়া ফেলিল।

—কি করব বল? ওরা কি ধ'রে ছাড়তে চায়—

--না। আমি ব'সে রইলুম, আর তুমি গেলা ওদের সঙ্গে গল্প করতে।

—তোমার হাতে ধরছি—

ঠাকুরঝি এবার হাসিয়া ফেলিল।

—ব'স, একটুকুন চা খাও। তোমার লেগে নতুন কাপ এনেছি—এই দেখ। সে পকেট হইতে একটি নতন ষ্টিলের মগ বাহির করিল।—ভুলে গিয়েছিলাম এতক্ষণ। নিতাই হাসিল।

—না। বেলা - । বলিয়াই বেলার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।—ওগো মাগো। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পথটাই সে ভাবিতেছিল এই বিলম্বের জন্য কি বলিবে। চলিতে চলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল হারের কথা। সে খুঁট খুলিয়া হারখানি বাহির করিল। গলায় পরিল। সঙ্গে সঙ্গে সব আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গেল।

পথে একটি ছোট নদী। স্বচ্ছ অগভীর জলস্রোত তাহার কম্পিত প্রতিবিম্বের গলায় সোনার হার ঝিকমিক করিতেছে, মেয়েটি সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, ধীরে ধীরে চঞ্চল জল স্থির হইল। এইবার একবার সে হার-পরা আপনাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল তারপর হারখানি খুলিয়া খুঁটে বাঁধিয়া নদী পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

কি বলিবে, সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই, তবে তিরস্কার সহ্য করিতে সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

নিতাই এখনও দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরের দিক্চক্রবাল ধূলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস উতলা হইয়াছে, সেই উতলা বাতাস ধূলা উড়াইয়া লইয়া বহিয়া যায়, যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত। নিতাইয়ের

মন এখনও চঞ্চল। সে এখনও সেই ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে মনে একটা বিচিত্র কথার মালা গাঁথিয়া উঠিল। নিজেরই একসময় মনে প্রশ্ন জাগিল—কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ওই মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল—কে আবার—'মনের মানুষ'। মনের মানুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সাধ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে। পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, হঠাৎ একসময়ে তাহার আসার নিশানা ঝিকমিক করিয়া উঠে।—সেই কথাগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া সুরতরঙ্গের দোলায় আপন মনেই গুনগুন ধ্বনি তুলিয়া দুলিতে লাগিল—

"ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর!
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা,
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।"

তাহাই সে করিবে। পথের ধারে ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকিবে। ঘর হইতে ঠাকুরঝি বাহির হইলেই তাহার মাথার ঘটিতে—রোদের ছটা লাগিয়া ঝিলিক উঠিবে, সে ঘটিতে ওঠা ছটার ঝিলিক আসিয়া তাহার চোখে লাগিবে। গান বাঁধিয়া সে সুরে ভাঁজিতে লাগিল—

ও আমার মনের মানুষ গো!

আট

পথের ধারে ঘরের বদলে কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিবাস্বপ্ন শুরু করিল। গান গাহিয়া সে টাকা পাইয়াছে। কবিয়াল সৃষ্টিধর বলিয়াছে তাহার হইবে। সুতরাং তাহার আর ভাবনা কি?

ট্রেনভাড়া সমেত নিতাই পাইয়াছিল ছয়টি টাকা। কিন্তু ট্রেনভাড়া তাহার লাগে নাই। এই ব্রাঞ্চ লাইনটিতে নিতাই অনেকদিন কুলিগিরি করিয়াছে—গার্ড, ড্রাইভার, চেকার সকলেই তাহাকে চেনে, রাজার জন্য তাহাকে সকলেই ভাল করিয়াই জানে, সেই জন্য ট্রেনভাড়াটা তাহার লাগে নাই, ছয়টা টাকাই বাঁচিয়া ছিল। জুতা চৌদ্দ আনা, চাদর বারো আনা, দেশলাই বিড়ি আনা দুইয়েক—এই এক টাকা বারো আনা বাদে চার টাকা চার আনা সম্বল লইয়া নিতাই ফিরিয়াছে। প্রত্যাশা আছে, আবার শীঘ্র দুই-একটা বায়না আসিবে। নিতাইয়ের ধারণা যাহারা তাহার গান শুনিয়াছে তাহাদের মুখে মুখে তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—

—নতুন একটি ছোকরা, মহাদেবের দলে দোয়ারকি করেছিল, দেখেছ?

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভাল ছোকরা। বেড়ে মিষ্টি গলা।

—উঁহু। শুধু গলাই মিষ্টি নয়, কবিয়ালও ভাল। এবার মহাদেবের মান রেখেছে ও-ই। মহাদেব তো বেহুঁশ, ও-ই গান ধরলে—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে'। তাতেই আসর একেবারে গরম হয়ে উঠল। দাও জবাব—কালো যদি মন্দ তবে কালো চুলের এত গরব কেন? এত ভালবাস কেন? পাকলেই বা মন খারাপ কেন?

—বল কি। ওই ছোকরার বাঁধা গান ওটা?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকেই আন।

নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মহাদেব আট টাকা লইয়া থাকে, ছিষ্টিধর দশ টাকা; নিতাই পাঁচ টাকা হাঁকিবে, চার-টাকা-রাত্রিতে রাজী হইবে। এখন একজন ঢুলি নাই। রাজনের ছেলে যুবরাজকে দিয়া কাঁসী বাজানোর কাজ দিব্যি চলিবে। এবার সে আরও ভালো গান বাঁধিয়াছে। সুরও হইয়াছে তেমনি। 'ও আমার মনের মানুষ গো—তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর; ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা, আমায় হেথা টানে নিরন্তর।' ইহাতেই মাত হইয়া যাইবে। একবার সুযোগ পাইলে হয়। মুস্কিল এইখানেই। কবির পালায় এমন গান গাহিবার সুযোগ সহজে মেলে না। তবুও আশা সে রাখে। এই কারণেই ঢং ঢং করিয়া ট্রেনের ঘন্টা পড়িলেই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে। ট্রেনের প্রতি যাত্রীকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে। মেলাখেলা লইয়া যাহারা থাকে, তাহাদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে, নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে। কেবল যায় না বেলা বারোটার সময়, কারণ ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরঝি।

* * *

মাসখানেক পর। গভীর রাত্রি। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল।

সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিয়াছে একটি সিকিতে। তাহার মনটা অকস্মাৎ আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে। কোনরূপে আর চারিটা দিন চলিবে তার পর আবার কি 'মোট বহন' করিতে হইবে।

নহিলে? উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে?

এদিকে ঠাকুরঝির কাছে দুধের দাম বাকী পড়িয়া যাইতেছে। দশ দিন আগে অবশ্য সব সে মিটাইয়া দিয়াছে; দশ দিনের দশ পোয়া দুধের দাম দশ পয়সা বাকী। নিতাই স্থির করিল, আজই সে দুধের রোজে জবাব দিবে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। আজই তার শেষ দাঁড়াইয়া থাকা। 'ও আমার মনের মানুষ'—গান আর শেষ হইল না, হইল না, হইবেও না; আজ হইতে সে ভুলিয়া যাইবে, আর গাহিবে না। ওইখানেই অকস্মাৎ এক সময়ে দেখা গেল, মাথায় ঘটি—সাদা ধবধবে কাপড় পরা ঠাকুরঝিকে।

ঠাকুরঝি আগাইয়া কাছে আসিল। তাহাকে দেখিয়া নিতাই হাসিল।

ঠাকুরঝি বলিল—না বাপু, তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। নোকে কি বলবে বল দেখি ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—নোকে কি কথা বলবে জানি না। আমি তোমাকে একটা কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছি।

নিতাই এখন ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই ল-কারকে ন-কার করিয়া তুলিয়াছে। লোহাকে বলে নোহা, লুচিকে বলে নুচি, লঙ্কা—নঙ্কা,—লোক—নোক হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে। রাজন, ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত।

নিতাইয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরঝি সপ্রশ্ন ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি কথা ? অকারণে মেয়েটির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তে দ্রুত হইয়া উঠিল। কি কথা বলিবে কবিয়াল ?

নিতাই বলিল—অনেক দিন থেকেই বলব মনে করি, কিন্তুক –

একটু নীরব থাকিয়া নিতাই বলিল আর ভাই, দুধের পেয়োজন আমার হবে না।

ঠাকুরঝি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল। একথা শুনিবে তাহা তো সে ভাবে নাই। তাহার মুখের শ্রী পরিবর্তিত হইতেছিল। বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রশ্রীর মত তাহার সে মুখখানি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া হেমন্ত-শেষের পাতার মত পাণ্ডুর হইয়া আসিল। সে হইতেছিল সম্পূর্ণভাবে তাহার অজ্ঞাতসারে। সে নির্বাক হইয়া শুধু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিতাইয়েব কথার শেষে তাহার মুখ এবার যে পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাহার আর পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকক্ষণ পরে সে যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। কথাটা নিতাইয়ের কথা। সেই কথাটাই সে যেন কম্পিতকণ্ঠে যাচাই করিয়া লইল—আর দুধ নেবে না ?

—না।

—ক্যানে ? কি দোষ করলাম আমি ? তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না। কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—মিথ্যে কথা একেই মহাপাপ, তার ওপর তোমার কাছে মিথ্যে বললে পাপের আমার পরিসীমা থাকবে না। আমার সামর্থ্যে কুলুচ্ছে না ঠাকুরঝি।

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—দরিদ্র ছোটলোকের কবি হওয়া বড় বিপদের কথা ঠাকুরঝি।

কাতর অনুনয়ে ব্যগ্রতা করিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—তোমাকে পয়সা দিতে হবে না কবিয়াল। অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর বলিল—না। জানতে পারলে তোমার স্বামী পেহার করবে, শাশুড়ী তিরস্কার করবে, ননদে গঞ্জনা দেবে—

ঠাকুরঝি প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না না না। ওগো, একটি গাই আমার নিজের আছে, আমি বাবার ঘর থেকে এনেছি, সেই গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দোব।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

—লেবে না ? কবিয়াল— ? মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল,

আবার তাহার চোখ দুইটিতে জল টলমল করিতেছে।

সান্ত্বনা দিবার জন্যই নিতাই মৃদু হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝির মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিতাইয়ের মুখের হাসিকেই সম্মতি ধরিয়া লইয়া মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উচ্ছ্বাসেই সে পুলকিত দ্রুত লঘুপদে নিতাইকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া নিজেই নিতাইয়ের বাসার দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। ঘরকন্না তাহার পরিচিত ; দুধের পাত্রটি বাহির করিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া দ্রুততর পদে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

নিতাই পিছন হইতে ডাকিল—ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির যেন শুনিবার অবসর নাই, তাহার যেন কত কাজ। নিজের গতিবেগ আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

তখন চলিয়া গেলেও ফিরিবার পথে সে আসিয়া বাসার বারান্দায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে বলিল- দাও, চা দাও। আমার নতুন কাপে দাও।

চায়ের কাপটি নামাইয়া দিয়া নিতাই বলিল -একটি কথা শুধাব ঠাকুরঝি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—বল?

—আমাকে বিনি পয়সায় কেনে দুধ দেরে ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই আবার প্রশ্ন করিল—বল কিসের লেগে?

ঠাকুরঝি বলিল—আমার মন।

নিতাই অবাক হইয়া গেল তোমার মন?

ঠাকুরঝি বলিল—হ্যাঁ। আমার মন।

তারপর হাসিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—তুমি যে কবিয়াল। কত বড় নোক। বলিয়াই সে চায়ের কাপটি ধুইবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, নিতাই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে দুইটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। ফুল দুটি আগাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—নাও। কবিয়ালের হাতে ফুল নিতে হয়।

ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—না।

—তবে আমিও দুধ নোব না।

ঠাকুরঝি লঘু ক্ষিপ্রহাতে ফুল দুইটি টানিয়া লইয়া এক রকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল।

নিতাই নূতন গানের কলি ভাঁজিতে বসিল। আজ আবার নূতন কলি মনে হইয়াছে। 'ও আমার মনের মানুষ গো।' গানটির শুধু দু'কলি আছে আর নাই ; ও গানটি ভুলিবার সংকল্পই সে করিয়াছিল, কিন্তু বিধাতা দিলেন না ভুলিতে,—ঐ গানটিকে সে পুরা করিতে বসিল। বড় ভাল গান।

'ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা'—গুন গুন করিতে করিতেই সে একখানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিল। ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি শেষ করিয়া এইবার রাজন চা-চিনি লইয়া আসিবে, আবার একবার চা খাইবে।

নূতন কলি আসিয়াছে। বড় ভাল কলি। নিতাই খুব খুশী হইয়া উঠিল।—আহা—"সেই ছটাতে ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার!"

তাই বটে, পথই সে সার করিয়াছে। কিন্তু তার পর ? হ্যাঁ—হইয়াছে। পাইয়াছে, সে পাইয়াছে—সেই পথের চারিদিকেই বাঁশী বাজিতেছে—পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দুঃখ নাই কষ্ট নাই।

"চারিদিকে চার বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার ?"

কার আবার ? সেই ব্রজের বাঁশী। সে বাঁশী চিরকাল বাজিতেছে। প্রেম হইলে তবে শোনা যায়, নহিলে যায় না ! সে শুনিয়াছে !

সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল—ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে।

ঠাকুরঝিও তাহাকে ভালবাসে।

গুন গুন করিয়া নিতাই আপন মনে আখর দিল—

"বংশী বাজে তার।
ও রাধা রাধা রাধা বলে—।"

তারপর ? তারপর ? আহা—। সেই বাঁশী। না। না।—হাঁ—

"ঘর জ্বলিল—মন হারালো ছটার সুরে গো।
সুখের একি আকুল আতান্তর।"

আতান্তরই বটে। এ বড় আতান্তর !

অকস্মাৎ তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। একটা কথা মনে হইতেই গান বন্ধ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি ভিন্ন জাতি, অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। এ যে মহাপাপ। ওঃ ! এ বড় আতান্তর।

অনেকক্ষণ নিতাই চুপ করিয়া রহিল। নির্জনে বসিয়া সে বার বার তাহার মনকে শাসন করিতে চেষ্টা করিল। বার বার সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই শাসন মানিতে চায় না। অবাধ্য মন লজ্জা পায় না, দুঃখিত হয় না, সে যেন কত খুশী হইয়াছে, কত তৃপ্তি পাইয়াছে। ঘরের প্রতিটি কোণে যেন ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া আছে—অন্ধকারের মধ্যে ক্ষারে-ধোওয়া ধপধপে কাপড় পরিয়া সে যেন দাঁড়াইয়া আছে নিতাইয়ের মনের খবর জানিবার জন্য। নিতাই অধীর হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের জানালাটা খুলিয়া দিল। উদাস দৃষ্টিতে সে খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল রেলের লাইনের দিকে। রেলের সমান্তরাল লাইন দুইটা যেখানে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে নিতাইয়ের আজ মনে হইল একটি স্থির স্বর্ণবিন্দু জাগিয়া রহিয়াছে, সে অচঞ্চল—সে নড়ে না—আগায় না, চলিয়া যায় না, স্থির। ঠাকুরঝি যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া ওইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জানালা খুলিয়া দেওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পথে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কবিয়াল তাহাকে ডাকে কিনা !

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। রাঙা ফুলে ভরা গাছ। 'চিরোল চিরোল' পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল ! গাছটার এমন অপরূপ বাহার নিতাই আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সামনেই রেল লাইনের ওপাশে বন-আউচের গাছ—বন-আউচের মিঠা

গন্ধ আসিতেছে। কদমের গাছটায় কচি পাতা দেখা দিয়াছে। বর্ষা নামিলেই কদমের ফুল দেখা দিবে। বাবুদের আমবাগানে দুইটা কোকিল পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে; একটা 'চোখ গেল' পাখী ডাকিতেছে চণ্ডীতলার দিকে। 'মধুকুলকুলি' পাখীগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রঙীন প্রজাপতির যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে কৃষ্ণচূড়া গাছটার চারিপাশে। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে।

ঠাকুরঝি যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছে এই দিকে।

নিতাইয়ের শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করিতেছে। সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ডাকিল--এস। ঠাকুরঝি, এস। তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। তুমি এস। আমার পাপ হয় হোক, নরকে যাইতে হয় হাসিমুখেই যাইব, তবু তোমাকে বলিতে পারিব না।—তুমি এস না। সে কি পারি? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হইবার? এস তুমি, এস।

তাহার মনে হইল নষ্টচাঁদের কথা। সে চাঁদ দেখিলে নাকি কলঙ্ক হয়। নিতাই কিন্তু কখনও সে কথা মানে নাই। মনের মধ্যে তাহার আবার গান গুনগুন করিয়া উঠিল। আপনি যেন কলিটা আসিয়া পড়িল—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?"

ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। ঠাকুরঝি যদি আর না আসে, তবে নিতাই বাঁচিবে কি করিয়া? এখানে থাকিয়া সে কি করিবে? কোথায় সুখ তবে? সে এইখানে বসিয়া ওই পথের দিকে চাহিয়া চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিবে।

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ, তোমার নাগি—"

ও-হো-হো! গানের কলি হু-হু করিয়া আসিতেছে!

"ওগো চাঁদ তোমার নাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

হায়, হায়, হায়। একি বাহারের গান। ওগো, ঠাকুরঝি। ওগো, কি মহাভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো—তাই তো আজ এমন গান-আপনা-আপনি আসিয়া পড়িল।

নিতাই উঠিল। সে চলিল ওই রেল লাইনের পথ ধরিয়া যে পথে ঠাকুরঝি আসে। কিছু দূর গিয়া পথ নির্জন হইতেই সে ওই গানটা ধরিয়া দিল।

রেল লাইনের বাঁধে ছেদ পড়িয়াছে নদীর উপর। বাঁধের মাথা হইতে পুল আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধ হইতে নিতাই নামিল নদীর ঘাটে; নদীতে অল্প জল, এক হাঁটুর বেশী নয়। হাঁটিয়াই ঠাকুরঝি নিত্য নদী পার হইয়া আসে-যায়। নিতাই গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

নিতাই চলিয়াছিল একেবারে বিভোর হইয়া। বাঁ হাতখানি গালে রাখিয়া ডানহাতে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা অঙ্গুল দুইটি জুড়িয়া সে যেন ঠাকুরঝিকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। হয়তো সে একেবারে ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে গিয়াই হাজির হইত। নদীর

ঘাটে পা দিয়াই হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল। তাই তো. সে কোথায় যাইতেছে? এ কি করিতেছে সে? ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীতে সে যদি গিয়ে দাঁড়ায়, এই গান গায়, বলে—ঠাকুরঝি, এ চাঁদ কে জান? এ চাঁদ আমার তুমি? তবে ঠাকুরঝির দশা কি হইবে? ঠাকুরঝির স্বামী কি বলিবে? তাহার শাশুড়ী ননদ কি বলিবে? পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়া যাইবে। তাহারা কি বলিবে? সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরঝি—, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল ঠাকুরঝির ছবি। দিশাহারার মত তাহার ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিবে।

ঠাকুরঝির নিন্দায় ঘর-পাড়া-গ্রাম-দেশ ভরিয়া যাইবে। ঠাকুরঝি পথ হাঁটিবে, মাথা হেঁট করিয়া পথ হাঁটিবে, লোকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিবে—ওই দেখ কালামুখী যাইতেছে।

কুৎসিত অভদ্র লোক ঠাকুরঝিকে কুৎসিত কুকথা বলিবে।

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে—মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।

নিতাই নদীর ঘাটে বসিল।

আপন মনেই বলিল—আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক।

আঃ—আজ কি হইল নিতাইয়ের! আবার কলি আসিয়া গিয়াছে।—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে-সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

নিতাই গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আবার ফিরিল।

রাজা বলিল—কাঁহা গিয়া রহা ওস্তাদ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—গান, রাজন, গান। বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান আজ এসে গেল ভাই। তাই গুনগুন করছিলাম আর মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম।

—হাঁ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান?

—হাঁ, রাজন, অতীব উত্তম, যাকে বলে উচ্চাঙ্গের গান।

—বইঠো। তব ঢোলক লে আতা হাম।

রাজা ঢোল আনিয়া বসিয়া গেল।

নিতাই একমনে গাহিতেছিল—চাঁদ তুমি আকাশে থাক—

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া রাজা বলিল—আরে ওস্তাদ, আঁখসে তুমরা পানি কাহে নিকালতা ভাই?

চোখ মুছিয়া নিতাই বলিল—হাঁ রাজন, পান নিকাল গিয়া। কিয়া করেগা! চোখের জল যে কথা শোনে না ভাই।

পরদিন সকাল হইতেই বসিয়া ছিল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। আজ সকাল হইতেই তাহার মনে হইতেছে—মনে তাহার কোন খেদ নাই, কোন তৃপ্তিও নাই। সে যেন বৈরাগীই হইয়া গিয়াছে।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে অনেক ভাবিয়াছে সে। সন্ধ্যায় গিয়াছিল রাজনের

বাড়ী। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা; ইদানীং রাজা নিতাইকে নানাপ্রকার সাহায্য করে বলিয়া সে নিতাইয়ের উপর প্রায়ই চটিয়া থাকে। তবু সে গিয়াছিল। রাজা খুশী হইয়াছিল খুব। আশ্চর্যের কথা—কাল রাজার বউও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতেই বলিয়াছিল—তবু ভাগ্যি যে ওস্তাদের আজ মনে পড়ল।

নিতাই তাহারই কাছে কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছে ঠাকুরঝির স্বামীর সমস্ত বৃত্তান্ত।

ঠাকুরঝির স্বামীটি নাকি দিব্য দেখিতে।

—রঙ পেরায় গোরা, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি ললছা-ললছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে।

অবস্থাও নাকি ভাল। দিব্য সচ্ছল সংসার। রাজার স্ত্রী বলিল—যাকে বলে 'ছছল-বছল'। আট-দশটা গাই গরু। দুটো বলদ। ভাগে চাষ-বাস করে। ঠাকুরঝির তোমাদের পাঁচজনার আশীর্বাদে সুখের সংসার।

নিতাই বলিয়াছিল আহা। আশীর্বাদ তো চব্বিশ ঘন্টাই করি মহারাণী।

রাজার স্ত্রী অদ্ভুত। সে এতক্ষণ বেশ ছিল, এবার ওই মহারাণী বলাতেই সে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ওই ওই কথা আমি সইতে লারি মহারাণী। মহারাণী তো খুব। মেথরাণী, চাকরাণী তার চেয়ে ভাল। না ঘর না দুয়োর। র্যালের ঘরে বাস—আজ এখান, কাল সেখান।

রাজা মুহূর্তে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল—কেঁও হারামজাদী? কেয়া বোলতা তুম?

—কেয়া বোলতা তুম কি? হক কথা বলব তার ভয় কি?

তাহার পরেই কাণ্ড এ। রাজা ধরিয়াছিল তার চুলে। তাহাদের শান্ত করিবার জন্য নিতাই বারকয়েক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছু হয় নাই। রাজার স্ত্রী প্রায় রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত কাঁদিয়া রাজাকে গাল দিয়াছে, নিতাইকে গাল দিয়াছে। তাহার জের টানিয়া আজ সকালেও একদফা হইয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের উদাসীনতা অবশ্য সেজন্য নয়

কাল সমস্ত রাত্রি সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে ভাল তুমি বাস, কিন্তু সে কথা মনেই রাখ, কাহাকেও বলিও না—ঠাকুরঝিকেও না। তাহার সুখের ঘরসংসার সে ঘর তাহার নিত্যনূতন সুখে ভরিয়া উঠুক। তুমি তাহার মনের শরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার সে সুখের ঘর ভাসাইয়া দিও না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরঝি আসিল ঘড়ির কাঁটার মত। রেল লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকঝকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। ক্রমে কাছে আসিয়া সে হইল ঠাকুরঝি। একমুখ হাসি ঠাকুরঝি তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কবিয়াল।

নিতাই অশ্রু-উদ্বেল কণ্ঠে বলিল—ঘরে বাটি আছে, দুধটা রেখে যাও।

সে বুঝিতে পারিল না কেন তাহার চোখে অকারণে জল আসিতে চাহিতেছে।

—না। তুমি এস। আমি অত সব লারব বাপু! আর—

—কি আর ?

—রোদে এলাম, বসব একটুকুন।

—না ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে বসা ঠিক নয়। দেখ পাঁচজনে দুষ্য ভাববে।

ঠাকুরঝি স্তব্ধভাবে স্থিরদৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বিশ্রাম করবে যদি তো তোমার দিদির বাড়ী রয়েছে। আমি একা বেটা ছেলে বাড়ীতে থাকি। পাঁচজনের দুষ্য ভাবার তো দোষ নাই। দেখ তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ ঠাকুরঝি। তাহার মুখে নিরুপায় মানুষের সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

* * *

দিন এমনি ভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। নিতাই উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকে। গানও আর তেমন গায় না। ঠাকুরঝি আসে, সেও আর নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইয়া, দুধের বাটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়, চলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে নিতাই একদিন বলিল—শোন।

ঠাকুরঝি শুনিতে পাইল, কিন্তু দাঁড়াইল না। একবার মুখ ফিরাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই আবার ডাকিল—যেও না, শোন। ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।

—শোন, এদিকে ফেরো।

ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

ঠাকুরঝি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দিন কয়েক আবার সেই আগের মত চলিল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলিল—সে দিন যে কি বলবে বলছিলে—বললে না ?

নিতাই বলিল—বলব।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর একদিন বলব ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি একটু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের বুক একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের বুক-ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ঝরিয়া পড়িল। যে কথাটা বলা হইল না সেই কথা গান হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

"বলতে তুমি ব'লো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন-আগুনে।'

অনেকদিন পরে নিতাইয়ের মনে গান আসিয়াছে ; দুঃখের মধ্যেও নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। গুন গুন করিয়া গান ধরিয়া নিতাই চলিল বাবুদের বাগানের দিকে। বাবুদের বাগানে তাহার গানের অনেক সমঝদার আছে। বাগানের প্রতিটি গাছ তাহার সমঝদার শ্রোতা। এই বাগানেই সে প্রথম-প্রথম কবিগান অভ্যাস করিত। গাছগুলি হইত মজলিসের মানুষ। তাহাদের সে তাহার গান শুনাইত। আজও বাগানে আসিয়া সে গান ধরিল, ওই গানটাই ধরিল--

"সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা,
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।
আমিই পুড়ি মন-আগুনে।

গান শেষ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। নাঃ, এমনভাবে আর দিন কাটে না। এই মনের আগুনে সে আর পুড়িতে পারিবে না। শুধু মনের আগুনই নয়, পেটের আগুনের জ্বালা, সেও তো কম নয়। রোজগার গিয়াছে ; পুঁজি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। রোজগারের একমাত্র পথ মোটবহন, কিন্তু কবিয়াল হইয়া তো ঐ কাজ করিতে পারিবে না। অন্তত এখানে সে পারিবে না। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাই সে করিবে। কালই গিয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিবে -মা গো, তোমার অভাগা ছেলে নিতাইচরণকে কবিয়াল করিলে, কিন্তু তাহার মনের দুঃখ পেটের দুঃখ বুঝিলে না। কোন উপায় করিলে না সে চলিল, তাহাকে বিদায় দাও তুমি। তাহার মনে পড়িয়া গেল অনেক দিনের আগের একটা শোনা গান, বাউলেরা গাহিত, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।"

ওই প্রথম কলিটা লইয়া তাহার পাদপূরণ করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া ছিল। তাহার সে স্তব্ধতা ভাঙিল রাজনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে। সে সচকিত হইয়া উঠিল। রাজা কাহাকে দুর্দান্ত ক্রোধে ধমক দিতেছে—চোপ রহো।

পরক্ষণেই স্ত্রী-কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা-চিনি নিয়ে যাবে। কেনে ? কিসের লেগে ? লাজ নাই, হায়া নাই, বেহায়া, চোখখেগো মিনসে।

আর কথা শোনা গেল না, শোনা গেল দুপ-দাপ শব্দ, আর স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত চীৎকার। রাজা নীরবে স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, রাজার স্ত্রী উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতেছে। নিতাই ছি-ছি করিয়া সারা হইল। নাঃ, এই চায়ের পর্বটা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—ওস্তাদ ! ওস্তাদ। স্ত্রীকে প্রহার করিয়া সেই মুহূর্তটিতেই রাজা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—বানাও চা।—পনরা ষোলা আদমীকে মাফিক। প্রায় পোয়াখানেক চা, আধসেরটাক

চিনি সে নামাইয়া দিল। রাজার স্ত্রীর দোষ কি ? এত অপব্যয় কেহ চোখে দেখিতে পারে ? আর এত চা-চিনি হইবেই বা কি ?

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন।

রাজন নিতাইয়ের কথার কানই দিল না, সে বাসার বাহিরে চলিয়া গেল, দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—হো ভেইয়া লোক হো। হাঁ হাঁ, হিঁয়া আও। চলে আও সবলোক, চলে আও।

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল।

মেয়ে-পুরুষের একটি দল আসিতেছে। ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা—আসবাবপত্র অনেক। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলিরও বিশিষ্ট একটা ছাপ-মারা চেহারা। এ ছাপ নিতাই চেনে।

—চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি। কথাটা যে বলিল, সে ছিল দলের সকলের পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সকলের আগে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেত্রে যেন ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর।

রাজনের মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটা আবার বলিল—কই হে, কোথায় তোমার ওস্তাদ ন ফোস্তাদ ?

রাজন নিতাইকে দেখাইয়া বলিল—ওহি হামার ওস্তাদ।

নিতাই অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে ইহাদের সকল পরিচয় দেখিয়াই চিনিয়াছে,—ঝুমুরের দল। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে ? সে কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। রাজা নিজেই বলিল—ট্রেনসে জোর করকে উতার লিয়া। হিঁয়া গাওনা হোগা আজ। তুমকো ভি গাওনা করনে হোগা ওস্তাদ।

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—ও হরি, এই তুমরা ওস্তাদ নাকি ? অ-মা-গ-অ। বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ তনু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে আরে সে হাসির কি ধার। মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।

নয়

জলের বুক ক্ষুর দিয়া চিরিয়া দিলেও দাগ পড়ে না, চকিতের মতন শুধু একটা রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া যায় আর ক্ষুরটাও জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি একটি মৃদু হাসি নিতাইয়ের মুখে দেখা দিয়া ওই তরঙ্গময়ী কৃশতনু মেয়েটার কলরোল-তোলা হাস্যস্রোতের মধ্যে হারাইয়া গেল। নিতাইয়ের হাসি যেন ক্ষুর ; কিন্তু ওই মেয়েটাও যেন

আবেগময়ী স্রোতস্বিনী, তাহাকে কাটিয়া বসা চলে না। মেয়েটা বরং নিতাইয়ের হাসিটুকুর জন্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই নিতাই সবিনয়ে সমস্ত দলটিকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন।

নিতাই বাড়ীর মধ্যে আগাইয়া গেল—সকলে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাইয়ের বাসা—রেলওয়ে কুলি-ব্যারাক। লাইন কনস্ট্রাকশনের সময় এখানেই ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বড় অফিস, তখনকার প্রয়োজনে এই সমস্ত ব্যারাক তৈয়ারী হইয়াছিল, এখন সব পড়িয়াই আছে। দিব্য তকতকে সিমেন্ট বাঁধানো খ্যানকটা বারান্দা, এক টুকরা বাঁধানো আঙিনা; সেই দাওয়া ও আঙিনার উপরেই দলটি বসিয়া পড়িল।

দলটি একটি ঝুমুরের দল। বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাড়িয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়—অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়।

আসরে কিছু কিছু পেলাও পড়ে। রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের দেহের ব্যবসাও চলে। তবে ইহাই সর্বস্ব নয়। পুরাণের পালাগানও জানে, তেমন আসর পাইলে সে গানও গায়। যন্ত্রীদের মধ্যে, নিতাইয়ের ধরণের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মত কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়।

দলটি ঘরে ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ! গাছতলায় পথের ধারে আস্তানা পাতিয়া যাহারা অনায়াসে দিনরাত্রি কাটাইয়া দেয়, এমন বাঁধানো আঙিনা ও দাওয়া পাইয়া তাহাদের কৃতার্থ হইবার কথা - কৃতার্থই হইয়া গেল তাহারা। খুশী হইয়া তালপাতার চ্যাটাই বিছাইতে শুরু করিল। দীর্ঘ কৃশতনু মুখরা মেয়েটি কেবল সিমেন্ট-বাঁধানো দাওয়ার উপর উঠিয়া সটান উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, ঠাণ্ডা মেঝের উপর মুখখানি রাখিয়া শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিল—আঃ! তাহার সে কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি ও গভীর হতাশার কারুণ্য। সে যেন আর পারে না।

—বসন! মেয়ের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া আছে, দলের কর্ত্রী, সে-ই বলিয়া উঠিল—বসন, জ্বর গায়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুলি কেনে? ওঠ, ওঠ।

মেয়েটির নাম বসন্ত। বসন্ত সে কথার উত্তর দিল না, কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল—কই হে, ওস্তাদ না ফোস্তাদ! চা দাও ভাই।

নিতাই চায়ের জল তখন চড়াইয়া দিয়াছে, সে বলিল—এই আর পাঁচ মিনিট। কিন্তু তোমার জ্বর হয়েছে—তুমি ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলে কেন? একটা কিছু পেতে দোব?—মাদুর?

বসন্ত চোখ মেলিল না, চোখ বুজিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওলো নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। নাগর শুধু নাগর নয়, পথের নাগর, দেখবামাত্র প্রেম। দরদ একেবারে গলায় গলায়।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর দলও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝির সেই নতুন মগটিতে চা ঢালিয়া নিতাই সেই মগটি বসন্তের মুখের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বুঝে খেয়ো, চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি।

কবিয়াল নিতাই রসের কারবারী, রসিকতার এমন ধারালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র পাইয়া সে মুহূর্তে মাতিয়া উঠিল।

চায়ের গন্ধ পাইয়া ও ষ্টিলের মগের শব্দ শুনিয়া তৃষ্ণার্তের মত আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ মচকাইয়া হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুইটা মেলিয়া চাহিয়া বলিল—বল কি নাগর! পীরিতে কুলোল না, শেষে যোগবশ!

অপর সকলকে চা পরিবেশন করিতে করিতে নিতাই গান ধরিয়া দিল—

"প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে!
আর কি উপায় বৃন্দে—এইবার দে এনে দে—
বশীকরণ লতা—বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে।"

গানটা কিন্তু নিতাইয়ের বাঁধা নয়, নিতাইয়ের আদর্শ কবিয়াল তারণ মোড়লের বাঁধা গান; নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে। নিতাইয়ের গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার চোখ দুইটা একেবারে শাণিত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল।

পুরুষদলের একজন বলিল—ভাল। ওস্তাদ, ভাল।

অন্যজন সায় দিল—হ্যাঁ, ভাল বলেছ ওস্তাদ।

—হ্যাঁ। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া অন্য একটি মেয়ে বলিল—হ্যাঁ, ময়না বলে ভাল।

নিতাইয়ের গানের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ, একা বসন্ত নয়—মেয়েদের সকলেরই গায়ে লাগিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন আবার বলিয়া উঠিল—"উনোন-ঝাড়া কালো কয়লা—আগুন তাতে দিপি-দিপি! ছেঁকা লাগে।"

নিতাই হাসিয়া বলিল—না ভাই, ছেঁকা কি দিতে পারি। আর তোমার সঙ্গে আমার কি পীরিত হয়, না হতে পারে? তুমি ফোটা ফুল, আমি ধুলো, ফুলের পথের নাগর তো ধুলো।—বলিয়াই গুনগুন করিয়া ধরিয়া দিল—

ফুলেতে ধুলাতে প্রেম হয়নাকো ফুল ফোটার কালে!
ফুল ফোটে সই আকাশমুখে চাঁদের প্রেমে হেলেদুলে।
ধুলা থাকে মাটির বুকে, চরণতলে অধোমুখে
ফুল ঝরিলে করে বুকে
সেই লেখা তার পোড়া কপালে।

বলে, বটে কিনা?

বসন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটা কি?

প্রৌঢ় বিচারকের মতো স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—তা তোদের হার হল বাছা। জবাব তোরা দিতে নারলি। তা বাবা কি এ সব গান মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে গাইছ?

নিতাই সবিনয়ে বললে—খানিক আদেক চেষ্টা করি। দু'চারটে আসরে কবিগানও করেছি। গানটা আমার বাঁধাই বটে।

প্রৌঢ় বলিল—পদখানি তো বড় ভাল বাবা।

নিতাই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তাঁর দয়া।

বসন্ত কোন কথা বলিল না, চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া মগটা নামাইয়া দিয়া আবার সে লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাতে হাঁড়ি-মালসা, বগলে শালপাতার বোঝা। মিলিটারী রাজা—হুকুমের সুরেই ব্যবস্থা জানাইয়া দিল—ভেইয়া লোক, ও-হি বটতলামে জায়গা সাফ হো গিয়া, আব খানা-উনা পাকা লিজিয়ে।

এক সময় রাজাকে একা পাইয়া নিতাই চুপি চুপি প্রশ্ন করিল রাজন, এই সব খরচ-পত্র করছ—

রাজার সময় অত্যন্ত কম এবং সংসারে গোপনও কিছু নাই। সে বাধা দিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই বলিল—সব ঠিক হ্যায় ভাই, সব ঠিক হ্যায়। বেনিয়া মামা আট আনা দিয়া, কয়লাওয়ালা চার আনা, মুদী আট আনা, মাস্টারবাবু আট আনা, গুদামবাবু আট আনা, গাডবাবু আট আনা, মালগাড়ীকে 'ডেরাইবর' আট আনা, হামারা এক রুপেয়া : বাস জোড় লেও। তুমারা এক রুপেয়া,—উ লোককে আড়াই রুপেয়া, বারো আনাকে চাউল ডাউল। বাস, হো গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলিয়া গেল, ওদিকে শান্টিং লাইন হইতে একখানা গাড়ী কুলিরা ঠেলিয়া প্রায় পয়েন্টের কাছে লইয়া গিয়াছে।

নিতাই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত সংসার পাতিয়া ফেলিল, উনান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিল, একটি মেয়ে জল আনিল, একজন তরকারি কুটিতে বসিল প্রৌঢ়া উনানের সম্মুখে বসিয়া মাটির হাঁড়ি ধুইয়া ফেলিয়া চড়াইয়া দিল কিছুক্ষণের মধ্যে। পুরুষেরা তেল মাখিতে বসিল; মেয়েদের স্নান তখন হইয়া গিয়াছে, সকলেরই ভিজা খোলা চুল পিঠে পড়িয়া আছে, প্রান্তে একটি করিয়া গেরো বাঁধা। সেখানে ধারে কাছে নাই কেবল সেই কৃশতনু গৌরাঙ্গী ক্ষুরধার মেয়েটি। নিতাইকে ডাকিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স বাবা, ব'স।

পুরুষ কয়জন প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তাই তো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন গো? বসুন।

উনানে একটা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া প্রৌঢ়া বলিল—খাসা গলা আমার বাবার। তারপর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাসি হাসিয়া বলিল—এই 'নাইনে'ই থাকবে বাবা? না, কাজকম্মও করবে—এও করবে?

—এই 'নাইনে'ই থাকবারই তো ইচ্ছে ; তা দেখি।

—বিয়ে-টিয়ে করেছ ? ঘরে কে আছে ?

—বিয়ে। নিতাই হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঘরে মা আছে, বুন আছে ; মা বুনের কাছেই থাকে। আমি একা।

—তবে আমাদের দলে এস না কেনে ?

নিতাই কিন্তু এ কথার উত্তর চট করিয়া দিতে পারিল না। সম্মতি দিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল রাজাকে—মনে পড়িয়া গেল ভুইচাঁপার শ্যামল সরস ডাঁটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি—ঠাকুরঝিকে। সে চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ়া আবার প্রশ্ন করিল—কি বলছ বাবা ?

—বাবা ভাবছে তোমার মনের মানুষের কথা। সঙ্গে সঙ্গে খিল-খিল হাসি। নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া সদ্য-স্নাতা বসন্ত। মেয়েটা স্নান করিয়া চুল গা মোছে নাই, চুল পর্যন্ত ঝাড়ে নাই। ভিজা চুল হইতে তখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিতাই অবাক হইয়া গেল।

—বউ কেমন হে ? বশীকরণের লতায় ছাঁদে ছাঁদে বেঁধেছ বুঝি ?

নিতাই এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল—জ্বরগায়ে তুমি চান ক'রে এলে ?

—ধুয়ে দিয়ে এলাম। চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর কিনা। বলিয়াই যে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে তাহার সুপরিস্ফুট সর্বাঙ্গও হাসিয়া উঠিল। নিতাইয়ের লজ্জা হইল।

প্রৌঢ়া বলিল—তাই তো বটে। চান করে এলি ? ছাড়, ছাড়, ভিজে কাপড় ছাড বসন। তুই কোন দিন মরবি ওই ক'রে।

বিচিত্র হাসিয়া বসন বলিল—ফেলে দিও টেনে। তা ব'লে চান না ক'রে থাকতে পাবি না। চান না করলে—মা-গো। গায়ে যা বাস ছাড়ে।

একটি তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল—চুল ফেরে না লতায় পাতায়, তা বল।

বসন হাত দিয়া মাথার চুলে চাপ দিতে দিতে বলিল—আমার তো আর কেশ দিয়ে নাগরের পা মুছতে হয় না, তা চুল না ফিরিয়ে করব কি ?

বহু পরিচর্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্নও ইহারা থাকিতে পারে না ; সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না। কেহ পতঙ্গের মত তার শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেয়েটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয়, মর্মচ্ছেদও হইয়া যায় তাই বসন্ত সঙ্গিনীকে এমন কথা বলিল। ফলে ঝগড়া একটা বাধিয়া উঠিবাব কথা ; আহত মেয়েটি ফণা তুলিয়াও উঠিয়াছিল ; কিন্তু দলের নেত্রী প্রৌঢ়া মাঝখানে পড়িয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল। হাসিয়া বলিল—ও বসন শোন শোন, দেখ আমাদের ওস্তাদকে পছন্দ হয় কিনা।

তাহার কথা শেষ হইল না, বসন্তের উচ্চ উচ্ছল হাসিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। নিতাই

ঘামিয়া উঠিল। প্রৌঢ়া ধমক দিয়া বলিল—মরণ। এত হাসছিস কেনে ?

হাসি থামাইয়া বলিল—মরণ তোমার নয়, আমার।

—কেন ?

—মা গো। ও যে বড্ড কালো ; মা—গ।

সকলে নির্বাক হইয়া রহিল।

বসন্ত আবার বলিল—কালো অঙ্গের পরশ লেগে আমি সুদ্ধ কালো হয়ে যাব মাসী। মুখ বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—যাই, শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি' হলে কে করবে বাবা। সে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

একটি মেয়ে বলিল—মরণ তোমার ; গলায় দড়ি।

প্রৌঢ়া ধমক দিল—চুপ কর বাছা। কোঁদল বাঁধাস নে।

মেয়েটি একেবারে চুপ করিল না, আপন মনেই মৃদুস্বরে গজগজ করিতে আরম্ভ করিল। নিতাই আপন মনে মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। হাসিতেছিল ওই গৌরগরবিনীর রকমসকম দেখিয়া। মেয়েটা ভাবে তাহার ওই সোনার মত বরণের ছটায় দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে। সবাই উহাকে পাইবার জন্য লালায়িত। হায়। হায়। হায়।

প্রৌঢ়া আবার। কথাটা পাড়িল—বলি হাঁ গো, ও ছেলে।

—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ। ছেলেই বলবো তোমাকে। অন্য লোক বলে—ওস্তাদ। রাগ করবে না তো বাবা ?

—না না। রাগ করব কেনে। মাসীর এ কথাটি তাহার বড় ভাল লাগিল।

—কি বলছ ? এই 'নাইনে'ই যখন থাকবে, তখন এস না আমাদের সঙ্গে।

—না। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নিতাই উঠিল,—তা হ'লে আমি যাই এখন, আমাকেও রান্নাবান্না করতে হবে।

—ওহে কয়লা-মাণিক। বসন্তর কণ্ঠস্বর। নিতাই ফিরিয়া চাহিল। ইতিমধ্যেই বসন্ত বিন্যাস করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে— বিন্যাস করিবার মত চুলও বটে মেয়েটির। ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালো চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে ধপধপে লাল নক্সিপাড় মিলের শাড়ী।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম দিয়েছি ভাই কয়লা মাণিক। কালো মাণিক কি বলতে পারি ? সে হাতজোড় করিয়া কালো-মাণিককে প্রণাম করিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—ভাল ভাল। তা বেশ তো। ময়লা-মাণিক বলতেও পার।

—সে ওই কয়লাতেই আছে। বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নিতাই বলিল—তা আছে, কিন্তু ময়ে—ময়ে—মিল নাই। ওতে কথাটা মিষ্টি নয়। গানের কান আছে তাই বললাম। কালা হলে বলতাম না। বল কি বলছ ?

—আমার একটি কাজ করে দেবে ?

—কি, বল ?

—চার পয়সার মাছ এনে দেবে ? আমার আবার মাছ নইলে রোচে না। দেবে এনে ?

—দাও। নিতাই হাত পাতিল। কিন্তু বসন্ত পয়সা দিতে হাত বাড়াইতেই সে আপনার হাতখানি অল্প সরাইয়া লইল, বলিল—আলগোছে ভাই, আলগোছে।

—কেনে? চান করতে হবে নাকি? মেয়েটার ঠোঁটের কোণ দুইটা যেন গুণ দেওয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কয়লার ময়লা লাগবে ভাই, তোমার রাঙা হাতে।

বসন্তের হাতের পয়সা আপনি খসিয়া নিতাইয়ের হাতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে ধনুকের গুণ যেন ছিঁড়িয়া গেল। তাহার অপর প্রান্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সে কম্পন তাহার বাঁকা হাসিতে রূপান্তর গ্রহণ করিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। মনে হইল মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী। প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেজী হয়; বিড়াল হইয়া রেজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেজী হইতে সে হয় বাঘিনী। কান্না তাহার বাঁকা হাসিতে পাল্টাইয়া গেল মুহূর্তে হাসিয়া সে বলিল—সেই জন্যে আলগোছে দিলাম।

জেলে-পাড়ার পথে নিতাইয়ের মনে গান জাগিয়া উঠিল। নূতন গান মনে মনে ভাবিয়া সে ওই মেয়েটার একটা তুলনা পাইয়াছে। শিমূলফুল। গুনগুন করিয়া সে কলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—আহা।

'আহা—রাঙা বরণ শিমুলফুলের বাহার শুধু সার।'

দশ

সন্ধ্যায় রাজা বেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতিল। রাজা পরিশ্রম করিল সেনাপতির মত; বিপ্রপদ বসিয়া ছিল রাজা সাজিয়া। বেচারা বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া নড়-চড়া করিতে পারে না, চীৎকারেই সে শোরগোল তুলিয়া ফেলিল। অবশ্য কাজও অনেকটা হইল। মুদী, কয়লাওয়ালা বিপ্রপদর ব্যঙ্গশ্লেষের ভয়ে শতরঞ্চি বাহির করিয়া দিল, বণিক মাতুল তাহার পেট্রোম্যাক্স আলোটা আনিয়া নিজেই তেল পুরিয়া জ্বালিয়া দিল। লোকজনও মন্দ কেন—ভালই হইল। সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিরা কেহ না আসিলেও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই হংসশ্রোতার মত যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া জাঁকিয়া বসিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মাঝখানে আসর পড়িল ঝুমুর নাচের। নিতাই প্রত্যাশা করিয়াছিল উহাদের দলের কবিয়ালের সঙ্গে একহাত লড়িবে অর্থাৎ গাওনার পাল্লা দিবে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে এক-একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে—স্বতন্ত্রভাবে গাওনা করিবার যোগ্যতা না থাকা হেতু ওই ঝুমুর দলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা। পথে কোন গ্রামে বা মেলায় এমনি ধারার ঝুমুর দলের দেখা পাইলে পাল্লা জুড়িয়া দেয়। মেলায় ঝুমুরের সহিত কবির আসর যোগ হইলে আসরও জোরালো হয়। এ দলেরও এমন একজন কবিয়াল আছে। কিন্তু সে আজ দলের সঙ্গে আসে নাই। কাজের জন্য পিছনে পড়িয়া

আছে। দলটির গন্তব্যস্থান আলেপুরের মেলা। কথা আছে, দুই দিন পরে সে সেই সেইখানে গিয়া জুটিবে। নহিলে নিতাই একটা আসর পাইত। কবিয়ালের অভাবে আসর বসিল শুধু নাচগানের। ঢোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়াম, একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষেরা আসর পাতিয়া বসিল। তাহাদের তেলচপচপে চুলে বাহারে টেরী, গায়ে রংচঙে ছিটের ময়লা জামা। মেয়েদের গায়ে গিল্টির গয়না—কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা ; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশনের বডিস রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকৃষ্ট ভঙ্গি। ঠোঁটে-গালে লালরঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নো'র প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লালরঙের ছোপ। দর্শকদের মনে কিন্তু ইহাতেই চমক লাগিতেছে। মেয়েগুলির মধ্যে বসন্তই ঝলমল করিতেছে, মেয়েটার সত্যই রূপ আছে। তার সঙ্গে রুচিও আছে। মেয়েটা সাজিয়াছে বড় ভাল। কবিয়াল নিতাই ফরসা কাপড়জামার উপর চাদরখানি গলায় দিয়া ঝুমুর দলেরই গা ঘেঁষিয়া বসিল। মুখে তাহার গৌরবের হাসি। এ আসরে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি কারণ সে কবিয়াল।

গাওনা আরম্ভ হইল। খেমটার অনুকরণে নাচ ও গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, মেয়েদের পরে দোয়ারেরা সেই গানেরই পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে। একালে খেমটা নাচের প্রভাব দেখিয়া তাহাদের ঝুমুর নাচ ছাড়িয়া এই ধরিয়াছে। কিছুটা অবশ্য ঝুমুরের রঙ রাখিয়াছে সেটুকু সবই অশ্লীলতা।

প্রৌঢ়া মধ্যস্থলে পানের বাটা লইয়া বসিয়াছিল, সে নিতাইকে বলিল—বাবা, তুমিও ধর।

নিতাই হাসিল। কিন্তু দোয়ারদের সঙ্গে সে গান ধরিল না। প্রথম গানখানা শেষ হইতেই মেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া পড়িল। কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি একটি নিবেদন পাই।

চারিদিকে নানা কলরব উঠিয়া পড়িল।

—সঙ নাকি ?

—ব'স ব'স।

—এই নিতাই।

একজন রসিক বলিয়া উঠিল—গোঁফ কামিয়ে এস। গোঁফ কামিয়ে এস।

অকস্মাৎ সকল কলরবকে ছাপাইয়া রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ সব, চোপ।

বিপ্রপদও একটি ধমক ঝাড়িল—অ্যা—ও।

সকলে চুপ করিয়া গেল। নিতাই সুযোগ পাইয়া বলিল—আমি একপদ গাইব আপনাদের কাছে।

—লাগাও ওস্তাদ, লাগাও। রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই গান ধরিয়া দিল। বাঁ হাতটি গালে দিয়া ডান হাতটি মুখের সম্মুখে রাখিয়া অল্প ঝুঁকিয়া আরম্ভ করিল—

"আহা রাঙাবরণ শিমূলফুলের বাহার শুধু সার—
ওগো সখি দেখে যা বাহার।"

কলিটা প্রথম দফা গাহিয়া ফেরতার সময় সে হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া বলিল—এই—এই, এই বাজাও তবলাদার—বলিয়াই সে আবার ধরিল—

"শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার।
মন-ভোমরা যাস্ নে পাশে তার।"

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরখানি মধুর এবং ভরাট, এক মুহূর্তে মানুষের মন দখল করিয়া লয়। লইলও তাই। লোকের আপত্তি গ—য়ে গোমাতার মত গানে, কিন্তু এখানে তাহার আভাস না পাইয়া লোকে জমিয়া বসিল।

রাজা বাহবা দিয়া উঠিল—বাহা রে ওস্তাদ, বাহা রে!

বিপ্রপদও দিল—বহুত আচ্ছা।

বণিক মাতুল বলিল—ভাল, ভাল।

লোকেও বাহবা দিল।

নিতাই উৎসাহে মৃদু মৃদু নাচিতে আরম্ভ করিল। একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, মুখে তাহার মৃদু হাসি। রাজার পিছনেই রাজার স্ত্রী, তাহার পাশে ঠাকুরঝি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুহূর্তের জন্য নিতাই গান ভুলিয়া গেল, ঠাকুরঝিকে অবহেলা দেখাইলেও ঠাকুরঝি তাহাকে অবহেলা করে নাই। তাহার গৌরবের গোপন অংশ লইতে সে আসিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে গানের খেই হারাইয়া ফেলিল।

ঝুমুর দলের ঢুলীটা সুযোগ পাইয়া ঢোলে কাঠি মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল- হ্যাঁ এই কাটল। অর্থাৎ নিতাইয়ের তাল কাটিয়া গেল। মুহূর্তে নিতাই সজাগ হইয়া গান ছাড়িয়া দিয়া হাতে তালি দিয়া বলিল—গান নয়, এবার ছড়া।

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলিয়া তালি মারিতে মারিতে পুনরায় ধরতার মুখে ধরিয়া দিল—

"ফল ধরে না ধরে তুলো চালের বদলে চুলো—"

সঙ্গে সঙ্গে সে নাচিতে শুরু করিল। পরের কলি ভাবিবার এই অবকাশ। নাচিতে নাচিতে সে ফিরিয়া চাহিল—আসরের দিকে। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—কেবল বসন্তর চোখে খেলিতেছে ছুরির ধার। নিতাই তাহার দিকে চাহিয়াই ছড়া কাটিল—

"ফুলের দরে তা বিকালো, মালা হলো গলার।"

নিতাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই বসন্ত যেন খেপিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়াকে বলিল—আমি চললাম মাসী! শিমূলফুলের অর্থ সে বুঝিয়াছে।

—কোথায়?

—বাসায়, ঘুমুতে।

—ঘুমুতে!

—হ্যাঁ।

—তুই কি ক্ষেপেছিস নাকি? ব'স।

—না। এ আসরে আমি গান গাই না। যে আসরে বাঁদর নাচে সে আসরে আমি নাচি না।

বেশ উচ্চকণ্ঠেই কথা হইতেছিল। নিতাই মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। দর্শকেরা অধিকাংশই

চিৎকার করিয়া উঠিল—এই, এই তুমি থাম।

চটিয়া উঠিল রাজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেয়া?

বসন্ত কোনও উত্তরই দিল না, কেবল একবার ঘাড় বাঁকাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে, একটা চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। চারিদিকে একটা রোল উঠিল, কেউ নিতাইয়ের উপর চটিয়া চীৎকার শুরু করিল, কেহ অর্থের চুক্তিতে আবদ্ধ ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার দুর্বিনীত স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন তুলিল। কিন্তু মেয়েটা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না; সম্মুখের মানুষটিকে বলিল—পথ দাও তো ভাই।

সে পথ ছাড়িয়া দিত কি দিত না কে জানে, কিন্তু সে কিছু করিবার পূর্বেই পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইল নিতাই। হাত জোড় করিয়া সে হাসিমুখে বিনয় করিয়া বলিল আমার দোষ হয়েছে। যেও না তুমি, ব'স। আমার মাথা খাও।

বসন্ত কথার উত্তর দিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসিল। গোলমাল একটু স্তিমিত হইতেই সে উঠিয়া গান ধরিল। গানখানির বাছাই করা গান। ভদ্রজনের আসরে যেখানে খেউর গাওয়া চলে না সেইখানে গাওয়ার জন্য তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে। গানখানি বসন্তের বড় প্রিয়; নাচের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। বাছিয়া তাই সে এইখানাই ধরিল—

ঝুম ঝুমাঝুম বাজেলো নাগরী;
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো।
তোরা আয় গো।
জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখি গাগরী
রজনী হইল ভোর;—আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুরায় গো।
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো।
ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম ঝুমাঝুম।

ঝুম ঝুমাঝুমের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কি ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও আছে। ছুরির ধারের মত উচ্চ সে-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততর তানে লয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মুহূর্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব। চারিদিক হইতে 'পেলা' পড়িতে আরম্ভ হইল—পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি, দুইটি আধুলি; দোকানী ঘনশ্যাম দত্ত একটা টাকাই ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটার সেদিকে লক্ষ্য করিবার বোধ হয় অবসর ছিল না, তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে, বুকখানা হাপরের মত হাঁপাইতেছে; গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ়া নিজে উঠিয়া পেলাগুলি কুড়াইয়া লইল।

চারিদিক হইতে রব উঠিল—আর একখানা, আর একখানা!

নিতাই বসন্তের দিকে চাহিল, চোখে চোখে মিলিতেই নমস্কার করিয়া সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

প্রৌঢ়া বসন্তের গায়ে হাত দিয়া বলিল—ওঠ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিল,—এ কি বসন, জ্বর যে আজ অনেকটা হয়েছে।

হাসিয়া বসন বলিল—একটুকুন মদ থাকে তো দাও।

সামান্য আড়াল দিয়া খানিকটা নির্জলা মদ গিলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রথমবারের মত গতি বা আবেগ কিছুই আনিতে পারিল না, সে হাঁপাইতেছিল, গতির মধ্যে ক্লান্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গান ধরিয়াও গাহিতে পারিল না ; দোহারেরা গাহিল। তেহাই পড়িতেই নাচ শেষ করিয়া সে শিথিল ক্লান্ত পদক্ষেপে আসর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না, যেন তাহাদের দাবি ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর দেনা-পাওনার ওজন-দাঁড়িতে তাহার দুইখানা গান ও নাচের ভার তাহাদের পেলার ভারকে তুচ্ছ করিয়া পাথরের ভারে মাটির বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পথের ধারে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া নিতাইকে বলিল—দেখ তো বাবা! আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে।

নিতাই বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া সে বসন্তর সন্ধান করিল। মনে মনে এই মেয়েটির কাছে সে হার মানিয়াছে। 'শিমূল' ফুল বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—অন্যায় নয়, অপরাধ। নূতন গানের কলি তাহার মনের মধ্যে গুনগুনানি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বসন্ত গেল কোথায়? ঝুমুর দলের বাসা তো এই বটগাছতলা। গাছতলাটায় একখানা চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে একটা পুরুষ-দলের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষটা। মহিষের মত প্রচণ্ড আকার, তেমনি কালো, রাঙা গোল চোখ ; বোবার মত নীরব ; তৃষ্ণার্ত মহিষ যেমন করিয়া জল খায়—তেমনি করিয়া মদ খায়, সারাদিন শুইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর হইতে পড়ে তাহার জাগরণের পালা। আগুন জ্বালিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া লোকটা জিনিসপত্র আগলাইতেছে। সেখানে নিতাই দেখিল বসন্ত নাই। সে জ্যোৎস্নালোকিত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। এ কি! তাহার বাসার দরজায় কয়জন লোক দাঁড়াইয়া কেন? সে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমরা।

নিতাই চিনিল, ব্যাপারী কাসেদ সেখের ছেলে—নয়ান ওরফে ননাইয়ের দল। সে প্রশ্ন করিল—কি? এখানে কি?

—মেয়েটা তোর বাসায় এসে ঢুকেছে।

—এসেছে তা—তোমরা দাঁড়িয়ে কেনে?

দলকে দল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—যাও তোমরা এখান থেকে। নইলে হাঙ্গামা হবে। আমি রাজাকে ডাকব, কনস্টেবল আছে—তাকে ডাকব। নয়ান সেখ নিতাইকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু রাজাকে গ্রাহ্য করে ; সে তবুও বলিল—শোন্ না, তোকে বকশিশ করব। নেতাই।

নিতাই একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু কোথায় বসন্ত? কোথাও তো নাই। কিন্তু ঘরের দরজার শিকল খোলা। দরজায় হাত দিয়া সে

দেখিল—হ্যাঁ, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

নিতাই ডাকিল—ওহে ভাই শুনছ? আমি—আমি।

—কে?

—তোমার 'কয়লা-মাণিক'।

—কে! ওস্তাদ?

–ওস্তাদ কি ফোস্তাদ যা বল তুমি।

এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। নিতাই ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—বসন্ত ততক্ষণে আবার শুইয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিছানাটা পাড়িয়া দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছে। বসন্তই বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

—বাইরের দরজা বন্ধ আছে।

পাঁচিল টপকে ঢুকরে ভাই—বন্ধ কর। বসন্ত ক্লান্ত অথচ বিচিত্র হাসি হাসিল। নিতাই তাহার কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল—এ কি? এ যে অনেকটা জ্বর।

—মাথাটা একটু টিপে দেবে?

হাসিয়া নিতাই মাথা টিপিতে বসিল। বসন্ত হাসিয়া বলিল—না, তুমি ফোস্তাদ নও, ভাল ওস্তাদ গানখানি কিন্তুক খাসা। তোমার বাঁধা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও গানটা বাতিল করে দিলাম।

—কেনে? চোখ বন্ধ করিয়াই বসন্ত প্রশ্ন করিল।

– ওটা আমার ভুল হয়েছিল।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

–আবার নতুন গান বাঁধছি। সে গুনগুন করিয়া আরম্ভ করিল –

"করিল কে ভুল, হায় রে।
মন-মাতানো বাসে ভ'রে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

বসন্তের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিল—তারপর?

তারপর এখনও হয় নাই।

–গানটি আমাকে নিকে দিয়ো।

—আমার গান তুমি নিকে নেবে? গাইবে?

হ্যাঁ।

জানালার দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—আজই শেষ করব।—কে? কে?

জানালার পাশ হইতে কে সরিয়া যাইতেছে? বসন্ত হাসিয়া বলিল—আবার কে। যত সব নবুকেদের দল।

নিতাই কিন্তু ওই কথা মানিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। সে যাহা দেখিয়াছে সে-ই জানে। হঁ, ওই যে দুধবরণ কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিয়াছে। মাথার কেবল স্বর্ণবিন্দুটি নাই। ঠাকুরঝি।

এগারো

জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতার মধ্যে দ্রুত চলন্ত কাশফুলটি যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। নিতাই কিন্তু স্তব্ধ হইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। চোখে তাহার অর্থহীন দৃষ্টি, মনের চিন্তা অসম্বদ্ধ অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে শারীরিক অনুভূতিতে কেবল একটি গভীর উদ্বেগ। সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল জ্যোৎস্নাময়তার মধ্যে ঠাকুরঝি হারাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সবই যেন হারাইয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া মুখরা স্বৈরিণী অসুস্থ দেহেও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতায় নিশাচর হিংস্র জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার মধ্যে পনেরো আনা তিন পয়সা, সেই অভিজ্ঞতার শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বসন্ত উঠিয়া বসিল। সে ভাবিল, যে দলটি বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারাই বোধ হয় দলপুষ্ট হইয়া নিঃশব্দ লোলুপতায় নখর দন্ত মেলিয়া বাড়ির চারপাশ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। উৎকণ্ঠিত হইয়া চাপা কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—কি ?

নিতাই তবুও উত্তর দিল না। সে যেমন স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরঝির রাগ তো সে জানে। খানিকটা গিয়াই সে দাঁড়ায়, পিছন ফিরিয়া তাকায়, ইঙ্গিতে বলে—আমায় ডাক, ডাকিলেই ফিরিব। আজ আর কিন্তু দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল ; এই রাত্রে একাই সে চলিয়া গেল। মধ্যরাত্রির নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যেও একটা ভয় আছে। সে ভয় সে করিল না।

বসন্ত এবার উঠিয়া আসিয়া নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াইল, জ্বরোত্তপ্ত হাতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল—কই ?

এতক্ষণে সচকিত হইয়া নিতাই ফিরিয়া চাহিল। রূপে গুণে ক্ষুরধার স্বৈরিণীর কৃশ মুখে, ডাগর দীপ্ত চোখে অপরিমেয় ক্লান্তি -গভীর উৎকণ্ঠা। নিতাই সে মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল না হইয়া পারিল না। সস্নেহে হাসিয়া সে বসন্তের কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—এত জ্বর, তুমি উঠে এলে কেনে ? চল শোবে চল। উঃ ! ধান দিলে যে খই হবে, এত তাপ।

—নচ্ছারগুলো ঘুরছে চারিদিকে ? ছুরি ছোরা নিয়ে জুটেছে ?

—নচ্ছারগুলো। নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। বসন্তের ভাবনার পথে যাহারা বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

এবারে বসন্তের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—খাপ হইতে ক্ষুরের ধার উঁকি মারিল, সে প্রশ্ন করিল—তবে ? কি ? কে গেল ? কি দেখছ তুমি ?

চকিতেই নিতাই এবার বসন্তের কল্পনার কথা বুঝিল, হাসিয়া সে বলিল—না, তারা নয়। ভয় নাই তোমার। এস, শোবে এস। সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

—কে যে গেল। কাকে দেখছিলে ? কে উঁকি মেরে গেল ?

—কে চিনতে পারলাম না।

—চিনতে পারলে না?

—না।

—তবে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে? যেন কত সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তোমার? বসন্তের শাণিত দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেও যেন জ্বলিতেছিল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না, শুষ্ক হাসিমুখে বসন্তের দিকে চাহিয়াই রহিল।

বসন্ত অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ দ্রুত হাসি। হাসিয়া বলিল—আ মরণ আমার। চোখের মাথা খাই আমি। যে উঁকি মারলে তার মাথায় যে ঘোমটা ছিল। ও । আমাকে দেখে—

আবার সেই খিলখিল হাসি।

নিতাইয়ের পা হইতে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বসন্ত হাসিতে হাসিতে ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। নিতাই ডাকিল—বসন। ও ভাই। বসন।

দুয়ারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—বসন নয় হে, কেয়াফুল, কেয়াফুল টেনো না, করাত-কাঁটার ধারে সর্বাঙ্গে ছ'ড়ে-ছিঁড়ে যাবে।

নিতাই তবুও বাহিরে আসিল।

স্বৈরিণী তখন কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

এ অবস্থায় নিতাই ডাকিতে গিয়াও পারিল না, লজ্জাবোধ হইল। আপনার দুয়ারটিতেই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিকে স্টেশনের ধারে ঝুমুরের আসরে গান হইতেছে। আলোর ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া এখানে ওখানে পড়িয়াছে। এদিকটা প্রায় জনহীন স্তব্ধ, পশ্চিম আকাশে চাঁদ অস্তে চলিয়াছে, পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্বৈরিণী মেয়েটার কিন্তু কোন লজ্জা নাই; খিলখিল হাসির মধ্যে কথা শেষ করিয়া ঘন অন্ধকারে কাসেদের ছেলে নয়ানের সঙ্গে ওই পূর্বদিকের গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই আকাশের দিকে তাকাইয়া একা দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে আবার তাহার মনে নতন গান গুনগুন করিয়া উঠিল। ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাই না খেলেন। এক ঘটে, মানুষ তাঁহার ছলনায় অন্য দেখে। ঠাকুরঝি বসন্তকে দেখিয়া চলিয়া গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিয়া চলিয়া গেল। সে গুনগুন করিয়া তাই লইয়াই গান বাঁধিতে বসিল।....

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন।"

ঘটনার মধ্যে সে যেন নিয়তির খেলা বা দৈবের অদ্ভুত পরিহাস দেখিতে পাইয়াছে আজ। ঠিক তাহার অচ্ছুৎ জন্মের মতই এ পরিহাস নিষ্ঠুর। সে তাই গানের মধ্যে হরিকে স্মরণ না করিয়া পারিল না।

ভোরবেলাতে রাজার হাঁক-ডাকে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ঘরে আসিয়া গান বাঁধিতে বাঁধিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চেতনা হইবামাত্র সেই অসমাপ্ত গানের কলিটাই প্রথমে গুঞ্জন করিয়া উঠিল তাহার মনে—

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হয়কে কর নয়—অঘটন কর সংঘটন।

রাজা হাঁকডাক শুরু করিয়াছে। সে হাঁকডাকের উচ্ছ্বাসটা যেন অতিরিক্ত। নিতাইয়ের মনে হইল হয়তো নূতন কোন অভিনন্দন লইয়া রাজন তাঁহার দুয়ারে আসিয়াছে—ধৈর্য তাহার আর ধরিতেছে না। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিমুখে সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা—তাহার পিছনে ঝুমুরের দলের প্রৌঢ়া। রাজা সটান ঘরের ভিতরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকৌতুকে কাহাকে যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি ?

—কাঁহা ? কাঁহা হ্যায় ওস্তাদিন ?

—ওস্তাদিন ?

হা-হা করিয়া হাসিয়া রাজা বলিল—সব ফাঁস হো গয়া ওস্তাদ, সব ফাঁস হো গয়া। কাল রাতমে—সে হা-হা করিয়াই সারা হইল। কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

নিতাই তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না।

বুঝাইয়া দিল প্রৌঢ়া। সে এতক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—আ মরণ। ও বসন্ত, বেরিয়ে আয় না লো, এই ট্রেনেই যাব যে আমরা।

নিতাই বলিল—সে তো এখানে নাই।

—নাই। সে কি ? সে আসর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে। আমি বলেও দিলাম তোমাকে। তারপর আমি খোঁজও করলাম ; শুনলাম, তোমার ঘরেই—

নিতাই বলিল—হ্যাঁ, কজন লোক বিরক্ত করছিল ব'লে আমার ঘরেই এসেছিল। আমি এসে দেখলাম শুয়ে আছে, গায়ে অনেকটা জ্বর। কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই চলে গেল।

প্রৌঢ়া চিন্তিত হইয়া উঠিল ঃ রাজার কৌতুক-হাস্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিতাই বলিল—কাদের সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে গিয়েছে। ওই ঝোপ মত বটগাছটার তলাতেই যেন কথা কইছিল। আসুন দেখি।

তাহারা আগাইয়া গেল।

সেখানেই তাহাকে পাওয়া গেল। সে হতচেতনের মত অসম্বৃত দেহে পড়িয়াছিল।

বিপুলপরিধি ছায়ানিবিড় বটগাছটির তলদেশটা ছায়ান্ধকারের জন্য তৃণহীন পরিষ্কার : সেখানেই মাটির উপর বসন্ত তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। কেশের রাশ বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি ভনভন করিয়া উড়িতেছে ; পাশেই পড়িয়া আছে একটা খালি বোতল, একটা উচ্ছিষ্ট পাতা। কাছে যাইতেই দেশী মদের তীব্র গন্ধ সকলের নাকে আসিয়া ঢুকিল।

প্রৌঢ়া বলিল—মরণ। এই করেই মরবে হারামজাদী। বসন ও বসন।

রাজা হাসিয়া বলিল—বহুত মাতোয়ারা হোগেয়া।

নিতাই দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এক কাপ

ধূমায়মান চা হাতে লইয়া। দুধ না দিয়া কাঁচা চা, তাহাতে একটু লেবুর রস। কাঁচা চায়ে নাকি মদের নেশা ছাড়ে। মহাদেব কবিয়ালকে সে কাঁচা চা খাইতে দেখিয়াছে। বসন্ত তখন উঠিয়া বসিয়াও ঢুলিতেছে অথবা টলিতেছে। প্রৌঢ়া বলিতেছে—এ আমি কি করি বল দেখি?

—এই চা-টা খাইয়ে দিন, এখুনি ছেড়ে যাবে নেশা।

চা খাইয়া সত্যই বসন্ত খানিকটা সুস্থ হইল। এতক্ষণে সে রাঙা ডাগর চোখ মেলিয়া চাহিল নিতাইয়ের দিকে।

প্রৌঢ়া তাড়া দিয়া বলিল—চল এইবার।

নিতাই বলিল—চান করিয়ে দিলে ভাল করতেন। সোরও হত, আর সর্বাঙ্গে ধুলো লেগেছে—

তাহার কথা ঢাকা পড়িয়া গেল বসন্তের মত্ত কণ্ঠের খিলখিল হাসিতে। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—মুছিয়ে দাও না নাগর, দেখি কেমন দরদ।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—হাসিয়া কাঁধের গামছাখানি লইয়া সযত্নে বসন্তের সর্বাঙ্গের ধুলা মুছাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার তা হ'লে।

প্রৌঢ়া তাহাকে ডাকিল—বাবা!

নিতাই ফিরিল।

—আমার কথাটার কি করলে বাবা? দলে আসবার কথা?

নিতাই কিছু বলিবার পূর্বেই নেশায় বিভোর মেয়েটা আবার আরম্ভ করিয়া দিল সেই হাসি। সে হাসি তাহার যেন আর থামিবে না।

বিরক্ত হইয়া প্রৌঢ়া বলিল—মরণ। কালামুখে এমন সর্বনেশে হাসি কেনে? দম ফেটে মরবি যে।

সেই হাসির মধ্যেই বসন্ত কোনরূপে বলিল—ওলো মাসী লো—কয়লা মাণিকেরও মনের মানুষ আছে লো। কাল রাতে--হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাজা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়েটাকে একটা ধমক দিয়া উঠিল—কেঁও এইসা ফ্যাক ফ্যাক করতা হ্যায়।

বসন্তর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

ওদিকে স্টেশনে ট্রেনের ঘন্টা পড়িল, স্টেশন-মাস্টার নিজে ঘন্টা দিতে দিতে হাঁকিতেছিল—রাজা। এই রাজা।

রাজা ছুটিল, নতুবা একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব ছিল না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার বাসার দিকে ফিরিল।

প্রৌঢ়া এবার কঠিন-স্বরে বলিল—বসন! আসবি, না এইখানে মাতলামি করবি?

বসন্ত ক্লান্তিতে শিথিল পদে চলিতে আরম্ভ করিল কিন্তু হাসি তাহার তখনো থামে

নাই।

সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইতে হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিল— চললাম হে।

*　　*　　*

নিতাই আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়।

ওদিকে তখন ট্রেনটা ছাড়িয়াছে।

ট্রেনটা স্টেশন হইতে ছাড়িয়া সশব্দে সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। কামরার পর কামরা। একটা কামরায় ঝুমুরের দলটাকে দেখা গেল। বসন্ত মেয়েটি একধারে দরজার পাশেই জানালায় মাথা রাখিয়া যেন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে।

অদ্ভুত মেয়ে। নিতাই হাসিল। ঝুমুর সে অনেক দেখিয়াছে। কবিগান করিতে ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী ক্ষুরধার মেয়ে সে দেখে নাই। ক্ষুরধার নয়, জ্বলন্ত। মেয়েটা যেন জ্বলিতেছে। তবে মেয়েটার গুণ আছে, রূপও আছে। আশ্চর্য মেয়ে। গতরাত্রের গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"করিল কে ভুল—হায় রে।
মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল
করিল কে ভুল। হায় রে।"

ট্রেনটা চলিয়া গেল। নিতাই বসিয়াই রহিল। চাহিয়া রহিল রেল-লাইনের বাঁকে যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানের দিকে। বসন্ত তো চলিয়া গেল, আর হয়তো কখনও দেখাই হইবে না। অদ্ভুত মেয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার এক একটি রূপ : এক রাত্রে উহাকে লইয়াই তিন তিনখানা গান মনে আসিয়াছে। সে খানিকটা উদাস হইয়া রহিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা সচেতনতা আসিয়া তাহাকে নাড়া দিল। ওইখানেই বাঁকের ওই বিন্দুটিতে একসময় একটি স্বর্ণবিন্দুটি ঝকমক করিয়া উঠিবে, তাহার পর দেখা যাইবে --ওই স্বর্ণবিন্দুটির নীচে চলন্ত একটি কাশফুল। স্বর্ণবিন্দু-বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটি মধ্যে মধ্যে এক একটি চকিত চমকে চোখে লাগিয়া চোখ ধাঁধিয়া দিবে। অসমাপ্ত গানগুলি তাহার অসমাপ্তই রহিল, পথের উপর স্থিরদৃষ্টি পাতিয়া নিতাই যেন প্রত্যাশা-বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল।

ঠাকুরঝি কখন আসিবে? কই, ঠাকুরঝি আসিতেছে কই?

ওই কি? না, ও তো নয়। নিতান্তই চোখের ভ্রম। মনের প্রত্যাশিত কল্পনা—এই দিকের আলোর মধ্যেও মরুভূমির মরীচিকার মত মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এখনি দেখা যায়, আবার মিলাইয়া যায়। নিতাই হাসিল। এই তো বেলা সবে দশটা। ঠাকুরঝি আসে ঘড়ির কাঁটাটির মত বারোটার ট্রেনটির ঠিক আগে।

তবু সে উঠিয়া গেল না। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘন্টাগুলো আজ যেন যাইতেই চাহিতেছে না।

ওই। হ্যাঁ, ওই আসিতেছে। চলন্ত সাদা একটি রেখার মাথায় স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। কিন্তু না, ও তো নয়, রেখাটির গতি-ভঙ্গি তো তেমন দ্রুত নয়, রেখাটিও তেমন সরল দীঘল নয়।

ওই আর একটি রেখা, এও নয়।

নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটবর্তী হইলে সেগুলি নারীমূর্তি হইয়াই উঠিল, মাথায় তাহাদের ঘটিও ছিল। তাহারাও এ গ্রামে দুধ লইয়া আসে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ঠাকুরঝি নয়। একে একে তাহারা সকলেই গেল কিন্তু ঠাকুরঝি কই? কই?

বেলা বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল।

রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ।

সচকিত হইয়া নিতাই হাসিয়া বলিল—রাজন।

—কেয়া ধ্যান করতা ভাই, হিঁয়া বইঠকে? নয়া কুছ গীত বানায়া—?

—না তো। অপ্রস্তুতের মত শুধু খানিকটা হাসিল।

—তুমারা উপর হাম গোসা করেগা।

—কেন রাজন, কেন? কি অপরাধ করলাম ভাই?

—ওহি ঝুমুরওয়ালী বোলা, তুমারা দিলকে আদমী, মনকে মানুষ-

নিতাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—চল, চা খেয়ে আসি। চা খাওয়া হয় নাই, ঠাকুরঝি আজ আসে নাই দুধ নিয়া। ঝুমুরওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ? হ্যাঁ, রাজন আছে আমার মনের মানুষ আমার মনের মানুষ তুমি রাজন, তুমি

—হাম? রাজা বিকট হাসিতে স্থানটি উচ্চকিত করিয়া দিল। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল চুম্ খাগা ওস্তাদ? আবার সেই বিকট হাসি। সে হাসির প্রতিধ্বনিতে আকাশ হাসিতে লাগিল, বাতাস হাসিতে লাগিল।

বারো

একদিন, দুইদিন, তিনদিন।

পর পর তিনদিন ঠাকুরঝি আসিল না। চতুর্থ দিনে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিতাই স্থির করিল, আজ ঠাকুরঝি না আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল, সেদিনও ঠাকুরঝি আসিল না। অন্যান্য মেয়েরা যাহারা দুধ দিতে আসে, তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গেল। নিতাইয়ের বার বার ইচ্ছা হইল—উহাদের কাছে সংবাদ লয়, কিন্তু তাহাও সে কিছুতেই পারিল না। কেমন সঙ্কোচ বোধ করিল। নিজেই সে আশ্চর্য হইয়া গেল—বার বার মনে হইল, কেন সঙ্কোচ, কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু তবু সে-সঙ্কোচ নিতাই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। চুপ করিয়া সে আপনার বাসায় আসিয়া ভাবিতে বসিল। কোন অজুহাতে ঠাকুরঝির শ্বশুরগ্রামে যাইলে হয় না? ভাবিয়া-

চিন্তিয়া সে ঠিক করিল—হাঁস, মুরগী অথবা ডিম কিনিবার অছিলায় যাইবে। ঠাকুরঝির শ্বশুরের হাঁস মুরগী আছে সে জানে। সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্যন্ত ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি সূচ গাঁথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে—চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া আসিতে পারে।

—ওস্তাদ রয়েছ নাকি? রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, রাজা বাংলায় বাত বলিতেছে। বিস্মিত হইয়া সে হিন্দিতে উত্তর দিল—রাজন, আও মহারাজ, কেয়া খবর?

রাজা আসিয়া খবর দিল—বিষণ্ণভাবে বাংলাতেই বলিল—খারাপ খবর ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হয়েছে ভাই।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, উৎকণ্ঠিত স্তব্ধ মুখে রাজার মুখের দিক চাহিয়া রহিল।

—আজ দিন তিনেক হ'ল, কি হয়েছে ভাই, ওই ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-মরদ সবারই সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করছে—মাথামুড় খুঁড়ছে। কাল রাত থেকে আবার মূর্ছা যাচ্ছে। দাঁত লাগছে, হাত-পা কাঠির মত করছে।

অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হইয়া উঠিল। রাজার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তুমি দেখতে যাবে না রাজন?

রাজা বলিল—বউ গেল দেখতে, ফিরে আসুক। আমি ও-বেলায় যাব।

—আমিও যাব।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল, মাথা নীচু করিয়া সে তাহা গোপন করিল।

রাজা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বড় ভাল মেয়ে ওস্তাদ। আবার কিছুক্ষণ পর রাজা বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির মরদটি যা কাঁদছে! হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলেমানুষ তো, সবে ভাব-সাবটি হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। বেচারা! রাজা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি খেলাচ্ছলে আঙুল দিয়া জলের চিহ্ন দুইটা বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল—রাজন।

—ওস্তাদ।

—ডাক্তার বদ্যি-কিছু দেখানো হয়েছে?

হতাশায় ঠোঁট দুইটা দুইপাশে টানিয়া রাজা বলিল—এতে আর ডাক্তার-বদ্যি কি করবে ওস্তাদ? এ তোমার নিঘ্যাত অপদেবতা, না হয় ডান ডাকিনী, কি কোন দুষ্ট লোকের কাজ।

কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরিল। চকিতে মনে হইল, তবে কি ওই ক্ষুরধার মেয়েটার কাজ। ঝুমুর দলের স্বৈরিণী—উহাদের তো অনেক বিদ্যা জানা আছে, বশীকরণে উহারা তো সিদ্ধহস্ত।

রাজা বলিল—মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বিত্তান্ত আজই জানা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—আও ভেইয়া, থোড়াসে চা পিয়েগা।

এতক্ষণে সে হিন্দী বলিল, অনেকক্ষণ পর রাজা যেন সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

*   *   *

রাজার বাড়িতেই নিতাই বসিয়া ছিল। রাজার স্ত্রী ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে গিয়াছে। এখনও ফেরে নাই। ভরন শেষ হইলেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে—সেই সংবাদের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া নিতাই বসিয়া রহিল। রাজা দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপের মধ্যেও রাজা। সে প্রচুর মুড়ি, বেগুনি, আলুর চপ, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ তাহার সঙ্গে কিছু সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

নিতাই বলিল—এ সব কি হবে? এ সমারোহ তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

—খানে তো হোগা ভেইয়া, পেট তো নেহি মানেগা জী। লাগাও খানা। তারপর সে চীৎকার আরম্ভ করিল—এ বাচ্চা। এ বেটা।

ডাকিতেছিল সে ছেলেটাকে। রাজার ছেলের ধরণটা অনেকটা সে আমলের যুবরাজের মতই বটে, দিনরাত্রিই সে মৃগয়ায় ব্যস্ত, একটা গুলতি হাতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। শালিক, চড়ুই, কোকিল, কাক—যাহা পায় তাহাই হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্যে হত্যা। খাওয়ার লোভ নাই। কখনও কখনও পাখীর বাচ্চা ধরিয়া পোষে এবং তাহার জন্য ফড়িং শিকার করিয়া বেড়ায়। যুবরাজ বোধ হয় আজ দূরে কোথাও গিয়া পড়িয়াছিল, সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা চটিয়া চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—এ শূয়ার কি বাচ্চা, হারামজাদোয়া—

তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা নিতাইকে বলিল—কিধর গিয়া ওস্তাদ। তারপর হাসিয়া বলিল—উ বাতঠো—কেয়া বোলতা তুম ওস্তাদ? কেয়া? —তেপান্তরকে মাঠকে উধরে—কেয়া? মায়াবিনী, না কেয়া?

এমন ধারার চীৎকারে সাড়া না পাইলে নিতাই বলে—যুবরাজ বোধ হয় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে মায়াবিনী ফড়িং কি পক্ষিণীর পেছনে ছুটেছে রাজন।

আজ কিন্তু নিতাইয়ের ও-কথাও ভাল লাগিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে একটু ম্লান হাসিল, সে কেবল রাজার মনরক্ষার জন্য।

রাজাও আর ছেলের খোঁজ করিল না, দুইটা পাত্র বাহির করিয়া আহার্য ভাগ করিয়া একটা নিতাইকে দিয়া, অপরটা নিজে টানিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল—যানে দেও ভেইয়া শূয়ার কি বাচ্চেকো। নসীবমে ভগবান উসকো নেহি দিয়া, হাম কেয়া করেগা?

নিতাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝির কথা। চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রং ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত পীতাভ রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। চারিপাশে দূরান্তরের শূন্যলোক যেন মৃদু কম্পনে কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হইল। তাহারই মধ্যে চারিদিকেই নিতাই

দেখিতে পাইল স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে—সব দিকেই। কোনদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই মনে হইল কম্পমান দূর দিগন্তের মধ্যে একটা স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দুলিতেছে, কাঁপিতেছে।

ক্ষুধার্ত গ্রাসে রাজা খাওয়া শেষ করিয়া বলিল—খা লেও ভাই ওস্তাদ।

ম্লান হাসিয়া নিতাই বলিল—না।

—দূর দূর ; খা লেও। পেটমে যানেসে গুণ করেগা। তবিয়ৎ ঠিক হো যায়েগা।

—তবিয়ৎ ভালই রাজন, কিন্তু মুখে রুচবে না।

—কাহে ? মুখমে কেয়া হুয়া ভাই ?

রাজার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নিতাই যেন অকস্মাৎ বলিল—রাজন, সেদিন তুমি আমাকে শুধিয়েছিলে আমার মনের মানুষের কথা।

—হাঁ। রাজা কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে ওস্তাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আমার মনের মানুষ। বলিতে বলিতে ঝরঝর করিয়া নিতাই কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজার খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কবিয়ালের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্য সময় হইলে সে হয়তো বিকট হাস্যে কথাটা এই মুহূর্তে পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিত, কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য তাহার বেদনাভারাক্রান্ত মন আজ তাহা পারিল না। স্তব্ধ হইয়া দুইজনেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রাজার স্ত্রী।

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত নিতাই প্রশ্ন করিতে গিয়া তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জিত শত প্রশ্নের মধ্যে হইতে কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করিল, কেবল একটি কথা—কি হ'ল ?

রাজার স্ত্রী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল—ডাইন, ডাকিন, রাক্ষস—

তারপর সে অশ্লীল কদর্য অশ্রাব্য বিশেষণে নিতাইকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এবং নিতাইয়ের মুখের উপর আঙুল দেখাইয়া বলিল—তুই, তুই, তুই। তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা। এত লোভ তোর ? তোর মনে এত পাপ ?

অজস্র ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত ও অশ্রাব্য গালিগালাজের মধ্য হইতে বিবরণটা জানা গেল। আজ ঠাকুরঝিকে কালী মায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী! ভূত পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, পিশাচ, যে মন্দ করেছে মা তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে! তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল্ বল্ ? কে তোকে এমন করলে বল্ ? দোহাই মা কালীর।

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন

কাঁপিতেছিল তেমনি কাঁপিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে দুর্বোধ্য অনুস্বারবহুল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের, বলিয়াছে—ওস্তাদ, কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—

"কালো চুলে রাঙা কোসম হেরেছি কি নয়নে?"

রাজার স্ত্রী মনে পড়িয়াছিল—নিতাইয়ের বাসার জানালা দিয়ে দেখা ছবি—নিতাই ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল। সে কথাটা সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

বাকীটা ঠাকুরঝিকে আর বলিতে হয় নাই। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এখানে আসিয়া নিতাইকে গালিগালাজে—শরবিদ্ধ ভীষ্মের মত জর্জরিত করিয়া তুলিল।

অন্যদিন হইলে রাজা স্ত্রীর চুলের মুঠা ধরিয়া কণ্ঠির প্রহারে মুখ বন্ধ করিত। আজ কিন্তু সেও পঙ্গু হইয়া গেল। নিতাই মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। গালিগালাজ অভিসম্পাত বিশেষ করিয়া ঠাকুরঝি যাহা বলিয়াছে সেই কথা শুনিয়া—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পর ট্রেনের ঘন্টার শব্দে রাজা সচেতন হইয়া উঠিল। তাহাকেও সচেতন করিয়া দিল। ট্রেনের ঘন্টা পড়িয়াছে। তিনটার ট্রেন। রাজা স্টেশনে যাইবে, সে নিতাইকে ডাকিল। উঠো ভাই ওস্তাদ, কি করবে বল? হম ইষ্টিশনমে যাতা হ্যায়। নিতাই উঠিয়া আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। উদাসীন স্তব্ধ নিতাই ভাবিতেছিল, পথের কথা। কোন পথে গেলে সে এ লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কোন পথে চলে গেলে জীবনে শান্তি পাইবে সে?

ঠিক এই মুহূর্তেই একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে ই যে ওস্তাদ।

নিতাই নিতান্ত উদাসীন মতই তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্তে তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—তুমি?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ আমি। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ। বড় দায়ে পড়ে এসেছি ভাই। বসন পাঠালে।

—বসন?

—সেই ঝুমুর দলের বসন।

লোকটি সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার।

আরও ঘন্টা কয়েক পর।

হেমন্তের ধূসর সন্ধ্যা; সন্ধ্যার ম্লান রক্তাভ আলোর সঙ্গে পল্লীর ধোঁয়া ও ধূলার ধূসরতায় চারিদিক যেন একটা আচ্ছন্নতায় ঢাকা পড়িয়াছে। ওদিকে সন্ধ্যার ট্রেনখানা আসিতেছে।

পশ্চিমদিক হইতে পূর্বমুখে। যাইবে কাটোয়া। সিগন্যাল্ ডাউন করিয়া রাজা লাইনের পয়েন্টে নীল বাতি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল নিতাই।

—রাজন।

রাজা ফিরিয়া দেখিল—নিতাই। তাহার পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গায়ে জামা, গলায় চাদর, বগলে একটি পুঁটলি। রাজা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ ?

পাঁচটা টাকা তাহার হাতে দিয়া নিতাই বলিল—দুধের দাম, ঠাকুরঝিকে দিও।

রাজা ফিস্ ফিস্ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—ঠাকুরঝিকা জাত মে জাত দেগা ওস্তাদ ?

নিতাই বিস্মিত হইয়া রাজার দিকে চাহিল।

—ঠাকুরঝিকে সাদী হাম বাতিল কর দেগা। তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা। 'সাগাই' দে দেগা।

নিতাই মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া কেবল একটি কথা বলিল—ছি !

—ছি কাহে ?

—মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন ? ছি।

রাজা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—তুমি বিশ্বাস কর রাজন, আমি কবিগান করি, কিন্তু মন্ততন্ত কিছু জানি না, কিছু করি নাই। তবে হ্যাঁ, টান—একটা ভালবাসা হয়েছিল। তা বলে ঠাকুরঝিকে নষ্টও আমি করি নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া বাঁকের মুখে ট্রেনের সার্চ-লাইট জ্বলিয়া উঠিল। ট্রেনটা ওদিক হইতে স্টেশনে ঢুকিতেছে। নিতাই দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে চলিল। এতক্ষণে এই সার্চ লাইটের আলোতে নিতাইয়ের বেশভূষা ও বগলের পুঁটলি যেন রাজার চোখে খোঁচা দিয়া বুঝাইয়া দিল নিতাই কোথাও চলিয়াছে। এতক্ষণ কথাটা তাহার মনে হয় নাই। এবার সে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ ?

ওদিকে ট্রেনটা সশব্দে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় নিতাই কিছু বলিল কিনা রাজা বুঝিতে পারিল না। ট্রেনখানা স্টেশনে প্রবেশ করিলে পয়েন্ট ছাড়িয়া রাজা ছুটিয়া প্ল্যাটফর্মে আসিল।

—ওস্তাদ !—ওস্তাদ !

তখন নিতাই গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে। গাড়ির কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া নিতাই উত্তর দিল—রাজন !

উৎকণ্ঠিত রাজন প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ভাই ?

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—বায়না এসেছে ভাই। আলেপুরের মেলায়।

আলেপুরে-মহাসমারোহে নূতন মেলা হইতেছে। কিন্তু বায়না কখন আসিল ? রাজার মনে চকিতে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ঠাকুরঝির দুধের দাম পাঁচ টাকা মিটাইয়া

দিয়া সে বায়না লইয়া কবিগান করিতে চলিয়াছে। মিথ্যা কথা। সে বলিল—ঝুট বাত।

—না রাজন। এই দেখ, লোক।

রাজা দেখিল, সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার। দলনেত্রী প্রৌঢ়া মেলায় গিয়াছে, সেখান হইতে নিতাইয়ের কাছে লোক পাঠাইয়াছে। তাহাদের দলের কবিয়াল পলাইয়া গিয়াছে। বসন ঝগড়া করিয়া তাহাকে লাথি মারিয়াছে।

নিতাই বলিল—আলেপুর, আলেপুর থেকে কান্দরা, কান্দরা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে—

ট্রেনের বাঁশী তাহার কথাটাকে ঢাকিয়া দিল।

বাঁশী থামিল, ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। রাজা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্রশ্ন করিল অগ্রদ্বীপসে কাঁহা ? দুনিয়া ভোর কি তুমারা বায়না আয়া হ্যায় ? উতার আও ওস্তাদ, উতার আও। রাজার কণ্ঠের আর্ত মিনতি মুহূর্তের জন্য নিতাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিল। মনে মনে বলিল—হ্যাঁ, দুনিয়া ভোর বায়না আয়া হ্যায় রাজন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

তেরো

ট্রেনখানা পূর্ব মুখের বাঁকটা ঘুরিয়া ফিরিল দক্ষিণমুখে। এ সেই বাঁকটা যেখানে ঠাকুরঝি আসিলে তাহার মাথায় ঘটিটি রোদের ছটায় ঝিকমিক করিয়া উঠিত। গাড়ীখানা দক্ষিণমুখে চলিতেছে। এবার বাঁ পাশে পড়িল পূর্বদিগন্ত। পূর্বদিগন্তে তখন শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল। আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে। নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়া রহিল। ছোট লাইনের ট্রেনগুলি বড় বেশী দোলে, আর শব্দও করে বড় লাইনের ট্রেনের চেয়ে অনেক বেশী—শূন্য কুম্ভের মত। যে লোকটি নিতাইকে লইতে আসিয়াছিল, সে ঝুমুর দলের বেহালাদার। কিন্তু বাজনাও সে জানে। সে বেশ খানিকটা নেশার আমেজে ছিল, ট্রেনের এই অত্যধিক শব্দে এবং ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল—এ যে ঝাঁপতাল লাগিয়ে দিল ওস্তাদ। এবং ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া বেঞ্চ বাজাইয়া বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখাদেখি ওপাশের বেঞ্চে দুইটা ছোট ছেলে ট্রেনের শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার আরম্ভ করিল। একজন বলিল—কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল। কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল।

নিতাইয়ের মন কিন্তু কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। চাঁদের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ঠাকুরঝির কথা, রাজনের কথা, যুবরাজের কথা, বণিক মাতুলের কথা, বিপ্রপদর কথা, কৃষ্ণচূড়া গাছটির কথা, স্টেশনটির কথা, গ্রামখানির কথা। মধ্যে মধ্যে

ইচ্ছা হইতেছিল—পরের স্টেশনেই সে নামিয়া পড়িবে।

স্টেশন পার হইয়া গেল, কিন্তু সে নামিতে পারিল না। হঠাৎ একসময়ে সে অনুভব করিল—নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোখ কখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে কাঁদিতেছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি ম্লান হাসিয়া এতক্ষণে সে সচেতন হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সুকণ্ঠে সে গান ধরিল—আহা! বার দুই-তিন তা-না-না করিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখব খালি;
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ, তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

বাজনদারটা নেশার মধ্যেও সজাগ হইয়া বসিয়া বলিল—বাহবা ওস্তাদ। গলাখানা পেয়েছিল বটে বাবা। বলিয়াই সে ধরতার মুখে বেগে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—হেঁই—তা—তেরে কেটে—তা—তা!

গাহিতে গিয়া নিতাই পরের কলি বদলাইয়া দিল। মন যেন গানে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুরে ফেলিলেই সে গান হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—

"না না, তাও করো মার্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।"

স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিয়াছিল। নিতাই গানখানা বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে। গাহিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ট্রেনটা খট্ খট্ শব্দে লাইনের জোড়ের মুখ অতিক্রম করিয়া একটা স্টেশনে আসিয়া ঢুকিল। স্টেশনের জমাদার হাঁকিতেছে—কান্দরা, রামজীবন—পু—র। বাজনদার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্টেশনটার চেহারা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওই, এরই মধ্যে চলে আইচে লাগচে। নামো—নামো—ওস্তাদ নামো।

নিতাই নামিল, কিন্তু গান বন্ধ করিল না। গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতেই সে স্টেশন পার হইয়া পথে নামিল।

"তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে,
কাকের মুখে বাত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।"

স্টেশন হইতে মাইল দুয়েক হাঁটা-পথে চলিয়া নিতাইয়ের মনের অবসাদ অনেকখানি কাটিয়া আসিল। রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। ইহার পূর্বেই নিতাই দেখিবার জন্য এ মেলায় আসিয়াছে। কেবল আলো—আলো আর আলো। সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্যসম্ভার-ভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর—যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক। এমনই একটি আসরে আজ তাহাকে গান করিতে হইবে। কবি ও ঝুমুর দল এক হইয়া অপর একটি এমনিই দলের সহিত পাল্লা দিয়া গান করিবে। সঙ্গের লোকটি বলিয়াছে, তাহাকেই মুখপাত—অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে গান করিতে হইবে। তাহাদের যে

লোকটি এমন আসরের গান করিত, সে লোকটা বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া অন্যদলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গলাও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, লোকটাও ছিল দুর্দান্ত মাতাল, গান বাঁধিবার ক্ষমতাও তাহার আর তেমন ছিল না। গতকাল একটা গানের সুরতাল লইয়া বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছিল। দুইজনেই ছিল মত্তাবস্থায়। শেষ পর্যন্ত লোকটা বসন্তকে অশ্লীল গাল দেওয়ায় বসন্ত তাহার পিঠে লাথি বসাইয়া দিয়াছিল। ফলে লোকটা তাহার প্রণয়িনী মেয়েটাকে লইয়া অন্য দলে চলিয়া গিয়াছে। কবিয়াল এবং ভালো গানেওয়ালা না হইলে মেলায় চলিবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রৌঢ়া নিতাইকে স্মরণ করিয়াছে। মানসম্মানের সমস্ত ভরসা এখন নিতাইয়ের উপর। সেইজন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়া ঝুমুর দলের নেত্রী প্রৌঢ়া তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে।

মনে মনে একটা খুব ভাল ধুয়া রচনা করিতে করিতে নিতাই পথ চলিতেছিল—মনটা ছিল মনে নিবদ্ধ, দৃষ্টি ছিল আকাশে নিবদ্ধ, ওই আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে। ঠাকুরঝি, রাজন, যোবরাজ, কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের দেহের পিছনে দীর্ঘ ছায়ার অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সে যত সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের ছায়া দৈর্ঘ্যে পরিধিতে তত বড় এবং ঘন হইয়া উঠিতেছে—সেই ক্রমবর্ধমান ছায়ার অন্ধকারে পিছনটা ক্রমশ যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনকে টানিতেছে মেলার আসর। ঠাকুরঝির চিন্তা, সেখানকার সকলের চিন্তাকে দুঃখকে ছাপাইয়া মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সে কবিয়াল হইয়া আসরে নামিবে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে এক আর এ এক। আজ সে সত্যই কবিয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া মেলার গাওনা করিতে চলিয়াছে। এমন ভাগ্য যে তাহার কখনও হইবে সে ভাবে নাই।

সে গাহিবে বসন্ত নাচিবে। অপর মেয়েগুলিকে সে নাচিতে দিবে না। আসরে বসিয়া তাহারা দোয়ারকি করিবে। এই সব কল্পনা করিতে করিতে তাহার মনে একটা কলিও আসিয়া গেল :

"ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে—
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—
ওহে কুটিল কালা।"

সঙ্গে সঙ্গে সুর ফেলিয়া সে গুন গুন করিয়া গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অপর দলের কবিয়াল নাকি বেজায় রঙদার লোক, গোড়া হইতেই সে রঙ তামাশা আরম্ভ করিয়া দেয়। রঙের জোরেই সে আসর জিতিয়া লয়। নিতাই কিছুতেই প্রথম হইতে রং আরম্ভ করিবে না। মানুষ কেবল মদই ভালবাসে, দুধে তাহার অরুচি—এ-কথা সে বিশ্বাস করে না। যদি অরুচি দেখে তবে মদই সে দিবে। দেখাই যাক না।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খাইয়া নিতাইকে দাঁড়াইতে হইল। মেলার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের জনতা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবিয়ালির চিন্তায়

বিভোর হইয়াই নিতাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, হঠাৎ বাঁকের মুখে লোকটার সহিত ধাক্কা বেশ একটু জোরেই লাগিয়া গেল। লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কানা নাকি ? একেবারে হন্যে হয়ে ছুটেছে।

নিতাই অবনত হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—তা অন্যায় হয়ে গিয়েছে ভাই।

লোকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল—অঃ, একেবারে ঠাঁই করে লেগেছে—

নিতাই বলিল—তবে দোষ একা আমার নয়, বেবেচনা ক'রে দেখুন।

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকার মোড়টা ফিরিয়াই মেলা। সারা মেলাটার বিভিন্ন পটি অতিক্রম করিয়া তাহারা মেলার বিপরীত প্রান্তে আসিয়া পড়িল। এখানে আলোকের সমারোহটা কম, কিন্তু লোকের ভিড় বেশী। মেলার এই প্রান্তে একটা গাছের তলায় খড়ের ছোট ছোট খান-কয় ঘর বাঁধিয়া ঝুমুরের দলটি আস্তানা গাড়িয়াছে। আশেপাশে এমনি আরও গোটাকয়েক ঝুমুরের দলের আস্তানা। একপাশে খানিকটা দরে জুয়ার আসর। তাহারই পর চতুস্কোণ আকারের একটা খোলা জায়গায় সারি সারি খড়ের ঘর বাঁধিয়া বেশ্যাপল্লী বসিয়া গিয়াছে। সে যেন একটা বিরাট মধুচক্রে অবিরাম গুঞ্জন উঠিতেছে।

মধ্যে মধ্যে নেশায় উন্মত্ত জনতা উচ্ছৃংখল কোলাহলে ফাটিয়া পড়িতেছে। তেমনি একটা কোলাহলে নিতাইয়ের গানের কলি দুইটা গোলমাল হইয়া গেল।

বসন্তদের ঝুমুরদলের আস্তানায় ঘরগুলার সামনে গাছতলায় চ্যাটাই পাতিয়া লণ্ঠনের আলোয় প্রৌঢ়া সুপরি কাটিতেছিল—জন দুইয়েক রান্নায় ব্যস্ত ছিল। একটা খড়ের কুঠুরীতে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, মেয়েপুরুষের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরখানা উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে নিতাই চিনিল—বসন্তের হাসি ; এমন ধারালো খিল খিল হাসি বসন্ত ভিন্ন কেহ হাসিতে পারে না, অন্তত ঝুমুর দলের কোন মেয়ে পারে না।

নিতাইকে দেখিয়াই প্রৌঢ়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এস, এস, বাবা এস। আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

রন্ধনরতা মেয়ে দুইটি রান্না ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল এসে গিয়েছ—লাগছে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—এলাম বৈকি।

প্রৌঢ়া বলিল—ওলো, বাবাকে আমার চা ক'রে দে। মুখে হাতে জল দাও বাবা।

একটি মেয়ে বলিল—খুব ভাল করে গান করতে হবে কিন্তুক।

অন্য মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া আলোকোজ্জ্বল কুঠুরীটার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—ওলো বসন, কবিয়াল আইচে লো। তোর কালো-মাণিক।

নিতাই হাসিয়া সংশোধন করিয়া দিল—কালো-মাণিক নয়, কয়লা-মাণিক।

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার পা টলিতেছে, ডাগর চোখের পাতা ভারী হইয়া নামিয়া আসিতে চাহিতেছে, নাকের ডগায় চিবুকে কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে। সে আসিয়া দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—না, তুমি আমার কালো-মাণিক। আমার মান রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ—তুমি

আমার কালো-মাণিক।

নেশার প্রভাবে বসন্তর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খানিকটা আবেগময় হইয়াছিল—কিন্তু সে আবেগ, শেষ কথা কয়টি বলিবার সময় যেন অনেক গুণে বাড়িয়া গেল।

প্রৌঢ়া রহস্য করিয়া বলিল—তা ব'লে যেন কাঁদতে বসিস না বসন, নেশার ঘোরে।

নেশায় অর্ধনিমীলিত চোখ দুইটি আবার বিস্ফারিত করিয়া বসন এবার খানিকক্ষণ প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ কাঁদব, কালো-মাণিকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দোব। এমন যত্ন ক'রে কে চা ক'রে দেয়—কে গায়ের ধুলো মুছিয়ে দেয়? আজ সারারাত কাঁদব—। বলিতে বলিতেই সে আপনার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—এই নাগরেরা, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা।

প্রৌঢ়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বসন্তর হাত ধরিয়া বলিল—এই বসন! বসন! ছি! করছিস কি? খদ্দের লক্ষ্মী তাড়িয়ে দিতে নাই।

বসন প্রৌঢ়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—তা বলে আমি কাঁদতেও পাব না মাসী, আমি কাঁদতেও পাব না?

নিতাই উঠিয়া আসিয়া বলিল—না কাঁদবে কেনে? ছি!

তবে তুমিও এস। তুমি গান করবে আমি নাচব।

—আচ্ছা, আর। প্রৌঢ়া বলিল—যাবে। এই এল, চা খেয়ে জিরুক খানিক, তারপর যাবে; তু চল ততক্ষণ।

চা খাবে না, চা খাবে কি! চা খাবে কেনে? আমার ওস্তাদ আগে মদ খাবে। এস। বসন্ত নিতাইয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিতাই হাত টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড়।

না।

—মদ আমি খাই না।

খেতে হবে তোমাকে। আমি খাইয়ে দোব।

—না।

বসন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ খেতে হবে তোমাকে।

প্রৌঢ়া বলিল মাতলামি করিস না বসন, ছাড়, ঘরে যা।

তেমনি বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিয়া বসন নিতাইকে বলিল—যাবে না তুমি? মদ খাবে না?

-না।

—আমার কথা তুমি রাখবে না?

—এ কথাটি রাখতে পারব না ভাই।

বসন্ত নিতাইকে ছাড়িয়া দিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—বন্ধ কর দেও দরজা।

প্রৌঢ়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—মেয়েটা ওই মদ খেয়েই নিজের সর্বনাশ করলে। এত মদ খেলে কি শরীর থাকে।

নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যে মেয়েটি চা করিতে গিয়াছিল, সে একটা কলাই-করা গ্লাসে চা আনিয়া বলিল—লাও, চা খাও ওস্তাদ।

হাসিয়া নিতাই চায়ের গ্লাসটি লইয়া বলিল—নক্ষ্মী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই।

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—বাঃ, বেশ হয়েছে। নির্মলা, তু ওস্তাদকে দাদা বলে ডাকবি। ভাইদ্বিতীয়েতে ফোঁটা দিবি ওস্তাদকে, কিন্তুক কাপড় লাগবে।

নিতাই পরম প্রীতি হইয়া বলিল—নিশ্চয়।

অপর মেয়েটি রান্নাশাল হইতেই বলিল—তা হলে আমি কিন্তুক ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতালুম।

প্রৌঢ়া খুশী হইয়া সায় দিয়া বলিল—বেশ বলেছিস ললিতে, বেশ বলেছিস। বসন তোকে দিদি বলবে।

নিতাইয়ের হাত হইতে চায়ের গ্লাসটা খসিয়া পড়িয়া গেল—ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি।

* * *

রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য। নিতাইয়ের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে। সে দিকটা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইয়ের যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক। সভ্যসমাজের আবর্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও আবিষ্কৃত চির-অন্ধকার—মেরুলোকের মত চির-অন্ধকার। এ ধরনের বীভৎসতার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকা নয়। তবুও এমন করিয়া প্রত্যক্ষ মুখোমুখি হইয়া সে কখনও দাঁড়ায় নাই। সে হাঁপাইয়া উঠিল।

নির্মলা এবং ললিতার ঘরেও আগন্তুক আসিয়াছে। মত্ত জড়িত কণ্ঠের অশ্লীল হাস্যপরিহাস চলিতেছে।

বসন্তের ঘর হইতে সে লোক দুইটা চলিয়া গিয়াছে, আবার নূতন আগন্তুক আসিয়াছে।

প্রৌঢ়া দলের পুরুষগুলিকে লইয়া মদ খাইতে বসিয়াছে। নিতাইকে আবার একবার চা দেওয়া হইয়াছে। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝিকে। ইচ্ছা হইতেছিল- এখনই এখান হইতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সে পলাইয়া যায়। কলঙ্ক তো তাহার হইয়াই গিয়াছে, সে কলঙ্কের ছাপ ঠাকুরঝির অঙ্গেও লাগিয়াছে। হয়তো তাহার স্বামী এজন্য তাহাকে পরিত্যাগই করিবে—বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। দশের ভয়ে তার বাপও হয়তো তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। আজ তাহার সব লজ্জা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘর ভাঙিতে আর বাকী নাই। ভাঙিয়াই গিয়াছে। তার আর ভয় কেন? আজ তো নিতাই গিয়া ঠাকুরঝির হাত ধরিয়া বলিতে পারে—"এস, আজ হইতে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি।" নিতাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—চলিয়াই সে যাইবে, ইহাদের এই মেলার গানের আসর সারিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু গ্রামে নয়, অন্য যেখানে হোক—এত বড় দুনিয়ায় যেদিকে মন চায় সেই দিকে চলিয়া যাইবে। মুহূর্তে পূর্বের চিন্তা

কল্পনা সব তাহার পাল্টাইয়া গিয়াছে—না না, সে হয় না। ঠাকুরঝির ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিবে, তাহার সুখের সংসার আবার সুখে ভরিয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি তাহাকে ভুলিয়া যাক। না দেখিলেই ভুলিয়া যাইবে। সন্তানসন্ততিতে তাহার কোল ভরিয়া উঠুক, সুখে সম্পদে সংসার উথলিয়া পড়ুক, স্বামী সন্তান সংসার লইয়া সে সুখী হোক।

চৌদ্দ

বিগত রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র চোখেই সে যাপন করিয়াছিল। কিছুতেই ঘুম আসে নাই। ভোরে উঠিয়াই সে ঝুমুর দলের আস্তানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারিপাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমায় রাসোৎসব মেলা, দীঘির পূর্ব দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া; মুখ হাত ধুইয়া নিতাই সেই রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গিয়া বসিল। রাসমঞ্চে অষ্টসখীপরিবৃতা রাধাগোবিন্দকে তাহার বড় ভাল লাগিল সেখানেই বসিয়া সে গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধাকৃষ্ণের যুগল-রূপের স্তবগান। প্রথমে গুন গুন করিয়া গানখানির রচনা শেষ করিয়া—বেশ গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। মিষ্ট গলার গানে বেশ কয়েকজন লোকও জমিয়া গেল। আখড়ার মোহন্তও বাহির হইয়া আসিলেন।

নিতাই গাহিতেছিল

"আশ মিটায়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী।"

মোহন্ত চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে দিতে একজনকে বলিলেন—খোল আন তো বাবা।

মোহন্ত খোল লইয়া নিজেই সঙ্গত আরম্ভ করিয়া দিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন তোমার কণ্ঠটি বড় তো ভাল। পদাবলী জান বাবা?

নিতাই পদাবলী কথাটা বুঝিল না। বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

—মহাজন পদাবলী বাবা—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের পদ?

নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু, অধীনের অধম নীচ কুলে জন্ম। এ সব কি করে জানব বাবা?

হাসিয়া মোহন্ত বলিলেন—জন্ম তো বড় নয় বাবা, কর্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।

মুহূর্তে নিতাইয়ের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল—কর্মও যে অতি হীন প্রভু; ঝুমুর দলে—বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি।

—কবিগান কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

—যে গান তুমি গাইলে, সে কি তোমার গান?

মাথা নত করিয়া সলজ্জ হইয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহন্ত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—ভাল ভাল। চমৎকার গান। তারপর বলিলে—কর্ম তোমার'তো অতি উচ্চ কর্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি। যাঁরা কবি, তাঁরাই তো সংসারের মহাজন, তাঁরাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন।

টপ্ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—কিন্তু সঙ্গ যে অতি নীচ সঙ্গ বাবা, বেশ্যা—

মোহন্ত হাসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিতাইকে বাধা দিলেন, বলিলেন—প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নেই বাবা। নিজে, পরে নয়—নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা? সূর্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী?

নিতাই বিল্বমঙ্গলের কাহিনী জানিত। গ্রামের বাবুদের থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল পালা শেষ দেখিয়াছে। সে বলিল—হ্যাঁ। কাহিনীটা সব তাহার মনে পড়িয়া গেল।

মোহন্ত সস্নেহে বলিলেন—তবে?

নিতাই ফিরিয়া আসিল—অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গান-বাজনায় নাচে সুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া কবিয়াল নিতাই বাহিরে তাহাদের খাতির করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণাই সঞ্চিত ছিল। আজ এই মুহূর্তে সেটুকুও যেন মুছিয়া গেল। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কাপড়ের খুঁটে সে চোখ মুছিল আর মনে মনে বাবাজীকে প্রণাম করিল। মনে মনে সংকল্প করিল, গোবিন্দের প্রসাদের সঙ্গে সে বাবাজীর প্রসাদকণাও চাহিয়া লইবে।

ঝুমুর দলের আস্তানায় আসিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এও বুঝি গোবিন্দের কৃপা।

আশ্চর্য। আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গত রাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নাই। সমস্ত স্থানটা গোবরমাটি দিয়া অতি পরিপাটীরূপে নিকাইয়া ফেলা হইয়াছে। গাছতলায় একটি কলার পাতায় অনেকগুলি ফুল। মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছে; সকলের পরনেই লালপাড় শাড়ী—একটি নিবিড় এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্বত্র পরিস্ফুট।

বসন্ত পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, নির্মলা ও ললিতা বসিয়া ছিল এইদিকে মুখ ফিরাইয়া। তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বেশ মানুষ যা হোক তুমি। এই এত বেলা পর্যন্ত কোথা ছিলে বল দেখি?

বসন্ত মুখ ফিরিয়া চাহিল। নিতাই মৃদু হাসিল। বসন্ত মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরক্ষণেই সে উঠিয়া রান্নাশালে চলিয়া গেল। নিতাই আসিয়া নির্মলা ও ললিতার কাছে বসিয়া

বলিল—বাঃ, ভারি ভাল লাগছে কিন্তুক ; চারিদিক নিকানো, তোমরা সব চান করেছ, লালপেড়ে কাপড় পরেছ—

হাসিয়া নির্মলা বলিল—আজ যে লক্ষ্মীপুজো গো দাদা।

—লক্ষ্মীপুজো ?

—হ্যাঁ। পূর্ণিমে, বেরস্পতিবার, আমাদের বারোমেসে লক্ষ্মীপুজো আজ।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। এতদিন মেলামেশা করিয়াও এ কথাটা সে জানিত না। ইহাদেরও ধর্মকর্ম আছে। সে প্রশ্ন করিল—কখন হবে লক্ষ্মীপুজো ?

—সেই সন্ধ্যেবেলায়। আজ তোমার পালা আরম্ভ হতে সেই ল'টার আগে লয়।

প্রৌঢ়া বলিল—বাবা আমার ভক্তিমান লোক। ভাল লোক।

ললিতা বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—লোক ভাল, কিন্তুক পাল্লা মোগলের। খানা—

প্রৌঢ়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।

বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি গ্লাস। গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—লাও।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি ?

মুখ মচকাইয়া বসন বলিল—মদ লয়, ধর।

নিতাই গ্লাসটি লইয়া দেখিল সদ্য প্রস্তুত ধূমায়িত চা।

ললিতা হাসিয়া বলিল—বুঝে-সুঝে খেও ভাই জামাই ; বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে।

বসন্ত চলিয়া যাইতেছিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আগুন পোড়ারমুখে।

নিতাই হাসিয়া কথাটা নিজের গায়ে লইয়া বলিল—তাই দাও ভাই, কয়লার ময়লা ছুটে যাক। আগুনের পারা বরণ হোক আমার। জান তো ?

"আগুনের পরশ পেলে কালো কয়লা রাঙা বরণ।"

ললিতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—যাও কেনে, আগুনের শীষ তো জ্বলছেই, গায়ে গায়ে পরশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এস।

বসন্তের চোখে ছুরির ধার খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে সে হাসি[illegible] বলিল—মদ জ্বলে দেখেছিস ? বলিয়া নিজের দেহখানা দেখাইয়া সে বলিল—এ হ'ল ম[illegible] আগুন। বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রির কথা ; সে হাসিল।

ইহার মধ্যেই নিতাই বসন্তের হইয়া গিয়াছে। বসন্ত জানিয়াছে নিতাই তাহার।

মেয়েদের সেদিন সমস্ত দিন উপবাস। সে উপবাস তাহারা নিষ্ঠার স[illegible] পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ও ফুল, ধূপ, দীপ নানা আয়োজনে পরম ভক্তির সহিত তাহারা লক্ষ্মীপূজা করিল। পূজাশেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক-একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল। নিতাই সদরেই বসিয়া ছিল। অ[illegible] পুরুষগুলি দূরে মদ্যপান করিতে বসিয়াছে। মদ খাইতে খাইতেই তাহারা রাত্রির আসরের জন্য সাজসজ্জা করিতেছে। বেহালাদার বেহালার পরিচর্যায় ব্যস্ত ; বার্নিশের শিশি, তার, রজন লইয়া বসিয়াছে। দোহারটা ঢুলীর সহিত তাল লইয়া তর্ক বাধাইয়াছে। হাতে তাল দিতেছে, আর

বলিতেছে—এই—এই—এই ফাঁক। বাজনদার আপন মনেই বাজাইয়া চলিয়াছে। দোহারের কথা গ্রাহ্য করিতেছে না।

মহিষের মত লোকটা মদের ঝোঁকে ঝিমাইতেছে। সম্মুখে জ্বলিতেছে ধুনী। অগ্নিকুণ্ডে মোটা মোটা কাঠের চ্যালা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লাল আগুনের শিখা জ্বলিতেছে। লোকটা ঝুমুর দলের পাহারাদার। চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অদূরে মেয়েদের আসর। তাহারই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছিল।

*   *   *

ব্রতকথা শেষ হইল। হুলুধ্বনি দিয়া সকলে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। তারপর প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল যে যাহার আপন ঘরে। অর্থাৎ ওই খড়ের কুটরিতে। প্রৌঢ়া পুরুষদের ডাকিয়া বলিল—যাও সব, প্রসাদ লও গা। অর্থাৎ নাও গে যাও।

নিতাই একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল। বসন নিজের ঘরে ঢুকিবার মুখে দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল—শোন।

—আমাকে বলছ ?

—হ্যাঁ।

আজ এই নিষ্ঠাবতী বসন্তের কাছে যাইতে নিতাইয়ের এতটুকু সঙ্কোচ হইল না। ঘরে ঢুকিয়া সে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহমধুর হাসি হাসিয়া বলিল—কি বলছ বল।

বসন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ চোখ নামাইয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিল একটু প্রসাদ খাও। বলিয়াই সে পরিপাটি করিয়া ঠাঁই করিয়া একখানি পাতায় ফলমূল সন্দেশ সাজাইয়া দিল। বসনের এই নূতন রূপ দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল ; সেই বসন এমন হইতে পারে।

নিতাই আসনের উপর বসিয়া পড়িল। খাইত খাইতে বলিল- জয়জয়কার হোক তোমার।

বসন বলিল—এক টুকরো পেসাদ রেখো যেন।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—পেসাদ ?

—হ্যাঁ, নাগরের পেসাদ খেতে হয়। সে হাসিল। বসনের মুখের এমন হাসি নিতাই কখনও দেখে নাই। সে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন জিনিসপত্র গুছাইবার অজুহাতে তাহার দিকে পিছন ফিরিল। গুনগুন করিয়া সে গান করিতেছিল। নিতাই সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

"তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।"

—বা। বা। বা। এমন গান। নিতাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

"কহে চণ্ডীদাস—"

—কি ? কি ? বসন। চণ্ডীদাস কি ?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসন বলিল—মহাজনের গান—চণ্ডীদাসের পদ যে।

—চণ্ডীদাসের পদ তুমি জান?

—জানি। বসন্ত হাসিল। আমাদের গানের খাতায় কত পদ লেখা আছে।

পনেরো

রাত্রি নয়টার পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের গান, মহাজনের পদ নাই। আকাশ আর পাতাল। রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মেলার নৈশ-আনন্দ-সন্ধানী মানুষের জনতার মধ্যে নগ্ন জীবনের প্রমত্ত তৃষ্ণার গান। বক্ষোভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মদ্যরসে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম আসর পাইয়াছিল বিপক্ষ দল। সে-দলের কবিয়ালটি রঙ-তামাশায় দক্ষ লোক। আসরে নামিয়াই সে নিজে হইল বৃন্দে-দূতী—নিতাইকে করিল কৃষ্ণ; পাল্লা ধরিল মানের। অভিমানিনী নায়িকার দূতীরূপে সে গানে কৃষ্ণকে গালাগালি আরম্ভ করিল। ধুয়া ধরিল—

"কা-দা জা-মের বো-দা—কয়ের রসে ওলো মজেছে কালা,
আমের গায়ে মিছে—ধরিল রঙ—মিছে সুবাস ঢালা।
চন্দ্রাবলী কাদা জাম
রাধে আমার পাকা আম।"

তাহার পরই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সহিত তুলনা উপলক্ষ্য করিয়া সে বসন্তের রূপ-গুণের অশ্লীল বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে লোকটার ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল। এ দলের পুরানো কবিয়াল, বসন্তের চড় খাইয়া যে দল ত্যাগ করিয়াছে, সেই লোকটাই বসন্তের প্রতিটি দোষ ও খুঁতের সংবাদ ওই দলের কবিয়ালকে দিয়াছে। কবিয়াল বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া চন্দ্রাবলীর খেউড় গাহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করিল বিপক্ষ দলের মেয়েগুলি। তাহারা পর্যন্ত বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া নাচিল।

নিতাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই খেউড়ের আসরে তাহার গান জমিবে না, জমাইতে সে পারিবে না। খেউড় তাহার যেন আসে না। মুখে যেন বাধে। কিন্তু শঙ্কা তাহার নিজের পরাজয়ের জন্য নয়। সে বসন্তের কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। যে মেয়ে বসন্ত। একদণ্ডে সে আগুন হইয়া উঠে। আসরেই সে একটা কাণ্ড না করিয়া বসে। বার বার সে বসন্তের মুখের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু এই পাল্লার ক্ষেত্রে আশ্চর্য ধৈর্য বসন্তের; চুপ করিয়াই বসন্ত বসিয়া আছে—যতবার নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলিল, ততবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে নিতাইয়ের ভুল হইল না, হাসিয়া বসন্ত ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছিল—শুনছ? এর শোধ দিতে হবে; নিতাইয়ের মনে পড়িল গতরাত্রের কয়টি কথা, বসন্ত তাহাকে প্রথম সম্ভাষণেই বলিয়াছে—কয়লা-মাণিক নয়, তুমি আমার কালোমাণিক। আমার ছিদ্র কুম্ভে জল রেখেছ, আমার মান রেখেছ তুমি।

বসন্তকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। নাচের আসরের সাজসজ্জা করিবার তাহার

অবকাশ হয় নাই ; এলোচুলই পিঠের উপর পড়িয়া আছে, লালপেড়ে তসরের শাড়ীখানিই সে একটু আঁটসাট করিয়া পরিয়াছে ; সকলের চেয়ে ভাল লাগিতেছে তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টি। মেয়েরা আজ কেহই মদ খায় নাই, সেও খায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য ! বসনের চোখের দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টির চেয়ে সাদা মনে হইতেছে। অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের ! চোখে মদের নেশায় আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মতো রাঙা এবং ধারালো হইয়া উঠে। আবার সুস্থ বসন্তের চোখ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।

বিপক্ষ দলের ওস্তাদ গান শেষ করিয়া বসিল। আশেপাশে শ্রোতার দল জমিয়াছিল, পচা মাছের বাজারে মাছির মত। পয়সা-আনি-দুয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা ততক্ষণে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে, গোটা টাকাও পড়িয়াছে দুই তিনটা। গান শেষ হইতেই শ্রোতারা হরিবোল দিয়া উঠিল –হরি হরি বল ভাই। বিচিত্র, ইহাই উহাদের সাধুবাদ !

পাশেই সস্তা তেলেভাজা ও মাংসের দোকান—মদও বিক্রি হয় গোপনে—সেখানে আর এক দফা ভিড় জমিয়া গেল—এবং দলের দুইটা মেয়েকে লইয়া দোকানের ভিতর চেয়ার টেবিলে আসর করিয়া বসাইয়া কয়েকটি শৌখিন চাষী খাবার খাইতে বসিয়া গেল।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মা-চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া নিতাই উঠিল। কিন্তু হাত-পা তাহার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে ;—এই এত বড় মদ্য-তৃষাতুর জনতা, ইহাদের কি দিয়া সে তৃপ্ত করিবে ? অনেক ভাবিয়া সে গান ধরিল—

"মদ সে সহজ বস্তু নয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধাঁ—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে খানায় পড়ে রয়।"

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল কূটবুদ্ধি ; এবং বড় শক্তি হইল গলাবাজি, অর্থাৎ জোর করিয়া আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়-কে নয়, এবং নয়-কে হয় করিয়া গলার জোরেই কবিয়ালরা জিতিয়া যায়। বুদ্ধি করিয়া অশ্লীল রসের গালিগালাজ বাদ দিয়া নিতাই সেই চেষ্টা করিল। সে ধরিল—

"বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ,
নয় অকারণ—কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

'নতুবা ওগো মাতাল বৃন্দা, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর নিন্দা করিতে না। চন্দ্রাবলী কে ? যে, রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। যে কালী, সে-ই কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আগে তেঁতুল খাও, মাথায় জল দাও—নেশা ছুটাও, তারপর চন্দ্রাবলীর দিকে চাও। দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যেই চন্দ্রাবলী। রাধাতত্ত্বের মানের পালার দশ পৃষ্ঠার দশম লাইন পড়িয়া দেখিও।' তারপর সে আরম্ভ করিল—চন্দ্রাবলীর রূপবর্ণনা। অর্থাৎ বসন্তের রূপকেই সে বর্ণনা করিল। একেবারে সপ্তম স্বর্গের বস্তু করিয়া তুলিল। বসন্ত নাচিতেছিল। সুস্থ দেহ মনে আজ সে বড় ভাল নাচিতেছিল ;—কিন্তু রূপ-যৌবন আজ কামনাময় লাস্যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। সেটা নেশার অভাবেও বটে এবং নিতাইয়ের গানে ঐ রসের অভাবেও বটে ! শুধু বসন্তের নাচই নয়, ক্রমে ক্রমে আসরটা ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল ; জনতা কমিয়া আসিতে শুরু হইল। দুই-

চারিজন যাইবার সময় বলিয়া গেল—দূর।

তাহাদের থালায় প্যালা পড়িল না বলিলেই হয়।

প্রৌঢ়া কয়েকবার নিম্নস্বরে নিতাইকে বলিল—রঙ চড়াও, ওস্তাদ, রঙ চড়াও।

ঢুলিদার বসন্তের কাছে গিয়া বলিল—একটুকুন হেলেদুলে, চোখ একটুকুন খেলাও।

বসন্ত চোখ খেলাইবে কি, চোখ ভরিয়া তার বার বার জল আসিতেছে। হেলিয়া দুলিয়া হিল্লোল তুলিবে কি, দেহ যেন অবসাদের ভারে ভাঙি·া পড়িয়াছে। আসরে নামিয়া শ্রোতাদের এমন অবহেলা তাহাকে বোধ করি কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইয়ের গানের তত্ত্বকথায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে লোকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। নিতাইয়ের ধর্মকথার জলো রসে তাহার নাচে রঙ ধরিতেছে না। সর্বোপরি দলের পরাজয়টাই তাহার কাছে মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী রূপ-পসারিনী তাহারা, দেহ ও রূপ লইয়া তাহাদের অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্যাদা নয়। কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের অহঙ্কারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ ও রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়। তাই ইহাদের জীবনের সকল [illegible] পঞ্জীভত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে নৃত্যগীতের অহঙ্কারটুকুকে আশ্রয় করিয়া। ওই দুইটা বস্তুই যে তাহাদের জীবনের এক মাত্র সত্য—সে কথা তাহারা বুঝে। তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, ভাল নাচ-গানের যে কদর—তাহা মেকী নয়। হাজার মানুষ চুপ করিয়া শোনে তাহাদের গান, বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তাহাদের রূপের মধ্যে বিচিত্র এক অপরূপের অভিব্যক্তি। মরুভূমির মত জীবনের ওইটুকুই তাহাদের একমাত্র শ্যামল সজল আশ্রয়কুঞ্জ। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধেই তাহারা অগণ্য শ্রোতার উপস্থিতিতে নগণ্য করিয়া মাথা তুলিয়া নাচে, গায়। সমাজে গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন লোকের সঙ্গেও অকুণ্ঠিত দাবিতে গানের তাল মান লইয়া তর্ক করে। খেউড় কবির দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউড় না জানিলে [illegible] দলে গাওন[illegible] [illegible]র অধিকারই হয় না। মাসী বলে—কত বড় বড় মুনি-ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া—শেষ তাহাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউড় ছোট জিনিস কিসে? আজ দলের পরাজয়ের সঙ্গে—সেই মর্যাদা ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে বলিয়া অবসাদে বসন্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জিতিতে হইলে কবিয়াল ও নাচওয়ালী দুজনকে একসঙ্গে জিতিতে হইবে। একজন জিতিবে, একজন হারিবে--তাহা হয় না।

কোনমতে গান শেষ করিয়া পরাজয়ের বোঝার ভারে মাথা হেঁট করিয়া নিতাই বসিল। ঢোলের বাজনার তেহাই পড়িল—বসন্তও নাচ শেষ করিল। নাচ শেষ করিয়া আসরে সে আর বসিল না ; শান্ত অথচ ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। প্রৌঢ়া দলনেত্রী তাহার দিকে চাহিয়া কেবল প্রশ্নের সুরে ডাকিয়া বলিল—বস[illegible] ?

বসন ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—শরীর খারাপ করছে মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিল, বলিল—দেখ না, দোসরা আসরে বাবা আমার কি করে।

বসন্ত নিতাইয়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল। নিতাই দেখিল—সে চোখে তাহার

ক্ষুরের ধার। পরমুহূর্তেই বসন্ত বাহির হইয়া গেল।

প্রৌঢ়া কিন্তু অদ্ভুত। সে যেন এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দলের বেহালাদারকে নির্বিকার ভাবে বলিল—প্যালার থালাটা আন।

লোকটি প্যালার থালা আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—কয়েকটা দোয়ানীর বেশী আর পড়ে নাই। সবসুদ্ধ দু টাকাও হইবে না।

প্রৌঢ়া বলিল—গুনে দেখ কত আছে। তারপর সে পানের বাটাটা টানিয়া লইয়া বলিল—মেলার আসর, রঙ-তামাসা-খেউর-খোরাকী লোকেরই ভীড়! নইলে বাবার গানে আর ওই ফচকে ছোঁড়ার গানে? গান তো বোঝ তুমি, তুমিই বল কেনে?

বেহালাদার বলিল—তা বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন না গাইলে হবে কেনে বল? রঙের গানও তো গান।

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল—একশো বার। রঙ ছাড়া গান, না গান ছাড়া রঙ। একটা মোটা পান মুখে পুরিয়া সে আবার বলিল—ওস্তাদের মার শেষ আসরে। দেখ না, বাবা আবার কি করেই দেখ না।

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

নির্মলা, ললিতা মেয়ে দুইটির মুখেও হাসি নাই, পরস্পরে তাহারা মুখভার করিয়াই কথা বলিতেছে—বোধ হয় এই হারজিতের কথাই হইতেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই মাথা হেঁট করিল। সকলের লজ্জা যেন জমিয়া জমিয়া বোঝা হইয়া তাহার মাথার উপর প্রচণ্ড ভাবে চাপিয়া বসিতেছে। শুধু তো লজ্জাই নয়, দুঃখেরও যে তাহার সীমা ছিল না। খেউড় যে তাহার কিছুতেই আসিতেছে না।

* * *

ওদিকে বিপক্ষ দলের ঢুলী বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল; লোকটার বাজনার মধ্যে যেন জয়ের ঘোষণা বাজিতেছে। বাজানোর ভঙ্গির মধ্যেও হাতের সদম্ভ আস্ফালন। ও-দলের কবিয়ালেরা বোধ হয় বাহিরে ছিল—সে একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে ছুটিয়া আসরে আসিয়া প্রবেশ করিল—

"হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি?"

'কুকুরী আর ময়ূরী, সিংহিনী আর শূকরী শিমূলে আর বকুলে কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী—তফাৎ নাইক, একই!' ইহার পরই সে আরম্ভ করিল অশ্লীলতম উপমা। সঙ্গে সঙ্গে আসরে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ বহিয়া গেল। লোকে হরিবোল দিয়া উঠিল। এবার লোকটা একটু থামিয়া এর সর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"অ'—কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জ্বেলে দে গো—
টিকেয় আগুন দিয়ে রাধে তামুক খেয়ে লে গো।"

অর্থহীন উপমায় যে কোন প্রকারে কতকগুলা গালিগালাজ দিয়া এবং অশ্লীল কদর্য ভাব ও উপমার অবতারণা করিয়া সে আসরটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই জমাইয়া তুলিল।

নিতাই আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ও-দলের একটি মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজেই আখর দিয়া গাহিতে উঠিল—

“ধর—ধর ধর কালাচাঁদে, পলায়ে যে যায় গো।
একা আমি ধরতে লারি সবাই মিলে আয় গো।”

আসরে একটা তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। নিতাই কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না। সে হাসিমুখেই মেয়েটির এই তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিয়া বলিল—ভাল, ভাল। ভাল বলেছ তুমি।

* * *

আসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিতাই ঝুমুর দলের আস্তানায় বসন্তের খুপরির দুয়ারে দাঁড়াইল। খড়ের আগড়টা আধখোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ভিতরে একটা লণ্ঠন মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে। বাহিরে খোলা আকাশের তলায় উঠানে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে সেই একটা অগ্নিকুণ্ডই উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছে এবং তাহারই সম্মুখে মহিষের মত প্রচণ্ডকায় লোকটা পূর্ণ-উদর হিংস্র কোন পশুর মত বাসা আগলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। পদশব্দে সে ফিরিয়া চাহিল, এবং নিতাইকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া ঝিমাইতে লাগিল। নিতাই বসন্তের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল, ঢুকিতে সাহস করিল না। দেহ-ব্যবসায়িনীর ঘর। সে বাহির হইতেই ডাকিল—বসন?

—কে? ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে বসন্ত উত্তর দিল।

—আমি নিতাই। রসিকতা করিয়া ‘কয়লা-মাণিক’ বলিতে তাহার মন উঠিল না।

—কি?

—ভেতরে যাব?

—কি দরকার?

—একটু’ন কাজ আছে।

মুহূর্তে বসন্ত নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর অস্থির ক্ষু পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল, ঠিক খাপ হইতে একটানে বাহির হইয়া আসা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণ দীপ্তিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল। নিতাই দেখিয়া শঙ্কিত হইল। আজিকার অপরাহ্নের পূজারিণী, শান্ত স্নিগ্ধ নম্র সে বসন্ত আর নাই, এ সেই পুরানো চেনা বসন্ত। তাহার সর্বাঙ্গে ক্ষুরের ধার ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রাঙা আলোর প্রতিচ্ছটায় সে যেন রক্তাক্ত! সে ফিরিয়া আসিয়া মদ খাইয়াছে। চোখে ছটা বাজিতেছে।

বসন্ত বলিল—আমি যাব না। আমি যাব না। কেন এসেছ তুমি?

নিতাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ কঠিনতম আক্রোশে বসন্ত তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিল,

বলিল—ন্যাকার মত আমার সামনে তবু দাঁড়িয়ে। কেনে, কেনে, কেনে? প্রশ্নই করিল, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করিল না। মুহূর্তে যে অধীর অস্থির গতিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেই গতিতেই সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এই আঘাত করিয়াও যেন তাহার ক্ষোভ মেটে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সে নিজের কপালে কয়টা চাপড় মারিল, তাহার শব্দটাই সে কথা বলিয়া দিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সেই আগলদার লোকটার কাছে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—পালোয়ান!

লোকটা দলের মধ্যে পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। নেশায় ভাম লোকটা রাঙা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিল মাত্র, কথার উত্তর দিল না। সম্মুখের কয়টা দাঁত শুধু বাহির হইয়া পড়িল।

নিতাই বলিল—তোমার কাছে মাল আছে? মদ?

নিরুত্তর লোকটা এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। বোতলটা হাতে করিয়াও নিতাই একবার ভাবিল—তারপর এক নিঃশ্বাসে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া গেল। সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করিয়া উঠিল; দুর্দমনীয় বমির আবেগে—সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে আবেগ রোধ করিল। ধীরে ধীরে আবেগটা যখন নিঃশেষিত হইল তখন একটা দুর্দান্ত অধীরতাময় চঞ্চল অনুভূতি তাহার ভিতরে সদ্য জাগিয়া উঠিতেছে। সে তখন আর এক মানুষ হইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও আর এক পৃথিবী হইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য।

সব যেন দুলিতেছে; ভিতরটা জ্বলিতেছে; দুনিয়া যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে। সে এখন সব পারে। সে-কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি মদের স্পর্শে—জলের স্পর্শে মহামারীর বীজাণুর মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে।

আবার সে খানিকটা মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

দ্বিতীয়বার আসরে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার রূপটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। সে আর এক মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। নীতিকথাগুলো ভুলিয়াছে, পাপপুণ্য লইয়া হিসাব-নিকাশ ভুলিয়াছে, হা-হা করিয়া অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হইবে না কেন? সামাজিক জীবনে মানুষের যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু কদর্য, যাহা কিছু উলঙ্গ অশ্লীল তাহাই আবর্জনা-স্তূপের মত সেখানে জমা হয়, সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহার জন্ম। দারিদ্র্য ও কঠিন দাসত্বের অনুশাসনের গণ্ডীর ভিতর বহু যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, সে তাহাদেরই সন্তান। মা সেখান অশ্লীল গালিগালাজে শাসন করে; উচ্ছ্বসিত স্নেহে অশ্লীল কথায় আদর করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, কদর্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালির চর্চা করিয়া সে-সব সে এতদিন ভুলিতে চাহিয়াছিল। সে-সবের উপর একটা অরুচি, একটা ঘৃণা তাহার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের কাছে আঘাত খাইয়া

সেই আঘাতে ক্ষোভে নির্জলা মদ গিলিয়া সে উন্মত্ত হইয়া গেল। মদের নেশার মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভে অর্জন করা সব কিছুকে ভুলিয়া সে উদগীরণ করিতে আরম্ভ করিল জান্তব অশ্লীলতাকে। ছন্দ এবং সুরে তাহার অধিকার ছিল, কণ্ঠস্বর তাহার অতি সুমিষ্ট ; দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল।

আসরে ঢুকিবার মুখেই সে কবিয়ালসুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে দোহারদের ডাকিয়া কহিল—দোহারগণ!

সবিস্ময়ে সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওই অপ্রস্তুত হওয়ার পর নিতাই যে আবার ফিরিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। তাহারা সাড়া দিতে ভুলিয়া গেল।

ভুলিল না মাসী। সে চতুরা। সে মুহূর্তে সাড়া দিল—বল ওস্তাদ!

নিতাই বলিল—

ধর্ম কথায় যখন মন ওঠে না—বসে না—তখন দিতে হয় গাল।
ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল।
যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল—
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জাল!

ওদিকের কবিয়ালটা রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল—বলিহারি কালাচাঁদ, টিকেয় আগুন দিয়েছ লাগছে, তেতেছ!

নিতাই বলিল- এমন তেমন তাতা নয় বিন্দে, জ্বলছি! সেই জ্বালাতে তোকে বলছি--শোন্! সহজে তো তুই শুনবি না!—দোহারগণ!

--হাঁ—হাঁ!

নিতাই শুরু করিল—

বুড়ী দূতী নেড়ী জুত্তি ছাড়া নয় সায়েস্তা
ছড়ির বাড়ি মারলে ভাবে এ কি আমার সুখ অবস্থা!

বুড়ীকে ছড়ি মেরে কিছু হয় নাই। এবার লাগাও জুতি—লাগাও পয়জার! তারপর প্রৌঢ় লোকটার মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—বুড়ার কোঁচকা মু টেরীর বাহার দেখুন, তেলকের বাহার দেখুন--

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখে রসকলি কাটিস নে!
রসের ভিয়েন জানিস নেকো গেঁজলা তাড় ঘাঁটিস নে।

তারপর তার মুখের কাছে আঙুল নাড়িয়া বলিল—

ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে!

আসরে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর জমিয়া গিয়াছে। সে নিজেও সেই জম-জমাটের মধ্যে হারাইয়া গিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সে গান ধরিল—

বুড়ী মরে না—মরণ নাই!
হায়—হায়!

গানের সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল।

বুড়ী খানকী নেড়ী কুটনী মরে নাই, মরে নাই
ও হায়, তার মরণ নাই—মরণ নাই!

তাহার পর একটার পর একটা অশ্লীল বিশেষণ তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতাদের অট্টহাসিতে রাত্রিটা যেন কাঁপিতেছে, সমস্ত আসর এবং আলো তাহার চোখের সম্মুখে দুলিতেছে। একটা মানুষ দুইটা বলিয়া বোধ হইতেছে। ওই তো দুইটা নির্মলা, ওই তো দুইটা ললিতা; ওই তো বাজাইতেছে দুইটা বায়েন; মাসীও দুইটা হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অকস্মাৎ একসময়ে সে দেখিল—বসন্তও দুইটা হইয়া নাচিতেছে! বাহবা—বাহবা—সে কি নাচ! বসন্ত কখন আসিয়া আসরে নামিয়া নাচিতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া দিয়া টলিতে টলিতে সে বসিল। এবার তাহাদের প্যালার থালাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এবার বিপুল কলরবে হরিধ্বনি উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিল—বাবা আমার। এই দেখ, মাল না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়? যে বিয়ের যে মন্তর! বসন, বাবাকে আমার আর এক পাত্য দে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

বসন! এতক্ষণে নিতাই স্থির দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

নিতাইয়ের চোখ রক্তমাখা, পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী দুলিতেছে; শঙ্কা সঙ্কোচ, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে জয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাসে। বসন্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। সে চোখে তাহার কামনা ঝরিতেছে। নিতাইয়ের বুকেও কামনা সাড়া দিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য বসন্ত। সে হাসিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে নিতাইয়ের গালে চড় মারিয়া যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে, তাহার জন্য এখন সে একবিন্দু লজ্জাও বোধ করিতেছে না; বরং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার চোখ মুখ ঝলমল করিতেছে, নিতাইয়ের গরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

—দাও, পাত্য দাও। নিতাই হাসিল।

—এস, ঘরে এস, ভাল মদ আছে—বেলাতী। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া গরবিনীর মত তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ঘরে কাচের গেলাসে বিলাতী মদের সঙ্গে জল মিশাইয়া বসন্ত নিতাইকে দিল। নিঃশব্দে গেলাসটি শেষ করিয়া নিতাই বসনের দিকে চাহিয়া হাসিল। এ বসন্ত যেন নূতন বসন্ত; নিতাইয়ের নেশার ঘোর ঝলমল করিয়া উঠিল।

সে আবার হাত বাড়াইল। তাহার তৃষ্ণা জাগিয়াছে। বলিল—দাও তো, আমাকে আর এক গেলাস দাও।

বসন্ত হাসিয়া আবার অল্প একটু তাহাকে দিল। সেটুকুও পান করিয়া নিতাই বলিল—দাঁড়াও, তোমাকে একটুকুন দেখি।

বসন হাসিয়া বলিল—না, চল আসরে চল।

—না। দাঁড়াও। সে বসন্তের হাত চাপিয়া ধরিল।

বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী ; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়—লজ্জা তাহাদের থাকে না, থাকিলে চলে না। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে। বসন্ত তাহাদের মধ্যেও আবার লজ্জাহীনা। সেই বসন্তের মুখ তবু আজ রাঙা হইয়া উঠিল।

এবং আরও আশ্চর্যের কথা ; মুহূর্ত পরেই তাহার চোখে জল দেখা দিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। নিতাই সবিস্ময়ে বলিল—তুমি কাঁদছ কেনে?

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বসন্ত বলিল—না, আমাকে তুমি দেখো না। এক পা সে পিছাইয়াও গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুই পা আগাইয়া আসিয়া নিতাই বলিল—কেনে?

বসন্ত বলিল—আমার কাসরোগ আছে। মধ্যে মধ্যে কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জ্বর হয় দেখ না? টপ টপ করিয়া বসন্তের চোখ হইতে এবার জল ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল।

হোক। নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে ; উচ্ছৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সে রূপ ঠাকুরঝি কখনও সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ্য করিবার সাহস আছে। নিতাইকে অগ্রসর হতে দেখিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে প্রসন্ন মুখে সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এবং নিতাইয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পিষ্ট হইতে হইতে সে মৃদুস্বরে গাহিল।

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে।
ত্যেজি' জাতি-কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে'।"

নিতাইয়ের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। গান শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—এ কি গান। তাহার নেশা যেন ফিকা হইয়া যাইতেছে। এ কি সুর। তাহার স্খলিত হাত দুইখানা বসন্ত নিজেই নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া আবার গাহিল—

"পরাণ-বঁধুয়া তুমি,
তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি।"

অপূর্ব। অপূর্ব লাগিল নিতাইয়ের ; চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করিল—কোথা শিখলে এ গান? এ কোন কবিয়ালের গান?

হাসিয়া বসন্ত দুইটি হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া গাহিল—

"যে হলো সে হলো—সব ক্ষমা কর বলিয়া ধরিল পায়,
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।"

গান শেষ করিয়া সে বলিল—মহাজনের পদ গো।

অধীর মত্ততার মধ্যেও নিতাইয়ের অন্তরের কবিয়াল জাগিয়া উঠিল। সে বসন্তের দুই হাত নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে শিখাবে?

বসন্ত আবেগভরে নিতাইয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল।

ষোলো

সকালে নিতাই যখন উঠিল, তখন তাহার জিভের ডগা হইতে বুকের ভিতর পর্যন্ত তেতো হইয়া উঠিয়াছে ; কপাল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বালা করিতেছে। নিজের নিঃশ্বাসেরই একটা বীভৎস দুর্গন্ধ নিজের নাকে আসিয়া ঢুকিতেছে। সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদাক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত, বিষে বিষাক্ত। শীতের প্রারম্ভ—তাহার উপর সকালবেলা—এই শীতের সকালেও তাহার মৃদু-মৃদু ঘাম হইতেছে। মাথার মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় একটা যন্ত্রণা। সমস্ত চেতনা যেন গ্রীষ্মদ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মাঠের ধুলায় আচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর—এবং মাঠের মরীচিকার মত কম্পমান। পেট জ্বলিতেছে, বুক জ্বলিতেছে, ভিতরটা শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে।

বসন্ত ঘরের মধ্যেই ছিল, সে আপান মনে অন্য কাজ করিতেছিল। কয়েক দিনের বসবাসের জন্য তৈরী খড়ের ঘর, সেই ঘর সে গোছগাছ করিয়া পরিপাটী করিয়া সাজাইতে অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে উঠিয়াই ঘরকন্নার কাজগুলো যেন তাহাকে দুই হাত মেলিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। মেলায় সে কয়েকখানা ছবি কিনিয়াছিল, নতন আমলের সাধারণ দেশীয় লঘুরুচি শিল্পীদের হাতের বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা—জার্মানিতে ছাপা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার ছবি। দু'খানা উলঙ্গ মেমসাহেবের ছবি। ছবিগুলি সে ঘরের বাঁশের খোঁটার গায়ে টাঙাইতেছিল। নিতাইকে উঠিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল—উঠলে ?

ওই হাসি এবং এই প্রশ্নেই নিতাইয়ের আজ রাগ হইয়া গেল—রাঙা চোখে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় বসন্ত প্রথমটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিল, বলিল—শরীর খারাপ হয়েছে, না ? হবে না ? প্রথম দিনেই যে মদটা খেলে ! মুখ হাত ধোও, চা খাও, খেয়ে চান কর। কাঁচা চা করে দি। তুমি সেদিন দিয়েছিলে আমাকে, ভারি উপকার হয়েছিল।

নিতাই কথার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের তলার মাটি এখনও যেন কাঁপিতেছে।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সে যখন ফিরিল, তখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। দীঘির ঘাটে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্য বার বার মাথা ধুইয়া ফেলিয়াছিল। ভিজা চুল হইতে তাহার সর্বাঙ্গে জলধারা ঝরিতেছিল, সে ধারাগুলি পড়িতেছিল যেন উত্তপ্ত লোহার পাত্রে জলবিন্দুর মত। বসন্ত তখন একগাদা কাপড় লইয়া কাচিবার জন্য বাহির হইতেছিল। নিতাইকে দেখিয়া সে কাপড় রাখিয়া তাড়াতাড়ি চা করিয়া দিল লেবুর রস দিয়া কাঁচা চা নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া সে আবার ঘরের মেঝেয় বিছানো খড়ের উপরেই শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র নিতাই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক ঘুম নয়, অশান্ত তন্দ্রা। তাহারই মধ্যে নিতাই শুনিতে পাইল বসন্ত বলিতেছে—খড়ের ওপরেই শুলে ?

সে চোখ মেলিয়া চাহিল। একগাদা ভিজা কাচা কাপড় কাঁধে ফেলিয়া আপাদমস্তক-

সিক্ত বসন্ত দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

—ওঠ, একটা মাদুর পেতে একটা বালিশ দিই। অ ভাই নির্মলা, তোর দাদাকে একটা মাদুর আর একটা বালিশ দিয়ে যা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে।

নিতাই চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—না।

বসন্ত এবার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া শাসনের সুরে বলিল—না নয়, ওঠ, ওঠ।

নিতাই এবার উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বসন্তর দিকে চাহিল।

—কই ? দাদা কই ? বলিয়া হাসিমুখে নির্মলা মেয়েটি আসিয়া ঘরের ঢুকিল। সযত্নে মাদুর ও বালিশ পাতিয়া দিতে দিতে বলিল—ওঃ, দাদা আমার আচ্ছা দাদা। যে গান কাল গেয়েছে।

নিতাইয়ের এতক্ষণে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক খেলিয়া গেল।

এই মুহূর্তেই ও-পাশের খড়ের ঘর হইতে দলের নেত্রী প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল।—বাবা আমার উঠেছে ? পরমুহূর্তেই সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল এ মা-গো। তোর কি কাণ্ড বসন ? এই কদিন জ্বর [illegible], আর আজ এই সকালেই উঠে এমনি করে জল ঘাঁটছিস।

মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল—সব কাচতে হ'ল মাসী। এইবার চান করব।

—কাচবার কি দরকার ছিল ?

নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—পিরীত সামান্য নয় মাসী। দাদা কাল বমি করে বিছানা-পত্র ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ়াও এবার মৃদু হাসিল, বসন্তকে বলিল—যা যা, ভিজে কাপড় রেখে চান করে আয়। কাপড় ছেড়ে বরং ও-গুলো মেলে দিবি।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—আমি বমি করেছি ?

নির্মলা আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া নিতাই ভাবিতেছিল—ঘরের এই দুর্গন্ধ তাহা হইলে তাহারই বমির দুর্গন্ধ। অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গে ওই বমির ক্লেদ লাগিয়া আছে। সেই গন্ধই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাহার ভিতরটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। নিজের অঙ্গের ক্লেদ এইবার এক মুহূর্তে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

—মাথা ধরেছে, নয় গো দাদা ? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি। নির্মলা তাহার কপালে হাত দিল। বড় ঠাণ্ডা আর নরম নির্মলার হাতখানি। কপাল যেন জুড়াইয়া গেল। ভারি আরাম বোধ হইতেছে। কিন্তু নিতাই স্নান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—না, চান করব আমি।

বসন্ত কাপড়গুলি রাখিতেছিল, সে বলিল—নির্মলা, দেখ, 'বাসকো'র পাশে ফুলেল তেলের বোতল রয়েছে, দে তো ভাই বার ক'রে। তারপর সে নিতাইকে বলিল—বেশ ভাল ক'রে তেল মাখো। দেহ ঠাণ্ডা হবে, শরীলের আরাম হবে। আর সাবান লাও তো তাই লাও।

—না। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছে তাহার জলে ডুবিয়া মরিতে। চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন বসন্ত স্নান করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বাক্স লইয়া কিছু করিতেছিল। নিতাই ঘরে ঢুকিতেই সে হাসিয়া বলিল—আজ কেমন সাজব, তা দেখবে। ওই দেখ, আয়না আছে, চিরুনি আছে, স্নো আছে, মুখে লাও খানিক।

স্নান করিয়া নিতাই সুস্থ হইয়াছে বটে কিন্তু মনের অশান্তি ইতিমধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছি। এ সে করিয়াছে কি? ছি। ছি। ছি। স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে সে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে, আজই সে পলাইয়া যাইবে। ইহারা যাইতে দিবে না, সুতরাং পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। জিনিসপত্র পড়িয়া থাক, 'বাজার ঘুরিয়া আসি' বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। অন্য জিনিসপত্রের জন্য দুঃখ নাই। কিই বা জিনিসপত্র। কয়েকখানা কাপড়, দুইটা জামা, একটা কম্বল, দুইটা কাঁথা বালিশ। দুঃখ কেবল তাহার দপ্তরটির জন্য। দপ্তর তো তাহার এখন নেহাৎ ছোটটি নয়, যে গায়ের জোরে আলোয়ানের আড়াল দিয়া বগলে পুরিয়া লইয়া পলাইবে। রামায়ণ, মহাভারত এবং আরও অনেক পুরাণ লইয়া তাহার দপ্তরটা এখন অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। মেলায়, বাজারে—যেখানে সে গিয়াছে—দুই একখানা করিয়া বই কিনিয়াছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জার গান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চণ্ডীমাহাত্ম্য, সত্যপীরের গান, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল—অনেক বই সে কিনিয়াছে। বাবুদের পাড়ায় ছেঁড়া পাতা কুড়াইয়া পড়িয়া ভাল লাগিলে সংগ্রহ করা তাহার একটা রোগ ছিল। সেগুলিও আছে। বাবুদের থিয়েটারের আশপাশ ঘুরিয়া কয়েকখানা আদি প্রান্তহীন নাটকও তাহার সংগ্রহে আছে। এছাড়া নিজের লেখা গানের খাতা, সেও যে এখন অনেক হইয়াছে—সব গানই সে এখন খাতায় লিখিয়া রাখে।

একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন্ত বলিল—উলঙ্গবাহার শাড়ী। এই কাপড় আজ পড়ব।

কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করিবে। সে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত বলিল—দেখব আজ কার জিত হয়, তোমার গানের, না আমার নাচের।

নিতাই আয়না-চিরুনিটা রাখিয়া দিয়া জামা পরিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্তে সে দ্বিধাশূন্য হইয়াছে, থাক তাহার দপ্তর পড়িয়া—সে চলিয়া যাইবে। এখানে সে থাকিতে পারিবে না।

—জামা পরছ যে? যাবে কোথা?

—এই আসি।

বসন্ত নিতাইয়ের আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইল বলিল—মানে?

—এই একটুকুন বাজার ঘুরে আসি।

—না। এখন বাজারে যেতে হবে না। একটুকুন ঘুমিয়ে লাও। ওই দেখ খানিকটা মদ ঢেলে রেখেছি, খাও, খোঁয়ারি ছেড়ে যাবে।

—না। আমি একবার মন্দিরে যাব।

—মন্দিরে ?

—হ্যাঁ।

—এই বলছ বাজার, এই বলছ মন্দির। কোথা যাবে ঠিক করে বল কেনে ?

—বাজারে যাব। রাধাগোবিন্দের মন্দিরে যাব।

—চল। আমিও যাব।

নিতাই বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া বসন্তর দিকে চাহিয়া রহিল।

রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—নিতাইয়ের মুখের দিকে সে চাহিয়া ছিল, হাসিয়া বলিল—কি ভাবছ বল দেখি ?

নিতাই উত্তর দিল না।

বসন্ত এবার বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন সরছে না ? লজ্জা লাগছে ?

নিতাই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আকস্মিক প্রশ্নে সে চকিত হইয়া উঠিল : অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল না—না—না। কি বলছ তুমি বসন। এস—এস।

বসন্ত বলিল—মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে আমার, তুমি যেন পালাতে পারলে বাঁচ। কে যেন তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে। আচ্ছা বাইরে চল তুমি, আমি কাপড় ছেড়ে যাই।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। বসন্তর চোখের দৃষ্টি তো ছুরি নয়—সূঁচ, একেবারে বুকের ভিতর বিঁধিয়া ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পায়। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বসন্তকে এড়াইয়া চলিয়া যাইবে সে তা-ই ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ওদিকে নির্মলা, ললিতা তাহাদের প্রিয়জন বেহালাদার ও প্রধান দোহারকে লইয়া তখন মদের আসর পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে। মহিষের মত বিরাটকায় লোকটা—প্রৌঢ়া দলনেত্রীর মনের মানুষ। লোকটা অদ্ভুত। ঠিক সেই একভাবেই বসিয়া আছে, অনাদি অনন্তর মত। উহাকে দেখিয়া নিতাই তাহার সমস্ত কথা স্মরণ না করিয়া পারে না। লোকটা কথাবার্তা বলে না, আমড়ার আঁটির মত সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলিয়া চাহিয়াই থাকে। রাক্ষসের মত খায়, প্রায় সমস্ত দিনটাই ঘুমায়, রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলিয়াও প্রায় জাগিয়া বসিয়া থাকে। তাহার সামনেই থাকে একটা আলো— আর একটা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। এই ভ্রাম্যমান পরিবারটির পথে-পাতা ঘরের গণ্ডির ভিতর রূপ ও দেহের খরিদ্দার যাহারা আসে তাহাদের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়িয়া পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্দান্ত মাতালগুলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিয়া—অনেকটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সুবোধ হইয়া উঠে। লোকটা ভাম হইয়া একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া আছে, নির্বিকার উদাসীনের মত। রান্নাশালার চালায় প্রৌঢ়া তেলেভাজা ভাজিতে বসিয়াছে।

ওই এক অদ্ভুত মেয়ে। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয়া উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার পরমুহূর্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া, গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালি

লইয়া চব্বিশ ঘন্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রথ-রথী-সারথি সবই সে একাধারে নিজে।

নির্মলা হাসিয়া ডাকিল—এস গো দাদা, গরীব বুনের ঘরে একবার এস।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কি হচ্ছে তোমাদের?

—কালকে নক্ষ্মীর বার গিয়েছে, পারণ করছি সকালে। বসন কই? সে আসছে না কেনে? মদের বোতলটা তুলিয়া দেখাইয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে নীরবে হাত দুইটি কেবল জোড় করিয়া মার্জনা চাহিল।

বেহালাদার হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকেই ডাক। কান টানলেই মাথা আসবে।

নিতাইয়ের পিছনেই বসন্তের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মাথা এখন পুণ্য করে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কানকেও যেতে হবে। তবে যদি কেটে লাও কানকে, সে আলাদা কথা।

বসন্তের কথা কয়টি নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। বাঃ, চমৎকার কথাটি বলিয়াছে বসন। খুশী হইয়া নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল—গতকালকার ভক্তিমতী পূজারিণীর সাজে সাজিয়া বসন্ত দাঁড়াইয়া আছে। বসন্ত হাসিয়া বলিল—চল।

পথের দুইধারেই দোকানের সারি।

বসন্ত সামগ্রী কিনিল অনেক। ফল মূল মিষ্টিতে পুরা একটা টাকাই সে খরচ করিয়া ফেলিল। একটা সিকি ভাঙাইয়া চার আনার আধলা লইয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—পকেটে রাখ।

নিতাই আবার চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল—এ বাঁধন কেমন করিয়া কাটিয়া ফেলা যায় সেই কথা। মন্দির হইতে ফিরিলেই তাহাকে লইয়া আবার সকলে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিবে। বসন্তও তখন আর এ বসন্ত থাকিবে না; হিংস্র দীপ্তিতে তখন বসন্ত ক্ষুরধার হইয়া উঠিবে। বসন্তের রাত্রির রূপ তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। সে ঠিক করিল, ফিরিবার পথে বসন্তকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া পথ হইতেই সে সরিয়া পড়িবে। অজুহাতের অভাব হইবে না। তাহার কোন গ্রামবাসীর সন্ধান করিবার জন্য মেলাটা ঘুরিবার একটা অজুহাত হঠাৎ তাহার মনে আসিয়া গেল, সে সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এই অবস্থায় বসন্ত আধলাগুলি তাহার হাতে দিতেই ভ্রূ তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল কি হবে?

—ও মা গো! রাজ্যের কানা খোঁড়া মন্দিরের পথে বসে আছে। দান করব। মৃদু হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ তুমি বল দেখি?

ব্যস্ত হইয়া নিতাই অভিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল—কিছু না।

—কিছু না?

নিতাই আবার অভিনয় করিয়া বলিল, ভাবছি তোমাকে চিনতে পারলাম না। নিতাই হাসিল।

সে অভিনয়ে বসন্ত ভুলিল, বলিল—আমার ভারি মায়া লাগে গো! আহা! কি কষ্ট বল দিকিনি কানা খোঁড়া রোগা লোকদের? বাপ রে! বলিতে বলিতে সে যেন শিহরিয়া উঠিল। নিতাই সত্যই এবার অবাক হইয়া গেল। এ কি! বসন্তের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিয়া যেন টলমল করিতেছে।

চোখ মুছিয়া বসন্ত আবার হাসিয়া বলিল—সে হাসি বিচিত্র হাসি, এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই—হাসিয়া বসন্ত বলিল—আমার কপালেও অনেক কষ্ট আছে গো! কাল তো তোমাকে বলেছি, আমার কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কাসের ব্যামো। এত পান-দোক্তা খাই তো ওই জন্যে। রক্ত উঠলে লোকে বুঝতে পারবে না। আর আমিও বুঝতে পারব না। দেখলেই ভয়, না দেখলেই বেশ থাকি। দলের কেউ জানে না, জানে কেবল মাসী। কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেদিন পাড়ু হয়ে পড়ব, সেদিন আর রাখবে না, নেহাৎ ভাল মানুষের কাজ করে তো লোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। নইলে যেখানে রোগ বেশী হবে, সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। জ্যান্ততেই হয়তো শ্যাল-কুকুর ছিঁড়ে খাবে।

নিতাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল—বসন!

বসন বলিল—সত্যি কথা কবিয়াল—এই আমাদের নেকন। তবে আমার নেকন আরও খারাপ। তুমি সেই ইষ্টিশানে গেয়েছিলে—'ফুলেতে ধুলোতে প্রেম'।—কবিয়াল, তখন ধুলোর সঙ্গে মাটির সঙ্গে প্রেম হবে আমার। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—দুব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে?

রোজ সকালে বসন্ত দূর্বাঘাস থেঁতো করিয়া রস খায়। অত্যন্ত গোপনে সে এই কাজটি করে। নিয়মিত খাওয়া হয় না। তাহার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় সম্ভব হইয়া উঠে না। মধ্যে মধ্যে প্রৌঢ়া মনে করাইয়া দেয়—বসন, সকালবেলায় দুর্বোর রস খাস তো?

বসন্ত কখনও কখনও সজাগ হইয়া উঠে, কখনও বা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—ম'লে ফেলে দিও মাসি। ও আমি আর পারি না।

আবার কাসি বেশী হইলেই সে সভয়ে গোপনে দূর্বাঘাস সংগ্রহ করিতে ছোটে। ঘাস ছেঁচিতে ছেঁচিতে আপন মনেই কাঁদে।

মন্দিরের পথ চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া উঠিল। একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল। এমন হাসিতে হাসিতে বসন্ত তাহার কাসের অসুখের কথাগুলো বলিল যে নিতাইয়ের মনে হইল, বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁট দুইটির কোলে কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, গাছতলায় মরিতে হইবে। জ্যান্ততেই হয়তো শেয়াল কুকুর ছিঁড়িয়া খাইবে।' সে ছবিগুলা যেন তাহার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল। অগ্রপশ্চাৎ তাহার সব ভুল হইয়া গেল। পলাইবার কথা তাহার মনে রহিল না। অজুহাতটার কথাও ভুলিয়া গেল। শুধু নীরবে মাথা হেঁট করিয়া

বসন্তের সঙ্গে মন্দিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বসন্ত আবার কথা বলিল—তাহার সে বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর আর নাই ; কৌতুক-সরস কণ্ঠে মৃদু হাসিয়া বলিল—গাঁটছড়া বাঁধবে নাকি ? গাঁটছড়া ?

কথাটা বসন নেহাৎ ঠাট্টা করিয়াই বলিল। আশ্চর্য বসন। এইমাত্র নিজের মরণের কথা এত করিয়া বলিয়া ইহারই মধ্যে সে সব সে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। স্থির দৃষ্টিতে বসন্তকে কিছুক্ষণ সে দেখিল। শাণিত-ক্ষুরের মত ঝকঝকে ধারালো বসন্তের ধার ক্ষয় হইয়া একদিন টুকরা টুকরা, হয়ত গুঁড়া হইয়া যাইবে উখায় ঘষা ইস্পাতের গুঁড়ার মত।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—দেখছ ?

—হ্যাঁ।

—কি দেখছ ? কেয়াফুলও শুকোয় ? চোখের কোণে কালি পড়েছে ?

বসন্তের মুখে তখনও হাসির রেখা। সে হাসি আশ্চর্য হাসি।

নিতাই মুখে কোন উত্তর দিল না। হাত বাড়াইয়া বসন্তের আঁচলখানি টানিয়া লইয়া নিজের চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

বসন্ত চমকিয়া উঠিল—ও কি করছ ? সে এক বিচিত্র বেদনার্ত উত্তেজনা-ভরে সে আপনার কাপড়ের আঁচলখানা আকর্ষণ করিয়া বলিল- না না, না—ছি। ও আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তুমি কি সত্যি ভাবলে নাকি ?

প্রসন্ন হাসিতে নিতাইয়ের মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল গিঁট আগেই পড়ে গিয়েছে বসন। টেনো না। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও এ গিঁট : আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে নোব গিঁট।

বসন্তর মুখখানি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল।

ঠোঁট দুইটা, শীতশেষের পাণ্ডুর অশ্বত্থপাতা উতলা বাতাসে যেমন থরথর করিয়া কাঁপে, তেমনি করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার রক্তাভ সুগৌর মুখখানা যেন সঙ্গে সঙ্গে সাদা হইয়া গিয়াছে। গরবিনী দর্পিতা বসন্ত যেন এক মুহূর্তে কাঙালিনী হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এবার হাসিয়া বলিল—এস এস, আমার আর তর সইছে না। ঠাকুরের দরবারে রাগ করে না।

—রাগ ? বসন্ত বলিল—আমার রাগ সইতে পারবে তো তুমি ?

—পায়ে ধরে ভাঙাব। নিতাই হাসিল।—এস এস।

বাসায় ফিরিতেই একটা কলরব পড়িয়া গেল। নির্মলা-ললিতাদের মদের নেশা তখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে। ফুলের মালা গলায় গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিতাই ও বসন ফিরিবামাত্র তাহাদের দেখিয়া তাহারা হুলুধ্বনি দিয়া হৈ-চৈ করিয়া উঠিল। গাঁটছড়াটা খুলিবার কথা নিতাই বা বসন দুইজনের কাহারও মনে হয় নাই।

নিতাই হাসিতে লাগিল। আশ্চর্য, সে লজ্জা পাইল না—কোন গ্লানিও অনুভব করিল না।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, লজ্জা পাইল বসন্ত। গাঁটছড়া বাঁধা নিতাইয়ের কাঁধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

সতেরো

ভ্রাম্যমান নাচ-গানের দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায়—গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ হইতে দেশান্তর। কবে কোন পর্বে কোথায় কোন মেলা হয়, কোন পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হয়—সে সব ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ-পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, ট্রেনে, তারপর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া—রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে।

প্রৌঢ়া বলে আগে আমরা পদ্মাপারে নিচের দিকেও যেতাম। পদ্মাপারে বাঙাল দেশে আমাদের ভারি খাতির ছিল।

নির্মলা প্রশ্ন করে- পদ্মাপার তুমি গিয়েছ মাসী?

নির্মলার কথা শেষ হইতে না হইতে মাসী পদ্মাপারে গল্প বলিতে বসে। বলে—যাইনি, বাপরে, সে কি ধুম।

তারপর বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে বলে—বাতের ত্যাল খানিক মালিশ করে দে দেখি; পদ্মাপারের কথা বলি শোন।

আপসোসের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—আঃ মা, তোরা আর কি দেখলি—কিই বা রোজগার করলি আর কিই বা খেলি। সে 'দ্যাশ' কি। - সোনার 'দ্যাশ'। মাটি কি। বারোমাস মা-লক্ষ্মী যেন আঁচল পেতে বসে আছেন। সুপুরি কিনতে হয় না মা। সুপুরির বন। যাও—কুড়িয়ে নিয়ে এস ডাব-নারিকেল—আমাদের 'দ্যাশে'র তালের মতন। দু-ধারি পাটের 'ক্ষ্যাত'।

সে হাত দুইখানা দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাড়াইয়া দিয়া সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে—এক এক পাটের ব্যাপারী কি। পয়সা কত। এই বড় বড় নৌকো। ব্যাপারীদের নজর কি, হাত দরাজ কত। প্যালা দেয় আধুলি, টাকা : সিকির কম তো নয়। আর তেমন কি খাবার সুখ। মাছই কত রকমের। ইলিশ-ভেটকি—কত মাছ মা—'অছল্যি' মাছ। আঃ, তেমনি কি লঙ্কা খাবার ধুম।

ললিত বলে—আমাদের একবার নিয়ে চল মাসী ওই দ্যাশে।

মাসী বলে—মা, সি রামও নাই আর সি অযুধ্যেও নাই। সি দ্যাশে আর আমাদের সে আদরও নাই মা। সি কালে আমরা যেতাম- পালা গান গাইতাম। পদাবলীর গান—আমাদের সি কালের ওস্তাদেরা আবার বেশ রং [illegible] দিয়ে পালাগান 'নকতো'—সে সব গান আমরা গাইতাম। যে যেমন আসর আর কি। তেলক কাটতে হ'ত, গলায় কণ্ঠি পরতে হ'ত। আবার বাজারে হাটে হাল-ফেশানী গান হ'ত। আজকাল আর পালাগান

কে শোনে বল? নইলে পালাগান নিয়েই তো ঝুমুর।

বেহালাদার মাসীর কথা শুনিতে শুনিতে বলিল—উ দ্যাশের মাঝিদের গান শুনেছ মাসী?

—শুনি নাই? ভারি মিষ্টি সুর। প্রৌঢ়া নিজের মনেই গুনগুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, আসছে না ঠিক।

বেহালাদার কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল, প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই বটে। কিন্তু বেহালাদার সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল।

নির্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল। বেহালাদার থামিয়া যাইতেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওই এক ধারার মানুষ। বাজাতে আরম্ভ করে থেমে গেল।

নির্মলার প্রিয়জন বেহালাদার একটু বিচিত্র ধরণের মানুষ, সারাদিন বেহালাটি লইয়া ব্যস্ত। ছড়িতে রজন ঘষিতেছে, বেহালাব কান টানিয়া টানিয়া তার ছিঁড়িতেছে আবার তার পরাইতেছে। কখনও ঝাড়িতেছে, কখনও মুছিতেছে। মাঝে মাঝে কখনও সযত্ন-সঞ্চিত বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাখাইতে বসে। কিন্তু বড় একটা বাজায় না। আসরে বাজায়, বাসায় নতুন গানের মহলা বসিলেও বাজায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সারাদিন যে মানুষটা বেহালা লইয়াই বসিয়া থাকে সে কখনও আপন মনে কোন গান বাজায় না ইহাই সকলের আশ্চর্য লাগে। ছড়ি টানিয়া সুর বাঁধিতে বাঁধিতেই জীবন কাটিয়া গেল তবে এক-একদিন, সেও কৃচিৎ গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, সে বেহালা বাজাইতে বসে। সেও একটি গান। এবং তেমনি দিনটিরও একটি লক্ষণ আছে। সেদিনের সে লক্ষণ নিতাই আবিস্কারও করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারে। নির্মলাব ঘরে আগন্তুক আসিয়া যেদিন সারারাত্রির মহোৎসব জুড়িয়া দিবে সেই দিন; নিতাই বুঝিতে পারে যে আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে।

সে এক অদ্ভুত গান। নিতাই বাজনায় সে গান শুনিযাছে। অন্ধকারে কোন গাছতলায় একা বসিয়া বেহালাদার সে গান·বাজায়। কিন্তু কেহ কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদার বেহালাখানি নামাইয়া রাখে। এমন রাত্রে, অর্থাৎ নির্মলার ঘবে মহোৎসবের রাত্রে নিতাই এই গানটি শুনিবার জন্য ঘুমের মধ্যেও উদগ্রীব হইয়া থাকে। নিস্তব্ধ রাত্রে বেহালার সুব উঠিবামাত্র তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু সে ওঠে না, শুইয়া শুইয়াই শোনে। একমাত্র মহিষের মত লোকটাকেই বেহালাদার গ্রাহ্য করে না। লোকটা যেন লোকই নয়, একটা জড় পদার্থ। লোকটাও চুপচাপ রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া নিশা-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

ললিতার প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক, তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনদার লোকটির সঙ্গে। বাজনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহাদের লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গেও ঝগড়া বাধিয়া যায়। ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, লোকটা মাসীর কাছে নালিশ করে, মাসীর বিচারে পরাজয় যাহারই হউক, সে-ই ললিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে—দোষ হইছে আম্মার, ঘাট মানছি আমি। আর কখুনও এমন কর্ম করব না। কান মলছি আমি। লোকটা সত্যই কান মলে।

নির্মলা ও বসন্ত লোকটার নাম দিয়েছে—'ছুঁচো। ছি-চরণের ছুঁচো।' কথাটা অবশ্য

আড়ালে বলিতে হয়, নহিলে ললিতা কোঁদল বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না, হাসে।

বাজনদারটির প্রিয়তম কেহ নাই। জুটিলেও টেঁকে না। লোকটির কেমন স্বভাব—যে নারীটির সহিত সে প্রেম করিবে, তাহারই টাকা-পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে। লোকটি প্রৌঢ়। নির্মলা, ললিতা দুইজনেই এক এক সময় তাহার প্রিয়তমা ছিল। কিন্তু ঐ কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে। লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভাল—যেমন তাহার তালজ্ঞান, বাজনার হাতটিও তেমনি মিঠা। কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন। রাত্রে বাজনা বাজায়, দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে।

নির্মলা ললিতা নিতাইয়ের একটা নাম দিয়াছে। বলে—'বসন্তের কোকিল'।

বসন্ত নিতাই দুজনেই হাসে।

নূতন জীবনে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতাইয়ের দিন কাটিতে লাগিল। জীবন-স্রোতের টানে কোথা হইতে সে কোথায় আসিয়া পড়িল, ঠাকুরঝি কোথায় ভাসিয়া গেল, রাজা কোথায় থাকিল—এ সব ভাবিতে গেলে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বসন্তের মুখপানে চাহিয়া সে তাহা পারে না। যে গিঁটটা সে বাঁধিয়াছিল সে গিঁটটা যেন অহরহই বাঁধা আছে, খুলিতেছে না। ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, এক হাতে চোখের জল মুছিয়া, অন্য হাতখানি কবিগানের সঙ্গে দর্শকদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে নিস্পৃহ নিরাসক্তির এমন একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে যে, সব কিছুই তাহার সহ্য হইল, অথচ সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিকে সঙ্কুচিত করিল না। বসন্তকে ভালবাসিল। দুই হাত দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে ভুলিল না। বসন্তের ঘরে যেদিন মানুষ আসে সেদিন এক গাছতলায় শুইয়া মনে মনে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কয় অথবা বিরহের গান বাঁধে। অহরহই তাহার মনের মধ্যে ঘোরে গানের কলি। বসন্তের কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে, কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোন রকমে খাপাইয়া লইয়া সেই গানটি সে গাহিবেই গাহিবে—

"তোরা—শুনেছিস কি—বসন্তের কোকিলঝঙ্কার।
বাঁশী কি সেতার—তার কাছে ছার—
সে গানের কাছে সকল গানের হার।"

'কোকিল' নামটাই তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। 'কালো কোকিল'। ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত।

ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে। অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগানের লাইন তাহার মুখস্থ। হরুঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যান্টনী সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া

ফেলিয়াছে। অবসর সময়ে কত খেয়ালই হয় নিতাইয়ের। বসিয়া বসিয়া ঝুমুর দলের মেয়েদের 'লক্ষ্মীর কথা'টিকে সে একদিন পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিল। বসন্ত যখন ব্রতের কথা শোনা শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাঁই করিয়া নিতাইকে প্রসাদ খাইতে দিল, তখন নিতাই বলিল—কথা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার কাছে একবার শুনে লাও।

সবিস্ময়ে বসন্ত বলিল—কি?

—লক্ষ্মীর কথা। বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলার সুরে আরম্ভ করিয়া দিল—

"নমো নমো লক্ষ্মী দেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।
শতদল পদ্মে বৈস—তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহে না পাপ—তাই তো চঞ্চলা।"

বসন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে যোগাড় করলে? নতুন পাঁচালীর বই কিনেছ, তাতেই আছে বুঝি?

নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিতে লাগিল।

—বল কেনে?

—আগে শোনই কেনে। ভনিতেতেই সব পাবে।

"অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনহ নিখিল।"

মুখরা দর্পিতা বসন্ত উল্লাসে বিস্ময়ে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল—ওগো মাসী, নক্ষ্মীর পাঁচালী নিকেছে।

মাসী জিজ্ঞাসা করিল—কি? কে?

বসন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—নক্ষ্মীর পাঁচালী। লিখেছে তোমার জামাই।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে সে আসর করিয়া সকলকে ডাকিয়া কবিয়ালের পাঁচালী শুনাইয়া তবে ছাড়িল। নিতাইকে বলিল—বেশ সুর করে বল।

নিতাইয়ের পাঁচালী শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই পাঁচালীটি ভাল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের পরিচিত কবিয়ালেরা কবি গান করে, ছড়া কাটে, দুই-চারিটা গানও লেখে, কিন্তু এমনভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালী রচনা করে না। সে-কালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে, তাই আজ পর্যন্ত চলিয়াছে, ভনিতার সময়ে—সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশে—ইহারা প্রণাম জানায়। সকলে বিস্মিত হইল যে নিতাই তেমনি পাঁচালী রচনা করিয়াছে। এবং সেই দিন হইতেই তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গেল।

নিতাইয়ের পাঁচালীই এখন এই দলটিতে ব্রতকথা দাঁড়াইয়াছে। শুধু এই দলের নয়,

আর পাঁচ-সাতটা দলের ওস্তাদ এই পাঁচালী লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে যখন মেয়েরা বসিয়া তাহার রচনা করা লক্ষ্মীর পাঁচালী বলে, তখন নিতাই একটু গম্ভীর হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়, যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তাহার দপ্তরটিও ক্রমশ বড় হইয়া উঠিল। অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে। আজকাল কলিকাতা হইতে বই আনায়। এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসী। মাসী অনেক জানে। নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায়। সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে। বিদ্যাসুন্দরের সন্ধান তাহাকে মাসীই দিয়াছিল। বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোঁপা না বাঁধিয়াই বেণী ঝুলাইয়া কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিলেন। নিতাই বলিয়াছিল- বিনুনীতেই তোমাকে মানিয়েছে ভাল বসন, খোঁপা আর বেঁধো না।

মাসী সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল-

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

নিতাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাসীর দিক চাহিয়াছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসী বলিয়াছিল—'বিদ্যেসোন্দর' জান বাবা? রায় গুণাকরের 'বিদ্যেসোন্দর'?

বসন্ত, ললিতা, নির্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল—আজ কিন্তু 'বিদ্যেসোন্দর' বলতে হবে মাসী।

সব কি মনে আছে মা। ভুলে গিয়েছি।

—তবে সেই তোমার কথাটি বল। সেটি তো মনে আছে। বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

—মেলেনী মাসীর কথা? মাসী হাসিয়া আরম্ভ করিয়াছিল—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।"

মাসী গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁক কোন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে পাছে কোন্দলের দায়।"

নিতাই মাসীর কাছে বসিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে বলবে মাসী, আমি খাতায় লিখে রাখব?

—আমার তো সব মনে নাই বাবা। তুমি বিদ্যেসোন্দর বই আনাও কেনে। বটতলার ছাপাখানায় লিখে দাও, ডাকে চলে আসবে। তুমি দাম দিয়ে ছাড়িয়ে লেবে। বটতলার ঠিকানা পাঁজিতে পাবে।

বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদামঙ্গল পাইয়াছে। বইয়ের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাশু রায়ের পাঁচালী, উদ্ভট কবিতার বইও আনাইয়াছে। দাশু রায় পড়িয়া তাহার মনের একটা সংশয় কাটিয়াছে। "ননদিনী, ব'লো নাগরে। ডুবেছে রায় রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" এবং "গিরি, গৌরী, আমার এসেছিল,—স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করায়ে চৈতন্যরূপিণী

কোথায় লুকাল," দাশু রায়ই লিখিয়াছেন ; আবার খেউড়েও দাশু রায় চরম লেখা লিখিয়া গিয়াছেন। আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশু রায়কে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণাম করে।

খেউড় আর তাহাকে খুব বেশী গাহিতে হয় না, গাহিতেও আর সঙ্কোচ হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই কবিয়াল এবং কবিগান-শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিয়া শোনে ; অশ্লীল খেউড়, গালিগালাজের উত্তরে সে চোখা-চোখা বাঁকা রসিকতায় গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে। কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিয়ালের সঙ্গে আসর পড়িয়াছিল। লোকটা বুড়া হইয়াছে, তবুও যত তাহার টেরির বাহার তত লোকটা অশ্লীল। খেউড়ে নাকি বুড়ার নামডাক খুব। লোকে তাহাকে 'খেউড়ের বাঘ' বলে।

সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে। বুড়াই আগে আসর লইয়া নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল সেই সম্বন্ধ পাতাইয়াই চন্দ্রাবলী অর্থাৎ বসন্তকে বুড়া গালিগালাজ দিতে আর বাকী রাখিল না। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ হিসাবে নিতাইকে যেন জীবন্ত মাটিতে পুঁতিতে চাহিল। এই সম্বন্ধটা কবির পাল্লায় বড় সুবিধার সম্বন্ধ। বিশেষ যে আগে আসরে নামে, সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালিগালাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া লয়। তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চড় মারিয়াছিল, সেদিন প্রতিপক্ষ কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইয়াই তাহাকে সে জব্দ করিয়াছিল, সে কথাও কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাইলেই প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। লোকটা আসরে নামিয়াই খেউড় আরম্ভ করিল। নিতাইয়ের চেহারা, বসন্তের চেহারা লইয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া আসর শেষ করিল।

নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌঢ়া বলিল—বাবা, সেই পুরনো পালা। খানিকটা রঙ চড়াবে নাকি ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—চড়াব বইকি। দেখি এক আসর, তারপর হবে। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল। গানটা সেই পুরনো গান।

"এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে—কুঁচকো মুখে—আর রসকলি কাটিস নে।
রসের ভিয়েন না জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে।
শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নেই আর আলবোট তুলে—
ও তোর—ফোক্‌লা দাঁতে—পড়ছে লালা—জিভ দিয়ে আর চাটিস নে।
—ও—হায়,—বুড়ি মরে না —মরণ নাই—
ও—ভয়ে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।"

—ভয় কিসের ? দোহারগণ, জান তোমরা যমের ভয়টা কিসের ?

একজন বলিল—অরুচি, যমের অরুচি।

—উঁহু।

অন্য একজন বলিল—পাছে সেখানে পেজোমি করে তাই।

—উঁহু। বলি চন্দ্রাবলী, তুমি জান ?

বসন্ত বিব্রত হইল, কি বললে কবিয়ালের মনোমত হইবে বা সুবিধা হইবে সে জানে না, তবু সে ঠকিবার মেয়ে নয়, সে বলিল—বুড়ি পাছে যমের সঙ্গে পিরীত করতে চায়, তাই সে ওকে নেয় না।

নিতাই বাহা-বাহা করিয়া উঠিল। লোকেও একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ঠিক ঠিক। বলিয়াই সে গান ধরিয়া দিল—

"ও পাছে, পিরীত করিতে চায়—যম ওরে নেয় না তাই—
ও তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।
যমকে ভালবাসিস নে।"

নিতাইয়ের মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্যে, ব্যঙ্গ শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় জমিয়া উঠে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে। বসন্তও আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না, তবে নাচে সে বিভোর হইয়া। লোকে পছন্দ করে। জনতার এক-একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু বেশী অংশ তারিফই করে। দুই-দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে। নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে।

সে গান ধরে

"(তোমায়) ভালোবাসি ব'লেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ,
নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভাল আমার মরণ।"

সে আরম্ভ করে, তুমি বন্দ—তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু—তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ—পূর্ণিমায় পূর্ণিমায়—কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া—তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল রূপের মাধুরী—। ওগো দূতী—সে-ই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রংশ দেখিয়া মনের যাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ তোমার নিজের কথা।

"রসের ভাণ্ডারী তুমি—কথা তোমার মিছরীর পানা
সেই তুমি আজ হাটে বেচ—সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।'

আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই।

বসন্ত রাগ করে, কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারার মিষ্ট কথা বললে?

সে বলে—ওকে বিঁধে বিঁধে মারতে হ'ত। খাতির কিসের?

নিতাই হাসিয়া বলে—বসন, নরম গরম পত্রমিদং, বুঝলে? নরম গরম—মিঠে কড়া—বুঝলে কিনা—ওতেই আসর মাৎ। তারপর বুঝাইয়া বলে—লোকটার বয়েস হয়েছে—প্রাণে দুঃখ দিলে কি ভাল হ'ত। তুমিই বল।

বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিতাই হাসিয়া বলে—রাগ করলে বসন?

বসন্ত হাসিয়া বলে—না।

—তবে?

—তবে ভাবছি, তুমি আমাকে সুদ্ধ নরম ক'রে দিলে।

নিতাই হাসে।

বসন্ত বলে—সে চড় মনে পড়ে?

—সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না। ও আমার গুরুর চড়।

বসন্ত আজ তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়।

খেউড়, যাহাকে বলে কাঁচা খেউড় অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীলতার গান,—সেও তাহাকে গাহিতে হয়। দুই একটা স্থানে, গভীর রাত্রে এমন গান না গাহিলে চলে না। শ্রোতারা দাবী করে। আবার এমনও আসর আসে যেখানে এই বুড়ার মত প্রতিদ্বন্দ্বীরা হটিয়া হটিয়া গিয়া নিজেরা আস্তাকুঁড়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকেও টানিয়া আনে। আসর ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া গোড়াতেই তাহা বুঝা যায়। একটা পালা গানের পরেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া উঠে থমথমে। চোখ দুইটা হইয়া উঠে উগ্র। প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায়। দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে, আজ লাগিল। বসন্ত এবং প্রৌঢ়া বুঝিতে পারে সর্বাগ্রে।

প্রৌঢ়া বলে—বসন! ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে।

বসন্ত উত্তর দেয়—হ্যাঁ মাসী!

সে অ.'র হইতে বাহির হইয়া যায়, সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে—শোন।

প্রৌঢ়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়—বাবা! ডাকছে তোমাকে। বাবা গো!

নিতাই চমকিয়া উঠে। তারপর গম্ভীর মুখেই বাহিরে যায়, বসন্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়। সে জানে কিসের জন্য বসন্ত তাহাকে ডাকিতেছে। গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া মদ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া নিতাই আসিয়া আসরে বসে আর এক চেহারা লইয়া।

তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিতে থাকে—খেউড়ে অশ্লীলতায়। প্রতি আসরের পূর্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ গ্লাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে। সে খায়। মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায়। বসন্তর মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠে। সেদিন আসরে আর কিছু বাকী থাকে না। নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিশেষ স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠে—তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ; সমাজের আবর্জনা-স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে রক্তবীজের মতো। ভাষায়—ভাবে—ভঙ্গীতে অশ্লীল কদর্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধে না। শুধু তাই নয়—সেদিন সে এমন উগ্র হইয়া উঠে যে, সামান্য কারণেই যে কোন লোকের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়।

প্রৌঢ়া সেদিন দলের লোককে সাবধান করে। বলে, হাতি আজ মেতেছে বাবা। তোরা একটুকুন সমীহ ক'রে স'য়ে থাক। তোরা সব কত সময়ে কত বলিস। ও তো সব সয়।

নির্মলা হাসিয়া বলে—মাউতকে (মাহুত) বল মাসী।

প্রৌঢ়া হাসে—সে বসন্তের দিকে চায়। বসন্তও হাসে। এমন দিনে বসন্তের সে হাসি অদ্ভুত হাসি।

বসন্তের মুখে এই হাসি দেখিয়া নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসে; বলে—কি লো হাসতে

গিয়ে যে গলে পড়েছিস বসন!

বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা—চোখ তাহার ঢুলঢুল করে। সে তবুও হাসে কারণ এমনি দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশার দিন। এমন দিনই নিতাই বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়। বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয়া উঠে।

সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। বসন্ত নির্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি। তবুও এমন দিনটি বসন্তের বহু প্রত্যাশার দিন।

সহজ শান্ত নিতাই আর এক মানুষ—সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাইরে।

তখন বসন্ত আপনা হইতে গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না, আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না। তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়—বসন্ত যেন কত ছেলেমানুষ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না—এমন পরম সমাদর আছে তাহার মধ্যে।

বসন্ত ছুতোনাতা করিয়া অভিমান করে, কাঁদে।

নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়। বলে—তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাই বসন।

তারপর গুনগুন করিয়া গান ধরে—

"তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি।
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জানি নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বলে—বল সত্যি কি না।

বসন্ত মনে মনে খুশী হয়। মুখে তাহার হাসি ফোটে। নিজেই চোখ মুছিয়া সে বলে—বলব না। হ্যাঁ, কোকিল বটে আমার! বাহারের গান হয়েছে। শেষ কর। লিখে রাখ।

কিন্তু শেষও হয় না, লিখিয়া রাখাও হয় না। অসমাপ্ত গানগুলি হারাইয়া যায়

এই সেদিন একদিন—নিতাই যে গানটি গাহিল, সে গানটি শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তের প্রথম রূপ। বসন্তর চোখে সে কি প্রখর চাহনি সে দেখিয়াছিল। আজ সেই বসন্তই কাঁদিতেছে।

নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল—

"সে আগুন তোমার গে-লো কোথা শুধাই তোমারে?
ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে,
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখো নি কি সখি হে?
ও হায়—সে আগুন আজ জল হ'ল কি পড়াইয়া আ-মারে?
শুধাই তোমারে!"

গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল? অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে বসন্ত ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল—গানটি শেষ কর, আমি শিখে তবে উঠব। তারপর বলিল—তোমাকে চড় মেরেছিলাম, সে কথা তুমি ভোল নাই তা হ'লে?

নিতাই বলিল—ভগবানের দিব্যি বসন—

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আবার হাসিয়া বলিল—এই তো, তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে পার না।

বসন্ত তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাললাগে। এই তো গান। পদাবলীর 'পিরীতি' এক, আর টপ্পার ভালবাসা অন্য জিনিস—একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়। এই না হইলে গান!

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে?"

কিংবা

"ভালবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"

আহা-হা! এ যেন মিছরীর পানা। নিতাই মিছরীর পানার সহিত তুলনা দেয়। নিতাইয়ের সাধ, সে এমনই গান বাঁধিবে—সে মরিয়া যাইবে, নূতন কবিয়াল নূতন ছোকরারা তাহার গান গাহিবে আর বলিবে—বাহবা! বাহবা! বাহবা!

অহরহই তাহার মনে গানের কলি গুনগুন করে।

আবার মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া ওঠে। মনে পড়িয়া যায় সেই রেলস্টেশন। সেই তাহাকে।

গ্রামপথে চলিবার সময় দ্বিপ্রহরে—দূরে পথের বাঁকে—হঠাৎ রোদের ছটায় ঝকমক করিয়া উঠে স্বর্ণবিন্দুর মত একটি বিন্দু। বাংলা দেশে পল্লীগ্রামে—এই সময়টাই জলখাবারের সময়, গরু খুলিবার বেলা, এই সময়েই কৃষকবধূরা মাঠে যায় পুরুষের জলখাবার লইয়া, গৃহস্থঘরে দুধের যোগান দেবার সময়ও এই। মাঠের পথে—গ্রামের পথে—ঘটি মাথায় চলন্ত কৃষকবধূদের রৌদ্রচ্ছটা প্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয়া উঠে।

তাহার মনে পড়ে সেই কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। ঠাকুরঝি। সঙ্গে সঙ্গে সব বিস্বাদ হইয়া যায়। এসব তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না! ইচ্ছা হয় এইখান হইতেই সে ছুটিতে আরম্ভ করে, ফিরিয়া যায় তাহার সেই গ্রামে; কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেল লাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহার সেই পুরানো বাঁধা গান—"ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।"

—নাঃ!

পরক্ষণেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—নাঃ। চাঁদ, তুমি আকাশে থাক। ঠাকুরঝি, তুমি সুখে থাক। সংসার তোমার সুখের হোক।

আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই? পাঁচদিন আবার আসর বসিবে, এবার

আর ঝুমুরদলের কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয়। আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা। তারণ কবিয়াল, মহাদেব কবিয়াল, নোটন কবিয়ালের মত দস্তুরমত কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে। একটা মেলার আসরে কবিয়াল হিসাবে পাল্লা দিবার জন্যে তাহাকেই শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল। ঝুমুরদলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই। তবু সে বলিয়াছে—উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং উহারাও যাইবে।

এ বায়নার পর দল চলিবে ধুলিয়ান অঞ্চলের দিকে। সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে? দলটা কানা হইয়া যাইবে যে। সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তা ছাড়া—বসন্ত আছে। বসন্তকে সে কথা দিয়াছে। সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনে পড়ে গাঁটছড়া বাঁধার কথা। কথা আছে—যে কেহ একজন মরিলে তবে এ-গাঁটছড়া খুলিয়া লইবে অপর জন। ভাবিতে ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠে। বসন্তের মৃত্যুকামনা করিতেছে সে? না না। ঠাকুরঝি, তুমি দূরেই থাক—সুখেই থাক-তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হইবে না। সে বসন্তের কালো-কোকিল—যেখানে বসন্ত সেইখানে ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে পারে না সে। বসন্ত বাঁচিয়া থাক—সে সুস্থ হইয়া উঠুক। বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন ক টা দিন। ইহার মধ্যে—বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি ভালবাসার শেষ করিতে পারিবে সে? ইহার পর আবার ঠাকুরঝিকে ভালবাসিবে? এমনি করিয়াই তো একদিন ঠাকুরঝিকে ছাড়িয়া—তাহাকে ভালবাসার লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া—চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে, তাহাকে ভাল বাসিতে সুরু করিয়াছে। আবার বসন্তকে ছাড়িয়া ঠাকুরঝির কাছে? না। এই ভাল।

তবুও তাহার ভাল লাগে না। সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে। কখনও আপনিই এক সময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসে, কখনও বা দল হইতে কেহ যায়, ডাকিয়া আনে।

বসন্ত বলে এই দেখ, এইবার তুমি ক্ষেপে যাবে।

নিতাই নির্বিষ্টচিত্ততার মধ্যেই হাসে—কেনে? কি হ'ল?

—সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে এলে। খেতে-দেতে হবে না?

—ভারি ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন

—না, এখন খাও দিকিনি।

—না। আগে শোন। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া আরম্ভ করে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল। গানটা শুনিয়া সে মনে পাথর হইয়া গেল।

নিতাই সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বসন। কী হ'ল বসন? বসন।

ধীরে ধীরে দুই চোখের কোণ হইতে দুটি জলের ধারা গড়াইয়া আসিল বসনের। সে বলিল—এ গান তুমি কেনে লিখলে কবিয়াল?

—কেনে বসন?

ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলিল—আমি তো এখন ভাল আছি কবিয়াল—তবে তুমি কেনে লিখলে, কেনে তোমার মনে হ'ল জীবন এত ছোট কেনে?

অকারণে নিতাইয়ের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

আঠারো

সত্যই বসন এখন ভালো আছে। অনেক ভাল আছে। দেহের প্রতি যত্ন তাহার এখন অপরিসীম। মদ এখন সে খুব কমই খায়। দূর্বাঘাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এমন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দূর্বাঘাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয়। স্বাস্থ্যও তাহার এখন ভাল হইয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ মুখখানি অনেকটা নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষ দীপ্ত গৌর বর্ণে একটু শ্যাম আভাস দেখা দিয়াছে। কথার ধার আছে, জ্বালা নাই। এখন আর সে তেমন তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না। মুচকিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

ললিতা নির্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না। বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোনো কাজ করে তখন ললিতা নির্মলাকে অথবা নির্মলা ললিতাকে একটি কথা বলে—'হায়- সখি, অবশেষে।'

অর্থাৎ যে পিরীতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত, সেই পিরীতিতেই সে পড়িল অবশেষে।

বসন্ত রাগে না, মুচকি হাসিয়া শুধু বলে—মরণ।

প্রৌঢ়াও হাসে। মধ্যে মধ্যে সেও দুই-চারিটা রহস্য করিয়া থাকে।

—বসন, ফুল তবে ফুটল। কোকিল নাম পাল্টে ওস্তাদের নাম দে বসন ভোমরা। কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো?

বসন্ত হাসে।

শুধু একটা সময়, বসন্ত—পুরানো বসন্ত। সেটা সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার পর হইতেই সে উগ্র হইয়া উঠে। এটা তাহাদের দেহের বেসাতির সময়। সন্ধ্যার অন্ধকার হইলেই ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়। মেয়েরা গা ধুইয়া প্রসাধন করিয়া সাজিয়াগুজিয়া বসিয়া থাকে। তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায়। অথবা আপন আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে—মোট কথা, এই সময়ের আলাপ-রঙ্গরহস্য সবই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়া-ছাড়া। মেয়েরা ইঙ্গিতময় ভাষায় অশ্লীল ভাবের রঙ্গরহস্য করে নিজেদের মধ্যে।

নির্মলা মৃদুস্বরে ডাকে—নি-ব, নি-স, নি-ন্ত। অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে—বসন্ত।

বসন্ত উত্তর দেয়—নি-কি? মানে—কি?

ওই নি শব্দটাকে যোগ করিয়া তারপর চলে অশ্লীল রহস্য। কোন একদিনের ব্যভিচার-বিলাসের গল্প। সকলেই তাহারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। যেন সম্মুখের দেহব্যবসায়ের আসরের জন্য মনটাকে তাহারা শানাইয়া লয়। এই কাজ হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। একদিকে মাসী দেয় না, অন্যদিকে চিরজীবনের অভ্যাস—সেও দেয় না। উপায় নাই।

পুরুষদেরও এ সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন পাতে। তাহাদেরও যেন সামাজিক ভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া যায়। একান্ত নির্লিপ্তের মত তাহারা বসিয়া থাকে।

নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে, আপনার লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দপ্তর খোলে, লেখে, পড়ে। বসন্তর ঘরে আগন্তুকদের মত্ত কণ্ঠের সাড়া জাগে—নিতাই রামায়ণ পড়ে। কৃষ্ণলীলা পড়ে। গানও রচনা করে—

'আর কতকাল মাকাল ফলে ভুলবি আমার মন?"

অথবা—

"আমার কর্মফল

দয়া ক'রে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল।"

কখনও সে বসিয়া ভাবে। ভাবে, বড় বড় কবিয়ালদের কথা—যাহারা সত্যকারের কবিয়াল। ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না। তেমন বায়না ইদানীং তাহার ভাগ্যেও দুই-একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার তাহার এ দল হইতে বাহির হইয়া পড়া উচিত। এক বাধা বসন্ত। বসন্ত যে রাজী হয় না। সে সবই বুঝিতে পারে। তবুও সে এ দল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। আশ্চর্য! সে আপন মনেই একটু হাসে।

—কি রকম? হাসছ যে আপন মনে?

নিতাই চাহিয়া দেখে—বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। সে বসিয়া আছে অল্প দূরে। বেহালাদার বসিয়া আপনার বেহালাখানিকে লইয়া পড়িয়াছে। সুর বাঁধিতেছে। সে-সুর-বাঁধা যেন তাহার ফুরাইবার নয়। সুর বাঁধিয়া এ- পার ছড়ি টানিয়াই আবার তার-বাঁধা কানটায় মোচড় দেয়। তার কাটিয়া যায়। বেহালাদার ন তার পরাইতে বসে। ছড়িতে রজন ঘষে। বেহালাখানাকে ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ লাগায়।

নির্মলার ঘরে কলরব উঠে।

বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে—বাজনা তাহার ভাল জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। এ-টা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়। লম্বা টানা একটা সুর। সুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে বাজিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠে। মনে হয়, যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে, চারিদিক যেন হিম হইয়া গেল যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনের চিন্তা-ভাবনাও যেন অসাড় হইয়া যায়।

দোহারটা তর্ক করে বাজনাদারের সঙ্গে।

বাজনাদারটার উপরে কোন কিছুর ছায়া পড়ে না। তাহার কেহ ভালবাসার জন নাই। সে হা-হা করিয়া হাসে—বাজনা বাজায়। দোহারটার তর্কের জবাব দেয়। মধ্যে মধ্যে মেয়েদের ঘরে গিয়া মদ খাইয়া আসে। বেহালাদারের জন্য মদ লইয়া আসে। তারপর ঘুম পাইলেই বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়ে।

দোহারটি ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে।

মহিষের মত লোকটা ধুনির সম্মুখে বসিয়া থাকে। প্রৌঢ়া ঘরগুলির প্রতির সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া সুপারি কাটে। লোকজন আসিলে মেয়েদের ডাকিয়া দেখায়, দরদস্তুর করে, টাকা আদায় করে। গোপনে মদ বিক্রি করে। প্রৌঢ়ার এই সময়ের মূর্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গম্ভীর, কথা খুব কম কয়, চোখের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রূকুটি উদ্যত করিয়াই রাখে ; দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয়। বসন্ত উগ্র হইয়া দেহের খরিদ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে। প্রৌঢ়া মাসী আসিয়া দাঁড়ায়, বসন্তকে সে প্রায় ধমক দেয়।—এই বসন। কি ব্যাপার ? ঝগড়া করছিস কেনে ?

—বেশ করছি। মদ খেতে বলছে, আমি মদ খাব না।

—এক-আধটু খেতে হবে বৈকি। তা না হ'লে হবে কেনে ? লোকে আসবে কেনে ?

—না আসে, না-ই এল। আমার ঘরে লোক এসে দরকার নাই।

—দরকার নাই।

—না।

—বেশ, কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেয়ো। আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

শুধু বসন্তই নয়, নির্মলা ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে। তাহারাও বলে—দরকার নাই, আর পারি না। মাসীর কিন্তু ক্লান্তি নাই, সে অনড়। তাহার সেই এক উত্তর—তা'হলে বাছা তোমাদের নিয়ে আমার দল চলবে না। তোমরা পথ দেখ। ঝুমুর দলের লক্ষ্মী ওইখানে। ও পথ ছাড়লে চলবে না।

সকলকেই চুপ করতে হয়, বসন্তকেও হয়। আবার এটাও আশ্চর্যের কথা যে, ব্যবসাটা তাহারা ছাড়িতে চায়, সে জীবনে বিষ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই ব্যবসায় ও সেই জীবনে ভাটা পড়িয়া আসিলে, মন্দা পড়িলে তাহাদেরই আর ভাল লাগে না, তাহারাই চিন্তিত হইয়া পড়ে। আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয়।

দূর, দূর, রোজগার নাই, পাতি নাই, লোক নাই, জন নাই—কিছু নাই। সব ভোঁ ভোঁ। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে—ঠিক বলেছিস, ভাই, ভাল লাগছে না মাইরি।

—ললিতে।

—কি ?

—এ কেমন জায়গা বল তো ?

—কে জানে ভাই। পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম নাকছাবি গড়াব ব'লে, চার টাকা খরচ হয়ে গেল। বসন।

বসন চুপ করিয়াই থাকে। তাহার দেহ-মন দুই-ই ক্লান্ত। নির্মলা ললিতা আবার ডাকে। কি লো চুপ করে রয়েছিস যে।—তারপর বলে—তোর ভাই অনেক টাকা।

কোন দিন ইহার উত্তরে বসন ফোঁস করিয়া উঠে। ঝগড়া বাধিয়া যায়। কোন দিন বিষণ্ণ-হাসি হাসিয়া উঠিয়া যায়। মেয়েটার মতিগতি কখন যে অস্থির, কখন যে শান্ত, বুঝিয়া ওঠা দায়। ঝগড়া বাধিলে নিতাইকে আসিয়া থামাইতে হয়। বসনকে ঘরে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া শান্ত করে। শান্ত হইলে প্রশ্ন করে—কেন এমন কর বসন?

বসন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বলে—জানি না।

নিতাই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়।

খুব বেশী মন্দা পড়িলে—মাসী নূতন পথ ধরে। মেয়েদের ডাকিয়া বলে—আজ সাজগোজ কর দেখি ভাল ক'রে। গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে যাব।

অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনিবে।

মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুরঘাটে যায়। স্নো, সিঁদুর, পাউডার, টিপ লইয়া সাজিতে বসে। হাঙ্গামা হয় বসনকে লইয়া। সে কোনদিন যাইতে চায়—কোনদিন চায় না। মাসী ইহার ওযুধ জানে। সে আগে হইতেই বসনকে খানিকটা মদ খাওয়াইয়া রাখে। অবশ্য মদ খাওয়াইবার জন্য অনেক ছলনা করিতে হয়, ভুলাইতে হয়।

ধোয়া ধপধপে কাপড় পরনে প্রৌঢ়া গালে একগাল পান পুরিয়া মেয়েদের সঙ্গে বাহির হয়।

মেয়েদের এই দেহের বেসাতির উপার্জনেও প্রৌঢ়ার ভাগ আছে। এই উপার্জন তিন ভাগ হইবে। দুই ভাগ পাইবে উপার্জনকারিণী মেয়েটি, এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌঢ়া—এই নিয়ম। গানের আসরে উপার্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয়। আসরের উপার্জন হয় আট ভাগ—আট ভাগ হইতে-এক ভাগ হিসাবে-মেয়েটি তিনটি পায় তিন ভাগ—এক ভাগ প্রৌঢ়ার—দুই ভাগ কবিয়ালের, এক ভাগ বেহালাদারের—এক ভাগ আধ ভাগ হিসাবে দোহার ও বাজনদার পায়। উপার্জন যে লোক হইতে হইবে না—প্রৌঢ়া তাহাকে দলে রাখিবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উপার্জনের পথগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কোন দিক হইতে ক্ষীণতম সাড়া পাইলেই সে মিষ্টিমুখে সরস বাক্যে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলে—কে গো বাবা? এস, এগিয়ে এস। লজ্জা কি ধন? ভয় কি? এস এস। আগন্তুক আগাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয়, পান দিয়া সম্মান করিয়া বলে—পানের জন্য দু আনা পয়সা দাও বাবা। দিতে হয়।

পয়সা কটা খুঁটে বাঁধিয়া তবে মেয়েদের ডাকে—ওলো বসন, নির্মলা ইদিকে আয়। বলি ললিতে, ক'ভরি সোনা কানে পরিছিস লো?

এমনি একদিন—

মাসী তাহাকে ডাকিল—বসন! শোন, একটি লোক তোকে ডাকছে লো, বলছে সে তোকে চেনে।

বসন্ত সেদিন বলিল—আমার গা কেমন করছে মাসী। শরীর ভাল নাই।

শরীরে আবার কি হ'ল তোর? কিছু হয় নাই, শোন ইদিকে। একটু মদ খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে শরীর। শোন, ইদিকে আয়।

আহ্বান—আদেশ। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বসন বাহির হইয়া আসিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, গায়ে সুগন্ধি মাখিয়া একটি রীতিমত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী বলিল—দেখি, তোর গা দেখি।.....ওমা, গা যে দিব্যি—আমার গা তোর চেয়ে গরম। ওগো বাবা, মেয়ের আমার শরীর খারাপ, একটু মদ খাওয়াতে হবে। সহসা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কাছেই আছে।

রূপোপজীবিনী নারীর আজীবনের বহু ভোগের নেশা। সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া বসন্তের মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠিল। কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।

মাসীও হাসিল। সে তো জানে, এ বিষ একবার ঢুকিলে—প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না। বসন্তের শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোকটা চলিয়া গেল বসন্তেরও নেশা ছুটিয়া যায়। মদের নেশার প্রতিক্রিয়ার মতই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া ওঠে। নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিল। এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে, কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আজও করিল। কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয়, কোথায় যাইবে? ওই মাসী—ওই নির্মলা—ওই ললিতা ছাড়া—কে কোথায় আপন জন আছে তাহার? এই দুনিয়া-জোড়া পথ ছাড়া ঘব কোথায় তাহাদের?

দিন সাতেক পর।

বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসীকে বলিল—মাসী।

বসন্তর কণ্ঠস্বরে মাসী চমকিয়া উঠিল। এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরানো বসন্তব কণ্ঠস্বর।—কি বসন?

কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বসন্ত- সেই পুরানো বসন্ত বলিল—ওষুদ, মাসী; আমার ব্যামো হয়েছে।

—ব্যামো? কাসি?

না না না। বসন্তর চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল—সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই প্রৌঢ়া নিজের ভুল বুঝিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়া মাসী বলিল—তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরী করে দেব। তিনদিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস না।

ইহাদের জীবনের এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য, আসিবেই। মানুষের জীবনে কোন্ কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল—সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে কিন্তু এ ব্যাধি অনিবার্য। শুধু অনিবার্যই নয়, এই ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াই সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের। এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে। ডাক্তারও দেখায় না, কবিরাজও না। নিজেরাই চিকিৎসা করে। ধরা-বাঁধা হাতুড়ে চিকিৎসা। চিকিৎসা অর্থে—ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়। কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধুলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া

দিয়া চলিয়া যায়। সে সব কথা ইহারা ভাবে না। এইটাই যে সে-সব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে।

বসন্তও আকুল হইয়া মাসীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাসী রোগের চিকিৎসা জানে।

সংবাদটায় ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছু নাই। শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হয়, রোগগ্রস্তার গামছা কাপড়ের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিলেই হইল। তাহারই মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা-দোষের আভাস ফুটিয়া উঠে।

গামছা-কাপড় সাবধান করিয়া নির্মলা ললিতা আসিল।

বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

নির্মলা পাশে বসিয়া বলিল—চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।

নিতাই, গত রাত্রের কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল, লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বসন্ত নির্মলাকে বলিল—বারণ কর।

সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না।

নির্মলা বলিল—দাদা—দাদা—

নিতাই হাসিয়া বলিল—কেনে ব্যস্ত হচ্ছ বসন? কিছু ভয় ক'রো না তুমি, আমার কিছু হবে না

নির্মলা অবাক হইয়া গেল।

তিনদিনের স্থলে নয়দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। সর্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে, দেহে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল। এমন ক্ষেত্রে রুগ্ন মেয়েগুলির দুর্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে। যেটুকু সেবা—যেটুকু যত্ন জোটে, সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই। নিতাই কিন্তু বসন্তর শিয়রে বসিয়া আছে প্রশান্ত হাসিমুখে।

সেদিন।

বাহিরে রাত্রি তখন নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরের সমীপবর্তী হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর। জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঢুকিতেছিল। সুরের সাড়ায় সে জাগিয়া উঠিল। একটু না হাসিয়া সে পারিল না। খেয়ালী বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে। আজ নির্মলার ঘরে বীভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে। বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথাই বটে। সন্ধ্যা হইতেই সে আজ এই সুর শুনিবার প্রত্যাশাও করিয়াছিল। বড় মিঠা হাত। কিন্তু অদ্ভুত সুর। বেহাগের আমেজ আছে। শুনিলেই মনে হয়, গভীর গাঢ় অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল।

—আঃ। ছি। ছি। ছি।—বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—কি বসন? কি হচ্ছে?

—আঃ। বারণ কর গো—বাজাতে বারণ কর।

—ভাল লাগছে না ?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল—নাঃ, নাঃ। আমার হাত পা যেন হিম হয়ে আসছে।

ছড়ির টানে একটা দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে। রাত্রি যেন কাঁদিতেছে।

উনিশ

পুরা এক মাস লাগিল। এক মাস পর বসন্ত রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া বসিল। কিন্তু বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিয়া চেনা যাইতেছিল না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহবর্ণের উজ্জ্বলতা, লাবণ্য সব কিছু নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়- সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কয়লার গুঁড়া মাখাইয়া দিয়াছে। মাথায় সে চিকন কালো দীর্ঘ চুলের রাশি হইয়া উঠিয়াছে কর্কশ পিঙ্গলাভ। শুধু বর্ণই নয়—তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিয়াছে। তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ। রস-নিটোল কোমল দেহখানা কঙ্কালসার। বসন্তের গরব-করা রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুটি চোখ। শীর্ণ শুষ্ক মুখে চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে। চোখ দুইটা জলজল করিয়া জ্বলিতেছিল। ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মত।

সেদিন মাসী বলিল—বসন, বেশ ভাল ক'রে 'ত্যালে হলুদে' মেখে চান কর আজ।

বসন্ত নিস্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে কোন উত্তর দিল না, একটু নড়িল না, চোখের একটা পলক পর্য্যন্ত পড়িল না।

মাসী আবার বলিল—রোগের গন্ধ মরবে, অঙ্গের কালচিটে খসখসে বদছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।

বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মাসী এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল—গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল ; ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—ললিতে, বাটিতে করে খানিক তেল গরম করে দে তো মা। আর খানিক হলুদ। তারপর সে ডাকিল নিতাইকে—বাবা। বাবা কোথা গো ?

নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্তর রোগশয্যা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল। বিছানাপত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমাকে বলছ মাসী ?

হাসিয়া প্রৌঢ়া বলিল—বাবা মানুষের একটাই গো বাবা। সে আমার তুমি। ভাল বাবা তুমি, মেয়ে ডাকছে—বুঝতে লারছ ?

হাসিয়া নিতাই বলিল—বল।

—বসনের চিরুনি আর তেলের শিশিটা দাও তো বাবা, মাথায় জট বেঁধেছে—আঁচড়ে দি।

বসন্ত এতক্ষণে কথা বলিল—বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওসব কি হবে?

ঘরের মধ্যে তেলের শিশি ও চিরুনির সন্ধানে যাইতে যাইতে নিতাই বলিল—কাচতে হবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—না। বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্না তাহার আর থামে না।

নিতাই আশ্চর্য মানুষ। সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মাসী যা বলছে তাই শোন বসন। এ সব এখন তুমি ভেবো না।

বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল।

নিতাই আবার বলিল—আমারও তো মানুষের শরীর। আমার রোগ হলে তুমি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ো। আমি না হয় মহাজনের মত হিসেব ক'রে শোধ নেব। না কি বল মাসী?

সে হাসিতে হাসিতে বিছানাগুলি লইয়া গেল।

ললিতা, নির্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বসন আমাদের ভাগ্যিমানী।

রোগ-ক্লেদ ভরা বিছানা কাপড় সমস্ত ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল। ললিতা নির্মলা দেহোপজীবিনী। তাহাদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ, আসে, চলিয়া যায়। যদি বা কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয়—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মত দেহোপজীবিনীর দেহে দুর্দশার আভাস আসিবামাত্র সে চলিয়া যায়। নির্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে তিনবার, ললিতার হইয়াছে দুইবার। রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র তাহাদের ভালবাসার জন পলাইয়াছে। নির্মলার একজন প্রেমিক আবার—রোগের সুযোগে তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়া ছিল। আজ নিতাইয়ের আচরণ দেখিয়া তাই তাহারা অবাক হইয়া গেল। শুধু নিজেদের নয়—তাহাদের সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই।

বিছানা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, বসন্ত তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল। তেলহলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন্ত খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে; মাথায় চুল আঁচড়াইয়া প্রৌঢ়া একটি এলো খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছে—কপালে একটি সিঁদুরের টিপও দিয়াছে।

রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুশী হইল। বলিল—বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত লাগছে

বসন্ত হাসিল। তারপর ফেলিল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। নিতাইয়ের কথাগুলা যেন বসন্তের ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল। বসন্তর হাসির মধ্যে যত বিদ্রূপ তত দুঃখ। তাহা দেখিয়া নিতাই বিচলিত না হইয়া পারিল না।

কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল—আমি মিথ্যে বলি নাই বসন। তোমার রং ফিরেছে—দুর্ব্বল হোক, চেহারার রোগা রোগা ভাব গিয়েছে—বিশ্বাস না হয়, আয়নায়

তুমি নিজে দেখ। সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া আয়নাখানা পাড়িয়া আনিয়া বসন্তর সম্মুখে ধরিয়া দিল।

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল

বসন্তের বড় বড় চোখের কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া, শুষ্ক কালো বারুদের মত—তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। মুহূর্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া বসন্ত তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্বল হাতের লক্ষ্য—আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইয়াছিল—তাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিন-চার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাচের টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেই মুহূর্তে একটি কঠিন কণ্ঠস্বর রণরণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।—বসন!

নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল মাসী। গম্ভীর কঠোর স্বরে মাসী আবার বলিল—বসন!

বসন্ত তেমনি নীরব অচঞ্চল; চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিস্পলক।

—বলি, রোগ না হয় কার? তোর একার হয়েছে? জানিস—এই মানুষটা না থাকলে তোর হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি হ'ত?

বসন্ত তবু উত্তর দিল না। আর মাসীর এ মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয়। এ মাসী আলাদা মাসী। নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী। মেয়েরা হইতে পুরুষ—এমন কি তাহার নিজের ভালবাসার জন—ওই মহিষের মত বিশালকায় ভীষণদর্শন লোকটা পর্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় পায়। নিতাইও এ স্বর, এ মূর্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল। কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ মূর্তি সে আজ প্রথম দেখিতেছে।

মাসী আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল—বসন! কথার জবাব দিস না যে বড়!

বসন্ত এবার দাঁড়াইল, নিস্পলক চোখে স্থির দৃষ্টি মাসীর দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—দুইজনের মাঝখানে। মাসীর চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মত। বসন্তর চোখে আগুন—তাহার চেতনা নাই—কিন্তু ভয়ও নাই—শুধু দাহিকাশক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে। নিতাই সবিনয়ে হাসিয়াও দৃঢ় স্বরে বলিল—বাইরে যাও মাসী। ছি! রোগা মানুষ—

—রোগা মানুষ! রোগ সংসারে আর কারও হয় না? ওর একার হয়েছে? ঝাঁটা মেরে—

—ছি মাসী, ছি!

—ছি কেনে—ছি কেনে শুনি?

—রোগা মানুষ। তা ছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই।

—আমার দলের লোকের ওপর করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেনে? তুমি আমার দলের লোক, কবিয়াল।

নিতাই শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে—একটু হাসিয়াই বলিল—তা বটে! তবে বসনের জন্যই তোমার

দলে আছি মাসী। নইলে—। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—যাও, তুমি বাইরে যাও।

প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। দলনেত্রী এ কথাটা ভাল করিয়াই জানে। দলের সর্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার, প্রতিটি কপর্দক তাহার হাত দিয়া বিতরণের বিধি—তাহার আসন, তাহার সাজ-সরঞ্জামের আভিজাত্য, প্রত্যেক জনকে তাহার অধীন অনুগত করিয়া তোলে। নিজের যৌবনে—তাহার দলনেত্রীর দলের সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তাহার দলেও এতদিন পর্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক্ষেত্রে তাহার দুর্দান্ত রাগ হইবার কথা, সক্রোধে ওই ভীষণ দর্শন লোকটাকে আহ্বান করাই উচিত। কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটাও তাহার মনে হইল না। মনে হইল—এ লোকটি তাহার আনুগত্য কোনদিনই স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, অস্বাভাবিকও কিছু নাই। নিতাই কোনমতেই তাহার কোন অপমানই করে নাই।

তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তা হ'লে শেষকালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—মা মাসী তো সমান কথা গো। এখন ঘরে যাও, বউ-বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

আর কোন কথা না বলিয়া সে অনুরোধ মানিয়া লইল, চলিয়া গেল।

নিতাই এবার বসন্তর দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি। রোগা শরীরে কি এত রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন।

অকস্মাৎ বসন্ত সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল—আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন?

বসন্তের কান্না বাড়িয়া গেল। সে কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুধের দোকানে চিঠি লিখেছি। সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাসিতে আরম্ভ করিল। কাসিয়া খানিকটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন দেখাইয়া দিল।

—কি?

এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল—অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—রক্ত!

—রক্ত?

—সেই কালরোগ। বসন্ত আবার হাসিল। এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটা বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল। কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়াছে।

নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তোলা শ্লেষ্মার মধ্যে টকটকে রাঙা আভাস সুস্পষ্ট। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি হাসিয়া সে একদৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাইও নিজের দুই হাতের বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মত তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল—ভয় কি? রোগ হ'লেই কি মরে বসন? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

এবার সে এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন্ত নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না।

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমি জানতাম কবিয়াল। যেদিন সেই গান তোমার মনে এসেছে—সেই দিনই জেনেছি আমি।

—কোন গান বসন?

—জীবন এত ছোট কেনে—হায়।

ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাইয়ের চোখেও এবার জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়। জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?

তারপর?

তারপর আর হয় নাই। অসমাপ্ত হইয়াই আছে। নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কবে শেষ হইবে কে জানে!

বসন্তই আবার কথা বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয়? তার ওপর ওই গান তোমার মনে এসেছে! কি করে এল?

বসন্তের মনের কথা হইয়া উঠিল দৈববাণীর মতই সত্য, মিথ্যা নয়।

দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে বসন্তের গায়ে স্পষ্ট জ্বর ফুটিয়া উঠিল। সে নিতাইকে

ডাকিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—দেখ কত গরম।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—হায় জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে কবিয়াল।

কথাটা হইতেছিল একটা ছোটখাটো শহরে, শহরের নামটাই বলি না কেন, কাটোয়া। কাটোয়ার এক প্রান্তে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল—ললিতাকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।

–না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—না।

—এই আধ ঘন্টা। আমি দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসব।

–না গো—না। যদি কাসি ওঠে? যদি রক্ত দেখতে পায়? তবে এই পথের মধ্যেই ফেলে আজই এখুনি পালাবে সব। যেও না, তুমি যেয়ো না।

নিতাই অগত্যা বসিল। রক্ত উঠার কথা আর সকলের কাছে লুকানো আছে।

জ্বরটা যেন আজ বেশী বেশী বাড়িতেছে। অন্য দিন রাত্রি প্রহরখানেক হইতেই খানিকটা ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, বসন্ত অনেকটা সুস্থ হয়। আজ ঘামও হয় নাই—সে সুস্থও হইল না। মধ্যে মধ্যে জ্বরজর্জর অসুস্থ বিহ্বল ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিয়া সে চারিপাশে খুঁজিয়া নিতাইকে দেখিতেছিল—আবার চোখ বন্ধ করিয়া এ-পাশ হইতে ও-পাশ ফিরিয়া শুইতেছিল। অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত।

নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল। তাই যতবার সে চোখ মেলিয়া তাহাকে খুঁজিল, ততবার সে সাড়া দিয়া বলিল—আমি আছি। এই যে আমি।

রাত্রি তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহব অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপে নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে, এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শী তো ধীরে ধীবে জাগিয়া উঠে। সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূ হইয়া পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারিত ধুমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছের পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে। হতচেতন হইয়া এ সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয়। মাটির ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিম-স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জীব জীবনের চৈতন্যলোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করিয়া দেয়। আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর; সে লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে—ধকধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রি দেবতার ললাট-চক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। নিতাই শত চেষ্টা করিয়াও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ তাহার চেতনা ফিরিল বসন্তের আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে। দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো!

সে কি আর্তবিহ্বল তাহার কণ্ঠস্বর!

—কি বসন? কি? উঠে বসলে কেনে? শোও, শোও। বসন্তর হাত দুইটি হিমের মত ঠাণ্ডা; পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে তাহার সর্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তের সর্বাঙ্গে ঘাম।

—বারণ কর! বারণ কর!

—কি?

—বেহালা! বেহালা বাজাতে বারণ কর গো!

—বেহালা? কই? নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও—তাহাদের দুইজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া—আর কোন ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না।

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না? ওই যে, ওই যে! কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে!

চকিতের মত একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

বসন্তর দেহের স্পর্শই তাহাকে সে কথাটি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিল। মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া নিতাই সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দের নাম কর বসন—

—কেনে? বসন্ত তাহার বিহ্বল চোখ দুইটা নিতাইয়ের মুখের দিকে স্থাপন করিয়া অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কেনে?

কেনে, সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না।

মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মূহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।

নিতাই অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল, সে নালিশের সব দায়দাবী, কি জানি কেন, তাহারই মাথার উপর যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিল।

বসন্ত এপাশে ফিরিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।

তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া একটু

ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—বসন। বসন।

—না, আর ডেকো না। না। বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

কুড়ি

গঙ্গার তীরবর্তী শহর। গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশানেই, নিতাই-ই বসন্তর সৎকার করিল। সাহায্য করিল মেয়েরা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল। দোহার—ললিতার ভালবাসার মানুষ—সে মুখ ফুটিয়া বলিল—ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক। আবার কেনে?

নিতাই হাসিল, প্রতিবাদ করিল না কিন্তু তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিবার লক্ষণও দেখাইল না। তার্কিক দোহার লোকটি ছাড়িল না, বলিল—হাসির কথা নয় ওস্তাদ। পরকালে কি জবাব দেবে বল।

নিতাই হাসিয়া বলিল- কোন জবাব দেব না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ভাই।

বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—যাক ভাই, ও কথা যাক। বলিয়াই সে বেহালায় ছড়ির টান দিল।

চিতার উপর শবদেহ চাপাবার পূর্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ। বসন, আমার সোনার বসন। দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। পাশেই বালুচরের উপর বসিয়া ছিল নির্মলা এবং ললিতা। নিঃশব্দ কান্নায় তাহাদের চোখ হইতে শুধু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায়।

নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল—দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও। সে আসিয়া বসন্তর আভরণ খুলিতে বসিল। নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীর কি-ই বা আভরণ। কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকছাবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তর গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার।

নিতাই হাসিল। বলিল—খুলে নিচ্ছ মাসী?

মাসী কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া অন্ধকার, খাদ্য বিষ, আর কিছু ছোঁব না—কখনও কিছু খাব না আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়, পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়, লোকের সঙ্গে চোখ জুড়তে হয়। বাঁচতেও হবে, খেতে-পরতেও হবে—ওগুলো চিতেয় দিয়ে কি ফল হবে বল। বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে হাতের গহনাগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—এগুলি

আবার আমার পাওনা বাবা!

নিতাই আবার একটু হাসিল, হাসিয়া সে বসন্তর নিরাভরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল।

প্রৌঢ়া বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওয়ারিশান! প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললিতা, নির্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্তর চিতার দিকে চাহিয়া ছিল। বসন্তর বিয়োগে বেদনা তাহাদের অকৃত্রিম, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল নিজেদের কথা। তাহাদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হইবে, মাসী এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে। বহুভাগ্যে যদি বুড়া হইয়া বাঁচে, তবে ওই মাসীর মতই তাহারাও হয়তো দলের কর্ত্রী হইবে। তখন—, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কল্পনা তাহাদের ততদূর গেল না, আশার চেয়ে নিরাশাই তাহাদের জীবনে বড়। শুধু তাহাই নয়, নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্তটিতে বড় ভাল লাগিতেছে। তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে, মাসী বাঁচিয়া থাকিবে।

*   *   *

সৎকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, মহিষের মত লোকটা বসন্তর ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বসন্তর জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে।

আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের একপাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপজর্জর, পরিশ্রমক্লান্ত দেহখানা ছড়াইয়া দিল।

সে ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কি? পুরাণে পড়া 'মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়; ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্ম বিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইবে হইবে। বসন্তর সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায়? তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই সে যাইবে। সে হয়তো অনন্ত নরক।

তা হোক। সেদিন তো আবার তাহার সহিত দেখা হইবে! কিছুক্ষণ পর মনটা আবার হায় হায় করিয়া উঠিল। আজ কিছুতেই তাহার মন ভরিতেছে না। তাহার কোলের উপরেই যে বসন্ত লুটাইয়া পড়িয়া মরিল, সে যে নিজহাতে তাহার দেহখানা পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে কিছুক্ষণ আগে। আর যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বসন্তকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না!

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।

বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত। ঝকমকে ক্ষুরের মত মুখের হাসি, আগুনের শিখার মত তাপ, তেমনি রঙ তেমনি রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতই বসন্তের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল। গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না।

মরণ সত্যসত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা। সেই গহনা প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য বসন্তর কত যত্ন। এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না।—সেই দেহখানা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, ক্ষোভ, মোহ এক মুহূর্তে মরণ সব ঘুচাইয়া দিল। মরণ অদ্ভুত। থাকিতে থাকিতে তাহার মনে সেই গানের কলিগুলা গুনগুন করিয়া জাগিয়া উঠিল।—

এই খেদ মোর মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়। জীবন এত ছোট কেনে।
এ ভুবনে?

বসন বলিয়াছিল, কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি কেনে বাঁধলে কবিয়াল। গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়। হায়। বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ—যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওযা যায় না—মরণে কি তাই মেলে? সুর গুনগুন করিয়া উঠিল।

জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে?

মেটে। তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে—সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে যে ফুলটি বয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে—পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে—সে জগতে? ওঠে? ওঠে?

এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়। জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

হঠাৎ একটা কলহ-কোলাহলে তাহার গানের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল। বাহিরে দলের লোকেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্মলা তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা শুনিয়া সে আরও মর্ম্মাহত হইল। ঝগড়া বাধিয়াছে বসন্তের স্থান পূরণ লইয়া। ছি! ছি। ছি।

বসন্ত আজই মরিয়াছে, দুপুরবেলা পর্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল ! তাহার স্থান কে লইবে সেই সমস্যা এখনই পূরণ না করিলেই নয় ? প্রৌঢ়া বসন্তের জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ললিতা, নির্মলা আজ নিজেরা খরচ দিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেহালাদার, দোহার ও ঢুলীটা আলোচনা করিতেছিল কোন্ ঝুমুর দলে গানে-নাচে-রূপে যৌবনে সেরা মেয়ে কে আছে ! সর্ববাদিসম্মতভাবে 'প্রভাতী' নাম্নী কে একজন তরুণীর নাম স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে ; মেয়েটা নাকি বসন্ত অপেক্ষা আরও ভাল এই কারণে যে তাহার বয়স বসন্তের চেয়ে অনেক কম। দোহার বলিতেছে, তাহাকেই আনা উচিত। তাহাতে বিশ ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত লাগে তাহা দিয়াও তাহাকে দলে আনা উচিত। না হইলে এমন যে দলটা এদলটাও অচল হইয়া যাইবে।

ঢুলীটা এই কথায় বলিয়াছে—চিঁড়ে রসস্থ না হলে গলা দিয়ে নামে না। শুধু কবিয়ালের গান কেউ শুনবে না। ললিতা নির্মলা মুখপাত হ'লে চোখ বুজে গান শুনতে হবে।

ললিতা নির্মলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। একে রূপোপজীবিনী নারী, তার উপর মদের নেশা। রূপের নিন্দা শুনিয়া গালিগালাজে স্থানটা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নিতাইয়ের ভাল লাগিল না। সে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে চলিতে কখন একসময় আসিয়া দাঁড়াইল গঙ্গার ধারে, শ্মশানে। সেইখানে সে বলিল।

* * *

সামনে জনশূন্য শ্মশান। একটা চিতা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। এখানে ওখানে ছাইয়ের গাদা। গঙ্গার ওপারে পূর্বদিকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। দগ্ধ দেহের গন্ধে এখানকার বাতাস ভারী। ইহারই মধ্যে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দু'চোখ ভরিয়া নিতাই জীবনের ওপারকে কখনও সে দেখে নাই। জীবনের ওপারে মৃত্যুপুরী, মরণ ওখানে বসিয়া আছে।

পাড়ায় গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার ছিল। এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল। মনে হইতেছে, বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত। কপালে হাত রাখিয়া কতদিন সে চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন ছ্যাঁক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিত যে না চমকিয়া পারিত না। আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল !

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। অনেক গোপন সাধ তাহার ছিল। হঠাৎ মনে হইল—বসন্তের আত্মা যদি—। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মার তো দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে।

গভীর নিশীথ রাত্রে বসন্ত যদি আসে চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক রূপের দেহখানির সন্ধানে? বুকখানা তাহার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সে একেবারে আসিয়া বসিল—শ্মশানের ভিতর বসন্তের চিতার পাশটিতে। রাত্রির তখন সবে প্রথম প্রহর। সব স্তব্ধ। সব অন্ধকার। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। শহরের আলো কোলাহল অনেকটা দূরে। নিতাই চিতার পাশে বসিয়া মনে মনে বলিল—বসন এস!....বসন এস!.....বসন এস!....বসন এস।

বসন্ত কিন্তু আসিল না।

সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল, শকুন, কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল, তাহারা একে একে আসিল, কলহ করিল, খেলা করিল, চলিয়া গেল। গঙ্গার জলে কত জলচর-সশব্দে ঘাই মারিল, কিন্তু বসন্তর দেখা মিলিল না। সাবারাত্রি বালুচরের ধার ঘেঁষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু; আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে সড়কটায় কত গরুর গাড়ী গেল; গাড়ীর নীচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকিগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তর আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম পর্যন্ত হইল না। আকাশের তারাগুলা পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল; পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠিল। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গঙ্গার পূর্ব পাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপারে সারি-সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল, কলকল কলকল করিয়া পাখীগুলা একবার রোল তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নাঃ, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। খোলা চোখের সামনে যে বসন্ত কোথাও ছিল না, নিতাই চোখ বুজিতেই সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—বসন্ত। বসন্ত।

চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আকাশে অন্ধকারের ঘোর আরও কিছুটা কাটিয়াছে। নিতাইয়ের সম্মুখে গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা! কুকুরের পালগুলাও দেখা যাইতেছে। উদাস মনে আবাব সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কি! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তর ছবি; ছবি নয়; যেন সত্যিকারের বসন্ত; সে হাসিতেছে, সে কথা বলিতেছে। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় সাজিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে।

নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।—

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যাকে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জ্বালা ?
চিকন-কালা দিবস নিশি রাধায় যাচে।"

মনখানি তাহার পরিপূর্ণ মন হইয়া উঠিল। এ যে কেমন করিয়া হইল তাহা সে জানে না, তবে হইল। বসন্ত তাহার হারায় নাই। পরিপূর্ণ মনেই সে গঙ্গার ঘাটে নামিয়া মুখ-হাত ধুইল, তারপর ফিরিল বাসার দিকে।

বাসায় তখন বাঁধাছাঁদার তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—এই যে। এই যে।

দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল—আমি বলি, ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।

নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার সুরে তাহারই পুরানো একটা গানের দুইটি কলি আবৃত্তি করিয়া দিল—

"সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে—ভবনে ভুবনে রহি কেমনে ?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।"

ললিতা ঠোঁটে পিচ কাটিয়া বলিল—বল কি বোনাই, অঙ্গে তবে তোমার ছাই কই ?

নির্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স দাদা, আমি চা ক'রে দি।

বাজনাদারটি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কাল ছিলে কোথা বল তো ? কার বাড়ীতে ? সে কেমন হে ? অর্থাৎ তাহার ধারণা নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোন দেহব্যবসায়িনীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

বেহালাদার ধমক দিল—থাম হে, থাম তুমি। যেমন তুমি নিজে, তেমন দেখ সবাইকে। ব'স ওস্তাদ, ব'স।

নিতাই হাসিয়া বসিল।

প্রৌঢ়া এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তের কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাম-দস্তুর শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল। নিতাইকে বলিল—ওগো ব বা, এই বেলাতেই উঠছি। গুছিয়ে তোমার জিনিসপত্তর বেঁধে-ছেঁদে নাও।

নির্মলা একটি বাটিতে তেলমাখা মুড়ি নামাইয়া দিয়া বলিল—চায়ের জল ফুটছে, ততক্ষণে মুড়ি কটি খেয়ে নাও। কাল তো সারারাত খাও নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—বোন নইলে ভায়ের দুঃখ কেউ বোঝে না।

—আর মাসী বেটীর কথা বুঝি ভুলেই গেলে বাবা ? প্রৌঢ়া আসিয়া একটি মদের বোতল, গোটা দুয়েক গত রাত্রের সিদ্ধ ডিম, খানিকটা মাংস আনিয়া নামাইয়া দিল।—কাল রাত থেকে আনিয়ে রেখেছি। খাও, শরীলের জুৎ হবে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—মা মাসীকে কি কেউ ভোলে, না—ভোলা যায় ? চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—তুমি খাও, আমি আসছি।

প্রৌঢ়া চলিয়া যাইতেই ঢুলীটা আরও কাছে আসিয়া বসিল। নিতাই হাসিয়া বলিল—নাও, নাও, ঢেলে নাও, আরম্ভ কর।

কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে চুপি চুপি বলিল—বসনের কাপড়চোপড় বিক্রী হয়ে গেল। .

নিতাই কোন উত্তর দিল না।

অভিযোগ করিয়া ঢুলীটা আবার বলিল—গয়না দু-এক পদ রেতে খুলে নাও নি কেনে, বল দেখি ? এমুনি মুখ্যুমি করে, ছি।

নিতাই বোতল দেখাইয়া বেহালাদার ও দোহারকে বলিল—এস, নাও।

তাহারও এবার অপরিমেয় সহানুভূতির সঙ্গে কাছে আসিয়া ঘেঁষিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল—ওই। বোতল শেষ হয়ে গেল। তুমি ? তুমি তো কই—

নিতাই হাসিয়া বলিল—তা হোক, দরকার নাই।

—তুমি খাবে না ?

—নাঃ।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নিতাই বলিল বেহালাদারকে—তোমার কাছে একটা জিনিস শিখবার সাধ ছিল। রাত্রে বেহালায় তুমি যে সুরটি বাজাও ওই সুরটি বেহালায় বলতে শিখবো গলায় পারি, বেহালায় শিখব।

বেহালাদার বলিল—নিশ্চয়। তোমাকে শেখাব না ওস্তাদ ? দেখ দেখি। তিন দিনে শিখিয়ে দোব।

নিতাই হাসিয়া বলিল—তিন দিন আর পাব কোথায় তোমাকে ?

—কেনে ? সবিস্ময়ে প্রশ্নটা করিল দোহার। বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে আঁচ করিয়াছে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আজই আমি চলব।

—সে তো আমরাও। তুমি—

দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল—থাম, তুমি থাম।

নিতাই কিন্তু দোহারের কথা ধরিয়াই জবাব দিল—হ্যাঁ যাব সবাই, তোমরা এক পথে, আমি আর এক পথে।

বেহালাদার তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, শুধু বলিল—ওস্তাদ !

নিতাই একটু চুপ করিয়া রহিল, কথার উত্তর দিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল ;—মনে নূতন পদ আসিয়াছে।

'বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বল—কেমনে থাকে হেথায় ।'

হঠাৎ বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—শোন ওস্তাদ, শোন, সেই সুর তোমাকে শোনাই, শোন। এসেছে।

সে ছড়ি টানিল—লম্বা টানা সুর। সেই সুর।

ইহারই মধ্যে আসিয়া হাজির হইল মাসী।

—বাবা।

নিতাই হাত তুলিয়া ইসারায় জানাইল—এখন নয়, একটু পরে। কিন্তু বেহালাদার থামিয়া গেল। সে মাসীর মুখ দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে।

মাসী বলিল—কি শুনছি বাবা ?

—কি মাসী ?

—তুমি— ? তুমি চলে যাবে ? আমাদের সঙ্গে যাবে না ?

—না মাসী। খেলার একপালা শেষ হল। এবার নতুন পালা।

—অন্য দলে— ?

—না মাসী। এবার পথের পালা। এবার পথে পথে।

প্রৌঢ়া অনেক বুঝাইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। বসন্তর গহনা কাপড়-চোপড়ের দামের অংশ পর্যন্ত দিতে চাহিল। আরও বলিল—বসনের চেয়ে ভাল নোক আমি দলে আনছি বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাব কাছেই সে থাকবে।

নিতাই বলিল—না মাসী, আর নয়।

নির্মলা কাঁদিল।

নিতাইও একবার চোখ মুছিয়া বলিল—না ভাই, তুমি কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাব।

বেহালাদার বলিল—তুমি কি বিবাগী হবে ওস্তাদ ?

নিতাই ও-প্রশ্নের জবাবে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাই তো। বসন্তের সঙ্গে যে গাঁটছড়া ও গিঁঠ সে বাঁধিয়াছিল, সে গিঁঠ খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। এবার একটা নতুন ডাক যেন সে শুনিয়াছে। পথে পথে চলো মুসাফের। বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ সুরটি বাজিয়া উঠিল—বিবাগী ?

বৈরাগ্যই তাহার ভাল লাগিল।

একুশ

ঝুমুরের দল ধরিল দেশের পথ।

নিতাই কোন পথে কোথায় যাইবে তাহা ঠিক করে নাই, তবে ওই দলটির সঙ্গে থাকিবে না তাহা ঠিক, সেই কারণে দলের বন্ধন কাটাইবার অন্য একটা পথ ধরিল। কাটোয়া হইতে ছোট লাইন ধরিয়া ইহারা চলিল মল্লারপুরের দিকে। নিতাই বড় লাইন ধরিয়া উত্তর মুখে চলিল। শেষ মুহূর্তে ঠিক করিয়া ফেলিল সে কাশী যাইবে।

নির্মলা অনেকখানি কাঁদিল। মেয়েটা তাহাকে দাদা বলিত। দাদা বলিয়া নিতাইয়ের জন্য কাঁদিতে তাহার সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না।

শেষ মুহূর্তে ললিতাও কাঁদিল। বলিল—জামাই, সত্যিই ছাড়লে।

প্রৌঢ়া বর্তমানের আশা ছাড়িয়াও কিন্তু ভবিষ্যতের আশা ছাড়ে নাই। সে বলিল—চিরকাল তো মানুষের মন বিবাগী হয়ে থাকে না বাবা। মন একদিন ফিরবে, আবার চোখে রঙ ধরবে। ফিরেও আসবে। তখন যেন মাসীকে ভুলো না। আমার দলেই এসো।

বেহালাদার ম্লান হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

মহিষের মত লোকটাও বলিল—চললে ? তা— । খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল--সন্ন্যেসী হওয়ার কষ্ট অনেক হে। ভিখ করে পেট ভরে না—তা নইলে—বেশ, এস তা হ'লে।

তাহারা যাইবে ছোট লাইনের ট্রেনে—যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ী। ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল—গ্রাম ছাড়িয়া। সেই ছোট গাড়ীতেই চড়িয়া মাসী বলিল—এস বাবা, এই গাড়ীতেই চড়। এই লাইনেই তো বাড়ী। মন খারাপ হয়েছে—বাড়ী ফিরে চল বাবা।

বাড়ী। নিতাই চমকিয়া উঠিল। বাড়ী। স্টেশন। সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। সেই রেল লাইনের বাঁক। সেই স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল। সোনার বরণ ঝকঝকে ঘ মাথায় ক্ষারে-ধোওয়া মোটা খাটো কাপড় পরা অতি কোমল কালো মেয়েটি। সে তাহার ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই কতকালের পুরানো গান—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?
কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে ?"

নিতাইয়ের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত হাসি। কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা—কত পুরানো গান

তবুও নিতাই বার বার ঘাড় নাড়িয়া নীরবেই জানাইল—না। না। না।

তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কলি গুঞ্জন করিতেছিল—"চাঁদ তুমি আকাশে থাক।" মনে ঘুরিতেছিল "তাই চলেছি দেশান্তরে— ।" সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না। ঠাকুরঝি এতদিনে ভাল হইয়াছে, ঘর-সংসার করিতেছে। সে গিয়া আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। না সে যাইবে না। সে যাইবে না।

নিতাই নীরবেই বিদায় লইল। এই বিদায় তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল—বিদায়-ব্যথা-কাতর ম্লান মুখ। কাহারও সহিত কোনদিন ঝগড়া হয় নাই কিন্তু তাহারা যে এত ভাল—এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্তটির আগে কোনদিন কোন একটিবারের জন্যও মনে হয় নাই। বরং সে সময় তাহাদের দোষগুলাই অনেক বড় হইয়া তাহার চোখে পড়িয়াছে। মাসীকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্ট কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিষে ভরা, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিতে জানে না। পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসে না মাসী। আজ মনে হইল—না, না, মাসী মাসীরই মত, মায়েরই মত ভালবাসিত তাহাকে। তাহার চোখের ওই কয় ফোঁটা জল বসন্তের মরণকালের ভগবানের নামের মতই সত্য।

নির্মলা চিরদিন ভাল। মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।

ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি—শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মত মিষ্ট ছিল।

বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই সুর।

সেই সুরটাই ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গা-স্তব রচনা করিবার চেষ্টা করিল। হইল না। ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া সে বসিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে ? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মত ? না। এ কল্পনা তাহার ভাল লাগিল না। তবে ? কিই বা করিবে—কোথায়ই বা যাইবে ? হঠাৎ তাহার মনে হইল—হায় হায় হায়, হায় রে পোড়া মন। এই কথা কি ভাবিতে হয় ? ঠাকুর, ঠাকুরের কাছেই যাইবে সে। গোবিন্দ ! বিশ্বনাথ ! প্রভু—প্রভুর কাছে যাইবে সে। মায়ের কাছে যাইবে। মা অন্নপূর্ণা। রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী ! সে সেই সব দেবতার দরবারে বসিয়া গান গাহিবে—মহিমা কীর্তন করিবে—ভগবানকে গান শুনাইবে—শ্রোতারা শুনিয়া চোখের জল ফেলিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কিছু কিছু দিয়া যাইবে—তাহাতেই তাহার দিন গুজরান হইবে। তাহার ভাবনা কি ? হায় রে পোড়া মন—এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই ভাবিয়া পাইতেছিলে না ? এখান হইতে কাশী, বাবা বিশ্বনাথ—মা অন্নপূর্ণা। কাশী হইতে অযোধ্যা, সীতারাম—সীতারাম ! সীতারামের রাজ্য হইতে রাধা-গোবিন্দ, রাধারাণী—রাধারাণীর রাজ্য বৃন্দাবন।

তারপর মথুরা—না, না, মথুরা সে যাইবে না। রাধারাণীকে কাঁদাইয়া রাজ্যলোভী শ্যাম রাজা হইয়াছে সেখানে, সে রাজ্যে নিতাই যাইবে না। মথুরা হইতে বরং কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার। হরিদ্বারের পরেই হিমালয়—পাহাড় আর পাহাড়। ছেলেবেলায় পড়া ভূগোল মনে পড়িল—পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু পাহাড় আর নাই—হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। হিমালয়ের মধ্যেই মানস-সরোবর। সেখান পর্যন্ত নাকি মানুষ যায়। নিতাই মানসসরোবরে স্নান করিবে। তারপর জনশূন্য হিমালয়ের কোথাও একটা আশ্রয় বানাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। নিত্য নূতন গান রচনা করিবে—গাহিবে, পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া খুদিয়া লিখিয়া রাখিবে। সে মরিয়া যাইবে—তাহার পর যাহারা সে-পথ দিয়া যাইবে তাহারা

সে গান পড়িবে আর মনে মনে নিতাই-কবিকে নমস্কার করিবে।

শেষ বৈশাখের দ্বিপ্রহর। আগুনের মত তপ্ত ঝড়ো হাওয়া গঙ্গার বালি উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই পায়ের শস্যহীন চরভূমি ধূসরবর্ণ—যেন ধু ধু করিতেছে। মানুষ নাই, জন নাই, কেবল দুই-চারিটা চিল আকাশে উড়িতেছে—তাহারাও যেন কোথাও কোন দূর-দূরান্তরে চলিয়াছে। সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। "চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরী—বহুদূর যানা হোগা।" কাশী। সে স্টেশনে ফিরিয়া বড় লাইনে কাশীর টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িল।

নিতাই আসিয়া উঠিল কাশীতে।

ব্রিজের উপর ট্রেনের জানালা দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির গঙ্গার সাদা জল ঝকঝক করিতেছে—সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা-গঙ্গা যেন চোখ ঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে—জয় বাবা বিশ্বনাথ—অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়।

সেও তাহাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিল। জয়ধ্বনির সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া দিল। জয় বাবা বিশ্বনাথ। অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়।

স্টেশনে নামিয়া কিন্তু অকস্মাৎ একসময় তাহার মনের ছন্দ কাটিয়া গেল। সে যেন হঁচোট খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে বিব্রত এবং বিহ্বল হইয়া অনুভব করিল, সে কোন বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

বাংলা দেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতে ছিল। কাশীতেই নামিয়াই সে ভিন্ন ধরণের মানুষের মধ্যে মিশিয়া গিয়া একসময় প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল যে, এখনকার মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে তাহার জীবনের ছন্দ কোনখানে মিলিতেছে না। তাহার উপর কাশী—কাশী—কাশী—তাহার কল্পনার কাশী কোথায়? এ তো এই দোকানদানিভরা বিকিকিনির কোলাহলে মুখর এই নগরীটি নয়। কোথায় সেই বিশ্বনাথের কাশী?

বিহ্বলের মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতেছিল। কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহার ঠিক ছিল না। অবশেষে একখানা একায় উঠিয়া সে একাওয়ালাকে কোনমতে বুঝাইল সে যে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবে। একাওয়ালাই তাহাকে একটা চৌরাস্তায় নামাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে যাও। সেই পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ তাহার মুখ চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার থালা হাতে ধপধপে সাদা থান পরিয়া একটি মহিলা যাইতেছিলেন। সে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার মনে হইল—এ যে তাহাদের গ্রামের সেই রাঙা মা-ঠাকরুণ। হ্যাঁ—তিনিই তো। তেমনি ঝলমলে সম্ভ্রম-ভরা ভঙ্গিতে কাপড় পরিয়াছেন, মাথায় তেমনি আধঘোমটা,

মাথার চুলগুলি তেমনি ছোট করিয়া ছাঁটা—অবিকল তিনি। হারাইয়া-যাওয়া ছেলে যেন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনিভাবেই নিতাই আশ্বস্ত এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁহার আগে গিয়া জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল।

না, রাঙা মা ঠাকরুণ নন, তবে ঠিক রাঙামায়ের মতই। ইনি যে তাহাদের দেশের অন্য কোন গ্রামের আর কোন রাঙামা—তাহাতে নিতাইয়ের আর সন্দেহ রহিল না। এবং সত্যসত্যই সে হিসাবে তাহার ভুল হইল না।—তিনি বাঙালী বিধবা এবং যাঁহারা গ্রামে মা ঠাকরুণ হইয়া দাঁড়ান তাঁহাদেরই একজন বটেন। পতিপুত্রহীনা বাঙালী বিধবা কাশীতে বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে তাকাইয়া আছেন। জীবনের বোঝা নামাইবেন সেইখানেই। মন্দিরে পূজা সারিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নিতাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মা ঠাকরুণ।

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—কে তুমি বাবা?

নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে মা আমি এখানে বড় 'বেপদে' পড়েছি।

'বেপদ' শব্দটি তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিল। শব্দটি শুনিয়া তিনি বুঝিলেন লোকটি পল্লীর মানুষ এবং একেবারে নূতন এখানে আসিয়াছে।

তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কি বিপদ বাবা?

—আমি এখানকার কথাবার্তা কিছুই বুঝিতে পারছি না মা। তার ওপর গরীব 'নোক', আশ্রয় নাই; নতুন এসেছি।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—বুঝেছি এস, আমার সঙ্গে এস। স্টেশন থেকে আসছ বুঝি?

—হ্যাঁ মা। পথে পথে—। নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

তাহার এই নূতন মা—তাঁহাকে সে নূতন মা-ই বলিল; তিনি নিতাইকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। মানুষটি বড় ভাল।

নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যবিধাতাকে বলিল—প্রভু, তোমার মত দয়াল আর হয় না। অধমের ওপর দয়ার তোমার শেষ নাই। নইলে এমন বিদেশ বিভূঁয়ে এসেও মা যশোদার মত মায়ের আশ্রয় পেলাম কি ক'রে?

এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। কোন এক আদি-অন্তহীন আঁকাবাঁকা গলির ভিতর তাঁর বাসা—একখানি ঘর, একটুকরা বারান্দা। আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোণ। নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি বরং বাড়ীর বাইরে বসি। জাতে আমি বড় নীচু।

—কেন বাবা? এই বারান্দায় ব'স। হ'লেই বা নীচু জাত।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল। সত্যই মা যশোদা। বৃন্দাবনের মায়েরা—যশোমতীর দেশের মায়েরা কেমন মা তাহা সে জানে না, কিন্তু তাহার দেশের মায়েরা ছাড়া যশোদার মত মা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক—হিন্দুস্থানী কথা যাহারা বলে—তাহারা তাহাদের দেশে যায়—অনায়াসে এক বৎসর, দুই বৎসর এক নাগাড়ে কাটাইয়া দেয়, কই মাকে দেখিবার জন্য তো তাহারা

ছুটিয়া যায় না! মায়েরাও নিশ্চয় দেশে দিব্যি থাকে। যে যশোদা গোপালকে এক বেলার জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া কাঁদিতে বসিতেন সে যশোদার মত মা তাহারা কি করিয়া হইবে? তা ছাড়া এমন মিষ্টি কথা—আহা-হা-রে!—মা গো মা। না—কি বাবা গোপাল। এমন ডাক—এমন সাড়া—আর কোথায় মেলে?

মা তাহাকে একে একে কত কথা জিজ্ঞেস করিলেন—কি নাম, কোথা ঘর, কোথা পোস্টাপিস্, কোন্ জেলা? অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কে কে আছে বাবা? মা, ভাই—বিয়ে করনি বাবা? নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল ঠ'কুরঝিকে, মনে পড়িয়া গেল বসন্তকে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

নূতন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ—কত ঘর কোন জাত আছে বাবা মাণিক? তোমাদের কোন স্টেশন? তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন হয়েছিল বাবা? ধান ছাড়া আর কোন ফসল হয়? বর্ষা কেমন হয় বাবা? বাদলা হয় ঘন ঘন?

মায়ের চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

—বর্ষায় কাদা কেমন হয় বাবা? তোমাদের দেশে ডাবের গাছ বেশী, না তালের গাছ বেশী? ডাবের দর কি রকম? মাছ কেমন—কোন মাছ বেশী? তোমাদের দেশে মুড়ি কেমন হয় বাবা?

নিতাই একে একে জবাব দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এক-একটি ছবি।

—তোমাদের গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা? বড় দীঘি আছে গ্রামে? আঃ, কতদিন দীঘির জলে স্নান করি নাই। দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে? শালুক সব গ্রামেই আছে। নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে। কলমী-শুশুনীর শাক হয় বাবা?

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুরাইয়া যায়। মা চুপ করিয়া থাকেন উদাস মনে। বোধ হয়, তাঁহারও মনে পড়ে দেশের কথা। আবার হঠাৎ মনে পড়ে কোন একটা নূতন কথা, সেইটার পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন।

—তোমাদের ওদিকে সজনের ডাঁটা হয়? 'নজনে' আছে? পানের বরজ আছে? কেয়ার গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায়? গোখরো কেউটে সাপ খুব বেশী ওদিকে, না? নদীর ধারে শামুকভাঙা কেউটে থাকে? গাঙশালিক আছে? 'বউ কথা কও' পাখী আছে? থাকবেই তো। 'চোখ গেল' অনেক আছে, না? 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী? অনেকে বলে 'গেরস্তের খোকা হোক'। গায়ের রঙ হলুদ, মাথাটি কালো, ঠোঁটটি লাল-টুকটুকে, আমরা বলি—'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী, 'বেনে বউও' বলি—আছে?

হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। দেখিতে দেখিতে ফোঁটা দুই জল যেন আপনা-আপনি চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়া টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল—বোধ হয় তাঁহার

কৃষ্ণও কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন—মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখী। সেই পাখীর মাথায় ঝরে পড়ল—তাঁর চোখের এক ফোঁটা জল। সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল। পাখীটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—পাখী, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়! পাখী ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল—'কৃষ্ণ কোথা রে?' 'কৃষ্ণ কোথা রে?' চিরকাল সে ডেকেই ফিরছে।

নিতাইয়ের চোখ দিয়াও জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

মা বলিলেন—আমার কৃষ্ণও চলে গেছে বাবা। ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেউ নেই। তাই এসেছি বাবার চরণে। নইলে দেশ ছেড়ে—। অর্ধপথেই থামিয়া মা চোখ মুছিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন—তুমি কাশী এসেছ তীর্থ করতে? এই বয়সে তীর্থ। কিছু মনে ক'রো না বাবা—তোমাদের জাতের কেউ তো এমন ভাবে আসে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাত দুটি জোড় করিয়া নিতাই বলিল—পূর্বজন্মের কর্মফল—হয়ত আমার কর্মফল, নইলে—। নিতাই কথাটা শেষ না করিয়াই চুপ করিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলছিলে বাবা?

নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কাছে লুকোব না মা। আমার বাবা, দাদা, ভাই, মামা, মেসো, এরা সব চুরি-ডাকাতি করত। জেলও খাটত। সেই বংশে আমার জন্ম মা। আমি—বলিয়া সে থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার বলিল—বলিতে সে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, সসঙ্কোচেই বলিল—দেশে কবিগান শুনেছেন মা? দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বেঁধে পাল্লা দিয়ে গান করে?

—শুনেছি বইকি, বাবা। কত শুনেছি। আমাদের গাঁয়ে নবান্নের সময় বারোয়ারী অন্নপূর্ণাপুজো হ'ত। কবিগান হ'ত পুজোয়। দুর্গাপুজোয় হ'ত যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা—শখের যাত্রা। নীলকণ্ঠের গান—"সাধে কি তোর গোপালে চাই গো? শোন যশোদে!" সে সব গান কি ভুলবার? মনসার ভাসান গান হ'ত মনসাপুজোয়। চব্বিশ প্রহরের সময় কীর্তন হ'ত। বাউল বৈরাগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করত—"আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া।" আহা-হা! বাবা সেই কীর্তন-গানে শুনেছিলাম—"অমিয় মথিয়া কেবা লাবণি তুলিল গো তাহাতে গড়ি গোরাদেহ"—গোরাচাঁদের দেহ অমৃত ছেঁকে তৈরী হয়েছে। এ সব গান যে অমৃত-ছাঁকা জিনিস বাবা। কবিগান শুনছি বইকি!

নিতাই চুপ করিয়া গেল। ইহার পর আর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না।

বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কবির দলে থাকতে বাবা? নিজে কবিগান করতে?

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলিল—হ্যাঁ মা, অধম একজন কবিয়াল। তবে মা বড়দরের কবিয়াল আমি নই। আমি ঝুমুর দলের সঙ্গে থেকে গান করতাম।

—তা হোক না বাবা। কবিয়াল তো বটে। তা তীর্থ করতে বেরিয়েছ বুঝি?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ফিরব বলে বেরুই নাই মা।

ইচ্ছে আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব, তাতেই দিন ক'টা কেটে যাবে আমার।

বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাতে তো তুমি সুখ পাবে না বাবা। তুমি কবিয়াল—গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক কত প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, সুখ হবে। বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।—সুখ সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।

অপরাহ্নে সে মায়ের কাছ হইতে বিদায় লইল। ইহার মধ্যে সে তাহার সকল কথাই বলিল। রাজার কথা, বিপ্রপদর কথা। এমন কি বসন্তের কথাও বলিল। বলিল না শুধু ঠাকুরঝির কথা। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে সে গানও শুনাইল।

মায়ের বৃত্তান্তও সে সব জানিল। আপনার জন মায়ের কেউ নাই, একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দেশ হইতে জ্ঞাতিরা যাহারা তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে, তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায়, তাও অনিয়মিত। মা হাসিয়া বলিলেন—পেটের জন্যে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না বাবা, লজ্জা হয়। আবার কমিয়ে আধপেটা অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দু মাস যায়। তার মধ্যে উপোস করতে পারলে—বিধবার উপোস তো অনেক!

নিতাই অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ—সে মায়ের এই আধপেটা অন্নের ভাগ লইয়াছে! মা তাহাকে হাসিমুখে দিয়াছেন। ওঃ! সে বলিল—আমি এইবার উঠি মা। থাকলে আবার আসব।

নিতাই প্রণাম করিল দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, বলিল—আপনি দু'পা পিছিয়ে যান মা। আমি ওই ঠাঁইটির ধুলো নেব।

মা বলিলেন—তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা। আমি তো চান করব এখনি।

—না। নিতাই তাঁহার পা ছুঁইল না।

মা বলিলেন—অনেক সত্র আছে। জায়গা মিলবে। আমার ঘর এই তো দেখছ—তা ছাড়া এ বাড়িতে আর দশজন থাকে। সবাই মেয়েছেলে এখানে—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেবতার দেখা খানিকক্ষণের জন্যই বটে মা। চিরকালের পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা। আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

মা বলিলেন—তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে। এ তো বাংলা গানের দেশ নয় বাবা। অবিশ্যি গঙ্গার ঘাটে—ঘাট তো এখানে অনেক আর বাঙালীও অনেক—সেখানে বসে গান করলে অনেক শুনবার লোক পাবে—কিছু কিছু হয়তো পাবেও। কিন্তু সংসারে পেট চলাই তো সব নয় বাবা। একটু বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে কথাটি শেষ করলেন মা।

এই কথাটায় নিতাই একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন।

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া মায়ের কথার সত্যতা কিন্তু সে অনুভব করিল। ঘটনাটা ঘটিল এইরূপ। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দিরশীর্ষের ধ্বজা ও কলসের দিকে সে তাকাইয়া ছিল। সোনার পাত দিয়া মোড়া মন্দির। আকাশে ছিল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার ছটায় ঝলমল করিতেছিল।

চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার-বেশ দর্শনার্থীর ভিড়। হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি, সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল—জয় বিশ্বনাথ!

তারপর সে মনে মনে গান রচনা আরম্ভ করিল—

"ভিখারী হয়েছে রাজা মন রে আমার দেখ রে নয়ন মেলে
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে।"

গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল—আহা! প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল।

গান শেষ হইলে—অল্প কয়েকজন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল—তাহাদের একজন তাহাকে কিছু বলিল—তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল—কি বললেন প্রভু? আমি বুঝতে পারতা নাই।

একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল—তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।

—হিন্দী ভজন? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

বাঙালীটি হিন্দী-ভাষী প্রশ্নকারী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল, বোধ হয় বলিল—হিন্দী ভজন ও জানে না।

জনতার অধিকাংশই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

* * *

মন্দির হইতে সরাসরি আসিয়া সে গঙ্গার ঘাটে হাজির হইল।

চোখ তাহার জুড়াইয়া গেল। আহা, এ যে দিন-রাত্রি মেলা লাগিয়াই আছে। আর এ কি বিচিত্র মেলা! মা গঙ্গাকে সামনে রাখিয়া এ যেন ভবের খেলার হাট বসিয়া গিয়াছে। একদিকে মণিকর্ণিকা অন্যদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে শ্মশানচুল্লী জ্বলিতেছে। অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে—রাম নাম সত্য হ্যায়! লোকে বলে—এখানে যাহারা ভস্ম হইল তাহারা শিবলোকে চলিয়া গেল। শিবরাম! শিবরাম! শিবশম্ভু! কি তাহার মনে হইল, দশাশ্বমেধ হইতে পথের জনকে শুধাইয়া শুধাইয়া আসিয়া উঠিল মণিকর্ণিকার ঘাটে। মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া হঠাৎ সে পুঁটলিটা খুলিয়া বাহির করিল একটা পিতলের আংটি। আংটিটা বসনের। বসনের এই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে আছে। সেইটিকে এই রাজা

মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে। এই পুণ্যে বসনের সকল পাপ মুছিয়া যাক।

বসন তুমি স্বর্গে যাও।

কিন্তু ফেলিতে গিয়াও সে ফেলিতে পারিল না। হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে প্রায় ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। বসনের আর কিছু নাই। শুধু এইটুকু। না—থাক এটুকু। থাক। তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত থাক। ওঃ! বসন দিন দিন হারাইয়া যাইতেছে। কাশী আসিয়া অবধি বসনকে তাহার বোধ করি মনেই পড়ে নাই। স্বপ্নও দেখে নাই। কাটোয়ার ঘাটে বসিয়া সে চোখ বুজিতেই বসনকে দেখিয়াছিল। গান বাঁধিয়াছিল—

"মরণ তোমার হার হ'ল যে মনের কাছে।
ভাবলে যারে—কেড়ে নিলে—সে যে আমার মনেই আছে, মনেই আছে।"

কিন্তু কই? ওঃ। মনের কদমতলাও শুকাইতে শুরু করিয়াছে। বসনের মুখটা পর্যন্ত ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সেই গানটি আবার গুন্‌গুন করিয়া উঠিল—

"এই খেদ মোর মনে।
ভালবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে।
হায়। জীবন এত ছোট কেনে—?
এ ভুবনে?"

আংটিটা সে হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়া ফিরিয়া আসিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মনটা তাহার জুড়াইয়া আসিল। বড় ভাল স্থান এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এত বড় তীর্থ আর হয় না। কত দেশের কত মানুষ। কত পাঠ। কত গান। কত দান। কত ভিক্ষা। কত কামনা। কত দুঃখ। এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘাটটা কত প্রশস্ত। মনে হইল—এই ভাল। বাকী দিনগুলা এই ঘাটে-বাটে বাসা বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

পরদিন অপরাহ্নে সামনে গামছা পাতিয়া ঘাটের এক পাশে বসিয়া সে গান ধরিয়া দিল—

"এই খেদ মোর মনে।"

কণ্ঠস্বর তাহার অতি মিষ্ট। লোক জমিল, পয়সাও কিছু পড়িল। কিন্তু গান শেষে একজন বলিল—কাশীতে এসে এ খেদ কেন হে ছোকরা?

একজন মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, ভাল গান গাও। মহাজনের পদ গাও। রামপ্রসাদের গান—কমলাকান্তের গান—এই সব গান।

সে এবার ধরিল—

"আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
সর্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।"

গান শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন তাহার বিকল হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা

চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশে-পাশে ফিরিতেছেন। মায়ের পিছু পিছু যেন বসন ফিরিতেছে; ঠাকুরঝি ফিরিতেছে; রাজন ফিরিতেছে। বিপ্রপদ ফিরিতেছে। মাসী, বেহালাদার—ভিড় করিয়া ফিরিতেছে। কাশীর চেয়ে তাহার গ্রাম ভাল। কাশীতে জীবনের জন্য খেদ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু জীবনের জন্য খেদ না করিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া? নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। এখানে এখন প্রচণ্ড গরম। ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, আলাপ-আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু সব কথাই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহুদূরের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, স্বরধ্বনির রেশই কানে আসিতেছে, কিন্তু শব্দের অর্থের কথা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কাছে থাকিয়াও মানুষগুলি যেন অনেক দূরের মানুষ।

ভাল লাগিতেছে না। এ তাহার ভাল লাগিতেছে না। হোক কাশী, বিশ্বনাথের রাজত্ব, স্বর্গের সিংহ-দরজা, তবু তাহার ভাল লাগিতেছে না। ভিক্ষা তাহার ভাল লাগিতেছে না। মহাজনের মদ তাহার ভাল জানা নাই। আর নিজের গান ছাড়িয়া ওসব গান যত ভাল হোক গাহিয়া কাল কাটাইবার কল্পনাও করিতে পারে না সে। নিজের যেন ওরকম পদ ঠিক আসেও না। তাহার উপর সে ভিক্ষাবৃত্তিতেও ঠিক সে আনন্দ পাইতেছে না। কোথায় আনন্দ? সে অন্তত পাইতেছে না। কবিগানের আসর, ঝলমলে আলো, হাজারো লোক। ভাল লাগিতেছে না তাহার।

মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি। কবিয়াল তুমি, দেশে ফিরে যাও। স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে--তাহার খেয়াল ছিল না—অকস্মাৎ সে অনুভব করিল—জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সচেতন হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—লোকজন নাই; বোধ হয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর দুই-চারিজন লোক ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সেও ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরে পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আর কোথায়ই বা যাইবে? চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গাস্রোতের নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল—গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল—গঙ্গাও যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে; কাটোয়ায়, যে-দিন বসন্তর দেহ পোড়াইয়া ছিল, সে-দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়?

আবার তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে পাখীর ডাক সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু 'বউ কথা কও' বলিয়া তো তাহাদের কেউ ডাকে নাই; 'চোখ গেল' বলিয়া তো কোন পাখী ডাকে নাই—'কৃষ্ণ কোথা রে' বলিয়াও তো কোন পাখী কাঁদিয়া ফেরে নাই এখানে। কাকের স্বর পর্যন্ত কেমন ভিন্ন রকম। মা তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক।

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও

কি—এই দেশেরই ভাষা বলেন ? তাঁহার এই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা—তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না ? হিন্দী ভজন ? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুশী হন ? 'মা অন্নপূর্ণা'—তিনিও কি হিন্দী বলেন ? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন—তবে কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন ? তবে ? তবে ? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে ? আবার তাহার মনে পড়িল—তাহাদের গ্রামের 'মা-চণ্ডী'কে, সঙ্গে সঙ্গে 'বুড়োশিব'কে। পাগলিনী ক্ষ্যাপা মা। ভাঙর ভোলা।

"ওমা দিগম্বরী নাচ গো।"

সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া ক্ষ্যাপা মা নাচে।

"হাড়ের মালা গলায় ভোলা নাচে থিয়া থিয়া।"

ভোলানাথ নাচে, তাহার সঙ্গে গাজনের ভক্তেরা নাচে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারাও মনে মনে নাচে। আবার সর্বনাশী এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সবাই। সবাইকে মনে পড়িল।

প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে- নির্মলা বোনকে মনে পড়িল—ললিতাকে মনে হইল, মাসী আসিয়া 'বাবা' বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। বেহালাদার, দোহার, বাজনদার, রাজন, বণিক মাতু , বিপ্রপদ ঠাকুর, সকলে দূরে যেন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঝিকে মনে পড়িল, কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ওই যে।—গ্রামের ধারের নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ, বিস্তীর্ণ মাঠ, বৈশাখে মাঠের ধূলা, কালবৈশাখীর ঝড়, কালো মেঘ, ঘনঘোর অন্ধকার, সেই চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ—সেই কড় কড শব্দে মেঘের ডাক—ঝর ঝর বৃষ্টি—সব মনে হইল। পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজার উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসির বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ ; কত কথা মনে পড়িল ,—বাবদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মত গোখুরার বাস ; গো[illegible]গুলো ডালে [illegible] ন বেড়ায়, দোল খায় ; কিন্তু ভক্তেরা যখন 'জয় ধর্মরাজো' বলিয়া রোল দিয়া গাছে চড়ে, তখন সেগুলো সন্তর্পণে কোথায় গিয়া লুকাইয়া পড়ে। বাগানের সেই পুরানো বটগাছতলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড়চোপড় পরা সারিবন্দী মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আল-পথের দু'ধারে লকলকে ঘন-সবুজ বীজধানের ক্ষেত, মাঝখান দিয়া পথ। আষাঢ় আসিতেছে। আকাশে হয়তো ইহারই মধ্যে মেঘ দেখা দিয়াছে, শামলা রঙের জলভরা মেঘ। ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের বার-মেসে' গানের কথা মনে হইল।

বৈশাখে সূর্যের ছটা—
যত সূর্য-ছটা, কাটফাটা, তত ঘটা কালবৈশা[illegible] মেঘে—
লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে।
পুণ্য ধরম মাসে—
পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে—পূর্ণিমাতে (সবে) পূজে ধর্মরাজায়—

আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।
তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে—
জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দলে অরণ্যষষ্ঠী পূজে।
জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।
দশহরায় চতুর্ভুজা—
দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গা পূজা, এবার সোজা মাঠ ভাসিবে বন্যায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি—চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

এমনি করিয়া আষাঢ়ের রথযাত্রা—বর্ষার বাদল—অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যন্ত মনে করিয়া করিয়া সে এক নূতন বারমেসে গান মনের আবেগে রচনা করিয়া ফেলিল—

বছর শেষে—চৈত্র মাসে—
বছর শেষে চৈত্রমাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পুজোর টাটে।
ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে—
তেল নাহি হায় শিবের মাথায়, ভরল জটায়—অঙ্গেতে ছাই
গাজনে ভূত নাচায়।
আমার পরাণ কাঁদে—হায় রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায়॥

অধীর হইয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বার বার এখানকার নূতন-মাকে মনে মনে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা!

সেখানকার মা তুমি, আমাকে ফেরাবার জন্য আগে থেকে এখানে এসে বসে আছ! তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম! শিরোধার্য করলাম।

* * *

মাসখানেক কোনরকমে কাশীতে কাটাইয়া নিতাই আবার একদিন ট্রেনে চড়িয়া বসিল। কোন রকমেই সে এখানে থাকিতে পারিল না।

এই এক মাস সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। তাহার সঙ্গে উৎকণ্ঠার, উদ্বেগের তাহার অবসান হইয়াছে। ঘুম যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোগলসরাই জংশনে কোনরূপে উঠিয়া ট্রেন পালটাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলার একটা খালি ছিল, সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল। আঃ—নিশ্চিন্ত! সোনার দেশে আপন মায়ের কোলে ফিরিয়া চলিয়াছে সে।

পরদিন সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন মনে হইল অতি পরিচিত জন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে। পরিচিত কেহ ভারি মিষ্টসুরে যেন তাহাকে ডাকিল—

—ওঠ, ওঠ, ওঠ।

—কে, কে?

নিতাই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

না, চেনা কেহ নয়, তাহাকে নয়। নীচের বেঞ্চে একজন লোক গোটা বেঞ্চটা জুড়িয়া শুইয়া আছে, তাহাকেই কতকগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে—ওঠ—ওঠ।

নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ, গাড়ীটা চেনামুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে। সব চেনা, সব চেনা। নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া—সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রীদলের একজনকে বলিল—মালগুলো ওপরে তুলে দি?

—দাও তো দাদা, দাও তো।

—বেঁচে থাক বাবা; বড় ভাল ছেলে তুমি। এক বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্বাদ করিল।

মালগুলো তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। ইস্টিশানের বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সব চেনা—সব চেনা। আঃ—তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। জানালার বাহিরে বাংলা দেশ। সব চেনা। রাণীগঞ্জ পার হইল। এইবার বর্ধমান। বাহিরে আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে।

বর্ধমানে গাড়ী বদল করিয়া—ঘন্টা দুয়েক মাত্র, তাহার পরই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী, বুড়োশিব।

মা চণ্ডী বুড়োশিবের দরবারে বসিয়াই সে ভগবানকে গান শুনাইবে। তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়—তারকেশ্বরে কালীঘাটে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে। দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে। সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে তাহাদের গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে। সে এবার নিজেই কবির দল করিবে, এখন তাহার নাম হইয়াছে, বায়নার অভাব হইবে না। কবিয়াল নিতাইচরণের নামে দেশের লোকও ভাঙিয়া আসিবে। মেলা-খেলায় গালাগাল খেউড় নহিলে চলে না। তাহার মধ্যেও কৌতুক আছে, তবু সে ভালবাসার গানকেই বড় করিবে। বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এই একই খেদ। জীবন এত ছোট কেনে? ভালবাসিয়া সাধ কেন মেটে না, ছোট এতটুকু জীবনের পরিসরে ভালবাসিয়া কেন কুলায় না? ভালবাসার গান। খেদের গান। এই খেদ মোর মনে।—সেই খেদের গান।—বসন্তর নাম করিয়া গান।

কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে?

এক্সপ্রেস ট্রেনটা থামিয়া গেল; একটা বড় স্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ধমান। বর্ধমান।

* * *

বর্ধমান হইতে লুপ লাইনের ট্রেন। নিতাই আবার সেই ট্রেনে চড়িয়া বসিল। মনে মনে তখন তাহার গান রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে পৌঁছিয়াই সে সর্বাগ্রে মা চণ্ডীর দরবারে যাইবে প্রণাম করিতে। সেই প্রণাম করিবার জন্য সে গান রচনা শুরু করিয়াছে। এই গান গাহিয়াই সে মাকে প্রণাম করিবে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী নয়, সে নিজের গান গাহিয়াই মাকে প্রণাম করিবে।

"সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,
ঘরপালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভুঁই পাড়া।

তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না,
নাচ-দুয়ারে পা সরে না, চোখে বহে জলের ধারা।"

আকাশ জুড়িয়া ঘন কালো মেঘ। হু-হু করিয়া ভিজা জলো বাতাস বহিতেছে। আঃ, দেহ জুড়াইয়া যাইতেছে। মাটির বুক আর দেখা যাইতেছে না ; লক্‌লকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ওঃ—ইহারই মধ্যে এদিকটায় বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। চষা ক্ষেতগুলির কালো মাটি জলে ভিজিয়া আদরিণী মেয়ের মত তুলিয়া ধরিতে যেন গলিয়া পড়িতে চাহিতেছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটা অল্প বিছাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মনের আনন্দে ভিজিতেছে। কচি নতুন অশ্বত্থ-বট-শিরীষের পাতাগুলি ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে। লাইনের দুধারের ঝোপগুলিতে থোপা থোপা ভঁট ফুল ফুটিয়াছে। আহা-হা। ওই দূরে নালার ধারে একটা কেয়া ঝোপ বাতাসে দুলিতেছে। কেয়া-ঝোপটার বাহার খুলিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের বসন্তকে মনে পড়িয়া গেল,

"করিল কে ভুল—হায় রে,
মন-মাতানো বাসে ভবে দিয়ে বুক
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়া-ফুল।"

ঝম ঝম শব্দে ট্রেন চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজলদীঘির জলের রঙের মত রঙ ; বৃষ্টি জোর হইতেছে, অমনি চারদিক ঝাপসা। ওঃ, এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ থৈ থৈ করিতেছে। ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক ট্রেনের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে। এদিকে কাড়ান লাগিয়া গেল।

ঘং-ঘং গম-গম শব্দে ট্রেনখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল। গেরুয়া রঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত লাল জল থৈ থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়। অজয় নদী। দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ, তাহার গাঁ। তাহার মা।

"তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যেন মন ভরে না
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না, বয়ে যায় মা জলের ধারা।'

এইবার বোলপুর—তারপর কোপাই, তারপর—তারপর জংশন, ছোট লাইন। ঘটো-ঘটো ঘটো ঘটো ঘং-ঘং-ঘং-ঘং। সর্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন। হায়-হায়-হায়-হায়। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকের ভিতর নাচিতেছে নিতাইয়ের মন। ছেলেমানুষের মত নাচিতেছে। চোখ ভাসাইয়া জল আসিতেছে অজয়ের বানের মত। মা গো—মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে—সেই 'নিমচের জোল', 'উদাসীর মাঠ',—ওই যে কাশীর পুকুর ;—ওই যে সেই কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবি-জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল।

গাড়ীটা ঈষৎ বাঁকিল—ইস্টিশনে ঢুকিতেছে। ওই যে, ওই যে—গাড়ী থামিল।

* * *

ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল, কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি। ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘন সবুজ চিরোল চিরোল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তবু দুই চারিটি ফুল যেন নিতাইয়ের জন্যই ধরিয়া আছে। নিতাইয়ের চোখে জলের ধারা। নিতাই কাঁদিতেছে; কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া। বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে।

বিপ্রপদর জন্য নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৌতুকের কথা। কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না। নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে, কিন্তু এ তাহা নয়, তাহারও অতিরিক্ত কিছু। তাহার চোখের ওই দরবিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে।

কতক্ষণ পর।

নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রাজন। ভাই

—ওস্তাদ। ভেইয়া।

—ঠাকুরঝি?

—ওস্তাদ।

—রাজন।

—ঠাকুরঝি তো নাই ভাইয়া।

—নাই?

—নাই। উতো মর গেয়ি। রাজার মত শক্ত মানুষের ঠোঁট দুইটিও কাঁপিতে লাগিল।—বলিল—ঠাকুরঝি ক্ষেপে গিয়েছিল ওস্তাদ। তোমার যাবার পরে—

রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরঝি নাই। ঠাকুরঝি মরিয়াছে। পাগল হইয়া ঠাকুরঝি মরিয়াছে। এই কয়টা কথাই নিতাইয়ের কাছে অনেক কথার তুফান হইয়া উঠিল। বুকের মধ্যে ঝড় বহিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মনে পড়িল—জীবন এত ছোট কেনে? তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা বলিল—ওস্তাদ, ভাইয়া, রোতা হ্যায়?

কাঁদছ ? ঠাকুরঝির জন্যে ?

চোখ মুছিয়া, বিচিত্র হাসি হাসিয়া ফেলিয়া নিতাই বলিল—গান শোন রাজন, গান শোন। গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া লইয়াই সে গলা ছাড়িয়া গাইল—

"এই খেদ আমার মনে—
ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়—জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে ?"

রাজা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হায় হায় হায় রে। বল ওস্তাদ, জীবন এত ছোট কেনে ? হায় হায় হায়।

নিতাই বলিল—তাই যদি জানব রাজন।—আবার তাহার চোখ হইতে জল ঝরিতে শুরু হইল। আবার কাঁদিল। নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গলি ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন। সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানে বসন আসিয়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল—কই হে। ওস্তাদ না—ফোস্তাদ। চকিতের মত মনেও হইল—বসনও যেন শুইয়া আছে। আঃ। ঠাকুরঝি, বসন—দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চল।

—কাঁহা ভাইয়া ?

—চণ্ডীতলায়। চল, মাকে প্রণাম করে আসি।

রাজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে।

তাহার সর্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে—মাগো—জীবন এত ছোট কেনে ?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

পরম শ্রদ্ধেয়

কবি কালিদাস বায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দাদা,

রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনাব সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম

আষাঢ়, ১৩৫৫

তারাশঙ্কর

হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহারেরা।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী ; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে মৌজাবাঁশবাঁদি, লাট্ জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম ; দুটি পকুরের চারি পাড়ে ঘর-তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ—কুমার-সদ্গোপ, চাষী-সদ্গোপ এবং গন্ধবর্ণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড় ; হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক—নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিনশো বিঘা।

সম্প্রতি জাঙল গ্রামের সদ্জাতির ভদ্রলোক বাবু মহাশয়েরা বেশ খানিকটা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন। অল্প আড়াইশো বিঘা সীমানার বাঁশবাঁদি গ্রামের অর্থাৎ হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা বলছে—বাবু মশায়েরা 'তরাস' পেয়েছেন। অর্থাৎ ত্রাস। পাবারই কথা। রাত্রে কেউ যেন শিস দিচ্ছে। দিনকয়েক শিস উঠেছিল জাঙল এবং বাঁশবাঁদির ঠিক মাঝখানে ওই হাঁসুলী বাঁকের পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকিতে—বেলগাছ এবং স্যাওড়া ঝোপে ভর্তি, জনসাধারণের কাছে মহা-আশঙ্কার স্থান ব্রহ্মদৈত্যতলা থেকে। তারপর কয়েকদিন উঠেছে জাঙলের পূর্ব গায়ে কোপাইয়ের তীরের কুলকাঁটার জঙ্গল থেকে। তারপর কয়েকদিন শিস উঠেছিল আরও খানিকটা দূরে—ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে স'রে। এখন শিস উঠছে বাঁশবাঁদির বাঁশবনের মধ্যে কোনখান থেকে।

বাবুরা অনেক তদন্ত করেছেন রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ করেছেন, দু-একদিন লাঠি-সোঁটা বন্দুক নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে হৈ-চৈ করেছেন, খুব জোরালো হাতখানেক লম্বা টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিক দেখেছেন, তবু কিছুরই সন্ধান হয় নাই। কিন্তু শিস সেই সমানেই বেজে চলেছে। ক্রোশখানেক দূরে থানা। সেখানেও খবর দেওয়া হয়েছে ; ছোট দারোগাবাবুও এসেছিলেন দিনতিনেক রাত্রে, কিন্তু তিনিও কোন হদিস পান নাই। তবে নদীর ধারে ধারে শব্দটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ঠিক। এইটাই তিনি সমস্ত শুনে ঠাওর

ক'রে গিয়েছেন।

দারোগাবাবু পূর্ববঙ্গের লোক—তিনি ব'লে গিয়েছেন, নদীর ভিতর কোন একটা কিছু হচ্ছে। 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।' ভাবেন, খানিকটা ভাবেন। সন্ধান মিললে পর খবর দিবেন।

'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস'—কথাটা অবশ্য ডাকপুরুষের বচন—পুরুষানুক্রমে চ'লেও আসছে দেশে। সে কথা কখনও মিথ্যা নয়, কিন্তু দেশভেদে বচনেরও ভেদ হয়, তাই ও-কথাটা হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির জাঙল গ্রামে ঠিক খাটে না। বাংলাদেশের এই অঞ্চলটাতেই খাটে না। সে হ'ল বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল। জাঙল গ্রামের ঘোষ-বাড়ির এক ছেলে ব্যবসা করে কলকাতায়। কয়লা বেচা-কেনা করে, আর করে পাটের কারবার। বাংলাদেশের সে অঞ্চল ঘোষবাবু ঘুরে এসেছে। সে বলে—সে দেশই হ'ল নদীর দেশ। জলে আর মাটিতে মাখামাখি। বারোটি মাস ভরানদী বইছে ; জোয়ার আসছে, জল উছলে উঠে নদীর কিনারা ছাপিয়ে সবুজ মাঠের মধ্যে ছলছলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ; জোয়ারের পর আসছে ভাটার পালা, তখন মাঠের জল আবার গিয়ে নামছে নদীতে ; নদীর ভরা কিনারা খালি হয়ে কূল জাগছে। কিন্তু তাও কিনারা থেকে বড়জোড় দু-আড়াই হাত ; তার বেশি নামে না। সে নদীও কি এমন-তেমন, আর একটি-দুটি ? সে যেন গঙ্গা-যমুনার ধারা, থৈ-থৈ করছে, থমথম করছে ; এপার থেকে ওপার পারাপার করতে এ দেশের মানুষের বুক কেঁপে ওঠে। আর সে ধারা কি একটি ? কোথা দিয়ে কোন্ ধারা এসে মিশল, কোন্ ধারা কোথায় পৃথক হয়ে বেরিয়ে গেল—তার হিসাব নাই। সে যেন জলের ধারার সাতনরী হার,—হাঁসুলী নয়। নদীর বাঁকেরই কি সেখানে অন্ত আছে ? 'আঠারো বাঁকি' 'তিরিশ বাঁকি'র বাঁকে বাঁকে নদীর চেহারা সেখানে বিচিত্র। দু ধারে সুপারি আর নারিকেল গাছ ;—সারি নয়—বাগিচা নয়—সে যেন অরণ্য। সঙ্গে আরও যে কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, তা যে দেখে নাই, সে কল্পনা করতে পারবে না। সে দেখে আশ মেটে না। ওই সব নারিকেল-সুপারির ঘন বনের মধ্য দিয়ে বড় নদী থেকে চ'লে গিয়েছে সরু সরু খাল, খালের পর খাল। সেই খালে চলেছে ছোট ছোট নৌকা। নারিকেল-সুপারির ছায়ার তলায় টিন আর বাঁশের ছেঁচা বেড়া দিয়ে তৈরি ঘরের ছোট ছোট গ্রাম লুকিয়ে আছে। সরু খালগুলি কোন গাঁয়ের পাশ দিয়ে, কোন গ্রামের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ও-দেশের ছোট নৌকোগুলি এ দেশের গরুর গাড়ির মত। নৌকাতেই ফসল উঠছে ক্ষেত থেকে খামারে, খামার থেকে চলেছে হাটে-বাজারে, গঞ্জে-বন্দরে ; ওই নৌকোতেই চলেছে এ গাঁয়ের মানুষ ও-গাঁয়ের কুটুমবাড়ি, বহুড়ী যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, মেয়ে আসছে বাপের বাড়ি ; মেলা-খেলায় চলেছে ইয়ারবন্ধুর দল। চাষী চলেছে মাঠে—তাও চলেছে নৌকোতেই, কাস্তে নিয়ে লাঙল নিয়ে একাই চলে নৌকা বেয়ে। শরতের আকাশের ছায়াপথের মত আদি-অন্তহীন নদী,—সেই নদীতে কলার মোচার মত ছোট্ট নৌকোর মাথায় ব'সে—বাঁ হাতে ও বাঁ বগলে হাল ধ'রে, ডান হাতে আর ডান পায়ে বৈঠা চালিয়ে চলেছে। ঘোষের ছেলে শতমুখে সে দেশের কথা ব'লে ফুরিয়ে উঠতে পারে না। এ নদীর ধারে বাস—ভাবনার কথাই বটে। ভাবনার কথা বলতে গিয়ে ঘোষের ছেলের চোখে ভয় ফুটে

ওঠে—সময়ে সময়ে শরীরে কাঁটা দেয়। ওই নদীর সাতনরী হার আরও নীচে গিয়ে এক হয়ে মিশেছে। তখন আর নদীর এপার ওপার নাই। মা-লক্ষ্মীর গলার সোনার সাতনরী হয়ে উঠেছে যেন মনসার গলার অজগরের বেড় ; নদী সেখানে অজগরের মতই ফুঁসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে উঠছে, যেন হাজার ফণা তুলে দুলছে। এরই মধ্যে কখনও ওঠে আকাশে টুকরো খানেক কালো মেঘ—দেখতে দেখতে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় তার উপর, যেন কেউ আগুনে-গড়া হাতের আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় ওই কালো মেঘের 'বিষমঢাকি'র বাজনা। যে বাজায় তার মাথার জটার দোলায় আকাশ-পাতাল দুলতে থাকে। অজগর তখন তার বিরাট অঙ্গ আছড়ে আছড়ে হাজার ফণায় ছোবল মেরে নাচে—ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে মাতনে মাতে। নদীর জলে তুফান জাগে। সে তুফানে বাড়ি ঘর গ্রাম—গোলা-গঞ্জ বন্দর—মানুষ গরু কীটপতঙ্গ সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। আবার তুফান নাই, ঝড় নাই, বাইরে দেখতে-শুনতে সব শান্ত স্থির, কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ নদীর ধারে গ্রামের আধখানা কাঁপতে লাগল, টলতে লাগল—দেখতে দেখতে কাত হয়ে মুখথুবড়ে পড়ল অজগরের মত নদীর অথৈ গর্ভে। মানুষকে সেখানে বারো মাস এক চোখ রাখতে হয় আকাশের কোলে—কালো মেঘের টুকরোর সন্ধানে, আর-এক চোখ রাখতে হয় সবুজ ঘাসে-ফসলে-ঢাকা চন্দনের মত মাটির বুকের উপর—ফাটলের দাগের খোঁজে। ভাবনা সেখানে বারো মাসই বটে।

ছোট দারোগা সেই দেশের মানুষ, তাই ও-কথা বলছেন। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের দেশ আলাদা। হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে, নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ-ধূ করে বালি--একপাশে মাত্র একহাঁটু গভীর জল কোনমতে বয়ে যায়—মা-মরা ছোট মেয়ের মত শুকনো মুখে দুর্বল শরীরে, কোনমতে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ ; ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়া লোহার মত ; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যা[illegible] গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কো[illegible] আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। খাল বিল পুকুর দীঘি চৌচির হয়ে ফেটে যায়। তখন নদীই রাখে মানুষকে বাঁচিয়ে ; জল দেয় ওই নদী। নদীর ভাবনা এখানে বারো মাসের নয়।

নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের। আষাঢ় থেকে আশ্বিন। আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভ'রে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট পাটকে[illegible] পাথর, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। ক্ষমা নাই—ঘেন্না নাই, দিগম্বরীর মত হাঁক ছেড়ে, ডাক পেড়ে, শতমুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে

ছোটে। গ্রাম বসতি মাঠ শ্মশান ভাগাড়, লোকের ঘরের লক্ষ্মীর আসন থেকে আঁস্তাকুড়—যা সামনে পড়ে মাড়িয়ে তছনছ ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। সেও একদিন দুদিন। বড়জোড় কালে-কস্মিনে, চার-পাঁচদিন পরেই আবার সম্বিৎ ফেরে। কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ ক'রে গাঁয়ের ধারে ব'সে থাকে, তারপর এক-পা, দু'পা ক'রে এসে বাড়ির কানাচে শুয়ে গুনগুন ক'রে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না—তেমনই ভাবে কোপাইও দু'দিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুল-কুল শব্দ ক'রে বয়ে যায়। চার মাসের মধ্যে এমনটা হয় পাঁচবার কি সাতবার, তার বেশি নয়। তার মধ্যে হয়তো একবার, কি দু'তিন বৎসরে একবার ক্ষ্যাপামি করে বেশি। কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে।

তবে কন্যার পাপে কুল নষ্ট। কোপাইয়ের বন্যায় ঘরদোর না ভাঙলেও ভুগতে হয় বইকি। জল সরে গেলে ভিজে মাটি থেকে ভাপ উঠতে আরম্ভ করে—মাছিতে মশাতে ভ'রে যায় দেশ। মানুষ চলে, মানুষের মাথার উপর ঝাঁকবন্দী মশা সঙ্গে চলে ভনভন শব্দ তুলে, মানুষের শরীর শিউরে ওঠে, তাদের কামড়ে অঙ্গ দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। গরুর গায়ে মাছি ব'সে থাকে চাপবন্দী হয়ে, লেজের ঝাপটানিতে তাড়িয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা অনবরত শিঙ নাড়ে, কখনও চার-পা তুলে লাফাতে থাকে। তাকে সাহায্য করে চাষী, তালপাতা চিরে ঝাঁটার মত ক'রে বেঁধে তাই দিয়ে আছড়ে মাছি মারে, তাড়িয়ে দেয়। এর কিছুদিন পরেই আরম্ভ হয় 'মালোয়ারী'র জয়।

আরও আছে—কোপাইয়ের বন্যার দুর্ভোগ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়িয়া নদী কোপাইয়ে ওই দু'তিন বৎসর অন্তর যে আকস্মিক বন্যা আসে—যাকে বলে 'হড়পা বান', সেই বন্যার স্রোতে প'ড়ে কৃচিৎ কখনও একটা-দুটো 'গুলবাঘা' ভেসে এসে হাঁসুলী বাঁকের এই খাপছাড়া বাঁকে, বাঁশবাঁদি গাঁয়ের নদীকূলের বাঁশবনের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়। কখনও মরা, কখনও জ্যান্ত। জ্যান্ত থাকলে বাঘ এই বাঁশবনেই বাসা বাঁধে। আর আসে ভালুক ; দুটো একটা প্রতি বৎসরই আসে ও-বেটারা। কিন্তু আশ্চর্য, ও-বেটারা মরে কখনও আটকে থাকে না বাঁশবনে। জ্যান্ত বাঘ কদাচিৎ আসে, মরাও ঠিক তাই। গোটা এক পুরুষে দু'টো এসেছে—একটা মরা, একটা জ্যান্ত। মরাটাকে টেনে বের ক'রে জেলার সায়েবকে সেটার চামড়া দেখিয়ে জাঙলের ঘোষেরা বন্দুক নিয়েছে। জ্যান্তটাকে কাহাররাই মেরেছিল, সেটা দেখিয়ে বন্দুক নিয়েছে গন্ধবণিকেরা। ভালুক এলে কাহারেরাই মারে, প্রতিবার বন্যার পর বাঁশবন খুঁজে-পেতে দেখতে পেলে লাঠি-সোঁটা খোঁচা বল্লম তীর-ধনুক নিয়ে তাড়া ক'রে মেরে হৈ-হৈ ক'রে নৃত্য করে ; নিজেদের বীর্যে মোহিত হয়ে প্রচুর মদ্যপান করে। আর এখানেই আছে বুনো শুয়োর, কাহারদের লাঠি-সোঁটা খোঁচা বল্লম সত্ত্বেও এখানে বুনো শুয়োরের একটা দস্তুরমত আড্ডা-আড়ত গ'ড়ে উঠেছে। অবশ্য বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ের জঙ্গলে নয়, এখান থেকে খানিকটা দূরে সাহেব ডাঙায়। কাহারদের দৌরাত্ম্যে ওরা বাঁশবাঁদির এলাকায় বাসা বেঁধে রক্ষা পায় না। ওদের বড় আড্ডা হ'ল প'ড়ো নীলকুঠির কুঠি-বাড়ির জঙ্গলে। রাত্রে শূকরের দল ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে নদীর ধারে ছুটে বেড়ায়, দাঁতে মাটি খুঁড়ে কন্দ তুলে খায়। কখনও কখনও দুটো একটা ছিটকে এসে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

অকস্মাৎ কেউ কেউ সামনে প'ড়ে জখম হয়। তখন কাহারেরা ওদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে। অস্ত্র নয়, ফাঁদ। বুনো শুয়োর মারবার আশ্চর্য কৌশল ওদের। হাতখানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝখানে আধ হাত লম্বা শক্ত সরু দড়ি বেঁধে প্রান্তভাগে বাঁধে ধারালো বঁড়শি। বঁড়শিতে টোপের মত গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা। এমনই আট-দশটা ছড়িয়ে রেখে দেয় পথে প্রান্তরে। মদের ম্যাতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুয়োর বেটারা মাটি শুঁকে শুঁকে এসেই পরমানন্দে গপ ক'রে মুখে পুরে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শি গেঁথে যায় জিভে অথবা চোয়ালের মধ্যে। তখন পায়ের খুর দিয়ে টেনে বঁড়শি ছাড়াতে চেষ্টা করে—তাতে ফল হয় বিপরীত, চেরা খুরের মধ্যে বঁড়শির দড়ি ঢুকে গিয়ে শেষে আটকায় এসে বাখারির ফালিতে। একদিকে বঁড়শি আটকায় জিভে, অন্যদিকে দড়ি-পরানো খুর আটকায় বাখারিতে, বেটা শুয়োর নিতান্তই শুয়োরের মত ঠ্যাঙ তুলে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে কাহারেরা আসে লগুড় হাতে, এসেই দমাদম ঠেঙিয়ে মেরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।

আর আসে মধ্যে মধ্যে কুমীর। প্রায়ই সব মেছো কুমীর। কুমীর এসে জাঙলের বাবু-ভাইদের মাছ-ভরা পুকুরে নামে। সে আর উঠতে চায় না। বাবুরা বন্দুক নিয়ে দুমদাম গুলি ছোঁড়ে, কুমীর ভুস ক'রে ডোবে আবার এক কোণে নাকটি জাগিয়ে ওঠে। কাহারেরা পাড়ের উপর ব'সে হুঁকো টানে আর আমোদ দেখে ; তবে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির ঘাটের পাশে যে দহটা আছে, সেখানে আসে সর্বনেশে মানুষ-গরু-খেকো বড় কুমীর—এখানকার লোকে বলে, 'ঘড়িয়াল'। তখন কাহারেরা চুপ ক'রে ব'সে থাকে না। তারা বের হয় দল বেঁধে ; সর্বাঙ্গে হলুদ মাখে, সঙ্গে দেয় কোদাল কুড়ুল লাঠি সড়কি, বড় বড় বাঁশের ডগায় বাঁধা শক্ত কাঠির ফাঁস। নদীর ধারে ধারে খুঁজতে থাকে কুমীরের আস্তানা। পাড়ের ধারে গর্তের মধ্যে শয়তানের আস্তানার সন্ধান পেলে মহা উৎসাহে তারা গর্তের মুখ বন্ধ ক'রে উপর থেকে খুঁড়তে থাকে সেই গর্ত। তারপর গর্তের নালার মধ্যে অবরুদ্ধ শয়তানকে তারা হত্যা করে। কখনও সুকৌশলে ফাঁস পরিয়ে বেঁধে টেনে এনে নিষ্ঠুরভাবে দু-তিন দিন ধরে ঠেঙিয়ে মারে। গর্তে কুমীর না পেলে গোয়ালপাড়ার গোয়ালাদের মহিষের পাল এনে সেগুলোকে নামিয়ে দেয় দহে। মহিষে জল তোলপাড় ক'রে তুলে ঘড়িয়ালকে বের করে। তারপর কুম্ভীর বধের পালা। সে প্রায় এক দক্ষযজ্ঞ। কুম্ভীর বেটাকে দক্ষের সঙ্গে তুলনা করা কখনই চলে না, কিন্তু কাহারদের মাতন—সে শিবঠাকুরের অনুচরদের নৃত্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

মোট কথা, এ দেশে—হাঁসুলীর বাঁকে নদীর ভাবনা খুব বেশি নয় ; যেটুকু আছে, তার একটুমাত্র 'মালোয়ারী'র পালাটা ছাড়া সকল ভাবনার ভার একা বাঁশবাঁদির কাহারদের উপর। কিন্তু এবারের এই শিস দেওয়ার ব্যাপারে তারাও হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম তাদের ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা চোরডাকাতের বা ব্যাপারটা বৃন্দাবনী ধরণের কিছু। তারা ক্ষেপেও উঠেছিল। কারণ এই অঞ্চলের বৃন্দাবনী ব্যাপারে নায়িকারা একশো জনের মধ্যে নিরেনব্বুই জনই হয় তাদের ঘরের মেয়ে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের এ ধারণা পাল্‌টে গিয়েছে। এখন তাদের ধারণা ব্রহ্ম-দৈত্যতলার 'কর্তা' কোন কারণে

এবার বিশেষ রুষ্ট হয়েছেন। হয়তো বা তিনিই ওই বেলবন ও শ্যাওড়াজঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে চ'লে যাচ্ছেন—শিস দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে চলেছেন হাঁসুলী বাঁকের অধিবাসীদের। এ নিয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ঘরে ঘরে কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সাও তুলেছে তারা, এবং এ বিষয়ে জাঙলের ভদ্রলোক মহাশয়দের উদাসীনতা দেখে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। বেচারী কাহারদের আর সাধ্য কি? জ্ঞানই বা কতটুকু? তবু একদিন সন্ধ্যায় ওরাই বসালে মজলিস। কিন্তু কাহারদের আবার দুটি পাড়া, 'বেহারা' পাড়া আর 'আটপৌরে' পাড়া। বেহারা পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী আটপৌরেদের সম্পর্কে ঘাড় নেড়ে হতাশা প্রকাশ ক'রে বললে—বছরে একবার পুজো, তাই ভাল ক'রে দেয় না। তা 'লতুন' পুজো দেবে!

নিমতেলে পানুর ভাল নাম প্রাণকৃষ্ণ। পাড়ায় দুজন প্রাণকৃষ্ণ থাকায় এ প্রাণকৃষ্ণের বাড়ির উঠানের নিমগাছটির অস্তিত্ব তার নামের আগে জুড়ে দিয়ে নিমতেলে পানু ব'লে ডাকা হয়। সে বললে—জান মুরুব্বি, কথাটা আমি বাপু, ভয়ে বলি নাই এতদিন। তা কথা যখন উঠল, বুয়েছ কিনা, আর কি বলে যেয়ে—কাণ্ড যখন খারাপ হতেই চলেছে, তখন আর চেপে থাকাটা ভাল লয়। কি বল?

গোটা মজলিসটির লোকের চোখ তার উপর গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী ব'সে ব'সেই ঘেঁষড়ে খানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছেন বল্ দিকিনি?

মুখ খুলেছিল পানু, কিন্তু তার আগেই একটা সূচালো বাঁশীর শব্দ বেজে উঠল। সেই শিসের শব্দ! শব্দটা আসছে—বাঁশবাঁদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশবন থেকে। সকলে চকিত হয়ে কান খাড়া করে চুপ ক'রে রইল। বনওয়ারী ব'সে ছিল উত্তর মুখ ক'রে, বাঁ হাতে ছিল হুঁকো—সে ডান হাতটা কাঁধের উপর তুলে, পিছনে তর্জনীটা হেলিয়ে ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিলে সকলকে। পিছনে দক্ষিণ দিকে বাঁশবেড়ের মধ্যে শিস বাজছে।

আবার বেজে উঠল শিস! ওই!

কাহার-বাড়ির মেয়েরা সব উদ্বিগ্ন মুখে উঠানে নেমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে। কারও হাতে রান্নার হাতা; কেউ ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল, তার কোলে ছেলে; কেউ কাঁকুই দিয়ে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছিল, তার বাঁ হাতে ধরা রইল চুলের গোছা, ডান হাতে কাঁকুই; কেউ কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে ঘরের পিছনে দেওয়াল থেকে ঘুঁটে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল, সে কেরোসিনের ডিবে আর খানচারেক ঘুঁটে হাতেই ছুটে এসে দাঁড়াল দশজনের মধ্যে। কেবল বদ্ধকালা বুড়ী সুচাঁদ কাহারনী সকলের মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল; সে উপরের অঙ্গের কাপড়ের আঁচলটা নিঃসঙ্কোচে খুলে কাঁথা-সেলাই-করা সূচে পুরানো কাপড়ের পাড়ের কস্তা পরিয়ে একটি লম্বা ছেঁড়া জুড়ছিল, ভুরু কুঁচকে নীরব প্রশ্ন তুলে সকলের দিকে চেয়ে সে শুধু ব'সে রইল। কিছু বুঝতে না পেরে অবশেষে সে তার স্বাভাবিক মোটা গলায় অভ্যাসমত চীৎকার করে প্রশ্ন করলে—কি?

সুচাঁদের মেয়ে বসন—অর্থাৎ বসন্ত, মায়ের বধিরত্বের জন্য লজ্জা পেয়ে পিছনদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—মর তুমি।

সুচাঁদ আবার প্রশ করলে এবং আরও বেশি একটু চীৎকার ক'রেই বললে—বলি, হ'ল কি? উঠে দাঁড়ালি যে সবাই?

এবার নাতনী পাখী—অর্থাৎ বসন্তর মেয়ে পাখী এসে তার মুখের কাছে চেঁচিয়ে বললে—শি-স!

—শিস? তা ওই জাঙলের ছোঁড়ারা কেউ দিচ্ছে।

—না—না। হাত নেড়ে বুঝিয়ে বললে—সেই শি—স!

এই মুহূর্তটিতেই আবার শিস বেজে উঠল।

পাখী দিদিমাকে ঠ্যালা দিয়ে বললে—ওই শোন। কিন্তু সুচাঁদ চকিত হয়ে পাখীর মুখে হাত চাপা দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসল। শুনতে পেয়েছে সে। এবং সে উঠে দাঁড়াল; প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়ে অবধি সে গাঁয়ে-ঘরে বুকে কাপড় নামমাত্রই দিয়ে থাকে, তাও দেয় মেয়ে বসন্তের অনুরোধে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই আজ এই মুহূর্তে ছেঁড়া আঁচলটা সে সেলাই করছিল—কিন্তু ছেঁড়া আঁচলটা টেনে গায়ে তুলতে সে ভুলেই গেল। আঁচলটা টানতে টানতেই এসে বনওয়ারীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে খুব চীৎকার ক'রে বললে—দেবতার পুজো-আচ্চা করাবি. না গাড়েপাড়ে যাবি?

বনওয়ারীও খুব চীৎকার ক'রে বেশ ভঙ্গি ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—দেবতার পুজো কি আমা-তোমাদের থেকে হয় পিসি? বাবুরা কিছু না করলে আমরা কি করব?

—তবে মরবি? মরতে যে তোদের মরণই হয় আগে!

—তা কি করব বল? ভগবানের বিধেন যা তাই তো হবেন। গাঁয়ের দখিন দিক আগুলে যখন আছি, আর আমরাই যখন কি বলে—ছিষ্টির ওঁচা, তখন আগেই আমাদিগে মরতে হবেন বইকি।

নিমতেলে পানু ব'লে উঠল—না মুরুব্বি। এবার খ্যানত হ'লে আগে তোমার ওই চৌধুরী-বাড়িতেই হবেন। তা আমি জানি।

বনওয়ারী ভুরুতে এবং দৃষ্টিতে সুগভীর বিস্ময় ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলে বলে—ব্যাপারটা কি বল্ দি-নি?

সুচাঁদ বললে—কি? কি বললি?

—কিছু লয় গো। তোমাকে বলি নাই। ব'স দিকি তুমি।

পাখী এসে সুচাঁদকে হাতে ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে বললে—ব'স এইখানে।

পানু বললে—ইবারে যে পুজোটি গেল মুরুব্বি, তার পাঁঠাটি খুঁতো ছিলেন।

সবিস্ময়ে সকলে ব'লে উঠল—খুঁতো ছিল? মেয়েরা শিউরে উঠল—হেই মা গো!

পানু বৃত্তান্তটি প্রকাশ করলে। পানুর ছাগলের একটি বাচ্চাকে খুব ছোটতে কুকুরে কামড়েছিল।—হেই এতটুন বাচ্চা তখন তোমার, তখন এক শালার কুকুর খপ ক'রে ধরেছিল পেছাকার পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল লটবরের মা, হাতে ঝাঁটা ছিল—কুকুরটাকে এক ঝাঁটা মেরে ছাড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তুক দুটি দাঁত বসে গিয়েছিল। হলুদ-মলুদ লাগিয়ে সেরে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—ওটাকে খাসী ক'রে দেব। তা তোমার এখন-তখন ক'রে হয় নাই, বড় হয়ে গেল। তখন ভেবেছিলাম, কেটে-মেটে একদিন পাড়ায় ভাগা দিয়ে খেয়ে

লোব। ই বছর বুঝলে কিনা, একদিন শালার পাঁঠা করেছে কি—চ'লে গিয়ে ঢুকেছে চৌধুরীবাড়ী ; আর খাবি তো খা—বাবুদের শখ ক'রে লাগানো—কি বলে বাপু, সেই ফুলের গাছ। এখন ধ'রে বেঁধে রেখেছিল। খোঁজে খোঁজে আমি গেলাম। গেলাম তো চৌধুরীদের গোমস্তা মারলে আমাকে তিন থাপ্পড়। তারপর সেই গাছ দেখিয়ে বললে—কলকাতা থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কলম এনেছিলাম। তোর দাম দেওয়া লাগবে কলমের। আমি কি বলব ? দেখলাম—বেটা পাঁঠা গাছটার পাতা-ডাল খেয়েই ক্ষ্যান্ত হয় নাই—টেনে-উপড়ে একেবারে গাছের নেতার মেরে দিয়েছে। আমি তো পায়ে হাতে ধরলাম। শেষ-মেষ পাঁঠাটাকে দিয়ে খালাস। আমি বললাম—কিন্তু দেখেন মশায়, খুঁতো পাঁঠা, কেটে ফিষ্টি-মিষ্টি ক'রে খাবেন, কিন্তুক দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না মশায়। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, নিজের বেটা ওই লটবরের মাথায় হাত দিয়ে কিরে ক'রে বলতে পারি মুরুব্বি, আমি দুবার বলেছিলাম—খুঁতো পাঁঠা, খুঁতো পাঁঠা হেই মাশায়, যেন দেবতা-থানে দেবেন না। তা এবার বেহ্মদত্যিতলায় কত্তার পুজোতে দেখি—পেরথম চোটেই চৌধুরীবাবুদের সেই পাঁঠা পড়ে গেল। 'এশ্বর' জানেন—আমার দোষ নাই।

সুচাঁদ খুব বেশি স'রে যায় নাই। কাছেই ব'সে একদৃষ্টে পানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলি শুনছিল ; তারই হাতের ডিবেটার আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল পানুর মুখের উপর। সে এবার প্রায় কথাগুলিই বুঝতে পেরেছে। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।

সমস্ত মজলিসটা থমথম ক'রে উঠল। মনে হ'ল, সুচাঁদের মুখ দিয়ে যেন দেবতাই ওই কথাগুলি বললেন—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

সেই থমথমে মজলিসে সুচাঁদ আবার আরম্ভ করলে—এই বাবার দয়াতেই হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু। ওই চৌধুরীরা তিন পুরুষ আগে তখন গেরস্ত, সাহেবদের নীলকুঠির গমস্তা। কুঠিরও তখন ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা। সেবার এল কোপাইয়ে 'পেলয়' বান। সে অনেক দিন আগে, তখন আমরা হই নাই ; বাবার কাছে গল্প শুনেছি। দুপুর বেলা থেকে ভাসতে লাগল কোপাই। রাত এক পহর হতে তু-ফা-ন ! 'হদের' পুকুরের শাহী পাড় পর্যন্ত ডুবে গেল। নীলকুঠির সাহেব মেম গাছে চড়ল। তারপর সমস্ত রাত হড়-হড়-হড়-হড় বান চললই—বান চললই। চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি। আর ঝম-ঝম জল। সে রাত যেন আজ পার হয়ে কাল হবে না। এমন সময়, রাত তখন তিন পহর চলছে,—হাঁসুলী বাঁকের অনেক দূরে নদীর বুকে যেন আলো আর বাজনা আসছে ব'লে মনে হ'ল। দেখতে দেখতে পঞ্চশব্দের বাদ্যি বাজিয়ে নদীর বুক আলোয় 'আলোকীন্নী' ক'রে এক বিয়েসাদীর নৌকোর মত নৌকো এসে লাগল হাঁসুলী বাঁকের দহের মাথায়। সায়েব দেখেছিল—সে ঝাঁপিয়ে নামল জলে। মেম বারণ করলে। সায়েব শুনলে না। তখন মেম আর কি করে। মেমও নামল। সায়েব এক কোমর জল ভেঙে চলল নৌকো ধরতে। হঠাৎ ওই বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন কত্তা। বলতে কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ে।—সত্যিই শিউরে উঠল সুচাঁদ।—এই ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল

কাপড়, পায়ে খড়ম—কত্তা জলের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে এগিয়ে এসে বললেন—কোথা যাবে সায়েব ? নৌকো ধরতে ? যেয়ো না, ও নৌকো তোমার লয়। সায়েব মানলে না সে কথা। বললে—পথ ছাড়, নইলে গুলি করেঙ্গা। কত্তা হাসলেন,—বেশ, ধরাঙ্গা তবে নৌকো। বাস, যেমনি বলা অমনি সায়েব মেমের এক কোমর জল হয়ে গেল অথৈ সাঁতার, সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুরনচাকিতে পাক দিয়ে ডুবিয়ে কো-থা-য় টেনে নিয়ে গেল—সোঁ ক'রে। চৌধুরী ছিল সায়েবের কাছেই আর একটা গাছের ডালে ব'সে। কত্তা এসে তাকে ডাকলেন—নেমে আয়। চৌধুরী তখন ভয়ে কাঁপছে। কত্তা হেসে বললেন—ওরে বেটা, ভয় নাই, নাম। তুই ডুববি না। বললে না পেত্যয় যাবে বাবা—চৌধুরী নামল, তো এক হাঁটুর বেশি জল হ'ল না। কত্তা হাসলেন, তা'পরে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—নৌকো লেগেছে দেখেছিস ? ও নৌকো তোর। আমার পুজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথকে জল দিস, ভিখিরীকে ভিখ দিস, গরীবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস। যখের কাছে ছিলেন লক্ষ্মী, তোকে দিলাম। যতদিন আমার কথা মেনে চলবি উনি অচলা হয়ে থাকবেন। অমান্যি করলে ছেড়ে যাবেন, আর নিজেই ফলভোগ করবি। তাকেই—সেই কত্তাকেই—এত হতচ্ছেদা। মা-লক্ষ্মী তো গিয়েছেন। অধর্মের তো বাকি নাই। শেষ-মেষ সেই কত্তার থানেই খুঁতো, কুকুরে-ধরা, এঁটো পাঁঠার পুজো। এতে কি আর দেবতা থাকেন। দেবতাই বটেন—দেবতাই শিস দিচ্ছেন। চ'লে যাবেন, তাই জানিয়ে দিচ্ছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন গাঢ় হয়ে উঠছিল ক্রমশ। হাঁসুলী বাঁকের নদীর চরে, গ্রামের কোল ঘেঁষে নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেঁকে চ'লে গিয়েছে গ্রামের বাঁশের বেড়। হাঁসুলীর মত গোল নদীর বেড়, তাই তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে যে বাঁশবেড় বা বাঁশের বাঁধ সেও গোলাকার। বাঁশবাঁদিকেব ঘিরে রেখেছে সবুজ কন্তার ডুরি মালার মত। সেই বাঁশবন থেকে অন্ধকার গোল হয়ে এগিয়ে আসছে কাহারপাহাড় বসতিতে কেন্দ্র করে। উঠানের মজলিসের আলোটার মাথার উপরে এসে আলোর বাধা পেয়ে যেন থমকে করছে। প্যাঁচাগুলো কর্কশ চেরা গলায় চীৎকার ক'রে উড়ে যাচ্ছে। বাদুড় উড়ছে—পাখসাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে। মধ্যে মধ্যে দুটোতে ঝগড়া ক'রে পাখসাট মেরে চিলের মত চিৎকার করছে। এরই মধ্যে সুচাঁদের এই গল্প সেই বেলবন ও শ্যাওড়াবনের কর্তার মাহাত্ম্য, তাঁর সেই গেরুয়াপড়া ন্যাড়ামাথা, রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতেধারী চেহারার বর্ণনা শুনে এবং সেই কর্তার কাছে কুকুরে-ধরা পাঁঠা দেওয়ার অপরাধের কথা মিলিয়ে সকলে একেবারে নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে গেল। কার একজনের কোলের ছেলেটা কেঁদে উঠল। মজলিসসুদ্ধ লোক বিরক্তিভরে ব'লে উঠল—আঃ।

ছেলেটার মা স্তন মুখে দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সাহস হ'ল না একা ঘরের ভিতরে যেতে।

সুচাঁদ হঠাৎ আবার বললে—পানা, অপরাধ কিন্তু তোমারও বটে বাবার থানে।

পানু এমন অভিযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তা ছাড়া ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কেন কে জানে ভয় তারই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সুচাঁদের কথা শুনে সে উত্তর দিতে

চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

তারপর বনওয়ারী সুচাঁদকে সায় দিয়ে বললে—তা ঠিক বলেছ পিসি। পাঁঠাটি তো পানুর ঘরের।

সুচাঁদ এতক্ষণ ধ'রে নিজে একাই কথা ব'লে আসছিল—কানে না-শোনার সমস্যা ছিল না। বনওয়ারী কথা বলতেই সমস্যাটা নতুন ক'রে জাগল। এমন গুরুতর তত্ত্বে রায় দেবার অধিকার কাহারপাড়ায় প্রাচীন বয়সের দাবীতে সুচাঁদ তার নিজস্ব ব'লে মনে করে। তাতে কেউ বাদ-প্রতিবাদ করলে, সে 'রূরপমান' সুচাঁদের সহ্য হয় না। এ দিক দিয়ে তার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। বনওয়ারীর কথা কানে শুনতে না পেয়ে সে ধারণা করলে—বনওয়ারী তার কথার প্রতিবাদ করছে, তার কথাতে সে মৃদুস্বরে কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে সে বনওয়ারীর দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে হাত নেড়ে বললে—তোর মত বনওয়ারী, আমি ঢের দেখেছি—বুঝলি। তুই তো সেদিনের ছেলে রে। মা ম'বে যেয়েছিল 'মাওড়া' ছেলে—অ্যাই ডিগডিগে 'প্যাট'। আমার দুধ খেয়ে তোর হাড়-পাঁজরা ঢাকল। আমার গতর তখন ভাগলপুরের গাইয়ের মতন, বুকের দুধও তেমনি অ্যাই মোষেব গাইয়ের মতন। তু আজ আমার ওপর কথা কইতে আসিস? এই আমি ব'লে রাখলাম, তু দেখিস—গাঁয়ের নোকেও দেখবে—বছর পার হবে না, পানুর 'খ্যানত' হবে।

পানু শিউরে উঠল। পানুর বউ দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে—মেয়েদের মধ্যে :– মৃদু অথচ করুণ সুর তুলে সে কেঁদে উঠল।

বনওয়ারী এবার চীৎকার করে বললে—তাই তো আমিও বলছি গো। তুমি যা বলছ, আমিও তাই বলছি।

—তাই বলছিস?

—হ্যাঁ। বলছি, পাঁঠাটি যখন পানুর ঘরের, তখন পানুর অপরাধ খণ্ডায় কিসে?

সুচাঁদের ঘোলাটে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বুদ্ধিমত্তার তৃপ্তিব একটা হাসিও ফুটে উঠল মুখে, সে বললে—অ্যা-অ্যাই। খণ্ডায় কিসে?

পানু কাতর হয়ে প্রশ্ন করলে—তাই তো বলছি গো, খণ্ডায় কিসে তাই বল? শুনছ? বলি—'পিতিবিধেন' কি বল? তারস্বরে চীৎকার ক'রে বললে শেষ কথা কটি।

—পিতিবিধেন?

—হ্যাঁ।

একটু ভাবলে সুচাঁদ। বনওয়ারী প্রমুখ অন্য সকলে আলোচনা আরম্ভ করলে।—তা কাল একবার চল সবাই চৌধুরী বাড়ি। বলা যাক সকল কথা খুলে।

সুচাঁদ বললে—আর একটি পাঁঠা তু দে পানু। আর পাড়া-ঘরে চাঁদা তুলে বাবাব থানে পুজো হোক একদিন। জাঙলের নোকে যদি 'রবহেলা' করে—আমরা আপনাদের কত্তব্য করি। না, কি বলিস বনবিহারী? আর পিতিবিধেন কি আছে বল? কত্তা তো দেবতা,—তিনি তো বুঝবেন আমাদের কথা।

বনওয়ারী বার বার ঘাড় নাড়লে। হ্যাঁ, তা বটে, ঠিক কথা। কি বল হে সব?

সকলেই ঘাড় নাড়লে। প্রহ্লাদ, গোপীচাঁদ, পাগল, দু নম্বর পানু, অমণ, সকলেই সম্মত

হ'ল,—হোক, পুজো হোক।

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারটা একটা নিষ্ঠুর চীৎকারে চিরে যেন ফালি ফালি হয়ে গেল। কোন জানোয়ারের চীৎকার। সে চীৎকার তীব্রতায় যত যন্ত্রণাকর, তীক্ষ্ণতায় সে তত অসহনীয়। বুনো শুয়োরের বাচ্চার চীৎকার। সম্ভবত দল থেকে ছিটকে পড়েছিল কোন রকমে, সুযোগ বুঝে শেয়ালে ধরেছে। শুয়োরের বাচ্চার মত এমন তীরের মত চীৎকার কেউ করতে পারে না। আর পারে খরগোশে—বুনো মেটে খরগোশ। এ চীৎকার খরগোশেরও হতে পারে।

ঠিক এই সময়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে শব্দ করে ছুটে এল একটা কুকুর। কালো রঙের প্রকাণ্ড বড় একটা কুকুর দৃপ্ত ভঙ্গিতে, সতেজ চীৎকারে পাড়া মজলিস চকিত ক'রে মজলিসের মাঝখান দিয়ে লোকজন না মেনেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওই চীৎকার লক্ষ্য ক'রে। কুকুরটার গায়ের ধাক্কা লাগল সুচাঁদের গায়ে। ধাক্কা খেয়ে এবং ঠিক কানের কাছে ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে সুচাঁদ চমকে উঠল। পরমুহূর্তে সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—এই দেখ বনওয়ারী, এই আর এক পাপ। ওই যে হারামজাদা বজ্জাত—ওই ওর পাপের পেরাশ্চিত্তি করতে হবে সবাইকে, ওই হারামজাদার জরিমানা কর তোরা। শাসন কর। শাসন কর্। শাসন কব।

বনওয়ারী কি[illegible] দেবার আগেই মেয়েদের মধ্যে থেকে ফোঁস ক'রে উঠল সুচাঁদের নাতনী—বসন্তের মেয়ে পাখী। সে ব'লে উঠল—ক্যানে, সে হারামজাদা আবার করলে কি তোমার? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। যত বাগ সেই হারামজাদার ওপর।

মেয়েবা এবাব মুখ টিপে হাসতে লাগল। আশ্চর্য নাকি মানুষের জীবনে 'রঙে'র ছোঁয়াচের খেলা। এ দেশেব এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালবাসাকে বলে 'রঙ'। রঙ নয়—বলে 'অঙ'। ওরা রামকে বলে 'আম', রজনীকে বলে 'অজুনী', রীতকরণকে বলে 'ইতকবণ', রাতবিরাতকে বলে 'আতবিরেত'। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে র থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ ক'রে দেয়। নইলে যে বেরোয় না জিভে তা নয়। শব্দের মধ্যস্থলে র দিব্যি উচ্চারণ করে। মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা হ'লে ওরা বলে—অঙ লাগাছে দু'জনাতে। রঙ-ই বটে। গাঢ় লাল রঙ। এক ফোঁটার ছোঁয়াচে মনভরা অন্য রঙের চেহারা পাল্টে দেয়। যে মেয়েরা এতক্ষণ আশঙ্কায় কাজকর্ম ছেড়ে নির্বাক হয়ে মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে সুচাঁদের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছিল এবং আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না, তারাই পাখীর কথার মধ্যে সেই রঙের ছোঁয়াচ পেয়ে মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল, মুখে হাসি দেখা দিল। ব্যাপারটার মধ্যে 'রঙ' ছিল।

সুচাঁদের ওই 'হারামজাদা'টির নাম করালী। করালী এই পাড়ারই ছেলে। চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে করালী। কথায়বার্তায় চালেচলনে কাহারপাড়ার সকলের থেকে স্বতন্ত্র। কাউকেই সে মানতে চায় না, কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। যেমন সে রোজগেরে, তেমনই খরচে। সকালে যায় চন্দনপুর, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যায়। আজ বাড়ি ফিরে শিস শুনেই সে কুকুর আর টর্চ নিয়ে বেরিয়েছে। এই করালীর সঙ্গে পাখীর মনে মনে রঙ ধরেছে। তাই পাখী দিদিমার কথায় প্রতিবাদ ক'রে উঠল। ওদের এতে লজ্জা নাই।

ভালবাসলে সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়াপড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা। সে অভ্যাস ওদের নাই, সে ওরা পারে না। সেই কারণেই মধ্যে মধ্যে কাহারদের তরুণী মেয়ে বানভাসা কোপাইয়ের মত ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ায়। তার উপর পাখী বসন্তের মেয়ে, বসন্তের ভালবাসার ইতিহাস এ অঞ্চলে বিখ্যাত। তাকে নিয়ে সে এক পালা-গান হয়ে গিয়েছে এক সময়। গান বেঁধেছিল লোকে, "ও—বসন্তের অঙের কথা শোন।"

সে অনেক কথা। তবে বসন্তের মেয়ে পাখীর কথা এদিক দিয়ে আরও একটু স্বতন্ত্র। এই গাঁয়েই তার বিয়ে হয়েছে। কাহারপাড়ার পূর্বকালের মাতব্বর-বাড়ির ছেলের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ—সে রুগ্ন, হাঁপানী ধরেছে এই বয়সে। এদিকে পাখী ভালবেসেছে করালীকে। করালীকে সমাজের মজলিসে এইভাবে অভিযুক্ত করায় সে মজলিসের মধ্যেই দিদিমার কথার প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

দিদিমাও পাখীকে খাতির করবার লোক নয়; সেও সুচাঁদ। সুঁচাদও পাখীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল—ওঃ, অঙ যে দেখি মাখামাখি। বলি ওলো ও হারামজাদী। আমি যে নিজের চোখে ছোঁড়াকে ওই কত্তার থানে ওই কেলে কুকুরটাকে সাথে নিয়ে বাঁটুল ছুঁড়ে ঘুঘু মারতে দেখেছি।

ঠিক সেই সময় মজলিসের পিছন থেকে কেউ, অর্থাৎ করালীই ব'লে উঠল—কত্তা আমাকে বলেছে, তু যখন আমার এখানে বাঁটুল ছুঁড়ছিস, তখন আমি একদিন ওই বুড়ী সুচাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব দড়াম ক'রে। তু সাবধান হোস বুড়ী, বিপদ তোরই। সে হা-হা ক'রে হেসে উঠল। তার হাসির দমকায় মেয়েদের হাসিতে আরও একটু জোরালো ঢেউয়ের দোলা লাগল।

বনওয়ারী হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল—অ্যাই করালী।

করালী হেসে উঠে বললে—ওরে 'বানাস' রে। ধমক মার যে?

—ব'স্ ব'স। হারামজাদা, তু ব'স।

—দাঁড়াও, আসছি আমি।

—কোথা যাবি?

—যাব।—হেসে বললে—দেখে আসি কাণ্ডটা কি? তাতেই তো কুকুরটাকে ছেড়ে দিলাম।

—না। কাণ্ড কি সে তোমার দেখার পেয়োজন নাই। সে আমরা জানি। তোমাদের পাপেই সব হচ্ছে।

হা-হা করে হেসে উঠল করালী।—কি? ওই বেহ্মদত্যি ঠাকুর? উঁহু।

—খবরদার করালী। মুখ খ'সে যাবে।

—এই দেখ। আমার মুখ খ'সে যাবে তো তোমাদের খবরদারি কেন?

ওদিকে বাঁশবনের মধ্যে কোথাও কুকুরটার চীৎকারের ভিতর হঠাৎ যেন একটা সর্তক ক্রুদ্ধ আক্রমণোদ্যোগের সুর গর্জে উঠল। এই মুহূর্তে সে নিশ্চয় কিছু দেখেছে, ছুটে কামড়াতে যাচ্ছে। করালী একটা অতি অল্প-জোর টর্চের আলো জেলে প্রায় ছুটেই পুকুরের পাড় থেকে নেমে বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ের গভীর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটা

মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে গেল। করালীর কি অসীম স্পর্ধা, কি দুর্দান্ত দুঃসাহস। শুধু পাখীই খানিকটা এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে, ডাকলে—যাস না। এই, যাস না বলছি। ওরে ও ডাকাবুকো। এই দেখ। ওরে ও গোঁয়ার-গোবিন্দ। যাস না। যাস না।

তার কণ্ঠস্বর ঢেকে গেল কুকুরটার একটা মর্মান্তিক আর্তনাদে।

বনওয়ারী বললে—হারামজাদা মরবে, এ তোমাকে আমি ব'লে দেলাম সুচাঁদপিসি।

কুকুরটা আর্তনাদ করতে করতে ছুটে ফিরে এল। সে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ।

পিছন পিছন ফিরে এল করালী। কালুয়া, কালুয়া।

কালুয়া মনিবের মুখের দিকে চেয়ে স্থির হবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্থির হতে পারলে না সে। কোন ভীষণতম যন্ত্রণায় তাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পাক দিয়ে ফিরতে লাগল কালুয়া। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে পড়ে গেল মাটিতে, মুখ ঘষতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গোঙাতে লাগল।

করালী তার পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলাতে লাগল, কিন্তু কুকুরটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে, মনিব করালীকেও কামড়াতে এল। ছটফট করতে লাগল, মাটি কামড়াতে আরম্ভ করলে, কখনও মুখ তুলে চেঁচালে—অসহ্য যন্ত্রণা অভিব্যক্ত করলে, তারপরই মাটিতে মুখ ঘষতে লাগল

করালী স্থির হয়ে ব'সে দেখছিল। তার টর্চটার দীপ্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। হঠাৎ সে মৃদুস্বরে ও বিস্ময়ে আতঙ্কের সঙ্গে বললে—রক্ত।

—রক্ত।

—হ্যাঁ।

সে আঙুল দেখালে—কালুয়ার নাকের ছিদ্রের দিকে। মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। শেষে ঘটল একটা বীভৎস কাণ্ড। হঠাৎ চোখ দুটো ফুলে উঠে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারা পড়ল কালো রোমের উপর দিয়ে। সমস্ত কাহারপাড়া দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল।

বনওয়ারী ভয়ার্ত বিস্ত্রস্বরে বললে—কর্তা।

কর্তা বোধ হয় খড়ম-সুদ্ধ বাঁ পা-টা কুকুরটার গলায় চাপিয়ে চেপে দিলেন।

দুই

সেই দিনই, শেষরাত্রে, তখন ভোরবেলা।

ঘুমের ঘোরের মধ্যে আর্তনাদ ক'রে উঠল বনওয়ারী। তার স্ত্রী গোপালীবালা চমকে জেগে উঠে তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—ওগো, বলি—ওগো। ওগো।

ফাল্গুন মাসের শেষ, বিশ তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। কঠিন মাটির দেশ। এরই মধ্যে এখানে বেশ গরম পড়েছে, সন্ধ্যাবেলা বেশ গরম ওঠে; কিন্তু শেষরাত্রে শীত-শীত।

বনওয়ারী বলে—গা-সিরসির করে। সমস্ত রাত্রি বনওয়ারীর ভাল ঘুম হয় নাই। শেষরাত্রে গায়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে আরামে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বু-বু ক'রে চীৎকার করে উঠল। গোপালীবালা তাকে ঠেলে তুলে দিলে—ওগো! ওগো!

বনওয়ারী ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর উঠে বসল।

গোপালীবালা জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল ? স্বপন দেখছিলা নাকি গো ? এমন করে চ্যাঁচালা কেনে গো!

সেও কাঁপছিল ভয়ে।

—হুঁ। একবার তামুক সাজ্ দেখি।

—কি স্বপন দেখল বল দি-নি ? এমন ক'রে তরাসে বুবিয়ে উঠলে কেনে গো ?

—কত্তা আইছিলেন। হাত দুটি জোড় ক'রে কপালে ঠেকালে বনওয়ারী।

—কত্তা! শিউরে উঠল গোপালী।

—হুঁ, কত্তা। পিসীর কথাই ঠিক গোপালী। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—লে, শিগগির তামুক সাজ! খেয়ে আটপৌরে-পাড়া হয়ে তবে যাব নদীর ধারে। লইলে হয়তো ওদের কারোর দেখা পাব না।—বাবার পুজো দিতে হবে। আটপৌরে-পাড়ার চাঁদা চাই।

পরম কাহার আটপৌরে কাহারপাড়ার মাতব্বর। তার কাছে যাবে বনও[illegible]।

বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম—গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙল গ্রামেরই একটা পাড়া। তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন ব'লে—ভিন্ন গ্রাম বলেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহারপাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে কাহার। বেহারা-কাহারপাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি ; পূব দিকে নীলের মাঠের বড় সেচের পুকুর নীলের বাঁধের চার পাড় ঘিরে বেহারাদের বসবাস। কোশকেঁধে-বাড়ির বনওয়ারী বেহারাপাড়ার মুরুব্বি। বেহারা-কাহারেরা পাল্কী বয়। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ এক কাঁধে পাল্কী নিয়ে এক ক্রোশ পথ চ'লে যেত, কাঁধ পর্যন্ত বদল করত না—তাই ওদের বাড়ির নামই 'কোশকেঁধেদের' বাড়ি। ওদের বংশটাই খুব বলশালীর বংশ। লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা, কিন্তু গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের ; অথবা গড়নের সময় ওরা যেন অনবরত নড়েছে, পালিশ তো নাই-ই।

বেহারা-পাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আটপৌরে কাহারদের বসতি। 'গোয়ার বাঁধ' ব'লে মাঝারি একটা পুকুরের পাড়ের উপর ঘর কয়েক আটপৌরে-কাহার বাস করে। আটপৌরেরা পাল্কী কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় ব'লে জাহির করে। খুব ভাল কথা ব্যবহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। বলে--আটপৌরে হ'ল অট্টপহরী।

অর্থাৎ 'অষ্টপ্রহরী'।

আসল অর্থ পাওয়া যায় চৌধুরীদের বাড়ির পুরানো কাগজে। সে সব কাগজ এখন প্রায় উইয়ে খেয়ে শেষ ক'রে এনেছে। উইয়ে-খাওয়া কাগজের স্তূপের মধ্যে কিছু কিছু এখনও পুরো আছে। তার মধ্যে ১২২৫-২৬ সালের থোকা জমাওয়াসিল বাকি থেকে পাওয়া যায়—গোটা বাঁশবাঁদি-মৌজাটাই ছিল পতিত ভূমি—ওখানে কোন পুকুরও ছিল না, বসতিও

না। জাঙল গ্রামে মোটমাট দশ ঘর বাস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়, সবাই তারা ছিল চাষী সদ্‌গোপ। ১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায়—এক নতুন জমাপত্তন—নীলকর শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স সাহেবের নামে। সেই জমার মধ্যে সেই জাঙলের যাবতীয় পতিত ভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। জাঙলের পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙার উপর এখনও কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং হ্রদের পুকুর ব'লে একটা পুকুর দেখা যায়। ওই হ্রদের পুকুরের জল পাকা নালা বেয়ে এসে নীল পচানোর পাকা চৌবাচ্চাগুলি ভর্তি ক'রে দিত। সেখানটা এখন জঙ্গলে ভ'রে গিয়েছে এবং ওইখানেই বুনো শুয়োরের একটা উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে। বাঁশবাঁদি মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সায়েবরাই ওখানে পুকুর কাটায় এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল ক'রে তোলে। সেই হাঁসিল করবার জন্যই এই কাহারপাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে। এসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে এই কাহার কয়েক ঘরই এখানে বসবাস করে। কয়েকজন পেয়েছিল কুঠিবাড়িতে চাকরি, লাঠি নিয়ে ঘুরত-ফিরত, আবার দরকারমত সাহেব মহাশয়দের ঘরদোরের কাজ করত; এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসেবে খেতাব পেয়েছিল—অষ্টপ্রহরী বা আটপৌরে। বেহারা-কাহারেরা নীলের জমি চাষ করত এবং প্রয়োজনমত সাহেব-মেমদের পাল্কী বইত। নীলের জমি সেচ করবার জন্য পুকুরটা কাটানো হয়েছিল ব'লে ওটার নাম 'নীলের বাঁধ', আর 'গোরার বাঁধ' নামটা হয়েছে 'গোরা' অর্থাৎ সাহেবদের বাঁধ ব'লে পুকুরটার জল ভাল—এই পুকুরে সেকালে কারও নামবার হুকুম ছিল না, ওখান থেকেই যেত সাহেবের ব্যবহারের জল, মধ্যে মধ্যে কুঠিয়াল সাহেবের কাছে সমাগত বন্ধুবান্ধব গোরা সাহেবেরা এসে স্নান করতে নামত। স্নান করত নাকি উলঙ্গ হয়ে। সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুষ্টিটার রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। সুচাঁদপিসীর কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার বাবার রঙ একেবারে সাহেবের মত ছিল। সুচাঁদপিসির রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয় কিন্তু ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে 'হলুদমণি' পাখী; চৌধুরীবাড়ির কর্তার ছেলে অকালে ম'রে গেল মদ খেয়ে, নইলে যুবতী পাখীর এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। তেমনিই বড় বড় চোখ, তেমনই সুডৌল নাক, চুলের সামনেটা পর্যন্ত তেমনিই ঢেউখেলানো। চৌধুরীকর্তা আজ নিঃস্বও বটে, তার উপর হাড়কৃপণও বটে, তবু তিনি বসন্তের মেয়ে পাখীকে মায়া-মমতা করেন। বসন্তের ও-বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ আজও ঘোচে নাই, সে আজও ও-বাড়ি যায়, খোঁজখবর করে, দুধের রোজ দেয়, কিন্তু টাকার তাগাদা করে না।

এই চৌধুরীকর্তার বাবার বাবা ছিলেন সাহেবদের নায়েব। তিনি নাকি ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, আর তেমনই নাকি ছিলেন জবরদস্ত জাঁহাবাজ বেটাছেলে; তাঁর দাপে নাকি বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেত। তাঁকেই দয়া করেছিলেন এই বেলবনের মহারাজ—যিনি নাকি এখানে 'কর্তা' ব'লে পরিচিত—গেরুয়া কাপড় প'রে, খড়ম পায়ে, দণ্ড হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষ আর ধবধবে পৈতের শোভায় বুক ঝলমলিয়ে, ন্যাড়া মাথায়

যিনি রাত্রে চারদিকে ঘুরে বেড়ান। চন্দনপুরের ভদ্রলোকেরা বলে—ও-কথাটা নেহাতই কাহারদের রচনা করা উপকথা। আসল কথা নীলকুঠী সব জায়গায় যেমন ভাবে উঠেছে এখানেও তেমন ভাবেই উঠেছে, তবে কোপাইয়ের বান আর কুঠী-ওটা ঘটেছে একসঙ্গে। যে সময় কুঠীয়াল সাহেবদের খারাপ সময় চলছিল, কারবার উঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কোপাই ভাসল। তেমন ভাসা কোপাই নাকি কখনও ভাসে নাই। সে বান কুঠী-বাড়ি পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল। লোকে বলে, সাহেব-মেম সেই বানে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু সুচাঁদপিসী যে কথা বললে. সেইটাই হ'ল আসল কথা। সেই কথাটাই বিশ্বাস করে বনওয়ারী। ওই কর্তার কথা অমান্য করতে গিয়েই সাহেব মহাশয় মেমকে নিয়ে তলিয়ে গেল ঘুরনচাকির মধ্যে প'ড়ে। নইলে সাহেব মেম—যারা সাত সমুদ্দর পার হয়ে ভাসতে ভাসতে আসে, তারা কোপাইয়ের বানে ম'রে যাবে? কর্তার লীলা, কর্তার ছলনা সব। চৌধুরীকর্তা দেবতার দয়ায় শুধু যখের ধনই পেলেন না, সাহেব কোম্পানীর তামাম সম্পত্তিও পেয়ে গেলেন জলের দামে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

চৌধুরীকর্তাদের আমলেও কাহাররা বেহারার কাজ করেছে। চৌধুরীদের পালকী ছিল দুখানা। ডুলি ছিল খানচারেক। আটপৌরেরা তাঁদের বাড়িতেও আটপৌরের কাজ করেছে।

* * *

পুরানো কথা যাক; আজকের কথাই বলি। বনওয়ারী পরমের বাড়ি এসে দেখলে, এই ভোরবেলাই পরম বেরিয়ে গেছে। পরমের বউ কালোশশী এই গাঁয়েরই দৌহিত্রী। আটপৌরেদের গোরাচাঁদের বেটীর বেটী। এই গাঁয়েই মানুষ হয়েছে কালোশশী। গোরাচাঁদের ছেলে ছিল না—বড় মেয়ের মেয়েকে নিয়ে মানুষ করেছিল। সুতরাং কালোশশীর সঙ্গে কথা বলতে বউমানুষের সঙ্গে কথা বলার সঙ্কোচ ছিল না। তার উপর এককালে বনওয়ারীর সঙ্গে তার নাকি মনে মনে 'রও ছুঁই ছুঁই' এমন অবস্থা হয়েছিল। সে অনেক কথা। কাহার-কন্যে কালোশশীর জন্যে সেকালে বোধ হয় দেবতারাও পাগল হয়েছিল। কিন্তু তার মন কেউ পায় নাই। পেয়েছিল বনওয়ারী। কিন্তু হায় রে 'নেকন'। আটপৌরে-কাহার-কন্যে বেহারা কাহারের ঘরে আসে কি ক'রে? হায় রে 'নেকন'।

সে-দিনের কথা মনে পড়লে বনওয়ারীর এই বয়সেও বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে ওঠে। রাত্রে উঠে দু'জনে গিয়ে মিলত কোপাইয়ের কূলে। গান গাইত কালোশশী। আকাশে উঠত 'চন্দ্রশশী'।

আটপৌরে-পাড়ার ছোঁড়ারা পাহারা দিত; বনওয়ারীকে পাকড়াও করবার জন্যে তাদের সে কি চেষ্টা। কিন্তু লবডঙ্কা। একদিনও ধরতে পারেনি তারা। বনওয়ারী হাসত আর গান করত —'সুরুৎ করে চলে যাব গিরগিটির মতন, চোখে চোখে রাখবি কতক্ষণ।' ওরা আক্রোশে জ্বলত। ওদের সর্দার পরম পথে-ঘাটে ছুতোনাতা ক'রে ঝগড়াও করত। কতবার যে দু-চারটে করে কিল চড় আদান-প্রদান হয়েছে পরমের সঙ্গে তার ঠিক নাই। শেষে পরমের হাতে পড়ল কালোশশী। কপাল কালোশশীর। পরমের হাতে প'ড়ে ওর আর দুর্গতির শেষ নাই। কালোবউকে বিয়ে ক'রে পরম ভালোবাসলে এক ভিনজাতের

কন্যাকে ; তার উপর মন্দ-সঙ্গে মিশে ধরলে ডাকাতি। কালো-বউ মনের আক্রোশে চন্দনপুরে রেজা খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল। পরমের দ্বীপান্তরের সময় চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ির ঝি-বৃত্তি করলে, আর বাবুদের চাপরাসী সিংজীর অনুগৃহীতা হয়ে রইল।

পরম দ্বীপান্তর থেকে ফেরার পর কালোশশী গাঁয়ে এসেছে। কালোশশীর অনেক দুর্নাম, অনেক কলঙ্ক.—মানুষটা যত বড়, তার চেয়েও বড় তার কলঙ্ক।

আজ কালো-বউ একগাল হেসে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বললে—কি ভাগ্যি, সকালেই তোমার মুখ দেখলাম ! ব'স।

—পরমদাদা গেল কমনে, তাই কও।

দাদার তরেই আইছিলা তা হ'লে ? হাসলে কালোশশী।—তা সে তো তোমার এই খানিক আগে বেরিয়ে গেল। ওই হুঁকোর মাথায় কল্কিতে আগুনও নেবে নাই এখনও। খাও কেনে তামুক।

—কি বেপদ দেখ দি-নি !

—কেনে ? বেপদটা কি হ'ল ? ব'স, আমার সাথে খানিক গল্প কর নিশ্চিন্দি। মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল কালো-বউ।

—বলি, হাসি তোমার আসছে ?

—কেনে ? তোমাকে দেখে হাসি আসবে না কেনে ?

—বলি কাল 'আতে' সনজে-কালে শিস শোন নাই ?

কালো-বউ এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল।—হাঁ, তা শুনেছি ভাই।

—তবে ?

তবের ব্যাপারটা হ'ল—রাত্রির অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা কালো-বউ ভুলে গিয়েছে।

বনওয়ারী এবার বসল। হুঁকোটা নিয়ে টানতে টানতে সবিস্তারে কালোশশীকে বললে করালীর কুকুরটার রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা। বললে—তোমাকে ক'ব কি ভাই, একেবারে মুখে 'অক্ত' তুলে মাথা কাছড়ে ম'রে গেল। শেষকালে হ'ল কি—

মুখের কাছ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে ধরলে বনওয়ারী—তার চোখে মুখে ফুটে উঠল অপরিসীম আতঙ্ক, গায়ের রোমগুলি কাঁটার মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

কালোশশী মুখ হাঁ ক'রে শুনছিল। হাতে ঝাঁটা নিয়ে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বনওয়ারী বললে কুকুরটার চোখ ফেটে যাওয়ার কথা। বললে—ফোস্কার মত ফুলে উঠে ফ-টা-স ক'রে ফেটে গেল। আর গলগল ক'রে অক্ত।

শিউরে উঠল কালোশশী—ওঃ, মাগো !

বনওয়ারী বললে—তাই এয়েছিলাম পরমদাদার কাছে ; পিতিবিধেন তো করতে হবে।

—তা হবে বইকি ! কত্তার 'আশ্চয়ে' বাস ক'রে কত্তার কোপে প'ড়ে বাঁচব কি ক'রে ?

—সেই তো। তা তোমরা করছ কি ?

—আমরা ? হঠাৎ কালোশশী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল তার স্বামীর উপর।—আমার কপালে

ঝাঁটা আর তার কপালে ছাই—বুঝলা দেওর, তার কপালে ছাই। এ পাড়ার অদেষ্টই মন্দ। বুঝলা না? মাতব্বর যদি মাতব্বরের মত হয় তো দশের জন্যে ভাবে। সে কি আর তুমি ভাই। সে হ'ল—'ফরম' আটপৌরে। 'আতদিন' নিজের ভাবনা, জমি-পয়সা আর ওই পয়সা-জমি। কাল আতে সবাই শুনেছে শিস। ভয়ও সবাই পেয়েছে। কিন্তু কি হবে? মাতব্বর গেল চন্নপুরে, বড়বাবুদের কাছারিতে। তামাম সাহেবডাঙা কিনেছে বাবুরা, শুনেছ তো?

চমকে উঠল বনওয়ারী। কথাটি তার কাছে একটা মূল্যবান কথা। সে প্রশ্ন করলে—সকালে উঠে সেখানেই গিয়েছে বুঝি?

—আবার কোথা? বলব কি দেওর, 'আতে' স্বপন দেখে কথা কয়—বিড়বিড় ক'রে ওই কথা। 'নয়ানজুলি', 'ছেঁচের জল', 'দে কেটে দে', 'কোদালে ক'রে মাথা কুপিয়ে দোব'—এই কথা।

বনওয়ারী অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চন্নপুরের বড়বাবুরা রাজাতুল্য লোক, মস্ত কয়লার ব্যবসা। তাঁরা হঠাৎ জমির উপর নজর দিয়েছেন। পতিত জমি যেখানে যা আছে কিনে চলেছেন। জমি কাটাবেন। কতক নিজেরা কাটিয়ে চাষ করবেন, কতক প্রজাবিলি করবেন। পরমদাদা ভারী বুদ্ধিমান লোক। খোঁজখবর অনেক রাখে। সে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে বাবুদের দরবারে। আর সে কি করছে? নাঃ, ছি ছি ছি।

বনওয়ারীর সমস্ত বৈষয়িক কাজগুলি মনে প'ড়ে গেল। জাঙলে মনিববাড়ি যেতে হবে। ধান পিটানো শেষ হয়ে গিয়েছে—এখনও বছরের দেনা-পাওনার হিসাব হয় নাই। সেখানে একবার যাওয়া উচিত। তারপর একবার চন্নপুর যেতেই হবে। কালো-বউয়ের কথাগুলি বনওয়ারীর কানে আর যাচ্ছেই না প্রায়।

কালোশশী ব'লেই চলেছিল—পাশে আমি যে একটা মানুষ শুয়ে থাকি, তা অসুখ-বিসুখ কি দেহ খারাপ হ'লে যদি কাতরে কাতরে ম'রেও যাই তবুও তার ঘুম ভাঙে না। বললে বলে কি জান? বলে—নাক ডাকে, তাতেই শুনতে পাই না। সে নাক ডাকা যদি শোন।

কালোশশী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

বনওয়ারী হঠাৎ উঠে পড়ল। হুঁকোটা ঠেসিয়ে রেখে দিয়ে বললে—আমি ভাই তা হ'লে ওঠলাম।

—ব'স, ব'স। আর একবার না হয় তামুক সেজে দি।

—আমারও তো কাজকম্ম আছে ভাই। মুনিববাড়ি যেতে হবে। তা' পরে—। থেমে গেল বনওয়ারী। চন্নপুরে যাওয়ার অভিপ্রায়ের কথাটা আর বললে না সে। হাজার হলেও কালোশশী পর।

কালোশশী তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে আক্ষেপের একটা শব্দ ক'রে বললে—হা-রে, হা-রে। সব পুরুষই এক। ওই কাজ কাজ আর কাজ। মুখে তার এক বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

বনওয়ারী একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সে হাসতে চেষ্টা ক'রে বললে—তা ভাই, কাজ করলেও

সে তো সবই তোমাদের জন্যেই। 'ওজগার' ক'রে 'সমপ্পন' তো তোমাদের হাতেই।

বলতে বলতে সে বেরিয়ে এল পরমের বাড়ি থেকে। নইলে এ কথাতেও কালোশশীর কথায় ছেদ পড়বে না।

কাজ অনেক। বনওয়ারীর একদণ্ড ব'সে থাকলে চলে? ভাই কালোশশী, তোমাকে ভাল তো বাসি, কিন্তু উপায় কি? রঙের ছাপ একবার মনে লাগলে কি আর ওঠে? হোক না দেখা এক যুগ পরে, দেখা হ'লেই দুজনের ঠোঁটেই হাসি ফোটে। ওই রঙটার রকমই হ'ল পাকা। একবার ছুঁলে, ঘষে ঘষে 'হিয়ে' ক্ষ'য়ে ফেললেও ওঠে না। কিন্তু যার উপায় নাই, তার জন্যে কেঁদেকেটে মন খারাপ ক'রেই বা লাভ কি? তোমার মায়ের বাপ যে তখন 'বেহারা-কাহার' ব'লে তোমাকে দিলে না বনওয়ারীর হাতে! আর পরমের সঙ্গে যখন তোমার বিয়ে হয়ে গেল, তখন বনওয়ারী আর হেসে দুটো কথা ক'য়ে করবে কি? আর তেমন জাতের মানুষ নয় বনওয়ারী। কর্তব্যধর্ম ব'লে একটা কথা আছে। একটা পাড়ার মাতব্বর সে। হরিবোল! হরিবোল! 'পভু', তুমিই বনওয়ারীকে বাঁচিও। বাঘ-শুয়োর-সাপ-ঝড়-বান—এসব থেকে বাঁচাতে বলে না বনওয়ারী, বনওয়ারীকে তুমি এই সব অন্যায় কারণ থেকে বাঁচিও।

কাজ অনেক। পাড়ায় ফিরে সুচাঁদপিসীকে বলতে হবে—যেন প্রতি বাড়ি ঘুরে পুজোর চাঁদা আর চাল তুলে রাখে। যে মেয়েগুলান ঘুঁটে মাথায় ক'রে দুধ নিয়ে চন্ননপুরে যাবে, দুধ ও ঘুঁটে বেচে তারপর সারাদিনটা সেখানে বাবুদের ইমারতে মজুরনী খাটবে, তাদেরই বলে দিতে হবে—অবসর ক'রে কেউ যেন কাছারিতে পরমের সঙ্গে দেখা ক'রে সকাল সকাল তাকে বাড়ি ফিরতে বলে। যদি তার চন্ননপুরে যাওয়া আজ না-ই হয়, মুনিববাড়িতে যদি আটক পড়েই যায় কোন রকমে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা ঠাওরালে সে। মুনিববাড়িতে তো রকমের অভাব নাই। খামারটা সাফ কর, নয়তো কাঠের গুঁড়িটা থেকে কতকগুলো কাঠ ছাড়িয়ে দিয়ে যা; নয়তো গরুর জাব-খাওয়া ডাবরগুলোর গায়ে মাটির লেপন দে; নিদেন কলার ঝাড়ের মধ্যে পুরনো 'এটে' পচেছে, খুঁড়ে তুলে ফেল্। আর হিসেবে? হিসেবে বসলেই তো এক বেলা।

আটপৌরে-পাড়া থেকে নিজেদের পাড়ায় ফিরে প্রথমেই তাকে দাঁড়াতে হ'ল করালীর বাড়ির উঠানে। করালী উঠানেই একটা গর্ত খুঁড়ছে, আর পাখী করালীকে তিরস্কার করছে।

—প'চে গন্ধ উঠবে যে!

করালী মাটি কুপিয়েই চলেছে। ছোঁড়াটার দেহখানা শক্ত বটে। আচ্ছা জোয়ান হয়ে উঠেছে! এরই মধ্যে শরীরের—বিশেষ ক'রে বুকের পিঠের পায়ের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, তার উপর ঘেমেছে—চক্‌চক্ করছে সর্বাঙ্গ। আজ রবিবার—ছোঁড়ার ছুটি, তাই চন্ননপুর না গিয়ে কালুয়া কুকুরটার জন্যে সমাধি খুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

পাখী চেঁচিয়েই চলেছে—কথা শুনছিস? না কানে যেছে না?

—চেঁচাস না মেলা বকবক ক'রে। করালী মাটি কোপাতে কোপাতেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে। কালুয়া কুকুরটাকে সে এইখানেই সমাধি দেবে। কালুয়ার হাড়মাস যে চিল-শকুন-

শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে, সে করালীর সহ্য হবে না।

—বাড়িতে টেকা দায় হবে। ভাতের গরাস মুখে তুললে বমি আসবে বদ 'ঘেরানে'।

—তা তোর কি? আমার বাড়ি আসিস না তুই।

—ওরে মুখপোড়া, ওরে নেমকহারাম। তোর মতন নেমকহারাম বজ্জাত কেউ আছে নাকি? বলে যে সেই—'যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি', তাই তোর বিত্তান্ত। তা আমার ঘেরান না লাগুক, আমি তোর বাড়িতে না আসি, নসুদিদিও তো মানুষ। সে থাকতে পারবে কেনে?

বনওয়ারী করালীর বাড়ি না ঢুকে পারলে না। বনওয়ারীকে দেখেই পাখী ব'লে উঠল—এই দেখ মামা, কি করছে দেখ। বাড়িতে কুকুর পুঁতবে—'সামাজ' দেবে। বারণ কর তুমি। নসুদিদি নাই, উ যা-খুশি তাই করছে।

বনওয়ারী বলে—এই, বলি হচ্ছে কি? বাড়ির উঠোনে ভাগাড় করে কে? তুই কি খ্যাপা না পাগল?

করালীর টামনার কোপে মাটিতে একটা ফাট দেখা দিয়েছিল ফাটলে টামনার চাড় দিয়ে সেই মাটির একটা চাপ ছাড়াবার চেষ্টা করছিল দাঁতে দাঁত টিপে, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ ক'রে। সে কোনও উত্তর দিলে না। পাখী বললে—আবার বলছে কুকুর পুঁতে যাবে বাঁশবেড় খুঁজতে।

—বাঁশবেড় খুঁজতে। বিস্ময়ের সীমা রইল না বনওয়ারীর।

—হ্যাঁ। কিসে শিস দেয়, কিসে মেরেছে ওর কালুয়াকে, তাই খুঁজে দেখবে।

—সর্বনাশ। হে ভগবান। হে বাবা কত্তাঠাকুর—তোমার লীলাখেলার নিরাকরণ করতে চায় ছোঁড়া। একের পাপে দশ নষ্ট হবে। মুহূর্তে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

—করালী।

করালী এ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল, টামনাটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে খানিকটা স'রে দাঁড়াল। ঘুরে তাকালে সে বনওয়ারীর দিকে।

বনওয়ারীর এই কণ্ঠস্বরকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। বনওয়ারী সহজে অত্যন্ত ভালমানুষ লোক, পাড়ার মাতব্বর হ'লেও মাতব্বরির কোন ঝাঁজ নাই, কোন অহঙ্কার নাই। হাসি-খুশি নাচ-গান মিষ্টি কথা নিয়েই আছে, কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া-বিবাদ হ'লে দু'জনকেই বুঝিয়ে-সুজিয়ে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়; দেখে মনে হয় গরজ যেন বনওয়ারীরই। কিন্তু আর এক বনওয়ারী আছে; কালেকস্মিনে সে দেখা দেয়। সে দেখা দেবার আগে প্রথমেই এই আওয়াজ তুলে সে সাড়া দেয়, সেই বনওয়ারী জাগছে।

সে বনওয়ারী জাগলে বিদ্রোহীকে তৎক্ষণাৎ অসুরের মত শক্তিতে আক্রমণ ক'রে মাটিতে ফেলে, বুকে চেপে ব'সে, বাঁ হাতে গলা টিপে ধরে, ডান হাতে টেনে ধরতে চেষ্টা করে জিভ। তখন পাঁচ-সাতজন জোয়ান ভিন্ন সে বনওয়ারীকে টেনে সরানো যায় না।

বনওয়ারীর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে করালীর দিকে। পাখী এবার সামনে এসে ভয়ার্ত স্বরে বললে—না, মামা, না। ও আর সে সব করবে

না।

করালী কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্থিরদৃষ্টিতে বনওয়ারীকে দেখছে। মুহূর্তে চোখে ফুটছে শঙ্কা, আবার পর-মুহূর্তে জ্বলে উঠছে বিদ্রোহ।

বনওয়ারী পাখীকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। পাখী পিছন থেকে তার হাত ধরতে চেষ্টা করলে —মামা! মামা! তবু বনওয়ারী নীরবে এগুচ্ছে।

শেষে নিরুপায় হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পাখী—ও দিদি, দিদি গো! ও দিদি! দিদি অর্থাৎ সুচাঁদ। এ সময়ে এক সুচাঁদ পারে বনওয়ারীর সামনে দাঁড়াতে।

বনওয়ারী উত্তরোত্তর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, এমন ভাবে আজও কেউ তাকে অপমান করে নাই। সে এগিয়ে চলল। তবু করালী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

করালী কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, হঠাৎ যেন সাহস তার ভেঙে পড়ল, মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে উঠানের বেড়াটা ডিঙিয়ে ওপাশে প'ড়ে ছুটে পালাল মাঠে। বনওয়ারী খানিকটা ছুটল, কিন্তু বয়স হয়েছে বনওয়ারীর, ছুটলে হাঁপ ধরে। এমনি পাল্কী কাঁধে 'সওয়ারী' বহনের অভ্যস্ত চালে কাঁধ বদল ক'রে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিয়ে দশ ক্রোশ হাঁটতে পারে, কিন্তু এমনভাবে ছুটতে আর পারে না। থামতে হ'ল বনওয়ারীকে। ওদিকে গাঁয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সুচাঁদপিসী হাঁকছে। মেয়ে ছেলে সব জ'মে গিয়েছে। প্রহলাদ রতন এগিয়ে আসছে। বনওয়ারী অগত্যা ফিরল। যাক হারামজাদার বাচ্চা—এখন যাক; কিন্তু যাবে কোথা? ফিরতে হবে, না ফিরতে হবে না? কার এলাকায় ফিরবে?

* * *

ফাল্গুন মাসের সকালবেলা, তাই কাহারেরা বাড়িতে ছিল। কাহারপাড়ায় কাজকর্মের চাপ এখন কম; মাঠে ক্ষেতে চাষ-কর্ম এখন বন্ধ, খামারে ধান-মাড়াইও শেষ হয়ে গিয়েছে। রবি ফসলের পালাও প্রায় শেষ; গম কারও পেকেছে, কারও পাকতে শুরু করেছে, ছোলা-মসুর-সরষে এ সবেরও ওই অবস্থা। আলুর জমির কাজও আর নাই। কেবল তুলতে বাকি। চৈত্রের প্রথম থেকে এক দফা ভিড় লাগবে আবার। কারও কারও আখ আছে—নাবি চাষের আখ, সেও মাড়াই হবে চৈত্র মাসে। এখন একমাত্র কাজ মুনিববাড়ির দেনাপাওনার হিসেব—সে হিসেব মুনিবদের হাতে। কাজেই পুরুষেরাও সকলে বাড়িতেই ছিল। তাই রক্ষা হ'ল।

প্রহলাদ রতন বনওয়ারীর সমবয়সী। ওরা এগিয়ে এসে বনওয়ারীর হাত ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। প্রহলাদ বললে—করালীর বিহিত যদি না হয় অতন, তা হ'লে তো কাণ্ড খারাপ। কেউ আর কাউকে মানবে না।

রতন বললে—তা হ'লে গেরামের 'পিতুল' নাই—এ একেবারে 'ধ্রোব' কথা।

বনওয়ারী কোন কথা বললে না।

যে দিক দিয়ে ওরা পাড়ায় ঢুকল, সে দিক দিয়ে নিমতেলে পানুর ঘর সামনেই পড়ল। পানু নিমতলার পশ্চিম দিকে ছায়াটি যেখানে পড়ে, সকালবেলা সেইখানটিতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে তামাক সেজে মাতব্বরদের অভ্যর্থনা করলে।—ব'স বনওয়ারীদাদা, অতনদাদা,

পেল্লাদখুড়ো,—ব'স, তামুক খাও।

একে একে জুটল সকলেই। সুচাঁদও এসে দাঁড়াল। বললে—বেশি 'আগ' করিস না বাবা বনওয়ারী, ছোঁড়াকে এনে তোর পায়ে ফেলে দিছি আমি।

বনওয়ারী এতেও কোন কথা বললে না।

সুচাঁদ বললে—আমার হয়েছে এক মরণ, বুঝলি বাবা—এই বুড়ো বয়েসে হারামজাদী বেটীর বেটী নিয়ে এ এক বেপদ। গলায় কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটা ওঠেও না, নামেও না, তাই। সর্বনাশীর করালী ছাড়া সারা 'তিভুবন' খাঁ-খাঁ খাঁ-খাঁ করছে। বুড়ীর সে হাতনাড়া দেখে এবার সবাই হেসে উঠল। শুধু হাতনাড়াই নয়, খানিকটা নেচেও দিলে বুড়ী। সে দেখে বনওয়ারীর মুখেও এবার অল্প একটু হাসি দেখা গেল। পানু ঘরের ভিতর থেকে একটা পাঁঠার কান ধ'রে টেনে এনে বললে—এই দেখ বনওয়ারীদাদা, এইটি। কাল 'আতে' এসেই আমরা 'স্তি-পুরুষে' এইটিকে কত্তার পুজোয় দোব ঠিক করেছি। এইটিই তোমার সবচেয়ে বড়, আর গায়েও বেশ আছে। বেশ তেজালো পাঁঠা।

বনওয়ারী পাঁঠার গায়ে হাত বুলিয়ে মেরুদণ্ডটা টিপে দেখে বললে, বেশ সাবধানে যতন ক'রে আখিস বাপু দুটো দিন। পুজো পরশু দোবই। শনিবার আছে; বারও পাব।

রতন বললে—আটপৌরে-পাড়ায় বলবে না?

বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে হতাশা প্রকাশ ক'রে বললে—তবে আর 'মেজাপ' খারাপ হ'ল কেনে। সকালে—সেই ধর পেথম—কাক কোকিল ডাকতে ঘুম ভেঙেছে। সমস্ত 'আত' ভাবনায় ঘুম হয় নাই। ভোর 'আতে' চোখ লেগেছিল খানিক—তা তোমার, সঙ্গে সঙ্গে স্বপন হয়ে গেল। দেখলাম যেন, ঠিক কত্তা এসে দাঁড়িয়েছেন মাথায় 'ছিয়রে'। বু-বু ক'রে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম। উঠেই গেলাম পরমের বাড়ি। তা পরম সেই ভোরেই বেরিয়েছে। তা বলে এলাম কালোবউকে—বলি, ব'লো পরম এলে।

রতন প্রহলাদ দুজনেই একটু হাসলে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে। মজলিসের সকলে—স্ত্রী-পুরুষ সকলে হাসলে। তারা অবশ্য গোপন ক'রে হাসলে।

বনওয়ারী অনুভব করতে পারলে গুপ্ত হাসির ধারার সরস স্পর্শটুকু। সে কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বললে—সে গিয়েছে তোমার চন্ননপুরে বাবুদের বাড়ি। বাবুরা নাকি গোটা সায়েবডাঙা কিনেছে। ডাঙা ভেঙে জমি করবে। 'খানিক আদেক' জমি বিলিও করবে শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবার মন ঘুরে গেল; বনওয়ারীও কালো-বউয়ের কথা থেকে লুব্ধ হয়ে ছুটল জমির দিকে।

এটা একটা খবর বটে। নীলকুঠির সাহেবদের সেই ডাঙাটা, যেখানে বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য তারা ঘর-দোর করেছিল, কুঠি করেছিল, সেই ডাঙাটা ভেঙে জমি হবে? বিলিও করবে কিছু জমি? এবং তাদেরই একজন সে জমি বিলি নেবার জন্য ভোরবেলায় গিয়ে ধরনা দিয়ে বসে আছে? মুহূর্তে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল। জমি! জমি!

বনওয়ারী বললে, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। শুনছ অতন-ভাই, পেল্লাদ-খুড়ো!

রতন প্রহলাদ উৎসুক হয়ে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে ব'সেই খানিকটা কাছে এগিয়ে এল।—কি বল দি-নি? কথাটা কিন্তু সকলেই বুঝতে পেরেছে। এক চাপ ছোলা-

কলাই যখন ভিজে ফুলে ওঠে, তখন যেমন সবগুলি ছোলা থেকেই অঙ্কুর বার হয়ে মাটি ফাটিয়ে উপরের দিকে একসঙ্গে ওঠে, তেমনিভাবে এই খবরের অন্তর্নিহিত আশার সরসতায় সকল কাহারের অন্তর থেকে একই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাছাকাছি ব'সে পরস্পরের মনের খবর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে পরস্পরকে ছুঁয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কিন্তু তবু কথাটা বনওয়ারীর কাছ থেকে আসাই ভাল। বনওয়ারীরও কথাটা বলাই ভাল। কথাটা একদিন প্রকাশ পাবেই, এবং নিজে জমি নিয়ে সে যদি কথাটা কাহারদের কাছে গোপন ক'রে রাখে, তবে সেটা তার অধর্ম হবে এবং মাতব্বরেরও যোগ্য হবে না। সে বললে, আমাদেরও সব চল কেনে চন্ননপুরে। জাঙলের সায়েবডাঙার জমি তো তোমার ধরগা চেয়ে কম লয়; সেরেস্তায় তিনশো বিঘের ডাক। আমরা সবাই মিলে দু বিঘে এক বিঘে ক'রে—। বনওয়ারী সকলের মুখের দিকেই তাকালে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে—কয়লার মধ্যে পড়া আগুনের ফিনকির মত।

—কি বল?

সুচাঁদ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নাই। সে দূরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, করালীর আচরণের সকল বিরক্তি এবং রাগ মুছে গিয়ে সকলের মুখে হঠাৎ যেন একটি প্রসন্ন দীপ্তি ফুটে উঠল। কোন্ সে বিস্ময়কর সংবাদ, যার মধ্যে সর্বজনীন প্রসন্নতার কারণ লুকানো আছে? তার উপর বনওয়ারীর কথা বলবার ভাবের মধ্যে বেশ একটি শলাপরামর্শ করার ভঙ্গিও সে দেখতে পেলে।

এগিয়ে এসে সে বললে—কি? কি রে বনওয়ারী? কি বলছিস তোরা?

প্রহলাদ হেসে বললে, লাও ঠ্যালা! এখন ঢাকঢোল বাজিয়ে পাড়া গোল ক'রে বল।

সুচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মস্করা করছিস আমার সঙ্গে পেল্লেদে, মুখপোড়া ছুঁচো?

শুনতে না পেলেও বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখনাড়া এবং মুখভঙ্গি থেকে সুচাঁদ নির্ভুল ধরতে পারে যে তাকেই তারা ঠাট্টা করছে। এবার নিশ্চয় চীৎকার ক'রে কেলেঙ্কারি করবে বুড়ী। একমাত্র উপায় ব্যাপারটা বলা। বললে বুড়ী মস্করার জ্বালাটা ভুলতে পারে। সুতরাং কথাটা তাকে বলতে হয়, তাই বললে বনওয়ারী। কাছে বসিয়ে চীৎকার ক'রে হাত নেড়ে বুঝিয়ে বললে সব। সুচাঁদ বললে—হ্যাঁ, তা ভাল যুক্তি বটেন। ওই নদীর উ পারে বুঝলি কিনা—

বনওয়ারী উঠে পড়ল। সুচাঁদপিসীর 'বুঝলি কিনা' বুঝতে গেলে এ বেলা কাবার হয়ে যাবে। এমনিতেই করালী-শয়তানের পাল্লায় প'ড়ে দেরি হয়ে গিয়েছে। ভেবে-চিন্তে হঠাৎ সে উঠে পড়ল। তারপর চীৎকার ক'রে সুচাঁদকে বললে—তুমি তা হ'লে পুজোর পয়সা চাল আদায় ক'রো পিসী, বুঝলে?

—পুজোর? কত্তার পুজোর?

—হ্যাঁ গো। নাহ'লে কল্যেণ নেই।

—অ্যা—অ্যাই! না হ'লে কল্যেণ নাই। সে কথা বুঝবে কে? তা শোন্, আর একটি

কথা বলি।

—কি ?

—জমি যদি লিবি, তবে পুজোতে আর একটি পাঁঠা জুড়ে দে। কত্তার আজ্ঞে নিয়ে করবি ; আখোঁড়া পিথিবীর অঙ্গে চোটাবি—কত কি না-জানা না-চেনা না-শোনা 'রোপোদ্দরব' আছে—বুঝলি কিনা—না কি বলিস ?

কথাটা মনে নিলে সকলের। সকলে বনওয়ারীর দিকে চাইলে। সুচাঁদও চেয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। বনওয়ারীও ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ একটা কথার মত কথা। হ্যাঁ। ভাল বলেছ পিসী।

—কি বলছিস ?

চীৎকার ক'রে বনওয়ারী বললে—তাই হবেন গো।

সুচাঁদ খুশি হয়ে বললে—আ-চ্ছা। এই দেখ, সে তো বাপের আমলের কথা—

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে বাধা দিয়ে বললে—সাতটার টেন পুল পেরিয়ে গেল। উ বেলায় শুনব।

রেলের লাইনটা চ'লে গিয়েছে গাঁয়ের পূর্বদিক দিয়ে। চন্ননপুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইনটা কোপাই নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চ'লে গিয়েছে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির নীলের-বাঁধ পুকুরের পাড় থেকে বেশ দেখা যায় ব্রিজটা। ওই ব্রিজে যে গাড়িগুলো পার হয়, তাই ধ'রে চলে কাহারপাড়ার জীবনের ঘড়ি। সকালে ছয়টায় একটা গাড়ি। তারপর সাতটায় গাড়ির সিগনাল পড়লেই পুরুষেরা কাজে বের হয়। আজ তাদের দেরি হয়ে গিয়েছে। তারপর যেই ওই সিগনাল দেখে সাতটার গাড়ি আসে—অমনি মেয়েরা বের হয়, খাটতে যায়, ঘুঁটে বেচতে যায়, দুধ বেচতে যায়।

সুচাঁদ ট্রেনের দিকে চেয়ে রইল। পুলে গাড়ি চাপলে যে শব্দ ওঠে, সে শব্দও তাকে কান পেতে মনোযোগ সহকারে শুনতে হয়। গুরুগম্ভীর ঝমঝম শব্দের যে ক্ষীণ ধ্বনি তার কানে প্রতিধ্বনি তোলে, সেটুকু ভারি মিষ্টি ব'লে মনে হয় সুচাঁদের। সুচাঁদ বলে—আতে যখন গাড়ি পুল পেরোয়, ঘরে চোখ বুজে শুয়ে আমার মনে হয় কেত্তনের দলের খোল বাজছে।

পুরুষেরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

বনওয়ারী ব'লে দিল সকলকে—পরশু আসতে পারব না, আগাম আজ থেকে ব'লে 'এখো' যেন, হ্যাঁ। নইলে আবার মনিবেরা বলবে—আগে বলিস নাই কেনে, আমার কাজ চলবে কি ক'রে ?

* * *

জাঙলের ঘোষ-বাড়ির ভাগজোতদার বনওয়ারী। বনওয়ারীর বাপের আমল থেকে দু-পুরুষ ধরে সম্বন্ধ। জাঙলের ঘোষ-বাড়ির যখন নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা, তখন থেকে বনওয়ারীদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ। বুড়ো ঘোষ-কর্তা যিনি এই সেদিন মারা গিয়েছেন, তখন তাঁর অল্প বয়স—ছোকরা মানুষ, তখন তিনি সদ্য পিতৃহীন হয়ে বাউণ্ডুলের মত

ঘুরে বেড়াতেন আর ওই চন্ননপুরে বড়বাবুদের নতুন শখের থিয়েটারে মেয়ে সেজে বক্তৃতা করতেন। বাড়িতে ছিল বিধবা মা আর অল্পবয়সী স্ত্রী ও বিধবা বোন। কিন্তু দিনগুজরানের কোন উপায় ছিল না। জমি না, জেরাত না, কোন চাকরি না। ছেলে ভাবে না, ভাববার সময় নাই ; তাই দিন চালানোর জন্য অনেক ভেবে বিধবা মা বনওয়ারীর বাপের কাছে একটি ঢেঁকি পাতবার কাঠ চেয়ে নেয়। এই হ'ল সম্বন্ধের সূত্র। বনওয়ারীর বাপ সেবার কোপাইয়ের বানে একটা বেশ বড় কাঠ ধরেছিল, তারই একটা অংশ সে নিয়েছিল। বউয়ের কানের মাকড়ি বিক্রি ক'রে ছুতোর ডেকে সেই কাঠে ঢেঁকি পেতে ধানভানার কাজ নিয়েছিল ঘোষগিন্নী। এ কাজেও তাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করত বনওয়ারীর মা। এই অবস্থায় ছেলেকে বার বার রোজগারে মন দেওয়ার জন্য অনেক মিনতি ক'রে হতাশ হয়ে অবশেষে সে পাগলের মত এক কাণ্ড ক'রে বসল। একদিন অনেক রাত্রে থিয়েটারের আড্ডা থেকে ছেলে গান গাইতে গাইতে ফিরে এসে যখন ভাত চাইলে, তখন মা একখানা ভাঙা থালায় একমুঠো সত্যি সত্যি ছাই এনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—খাও ! ছেলে মায়ের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেল পাঁচ বছরের মত। সেই অবস্থায় বনওয়ারীর বাপ-মা ঘোষ-সংসারের দুঃখের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়ল। আগে বনওয়ারীর মা, তারপর স্ত্রীর টানে বনওয়ারীর বাপ। বনওয়ারীর বাপ চন্ননপুরের বাবুদের বাড়ি থেকে চাল করে দেবার জন্য ধান আনত এবং ঘোষেরা চাল তৈরি করলে চন্ননপুরে চাল পৌঁছে দিয়ে আসত। নিতান্তই এক তরফা ব্যাপার। কারণ ধান থেকে চাল করার মজুরী চাল ঘোষেরাই পেত। এ ছাড়াও যে-কোন দরকারে ঘোষ-মা, ঘোষ-দিদি নিজেরাই যেত বনওয়ারীর বাবার কাছে। কাঠ তালপাতা মাঠের মাছ ঝুড়িভর্তি গোবর ঘোষ-বাড়িতে দিয়ে আসত—আর কি দিতে পারে বনওয়ারীর মত লোকেরা ? তাই দিত তারা, এবং তাই ছিল ঘোষেদের সংসারের পক্ষে প্রচুর সাহায্য। ঘোষ-মা দিত ব্যান্নন। মায়ের হাতের রান্না 'অম্‌রেতো'। তারপর ঘোষ একদিন ফিরল রোজগার ক'রে। সেই ঘোষেদের ঘরে লক্ষ্মী এলেন। ঘোষ একটি জোত কিনলেন—জাঙলের ওই চৌধুরীদের কাছে। নদীর ধারের জমি, গোপথের ধারে ; বান এলে সে ডুবে যায়ই, তার উপর গোপথের গরুর পাল নিত্য মুখ দেয় ফসলে। দশ বিঘে জমি, তার দু বিঘে জমির ধান পেটেই যেত চিরকাল। তবে রক্ষা এইটুকু যে, খাজনাটা ঠাণ্ডা—দশ বিঘে জমির বছরসাল খাজনা সাড়ে বারো টাকা, বিঘা পিছু পাঁচ সিকি নিরিখ। ঘোষের মা বললেন—তারিণী আমার বড় ছেলে। ওই করবে জমি। ওকেই ভাগে জমি দাও।

বনওয়ারীর বাপের নাম ছিল তারিণী।

সংসারে লক্ষ্মী হ'লেই নাকি সব হয়, শ্রীভ্রষ্ট কুৎসিত মানুষও শ্রীমন্ত হয়—একটা রূপ দেখা দেয় তার চেহারায়, কুমতি ঘুচে সুমতি হয়, বিষমাখা জিভের বিষ ঘুচে মধুর মত অমৃত উথলে উঠে। মায়ের কথায় ঘোষ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—তোমার কথার কি 'না' হতে পারে ? তারিণী আমার দাদা। তারিণীদাদাই আমার জমি করবে, বুঝেছ তারিণী ?

তারিণী হেসে বলেছিল—এই দেখেন মা, আমাকে কি 'ফ্যারে' ফেলেছেন দেখেন।

আমার হাল-বলদ কোথা গো? আপনারা বরং হাল-বলদ করেন, আমি কৃষাণ থাকব।

—হাল-বলদ কর। আমি টাকা দিচ্ছি তোমাকে। ভয় কি, ক্রমে শোধ দেবে—ঘোষ বলেছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিল তারিণী; সৎজাতিকে সেবা ক'রে অমন পুরস্কার পেয়ে সে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে এসে কেঁদেছিল সেদিন। সেই অবধি বনওয়ারীদের ঘরে হাল-বলদ। সেই অবধি বনওয়ারীরা ঘোষেদের জমি চাষ করছে। বাপ তারিণী মারা গিয়েছে, ঘোষকর্তাও নাই, ঘোষকর্তার ছেলেদের এখন জমজমাট সংসার। মেজ ছেলে ব্যবসা ক'রে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়ায়, দু হাতে টাকা রোজগার ক'রে 'বেঙ্কে' জমিয়ে রাখে। ঘোষেদের বাড়িতে বনওয়ারী যে বনওয়ারী তারও এখন কেমন ভয়-ভয় করে। এখন আগের মত সরাসরি বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকতে পারে না, বড় ঘোষকে এখন আর তেমন উপদেশ দিতে পারে না। সারের টাকার জন্য সে-ভাবে জোর ক'রে দশটা কথা বলতে পারে না। হিসেবের জন্য তাড়া, তাই বা কেমন ক'রে দেয়? বনওয়ারী সেখানে গিয়ে দেখলে, বড় আর মেজ দুজনে চা খাচ্ছে আর খুব মন দিয়ে শলা-পরামর্শ করছে। সে প্রণাম ক'রে বসল উবু হয়ে দাওয়ার উপর। কিছুক্ষণ পর একটা থামে ঠেস দিয়ে ভাল ক'রে বসল। তারপর ঢুলতে লাগল। সারারাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই—সকালের মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম আসছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ভারি আমেজী হাওয়া দিচ্ছে। সকালে সূর্য উঠে এরই মধ্যে ভোরের শীত-শীত ভাবটা কেটে গিয়েছে। পাতলা ঘুমের মধ্যেই নানা এলোমেলো স্বপ্ন দেখছে সে। কালোশশী, করালী, পরম—আরও কত লোক সায়েবডাঙায় জমেছে সব। সায়েবডাঙার কুঠিবাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে এক মহিষের বাচ্চার মত বড় এবং কালো বুনো দাঁতাল শুয়োর, ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে তীরের মত ছুটে আসছে। দিলে ফেঁড়ে করালীকে। পরম পালাচ্ছে। বনওয়ারীকে জড়িয়ে ধরেছে কালোশশী। বনওয়ারী কি কালোশশীকে ঝাপটা দিয়ে ফেলে পালাতে পারে। খটখট শব্দ ক'রে পিছনে কে এল? বনওয়ারী বুঝতে পারলে, তিনি কে। কর্তা আসছেন। আর ভয় নাই। ভয়ের মধ্যে আশ্বাস পেয়ে বুনো শুয়োরটাকে ধমক দিয়ে সে বিক্রমভরে হাঁক মেরে উঠল, আ—প।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের আমেজ ছুটে গেল। সে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল ক'রে চারিদিকে দেখে তাল সামলে নিয়ে বসল। ঘোষ-ভাইয়েরা হাসছেন।

—কি রে বনওয়ারী, চেঁচিয়ে উঠলি কেন?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বনওয়ারী বললে—আজ্ঞে, উ একটো হয়ে গেল আর কি।

—একটো হয়ে গেল আর কি। কি হয়ে গেল?

চুপ ক'রে রইল বনওয়ারী। লজ্জা লাগে বইকি—স্বপ্ন দেখে অমনি চীৎকার করেছি এ কথা বলতে।

—কি রে? স্বপ্ন দেখেছিলি বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মেজ জনা। প্রশ্ন করলেন—কি স্বপ্ন রে?

—আজ্ঞে, স্বপ্ন দেখেছিলাম, দাঁতাল শুয়োরে তাড়া করেছে।

আবার দুজনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বনওয়ারীও হাসতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা চুলকাতে লাগল। বললে—দাঁতাল বেটারা ভারী পাজী গো! আপনারা জানেন না। তারপর তাঁদের হাসি থামলে সুযোগ পেয়ে বললে—আমার হিসেবটা আজ্ঞে, একবার দেখে মিটিয়ে দ্যান। আবার লতুন চাষকর্ম এসে গেল।

—হিসেব! তা হবে। কাল আসিস। না হয় পরশু।

—কাল পরশু আসতে লারব আজ্ঞে।

—কেন? কাল পরশু কি করবি?

—আজ্ঞে, পাড়াতে চাঁদা তুলে কত্তার পুজো দোব।

—কর্তার পুজো! অসময়ে? কি ব্যাপার?

বনওয়ারী সবিস্তারে বলতে চেষ্টা করে ব্যাপারটা। ইচ্ছে—কিছু চাঁদাও আদায় করবে মেজ ঘোষের কাছ থেকে। কিন্তু মেজ ঘোষই খানিকটা শুনেই বললেন—তোদের সেই—'অন্ধ জাগো। না, কিবা রাত্রি কিবা দিন।' সেই এক কালই চলেছে রে তোদের। হুঁ, কর্তাবাবা শিস দিচ্ছে। যত সব হুঁ!

দ'মে গেল বনওয়ারী। কিন্তু সামলে নিয়ে সে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হ'ল না, দুই কানের পাশে হাত দিয়ে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠে বসল। হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল উঠছে ব'লে মনে হ'ল। আগুন। আগুন।

আগুন। ছুটে বেরিয়ে এল বনওয়ারী। কোথায় আগুন? কোলাহলের দিক লক্ষ্য ক'রে সে ছুটে এল গ্রামের বাইরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁশবাঁদির ওই দক্ষিণ মাথা থেকেই তো প্রচুর ধোঁয়া উঠছে আকাশে। বাঁশবেড়ের বাঁশের মাথাগুলি ঢেকে গিয়েছে কুণ্ডলী পাকানো রাশি রাশি ধোঁয়ার মেঘে; আষাঢ়ের মেঘের মত জমাট ধোঁয়ার মেঘ।

বনওয়ারীর বুকটা তোলপাড় করে উঠল:—'কত্তার কোধ'।

* * *

নাঃ—কাহারদের ভাগ্য ভাল। কোধের মধ্যেও কত্তা কিঞ্চিৎ দয়া ক'রেছেন।

গ্রামে আগুন নয়। আগুন লেগেছে বাঁশবেড়ের বাঁশবনের তলায়। মাঘে পাতা ঝরেছে বাঁশের। নিবিড় বাঁশবনের অজস্র পাতা স্তূপীকৃত হয়ে জ'মে আছে তলায়। সেই ঝরা শুকনো পাতায় আগুন লেগেছে। কি ক'রে লাগল কে জানে? বেলা প্রখর হয়ে উঠেছে, পাতাগুলির উপরে রাত্রের শিশির শুকিয়ে গিয়েছে; আগুন খোরাক পেয়েছে ভাল। সবুজ দেওয়ালের মত যে বাঁশবন, সে বাঁশবন ধোঁয়ায় প্রায় ঢেকে গিয়েছে।

বাঁশবাঁদির ধারে লোকজন স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে কারও সাহস নাই। নিমতেলে পানু, প্রহ্লাদ জাঙ্গল থেকে বনওয়ারীর আগেই ফিরে এসেছে। তারা ঢুকেছিল, কিন্তু পালিয়ে এসেছে ভয়ে এবং যন্ত্রণায়। ভয়—সেই শিস উঠছে। যন্ত্রণা- ধোঁয়ার।

কর্তার রোষ শেষে আগুন হয়ে জ্'লে উঠেছে গাঁয়ে ধারে, সাবধান করে দিচ্ছেন। বনওয়ারী থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—কত্তার কোপ! কত্তার কোধ!

প্রহ্লাদ বলে—না, করালী আগুন লাগিয়েছে, বাঁশের পাতায় 'কেরাচিনি' ত্যাল ঢেলে

আগুন লাগিয়েছে। সে রয়েছে ওই ধোঁয়ার মধ্যে।

মুহূর্তে ক্ষেপে গেল বনওয়ারী, নেমে গেল ধোঁয়ায়-ভরা বাঁশবনের মধ্যে।

হ্যাঁ, শিসও উঠছে। কর্তাও ক্ষেপেছেন। এগিয়ে গেল বনওয়ারী শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

যেখানে শব্দটি উঠছে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে করালী। বুক চিতিয়ে নির্ভয়ে একদৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুছছে আর উপরের দিকে চেয়ে দেখছে। নীচে আগুন নাচছে শুকনো পাতার স্তূপে। উত্তাপে বাঁশবেড় যেন অগ্নিগড় হয়ে উঠেছে, আঁচ লাগছে গায়ে, করালীর সেও গ্রাহ্য নাই।

বনওয়ারী এগিয়ে গেল ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।—হে কত্তা, মাপ কর তুমি। আমি হতভাগাকে ফেলে দিচ্ছি ওই আগুনে। তুমি নিজের মহিমায় আগুন নিবিয়ে দাও। বাঁচাও তুমি বাঁশ-বাঁদিকে, বাঁচাও হাঁসুলীর বাঁককে—বাঁচাও। সে সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠে ডাকলে—করালী।

করালী তার দিকে চকিতের মত চেয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বনওয়ারীকেই ইশারা ক'রে ডাকলে—এস, এস। এতটুকু নড়ল না সে। বনওয়ারীর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে অগ্রসর হল, মনে মনে বলল—যাই যাই, দাঁড়া।

দূরে পিছন থেকে ভেসে আসছে আর একটা আওয়াজ—মামা। মামা। মামা। পাখীর গলা। আর্ত-উৎকণ্ঠা যেন ফেটে পড়ছে কণ্ঠস্বরে। কিন্তু বনওয়ারী আজ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কাহারপাড়ার বিচারকর্তা সে। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের মত সর্বময় কর্তা–দণ্ডদাতা।

বনওয়ারী দুর্দান্ত ক্রোধে করালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোশকেঁধের বাড়ির ছেলে, বিধাতার মোটা হাতে পাথর কেটে গড়া বনওয়ারী।

করালী কিন্তু নড়ল না, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বনওয়ারীর হাত থেকেও মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে একটা হাত। সেই হাতে সে দুর্দান্ত বিক্রমে আক্রমণ করলে বনওয়ারীকে। আশ্চর্য, বনওয়ারী অনুভব করছে—করালীর শক্তি যেন তার চেয়ে বেশি। না, বনওয়ারীর পায়ের তলায় বাঁশের পাতাগুলি পিছলে স'রে যাচ্ছে। সেই অসুবিধার জন্যই করালী তাকে বাগে পেয়েছে। হঠাৎ করালী চীৎকার ক'রে উঠল—ছাড়—ছাড—পড়ছে। ছাড়।

উৎসাহের প্রাবল্যে তার শক্তি যেন শতগুণ বেড়ে গেল। সে অনায়াসে বনওয়ারীকে নীচে ফেলে দিয়ে তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নাচতে লাগল সে। ওই—ওই—ওই শালা পড়ছে। বনওয়ারী উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে করালী এসে তার হাতে ধ'রে টেনে ঝাঁকি দিয়ে বলল—ওই—ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে। হুই—হুইয়ো।

বাঁশের ঝাড়ের মাথা থেকে আগুনের উত্তাপে ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট অবসন্ন হয়ে এলিয়ে নীচে পড়ছে একটা প্রচণ্ড সাপ। পাহাড়ে চিতির মত মোটা, তেমনই বিচিত্র তার বর্ণ, কিন্তু লম্বা খুব বেশি নয়। পাহাড়ে চিতির সঙ্গে ওইখানেই সেটার পার্থক্য।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে বনওয়ারী বললে—পে-কা-ণ্ড চন্দ্রবোড়া। হ্যাঁ, ওদের গর্জন খুব বটে।

—এটা কত বড় দেখছ না? তাতেই শিসের শব্দ হয়। শালা।

আগুনের মধ্যে প'ড়ে সাপটা ছটফট করছে। মরছে। করালী তারই উপর দমাদম ঢেলা ছুঁড়ে মারছে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

—মামা ! মামা ! এদিক থেকে পাখী ডাকছে। ধোঁয়ার মধ্যে বুঝতে পারছে না সে, এরা কোন দিকে রয়েছে। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সে ডাকছে। ডাকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী ওদের খুঁজে ফিরছে।

চীৎকার ক'রে সাড়া দিলে করালী—এই দিকে—এই দিকে। আয়। আয়। ডাক সব পাড়ার নোককে ! দেখে যা তোদের কত্তা পুড়ছে। দেখে যা। ডাক্ সব লোককে। ডাক্—ডাক্।

ওদিকে সাপটার পেটটার একটা মোটা অংশ ফেটে গেল আগুনের আঁচে। বেরিয়ে পড়ল একটা কি। এগিয়ে গেল করালী, বনওয়ারীও গেল। ঝুঁকে দেখতে লাগল, ওটা কি ? ওঃ, একটা বুনো শুয়োরের বাচ্চা। ওটাই কাল রাত্রে সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার করেছিল। পাখী ছুটে এসে করালীর হাত ধরলে। সে হাঁপাচ্ছে।

করালী বললে---ওই দেখ্। সাপটা দেখে পাখী অবাক হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ভেঙে এল গোটা কাহারপাড়ার লোক। বিস্ময়ে কৌতূহলে অবাক হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর কলকল ক'রে বাঁশবাঁদি মুখরিত ক'রে তুললে।

করালী হাসতে হাসতে ব'লে উঠল—মুরুব্বি, কত্তার পুজোটা সব আমাকে দিয়ো গো। সে হা-হা করে হাসতে লাগল।

পাখী ধমক দিয়ে বললে—চুপ কর।

করালী তবুও হাসতে লাগল। সে যেন এক অপার কৌতুক।

পাখী করালীর পিঠে একটা কিল মেরে বললে—ডাকাবুকো, ডারপাড়, লঘুগুরু জ্ঞান নাই তোমার ?

তিন

গোটা কাহারপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা স্তম্ভিত এবং স্তব্ধ হয়ে গেল করালীর কথা শুনে আর সকৌতুক উচ্চহাসি দেখে। করালী বলে কি ? 'কত্তার পুজোটা আমাকে দিয়ো গো !' এত বড় স্পর্ধা তার ! হে ভগবান, হে বাবা কালারুদ্র, হে বাবাঠাকুর .

বনওয়ারী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল করালীকে। আজই যেন সে করালীকে নতুন ক'রে দেখলে। নোড়ার কাজের জন্যে কুড়িয়ে-আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমনভাবে সবিস্ময়ে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তেমনই ভাবে দেখলে তাকে বনওয়ারী। ছোঁড়ার চেহারাটা ছেলেবেলা থেকেই মিষ্টি চেহারা। আজও তাকে দেখে সেই মিষ্টি চেহারার আস্বাদই মনে জাগে, আজ বনওয়ারী তাকে দেখে নতুন আস্বাদ পাচ্ছে। গোটা কাহারপাড়াই পাচ্ছে যেন।

লম্বা দীঘল চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোন সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ, নাকটি খাঁদা ; কিন্তু তাতেই চেহারাখানিকে করেছে সবচেয়ে মিষ্টি,

তারও চেয়ে মিষ্টি তার ঠোঁট আর দাঁত। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় করালীকে।

তরুণের দলের অবশ্য এ চেহারা চোখে ঠেকেছে। পাড়ার ছোকরারা মনে মনে অধিকাংশই করালীর অনুগত। কিন্তু এ চেহারা সকলের চেয়ে ভাল ক'রে দেখেছে পাখী। করালীর দেহের রূপ বীর্য সে দেখে মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। তার কাছে জীবনে সব এক দিক আর করালী এক দিক।

বনওয়ারীও দেখছিল করালীর দেহের শক্তির শোভা। হ্যাঁ, ছোকরা জোয়ান হয়েছে বটে। কবালী যখন ঘরে কুকুরটার জন্যে সমাধি খুঁড়ছিল, তখন চকিতের মত যেন চোখে পড়েছিল এ চেহারা। কিন্তু বনওয়ারী তখন দেখেও দেখে নাই। আজ এই মুহূর্তে তাকে না দেখে বনওয়ারীর উপায় নাই। মনে পড়ছে বনওয়ারীব—বাঁশবনে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল করালীর উপর, নিষ্ঠুর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ইচ্ছে ছিল—বুকে চেপে ব'সে গলাটা টিপে ধরবে, ম'রে যদি যায় দেবে ফেলে ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু- । বনওয়ারীর ভাল মনে পড়ছে না, কি ক'রে হয়েছিল। বাঁশপাতায় পা পিছলে গিয়েছিল?

ধোঁয়ায় মাথা ঘুরে গিয়েছিল? হয়েছিল একটা কিছু। করালীই চেপে বসেছিল তাব উপর। সে ভাবছিল, করালী হয়তো উচ্চহাসি হেসে এই সমবেত কাহারদের কাছে বলবে, বাবাঠাকুরের চেলা বনওয়ারী মুরুব্বিকেও দেখে নিয়েছি –

পাখী এগিয়ে এল বনওয়ারীর কাছে। ডাকলে—মামা।

বনওয়ারী তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ হেসে বললে—করালীর বুদ্ধি আছে। ও ঠিক ধরেছে।

করালী উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠল—রেল লাইনের আটাশ মাইলে ঠিক এমনি হয়েছিল। বুঝেছ—আটাশ মাইলে—খুব জঙ্গল, সেখানে গেলবারে ঠিক এমনি শিস উঠত। সন্ধ্যাবেলা টলি ঠেলে আসছি, টলিতে আছে সায়েব। হাতে বন্দুক। বুঝেছ, শিস শুনেই বললে –রোখো টলি, তা'পরেতে টর্চ মারতে লাগল, মারতে মারতে এক জায়গায় টর্চ পড়তেই দেখতে পেল সাপ। ব'স, বন্দুক তুলে গুড়ুম।

প্রহলাদ বললে, লে, এখন সাপটাকে ভাল ক'রে পুড়িয়ে দে। খরিস গোখরা লয়, চিতি বটে—তা বড় চিতি। বেরাম্ভন না হোক, বদ্যি কায়স্থ-টায়স্থ তো বটেনই। সৎকার করতে হবে তো।

নিমতেলে পানু বয়সে করালীদের বয়সী হ'লেও জ্ঞানবৃদ্ধ প্রহলাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। সে সর্বাগ্রে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল—একশো বার। শুধু কি সৎজাত পেহলাদদাদা? পবীন, পবীন সাপ। তা বয়স তোমার অনেক হবেন গো।

করালী বললে—না। ও আমি নিয়ে যাব। দেখুক, পাঁচজনায় দেখুক। সনজে হতেই সব কিসের ভয়ে জুজুমানা হয়ে ঘরে খিল দিত। দেখুক—ব'লে আবার সে হেসে উঠল।

নিমতেলে পানু বনওয়ারীর দিকে চেয়ে বললে—মুরুব্বি।

বনওয়ারী বললে—তা—। সে বুঝতে পারলে না, কি বলা উচিত।

—কি? বল? 'তা' ব'লে যে থেমে গেলা।—পানু বিরক্তিভরেই বললে, 'শাস্ত' যা বটে, তা করতে হবে? না—কি?

—তা করবে। মড়া ম'লে সঙ্গে সঙ্গেই তো পোড়ায় না। পাঁচজনা আসে, দেখে। বাসমড়া না হ'লে হ'ল। তা এখন নিয়ে যেয়ে রাখুক—তা পরে 'আত্তি' কালে নদীর ধারে দেবে পুড়িয়ে।

খুব খুশি হয়ে উঠল করালী। বললে—এই না হ'লে মুরুব্বি বলবে কেনে?

বনওয়ারী বললে—তু তো মানিস না রে মুরুব্বি ব'লে।

করালী এবার লজ্জিত হ'ল। সুন্দর হাসি হেসে সে বললে—মানি গো খুব মানি, মনে মনে মানি। বুঝলে?

নিমতেলে পানু বললে—তা আবার মানিস না। কাহারপাড়ার পিতিপুরুষের রোপদেশে নাতি মেরে মুরুব্বির মুখের ওপর বুড়ো আঙুল লেড়ে দিয়ে চন্দনপুরে মেলেচ্ছো কারখানায় কাজ করছিস। মেলা রোজগার করছিস—

করালী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—হারামজাদা।

বনওয়ারী দুই হাত বাড়িয়ে আগলে বললে—না।

করালী থমকে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বনওয়ারীর মুখের উপর রেখে চেয়ে রইল।

বনওয়ারী বললে—মারামারি করতে নাই। পেনোর অন্যায় বটে। ওকে আমি শাসন ক'রে দোব।

করালী তার অনুগতদের বললে—একটা বাঁশ আন। চাপিয়ে তুলে নিয়ে যাব।

প্রহ্লাদ বললে—বেশ পেশস্ত জায়গায় 'আখ'। অ্যানেক লোক দেখতে আসবে।

এ সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা আছে। দাঁতাল শুয়োর মারা এখানে তো সাধারণ ব্যাপার; এ বিষয়ে শিক্ষাও তাদের পুরুষানুক্রমিক; কখনও কখনও দু-একজন জখমও হয় দাঁতালের দাঁতে। বছরে দু-তিনটে দাঁতালে মারেই, আর এখানকার লোকের স্বভাব হ'ল—খবর পেলেই ছুটে দেখতে আসবে। দাঁতালটাকেও দেখে, আবার জখম মানুষটাকেও দেখে। বাঘ কি কুমীর হ'লে তো কথাই নাই। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে একটা চিতা এসেছিল, ওই কোপায়ের বানে ভেসে এসে বাঁশবেড়েয় আটকে যায়। সেটা ছিল জ্যান্ত। সে বলতে গেলে বনওয়ারীর বাপের আমল। কর্তা ছিল তারাই। বনওয়ারী প্রহ্লাদদের তখন করালীর বয়স, এরা ছিল কর্মী। কর্তাদের পরামর্শে বাঘটাকে তারাই বাঁশের খাঁচা তৈরি ক'রে ধরেছিল। শক্ত পাকা বাঁশ আধখানা ক'রে চিরে শিকের মত গেঁথে খাঁচা তৈরি করেছিল তারা; লোহার শিক দিয়ে তৈরি খাঁচার চেয়ে সে বেশি শক্ত। সেই খাঁচার মধ্যে পাঁঠার বাচ্চা বেঁধে বাঁশবাঁদির বনে খাঁচা পাতা হ'ল। এক দিন, দু দিন, তিন দিনের দিনই বাঘা বন্দী হ'ল। তখন খুঁচিয়ে মারার ব্যবস্থা। মারার পর ভেঙে এল চাকলার লোক। ঘোষকর্তা আগেই এসে মরা বাঘের উপর মারলে এক গুলি। রগে নল রেখে গুলি। তারপর লোকের ভিড় দেখে জাঙল থেকে আনালেন একটা উঁচু তক্তাপোশ, সেইটার উপরে রেখে দিলেন। সে কি ভিড়। কেউ বাঘটাকে ঢেলা মারলে, কেউ লাঠি দিয়ে খোঁচালে, কেউ লেজ ধ'রে টানলে, দু-চারজন ছোকরা তো বাই উঠে লাফিয়ে উপরে পড়ে মারলে দমাদম ঘুষি। কেউবা সেটাকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়েই পড়ল মনের আনন্দে। সেই সব ভেবেই চিরদিনের চলিত প্রথা অনুযায়ী কথাটা বললে প্রহ্লাদ-রতনের দল। জায়গার জন্য ভাবনারও

কোন প্রয়োজন নাই। চিরকাল যেখানে নামানো হয়, সেই বনওয়ারীর খামার প'ড়ে রয়েছে—মস্ত ফাঁকা জায়গা।

কিন্তু করালীর মতিগতিই ভিন্ন। হাত ছয়েক লম্বা একটা বাঁশের উপর সেটাকে ঝুলিয়ে আর একজনের সাহায্যে কাঁধে তুলে ব'য়ে বনওয়ারীর খামার পার হয়ে চলতে শুরু করলে নিজের বাড়ির দিকে। প্রহলাদ রতন পানু বললে—নামা এইখানে।

করালী বললে—উঁহু। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব আমি।

প্রহলাদ রতন পানু স্তম্ভিত হয়ে গেল করালীর স্পর্ধা দেখে। তারা বনওয়ারীর মুখের দিকে চাইল।

বনওয়ারী এতক্ষণে হাসলে। তাচ্ছিল্যভরেই বললে—যাক, যাক, ছেলেমানুষ। তা ছাড়া কাণ্ডটি তো ওরই বটে বাপু। তারপর করালীর পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড় মেরে বললে—হ্যাঁ। বীর বেটাছেলে বটিস তুই।

করালী হাসলে। স্মিতমুখে আনন্দের হাসি হাসলে। সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন লজ্জিত হ'ল। মনে হ'ল, বনওয়ারী খুড়োকে খানিকটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন আছে। সে বললে—তুমিও এস কিন্তুক।

—আচ্ছা। যাব, চল্।

বাড়ির উঠানে ফেলে করালী বীরদর্পে সকলের দিকে চাইল। মাতব্বর-মুরুব্বিরা কেউ আসে নাই। অপমান বোধ না করলেও তারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। করালী এই সুযোগে কৌতুক করে অকস্মাৎ ভান ক'রে চমকে উঠে ব'লে উঠল—ওরে বাবা, লড়ছে যে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের দল আতঙ্কে চীৎকার ক'রে ঠেলাঠেলি ক'রে পিছু হঠতে লাগল। পুরুষেরা ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলে। করালী অট্টহাসি হেসে উঠল। বললে—যত সব ভয়-তরাশের দল—ভয়েই মরবে, ভয়েই মরবে।

তারপর বললে—পালাও সব, পালাও বলছি। নইলে ভাল হবে না। পালাও। পাখী, বার কর্।

অর্থাৎ মদের বোতল। বিজয়ী বীর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদ্যপান করবে। কাহারপাড়ায় তরুণদের নিয়ে তার একটি দল আছে, সে দল বাইরে বনওয়ারীর মাতব্বরি মেনে চললেও অন্তরে অন্তরে করালীই তাদের দলপতি। এদের মধ্যে রতনের ছেলে নটবরই প্রধান।

নটবর একবার বীরদর্পে সাপটার চারদিক ঘুরে বললে—কই, একটি ক'রে পয়সা আন দেখি নি। হুঁ হুঁ বাবা, তার বেলাতে লবডঙ্কা।

একটি মেয়ে বললে—মরণ! সাপ মেরে গিদেরে যেন কি করছে! অর্থাৎ অহঙ্কারে।

করালী বললে—ধর্ ওকে নটবরে, আমরা গান করব, ওকে লাচতে হবে। ধর্।

মেয়ের দল এইবার পালাল। চ্যাঙড়ার দলকে বিশ্বাস নাই, তার উপর মদের বোতল বেরিয়েছে। কয়েক ঢোক পেটে পড়লে হয়।

নটবর বললে—আঃ, নসুদিদি নাই রে আজ!

করালী ইতিমধ্যে খানিকটা খেয়েছে। সে বললে—ওঃ, সে থাকলে মাতন লাগিয়ে দিত।

হারামজাদীর কুটুম্বিতে লেগেই আছে।

নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গিতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত। মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছবি পরে, কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মত শাড়ি পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবড় কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্ননপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট—গান গায় নাচে। গান আর নাচ—এই তার সবচেয়ে বড় নেশা। ঘেঁটুর দলে নাচে, ভাঁজোর নাচনে সে-ই মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা নাচিয়ে। মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রতপার্বণ করে। করালীর ঘরে সেই গৃহিণী। করালী বিয়ে করে বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, বউ তার পছন্দ হয় নি, আবার বিয়ে করবে। নসুরও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নসুও বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, সে আর বিয়ে করবে না। করালীর ঘরে বোন হয়ে, করালীর বউয়ের ননদ হয়ে থাকবে—এই তার বাসনা। পাড়ার বিয়েতে নসুবালাই বাসরে নাচে, গান গায়। শুধু পাড়ায় নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে যে কোন ঘরে ধুমধামের বিয়ে হলেই নসুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর দেয়। নসু খোঁপা বেঁধে, আলতা প'রে, রঙিন শাড়ি প'রে, কপালে সিঁদুর ঠেকিয়ে অর্থাৎ টিপ প'রে রওনা হয়, আবার উৎসব মিটলে ফেরে। করালীর জন্যে কিছু-না-কিছু নিয়ে আসে।

এই নসুবালার অভাবই করালী সবচেয়ে বেশি অনুভব করলে আজ।

—নসুদিদি নাই তো পাখী নাচুক কেনে? কথাটা বললে করালীর অপর অনুগত শিষ্য মাথলা। মাথলার আসল নাম রাখাল বা আখাল, কিন্তু দেহের অনুপাতে মাথাটা মোটা ব'লে কাহারেরা তাদের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্ভবত ওয়ালা প্রত্যয় ক'রে করেছে মাথলা।

কথাটা মন্দ বলে নাই মাথলা। কিন্তু তবু ভ্রূ কুঁচকে উঠল করালীর। পাখী তাকে ভালবাসে, একদিন হয়তো তাকেই সে সাঙা করবে। সে নাচবে এই এদের সামনে?

পাখীর চোখেও রঙ ধরেছে, সেও খানিকটা পাকি মদ খেয়েছে, করালীর গৌরবে তারও নাচতে মন যাচ্ছে; তবু সে করালীর মুখের দিকে চাইলে। চেয়েই সে বুঝতে পারলে করালীর মন, সে তৎক্ষণাৎ বললে—না। তোর বউকে ডাক্ কেনে?

ঠিক এই সময়েই কাছাকাছি কোথাও সুচাঁদের কর্কশ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, মুহূর্তে সমস্ত পাড়াটা চকিত হয়ে উঠল।

—ওরে বাবা রে! ওরে মা রে! আমি কোথায় যাব রে!

করালী হা-হা ক'রে হেসে উঠল, বললে—'বিত্যেব' দেখ বুড়ীর! অর্থাৎ ভয়ে চেঁচানি দেখ বুড়ীর। তারপর সকৌতুকে ব'লে উঠল—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, ওই বুড়ীকে নিয়ে আয়—ও-ই নাচবে। তুর্কী নাচন নাচাব বুড়ীকে। ব্যাঙ দেখে নাচে, সাপ দেখে নাচবে না?

ডাকতে হ'ল না, এক-গা কাদা মেখে খাটো-কাপড়-পরা সুচাঁদ এসে দাঁড়াল করালীর উঠানে। তার পিছনে আরও কয়েকজন প্রৌঢ়া মেয়ে। স্থির দৃষ্টিতে সে মরা সাপটাকে কিছুক্ষণ দেখে হঠাৎ বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল। শঙ্কাতুর অমঙ্গল ঘোষণার সুর ধ্বনিত

হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বরে।

—ওগো বাবাঠাকুর গো! ওরে, আমার বাবার বাহন রে! ওরে, কি হবে রে! হায় মা রে!—বলতে বলতে সে থরথর করে কেঁপে মাটির ওপরে বসে পড়ল।

সমস্ত কাহারপাড়ার আকাশে একটা আশঙ্কার আর্তবাণী হায়-হায় ক'রে ছড়িয়ে পড়ল। করালী পাখী নটবর মাথলা সকলেই বেরিয়ে এল—কি হ'ল?

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-ঘেরা আলো-আঁধারির মধ্যে গ্রামখানি। সে গ্রামের উপকথায়—এ দেশের কতকাল আগের ব্রতকথায় আছে, "গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করত, ধর্মকর্ম করত, গাঁয়ের দুঃখে দুঃখ ক'রেই তার ছিল সুখ। কারও দুঃখে কাঁদতে না পেলে বুড়ী পশু-পক্ষীর দুঃখ খুঁজে বেড়াত। এমন দিনের সকালে ব'সে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলত—"কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আশ্বি মিটছে, মহাবনে হাতী মেরেছে, যাই: তার গলা ধরে কেঁদে আসি।"

হাঁসুলী বাঁকে সুচাঁদ বুড়ী বোধ হয় সেকালের সেই বুড়ী। সাপটা যখন মরে তখন বুড়ী বাড়ি ছিল না। থাকলে যে কি করত, সে কথা বলা যায় না। সে গিয়েছিল ঘাস কাটতে। বাঁশবাঁদির কাহার-বুড়ীরা, প্রবীণরা, যারা মজুরনী খাটতে পারে না, তারাও বসে খায় না—পিতি-পুরুষের নিয়ম এই, যেমন গতর তেমনই খাটতে হবে। তারা দুপুরবেলা গোরু-বাছুর-ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে, কাস্তে নিয়ে চ'লে যায় হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে—কোপাইয়ের অপর পারে গোপের পাড়ায় 'মোষদহরী'র বিলে ঘাস কাটতে। মস্ত বিলটার চারিপাশে প্রচুর ঘাস জন্মায়। তার সঙ্গে পানিফল তুলে আনে, কল্মি শুসনি শাক সংগ্রহ করে, আর দু-চারটে পাঁকাল মাছ—তাও ধরে আনে। তাই বুড়ী গিয়েছিল ওই মোষদহরীর বিলে। ফিরে এসে সমস্ত কথা শুনে ছুটে এসেছে সাপটাকে দেখতে। দেখে চীৎকার করে পাড়াটাকে শঙ্কায় সচকিত করে দিলে।

সাপটার সামনে বুড়ী চোখ বিস্ফারিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বাবাঠাকুরের থানের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললে—হে বাবা, হে বাবা, হে বাবা!

—অ্যাই বুড়ী! চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ ক'রে উঠল করালী।

পাখী বললে—মরণ! ঢঙ দেখ! দোপরবেলায় কাঁদতে বসল দেখ! সাপ আবার বাবা হয়!

—হয় লো, হয়। বুড়ী কেঁদে উঠল। সুর ক'রে কেঁদে কেঁদে বুড়ী ব'লে গেল—ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে! ওর মাথায় চ'ড়ে বাবাঠাকুর যে 'ভোমন' করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে! দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমূলগাছের কোটরে সুখে নিদ্যে যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পশুর দেখেছি রে!

এর পর আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের শিমূলগাছ, দহের মাথায় প্রাচীনতম বনস্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিস-দেওয়া বিচিত্রবর্ণ বিষধর যখন থাকত, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত, তাঁর বাহন—এতে আর সন্দেহ কোথায়! সমবেত কাহারপাড়ার নর-নারী শিউরে উঠল, মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল—হেই মা রে!

করালী শঙ্কিত হয়ে উঠল, আবার ক্রুদ্ধও হয়ে উঠল। সে অনুমান করতে পারছে, এর পর কি হবে। পাড়া জুড়ে হায়-হায় রব উঠবে। তার সকল বীরত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু সে ভেবে পেল না, কি করবে! তার সঙ্গীদের মুখ শুকিয়ে গেছে। তারাও যেন ভয় পেয়েছে। তার ইচ্ছে হ'ল, সে ছুটে চলে যায় চন্ননপুরে। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে আসে তাদের ছোট সাহেবকে, যে সেদিন এমনই একটা সাপ মেরেছে রেল-লাইনের ধারে, যে সায়েব নিজে হাতে কোপ মেরেছে নদীর ঘাটে 'দেবী'র আশ্রয়স্থল পুরানো শ্যাওড়াগাছটায়; সে এসে মরা সাপটাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারুক, গোটা কাহারপাড়াকে সায়েস্তা করে দিক।

হঠাৎ পাখী চীৎকার ক'রে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে মাতামহীর সামনে এসে বললে—এই দেখ্ বুড়ী, এই ভর তিন পর বেলাতে তু কাঁদিতে লাগিস না বললাম।

কালা সুচাঁদ শুনতে পেলে না কথা। সে আপন মনেই আক্ষেপ ক'রে চলল—সব্বনাশ হবে রে, সব্বনাশ হবে। ই গাঁয়ের পিতুল নাই। আঃ—আঃ—হায়-হায় রে!

পাখী এবার আর বৃথা চীৎকার করলে না। এসে বুড়ীর হাত ধ'রে টেনে তাদের ঘরের সীমানা থেকে বার ক'রে এনে চীৎকার ক'রে বললে—এইখানে ব'সে কাঁদ্।

হাত ধরে টানাতেও বুড়ী প্রথমটা বুঝতে পারে নাই পাখীর মনের ভাব। এবার কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না। সে মুহূর্তে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল, এবং এক মুহূর্তে সে অলৌকিক লোক থেকে নেমে এল লৌকিক বাঁশবাঁদির ইতিহাসে। তা নইলে যেন পাখীকে ধরা যায় না, পাখী এবং করালীকে দেবতার ভয় দেখিয়ে মানানো যায় না। তাই সে আরম্ভ করলে পাখীর জন্মকাণ্ডের কাহিনী, তা নইলে ওর চরিত্র এমন হবে কেন?

চীৎকার ক'রে পাখীর জীবনের জন্মকাণ্ড হতে এ পর্যন্ত যত অনাচারের কথা আছে তাকে সাতকাণ্ড ক'রে আকাশ-লোককে পর্যন্ত শুনিয়ে দিল। অবশেষে শাসন ক'রে বললে—হারামজাদী বেজাত—বদজাত—বদজন্মিত, এত বড় বাড় তোমার? আমার বাড়ি থেকে আমাকে বার ক'রে দাও তুমি?

তারপর সে বললে—তাই বা কেন? এত বড় স্পর্ধা এই পাখী ছাড়া আর কার হতে পারে? বসন্তের এই কন্যাটি ছাড়া আর কার হতে পারে? সুচাঁদের নিজের কন্যা হ'লে কি হয়? সুচাঁদ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবে না। নিজের কন্যা ব'লে সে তার খাতির ক'রে না। বসন্তের যে মতিগতি মন্দ; যখন ওই জাঙলে চৌধুরীবাবুর মাতাল ছেলের সঙ্গে মনে রঙ লাগায়, তখন সে জানে এর দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। আজও পর্যন্ত বসন্ত সেই রঙের নেশায় বিনা পয়সায় বারোটি মাস চৌধুরী বাড়িতে দুধ যোগায়। তাও কিছু বলে না সে। এই হারামজাদী পাখী যখন বসন্তের পেটে এল, তখন খুঁজে খুঁজে সুচাঁদ নিয়ে এসেছিল এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহারের ছেলেকে; এনে অনেক ঘুষ দিয়ে পাখীর পিতৃত্বের দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে বসন্ত এবং পাখীকে রক্ষা করেছিল। অন্যায় হয়েছিল—তার অন্যায় হয়েছিল। বসন্তকেই পথে বার ক'রে দেওয়া উচিত ছিল। অথবা এ পাপকে ভ্রূণ অবস্থায় বিনষ্ট করতে বসন্তকে বাধ্য করা উচিত ছিল তার। এ পাপ যে এমন হবে, সে তো জানা কথা। ওই চৌধুরীদের এবং বসন্তের রক্ত তার দেহে, তার

রঙের নেশা এমনই হবে যে। করালীর নেশায় পাগল হয়েছে পাপ পাখী। সেই নেশায় অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় দেখছে বজ্জাত বেজাত।

পাখী হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠল—হারামজাদী, আমার শরীলে লয় চৌধুরীদের অক্ত আছে, তাতেই না হয় আমার নেশা বেশি। কিন্তুক তোর প্যাটের মেয়ের নেশা কেনে আজও ছাড়লো না শুনি? বলি, তোর বসন্তের শরীরে কার অক্ত আছে তা বল? শুনি।

পাখীর চীৎকারে ঠিক মাথার উপরে আকাশে উড়ন্ত চিলটাও বোধ করি চমকে উঠল, অন্তত তাই মনে হ'ল। ঠিক মাথার উপরে যে চিলটা স্থির পাখা মেলে ভেসে চলেছিল ব'লে মনে হচ্ছিল, সেটা এই মুহূর্তেই সজোরে পাখা আন্দোলিত ক'রে দ্রুততর বেগে অতিক্রম ক'রে গেল স্থানটা। সুচাঁদের কানেও একটি কথা অস্পষ্ট রইল না। সুচাঁদ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কিছু যেন খুঁজতে লাগল।

পাখী বললে—আমি জানি না তোমার বেবরণ, লয়? তুমি নিজে মুখে আমাকে বল নাই তোমার অঙের কথা?

সুচাঁদ ছুটে গিয়ে নিমতেলে পানুর নিমতলা থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ছুটে এল।—তোর বিষ ঝেড়ে দোব আমি আজ।

পাখী ছুটে গিয়ে নিয়ে এল মস্ত লম্বা একখানা বাঁশের লাঠি।—আয়, তু আয়। দেখি আমি তোকে।

হঠাৎ এই সময় এসে পড়ল বনওয়ারী। চীৎকার বেড়ে গেল সুচাঁদের। পাখী চীৎকার বন্ধ করে লাঠিখানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ব্যাপারটা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার অতি সাধারণ ব্যাপার। এমনিই এখানকার ধারা—এমনিভাবেই কলহ বাধে, এমনিভাবেই মেটে। দপ ক'রে আগুনের মত যেমন জ্বলে উঠেছিল, তেমনই খপ ক'রে নিবে গেল। বনওয়ারী এলে এমনিভাবেই ঝগড়া থামে।

বনওয়ারী মুখ গম্ভীর। তার ভাবে ভঙ্গিতে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যস্ততা, সে বললে—চুপ, সব চুপ।

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল আবার—ওরে বাবা রে—

বনওয়ারী ঝুঁকে কানের কাছে চীৎকার করে বললে—শুনব ইয়ের পরে।

—ইয়ের পরে?

—হ্যাঁ। মাইতো ঘোষ আসছেন সাপ দেখতে।

—কে আসছে?

—জাঙলের মাইতো ঘোষ। আমার মনিব।

বুড়ীও সন্ত্রস্ত হ'ল। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে জাঙলের পথের দিকে চেয়ে রইল। পানু পিছন থেকে হাঁকলে—সর্, সর্, স'রে যাও। পথ দাও।

দু ফাঁক হয়ে গেল জনতা। জাঙলের ঘোষ এসে দাঁড়ালেন।

চার

করালীর চোখ জ্বলে উঠল।

জাঙলের মাইতো ঘোষকে দেখলে যত তার ভয় লাগে, মনে মনে তত তার ক্ষোভ জেগে ওঠে। চন্ননপুরের কারখানায় কাজ করার জন্য তার মনে যত অহঙ্কার, তার অজ্ঞাত কোন গোপন মনে তার চেয়েও বেশি বেদনাও জ'মে আছে। ওই চন্ননপুরের কারখানায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন এই মাইতো ঘোষ। ওই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার মায়ের ইতিহাস। লজ্জা এই হাঁসুলী বাঁকের আলো-আঁধারিতে কম। কিন্তু তবুও মায়ের লজ্জাই সবচেয়ে বড় লজ্জা। তার সঙ্গে আরও আছে মা-হারানোর বেদনা। আর আছে এই বাঁশবাঁদি ছেড়ে যাওয়ার প্রথম দিনের বেদনার স্মৃতি।

সে সব অনেক পুরানো কথা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার একটা টুকরো গল্প, গোটা পাঁচালির মধ্যের কয়েকটা ছড়া। সে ছড়া বলতে বনওয়ারীর মত মাতব্বরেরা লজ্জা পায়, ছোঁড়ারা আনাচে-কানাচে বলে। মেয়েরা বলে নিজেদের মধ্যে, রঙের কথা উঠলে ফিসফাস করে। কেবল চীৎকার ক'রে বলে সুচাঁদ। সে বলে—"আঃ, তার আবার লাজ কিসের? বলে যে সেই 'বেগুনে কেনে খাড়া? না বংশাবলীর ধারা'।" এই তো কাহারদের পুরুষে পুরুষে চ'লে আসছে। তারা অকপটে ব'লেও আসছে এই কাহিনী। করালী তখন ছেলেমানুষ, বাপ মারা গিয়েছিল তিন বছর বয়সে। পাঁচ বছর বয়স যখন তার, তখন তাকে ফেলে তার মা পালিয়ে যায় ওই চন্ননপুরে ইস্টিশানের একজন লোকের সঙ্গে। তখন ওই রেললাইন তৈরি হচ্ছে, দেশ-দেশান্তর থেকে লোক এসে লাইন বসাচ্ছে, কোপাইয়ের উপরে পুল তৈরি করছে, সে যেন এক মস্ত ব্যাপার ক'রে তুলেছে। হাঁসুলী বাঁকের মেয়েরা খাটতে যেত চন্ননপুরের বাড়িঘর তৈরির কাজে। রেল-লাইনের ওই মস্ত ব্যাপারে যাওয়া ছিল তাদের বারণ। বনওয়ারীই তখন মাতব্বর, বারণ ছিল তারই। ওখানে গেলে জাত যায়—ধর্ম থাকে না। চাষ ক'রে খায় যারা, তারা ওই কারখানার বাতাস গায়ে লাগলে তাদের মঙ্গল হয় না। ওই বাতাস, ওই 'ঘরাণ' অর্থাৎ ঘ্রাণ সহ্য করতে পারে না চাষীর লক্ষ্মী। যাক সে কথা। করালীর মা বিধবা হয়ে চন্ননপুরে বাবুদের বাড়ি মজুরনী খাটতে গিয়ে পয়সার লোভে ইস্টিশানে কারখানার লোকদের সঙ্গে 'গোপ্ত' যোগাযোগ পাতায়। তারপর সে একদিন সন্তানের মায়া পর্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল কোথায়। কে-ই বা খোঁজ করবে? আর খোঁজ করেই বা কি হবে? করালী কাঁদতে লাগল। তবে হাঁসুলী বাঁকে এটা কোন নূতন ব্যাপার নয়। এমন অনেক ঘটে, অনেক ছেলে কাঁদে; আত্মীয়স্বজনে টেনে নেয় কাছে। আত্মীয়স্বজন না থাকলে মাতব্বর নেয় টেনে। অনাদরের মধ্যেই কোন রকমে বড় হয়। দশ বারো বছর বয়স হ'লেই আর ভাবনা থাকে না; সে তখন সক্ষম হয়ে ওঠে, নিজের অন্নবস্ত্র নিজেই রোজগার করতে পারে। জাঙলে সদ্গোপের বাড়িতে ভাত কাপড় আর মাসিক চার আনা মাইনে বাঁধা। গরুর রাখালি কর্মে ঢুকে পড়ে।

করালীর তিনকুলে থাকার মধ্যে ছিল এক পিসী—ওই নসুর মা, সে-ই করালীকে টেনে নিলে। লোকে করালীকে বলত—ভূতুড়ে ছেলে। করালী খুঁজে বেড়াত তার মাকে। খুঁজতে

যেত মহিষডহরির বিলে, খুঁজত কোপাইয়ের তীরের বনে বনে, দয়ের ধারে, শিমূলগাছের তলায়, ওই বাবাঠাকুরতলায় ; কোন-কোনদিন চ'লে যেত চন্ননপুরের আলপথ ধ'রে মাঝপথ পর্যন্ত। কাঁদত 'মা মা' ব'লে। তারপর কোন খেলা আবিষ্কার ক'রে তাই নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ত, অথবা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বাবাঠাকুরতলায় ব'সে ব'সে সে দেখত বেলগাছে পিঁপড়ের সারি, গোড়ায় উইয়ের ঢিপি। বেলগাছ-ঢাকা অপরাজিতার লতা থেকে পাড়ত ফুল। কাহারেরা যেদিন বাবাঠাকুরের থানে পুজো দিত, সেদিন পুজোর পরে সে সেখানে যেত—গিয়ে ভোগ-দেওয়া বাতাসা পাটালি কুড়িয়ে খেত, পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ত। ভাঁড়ে দুধ রেখে আসত কাহাররা, সে সেটুকু খেত। ওই দহের শিমূলগাছতলায় ব'সে সে দেখত ঝাঁকবন্দী টিয়াপাখির খেলা—লেজ নাচিয়ে তারা উড়ত, রাঙা ঠোঁটে ব'য়ে আনত ধানের শিষ, কত দিন লড়াই করত তারা ছানা-আক্রমণকারী সাপের সঙ্গে। করালী সাহায্য করত টিয়াপাখিদের, সে ঢিল ছুঁড়ে মারত, সাপটাকে বিব্রত করত। দু-একটা সাপকে ঢেলা মেরে নিচে ফেলেও দিয়েছে। হঠাৎ এক সময় খেলার নেশা ছুটত, তখন সে আবার মাকে খুঁজত। ক্রমে বয়স বাড়ল, মায়ের ইতিহাসের লজ্জা তাকে স্পর্শ করল, তখন মাকে খোঁজা ছাড়লে সে। তখন একদিন—বারো বছর বয়স হতেই বনওয়ারী তাকে রাখালি কর্মে ঢুকিয়ে দিলে ঘোষ মহাশয়দের বাড়ি। গরু চরাত, গোবর কুড়াত, ফাইফরমাস খাটত। মধ্যে মধ্যে মেজ ঘোষকে ইস্টিশানে গাড়িতে চড়িয়ে দিলে প্রতিবারেই মেজ ঘোষ তাকে একটি ক'রে আনি দিত।

করালীর ভারি ভাল লাগত মাইতো অর্থাৎ মেজ ঘোষকে, ভয়ও লাগত তেমনই। এমন যার বাক্সবিছানা, এমন যার সাজপোশাক, যে লোক এমন ক'রে অবহেলায় ফেলে দিতে পারে একটা আনি, যে লোক রেলগাড়িতে চ'ড়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তাকে কাহারদের যত ভাল লাগে, তত ভয় লাগে। হঠাৎ একদিন এই ভাল-লাগাটা বিষ হয়ে উঠল।

ঘোষ তাকে জুতোর বাড়ি মারলেন। ঘাড়ে ধ'রে তার মাথাটা নুইয়ে ধরলে বনওয়ারী, আর মেজ ঘোষ মারলেন পিঠে চটাচট চটিজুতোর পাটি। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। মেজ ঘোষের এক খদ্দের পাঠিয়েছিল এক ঝুড়ি খাস আম। সেই আমের ঝুড়ি করালী আনতে গিয়েছিল চন্ননপুর ইস্টিশান থেকে। মাস্টার-মশায়ের মত এমন ভালো লোক আর হয় না। এত জিনিস আসে ইস্টিশানে, রাজ্যের সামগ্রী ; সব মাস্টারই তার থেকে কিছু কিছু নিয়ে থাকে। কিন্তু সে মাস্টার কখনও কারুর জিনিসে হাত দিতেন না। শুধু মালের রসিদ-পিছু তাঁর যে পার্বণীটি পাওনা—সেইটেই নিতেন। ঘোষের আমের ঝুড়ি বেশ ক'রে চট দিয়ে মুড়ে সেলাই করাই ছিল। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতের ল্যাংড়া আমের সুগন্ধে মালের ঘরখানা একেবারে মৌ-মৌ করছিল। ঢুকলেই সে গন্ধে মানুষের নাক থেকে বুক পর্যন্ত ভ'রে উঠেছিল, জিবের তলা থেকে জল বেরিয়ে মুখটাকে সপসপে সরস ক'রে তুলছিল। মাস্টারের একটি ছোট মেয়ে সেই গন্ধে লুব্ধ হয়ে আম খাওয়ার জন্য বায়না ধরে শেষ পর্যন্ত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। মাস্টার তবু একটি আমও বার ক'রে নেন নি। কিন্তু করালী থাকতে পারে নি। সে নিজে দুটি আম বার ক'রে মেয়েটির হাতে দিয়েছিল। বলেছিল—আমার মুনিব

তেমন নয়, মাস্টার-মশায়। তারপর ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে আসতেই জমাদার ধরেছিল করালীকে। সে দুটো আম না নিয়ে ছাড়লে না। শুধু ছাড়লে না নয়, পকেট থেকে ছুরি বার ক'রে একটা আম কেটে খেয়ে আমের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে এক চাকা আম করালীকে আস্বাদন করিয়ে তবে ছাড়লে। তাই তার অপরাধ। চারটে আম কম-বেশিতে ঘোষ করালীকে ধরতে পারত না, ধরলে করালীর হাতের ও মুখের গন্ধ থেকে। আমের ঝুড়িটা মেজ ঘোষই ধ'রে তার মাথা থেকে নামাচ্ছিল। নামিয়েই সে করালীর ডান হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে নাকের কাছে টেনে নিয়ে শুঁকলে, তারপর বনওয়ারীকে ডেকে বললে—মুখটা শোঁক তো বনওয়ারী। হারামজাদা ঝুড়ি থেকে আম বের ক'রে খেয়েছে পথে। বনওয়ারী লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল প্রথমটা। এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়? করালী তার জাত-জ্ঞাতের ছেলে, সে-ই তাকে এনে এ বাড়িতে চাকরি ক'রে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা যে পাড়ার সে মাতব্বর, সেই পাড়ার ছেলে করালী। প্রজার পাপ জমিদার-রাজাকে অর্সায়, সেই জন্যই তো জমিদার-রাজার প্রজাকে শাসনের অধিকার। সমাজের পাপ মণ্ডলকে মাতব্বরকে অর্সায়, সেই জন্যই মণ্ডল-মাতব্বরের কাজ হ'ল—অধর্মের পথে পুরুষ-মেয়েকে যেতে 'নেবারণ' করা। ছি-ছি-ছি। দেবতা আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, বাড়ির মালিক আছেন—তাঁরা তার মনিব, তাঁরা [illegible] তবে না লোকে প্রসাদ দেবেন। বনওয়ারীর ইচ্ছা হয়েছিল, একটা লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে তার জিভে ছেঁকা দেয়। কিন্তু মেজ ঘোষ নিজেই তাকে সাজা দিলেন। তাকে বললেন-ধর, বেটা'র ঘাড় ধ'রে মাটিতে মাথাটা নুইয়ে ধর। তাই ধরলে বনওয়ারী। মেজ ঘোষ নিজেই পায়ের চটি খুলে 'পেচণ্ড' পেহা'র দিলেন। এবং করালীকে তাড়িয়েও দিলেন মেজবাবু। মাইনে কিছু পাওনা ছিল, সেও দিলেন না। কথাটা কানে গিয়েছিল স্টেশন-মাস্টারের। তিনি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন, এবং তিনিই করালীকে ডেকে দিলেন ইস্টিশানের গুদামে কুলির কাজ। কিন্তু ছোট স্টেশনে এ কাজে উপার্জন নাই। কায়ক্লেশে একটা লোকের পেট চলে। তাই লাইন-ইন্সপেক্টারকে ব'লে শেষে ঢুকিয়ে দিলেন কুলী-গ্যাঙের মধ্যে। সেই জন্যই ... করালী আজ [illegible]ই করালী, এবং এই সবের জন্যই সে অন্য দশজনের মত বনওয়ারীকে খাতির করতেও চায় না এবং ঘোষ-বাড়ির ছায়াও মাড়াতে চায় না। হোক না কেন এসব অনেক দিনের কথা, এবং দশে বিচার ক'রে বলুক না কেন অন্যায় তারই, তবু করালী সে কথা ভুলতেও পারে না, এবং অন্যায় তার ব'লে মানতেও পারে না।

মেজ ঘোষকে দেখে করালীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা নেচে উঠল। বনওয়ারী তার ঘাড় ধরেছিল, মেজ ঘোষ তাকে মেরেছিল। আজ বনওয়ারী তাকে তারিফ করছে, মেজবাবু এসেছে তার মারা সাপটা দেখতে। মেজ ঘোষ কি বলে, কি রকম ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে প্রশংসা-ভরা দৃষ্টিতে, সে আজ তা একবার দেখবে।

উঠানে নেমে সে সত্যই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। ঘোষ দাঁড়িয়ে ছিলেন সাপটার কাছেই। বনওয়ারী সামনের ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে। করালী কিন্তু এগিয়েও এল না, প্রণামও করলে না। সে লটবরের সঙ্গে কি একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিলে। বনওয়ারী বারকয়েক চোখের ইশারায় তাকে এগিয়ে এসে ঘোষ মহাশয়ের চরণে

দণ্ডবৎ করতে ইঙ্গিত করলে। করালী দেখলে, কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলে না, এই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। কান কিন্তু তার খুব সজাগ ছিল, কে কি বলছে, তার প্রতিটি কথা সে শুনছিল। অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল মেজ ঘোষের মুখে কি কথা বার হয়—সেইটুকু শুনবার জন্য। সকলেই খুব বিস্ময় প্রকাশ করলে, করালীর বীরত্বের তারিফ করলে। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখে শুনে একটু হেসে মেজ ঘোষ বললেন, নাঃ, খুব বড় না। এর চেয়ে অনেক বড় পাহাড়ে চিতি চিড়িয়াখানাতেই আছে। আসামের জঙ্গলে তো কথাই নাই। সেখানে এত বড় সাপ আছে যে, বাঘের সঙ্গে লড়াই হ'লে বাঘ মেরে ফেলে। রেল-লাইনের উপর যদি কোন ট্রেন যাবার সময় পড়ে তো ট্রেন আটকে যায়।

বনওয়ারী সায় দিলে কথাটায়, বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঝারি সাপ।

করালী এবার উদ্ধতভাবেই এগিয়ে এল। সাপটাকে এখনই এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে সে। নিয়ে যাবে চন্ননপুর স্টেশনে, সেখানে বাবুদের দেখাবে, সায়েবকে দেখাবে। তাদের কাছে ঘোষের দাম কানাকড়ি। জাঙলের একজন ভদ্রলোকের ছেলে বললে—কিন্তু এ তো পাহাড়ের চিতি নয়—এ হ'ল চন্দ্রবোড়া। চন্দ্রবোড়া এত বড় কিন্তু কেউ কখনও দেখে নি। আর সাপও ভীষণ সাপ।

ঘোষ একটু হেসে বললেন—জাত ওই একই হে, চিতির জাত। তারপর করালীর দিকে চেয়ে দেখে বললেন—হুঁ, জোয়ান তো হয়েছিস বেশ। বুদ্ধিরও একটু ধার আছে মনে হচ্ছে। কি করিস এখন?

করালী বেশ মাথা উঁচু ক'রে গম্ভীরভাবেই জবাব দিতে চেষ্টা করলে, অ্যাল-লাইনে কুলীগ্যাঙে কাজ করি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গম্ভীর আওয়াজ তার গলা দিয়ে একেবারেই বার হ'ল না। উত্তর দিতে গিয়ে বার দুই ঢোক গিলে সে চুপ ক'রে রইল। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। উত্তর দিলে বনওয়ারী, বললে—এ এখন অ্যাল-লাইনের কুলী খাটে।

—ও, আচ্ছা! তা হ'লে তো অনেক দূর এগিয়েছিস রে! আর কি করছিস? রাত্রে চুরি? যে রকম শরীরটা বেঁধেছে আর বুদ্ধিতে যেমন বঁড়শীর বাঁকা ধার, তাতে তো ও-বিদ্যেটায় পণ্ডিত হতে পারবি।

করালীর শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথা হেঁট ক'রে রইল সে। কথা বলার ভঙ্গিই এমন মেজ ঘোষের যে, সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। বনওয়ারী হেসে বললে—আজ্ঞে না, চুরি-টুরি করে না। সে সব আমার আমলে হবার জো নাই কাহারপাড়ায়। সে যিনি করবেন, তাঁকে গাঁ থেকে উঠে যেতে হবে। তবে করালী বজ্জাত খুব। যত বজ্জাত, তত ফিচলেমি বুদ্ধি।

মেজ ঘোষ হাসতে হাসতে বলল—তা হ'লে চোর হওয়া ওর অনিবার্য। যদি চোর না হয় তবে পয়লা নম্বরের লোচ্চা হবে—এ আমি বলে দিলাম বনওয়ারী। তারপর পকেট থেকে চামড়ার বাহারে মনিব্যাগ বার ক'রে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—নে।

সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঘোষ সমস্ত লোকের কাছে আশ্চর্য রকমের সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। তারপর বললেন—উঠিয়ে নিয়ে যা ওটা। গন্ধ উঠেছে এর মধ্যে। সকলেই জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে লাগল কথাটা শুনে। গন্ধ উঠছে নাকি? গন্ধ? বনওয়ারীও নিশ্বাস টানলে

জোরে জোরে। করালী একটা রুদ্ধ অথবা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও সিকিটাকে উপেক্ষা করলে না, সিকিটা নিয়ে কোঁচড়ে গুঁজে সঙ্গীদের বললে—লে, তোল্। নিয়ে যাব চন্ননপুর ইস্টিশান। তোল।

আজ এই মুহূর্তটিতে আবার করালীর আক্ষেপ হ'ল—নসুদিদি নাই, সে থাকলে জবাব দিতে পারত ঘোষকে। সে থাকলে কোমরে কাপড় বেঁধে মেজ ঘোষকে দেখে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়েও ঘোষের উত্তর না দিয়ে ছাড়াত না।

ঘোষ বললে—নাঃ, খুব বড় না।

নসু সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে জবাব দিত—হেই মাগো! বড় তবে আর কাকে বলে মাশায়?

ঘোষ বললে আসাম না কোথাকার জঙ্গলে পাহাড়ে চিতির কথা।

নসু হাত নেড়ে ব'লে উঠল—গোখুরা কোথা পাব বাবা? আমাদের এই হেলেই গোখুরা। আসাম না বেলাত কোথাকার কথা বলছেন, সেথাকার রজগর সেথাকেই থাকুক। আমাদের এই রজগর, ওই আমাদের খুব বড়; লঙ্কায় বলে সোনা সস্তা, সেখানকার নোকের সব্ব অঙ্গে সোনা, আমাদের দ্যাশে কাঁচের চুড়ি, রুপদস্তার চুড়িই সোনার চুড়ি।

আরও কত ছড়া কাটত। করালীর বার বার মনে হ'ল নসুবালার কথা আর আজ নসুদিদি থাকলে বড় ভাল হ'ত। এতবড় একটা কীর্তির গৌরব-উৎসাহ ম্লান ক'রে দিল মেজ ঘোষ। ঘোষ চোখের অন্তরাল হতে তবে তার সাহস খানিকটা ফিরে এল। সে মাথলাকে ধমক দিয়ে বললে—কি রে, কানে কথা যায় না, লয়? লে, তোল। সাপটাকে ব'য়ে নিয়ে যাবার বাঁশের এক দিকে কাঁধ দিয়েছিল মাথলা, অন্য দিকে 'লটা' অর্থাৎ নটা, মানে নটবর।

ঘোষ বাড়ি থেকে চ'লে গেলে কোঁচড় থেকে সিকিটা বার ক'রে করালী বললে—দেখ দিনি রে- সিকিটা আবার চলবে তো? মেকি-ফেকি লয় তো? মাথলা এবং নটবর সাপটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে ব'য়ে নিয়ে যাবে, তাদেরই বললে সে। তারা কেউ বলবার আগেই এগিয়ে এল নিমতেলে পানু। বললে—কই, দে দেখি।

দেখে বললে—না, চলবে। ভালই বটে। তা ছাড়া মাইতো ঘোষ মাশায়ের বেগের সিকি। নতুন চকচকে ছাড়া রাখেই না তিনি টাকা পয়সা।

করালী বললে—হুঁ।

পানু বললে—আমাকে সেবার পয়সা দেবার তরে বেগটা ঢাললে তক্তপোশের ওপর। একেবারে সোনার পয়সার মত চকচকে লালবন্ন পয়সা—সে এই এত।

পানুও তাদের সঙ্গ নিলে বেহায়ার মত, সেও যাবে চন্ননপুর ওদের সঙ্গে। চন্ননপুরে যে অনেক পয়সা মিলবে তাতে সন্দেহ নাই। করালী তাতে আপত্তি করে নাই। আসুক বেটা ছুঁচো। পানুই দিলে একটা কাঁধ। অজগর চললেন চন্ননপুর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ করালী দূরে দাঁড়িয়ে পানুর গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে আচমকা—শালো, কানার মত চলছ যে বড়? কানার মত চলছ যে? পায়ে পায়ে টক্কর দিলি যে বড়? আমাদের আর চোখে দেখতে পাও না, লয়? শালো। সোনার

পয়সার মত চকচকে 'লালবন্ন'। শালো, যাও না কেনে, সেইখানে যাও না। আমার সাথে কি বটে তোমার?

মাথলা বললে—ঠিক বলেছে করালী। আজ আমাদের সাথে কি বটে হে তোমার? মুরুব্বির কাছে তো সাতখানা ক'রে লাগাও তুমি। আজ কি বটে আমাদের সাথে?

নটবর তাকে সাবধান ক'রে দিলে—অ্যাই, চুপ কর। মুরুব্বি আসছে কিনা দেখ্ আবার।

ওদের দুজনের ঘাড় ফেরাবার উপায় ছিল না, একে আলপথ, তার উপর কাঁধে সাপ ঝুলানো বাঁশ।

মাথলা তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললে—না। কই? আসে নাই সে।

করালী বললে তার বিদ্যাসম্মত হিন্দীতে—যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়। হুঁ। তারপর হঠাৎ বললে—কাহারদের ছেলে পাল্কি বওয়ার হাঁক ধর না কেনে শালোরা। হাঁক ধর কেনে। কথাটা ভারি মনে লাগল মাথলাদের। মরা সাপটাকে পাল্কির আরোহী ধ'রে নিয়ে তারা হাত দুলিয়ে হাঁক ধরলে—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ। হঠাৎ পিছন থেকে বনওয়ারীর মোটা গলার হাঁক তারা শুনতে পেলে, দাঁড়া—দাঁড়া। এ-ই। দাঁড়া। থেমে গেল সকলে। থেমে যেতে হল। পা আর উঠল না। শুধু করালী উঠল অধীর হয়ে। এ কি কাণ্ড। এ কি জুলুম।

বনওয়ারীর মুখটা হয়ে উঠেছে হাঁড়ির মত। সে এসে দাঁড়াল। বললে—ফিরে আয়।

—ফিরব? কেনে?

—দাহ করতে হবে।

—সে তো 'আত্তে' করব বলেছি।

—না। এখুনি হবে দাহ। গোটা কাহারপাড়াকে চান করতে হবে। তারপর হঠাৎ আক্ষেপভরা আক্রোশভরা কণ্ঠে সে ব'লে উঠল—তুই গাঁয়ের সর্বনাশ করবি রে তুই সব অনথের মূল।

করালী স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে—ফিরে আয়। যা করেছিস, তার পিতিবিধেন করতে হবে।

করালী বললে—না। ওঠা রে সব, ওঠা।

কিন্তু কেউ ওঠাতে সাহস করে না। দাঁড়িয়ে রইল মাটির পুতুলের মত।

করালী আবার বললে—শুনছিস? ওঠা।

কেউ যেন শুনতেই পাচ্ছে না। বনওয়ারী বললে—মুখ দিয়ে অক্ত উঠে যদি মরতে না চাস তবে ফেরা।

এবার সাপ উঠল। চলল সকলে সাপ কাঁধে ক'রে বাঁশবাঁদিতে ফিরে। ফিরল না শুধু করালী। সে হনহন ক'রে চলতে শুরু করলে চন্ননপুরের দিকে।

বনওয়ারী ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফিরল।

কাহারপাড়ার আদ্যিকালের যত বিধান সুচাঁদের কাছে। সেই বিধানই চিরদিন বলবতী হয়েছে এখানে, আজও হ'ল।

মেজ ঘোষকে বিদায় ক'রে বনওয়ারী বাড়ি ফিরে দেখলে, সুচাঁদ ব'সে আছে। সুচাঁদ পাখীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে। পাখীকে ব'লে এসেছে—এ বাড়িতে যদি আর ফিরি, তোর মায়ের গতরের ওজগারের রন্ন যদি খাই, তবে আমার জাত নাই, আমি বেজাত। আমি বনওয়ারীর বাড়িতে থাকব।

বনওয়ারী সম্মান করতে জানে। সে বললে—বেশ তো পিসী। ছেলেকালে অ্যানেক দোম্ধ তুমি দিয়েছ আমাকে। তুমি থাকবে সে তো ভাগ্যি আমার গো। কি, হ'ল কি?

সুচাঁদ সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা ক'রে বললে—বনওয়ারী, উনি যদি কত্তার বাহন না হন, কি মা-মনসার বেটী না হন তো আমি কি বলেছি।

বনওয়ারীর—কাহারপাড়ার মাতব্বরের দৃষ্টি যেন এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, এবার জেগে উঠল। খুশিও হ'ল সে। অত্যন্ত খুশি হ'ল। মনের মধ্যে সাপ মারার সেই স্মৃতির বেদনা যেন ঘন হ'য়ে উঠছে। সে পিসীর পায়ের ধুলো নিলে।

পিসী আশীর্বাদ করলে- ছেরোয়ু হ্ বাবা। আমার মাথার চুলের মতন তোর পেরমাই হোক। তারপর কাপড়ের খুঁটি দিয়ে চোখ মুছে বললে—আহা, আগুনে দগ্ধে গিয়েছেন মা আমার, তবু কি বন্নের বাহার, কি গড়ন। আঃ, সর্বনাশ ক'রে দিলে বাবা।

বনওয়ারীর মন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিধানের জন্যই বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রতিবিধান -বাবাঠাকুরের পজা। মদে-মাংসে ঢাকে-ঢোলে আতপে-চিনিতে বস্ত্রে-সিঁদুরে পজা। সকল কর্মের উপরে হ'ল তার মাতব্বরির দায়িত্ব, গ্রামের ভাল আগে দেখতে হবে তাকে। হে বাবা কর্তা। গ্রামের মঙ্গল কর তুমি। সাজা দিতে হয়, যে দোষ করেছে তাকে দাও। করালীকে কিন্তু শাসন করা দরকার হয়েছে। বড়ই বৃদ্ধি হয়েছে। জোয়ান বয়সের রক্তের তেজ। হঠাৎ ক্রোধে ফুলে উঠল বনওয়ারী। আজও ওই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাঁশবনের মধ্যে—। আফসোসের সঙ্গে মনে করতে চেষ্টা করলে বনওয়ারী, বাঁশপাতা'র উপর অসাবধানে কেমন ক'রে তার পা পিছলে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও সে তার অপমান। সে তার পরম লজ্জার কথা।

বনওয়ারী মাতব্বর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে বাবাঠাকুরবে উপরের দিকে চাইলে একবার, তারপর মনে মনে মানত করলে ঠাকুরকে—হে ঠাকুর, পুজো দেবার কথা তো হয়েই আছে। আবারও মানত করছি—এর জন্যে একটি নতুন পাঁঠা দেব আমি। তুমি কাহারদের রক্ষা কর।

সুচাঁদ প্রশ্ন করলে—কি করছিস তা বল্?

বনওয়ারী বললে—এর তরে আমি পুজো দোব পিসী, আলাদা পাঁঠা মানত করছি।

—কি করছিস? আরও একটা পাঁঠা?—স্থিরদৃষ্টিতে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে সুচাঁদ প্রশ্নচ্ছলে কথাটার পুনরুক্তি করলে।

বনওয়ারী আবার বুঝিয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মানত করছি—মানত।

—মানত?

—হ্যাঁ। দুটো পাঁঠা দিয়ে কত্তার পুজো দোব।

আঙুল দেখিয়ে সুচাঁদ বললে—দুটো পাঁঠা দিবি?

—হ্যাঁ।

—বেশ্ বেশ। কিন্তুক, অ্যানেক কল্যেণ করতেন উনি বাবা—ওই উনি। আঃ, কি শিস।

বনওয়ারী বললে—দাহ হবে বাবার বাহনের। কাহারপাড়ার সবাইকে চান করতে হবে। ব'লে দাও সব। আমি চললাম ডাকতে। সে ছুটল।

কোপাইয়ের তীরে চিতা সাজিয়ে দাহ হ'ল বাবার বাহনের। গোটা কাহারপাড়া চান ক'রে ফিরল। বনওয়ারী প্রণাম ক'রে এল বাবার থানে।—হে বাবা! রক্ষা কর বাবা। পাষণ্ডকে দলন কর বাবা। কাহারদের মালিক, কাহারদের রক্ষা কর।

পাঁচ

ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং-ড্যাডাং—এর-র-র-র-র-র-র- ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং-ড্যাং—

বাবাঠাকুরতলায় ভোরবেলায় 'ঝুঁজকি' থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকী ভোরের বাজনা ধুমুল বাজাতে শুরু করলে। রবিবার অমাবস্যা—ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পুজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধূপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে, দুধে রম্ভায়, মদে মাংসে, কাপড়ে দক্ষিণায়—সমারোহ ক'রে পুজো।

ঢাক বাজবার আগেই ওঠে কাহারপাড়া—মেয়ে পুরুষে। ঘুমিয়ে থাকে শুধু ছেলেরা। তারাও আজ উঠে পড়ল। কলরব ক'রে তারা যেতে চায় বাবাঠাকুরের থানে। সুচাঁদ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—খবরদার, এ তো বছরশালি পুজো নয়,—আমোদ নেই এতে। অপরাধের পুজো, একেই বাবা মুখ ভার ক'রে আছেন, তারপর ছেলেরা যাবে, চেঁচামেচি করবে ল্যাইক লহ্ করবে, ধুলো ছিটোবে, অবলার জাত—নোংরা ময়লা করবে- অপরাধের ওপর অপরাধ হবে। খবরদার! আগে পাঁঠা দুটি নির্বিঘ্নে কাটা হোক, বাবাঠাকুর পুজো লেন হাসিমুখে; তারপর নাচন-কোঁদন, গান-বাজনা, মাল-মাতালি—সব হবে।

বনওয়ারী পাড়ায় পাড়ায় ব'লে এল—সাবোধান, সব সাবোধান! করালীর অপরাধের সাজা গোটা পাড়াকে ভুগতে হচ্ছে বাবা সকল; আর অপরাধ বাড়িয়ো না। অনেক মাশুল লাগল। আর না।

প্রহ্লাদ বললে—সোজা খরচ!

বনওয়ারী খরচ করছে, পানু মনে করে হিসেব রাখছে। এসবে নিমতেলে ছোকরা খুব লায়েক। দেহখানি—ওরা বলে, সরিঙ্গী অর্থাৎ কাঠির মত; কিন্তু মাথা নাকি খুব। মনে রাখতে পারে খুব। পানু মুখে মুখে হিসেব দিলে—খরচ তোমার অনেক। লগদ তিন টাকা বারো আনার ওপর দু পয়সা।

এর উপরে আরও খরচ আছে, ঘর থেকে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে, তার দামই বেশি। দুটো পাঁঠা, একটা ভেড়া, বারোটা হাঁস, দশ-বারো সের চালও দিতে হয়েছে—বায়েন কর্মপ্রকার পুরোহিত মহাশয়দের সিধার জন্য। এ সবের দাম অনেক। সকালবেলা থেকে তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত মজুরি খেটে যারা পাঁচ আনা রোজ পায় অর্থাৎ মাসিক ন টাকা

ছ আনা মাত্র যাদের আয়, তাদের কাছে অনেক বইকি। সুতরাং কাহারদের জীবনে এ একটা সমারোহ এবং রোমাঞ্চকরও বটে।

রোমাঞ্চটা আরও প্রবল হয়ে উঠল বাবাঠাকুরের থান পরিষ্কারের সময়। সেয়াকুলের ঝোপ কাটবার সময়, ওই ঝোপগুলির ভিতরের উইঢিপি থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন-তিনটে আলকেউটে। কেউটেকে ওরা খুব ভয় করে না। কোপাইয়ের তীরে, জাঙলের মাঠে আলকেউটের বাস চিরকাল। ওদের সঙ্গেই একরকম বাসই করে কাহারেরা। কেউটেরাও ওদের মধ্যে মধ্যে তাড়া করে, ওরাও কেউটেদের তাড়া ক'রে পাঁচন-লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তবে জাত-সাপ নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের মেরে তাই সম্মান ক'রে আগুনে 'ডাহ' অর্থাৎ দাহ করে। বাবাঠাকুরের থানে কেউটের কিন্তু অন্য অর্থ হ'ল। বিশেষ ক'রে এই অজগর তুল্য চন্দ্রবোড়াটিকে বাবার বিচিত্র-বর্ণ বাহন ব'লে জানার পর, এই কেউটেগুলিকে তার সঙ্গী-সাথী না ভেবে পারলে না বনওয়ারী। সে বললে খবরদার। হাত দিয়ো না গায়ে।—ব'লে নিজেই সে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলে। সাপ তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ফোঁসাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মাটিতে ছোবল মারছে। কিন্তু এগিয়ে আসতে তাদেরও সাহস নাই। বেদে জাতের গায়ের গন্ধে সাপ তাদের বেদে ব'লে জানতে পারে, ভয় পেয়ে ছুটে পালায়: কাহারদের গায়ের গন্ধে ওরা তেমনিই বোধ হয় ভয় পায়, এগিয়ে আসতে চায় না সহজে।

বনওয়ারী সাপদের বললে- যা যা, যা বাবারা, চ'লে যা। খানিকটা স'রে যা। নরে-নাগে অর্থাৎ নরে-নাগে বাস করতে নাই, এখন তোরা স'রে যা তোমাদের প্রভু, আমাদের বাবাঠাকুর, তাঁর পুজোটি নেবেন, তা'পরেতে তোমরা আবার স্বস্থানে পরমেশ্বরী হ'য়ো না কেনে।

সাপগুলো স'রেই গেছে। কাহারেরাও সাবধান হয়ে রইল। কি জানি, হোক না কেন বাবাঠাকুরের বাহনের সঙ্গী সাথী, তবু ও জাতকে বিশ্বাস নাই।

তবে ওই যে ঢাকের শব্দ—ড্যাডাং-ড্যাডাং, ওতেই ওরা স'রে যাবে অনেক দূর। তার উপর ধূপ-ধুনো, অনেক মানুষের আনাগোনা।

নগদ খরচের মধ্যে পুরুত মহাশয় নিলেন আট আনা; কাপড় একখানা সাত হাত—দাম পাঁচ সিকে জোড়া হিসেবে দশ আনা; পাকি 'কারণ' সওয়া পাঁচ আনা; বাতাসা কদমা মণ্ডা ও অন্যান্য জিনিস,—বনওয়ারীরা এক্ষেত্রে জিনিসকে বলে 'দব্য'—তার দাম সওয়া পাঁচ আনা; বলিদানের ছেত্তাদার ছ আনা; দেড় গোলা মদ আঠারো আনা, এবং ঢাকী নিয়েছে চার আনা, বাকি চার আনায় তেল সিঁদুর ধূপ ধুনো ধনুচি প্রদীপ ইত্যাদি। ছাগলের দুটো মুড়ির একটা নিয়েছে পুরুত, একটা ছেত্তাদার, ঢাকী নিযেছে ভেড়ার মাথাটা। কাপড়খানা পুরুত নিয়েছে। সকলেই খুশি হয়ে গিয়েছে, ব'লে গিয়েছে—পুজো নিখুঁত হ'ল মুরুব্বি। শুধু একদিন দেরি হয়ে গেল এই যা। শনিবারটা পাওয়া গেল না। তা হোক। পুরুত বললেন—রবিবার অমাবস্যে—খুব ভাল। অমাবস্যে রবিবার, মৎস্য খাবে তিনবার। কত্তা খুশি হয়ে মদ মাংস খাবেন।

তা বাবাঠাকুর খুশি হয়ে পেসন্ন মনে দু হাত ভ'রেই মদ-মাংসের পুজো নিলেন। বলিদানে

একটু খুঁত হ'ল না। তিন প্রহরের সময় বলিদানের ঢাক বাজল—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ডেনাক-ড্যাডাং—লাগ-ড্যাং-ড্যাং-ড্যানা—

কাহারদের মাতব্বরেরা তখন বাবার পেসাদী 'কারণের' প্রসাদ নিয়েছে—উপোস-করা পেটে অল্প 'কারণেই' বেশ জমিয়ে তুলেছে ; মাথা ঝিমঝিম করছে। তারা সব জোড়হাত ক'রে দাঁড়াল। সুচাঁদ রাঙা-আঁটির মত চোখ বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে চেঁচাতে লাগল,—হে মা—হে মা—হে মা।

ছেলেরা মুখে বাজনার বোল বলতে লাগল—খা-জিং-জিং জিনাক জিজিং লাগ জিং জিং জিনা—

বলির সঙ্গেই পূজা শেষ। দেখতে দেখতে বলি হয়ে গেল—নিখুঁত বলি। হাঁসগুলোকে কেটে উড়িয়ে দিলে। হাঁসগুলোকে কেটে ধড়টাকে ছুঁড়ে দিলে। তারা খানিকটা উড়ে গিয়ে পড়ল।

পানুর পাঁঠা তো ছিলই, বনওয়ারী নিজে একটা পাঁঠা দিয়েছে। রতন দিয়েছে ভেড়াটা। বনওয়ারী দিলে ওই সাপটিকে মারার অপরাধের জরিমানা। করালী করলে পাপ, সে করলে প্রায়শ্চিত্ত। না করলে কে করবে ? করালীর যা হবে হোক, কিন্তু পাড়ার মঙ্গল, গাঁয়ের মঙ্গল তাকেই দেখতে হবে যে। সমস্ত পাড়ার লোক বনওয়ারীকে এর জন্য প্রাণখুলে ধন্যবাদ দিয়েছে। রতন ভেড়াটি দিয়েছে নিজের অবাধ্য সন্তানের জন্য—লটা করালীর সঙ্গী, সেই হতভাগাই বাঁশে ঝুলিয়ে ওই অলৌকিক সাপটিকে ব'য়ে নিয়ে গিয়েছে। সুচাঁদ দিয়েছে একটি হাঁস। নিছক ভক্তির বশবর্তী হয়েই সে দিয়েছে। বসন্তও দুটি হাঁস দিয়েছে, ডাইনে বাঁয়ে বলি দেবার মত দু পাশে দুটো হাড়কাঠ ছিল না—তবু ওই মানসেই সে দুটি হাঁস দিয়েছে। পাখী করালীকে সমর্থন করে। বসন্তের গোপন মানস ছিল একটি হাঁস পাখীর জন্য, অন্যটি করালীর জন্য। একটি পাঠিয়েছে কালোশশী—গোপনে পাঠিয়েছে। এ পুজোয় আটপৌরে-পাড়ার সকলে যোগ দিলেও পরম মাতে নাই এতে। বনওয়ারীর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য নাই। বনওয়ারী মাতব্বর হয়ে যা করে, তাতে পরম যোগ দিতে দেয় না আটপৌরেদের। এক্ষেত্রে আটপৌরেরা পরমের কথা মানে নাই। কিন্তু পরম যোগ দেয় নাই। তবে নিজের পাড়ার লোকেরা যখন তার কথা না শুনেও যোগ দিলে, তখন নেহাত পাড়ার মাতব্বরি করতে উপস্থিত হয়েছিল মাত্র। বাকি আটটা হাঁস আর আট ঘর থেকে এসেছে। যার হাঁস ছিল, সে না-দেওয়া হয় নাই। যার নাই, সে কি করবে ? কত্তাকে পুজো দিতে সাধ কার না হয়, প্রসাদ পাওয়ার ভাগ্য কে চায় না ? সকল বাড়ি থেকেই মণ্ডা বাতাসা পাঁচ পয়সা হিসেবে দিয়েছে। এ ছাড়া মদ। ঘোষ মহাশয় তিন গোলার দাম দিয়েছিলেন, কিন্তু বনওয়ারী দেড় গোলার বেশি কেনে নাই। দেড় গোলা কিনে তারই আবরণে ভেণ্ডরকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামেই তারা আরও তিন গোলা মদ নিজেরাই ক'রে নিয়েছে।

পুজো হয়ে গেল। এইবার নিশ্চিন্ত। চল সব, চল, বাবাঠাকুরের বাতাসা পেসাদ লাও, জল খাও, রান্নাবান্না কর। জয় বাবাঠাকুর। হে ভগবান, মঙ্গল কর তুমি।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালে করালী। তার হাতে তিনটে হাঁস। পিছনে নসুবালা আর পাখী।

—মাতব্বর, আমি তিনটে হাঁস বলিদান দোব।

বনওয়ারী দুঃসহ ক্রোধে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। এ কি উৎপাত—এ কি বিঘ্ন! রাগে তার মুখে কথা ফুটল না, গোটা কাহারপাড়াই স্তব্ধ হয়ে রইল। এগিয়ে এল পানু। সে তার শীর্ণ লম্বা হাতখানা লম্বা ক'রে বাড়িয়ে রাস্তা দেখিয়ে বললে—ভাগো।

—ভাগো?—করালী প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ। লিয়ে যাও তোমার হাঁস। তোমার বলি লেয়া হবে না।

—লেয়া হবে না?

—না।

করালী চীৎকার ক'রে উঠল—মাতব্বর।

বনওয়ারী এগিয়ে এল এবার। বললে—চিচকার কিসের? চিচকার কিসের?

—পানার মুখ ভেঙে দোব আমি। কি বলছে শুনছ?

- কি বলছে?

—আমার হাঁস লেবে না। বলি দিতে দেবে না।

--হ্যাঁ, লেবে না আমার হুকুম।

—কেনে? লেবে না কেনে?

—না, না। লেবে না। তোমাকে নাকে খত দিতে হবে—

বাধা দিয়ে বলল করালী—নাকে খত দিতে হবে?

—হ্যাঁ। জরিমানা দিতে হবে। সকলের ছামুনে—

- থাক, থাক। এই করলে তবে লেবে আমার হাঁস?

—হ্যাঁ।

—লইলে লেবে না?

—না।

করালী আর কোন কথা না ব'লে পট পট ক'রে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দুহাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে- কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না যা মন তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।—ব'লে মুখে বলিদানের বাজনার বোল আওড়াতে আওড়াতে চ'লে গেল—খা—জিং-জিং—ডেনাক পুজো—

মুণ্ডুগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁসগুলাকে নিয়ে সে চ'লে গেল। গোটা পাড়াটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুধু বনওয়ারী হেঁকে উঠল—যাক, যেতে দাও ওকে। চল সব, বাড়ি চল, জল খাও। একবার বাবাকে ডাকো। ব'লেই সে ডেকে উঠল, ব'লো শি-বো—ধর্ম রঞ্জো।

সবাই সমবেত কণ্ঠে হেঁকে উঠল।

ঢাক বাজতে লাগল পুজো শেষের—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ড্যাং-ড্যাং—। লম্বা ক'রে বাজনা। শেষ হ'ল। পুজো শেষ

অশুভক্ষণে করালী, অশুভক্ষণে ওর জন্ম; এমন পুজোটিতে কেমন অস্বস্তি এনে দিলে। দিক। সে ভাববার অবকাশ নাই বনওয়ারীর। পুজো শেষ হ'লেই কাজ শেষ হল না।

অনেক কাজ। মাতব্বরি সহজ নয়। অনেক বিবেচনা করতে হয়। অনেক ভাবতে হয়। প্রসাদ বিলি করতে হবে। মিষ্টির প্রসাদ, বলিদানের প্রসাদ, কারণের প্রসাদ। যে সব লোকের বাড়ি থেকে হাঁস অথবা অন্য বলি যায় না, তাদের বাড়িতে দেবার জন্য প্রত্যেক বলি থেকে দুটি ক'রে পা কেটে নিয়ে একত্র ক'রে কুটে তাই ভাগ ক'রে পাঠিয়ে দাও তাদের বাড়ি বাড়ি। নিজের বলিটির আর দুটি পা ছাড়িয়ে ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি পাঠাতে হবে। নিজেই সে চলল সে-দুটি নিয়ে। তার আগে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদটি সে ভাল ক'রে দেখে নিল। বাঃ, বেশ হয়েছে। ঠিক আছে। পরনে আজ তার পরিষ্কার একখানি হাঁটু-বহরের কাপড়, তার কোঁচাটি উল্টে নিয়ে কোমরে গুঁজেছে, কাঁধে পরিষ্কার করা গামছাখানি পাট ক'রে ঝুলিয়েছে, কপালে পরেছে সিঁদুরের ফোঁটা। মাংস পেয়ে ঘোষ খুশি হলেন খুব, একটা সিগারেট দিলেন বনওয়ারীকে। বললেন—হ্যাঁ, আজ একটা মণ্ডল মাতব্বর ব'লে মানাচ্ছে বটে। তা এর সঙ্গে একটা সিগারেট না হ'লে চলবে কেন?

বনওয়ারী সেটিকে কানে গুঁজে ভক্তিসহকারে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরল। দু-বাটি মদ সে এর আগেই খেয়েছিল। একটু বেশ নির্ভয়-নির্ভয় ঠেকছিল দিন দুনিয়া; সে বললে—আশীব্বাদ—সব আপনকারদের আশীব্বাদ। ঘোষবাড়ির 'নক্ষীর' এঁটো-কাঁটায় বনওয়ারীর পিতিপুরুষের 'জেবন'। আবেগে কেঁদে ফেললে বনওয়ারী।

সান্ত্বনা দিতে গেলে ফ্যাঁসাদ বাড়বে--ও অভিজ্ঞতা মেজ ঘোষের স্বোপার্জিত; ধমক দিলেও ওদের মনে বড়ই লাগে তাও অজানা নয়। সুতরাং তিনি সংক্ষেপে বললেন--সে হবে বনওয়ারী, কাল হবে সে সব কথা। ওদিকে তোমার পাড়ায় আজ অনেক কাজ। দেখো, যেন কোন অঙ্গহীন না হয়।

বনওয়ারীকে এখন বিদেয় করতে পারলেই বাঁচেন ঘোষ। একে কাহার, তাতে মাতাল হয়েছে, গায়ে দুর্গন্ধ উঠছে। কিন্তু মাতাল বনওয়ারীর কথা সহজে শেষ হবে কেন, সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। একশো বার। জ্ঞানবানের কথা। তবে বনওয়ারীর জেবন থাকতে সেটি হবেন না। খুন-খারাবি হয়ে যাবে। ওই করালী--ওই যে হারামজাদা বদমাশ—অক্তের ত্যাজে মেরে ফেলালে দেবতুল্য সপ্যটিকে, ওর আমি কি করি দেখেন। তাড়াব--ওকে আমি এখান থেকে তাড়াব।

বড় ঘোষবউ বললেন—বেশ বেশ, এখন বাড়ি যাও। সন্ধ্যে হয়ে গেল, আজ পুজো দিয়েছ, কত্তার ওখানে আজ একটা পিদীম দিয়ে, ঢাকীটাকে একবার ধুমুল দিতে ব'লো যেন। যাও। এখন ব্যবস্থা কর গিয়ে।

বনওয়ারী এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। একটি ব্যবস্থা তার ভুল হয়ে গিয়েছে। ঠিক কথা, ওঁরা জ্ঞানবান লোক, অনেক বিদ্যা ওঁদের 'ওদরে'র মধ্যে আছে, এমন প্রয়োজনীয় কথা ঠিক ওঁদের মনে পড়বেই তো। সে হাতজোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে আমি আজ যাই।

—হ্যাঁ এসো—এমন ক্ষেত্রে গম্ভীর ভাব রক্ষা করতে মেজ ঘোষ অদ্বিতীয়। অন্য সকলেই অল্প অল্প হাসছিল, কিন্তু ঘোষ একেবারে গম্ভীর, যেন কোন সম্পত্তি নিলামে ওঠার সম্পর্কে চিন্তান্বিত মুখে আলোচনা করছেন তাঁর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে।

বনওয়ারী চ'লে গেল, খুব দ্রুতপদে হনহন ক'রে চলল। প্রদীপ দিতে হবে, ঢাকীকে বলতে হবে বাবার স্থানে ধুমুল দেওয়ার জন্য। তার হয়েছে এক মরণ। এই যে মাতব্বরি, এর চেয়ে ঝকমারি কাজ আজ আর কিছু নাই। রাজার দোষে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের দোষে গ্রাম নাশ ; প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গ্রামের পাপে মণ্ডলের মাথায় বজ্রপাত। হে ভগবান।

পাড়ায় এসেই হাঁকডাক শুরু ক'রে দিলে, পিদীম—পিদীম চাই একটা। কাচা কাপড়ের সলতে দে। ভাঁড় ছেঁকে ত্যাল দে, অন্নশালের ত্যাল দিস না যেন।

পানুকে সে পাঠালে বায়েনপাড়া। ধুমুল দিতে হবে।

প্রদীপটি নিয়ে সে দু পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাতাস দিচ্ছে। তার স্ত্রী গোপালীবালা এগিয়ে এসে একটি 'টোকা' অর্থাৎ চুপড়ি হাতে দিলে।

বনওয়ারী বললে বাঃ। হ্যাঁ, এ সব কাজে মেয়েদের বুদ্ধিই খেলে ভাল। ঠিক হয়েছে। প্রদীপটিকে টোকার আড়াল দিয়ে সে চলল। কত্তার থানে যেতে হ'লে পথে আটপৌরে পাড়ার উত্তর প্রান্তের ঝাঁকড়া বটগাছতলাটা পার হতে হয়। বড়ই অন্ধকার স্থান। টোকার আড়ালে প্রদীপের আলো ঢেকে গেছে। গাছতলাটা থমথম করছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে বনওয়ারী থমকে দাঁড়াল। কে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদছে যেন ?—কে ?—কে গা ?

গাছতলায় একটা সাদা মূর্তি ব'সে রয়েছে। এগিয়ে গেল বনওয়ারী।

—কে ? প্রদীপটার উপর থেকে টোকাটা সরিয়ে নিয়েই সে চমকে উঠল।—কালোবউ ? কালোশশী ? এ কি ? এ কি ? হ্যাঁ, সে কালোশশীই বটে। বুকের ভিতর যেন ঢাক বেজে উঠল। অন্ধকারে এই গাছতলায় একা কালোশশী।

মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে এসে কালোশশী কাঁদছিল। পরম তাকে বেশ ঘাকতক দিয়েছে। গোপনে সে যে হাঁসবলি পাঠিয়েছিল বনওয়ারীর কাছে, সে কথাটা পরমের কাছে গোপন থাকে নাই। কেউ ব'লে দেয় নাই, কিন্তু পরম নিজেই ধ'রে ফেলেছে। কত্তার ওখানে পরম একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, পুজো না দিলেও প্রণাম জানাবার জন্য গিয়েছিল ; সেই সময় বলি দেবার জন্য যখন হাঁসটার মাথায় সিঁদুর দিচ্ছিল পুরুত, তখনই তার সন্দেহ হয় হাঁসটা ওর বাড়ির হাঁস ব'লে। কিন্তু সেখানে কোন গোল করে নাই। বাড়ি এসে হাঁসের হিসেব ক'রে দেখেছে একটি হাঁস কম। অমনি বাক্যব্যয় না ক'রে কালোশশীকে ঘরে পুরে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে, এবং এই গোপন পুজো দেওয়া যে কালোশশীর কর্তার প্রতি ভক্তির জন্য নয়, পুজোর উদ্যোক্তা বনওয়ারীর প্রতি প্রীতির আতিশয্যের নিদর্শন, সেই কথাটা অত্যন্ত কুৎসিত ভঙ্গি ক'রে পরম তাকে বার বার ক'রে বলেছে—আমি কবে মরব তাই জানি না, লইলে সব জানি, সব বুঝি, বুয়েছিস ? পরিশেষে কয়েকটা কুৎসিত অশ্লীল সম্বোধনে সম্বোধিতও করেছিল কালোশশীকে। প্রহারের বেদনার জন্যই সে রাগ করেছে, এবং সেই ক্ষোভের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে তার অভিমান জেগে উঠেছে তার অদৃষ্ট এবং বিধাতার উপর। তাই ঘর ছেড়ে গ্রামের বাইরে গাছতলায় ব'সে সে কাঁদতে এসেছে।

বনওয়ারীর সঙ্গে সে কিন্তু ছলনা করলে। আসল কথা গোপন করলে, বললে—এসেছিলাম কত্তাকে পেনাম করতে। মানত করলাম একটা।

বনওয়ারী বললে—তা কাঁদছিলা কেনে ভাই ?

—কাঁদছিলাম মনের বেথায়।

—মনের বেথায় ?—কেঁদে ফেললে বনওয়ারী। কালোশশীর মনের ব্যথা। সে ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীর মদ্যসিক্ত নরম মনকে ব্যাকুল ক'রে তুললে।—কি তোমার মনের বেথা ভাই ?

—আমার বেথা আমার কাছে ভাই ; যাকে বলবার, যার বুঝবার, সেই বুঝবে। বললাম—আমার যেন 'মিত্যু' হয়।

—কেনে ভাই ? এমন মানত কেনে করলে ভাই ? কি তোমার বেথা, কি তোমাব অভাব—আমাকে বলবে না ?

—কি হবে বেঁচে ? ছেলে নাই, পুলে নাই। সোয়ামী, না, কসাই—

বনওয়ারী তার মাথায় হাত দিয়ে বললে—হবে—হবে। আমি বলছি, তোমার সন্তান হবে। দেখো তুমি।

হঠাৎ প্রদীপের আলোটা নিবে গেল। চুপড়ির আড়ালের মধ্যে থেকে প্রদীপটার বাইরেব বাতাসে নেববার কথা নয়। বাতাস নয়, ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিলে কালোশশী। ব্যাকুলভাবে সে বনওয়ারীর খালি হাতখানি জড়িয়ে ধরলে। কালোশশীর মুখেও মদের 'বাস' উঠছে।

হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার বাসা বেঁধে থাকে। সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে সে, অন্ধকার বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে। প্রদীপটা নিবে যেতেই সে অন্ধকার ছুটে এল যেন কোপাইয়ের বুক থেকে হড়পা বানের মত। সেই তমসার মধ্যে মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী এবং কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল। এতক্ষণে কালোশশী সব কথা বললে বনওয়ারীকে। বনওয়ারী অনেক কাঁদল তার ব্যথার কথাও সে বললে। তারও সন্তান নাই। সে জানে সন্তানহীনতার দুঃখ। এত বড় মাতব্বর সে, দু-দু বিঘে জমি, খানিকটা ঘাসবেড়, এতগুলি গরু, হাল, বলদ, এ সব কি হবে ? কি দাম এ সবের ? কিন্তু আজ আর তার কোনও উপায় নাই। তা ছাড়া আজ এই এমন মুহূর্তে কালোশশীর কাছে সত্য গোপন করবে না ; তার স্ত্রীকে সে কখনই কালোশশীর মত ভালবাসে না। কিন্তু কি করবে সে ? তাদের মধ্যে সাঙার রেওয়াজ আছে, কিন্তু ওর পক্ষে—ঘাড় নাড়লে বনওয়ারী। অন্য কেউ হ'লে তার পক্ষে সম্ভব ছিল এমন কাজ। সে বনওয়ারী—পাড়ার মাতব্বর।

কালোশশী বললে—আমারই কি আর তাই সাজে ভাই। সে কথা আমি বলি নাই। হঠাৎ কালোশশী চমকে উঠল। বললে—কে যেন গেল। আমি বাড়ি যাই। তুমি যাও, ঠাকুরতলায় পিদীম দিয়ে পাড়ায় যাও।

—দাঁড়াও, পিদীম আবার জ্বেলে আনি।

এইবার কালোশশীই বললে—পিদীম নিয়েছ, ধূপ কই ? শুধু পিদীমে সনজে দেওয়া হয় নাকি ?

ঠিক কথা। ঠিক বলেছে কালোশশী। কালোশশী যে চন্ননপুর-ফেরতা মেয়ে ; এ কথা

কালোশশী ছাড়া আর কে বলতে পারবে ?

চন্নপুরে বাবুদের বাড়িতে কালোশশী অনেকদিন 'ছোটলোক' ঝিয়ের কাছ্ করেছে। বাবুরা বলে—ছোটলোক ঝি। এদের মেয়েরা এঁটো-কাঁটা আঁস্তাকুড় ধোয়, বাসন মাজে, ছেলেপিলের ময়লা কাপড় সাফ করে, দু'বেলা খেতে পায়, বছরে দু'খানা কাপড়ও মেলে, মাইনে চার আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত—যার যেমন বাড়ি, যেমন কাজ। কাহারপাড়ার মেয়েরা জাঙলে সদগোপদের বাড়িতে ভোরবেলায় গিয়ে কাজ ক'রে বাড়ি ফেরে। চন্নপুর এখান থেকে অনেকটা দূর, সেখানে যাওয়া চলে না এবং সেখানেও অনেক 'ছোটজাত' আছে, তারাই করে সেখানকার কাজ। কেবল কালোশশীই চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়ি কাজ করেছে বছর দুয়েক। সেবার একটা ডাকাতির মকদ্দমায় পরমের আড়াই বছর জেল হয়েছিল। সেই সময় কালোশশীকে চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়িতে কাজ ঠিক ক'রে দিয়েছিল বড়বাবুদের হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ভূপসিং মহাশয়। সেইখানেই থাকত তখন কালোশশী। ভূপসিং মহাশয় তখন কালোশশীর মালিক হয়েছিলেন। ব্যাপারটায় নিন্দা অবশ্যই আছে, নিন্দাও হয়েছিল : কিন্তু নিন্দনীয় কর্মমাত্রই অমার্জনীয় অপরাধ নয় সমাজে। ওদের সমাজে এটা এমন নিন্দনীয় কর্ম নয়, যার মার্জনা নাই। কারণ ভূপসিং মহাশয় জাতিতে উচ্চবর্ণ, ছত্রী, গলায় পৈতে আছে, তা ছাড়া তিনি বাবুদের বরকন্দাজ। যাক সে কথা। পরম ফিরে এসে কালোশশীকে ঘরে এনেছে। এসব রীতিনীতি কালোশশী সেখানেই শিখে এসেছে।

বনওয়ারী আবার পাড়ায় ফিরে ধূপ প্রদীপ নিয়ে গেল।

প্রদীপটা কয়েক মুহূর্ত জ্বলেই নিবে গেল বাতাসে।

ধূপটা পুড়তে লাগল, কর্তাতলার সরীসৃপসঙ্কুল প্রান্তরের মধ্যে বাতাসের সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ওদিকে গ্রামের মধ্যে তখন মাতন লেগেছে, ঢোলক বাজছে, গান চলছে সমবেত কণ্ঠে। আঃ, তবু আজ পাগল কাহার নাই। পাগল কাহার বাঁশবাঁদির গায়েনদার, গান বাঁধে, গান গায়, সে থাকলে আরও জমত। এও বেশ জমেছে। বয়স্কদের মোটা গলার সঙ্গে ছেলেদের মিহি জোবালো মিঠে গলার সুর ; শিঙের সঙ্গে সানাইয়ের মত মিহি-মোটা সুরের শিল্পময় বুনন বুনছে। মেয়েরাও মদ খেয়েছে। তাদেরও বসেছে স্বতন্ত্র আসর। সে আসরের মূল গায়েন সুচাঁদ ; সে আজ খুব খুশী। কত্তার পুজো হয়ে গিয়েছে, পুজোর মত পুজো, বলিদান, ঢাক, মদ—কোন খুঁত নেই। পাকি আধ সের দুধ ধরে, এমন বাটির তিন বাটি মদ খেয়েছে সে। সুচাঁদ নাচছে কখনও, গান গাইছে কখনও, কখনও বলছে সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প। তাদের আমলের মনে মনে রঙ-ধরাধরির কথা, কে ছিল কার ভালবাসার মানুষ—উচ্চ হাসি হেসে সেই সব কথা ব'লে যাচ্ছে। কখনও বলছে, নীলকুঠীর আমলের সাহেবদের গল্প, কুঠী উঠে গেলে কাহারদের কষ্টের কথা।

—কাহারপাড়ার সে এক 'মনন্তরা'। আমার মা বলত, বাপের মা বলত, সে এক 'ভেষণ' অবস্থা। হাড়ির ললাট—ডোমের দুগ্‌গতি। বান এল, সেই বানে কুঠী ভাসল—তা কাহারপাড়া। কাহারপাড়ায় সাগর জল। সে জলের 'সোরোত' কি। ঘর-দুয়োর প'ড়ে গেল। গরু-বাছুর-ছাগল ম'রে ঢোল হয়ে ফুলে বাঁশবনে আটকে থাকল কতক, কতক ভেসে গেল। লোকেরা

গাছে উঠে ব'সে থাকল চি-পুত্ত-মা-বুন নিয়ে। মায়ের কোল থেকে কচি ছেলে ঘুমের ঘোরে হাত থেকে খ'সে টুপুস ক'রে প'ড়ে গেল বানের জলে। আমাদের বনওয়ারীর এক জেঠা ছিল—বাবার বড় ভাই, সে তখন দু'বছরের ছেলে—সে প'ড়ে যেয়েছিল। আরও যেন কার কার ছেলে যেয়েছিল প'ড়ে। গাছের ডালেই ঠুকুস ক'রে ঘাড় লটকে ম'রে গেল পেহ্লাদের কত্তাবাবা। ওই হারামজাদা করালীর কত্তাবাবা ছিল তখন মায়ের প্যাটে। ভর্তি-ভর্তি দশ মাস। গাছের ডালেই পেসব হ'ল ছেলে। তাতেই নাম হ'ল—ষষ্ঠীদাস। গাছটি ছিল ষষ্ঠীগাছ। ডাকত নোকে 'গেছোষষ্ঠী' ব'লে। ওই হারামজাদা করালী এমন ডাকাবুকো কেন? গেছোষষ্ঠীর ঝাড় ব'লে।

তার পর সে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

বসন বললে—মরণ, এর আবার হাসি কিসের?

পাখী নেশায়-রঙিন চোখ বিস্ফারিত ক'রে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, বাইরে সে মজলিসটিকে লক্ষ্য করছে, মনে মনে মন রচনা করছে। ওর কান রয়েছে করালীর বাড়ির আসরের ধ্বনির দিকে। করালীর বাড়িতে করালী আলাদা আসর বসিয়েছে। করালী কাউকে ভয় করে না, সে কারও কাছে হার মানে না, ঘোষকেই সে আজ প্রণাম করে নাই তো বনওয়ারী। সেই মুণ্ডু ছেঁড়া হাঁস তিনটে রান্না হয়েছে। চন্ননপুর থেকে বোতলবন্দী পাকি মদ এসেছে। নসুবালা নাচছে। জ'মে উঠেছে তাদের আসর। পাখীর মন নাচছে। আষাঢ় মাসে ঘনঘটা ক'রে মেঘ এলে তালচড়ুই যেমন নেচে নেচে ওড়ে, তেমনই ভাবে উড়ে যেতে ইচ্ছা করছে। তার মনে রঙের সঙ্গে মদের নেশায় উত্তেজনা যোগ দিয়েছে। সে যাবেই করালীর বাড়ি। এদের মজলিসটা ভাঙলে হয়, কি নেশাটা আরও খানিক জ'মে উঠলে হয়। 'ওদিকে সেই ডাকাবুকোর অর্থাৎ করালীর মজলিস ভাঙলে হয়। তার সঙ্কল্প আজ দৃঢ়।

সুচাঁদ গাল দেবে—দিক। বনওয়ারী শাসিয়েছে—শাসাক।, সে মানবে না কারও শাসন। সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকে।

বনওয়ারী আজ পাড়ার মজলিসে ব'লে দিয়েছে—যদি আপন আপন থাকতে চাও তো সে ভাল কথা; যার যা খুশি কর; কারুর দায় হায় কারুর নাই, কে মরল, কে থাকল দেখাদেখি নাই, বাস, ভাল কথা; আমি বাঁচি, মাতব্বরি আমি চাই না, করব না। আর তা যদি না হয়, দায় যদি পুরতে হয় আমাকে, তা হ'লে আমার কথা মেনে চলতে হবে। ওই করালীর মতন চালচলন—এ চলবে না। কথাটা সে বলবার সময় দু-তিনবার পাখীর দিকে চেয়ে কথা বলেছে। বলুক।

নিমতেলে পানু—ওই লিকলিকে চেহারা, ধূর্ত চাউনি-ভরা চোখ—ওই দুষ্টটাই সর্বাগ্রে সমর্থন করেছে বনওয়ারীকে। যত নষ্টের মূলে হ'ল ওই। করালীর নামে ওই সাতখানা ক'রে লাগিয়েছে। সেদিন চন্ননপুরে সাপটা নিয়ে যাবার সময় কি সব কথা করালী বলেছিল, তা-ই একটাকে সাতখানা ক'রে লাগিয়েছে। ওই নষ্টই তুলেছিল পাখীর কথা।

ফুট কেটে বলেছে—বসন আর পাখীকে শুধাও কথা। তাঁরা তোমার কথা মানবে তো করালীর উঠানে পাখীর যে ফাঁদ পাতা আছে। হি-হি ক'রে সে হেসেছে।

পাখী পাখা ঝাপটে নখ-ঠোঁট মেলে আক্রমণ করত পানুকে, কিন্তু তার আগেই বসন্ত তাকে থামিয়ে দিয়েছে। পাখীর ওই একটা দুর্বলতা। মাকে সে দুঃখ দিতে পারে না। কি ক'রে দেবে ? মা তো তার শুধু মা নয়—তার পরাণের সখী। এমন মা কারও নাই। পাখী অকপটে বলে সকল কথা তার মাকে। বসন কখনও মেয়েকে তিরস্কার করে না। সে তার চুল বেঁধে মুখ মুছিয়ে দেয়। ঠাট্টা ক'রে বলে—ভাল হয়েছে কি না করালীকে শুধাস। এই মায়ের অপমান সে করতে পারে, না তাকে দুঃখ দিতে পারে ?

সে জানে, করালীর ঘরে সে গেলে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তার মা বসনকে সবাই বিঁধে মারবে। সেই ভয়েই এতদিন সে কিছু করে নাই। তবে আজ আর নয়। আজই সে যাবে, আজ যেন মন বলছে, যেতেই হবে।

ওঃ ! কি আষাঢ়ে এক গল্প ফেঁদেছে দিদি-বুড়ী অর্থাৎ সুচাঁদ, তার আর শেষ নাই। টুকরো টুকরো ক'রে এই গল্প—এই আঠারো বছর বয়সের গোটা জীবনটাই শুনে আসছে পাখী। অরুচি ধরেছে তার ওই গল্পে, বিশেষ ক'রে আজ এই মুহূর্তে।

হা-হা ক'রে হাসছে সুচাঁদ—সে হাসি আজ রাত্রে আর থামবেই না বোধ হয়। করালীর বাবার বাবা বন্যার সময় গাছের উপর জন্মেছিল, সেই নিয়ে বুড়ী হাসছে। তা নিয়ে এত হাসি কিসের ? বুড়ী ডাইনী ডাকিনী, করালীকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

সেজন্য কিন্তু হাসে নাই সুচাঁদ। বন্যার দুর্যোগে—গাছের ডালে জীবন বাঁচাতে মানুষ যখন বিব্রত, তখনও কিনা কাহার-কাহারনীর মন-মাতানো রঙের খেলা ! সেই কথা বলতে গিয়ে সুচাঁদ না হেসে পারে ! হায় হায় রে ! কাহার-কুলের মনে রঙের খেলার বিরাম নাই। কি মনই তাদের দিয়েছিল বাবাঠাকুর ! বলতে বলতে হাতজোড় ক'রে প্রণাম করে সুচাঁদ। গাছের ডালে ব'সে মানুষ অনাহারে রয়েছে, শীতে কাঁপছে, হু-হু করে বাদলের বাতাস বইছে, নিচে পাখার বান, কোপাইয়ের বুকে গোঁ-গোঁ করে ডাক উঠেছে, সেই সময়ে কিনা ওই নিমতেলে পানুর ঠাকুরদাদার বাবার তৃতীয় পক্ষের পরিবার রঙ লাগালে আটপৌরেদের পরমের কত্তাবাবার সঙ্গে ! ওরা ছিল এক গাছে, এরা ছিল এক গাছে। চোখে চোখে কি খেল হ'ল, কখন হ'ল দু'জনার, কে জানে ! সেই দুর্যো[illegible] কে-ই বা উদিকে মন দেয় ! পরমের কত্তাবাবার তখন ছোকরা বয়েস ; তার উপর কুঠীর সাহেবদের আটপৌরে ; খাতির যত, হাঁক-ডাক তত। আর ছুঁড়ীরও তখন অল্প বয়েস, বুড়ো স্বামী—ইংলি-বিংলি সতীনপোর ঝাঁক, সে থাকবে কেনে তার ঘরে ? এমনিতেই থাকত না। আশ্চর্যের কথা মা, তার দুদিন তর সইল না, ওই গাছের উপর ব'সেই চোখে চোখে অণ্ড খেললে ! ভোরবেলা সবাই ঢুলছে ; শব্দ উঠল—ঝপ। বাস্। কেবল বনওয়ারীর কত্তামা—ছেলের 'শোগে' ঘুমোয় নাই সে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই জাগল—দেখ্ দেখ্, কে পড়ল। নিমতেলে বুড়ো কেঁদে উঠল—ও মাতব্বর, আমার বউ পড়েছে। পড়েছে তো পড়েছে, যে গেল সে যাক। কি করবি বল ? আর করবেই বা কি ? বুড়ো কাঁদতে লাগল। ওমা ! সকাল হ'লে লোক দেখলে, আটপৌরেদের গাছে পরমের কত্তাবাবার ডালে ব'সে আছে সে মেয়ে।

আবার হাসতে লাগল সুচাঁদ।

রতনের স্ত্রী বললে—তা হ'লে মজার 'মনন্তরা' বল?

সুচাঁদ এক মুহূর্তে হাসি থামিয়ে মদের নেশায় লাল চোখ বিস্ফারিত ক'রে মুখ তুলে চাইলে, মাঝ উঠানে জ্বলছিল যে কাঠের পাতার ধুনিটা তার ছটা পড়ল মুখে ; হাঁড়ির মত বুড়ীর মুখখানা কেমন হয়ে উঠেছে যেন। সে বললে—মজা! হ্যাঁ, সে মজা যেন আর কখনও না হয়। মজা হ'ল তা'পরেতে। বান নেমে গেল। ভিজে দেয়াল 'ওদ' আর বাতাস পেয়ে দুড়দাড় ক'রে ধসতে লাগল। গাঁয়ের মাটি ভিজে সপসপ করছে, চার আঙ্গুল ক'রে পলি পড়েছে, দাঁড়াবার থান নাই। গরু মরেছে, বাছুর মরেছে, ছাগল মরেছে, শুয়োর মরেছে, মানুষ মরেছে ; চারিদিকে পচা দুগ্‌গন্ধ ; ধান চাল ভেসে গিয়েছে, কাঁথা-কানি ভিজে ডবডব করছে। কুঠীর সায়েবের চাকর বেয়ারারা ছিল, সাহেব মেম মরেছে, কুঠী ভেসে গিয়েছে। কে গুরু, কে গোঁসাই তার ঠিকানা নাই। মুনিব নাই। মুনিব নাই, 'অক্ষে' করবে কে? আগের কালে বান আসত, কাহারপাড়া ডুবত, সায়েব্‌রা ছিল—তারা বড় বড় তক্তা বেঁধে ভেলা ক'রে কাহারদের নিয়ে যেত কুঠীবাড়িতে। চাল দিত, ডাল দিত, হুকুম দিত—খিচুড়ি রাঁধ, খাও। ঘর ভাঙলে ঘরের খরচ দিত, খোরাক দিত। কাহারেরা ছিল পাহাড়ের আড়ালে। ঝড় আসুক, ঝাপ্‌টা আসুক, বান আসুক, কাহারদের ভাবনা ছিল না। আর এবার কাহারদের পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল। সায়েব ম'ল, মেম ম'ল, কুঠী বিকিয়ে গেল। তার ওপর সেবার সে কি 'ওগ'। সে এক মহামারণ। জ্বরজ্বালা, প্যাটের ব্যামো ; কে কার মুখে জল দেয়—এমুনি হাল। দু-তিন ঘর 'নিব্যনেদ' হয়ে গেল। তখন সব যে যার পরাণ নিয়ে পালাতে আরম্ভ করলে। কেউ গেল কুটুমবাড়ি, কেউ গেল ভিখ করতে হেথা-হোথা। বিদেশ-বিভূঁয়ে কত জনা যে ম'ল তার ঠিকানা নাই। তা'পর দেশ ঘাট শুকুলো, মা দশভূজার পুজোর সময় যারা বেঁচে ছিল একে একে ফিরল গাঁয়ে। ফিরল যদি তো—সে আর এক বেপদ। সে বেপদের কাছে বানের বেপদ কোথা লাগে! সায়েবদের কুঠী উঠে যেয়েছে, বেবাক জমিদারী 'হকহুকুক' কিনেছে চৌধুরী। সেই যে যখের ধন দিয়েছিলেন কত্তা, সেই টাকায় সাহেবদের সব কিছু কিনেছে তখন চৌধুরী। ঘর নাই, দুয়োর নাই, 'আশ্চয়' নাই, চাকরি নাই, কাহারেরা এসে 'অতান্তরে' পড়ল, চোখে পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল। কি হবে? কোথা যাবে? কে চাকরি দেবে?

সায়েবদের আমলে দুখানা পাল্কি, কুঠীতে চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতে হ'ত, ষোলো জন বেহারা মোতায়েন থাকত। সায়েবরা ফি বেহারাকে জমি দিয়েছিল দশ বিঘে ক'রে আর বাস্তুভিটে। জমি চাষ কর, খাও দাও, আর সায়েব-মেমকে নিয়ে সাওয়ারী কাঁধে বেড়াও। তার ওপর 'বকশিশ' ছিল, হেথা হোথা বিয়ে-সাদীর বায়না ছিল। আরও ছিল তোমার নীলের চাষ। তাও সবাই খানিক-আধেক দুবিঘে পাঁচবিঘে করত। তা'পরে তোমার সায়েবদের যখন দাঙ্গা হ'ত—এই ধর কোন 'ভদ্দ-শুদ্দুরের' জমির ধান ভেঙে নীল বুনতে হ'ত, কি পাকা ধান কেটে নিতে হ'ত, তখন কাহারেরা ছিল সায়েব মশায়দের ডান হাত। সায়েবদের লেঠেল যেত, ওই আটপৌরেরাও লেঠেলদের সঙ্গে লাঠি নিয়ে যেত। তারা পাহারা দিত, আর বেহারা-কাহারেরা হাল গরু নিয়ে দিত পোঁতা জমি ভেঙে, চ'ষে-ম'ষে তছনছ ক'রে নীল বুনে দিত, পাকা ধান হ'লে কেটে-মেটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলে নিয়ে চ'লে

আসত বাড়ি। ধান যে যা আনত সে তো পেতই, তার ওপর ছিল লগদ লগদ 'বশকিশ'। সে ছিল কাহারদের সোনার আমল। সায়েবরা গেল, কাহারদের কপাল ভাঙল। চোখে অন্ধকার দেখবে না কাহারেরা? আমলই পালটিয়ে গেল। চৌধুরী বেবাক চাকরান জমি খাস করে নিয়েছে এখন। বললে—আমার তো পাল্কি বইতে হবে না বারো মাস, বেহারাদের চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতেও হবে না—চাকরান জমি আমি দোব কেনে? কেড়ে নিলে মা জমি। জমি বাড়ি ঘর সব গেল। অন্ধকার, তিভুবন অন্ধকার মা। বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল কাহারেরা। আমার মা বলত, তখন আমার মা ভরাভরতি সোমত্ত মেয়ে; তার এক বছর পরে আমি প্যাটে হই। মা বলত—কাহারেরা বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল, সে কান্নায় পুজো-বাড়ির ঢাকের বাদ্যি ঢাকা প'ড়ে যেয়েছিল। যে প্যাটের জ্বালায় গাঁ ছেড়ে দিয়ে ভিখ মাগতে গিয়েছিল কাহাররা, কুটুমবাড়িতে 'নেনো' হয়ে ছিল এতদিন মা, সেই প্যাটের জ্বালা পাসরণ হয়ে গেল। হাঁড়ি চড়ালে না; 'আন্না-বান্না' দূরে থাক, পুজো-বাড়ির পেসাদ—সেও কেউ মাগতে গেল না। তা'পরে হ'ল কি মা, শেষকালে 'নউমী' পুজোর দিনে সে এক অবাক কাণ্ড। হঠাৎ চৌধুরী বললে—যা, ভিটেগুলো তোদের ছেড়ে দিলাম, ভিটে থেকে তোদের বাস তুলে দোব না, সে বজায় রাখলাম। ওই চাকরানটুকু রইল, কালে-কস্মিনে পাল্কির দরকার হ'লে বইতে হবে। তবে জমি পাবি না। হ্যাঁ, কৃষাণি মান্দেরী কর—থাক। কাহাররা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পিতিপুরুষদের ভিটে থাকল 'মনন্তরায়', এই ভাগ্যি। চৌধুরীকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ ক'রে বিজয়া দশমী থেকে ঘর তুলতে লাগল সব প'ড়ো ভিটেয়। সেও ওই কত্তামশায়ের দয়া। চৌধুরীকে তিনি স্বপন দিয়ে দিয়েছিলেন অষ্টমির 'আতে'—মানুষকে ভিটেছাড়া করতে নাই, কাহারদিগে তুলে দিলে আমার 'ওষ' হবে তোর ওপর। তাতেই 'নউমির' দিন সকালে উঠে চৌধুরী ভিটে ছেড়ে দিলে।

থামল সুচাঁদ। সমস্ত মজলিসটা হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শুনে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মত ব'সে আছে, মদের নেশায় আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে সেকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথার মধ্যে নেশার স্রোত ছুটছে কোপাইয়ের হড়পা বানের মত। সেই বানের উপর কল্প[illegible]। সেকালের নৌকো ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে চৌধুরী-বাড়িতে ভেসে আসা সেই যক্ষের নৌকোর মত। পঞ্চ-শব্দের বাজনা বাজিয়ে আলোঝলমল হয়ে যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে নড়ছে। সব ভাম হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ ঢুলছে, কার যেন নাক ডাকছে। শব্দ উঠেছে নানা রকমের, হাসি আসে শুনে।

বসন বড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে, সে মদও কম খেয়েছে—মৃদু হেসে রতনের স্ত্রী কুসুমকে বললে—মরণ, নাক ডাকছে কার লো?

কুসুমও চারিদিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কে লো, কার নাকে শুয়োর ঢুকল বটে? ঘোঁত ঘোঁত করছে কে লো?

সুচাঁদ ওদের মুখ নড়া দেখতে পেয়ে মুখটা এগিয়ে এনে প্রশ্ন করলে—অ্যাঁ?

পাখী এবারে উঠে পড়ল বিরক্ত হয়ে। নাঃ, এরা আর ঘুমোবে না। ওদিকে করালীর ঘরেও মজলিসে তেহাই পড়বে না। সে উঠে মাকে বললে—আমি শুতে চললাম মা।

—খেয়ে শুবি। আর খানিক ব'স।

—না।

কুসুম চিমটি কাটলে বসনের পায়ে। কুসুম বসন্তের সখী, সে সবই জানে ভিতরের কথা। বসন্ত একটু হেসে বললে—যা তাই। ঘুমোস না যেন।

সুচাঁদ একটু বিরক্ত হয়ে বললে—কি বলছিস লো, অ্যাঁ?

চীৎকার করে বসন্ত বললে—পাখী শুতে চলল। তাই বলি—ঘুমোস না যেন।

সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দু'হাত নেড়ে একটা ছড়া কেটে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা জোর হাঁক জেগে উঠল কোথা থেকে। হাঁসুলী বাঁকের অন্ধকার চমকে উঠে সতর্ক হ'ল; ওঃ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে। সুচাঁদও চমকে উঠেছিল—পাখীকে কথাটা তার বলা হল না, তার বদলে বিস্মিত হয়ে বললে—ও মা গো! থানাদার হাঁক দিচ্ছে? ইয়ের মধ্যে? বলি হা বসন, ট্যান পুল পেরিয়ে গেল কখন? কই, বাদ্যির মত শব্দ তো ওঠে নাই?

সত্যই ট্রেন যাওয়ার শব্দ এখনও ওঠে নাই।

পাখী যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ব'লে গেল—মদ খেয়ে মেতে আনন্দের আর সীমে নাই। আজ অবিবার মনে আছে? আজ সেই ভোরবেলাতে গাড়ি।

তাই বটে, সে কথা কারও খেয়াল নাই। রবিবার সন্ধ্যায় ট্রেন যায় না, যায় ভোররাত্রে।

—কি?

—আজ 'অবিবার'।

—হ্যাঁ, মনে পড়ল সুচাঁদের। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে বললে—তা শ্যাল ডেকেছে পহরের? শুনেছিস?

—কই, না। যে গল্প তুমি বলছিলে!

ঠিক এই সময়েই খানিকটা দূরে শোনা গেল কার খুব গম্ভীর গলার আওয়াজ—পরম। পরম। পরম আটপৌরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরালো টর্চের আলোর লম্বা ফালিতে আটপৌরে-পাড়ার অন্ধকার চিরে ফেললে। সকলে আশ্বস্ত হ'ল। না, রাত্রি বেশি হয় নাই। থানার বাবুরা কেউ এসেছে 'দাগী' দেখতে। মধ্যে মধ্যে সপ্তাহে একদিন ক'রে আসে থানার বাবুরা। ওরা এই সকালো সকালোই আসে। পরম আটপৌরে দাগী। এই জাঙলে সদ্‌গোপ বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল কয়েক বছর আগে। পরম ডাকাতির দলে অবশ্য ছিল না, কিন্তু শুলুক-সন্ধান সে-ই দিয়েছিল। মালও বেরিয়েছিল তার ঘরে। জেল হয়েছিল পরমের। পরম দাগী আসামী।

সকলেই ভাল হয়ে বসল। পুরুষদের মজলিসে গান বাজনা গোলমাল সংযত হ'ল। করালীর বাড়ির মজলিসের বাজনা একেবারে থেমে গেল। থানার বাবু এ পাড়া পানেও আসবে একবার। আটপৌরে পাড়ায় এলে এ পাড়াও ঘুরে যায়। এ পাড়ার দাগী এখন কেউ নাই, কিন্তু এককালে ছিল। এককালে কাহারপাড়ার সকলেই দাগী ছিল বললেই সত্য কথা বলা হবে। সে কারণেও বটে, তা ছাড়া—'অজ্ঞান' জাত, কার কখন মতিভ্রম হয় কে বলতে পারে? তাই বোধ হয় বাবুরা দেখে যান। বনওয়ারী বলে—ওঁরা যে আসেন, তাতে আমি খুশি। নিজের চোখে দেখে যান আমাদের রীতকরণ, আর আমাদের মধ্যে

যারা মনে মনেও 'চুলবুল' করে তারাও জ্ঞান পাক, 'সতর' হোক, মনকে সামাল দিক।

এই যে করালীর মত বেহেট-বেতরিবৎ ছোকরা, এদের শাসন কি শুধু মাতব্বর থেকে হয়? বনওয়ারী ঠিক করে রেখেছে আজ বলবে—দারোগা হোক, ছোট দারোগা হোক, যে আসবে তাকেই বলবে করালীর কথা। রতনকে সে বললে—তোর সেই বড় 'কুকুড়ে'টা ঠ্যাঙে বেঁধে নিয়ে আয় দিনি।

বাবুরা যেদিন আসেন, সেই দিন কুকুড়ে অর্থাৎ মুরগী আর হাঁস—কিছু না হলে কয়েকটা ডিম কাহারেরা ভেট দিয়ে থাকে। আজ বড় মুরগী একটা দিতে হবে ঠিক করলে বনওয়ারী। রতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল। উপায় নাই, মাতব্বরের কথা, তা ছাড়া তার ছেলে লটা লচ্ছার করালীর দলে জুটেছে। লটা শাসনের বাইরে; বাপের সঙ্গে ভিন্নই হয়েছে তো শাসন। কিন্তু তবু তো তার বাপের পরাণ। কি জানি, কখন কুদৃষ্টিতে পড়বে বাবুদের। আগে থেকে একটু বলে রাখা ভাল।

বনওয়ারী হাঁকলে—শিগগির কর। বাবু আসছে।

নীলের বাঁধের উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর আলোর ছটা উঠে হেঁড়ে তালগাছটার মাথায় গিয়ে পড়েছে। দুটো প্যাঁচা ছটা পেয়ে ক্যাঁ-চ ক্যাঁ-চ শব্দ ক'রে উড়ে গেল। বাবু মাঠ থেকে পাড়ের উপর উঠছেন। জুতোর শব্দ বাজছে পাষাণের মত কঠিন মাটিতে। এইবার সামনাসামনি আসছে টর্চের আলো। বাবু এসে পড়েছেন।

বাবু এসে দাঁড়ালেন। প্রণাম করলে সব। নিমতেলে পানু ছুটে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এল। বাবু বসেন না ওটাতে, পা দিয়ে দাঁড়ান। বাবু হেসে বললেন—কি রে, আজ যে খুব ধুম দেখি।

নতির স্বীকৃতি জানিয়ে বনওয়ারী একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে বাঁ হাতের আড়াল দিয়ে জবাব দিলে—পাছে মুখের 'আব' অথবা গন্ধ গিয়ে লাগে তাই সতর্কতা; বললে—আজ্ঞেন হুজুর, আজ কত্তার থানে পুজো দিলাম কিনা।

বাবু বললেন—আচ্ছা, ভাল।

রতন বড় মুরগীটা এনে নামিয়ে দিলে সামনে। টর্চের আলোটা সেটার উপর ফেলে বাবু খুশি হয়ে বললেন—বেশ বড় জাতের যে রে, অ্যাঁ?

—আজ্ঞেন হ্যাঁ। আজ কত্তার পুজো দিলাম; আপনাকে কি আর যা-তা 'দব্য' দিতে পারি?

—বেশ, বেশ। তা তোদের মধ্যে করালী কার নাম?

মনে মনে বিস্মিত হ'ল সকলে। বনওয়ারী চকিতে অনুভব করলে বাবাঠাকুরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য। ওঃ। এরই মধ্যে করালীর বদ রীতি-চরিত্রের কথা দারোগাকে তিনি জানিয়েছেন। মনে মনে বাবাকে প্রণাম ক'রে বনওয়ারী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোঁড়াটা বড়ই আজ্ঞেন—বেজায় আজ্ঞেন—

করালীকে অভিযুক্ত করার মত বিশেষণ খুঁজে পেলে না বনওয়ারী।

কিন্তু দারোগা বললেন উল্টো কথা—হ্যাঁ, বাহাদুর ছোকরা। ছোকরাকে পাঠিয়ে দিবি থানায়। বকশিশ পাবে কিছু। গোটা পাঁচেক টাকা পাবে।

—বকশিশ পাবে ?

—হ্যাঁ। আমরা শিসের কথা ডায়েরি করেছিলাম, ওপরেও গিয়েছিল খবর। এখন যখন সাপটাই শিস দিচ্ছিল, আর সেই সাপ ওই ছোকরা মেরেছে—সে খবরও পাঠিয়েছি। পাঁচ টাকা বকশিশও পাবে।

বাবু চ'লে গেলেন। মুরগীটা নিয়ে গেল চৌকিদার।

কাহারপাড়াটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদের বিস্মিত মনের দৃষ্টির সামনে করালী যেন নতুন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে হাসছে। গোলালো বুক ফুলে উঠেছে. গালে টোল খেয়েছে, সুন্দর মিষ্টি হাসিতে সুন্দর সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিক করছে।

মেয়েদের মজলিসে হঠাৎ গোল উঠল।

করালীর বকশিশের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল. হঠাৎ তাদের সুমুখ দিয়ে কে ছুটে পালিয়ে গেল।

হাতের চুড়ি রিনরিন শব্দে বেজে উঠল।

—কে ? কে ?

—পাখী। পাখী। একজন জবাব দিলে—পাখী ছুটে চ'লে গেল।

—পাখী। পাখী। ও পাখী।—বসন্ত ডাকলে তারস্বরে।

পাখী শুতে যাবার জন্য উঠছিল, এই সময়েই এলেন ছোট দারোগা। সে দরজার মুখে ঢুকছিল, ছোট দারোগা করালীর নাম করতেই থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা শুনে সেও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে মজলিসকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সাদা কাপড়ের দোলায় বাতাসে খানিকটা ঝলক তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বসন্ত ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এল—পাখী শোন। পাখী।

দূর অন্ধকারের ভিতর থেকে জবাব এল—না, আমি চললাম।

পাখী বললে—যার ওপর আমার মন পড়েছে. আমি তারই ঘরে চললাম।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তুফান বানে ঝোঁপ খেয়ে যুবতী বউ পালায় যার উপরে মন পড়ে তার কাছে, তার গাছের উপরে তার পাতা সংসারেই গিয়ে উঠে বসে। পাখীর মা বসন্ত যৌবনে নিত্য রাত্রে বেশভূষা ক'রে একাই চ'লে যেত চৌধুরীবাবুদের গাঁয়ের ধারের বাগানে, কোনদিন ফিরত গভীর রাত্রে, কোনদিন ভোরবেলা। পাখীও আজ চ'লে গেল ছুটে করালীর বাড়ি।

এর পর আসছে একটা কুৎসিত ঝগড়ার পালা। তারপর হয়তো লাঠি—মারপিট—মাথা ফাটাফাটি। করালী তো হটবার পাত্র নয়।

ঝগড়ার পালাটা জমিয়ে তুললে সুচাঁদ। কর্কশ কণ্ঠে উচ্চ কণ্ঠে সে গালি-গালাজ আরম্ভ করলে। করালীর নিজের মা বোন কি কোন স্ত্রীলোক আত্মীয়া নাই। কিন্তু নসুদিদি আছে। নসুদিদি এতক্ষণ নাচছিল, পায়ে নূপুর বেঁধেই সে বেরিয়ে এল ঝগড়া করতে। মেয়েদের মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে, অঙ্গ দুলিয়ে সুচাঁদের সঙ্গে সমান জোরাল ভাষায় ঝগড়া জুড়ে দিল।

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে নিমতেলে পানু। হঠাৎ সকলে চমকে উঠল। একটা কঙ্কালসার মানুষ টলতে টলতে এসে দাঁড়িয়েছে মজলিসের সামনে। এখনও টলছে। কে? কে?—ও, নয়ান এসেছে। হেঁপো রোগী নয়ান। ওই নয়ানের সঙ্গেই ছেলেবেলায় পাখীর বিয়ে হয়েছিল। তখন অবশ্য নয়ান হাঁপানীর রোগী ছিল না, এবং নয়ান তখন ছিল পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাল পাত্র। নয়ানের ঠাকুরদাদা ছিল সে আমলে কাহারপাড়ার মাতব্বর। সেই আমল থেকেই চৌধুরী-বাড়ির ভাগজোতদার নয়ানেরা। দু'বিঘা নিজের জমিও আছে নয়ানের। সেই সব দেখেই বিয়ে দিয়েছিল সুচাঁদ। হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে নয়ান ঘায়েল হয়ে গেল প্রথম যৌবনেই। সারল, কিন্তু হাঁপানী ধরে গেল। পাখী বলে--যে গন্ধ ওর 'নিশেষে' আর যে বুকের ডাক। সে সহ্য করতে পারে না, তার ভয় লাগে। সে কিছুতেই যাবে না ওর বাড়ি। আজ দু'বৎসর ধরেই এই বিরহের পালা চ'লছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় নাই। আজ হয়ে গেল। মৃতপ্রায় নয়ান এমন ক্ষেত্রে না বেরিয়ে পারলে না। টলতে টলতে এসে ব'সে পড়ল, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে চাপড় মেরে বনওয়ারীকে বললে—তুমি এর বিচার কর। বিচার কর তুমি।

কিন্তু বনওয়ারী ব'সে রইল মাটির পুতুলের মত। সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। করালী এবং পাখীর ঘটনায় তার বার বার মনে পড়ছে সন্ধ্যার কথা; মনে পড়ছে কালোশশীকে। সে উৎসাহ পাচ্ছে না। সে যেন মাথা তুলছে পারছে না।

নয়ান কান্নায় চীৎকার করে উঠল—মাতব্বর।

বনওয়ারী হতভম্বের মত বললে—কি বলব?

রতন বললে—না না। এ ভারি অন্যায়। তুমি চুপ করে থাকলে হবে না বনওয়ারী। গাঁ সুদ্ধ ছেলে মাটি হ'ল ওই হারামজাদার সঙ্গে জুটে।

বনওয়ারী তবু স্তব্ধ।

ওদিকে হঠাৎ মেয়েদের ঝগড়ার আসরের সুর পালটে গেল। অকস্মাৎ সুচাঁদ আর্তনাদ ক'রে উঠল মর্মান্তিক আর্তনাদ। কি হ'ল? নসু মারলে নাকি ধ'রে? প্রহ্লাদ, রতন, নিমতেলে পানু ছুটে গেল। কি হ'ল?

সুচাঁদ আর্তনাদ করে লাফাচ্ছে। মুখে একটা ভয়ার্ত শব্দ শুধু। চোখের দৃষ্টিতে বিভীষিকার ছায়া। সে যেন মৃত্যুকে দেখছে চোখের সম্মুখে।

বুঝতে বাকি রইল না কারও কিছু।

ব্যাঙ দেখেছে সুচাঁদ। ব্যাঙকে সুচাঁদ মৃত্যুদূতের মত ভয় করে। ব্যাপারটা ঘটেছে এই—

সুচাঁদ প্রচণ্ড চীৎকারে গালিগালাজ করছিল। করালী হঠাৎ এসে শাসিয়ে তাকে বলে—চুপ কর, নইলে দোব ছেড়ে।

অর্থাৎ ব্যাঙ ছেড়ে দেবে।

সুচাঁদ মানে নাই সে কথা। ব্যাঙ যে কেউ তার গায়ে ছেড়ে দিতে পারে—এ তার ধারণার অতীত ছিল। চন্ননপুরে বাবুদের ছেলেরা কখনও কখনও এমন ঠাট্টা করে; কিন্তু এ গাঁয়ে এমন সাহসই বা কার, এমন হৃদয়হীনই বা কে? করালীর যে সেই সাহস সেই হৃদয়হীনতা আছে, তা সে জানত না। কিন্তু করালী সত্যিই একটা ব্যাঙ ধ'রে এনেছিল।

সুচাঁদ ক্ষান্ত হ'ল না দেখে সেটাকে সে তার উপর ছুঁড়ে দিয়ে নসুকে টেনে নিয়ে বাড়ি চ'লে গিয়েছে।

পাখী খিলখিল ক'রে হাসছে করালীর বাড়িতে।

এদিকে বসন্ত দুই হাতে জাপটে ধরেছে মাকে। সুচাঁদ তবু লাফাচ্ছে। মেয়েরা সব মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে। প্রহ্লাদ ব্যাঙটা ফেলে দিয়ে এক বাটি মদ এনে সুচাঁদের মুখের কাছে ধরলে।—খাও পিসী। চোখ বন্ধ ক'রে তৃষ্ণার্তের মত পান ক'রে নিলে সুচাঁদ, তারপর বুকে হাত দিয়ে প্রহ্লাদের কোলের মধ্যেই নিজেকে এলিয়ে দিল।—আঃ—আঃ। তারপর হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

প্রহ্লাদ বললে—ভয় নাই, ফেলে দিয়েছি, ফেলে দিয়েছি ব্যাঙ।

ওদিকে করালী পাখীকে নিয়ে তখন বেরিয়ে পড়েছে বাঁশবাঁদি থেকে। এই রাত্রির অন্ধকারেই তারা যাবে চন্ননপুরে। নসুদিদিও চলল। বনওয়ারীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে কাহারপাড়ার সকলকে বিরোধী ক'রে থাকতে তার সাহস হ'ল না।

দূরে রেল-লাইনের উপর সিগনালের লাল আলো জ্বলছে। ওই চন্ননপুর। করালীর দুর্গ ওইখানে। ওখানে যেতে কাহারদের সাহস নাই। নসুবালা হঠাৎ গান ধরলে। করালী ধমক দিয়ে বললে—চুপ কর। সে ভাবতে ভাবতে চলছে, কেমন ক'রে এর শোধ তুলবে সে। শোধ তাকে তুলতেই হবে।

ওদিকে বনওয়ারী ভয়ঙ্কর মূর্তিতে করালীর বাড়িতে এসে দেখলে, করালী নেই বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

কয়েক দিন পর।

হাঁসুলী বাঁকে পৃথিবীর সঙ্গেই যথানিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। সেখানে ব্যতিক্রম নেই। গাছে গাছে পাখী ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা থেকে, বনশিরীষ নিম আম জাম কাঁঠাল শিরীষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপটাপ ক'রে শিশিরবিন্দু ঝ'রে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুলই ফোটে। পূর্ব দিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে—কোপাইয়ের ওপারের গ্রামে গোপগ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে। কিন্তু কাহারেরা জাগে সূর্য ওঠার অনেক আগে। পূর্বের আকাশে তখন শুধু আলোর আমেজ লাগে মাত্র, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা জ্বলজ্বল করে। কাহাররা ওঠে সেই সকালে। আপন আপন প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে মেয়েরা ঘরে দোরে জল দেয়, মাডুলি দেয়, সামান্য যে বাসন কয়েকখানি রাত্রে উচ্ছিষ্ট হয়ে থাকে—সেগুলি মাজে। গরু ছাগল বার করে তাদের জায়গায় বাঁধে।

হাঁসগুলিকে ছেড়ে দেয়, কলরব ক'রে তারা ছুটে গিয়ে নামে নীলের বাঁধের জলে, নেমেই ছুটে আসে ঘাটে, এঁটো বাসনের খাদ্যকণাগুলো মুখ ডুবিয়ে খুঁজে খুঁজে খায়। মুরগীগুলোকে ছেড়ে দেয়, তারা ছুটে যায় আঁস্তাকুড়ে, সারের গাদায়। পুরুষেরা প্রাতঃকৃত্য সেরে এই সকালেই ঘরে দোরে যে মাটির কাজগুলি থাকে, কোদাল নিয়ে সেই কাজগুলি সেরে ফেলে। পাষাণের মত মাটি—মেয়ে-পুরুষে আগের দিন সন্ধ্যায় কলসীতে ভ'রে জল তুলে ভিজিয়ে রাখে, সকালে কাহার মুনিষ তার উপর কোদাল চালায়। মাটির কাজ কিছু-না-কিছু থাকেই। পুরানো দেওয়াল মেরামত চলতে থাকে ধীরে-সুস্থে। নূতন ঘর যদি কেউ করে, তার কাজ চলে দীর্ঘদিন ধ'রে।—কিছু না থাকলে বাড়ির ধারে শাক-পাতার ছোট ছোট ক্ষেত কোপায় তারা। বাড়ির গাছা পেটের বাছার মতই গেরস্থের সহায়। গোটা শীতকালে এই ধারা।

এই সব সেরে তারপর কাহারেরা কাজে বার হয়।

সুচাঁদ ভোরে ওঠে। ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করতে করতে তারস্বরে গাল দিচ্ছে। আজ আর তার ভাষা অশ্লীল নয়, মর্মান্তিক অভিশাপ-তীক্ষ্ণ, এবং সে অভিশাপের মধ্যে দুঃখ লাঞ্ছনা, নির্যাতন নিপুণ বিধানের মত স্তরে স্তরে শৃংখলাবদ্ধভাবে সাজানো।

—যে 'অক্তের' 'তাপে' এমন বাড় হয়েছে, সে অক্ত জল হয়ে যাবেন তোমার। 'গিহিনী' 'ওগ' হবে, 'ছেরউগী' হয়ে প'চে থাকবে, ওই পাথরের মত ছাতি ধসে যাবে, হাড় পাঁজর ঝুরঝুর করবে। যে গলার ত্যাজে হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ফিরছ, সেই গলা তোমার নাকী হয়ে পাখীর গলার মত চিঁ-চিঁ করবে। যে হাতে তুমি আমাকে ব্যাও দিয়েছ, যে হাতে তুমি বাঁশবনে আগুন লাগিয়ে মা মনসার বিটীকে পুড়িয়ে মেরেছ, সেই হাতদুটি তোমার প'ড়ে যাবে, কাঠের মত শুকিয়ে যাবে। দ্যাবতাকে যদি আমি পুজো ক'রে থাকি, অতিথকে যদি আমি সেবা ক'রে থাকি, তবে আমার কথা ফলবে—ফলবে—ফলবে। হে বাবা কত্তা, হে মা মনসা, হে বাবা ভাণ্ডলের 'কালারুদ্দু', হে মা চন্নপুরের চণ্ডী, হে মা বাকুলের বুড়ীকালী, হে বাবা বেলের ধম্মরাজ, তোমরা এর বিচার ক'রো—বিচার ক'রো।

বোধ করি হঠাৎ সুচাঁদের মনে প'ড়ে গেল চোখের কথা—চোখ নিয়ে তো কোন অভিশাপ দেওয়া হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিয়ে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করলে। ওই যে তোমার ড্যাবা চোখ, ওই চোখ তুমি হারিও। দিন 'আত' জল ঝ'রে ঝ'রে ছানি পড়ুক। কানা হ'য়ো তুমি, কানা হ'য়ো তুমি—কানা হ'য়ো। ওই ড্যাবা চোখ তোমার, 'আঙা' 'অক্তের' ডেলার মতন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে 'বিভীমকার' হয়ে যায় যেন।

এটি একটি বিশেষত্ব হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ার। ঝগড় হ'লে সে ব'ন্দা একদিনে মেটে না। দিনের পর দিন তার জের চলতে থাকে এবং প্রাতঃকালে উঠেই এই গালিগালাজের জেরটি টেনে তারা শুরু ক'রে রাখে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে থামে। আবার জিরিয়ে নিয়ে অবসর-সময়ে নিজের ঘরের সীমানায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষ পক্ষের বাড়ির দিকে মুখ ক'রে এক-এক দফা গালিগালাজ করে। এবং কাহারদের ঝগড়ায় এই গালিগালাজের এই বাঁধুনিটি পুরুষানুক্রমে চ'লে আসছে,—একে কলহ-সংস্কৃতি বলা চলে। তবে সাধকভেদে মন্ত্রের সিদ্ধি—এই সত্য অনুযায়ী সুচাঁদ এই বৃদ্ধ বয়সেও সর্বশ্রেষ্ঠা। ওদিকে আরও একজন গাল

দিচ্ছে করালীকে—সে হ'ল নয়ানের মা। সে গাল দিচ্ছে করালীকে একা নয়, পাখীকেও শাপশাপান্ত করছে।

হাঁপানীর রোগী নয়ান উঠে ব'সে কাশছে আর হাঁপাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বুকের উপর ধর্মরাজের এক মোটা মাদুলি—হাঁপানীর আক্ষেপে চামড়া-ঢাকা পাঁজরার সঙ্গে সঙ্গে উঠছে আর নামছে। তার বাড়ির সামনেই একই উঠানের ওদিকে রতনের বাড়ি। রতন কোদাল চালানো শেষ ক'রে ব'সে হুঁকো টানছিল আর গালাগালি শুনছিল।

হাঁপানীটা একটু থামতেই নয়ান দাওয়ার বাঁশের খুঁটিটা ধ'রে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টিতে তার অমানুষিক প্রখরতা ফুটে বেরুচ্ছে। এইসব দীর্ঘদিনের রোগীর চোখের রঙ বোধ হয় একটু বেশি সাদা হয়। নয়তো জীর্ণ দেহ এবং কালো রঙের জন্যই নয়ানের চোখ দুটো বেশি সাদা দেখাচ্ছে।

রতন বললে—উঠলি যে?

—হুঁ।

—কোথায় যাবি?

—যাব একবার মুরুব্বির কাছে।

—যেতে হবে না। ব'স।

—না। এর একটা হেস্তনেস্ত—

—মুরুব্বি বেরিয়ে যেয়েছে।

—বেরিয়ে যেয়েছে। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে রতনের দিকে, যেন অপরাধটা রতনের। নয়ান আবার প্রশ্ন করলে—এই 'সোমকালে' গেল কোন ভাগাড়ে? কেউ তো এখনও যায় নাই?

রতন বললে—মাইতো ঘোষ এই সকালের 'ট্যানেই' কোথায় যাবে; ঘোষেদের চাকর এয়েছিল, ভারী মোট আছে—নিয়ে যেতে হবে চন্নপুরের ইস্টিশান।

—তা হ'লে? হতাশ হয়ে পড়ল এবার নয়ান।

—তা হ'লে আর কি করবি? বাড়িতে ব'সে আগে জল গরম ক'রে আরসোলা 'সিজিয়ে' খা। হাঁপটা নরম পড়ুক।—হাজার হলেও রতনের বয়স হয়েছে, মাতব্বরের বয়সী, বন্ধুলোক; খোদ মাতব্বর না হলেও প্রবীণ। স্নেহবশেই সে উপদেশ দিলে।

নয়ানের মা বাসন মাজতে মাজতে গাল পাড়ছিল, সে হঠাৎ ছাইমাখা হাতে এগিয়ে এসে হাত দুটো রতনের মুখের কাছে নেড়ে বললে—তুমি তো মাতব্বরের ডান হাত। সলা-শুলুক-গুজগুজ তো খুব। বলি, মাতব্বরের এ কোন্ দিশী বিচার, এ কোন্ ঢঙের মাতব্বরি, শুনি? এ অন্যায়ে একটি কথাও বললে না তোমার মাতব্বর? বিচার করবার ভয়ে সকালে উঠে পালাল?

রতন বললে—তা আমি কি বলব? তোমরাই তাকে ব'লো।

—বলব বইকি, একশো বার বলব। ছাড়ব আমি? জমিদারের কাছে যাব, থানা-পুলিস করব।

—তা যা খুশি তুমি করতে পার। তবে সকালে উঠে বিচারের লেগে মাতব্বর ব'সে

থাকবে—এ তোমাদের ভাল 'নেকরা' বটে।

নয়ানের মা বলল—মাতব্বর তোমার খুব 'আঁতের' নোক—তুমি বল কেনে, শুনি।

বিরক্ত হয়ে রতন হুঁকাটি রেখে গামছাখানা টেনে গায়ে চাদরের মত ফেলে বেরিয়ে পড়ল। সূর্য উঠে পড়ছে গোপগ্রামের গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে। রোদ এসে বাঁশবাঁদির ঘরগুলির চালের উপর পড়েছে ; বনওয়ারীর সদ্য-ছাওয়া চালের নতুন খড়ের উপর যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে।

একা রতন নয়, গ্রামের পুরুষেরা সকলেই বেরিয়েছে—নীলের বাঁধের উত্তর পাড় থেকে সরু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নামছে জাঙলে যাবার মাঠে পথে।

মেয়েরাও সব এর পর বার হবে। সাতটার ট্রেন তাদের নিশানা।

হাঁসুলী বাঁকের এই জীবনই স্বাভাবিক জীবন। মন্থর গতিতে পায়ে-হাঁটা আলপথে পদাতিকের জীবন তাদের। কথাটার মধ্যে একবিন্দু অতিরঞ্জন নাই। হাঁসুলী বাঁকে গরুর গাড়ির পথ পর্যন্ত নাই। জাঙল গ্রাম পর্যন্ত গরুরগাড়ির পথ এসে শেষ হয়েছে। বহু আগে এগুলি ছিল চারণভূমিতে গরু নিয়ে আসবার পথ। 'নিয়ে আসবার' বলছি এই জন্য যে বহু প্রাচীন ভদ্র মহাশয়দের গ্রাম—ওই চন্দনপুর থেকে সেকালে গরু চরতে আসত এই হাঁসুলী বাঁকের চরে। জাঙল পর্যন্ত ছিল রাস্তা—গো-পথ, তারপরই ছিল হাঁসুলীর ঘেরের মধ্যে গোল পংক্তির মত চারণভূমি। তারপর নীলকুঠীর সাহেবেরা এসে ডাঙায় কুঠী ফাঁদলে, গো-চরভূমি ভেঙে জমি ক'রে সেচের পুকুর কাটিয়ে বাঁশবাঁদির মাঠে নীল-চাষ ও ধান-চাষের পত্তন করলে, এই পুকুরপাড়ে কাহারবসতি বসালে। যে পথে চন্দনপুরের গরুর পাল আসত, সে পথে গরু আসা বন্ধ হ'ল। ওই পথকে মেরামত ক'রে তার উপর চলতে লাগল নীলকুঠীর মালের গাড়ি এবং সাহেবদের পাল্কি ও ঘোড়া। চন্দনপুরের ভদ্র মহাশয়দের জাঙলের মাঠে জমিজেরাত আছে চিরকাল, তাঁদের গরুর পালের সঙ্গে গাড়ি যাতায়াত করত এই পথে মাঠের ধান ঘরে নিয়ে যেত, সেই গরুরগাড়ির যাতায়াত বজায় রইল শুধু। আজও সে পথে তাঁদের ধান-কলাই-গুড়-বোঝাই গাড়ি চলে। বাঁশবাঁদির কাহারদের পায়ে-চলা-পথের চেয়ে ভাল পথের দরকারও ছিল না কোন কালেই। তারা পায়ে হেঁটেই চলে, সে হিসাবে পদাতিক, কিন্তু সেকালে তারা পদাতিক ছাড়া আরও কিছু ছিল ; পেশা হিসাবে ছিল বাহক, কাঁধে পাল্কি নিয়ে সাহেব-মেমদের বইত, বর-কনে বইত। কখনও কখনও জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য বায়না আসত। সকলের আগে যে বেহারা থাকত, সে সুর ক'রে বলত সওয়ারীর ছড়া, অন্য সকলে সমস্বরে হাঁকত—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ চারিদিক সরগরম ক'রে তারা চলত দ্রুতবেগে। আজকাল তাদের এ পেশাটা ক্ষীণ হয়েছে। বিয়ে ছাড়া ওদের আর ডাক পড়ে না এই কর্মের জন্য। তবে বহনের কাজটা বজায় আছে, পাল্কি-বহা-কাঁধে ভার বয়। সে দেড় মণ বোঝা নিয়ে যায় দশ ক্রোশ পর্যন্ত। বিশ ক্রোশও যায়, তবে পথে এক রাত্রি বিশ্রাম করতে হয়। মাথায় বোঝা বইতে হয় আজকাল বেশি। বাহকত্ব ছাড়া চালকত্ব-গৌরবও আছে ; হালের বলদ চালায়, গরুর গাড়িও চালায়। সুতরাং সে গতি আরও মন্থর, তাই পায়ে-চলা-পথ ছাড়া অন্য পথের অভাব তারা অনুভব করে না।

পথ চলতে চলতে হুঁকো টানে, মধ্যে মধ্যে হাত বদল ক'রে গল্প হয়। এই মন্থর জীবনের গতানুগতিক কথাই হয় পরস্পরের মধ্যে। রোমন্থন বলা যায়। আজ কিন্তু সকলেই একটু উত্তেজিত। আজ কথা চলছে—গত কয়েক দিনের ঘটনার আলোচনা। তার মধ্যে বনওয়ারীর ব্যবহারের সমালোচনাই বেশি। বনওয়ারীর অন্যায় হয়েছে—এ কথা সকলেই একবাক্যে বলছে। নিমতেলে পানু বেশ গুছিয়ে এবং চিবিয়ে কথা বলতে পারে। সে-ই বলছিল—মাতব্বর যদি শাসন করতে 'তরাস' করে, তব দুষ্ট নোকে 'অল্যায়' করলে তার শাসন হবে কি ক'রে? 'আজা' হীনবল হ'লে 'আজ্য' নষ্ট। এতবড় 'অল্যায়ে' মুরুব্বি বাক্যিটি বার করলে না মুখ থেকে।

—'নিচ্চয়'। তবে চলুক এই করণ কাণ্ড: তোমার 'পরিজনকে' আমি টেনে নিয়ে যাই। আমার পরিজন গিয়ে উঠুক 'অন্‌নার' ঘরে।—কথাটা বললে প্রহ্লাদ।

রতন পিছন থেকে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—আমার নাম মাইরি ক'রো না বলছি। আমি কাল 'সব্বাগ্যে' মাতব্বরকে বলেছিলাম, এ 'অল্যায়' হচ্ছে মাতব্বর। তবে নিজের নিজের বউবিটি নিজে নিজে না সামলালে মাতব্বরই বা করবে কি? মাতব্বর পাহারা দিয়ে ব'সে থাকবে?

প্রহ্লাদ চীৎকার ক'রে উঠল—বলি হা শালো, মাতব্বর করালীকে শাসন করতে লারত?

সকলের পিছনে নীলের বাঁধের ঘাটের উপর থেকে চীৎকার ক'রে কেউ বললে—কার দশ হাত ল্যাজ গজালছে রে শুনি, করালীকে শাসন করবে তার নাম কি?

শব্দ লক্ষ্য ক'রে সকলে চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, বক্তা করালী নিজে।

নীলের বাঁধের উত্তর-পূর্ব কোণের পথটা বেয়ে ঘাটে করালী উঠছে। চন্দনপুর থেকে আসছে নিশ্চয়। সেই সেদিন রাত্রে পালিয়েছে পাখীকে নিয়ে, ফিরছে আজ সকালে। সম্ভবত কোন জিনিসপত্র নিতে এসেছে। দাঁড়িয়ে হাসছে। সঙ্গে তার পাখী ও নসুদিদি।

রতন প্রহ্লাদ পানু এবং অন্য সকলেই করালীর কথায় ফিরে দাঁড়াল।

তবু তাচ্ছিল্যভরে হাসছে করালী। পানু অন্য সকলকে বললে—দেখ সব, একবার ভাল ক'রে দেখ। পিতিকার করতে না পার, তোমার গলায় দঁড়ি দাও গা।

চীৎকার ক'রে উঠল প্রহ্লাদ—কিলিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে দোব গা।

করালী হা-হা ক'রে হেসে বললে—এস কেনে একা একা, কেমন মরদ দেখি।

পাড়ের উপর থেকে পানুদের দলের অনুসরণ ক'রে নেমে এল মাথলা এবং নটবর। ওদেরও গন্তব্যস্থল জাঙল, ওরাও সেখানে কৃষাণি করে।

রতন বললে—চল্ চল্। এখন আর পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের 'খিটকাল' করতে হবে না।

সে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চায়। করালীর দলে রতনের ছেলেও রয়েছে যে।

করালী কিন্তু অকুতোভয়, কারও ভয়ে সে চাপা দিয়ে রাখতে চায় না। সে চেঁচিয়েই ব'লে দিল—তোমাদের মাতব্বরকে দেখেছি সেদিন। তোমরাও দেখতে চাও তো এস।

ঘাড় নেড়ে ভুরু নাচিয়ে সে বললে—সেদিন একহাত মুরুব্বির সঙ্গে হয়ে যেয়েছে।

সকলের কাছে এ উক্তিটা একটা অসম্ভব সংবাদের মত। বনওয়ারী কোশকেঁধেদের

বংশের ছেলে, পাকা বাঁশের মত শক্ত মোটা হাড়ের কাঠামো তার। কাহারপাড়ায় কেন, কাহারপাড়া, আটপৌরেপাড়া জাঙল তিন জায়গায় তার মত জোরালো মুনিষ নাই; বনওয়ারী শক্ত মুঠোয় লাঙল ক'ষে টিপে ধরলে টানতে মাঝারি বলদের পিঠ ধনুকের মত বেঁকে যায়, ঘাড় লম্বা হয়ে যায়। তার সঙ্গে একহাত হয়ে গিয়েছে করালীর? বলে কি শয়তান ডাকাত? শুধু তাই নয়, শয়তানের কথার ভঙ্গির তাচ্ছিল্যের মধ্যে যে ফলাফলের ইঙ্গিত রয়েছে, সে কি কখনও হতে পারে—না হয়! কিন্তু সকলের মধ্যে মুখের সামনে জোরগলায় যে একটা স্পষ্ট সত্যের ঘোষণা রয়েছে তাও তো মিথ্যে ব'লে মনে হচ্ছে না। সকলে অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইলে।

করালীকিঙ্কর এতেও ক্ষান্ত হ'ল না; সে আরও একদফা হেসে নিয়ে বললে—তোদের মাতব্বর তো মাতব্বর, তোদের কত্তার বাহনকেই দেখে লিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে শাসন ক'রে পাখী বললে—আবার! আবার! আবার!

হি-হি ক'রে হাসতে লাগল করালী। নসুদিদি তো হেসে উলটে পড়ল। পাখীকে সে বললে—দে বুন, দে আরও ঘা-কতক দে। আমি লারলাম ওকে বাগ মানাতে—আমি লারলাম। তু দেখ বুন এইবার। গদাগদ কিল মারবি, আমি ব'লে দিলাম।

করালীর এই চর·· স্পর্ধিত উক্তিটি প্রত্যক্ষ সত্য। কত্তার বাহন অর্থাৎ ওই চন্দ্রবোড়া সাপটাকে মারার কথা তো সকলে চোখে দেখেছে। কিন্তু সে কথাটাকে এমন স্পর্ধায় শাণিত ক'রে বলায় সকলে আশ্চর্যরকম সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

করালী পাখী নসু কিন্তু উল্লাস করতে করতেই চ'লে গেল। কোন কথা না ব'লে মাথলা নটবরও মাঠে নেমে পাশ কাটিয়ে তাদের অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল। ওরা নীরবেই গেল নটবর হুঁকোটা টানছিল, বাপকে দেখে একটু খাতিরই দেখালে, কাছবরাবর এসে নামালে হুঁকোটা একবার। ওরা চলে যেতেই রতনের দলের চমক ভাঙল। সে-ই ছিল সর্বাগ্রে—সে চলতে আরম্ভ করলে সকলেরই পা চলল সঙ্গে সঙ্গে। চলল কিন্তু নীরবে। খবরটা শুনে যেন সকলের কথা হ'রে গিয়েছে।

হঠাৎ একটা ডাক এল সামনে থেকে। জাঙলের আমবাগান পড়ে সর্বাগ্রে ওই বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ। পথের উপর দাঁড়িয়ে হেদো মোড়ল তার খুব মোটা গলায় ডাকছে—অ্যাই! অ্যাই বেটা রতন! হারামজাদা! ও-রে গুখোর বেটা!

রতন জোরে হাঁটতে শুরু করল। প্রহ্লাদ বললে—ওরে বাবা রে, মোড়ল 'এগে' যেয়েছে লাগছে!

রতন বললে—পাঁচিল দেবার 'জাওন' খারাপ হয়ে যেছে, কাল দিন যেয়েছে পাচিল দেবার।

পানু ব'লে উঠল—আমার মুনিব মশায় আবার কি করলে কে জানে? আলু তুলতে হবে; পরশুই লাগবার কথা। কত্তার পুজোর 'পাট' পড়ে গেল। বললাম তো ব'লে দিয়েছে—উ সব আমি জানি না। আলু খারাপ হ'লে আমি নগদা মুনিষ লাগাব। তোমার ভাগ থেকে কাটব।

প্রহ্লাদ পানুকে বললে—হ্যা রে পানা, তোর মুনিবের পাল-বাছুরটার ক'দাঁত হ'ল রে ?

—দু দাঁত।

—এবারে জোঁয়াল গতাবে ?

—তা খানিক-আধেক ক'রে না গতিয়ে রাখলে, চার দাঁত হ'লে তখন কি আর উ জোঁয়াল লেবে ঘাড়ে ?

—ত্যাজ কেমন হবে বুঝছিস ?

—ওঃ, বেপয্যয় ত্যাজ। 'লেঙুড়ে' হাত দেয় কার সাধ্যি। পাঁচন পিঠে ঠেকলে চার পায়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘুরবে। ওকে বেচে মুনিব পিটবে একহাত।

প্রহ্লাদ বললে—আমার মুনিবকে আমি বলছিলাম বাছুরটার কথা।

—লতুন গরু কিনবে নাকি তোর মুনিব ?

—হ্যাঁ। এবারে কিনবে। তিন বছর ব'লে ব'লে এ বছর 'আজী' করালছি।

—অ্যানেক টাকা লেবে আমার মুনিব। মাটি থেকে তুলতে হবে টাকা তোর মুনিবকে।

—ওরে না। আমাব মুনিব মাটিতে পুঁতলে আর তোলে না, আধ 'বাখার' ধান ছেড়ে দেবে। ধানও ছাড়তে হবে না, আলুর টাকাতেই হয়ে যাবে, লাগবে না। তিন বিঘে আলু রে। সোজা কথা। কাঠা-ভুঁই দু পসুরি খোল দিয়েছে, 'সালপেট-আলুমিনি' দিয়েছে। কাঠাতে ফলন—দু মণ, তা হেসে খেলে—হ্যাঁ, তা খুব।

ওরা অ্যামোনিয়াকে বলে—'আলুমিনি', অ্যালুমিনিয়মকে বলে—'এনামিলি'।

—অতনকাকার মুনিবের আলু কেমন গো ? গাছ তো হলছিল বাহারের।

রতনের উত্তর দেবার অবসর নাই। খুব দ্রুতপদেই সে হেঁটে চলেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এক লাফ দিয়ে গিয়ে মনিবের সামনে হাজির হয়। সত্যিই তার মনিবের ক্ষতি হয়েছে। মাটির 'তাক' ভারি হিসাবের জিনিস। তা ছাড়া পরিশ্রমই কি কম ? গোটা একদিন মাটি কেটে তাতে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরের দিন ফের দুপুর কি তিন পহরের সময় আবার একদফা জল ঢালা হয়েছে, পরের দিন ফের কাটা, জল দেওয়া এবং পায়ে খুব ক'রে ছাঁটা হয়েছে—তার উপর আবার জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই জল শুষে সেই জলে ভিজে মাটি তৈরি হয়। বেশি নরম থাকলে চলে না, বেশি শুকিয়ে গেলে তো 'কাজ খারাবি'ই হয়ে গেল। সেই আবার নূতন ক'রে পাট করতে হবে। নিজের হয় তো সে কথা আলাদা, এ হ'ল মনিবের কাজ। খারাপ হ'লে মানবে কেন মনিব ? তার উপর তার মনিব যে লোক। একবারে মোষের 'কোধ'। রাগ হ'লে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রকাণ্ড পাথুরে গড়নের ভারী চেহারা, মোটা গলা, থ্যাবড়া নাক, কোঁকড়া চুল, আমড়ার আঁটির মত চোখ—তাও আবার 'লালবন্ন', মোটা বেঁটে আঙুল, বাঘের মত থাবা, বুনো দাঁতাল শুয়োরের মত গোঁ। রাগ হ'লেই গাঁ-গাঁ শব্দে চীৎকার করে দমাদম কিল মারতে আরম্ভ করবে। ঠিক যেন মা-দুর্গার অসুর।

রতনও বেশ মজবুত মুনিষ। লম্বা চেহারা—লম্বা ঢঙের ইস্পাতে গড়া মানুষ। বয়স কম হয় নাই। দু' কুড়ি পার হয়ে গিয়েছে—আড়াই কুড়ি হবে কি হয়ে গিয়েছে। তবু এখনও পর্যন্ত গায়ের চামড়া কেউ চিমটি কেটেও ধরতে পারে না। সকাল থেকে হালের

মুঠো ধরে, দুপুরবেলা হাল ছেড়ে কোদাল ধরে—সাড়ে তিনটের ট্রেন কোপাইয়ের পুলে উঠলে তবে কাজ ছাড়ে। ধান রোয়ার সময় হ'লে কোদাল ছেড়ে তখন নামে বীজের জমিতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত বীজ মেরে তবে ওঠে। দেড় মণ বোঝা ভার চাপিয়ে বেশ সোজা হয়েই কাঁধ দুলিয়ে দোলনের তালে তালে একটানা চ'লে যায় ক্রোশখানেক রাস্তা। এই রতনও মনিবের কিলকে ভয় করে। মনিব রাগে, চীৎকার করে, আর কিল মারে। চীৎকার করে যতক্ষণ কাশি না পায়, গলা না ভাঙে, সে ততক্ষণ এই কিল চালায়। সে কিল আস্বাদন করা আছে রতনের, একটি কিলেই পিঠখানি বেঁকে যায়, দম আটকে যায়। এর ওষুধও কিন্তু ওই দম বন্ধ ক'রে থাকা আর চুপ ক'রে থাকা। কিল খাবার আগে থেকেই দমটি বন্ধ ক'রে রাখতে হয়। তা হ'লে আর কিল খেলে দম আটকায় না এবং লাগেও কম। ঘোষ মহাশয়ের ছেলেদের একটা 'বল' আছে, পিতলের পিচকারি দিয়ে বাতাস ভ'রে দেয়, ইটের মত শক্ত হয়ে ওঠে বলটা, তাতে কিল মারলে যেমন বলটার কিছু হয় না, লাফিয়ে ওঠে—তেমনি হয় আর কি। আর কিল খেয়ে যত চুপ ক'রে থাকবে, মনিব তত চীৎকার করবে রাগে। তাতে সহজেই গলা ভাঙে, কাশি পায় মনিবের, কাশি পেলেই মনিব ছেড়ে দিয়ে নিজের গলায় হাত দিয়ে কাশতে শুরু করবে।

রতন কাছে আসতেই মনিব হেদো মণ্ডল মহাশয় বললেন—ওরে বেটা গুয়োটা কাহার, বেলা কত হয়েছে রে বেটা! ব ত্তার পুজো দিয়ে মদ মেরে তুই হারামজাদারা 'কেডামাতন' করবি—আর আমার 'জাওন' শুকিয়ে কাঠ হবে নাকি?

রতন ঘাড় হেঁট ক'রে কান টানতে লাগল। এটা কাহারদের সবিনয় অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গি। এর সঙ্গে মুখে একটু হাসিও থাকা চাই—নিঃশব্দ দন্তবিকাশ। তা অবশ্যই ছিল রতনের মুখে। ওই হাসিটুকুর অর্থ হ'ল এই যে, মনিবের তিরস্কারের অন্তর্নিহিত সদুপদেশ এবং স্নেহ সে অনুভব করতে পারছে।

তা মনিব মহাশয়েরা 'স্যাহ' করেন বইকি। তা করেন। বিপদে-আপদে মনিবেরা অনেক করেন। কাহারেরা স্বীকার করে মুক্তকণ্ঠে—অ্যানেক, অ্যানেক করেন। অসুখ- সুখে খোঁজ করেন, কিছু হ'লে দেখতে পর্যন্ত আসেন, পয়সাকড়ি ধার দেন, পথ্যের ন্য পুরনো মিহি চাল, আমসত্ত্ব, আমচুর এমনিই দেন; বিঘটন কিছু ঘটলেও তত্ত্বতল্লাস করতে আসেন। রতনদের দুঃখে নিজেও হেদো মণ্ডল মহাশয়েরা কাঁদেন, আপ্তবাক্য বলেন, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, তাতে সত্যই অন্তর জুড়িয়ে যায় রতনদের। আবার অন্য কোন ভদ্র মহাশয় যদি কোন কারণে অকারণে রতনদের উপর জুলুমবাজি করতে উদ্যত হন, তাতেও মনিব মহাশয়েরা আপন আপন কৃষাণদের পক্ষ নিয়ে তাদের রক্ষা করেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে দরকার হ'লে ঝগড়াও করেন, প্রতিপক্ষ তেমন বড় কঠিন লোক হ'লে অর্থাৎ চন্দনপুরের বাবুরা হলে তখন মনিবেরা রতনদের পিছনে নিয়ে বাবুদের কাছে গিয়ে মিটিয়ে দেন হাঙ্গামাটা। ভদ্র মহাশয়দের বলেন—আপনার মত লোকের ওই ঘাসের ওপর রাগ করা সাজে? ঘাসও যা, ও-বেটাও তাই।

কখনও বলেন—পিঁপড়ে। ও তো ম'রেই আছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কি আপনার সাজে?

তারপর রতনদের ধমক দিয়ে বলেন—নে বেটা উল্লুক কাহার কাঁহাকা, নে ধর্, পায়ে ধর্। বেটা বোকা বদমাশ হারামজাদা।

পায়ে ধরিয়ে বলেন—নে, কান মল্, নাকে খত দে।

তাতেও যদি না মানেন—বড় কঠিন লোক বাবু মহাশয়, তবে মনিব নিজেই হাত জোড় ক'রে বলেন—আমি জোড়হাত করছি আপনার কাছে। আমার খাতিরে ওকে ক্ষমা-ঘেন্না করতেই হবে এবার। 'না' বললে শুনব না।

মোট কথা, যেমন ক'রে হোক রক্ষা করেন রতনদের।

সেই মনিব মহাশয় 'আগ' করেছেন। আজ রাগ খুব বেশি। হবারই কথা। দু দিন কামাই, তার উপর মাটি খারাপ হয়ে গিয়েছে; আজও দেরি হয়েছে খানিকটা। রতন খুব দ্রুতপদেই চলল। মাঠ পার হয়েই কুঠীর সাহেবদের আমবাগান—সেই পুরানো কালের আমবাগানের মধ্য দিয়ে জাঙলে ঢুকতে হয়। বাগানের ভিতরে ঢুকতেই মাথার উপরে আমগাছের পাতার মধ্য থেকে অজস্র পোকা উড়ে মাথায় মুখে লাগল। এবার আমগাছের মুকুলও বেশি, মধুর গন্ধে চারিদিক ভুর-ভুর করছে, পোকাও হয়েছে অসম্ভব রকমের বেশি।

হেদো মোড়ল চীৎকার করতে করতেই চলল—হারামজাদা, নেমখারাম ছোটলোক জাতেরই দোষ—তোর আর দোষ কি?

পানু বললে প্রহ্লাদকে—খুব বেঁচে গেলছে অতনকাকা, আমি বলি—লাগালে বুঝি 'আষিড়ে' কিল গদাম ক'রে।

প্রহ্লাদ বললে—কিল খেয়ে অতনার অভ্যেস হয়ে যেয়েছে। মারলেও কিছু হত না।

আমবাগান পার হয়ে অপর প্রান্তে জাঙলের বসতি আরম্ভ হয়েছে। বালি-প্রধান একটা পথ। বর্ষায় হুড়-হুড় ক'রে জল যায় রাস্তাটা বেয়ে, তখন এটা নালা। জল চলে যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, তখন এটা পথ। পথটা এসেছে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কুঠীডাঙা থেকে। থমকে দাঁড়াল প্রহ্লাদ। পানু বললে—দাঁড়ালে যে গো।

প্রহ্লাদ বললে—উটো কে রে? পরমের পারা লাগছে না?

দূরে সায়েবডাঙার উপরে দুটি লোক ঘুরছে—প্রহ্লাদ দেখালে।

—তেমুনি তো লাগছে।

—সাথে কে বল দিনি?

—বড়বাবুদের সেই মোচাল চাষবাবু লয়? সেই যে গো, চুল কোঁকড়া—মিচ্ছি মাশায়।

প্রহ্লাদ বললে—পরমা আমাদের তক্কে তক্কেই আছে। কোথা জমি, কোথা পয়সা—

—জমি?

—সেদিন মাতব্বরের কাছে শুনিস নাই? চন্নপুরের বড়বাবুরা কুঠীডাঙা কিনেছে, জমি করবে। বন্দোবস্তও করবে খানিক। পরম সেই তক্কে ঘুরছে।

পানু হেসে বেশ রসিয়ে বললে—ঘুরুক শালো তক্কে তক্কে পরের দুয়ারে, উদিকে শালোর ঘরে কুত্তা ঢুকে—

হাসতে লাগল পানু, যে হাসির অনেক অর্থ এবং সে অর্থ কাহারেরা 'বেদের সাপের

হাঁচি চেনা'র মতই চেনে।

—কে? বাবুদের চাপরাসী মাশায় এসেছিল? তা ও তো জানা কথা।

পানু ঘাড় নেড়ে বললে—সিংয়ের কথা বলছি না। সে পুরানো কথা। সে আর কে না জানে? ভূপ সিং মাশায় ছত্তিরি বেরাম্ভন, সে কি আর কুত্তা হয়? সে হ'ল বাঘা। বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে? হুঁ-হুঁ, অন্য লোক। কাল সনজে বেলাতে—। সে এক মজার কথা।

সে হাসতে লাগল।

ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলে প্রহ্লাদ—কে? কে? কে রে?

খুব হাসতে লাগল পানু।

—কে রে?

—সে বলব মাইরি উ বেলাতে। অ্যানেক সময় নাগবে। গতকাল সন্ধ্যায় আটপৌরে পাড়ার বটগাছের তলায় সেই অন্ধকারের মধ্যেও পানু আবিষ্কার করেছে মাতব্বর এবং কালোবউকে একসঙ্গে। সেও ঠিক সেই সময় ওই দিকে গিয়েছিল আটপৌরে পাড়ায় তার এক ভালবাসার লোকের সন্ধানে।

বাঁশবাঁদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে, ওদের চোখেও তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকার-ভেদী আরণ্য-জন্তুর দৃষ্টি।

মাতব্বরের রঙের খেলা দেখে পানু অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করেছে। কৌতুকেরও বেশি একটু কিছু আছে। অন্য লোক হ'লে ওই কৌতুকের বেশি কিছু হ'ত না। কিন্তু বনওয়ারী মাতব্বর, তা ছাড়া মানুষটাও যেন একটু অন্য ধরনের। কৌতুকের সঙ্গে জেগেছিল বিস্ময়। তাই সে কথাটা গোপন ক'রে রেখেছিল। প্রকাশ করতে সাহস পায় নাই। এবং গতকাল হঠাৎ পাখী ও করালীর কাণ্ডটা ঘটায় ও কাণ্ডটার কথাটা মনেই ছিল না বলতে গেলে। হঠাৎ পরমকে দেখে মনে প'ড়ে গেল তার আজ। আজও তার বলতে গিয়েও বলতে সাহস হ'ল না। তা ছাড়া কথাটা বলবে কিনা তাও পানু ভাবছে মাঝে মাঝে। ওটাকে নিজস্ব ক'রে রাখলে ভাঙিয়ে কিছু কিছু আদায় কবতে পারবে মাতব্বরের কাছে।

পানু দল ছেড়ে গলি-পথে ঢুকল। গলির ও-মাথায় তার মুনিববাড়ি।

প্রহ্লাদ প্রমুখ কজন কিন্তু মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

কি মজার কথা। কি মজার কথা। পরমের ঘরে কে ছিল?

কথাটার কল্পনাতে সারাটা দিনের কাজ হাল্‌কা হয়ে গেল কাহারদের।

প্রহ্লাদ, ভূতো প্রভৃতি এরা কজন গম ঝাড়াই করলে। শীষ পিটিয়ে স্তূপ ক'রে তুললে। জলখাবার নিয়ে আসবে মেয়েরা, কুলো দিয়ে পাছড়ে খোসা ঝেড়ে গম বার করবে।

জলখাবার—অন্তত দু সের মুড়ি, খানিকটা গুড়, পেঁয়াজ, লঙ্কা আর এক ঘটি জল।

পানা তুললে আলু। খুব মোটা আলু হয়েছে পানার মনিবের। পানার স্ত্রী জলখাবার নিয়ে আসবে, সেও আলু তুলবে। চারটে মোটা আলুপানা খোঁড়া মাটি চাপা দিয়ে একটা

চিহ্ন দিয়ে রেখে দিলে। পরিবারকে বলবে, পেঁট-আঁচলে পুরে নিয়ে যাবে। মোটা আলু বেছে মনিবই নিয়ে থাকে। মোটা আলুও খাওয়া হবে ভাত দিয়ে, নিজের ভাগে বেশি কিছু পাওয়া হবে। এই বেশি পাওয়ার আনন্দটাই এক্ষেত্রে বেশি। আর প্রহ্লাদকে দেখাতে হবে। প্রহ্লাদ বলে, বিঘে ভুঁই দু পসুরি খোল, আর 'আলুমিনি' সার দিয়েছে ওর মনিব, আলু ইয়া মোটা হয়েছে। গল্প করা প্রহ্লাদের স্বভাব। পানুর মনিবের বাছুরটা কিনবে নাকি প্রহ্লাদের মনিব। আলুর টাকা থেকেই নাকি তার টাকা হয়ে যাবে। তাই দেখাবে ওকে ওর কৃষানির জমির আলু—মনিবের সম্পদ।

নিজের মনিবকে বললে পানু—মনিব মাশায়, পল্লাদে আজ আমাদের পাল বাছুরটার কথা শুধাচ্ছিল। বলে—কত দাম? ওর মুনিব এবার গরু কিনবে।

পানুর মনিব লগন্দ অর্থাৎ নগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় বিচক্ষণ হিসাবী লোক; নাক মুখ চোখ বেশ পাতলা পাতলা চোখা গড়নের, মানুষটিও পাতলা ছিপছিপে; বেশ বাবু-মহাশয়ী ছাপ আছে। মনিব মহাশয় কিন্তু পানার কথার জবাব না দিয়ে উঠে এলেন জমিতে। যেখানটায় পানা আলুগুলি মাটি চাপা দিয়েছিল, সেখানকার মাটি খুঁড়ে আলু চারটে তুলে গামছায় বেঁধে বললেন—ভাল ক'রে দেখে খোঁড় রে বেটা, দেখে খোঁড়, বাদ দিয়ে চললি যে, তাতে তোরই লোকসান। আমার আলু তো আমার জমিতেই থাকবে, সে তো আমি মাটি সরালেই পাব। হ্যাঁ, এ আলু কটির ভাগ তুই পাবি না, বুঝলি? তোর নজরের দোষের জরিমানা—ব'লে জমি থেকে উঠে আলের ওপর ব'সে আবার হুঁকো টানতে লাগলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। ভাবটা যেন কিছুই হয় নাই। পানার বুকটা গুরগুর ক'রে উঠল। তেষ্টা পেয়ে গেল।

ওই জলখাবার আসছে। কোপাইয়ের পুলের ওপর দশটার ট্রেন শব্দ ক'রে পার হয়ে গেল। বেশ শব্দ। ঝমর-ঝম্, ঝম্-ঝম।

ইচ্ছে ছিল জলখাবার নিয়ে গাঁয়ের বাইরে আমবাগানের সকলে ব'সে জমিয়ে গল্প করবে। বনওয়ারী-কালোশশীর কথাটা সকলে শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। তারও ইচ্ছে খুব। কিন্তু মনিবের কাছে ধরা প'ড়ে পানুর সব উৎসাহ নিবে গেল। মাঠে ব'সেই জল খেতে লাগল সে। হঠাৎ বউটার উপর পড়ল তার রাগ। পানুর সন্দেহ হয়, বউটা করালীর দিকে তাকিয়ে থাকে ঘোমটার মধ্যে দিয়ে। সে তাকে রূঢ় ভাষায় গাল দিতে লাগল।

দুই

বনওয়ারী গিয়েছিল চন্দনপুর ইস্টিশানে মনিবের সঙ্গে।

মাইতো ঘোষ ট্রেনে চাপলেন। বনওয়ারীকে চার আনা বকশিশ ক'রে বললেন—খুব ট্রেন ধরিয়েছিস। ও, বুড়ো বয়সে এখনও খুব জোর তোর! প্রশংসা করলেন তিনি।

বনওয়ারী হেঁট হয়ে প্রণাম করে হাসতে লাগল। বললে—তা আজ্ঞেন, আরও

কোশখানেক এই গমনে যেতে পারি আজ্ঞেন।

ঘোষ বললেন—বাপ রে বাপ, ছুটতে হয়েছে আমাকে।

—কি করব আজ্ঞেন। চা খেতে দেরি ক'রে ফেলালেন আপুনি। সতর গমনে না এলে এনারে ধরতে লারতেন। উনি তো দাঁড়ান না। টায়েন হ'লেই ছেড়ে দ্যান।

হাসতে লাগলেন ঘোষ। বনওয়ারী গামছা দিয়ে কপালেব শরীরের ঘাম মুছলে। স্থূল গড়নের পাথরের মূর্তির মত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। কানের পাশ দিয়ে জুলপী বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে সদ্য স্নান করানো কষ্টিপাথরের মূর্তির মত।

ট্রেন ছেড়ে দিলে; বনওয়ারী আবার প্রণাম ক'রে বললে—আমার 'নেবেদনটা' তা হ'লে—

—হ্যাঁ। দাদাকে ব'লে দিয়েছি, আমগাছ ক'টা আর বাঁশঝাড় পাঁচটা লিখে দিস।

—তা দিতে হবে বইকি আজ্ঞেন।

—বেশ।

গাড়ি চ'লে গেল। বনওয়ারী ইস্টিশানের নিমগাছতলাটায় ছড়ানো ইটগুলোর মধ্যে দু'খানা টেনে উপরে উপরে রেখে একটু উঁচু ক'রে নিয়ে বসল। আর তাড়া নাই। জিরিয়ে নিয়ে একটি কাজ আছে, সেই কাজটি সেরে তবে ফিরবে। বেশ ফুরফুর ক'রে হাওয়া দিচ্ছে; হাওয়ার সঙ্গে রয়েছে মিঠে গন্ধ—বন-আউচ ফুলের সুবাস। এখানকার মাঠের আলের উপব, রাস্তার ধারে অনেক বন-আউচের গাছ। ইস্টিশানের দক্ষিণ দিকটা একেবারে জাঙল বাঁশবাঁদি পর্যন্ত খোলা। চন্দনপুরের মাঠ একেবারে খালি—কাটা ধানের গোড়া ছাড়া আর কিছু নাই। খাঁ-খাঁ করছে বাবুলোকের গ্রাম। এ গ্রামের মাঠে অন্য ফসল হয় না এখন। হয়, তবু বাবু মহাশয়দের ওদিকে খেয়াল নাই। ধান ছাড়া আর সবই তাঁরা খরিদ ক'রে খান। মেলা পয়সা, বিস্তর টাকা—কেনই-বা এই সব চাষের হাঙ্গামা তাঁরা করবেন। এই যে চন্দনপুরের বড়বাবুরা জাঙলের কুঠিডাঙাটা কিনলেন, ওখানে কি ওঁরা এই সব চাষ করবেন ব'লে কিনলেন? চৌধুরীদের অবস্থা খারাপ হয়েছে—মা-লক্ষ্মী ছেড়েছেন, ওরা সবই বিক্রি করছে, পতিত ডাঙাটাও বিক্রি করলে। মাইতো ঘোষ নিজে ব'লে গেলেন—ঘোষেরা কিনতে চেয়েছিলেন ওটা। কিন্তু ঘোষেদের কাছে বিক্রি করতে চাইলে না চৌধুরীরা। হাজার হ'লেও জাতজ্ঞাত তো। শেষে সেধে দিয়ে এল চন্দনপুরের বাবুদের; এখন বাবুরা যে অংশটার মাটি ভাল, অল্প-স্বল্প ডোবে, মানে পলি পড়ে অথচ ফসল নষ্ট হয় না, সেই অংশটা কাটিয়ে জমি করবেন, বাকিটা বিলি করবেন, কতক কতক প্রজাবিলি করবেন সেলামী নেবেন, খাজনা নেবেন। সে সব নেবেন জাঙলের মোড়ল মহাশয়েরা। বাকি যা থাকবে তাই পাবে পরম, বনওয়ারী, জাঙলের হাড়ীরা, চন্দনপুরের শেখেরা। তাদের বন্দোবস্তের শর্ত আলাদা; শর্ত হল—স্ড়ারী খাজনার শর্ত। সেলামী নেবেন না। তবে তারা পতিত ভেঙে যে জমি করবে দশ বছর পরে সে জমিদারের হবে। খাজনার শর্ত হ'ল—প্রথম দু' বছর বা তিন বছর খাজনা নেবেন না, তারপর এক বছর সিকি খাজনা, তার পরের বছর আধা খাজনা নেবেন, তারপর চলবে পুরো খাজনা। এগারো বছরের বছর জমি হবে জমিদারের। কারণ বারো বছর হ'লেই নাকি তার স্বত্ব

হয়। এগারো বছরের পরে আর-একটা বন্দোবস্ত হবে আর দশ বছরের জন্য। বিক্রি করতে পাবে না, করলেও তা আইনে টিকবে না, জমিদার কেড়ে নেবেন। তবে বিক্রি না ক'রে চাষ ক'রে যাও, খাজনা দাও, জমিদার মহাশয়ের সঙ্গে বনিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রে চল, কেউ কিছু বলবে না—যতদিন খুশি ভোগ ক'রে যাও। বাস্। সেইজন্যই তো 'পিতিপুরুষে' ব'লে গিয়েছেন—'আশ্চয়' করিব লক্ষ্মীমন্তকে, মালক্ষ্মী মনিবের ঘরে ঢুকবেন, মনিবের উঠানে মায়ের পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়বে, তাই কুড়িয়ে মাথায় ক'রে আনবি, তাতেই তোর 'সোঁগুষ্ঠী'র 'প্যাট' ভরবে। এতটুকু মিথ্যে নয় পিতিপুরুষের কথা। এই বনওয়ারীদের কথাই ধরো না। ঘোষ মহাশয়ের ঘরে লক্ষ্মী এলেন। বনওয়ারীদের বাপ তাকে আশ্চয় করলে—সেই কল্যাণেই বনওয়ারীর বাবা হ'ল কাহারপাড়ার মাতব্বর। ঘোষবাড়ির লক্ষ্মীর পায়ের ধুলোয় বনওয়ারীর বাপের অবস্থা সচ্ছল হ'ল। নইলে তখন তো মাতব্বর ছিল ওই হেঁপো রোগী নয়ানের বাবা। নয়ানের কর্তাবাপের নিজের দু'বিঘে জমি, চৌধুরীবাড়ির 'আশ্চয়ে' বাস, তাদের সোনাফলানো জমি ওরা ভাগে করত। নয়ানের ঠাকুরদা মরদও ছিল জব্বর, হাঁক-ডাকও খুব। 'ঘরভাঙারাই' তখন মাতব্বর। নয়ানদের বংশটার নাম সেকালে ছিল 'ঘরভাঙাদের গুষ্টি'। আগের আমলে ওদের ঘর ছিল নীলের বাঁধের দক্ষিণ পাড়ে সব থেকে নীচু জায়গায় ; আশ্চর্যের কথা, গোটা ঘরে বাস করা ওদের কখনও ঘটত না, প্রতি বছরই বর্ষার সময় ভাঙত। কোন বার পুরো ঘরটাই ভাঙত, কোন বার একটা দেওয়াল, কোন বার বা আধখানা দেওয়াল ; এ ভাঙতেই হ'ত। সেই অবধি ওদের বাড়ির নাম—ঘরভাঙাদের বাড়ি। তারপর যখন নয়ানের কত্তাবাবা জাঙলের চৌধুরী মহাশয়দের 'আশ্চয়ে' এল—চৌধুরী-বাড়ির মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো কুড়িয়ে এনে নতুন ঘর করলে তখন আর মায়ের কৃপায় সে ঘর ভাঙল না। তবে নয়ানের ঠাকুরদাদা পিতিপুরুষের কথা মেনেছিল, ঘরখানা গোটা ক'রেও দেওয়ালের মাথায় হাত চারেক লম্বা হাত খানেক চওড়া জায়গা দেওয়াল সম্পূর্ণ না ক'রে মজবুত বাঁখারির বেড়া দিয়ে রেখেছিল। ভাগ্যমন্তের 'আশ্চয়'—চৌধুরীবাড়ির মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলোর কৃপা ছাড়া সেটা আর কি ? চৌধুরীবাড়ির পতন হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরভাঙা কাহারবাড়ির মাতব্বরি গেল। মাতব্বর হ'ল বনওয়ারীর বাপ। বাপের পর বনওয়ারী মাতব্বর হয়েছে। ঘোষেদের 'আশ্চয়ে' রয়েছে, ঘোষেদেরও চলছে বাড়বাড়ন্ত, বনওয়ারীরও যে বাড়বাড়ন্ত চলবে তাতে বনওয়ারীর সন্দেহ নাই। এখন সেদিন ওই কালোবউয়ের কাছে সায়েবডাঙা বন্দোবস্তির কথা শুনে ওই জমি খানিকটা নেবার মতলব হয়েছে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে আর-একটা কথা তার মনে হয়েছে। চন্ননপুরের বড়বাবুদের এখন এ চাকলার মধ্যে বাড়বাড়ন্ত, বাবুদের 'আশ্চয়' যদি একটু পায়, যদি ওঁদের মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো আঙুলের ডগায়ও একটু তুলে আনতে পারে, তবে তো তার ঘরেও মা-লক্ষ্মী উথলে উঠবেন।

বনওয়ারীর মনে এটি অতি গোপন কথা। এ কথা কাউকে বলতে পারে না। ঘোষ মহাশয়রা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে। মাইতো ঘোষ সাধারণত ইস্টিশানে যেতে তাকে ডাকেন না। মাল তো তাঁর বেশি থাকে না। কি বলে, 'বেগ' না 'সুটক্যাস' আর তেরপলের মত মোটা কাপড়ের খোলে বাঁধা 'বেছ্না'।

এবার মাল নিয়েছেন বেশি। তাই ডাক পড়েছে 'কোশকেঁধে' বাড়ির বনওয়ারীর। ভালই হয়েছে, চন্ননপুরে যে কালে এসেছে, সে কালে বড়বাবুদের কাছারি হয়েই যাবে। বনওয়ারী উঠল। মাইতো ঘোষ যে সিগারেটটি দিয়েছিলেন, কানে যেটি গোঁজা ছিল, সেটি হাতে নিয়ে ইস্টিশানের বাইরে পান-বিড়ি-চায়ের দোকানের দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিয়ে চন্ননপুর গ্রামের পথ ধরলে। প্রথমেই ইস্টিশান এলাকা। পথে পা বাড়িয়েও সে থমকে দাঁড়াল। মনে প'ড়ে গেল তার খুড়তুত বোন সিধুকে। ঘুরল সে।

ইস্টিশানের এলাকাটি বেশ বড়।

ছোট 'নাইন' হলে কি হয়, চন্ননপুরের ইস্টিশানের সীমানা-সহরদ্দ মস্ত। লাইন তো তৈরি হয়েছে সেদিন—বনওয়ারীর চোখের সামনে হ'ল এসব। এই লাইনে খাটতে এসে কজন মেয়ে ঘর ছেড়েছে পাঁচী খুকী বেলে চিত্ত নিম্মলা। খুকী আর বেলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে- দুজন মুসলমান রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে। আর চিত্ত পাঁচী গিয়েছে একজন হিন্দুস্থানী লাইন-মিস্ত্রীর সঙ্গে। নিম্মলাও গিয়েছে আর একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে। ওই নিম্মলারই ছেলে করালী। পাঁচ বছরের ছোট করালীকে পর্যন্ত ফেলে হারামজাদী চ'লে গিয়েছে। ওঃ, রঙের নেশার কি ঘোর, সন্তান পর্যন্ত ভুলে যায়। সিধু আর 'জগধাত্তি' এরাও দুজনে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভালবাসার লোক তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় নাই। তারা এখনও রয়েছে চন্ননপুরে, এই ইস্টিশান এলাকাতেই থাকে। মাস্টারদের বাড়িতে ঝিয়ের 'পাটকাম' করে, ইস্টিশানে পোড়া কয়লা কুড়োয়, কয়লা-চুনের ডিপোতে কামিনের কাজ করে। আবার রাত্রিকালে অন্য রূপ ধরে। বনওয়ারীই আর তাদের গাঁয়ে ঢুকতে দেয় নাই। সিধু তার নিজের খুড়োর কন্যে; সিধুকে সে ভালবাসে। এই সিধুর জন্য আজও তার মন 'বেথা' পায়। আপন খুড়োর মেয়ে, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। হঠাৎ এসে আজ তার ইচ্ছে হ'ল, একবার সিধুকে দেখে যাবে। সিধুর ওখানে করালী-পাখীর খবরও পাবে।

ঘুরল বনওয়ারী। ইস্টিশানের এলাকার মধ্যে ঢুকল। লম্বা—এই এখান থেকে সেখান পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে সারি সারি ঘর। পাকা ঘর, পাকা মেঝে, সামনে খানিকটা উঠান; এক এক ঘরে এক এক সংসার বেশ আছে। থাকবে না কেনে? সায়েবসুবার কারখানা, তাদের 'আশ্চয়ে' আছে; কিন্তু বড় ঘুপচি। পাকা ছাদ, পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝে হলেও এর মধ্যে থাকতে হ'লে বনওয়ারীর হাঁপ ধ'রে যেত। তাদের ঘর এর চেয়ে অনেক খারাপ, কিন্তু উঠানটি খোলা। তা ছাড়া এদের সংসারের ঘরদোরের গন্ধ যেন কেমন কেমন। এলেই নাকে লাগে। তাদের ঘরের গন্ধটির মধ্যে গোবর-মাটির গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, ধানের গন্ধ, কাঠ-ঘুঁটে-পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ির আশপাশের বাবুরি তুলসী গাছের গন্ধ মিশে এক ভারি মিষ্টি প্রাণ-জুড়ানো গন্ধ। আর এখানকার গন্ধ আলাদা, ভারি কটু গন্ধ, ইঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা আর জলে মিশে একটি ভাপানী তেজিয়ান গন্ধ এসে নাকে ঢোকে। ডাক্তারখানার তেজী ওষুধের গন্ধ ছাড়া আর কোথাকারও গন্ধ এমন তেজী নয়।

সিধু এই সকালবেলাতেই চুল আঁচড়াচ্ছে। যে অন্ন গেঁজে প'চে যায়, সে অন্নের গন্ধ সকাল বিকেল সব সময়ে এক। বনওয়ারী মনে মনে দুঃখের হাসি হাসলে। সকালবেলাতেই

'ব্যাশ' করতে বসেছে। বনওয়ারীকে দেখে সধু ব্যস্ত হয়ে চুল আঁচড়ানো বন্ধ ক'রে হেসে বললে—এস, দাদা এস, কি ভাগ্যি আমার।

—এলাম একবার। মাইতো ঘোষের মোটঘাট নিয়ে এসেছিলাম। তা বলি, একবার সিধুকে দেখে যাই।

সিধু উঠে তাড়াতাড়ি একখানা বস্তা পেতে দিলে—ব'স।

চন্দনপুরে থেকে সিধু তরিবৎ শিখেছে। আসন পেতে দিতে হয়—সভ্যতার এ রীতি জেনেছে। তাদের পাড়ায় আগন্তুকেরা নিজেরাই ফুঁ দিয়ে অথবা গামছা দিয়ে ধুলো-কুটো ঝেড়ে নিয়ে মাটিতেই বসে। গণ্যমান্য কেউ এলে বনওয়ারীর ঘরে দুটো মোড়া আছে, তাই এনে পেতে দেয়—যেমন দারোগাবাবু কি জাঙলের মনিব মহাশয়েরা কেউ। বনওয়ারী বসল বস্তাখানার উপর। বললে—তারপরে, ভাল আছিস?

—ভাল আর মন্দ। হেসে উঠল সিধু।—যেদিন খাটি সেদিন খাই, যেদিন খাটতে নারি সেদিন পেটে আঁচল বেঁধে প'ড়ে থাকি। জগধাত্রি কি কেউ যদি এক মুঠো দেয় তো খাই। আপনজন কে আছে যে তার উপর দাবি করব, বল?

বনওয়ারী চুপ করে রইল। সিধুর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ রয়েছে, তার সমস্তটাই এসে পড়ছে বনওয়ারীর উপর।

সিধু আবার বললে—তবু তোমার করালী ছোঁড়া লাইনে কাজ করা অবধি খোঁজখবর করে। পিসী ব'লে এসে বসে। তোমাদের খবর তার কাছেই পাই।

এতক্ষণে বনওয়ারী বললে—তা তুও তো মধ্যে-মাঝে যেতে পারিস উদিক পানে।

সিধু বললে—কে জানে বাপু, ভয় তো কাউকে নয়, ভয় তোমাকেই।

বনওয়ারী দুঃখের হাসি হেসে মাথা নামিয়ে রইল। সিধু হেসে বলল—তোমাকে বাপু বড় ভয় লাগে।

বনওয়ারী বললে—ছোটকালে বড় মারতাম তোকে, লয়?

সিধু হেসে বললে—বাবা রে। তারপর গম্ভীর হয়ে বললে—তাব লেগে লয়, তুমি বাপু ভারি কড়া নোক। কি ব'লে দেবে কে জানে? হয়তো বলবে—সিধুকে কেউ বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না।

বনওয়ারীর চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে চেয়ে কোনরকমে আত্মসম্বরণ ক'রে হেসে উঠে পড়ল। ঘোষ যে চার আনা পয়সা তাকে দিয়েছিলেন, তারই একটি দুয়ানি সিধুকে দিয়ে সে বললে—রাখ, মিষ্টি কিনে খাস।

সিধু বললে—দাঁড়াও। ব'লে ঘরে ঢুকে একটি পাকি মদের বোতল এনে বললে—খানিক আছে, খাও।

বনওয়ারী একবার ভাবলে, তারপর বোতলটি নিয়ে গলায় ঢেলে দিলে।

সিধু বললে—সেদিন করালী সাপ মেরেছিল, মেরে এখানে অনেক খরচ করেছিল। দু বোতল এনে সবাই মিলে খেলাম। ওইটুকুন ছিল। তারপর হঠাৎ তার একটা সরস কথা মনে প'ড়ে গেল, সে বেশ কৌতুক-পুলকিত স্বরে ব'লে উঠল।—ওই দেখ, আসল কথাই শুধোতে ভুলে গিয়েছি—করালী-পাখীর রঙের কথা।

—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড হয়ে যেয়েছে। ছোঁড়াকে শায়েস্তা না করলে হবে না।

সিধু বললে—তারা এখানে পালিয়ে এসে দিব্যি রয়েছে। করালী তো লাইনে কাজ করে, একখানা ঘর পেয়েছে, সেইখানে রয়েছে। কি আর শায়েস্তা করবা তুমি? সে বলছিল—যাবেই না আর তোমার এলাকাতে।

চমকে উঠল বনওয়ারী।

সিধু বললে—ওই সব-শেষের ঘরখানায় রয়েছে তারা। এর পরে মুখে কাপড় দিয়ে হাসি ঢেকে বললে, ওদের রঙ দেখলাম খুব জমজমাট। করালী বলে—গাঁয়েই যাব না, লাইনে খাটব, এইখানেই থাকব, কারুকে গেরাহ্যি করি না আমি। নতুন নোয়া এনে পরিয়ে দিয়েছে পাখীকে। ঘর পেতেছে, ধুম এখন চলছেই—চলছেই।

চন্দনপুরে এসে সিধুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রঙকে সে অঙ বলে না, নতুনকে লতুন বলে না। চলকো ক'রে চুল বাঁধে।

বিড়ি লাও একটা, বিড়ি। সিধু বললে।

থাক। বনওয়ারী হঠাৎ উঠে পড়ল।

বেরিয়ে এসে সে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ পাখী এবং করালীর ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছে। ভাল কথা নয়, গ্রামেই যাবে না—এ মতলব ভাল নয়। বদমাশ হোক, দুষ্টু হোক, পাপী হোক—ছোঁড়া এখনও এমন অন্যায় কিছু করে নাই, যাতে তাকে গাঁ থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। পাখীর সঙ্গে ব্যাপারটার মত ব্যাপার তো চিরকালই ঘ'টে আসছে। তা রঙ যখন পাকা, তখন নয়ানের সঙ্গে পাখীর ছাড়পত্র হয়ে যাক, সাঙা হোক করালীর সঙ্গে। গাঁয়ে-ঘরেই থাকুক। এখানে সর্বনাশ হবে। পাখী-করালী জানে না, বুঝতে পারছে না, কিন্তু চোখ তো আছে—চেয়ে দেখুক ওই সিধুর দিকে, জগদ্ধাত্রীর দিকে।

খুব জমিয়ে বসেছিল ওরা। পাখী করালী নসুদিদি জগদ্ধাত্রী আর করালীর লাইনগ্যাঙের দু'জন সঙ্গী। মধ্যে একরাশ তেল-মাখানো মুড়ি-লঙ্কা-পেঁয়াজ, কতকগুলো বেগুনি ফুলুরি আর মদের বোতল। খুব গরম গরম কথা চলছে। পাখী কলরব করছে বেশি। দরজার মুখ থেকে তারই কথা শুনতে পেলে বনওয়ারী। পাখী বলছিল জগকে—'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন'—ইয়ের আবার শাসনই বা কি মাতব্বরিই বা কি। ওই হেঁপো উগীর ঘরে আমি থাকব না, পালিয়ে এসেছি আজ ছ'মাস। এখন একজনার সাথে আমার মনে অঙ ধরল, আমি তার ঘরে এলাম। এ কি লতুন নাকি কাহারদের ঘরে? না কি বল জগমাসী?

জগ বললে—ইয়ের আর বলব কি লো?

করালী বললে—মামলা যদি থাকে তো আমার সাথে ওই নয়না শালোর। তা আসুক নয়না, তার সাথেই বোঝাপড়া হোক। ঠেঙা আনুক, লাঠি আনুক, নিয়ে যাক পাখীকে কেড়ে।

পাখী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—মর্ মুখপোড়া, তোকে লাঠি-সোঁটা মেরে আমাকে লিয়ে যেতে

চাইলেই আমি যাব নাকি ?

নসুদিদি ব'লে উঠল—তা ব'লো না হে, তা ব'লো না, সেই 'কিল্ ধমাধম পড়ে সই—কিল ধমাধম পড়ে গো', লাঠি-সোঁটা মেরে নিয়ে যেতে ক্ষ্যামতা থাকলে চুলের মুঠোতে ধ'রে নিয়ে যাবে। তুমি হাত পা ছুঁড়ে বড় জোর চেঁচিয়ে 'রবশ্যাষে' গলা ধরিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে ভাত রাঁধতে বসবা, 'হেনসেলে' যাবা। মরদের কিলে বাবা ভুলে যায়, তা অঙের নোক !

পাখী বললে—না হে, না। অঙ যার পাকা হয়, অঙের নোকেই পিথিবীর মধ্যে 'ছেষ্ট'।

হি-হি ক'রে হেসে উঠল নসুদি।

'এ কি পাকা অঙ লাগল মনে মনে—ও সজনি।'

এই সময়ে ঘরে ঢুকল বনওয়ারী। এক মুহূর্তে আসরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। করালীর মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। শুধু পাখী বার বার ঘাড় নেড়ে ব'লে উঠল--আমি যাব না, আমি যাব না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে।

বনওয়ারী ডাকলে করালীকে—শোন।

করালী এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বুকটা ফুলিয়ে নিয়ে উঠে এসে উদ্ধতভাবেই বললে—কি ?

বনওয়ারী বললে—ছুটি হ'লে বাড়ি যাস পাখীকে নিয়ে। এখানে থাকবার মতলব ভাল নয়। উ সব ছাড়্। বাড়ি যাস ; সাঙার ব্যবস্থা ক'রে দেব। বুঝলি ?

করালী শান্ত ছেলেটির মতই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

বাড়ির বাইরে এসে আবার করালীকে ডাকলে বনওয়ারী, আর একটা কথা মনে পড়েছে—থানায় গিয়েছিলি ? বশকিশটা এনেছিস ?

—না।

—আয় আমার সাথে। দারোগাবাবুর কাছে তোকে সনাক্ত দিয়ে যাব।

—সনাক্ত ?

—হ্যা রে। তুই যে করালী, দারোগা তা জানবে কি ক'রে ? সেই সনাক্ত দিয়ে যাব। তা'পরে আপনার বশকিশ তুই লিস যবে দেবে। আয়।

তিন

দারোগার কাছে করালীকে সনাক্ত ক'রে দিয়ে সে বড়বাবুদের কাছারি হয়ে বাড়ি ফিরল। বেলা তখন দুপুর গড়িয়েছে। ঘোষের বাকি দু' আনা পয়সায়—ছ' পয়সার মুড়ি, দু পয়সার পাটালী কিনে গামছায় বেঁধে বাবুদের কেষ্ট দীঘির জলে ভিজিয়ে আমগাছের ছায়ায় ব'সে খেয়ে নিয়েছে, আঁজলা ভ'রে জল খেয়েছে। সিধুর পাকি মদের বোতলটিতে নেহাত কম 'দব্য' ছিল না, জিনিসটাও ছিল খাঁটি—এখনও পর্যন্ত অল্প-অল্প বেশ নেশায় ফুর্তি রয়েছে বনওয়ারীর। তার উপর মনটা খুব খুশি রয়েছে। দিনমানটা আজ ভালই বলতে হবে।

সেদিন পুজোটি কর্তা প্রসন্ন হয়েই নিয়েছেন মনে হচ্ছে তার। করালীর ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে, ভালই হয়েছে। তার মনের মধ্যে ভারি একটা অশান্তি ছিল। 'কোধ' অবশ্য খুবই হয়েছিল তার। গুরুবলে খুব সামলে গিয়েছে। নইলে হয়তো কাণ্ডটা একটা 'বেপযয়য়' ঘটিয়ে ফেলত। ছোঁড়াটার গায়ে ক্ষমতা হয়েছে, হ্যাঁ, তা হয়েছে, মানতেই হবে বনওয়ারীকে। বাঁশবনে সে তার নিচে পড়েছিল—এজন্য বলছে না, ওটা বেকায়দায় প'ড়ে গেল, ঝরা বাঁশপাতার গাদায় পাতা স'রে গিয়ে পিছলে প'ড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু বনওয়ারীর বুকে যখন উঠে বসেছিল করালী, তখন তার ক্ষমতার আঁচটা পেয়েছে সে। 'ডাঁটো মরদ' হবে ছোঁড়া। তবে মদে—বদখেয়ালীতে না মাটি হয় যায়। সেই জন্যই তো বনওয়ারী তাকে নষ্ট হতে দেবে না। এ কদিন কয়েকবারই তার মনে হয়েছে, ছোঁড়াকে ফেলে বুকে চেপে বসে। বসলে হয়তো মেরে ফেলত তাকে। তা, তা থেকে রক্ষা করেছেন গুরু আর কর্তা। আজ ওই সিধুকে দেখে পাখীর জন্য তার মন কাঁদল। করালী আর পাখীকে ফিরিয়ে আনাই 'কত্তব্য' মনে হ'ল। তার মত লোকের কি ওই ছেলেমেয়ের উপর রাগ করা ভাল দেখায়? রাম রাম, লোকের কাছে সে মুখ দেখাত কি ক'রে? যাক, ছোঁড়াও শেষটা বুঝতে পেরেছে, পাখীকে নিয়ে ফিরে যাবে বলেছে। থানায় ছোঁড়া পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হতভাগা, বদমাশ কোথাকার। হতভাগা যে শেষে বুঝেছে, এতেই বনওয়ারী খুব খুশি। নিমতেলে পানু প্রহ্লাদ নয়ান, এরা খানিকটা মাথা নাড়বে, তা নাড়ানাড়ি করুক। বুঝিয়ে দিতে হবে। বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ এই মাতব্বরের কাজ। দশ জনের মাথার উপর বসার ভারি আরাম—এই ভাবে সবাই। ওরে বাবা, এ দশের মাথায় বসা নয়—এ হ'ল লোহার গজাল-বসানো তক্তার পাটায় গজালগুলোর সূচালো মাথায় ব'সে থাকা। হে ভগবান! মতি ঠিক রেখো বাবা, মতিভ্রম হ'লেই ওই গজালে চেপে বিঁধে মারবে দশে। বুকের ভিতর রাগ অশান্তি হ'লেই বুঝতে হবে—গজাল বিঁধছে। করালীর ব্যাপারটা নিয়ে মনে যখন অশান্তি ছিল, তখন ওই গজালই বিঁধছিল। মিটে গেল—যাক। ভারি আনন্দ।

চন্দনপুরের বাবুদের ওখানেও সে সুফল পেয়েছে। জয় বাবাঠাকুর। বাবু শুনেছেন তার কথা—বাবুর সেরেস্তার কর্মচারী—কোপাইয়ের অপর পারের গোপের পাড়ার দাসজী মহাশয়ের ছেলে—বনওয়ারীর খুব সুখ্যাতি করলে বাবুর কাছে। পরমের নিন্দেই করলে। বললে—ওই তো আসল মাতব্বর কাহারপাড়ায়। পরম তো আটপৌরে পাড়ার। আটপৌরেরা মোটে ছ-সাত ঘর। তাও সকলে পরমকে মানে না। তা ছাড়া পরম লোকও ভাল নয়। ডাকাতিতে জেল খেটেছে এবং যত কুঁড়ে তত মাতাল। বনওয়ারীর স্বভাব চরিত্র খুব ভাল।

বাবু মন দিয়ে শুনলেন সব। বললেন—আচ্ছা, দেব তোমাকে জমি।

চন্দনপুরের বড়বাবুর চারমহলা বাড়ি, গাড়ি ঘোড়া লোকলস্কর, যাকে বলে—'চার চৌকস' কপাল। ওঁর বাড়ির মা-লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ 'আজলক্ষ্মী'। ওই মায়ের পায়ের 'পাঁজের' ধুলো যদি বনওয়ারী পায়, তবে কি আর দেখতে আছে। আর ওই রকম মনিব নইলে কি মনিব। ওই মনিবের চাকর হ'লে এক হাত ছাতি দশ হাত হয়ে ওঠে। লোকের কাছে ব'লে সুখ কত? তা ছাড়া কত দুর্লভ জিনিস তাঁর আশেপাশে? মেলাখেলায় ঝকমকে

আলোর তলায় সারারাত ব'সে নয়ন ভ'রে দেখে যে সুখ, ওই রাজবাড়িতে চাকর হয়ে ঠিক সেই সুখ। বনওয়ারীর মন কল্পনায় পুলকিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ দাঁড়াল বনওয়ারী। ডাইনে জাঙল—সামনে বাঁশবাঁদি। বাঁয়ে পূবে মা-কোপাইয়ের 'পলেনের' অর্থাৎ পলি-পড়া মাঠে রাখাল ছোঁড়ারা গরু ছাগল ভেড়া ছেড়েছে। সকলে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে গাছতলায় কড়ি খেলছে। এদিকে ওই একটা আলোর পাশে একটা শেয়াল মুখ বাড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে; ছাগলগুলো চীৎকার ক'রে ছুটছে, দেখেছে তারা; কিন্তু ভেড়াগুলো এক জায়গায় জমাট হয়ে গায়ে গায়ে বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা জাত। চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। নিলে বোধ হয় একটা। বনওয়ারী হাঁকলে—লিলে রে—লিলে রে। এই ছোঁড়ারা।

রাখালেরা চকিত হয়ে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই শেয়ালটাকে দেখতে পেলে, সঙ্গে সঙ্গে তারা হৈ-হৈ ক'রে ছুটল।—লে—লে—লে—লে। বনওয়ারি ভারি বিরক্ত হ'ল। বেকুবের দল। সব একদিকে ছুটল। কাহারের ছেলে হয়ে ধূর্ত্ত শেয়ালের ফন্দি জানে না হতভাগারা। হায় হায় হায়। করালীর আড্ডায় দিনরাত গিয়ে গিয়ে ওদের এই দশা, সেখানে দিনরাত দ্যাশ-বিদেশের আজা-উজীবের গল্প। এসব কুলকর্মের কথা তো হয় না, শিখবে কি ক'রে? ওই একটা শেয়াল ছুটে পালাচ্ছে। তা হ'লে আসল শিকারী পিছনদিকে কোথাও আছে নিশ্চয়। এই ফাঁকে সে এসে একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে পালাবে। আচ্ছা ধূর্তের জাত। রাখাল থাকলে ধূর্তেরা এইভাবে একটা এক দিকে দেখা দেবে উলটো দিকে লুকিয়ে থাকবে আর একটা কি দুটো। রাখালেরা যেমনই ছুটবে দেখা দেওয়া ধূর্তটার দিকে, অমনিই পিছন দিক থেকে সেটা বার হয়ে ঝপ ক'রে ভেড়া ছাগল যা সামনে পাবে মেরে টেনে নিয়ে পালাবে। সাধে 'পণ্ডিত মহাশয়' বলে শেয়ালকে। কিন্তু এদিকের ধূর্ত পণ্ডিতটি কই? কোথায়? যেখানেই থাক, বনওয়ারী ভেড়ার পালের দিকে ছুটতে লাগল।

সামনে একটা নালা। প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে সশব্দে পার হ'ল বনওয়ারী। সঙ্গে সঙ্গে একটা খ্যাঁক' করে শব্দ হ'ল, তারপরই নালার কুল-ঝোপ থেকে সড়াৎ ক'রে বেরিয়ে পালাল একটা শেয়াল। ছুট—ছুট—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে শেয়ালটা। হরি হরি, পণ্ডিত মহাশয় এইখানেই নালাকে পেছনে রেখে কুলবনের ঝোপে ঝোপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভেড়াগুলোর দিকে। বনওয়ারী ঠিক হাত-পাঁচেক দূরে লাফিয়ে পড়েছে। ঘাড়ে পড়লে ঠিক হ'ত। ওঃ—ওঃ—এখন ছুটছে পণ্ডিত। ধর্—ধর—ধর, ধূর্তকে ধর। পণ্ডিতকে ধর।

খুব একচোট হেসে ছোঁড়াগুলোকে পণ্ডিতদের ধূর্ত বুদ্ধির কৌশল বুঝিয়ে দিয়ে বললে—খবরদার, সবাই মিলে কখনও ছুটে যাবি না, একজনা থাকবি ছাগল-ভেড়ার কাছে—বড় দেখে একজনা থাকবি। তা নইলে পণ্ডিত দাঁত মেলে খ্যা-খ্যা ক'রে তেড়ে এসে ছেলেমানুষকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল ক'রে পালাবে। তারপর বললে—কল্‌কেটায় আগুন আছে? ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করলে সে। ধরিয়ে নিলে।

ওই কত্তার 'থান' দেখা যাচ্ছে। প্রণাম করলে বনওয়ারী। বাড়ি ফিরতে গিয়ে গাঁয়ের ধারে এসে মনে পড়ল—বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। বউ বলেছিল—চার পয়সার পোস্তদানা আনতে। ভুলে গিয়েছে। জাঙলে পানার মনিবের দোকান থেকে নিয়ে গেলে হ'ত। কিন্তু

না, থাক। ধার সে নেবে না। চার আনা পয়সার দু'আনা নিজে খেয়েছে, দু আনা দিয়েছে সিধুকে। এতে তার মন খুশি হয়েছে—সিধুকে পয়সা দিয়েছে, এতে তার মন ভারি খুশি। আহা, 'দুভ্যাগা মেয়ে'। সিধু এখন আঁস্তাকুড়ের অন্নের সমান। আঁস্তাকুড়ে যে অন্ন পড়ে, সে অন্ন আর তুলে নেবার উপায় নাই। কিন্তু সে অন্নও তো লক্ষ্মী। তার জন্য মন না কেঁদে তো পারে না।

* * *

এর কয়েকদিন পরেই হাঁসুলী বাঁকে কাহারপাড়া বাঁশবাঁদিতে আবার একবার বাদ্যি বেজে উঠল। এবার বাজল ঢোল কাঁসি সানাই—কুরুতাক-কুরুতাক-কুরুম-কুরুম। বায়েন এসেছিল একদল, ঢোল কাঁসি সানাই। মেয়েরা এবার দিচ্ছে উলু—উলু—উলু—লু—লু—লু। তারই সঙ্গে ঢুলী বাজাচ্ছে কুরুর—কুরুর—কুরুর—তাক—তাক—তাক। কাঁসিতে বাজল কাঁই—কাঁই-কাঁই। সানায়ে সুর উঠল- আহা—মরি মরি মরি রে মরি, শ্যামের পাশে রাইকিশোরী। বাঁশবাঁদির বাঁশবনে-বনে চঞ্চল হয়ে উঠল পাখীর ঝাঁক; তলায় আদ্যিকালের পচা এবং শুকনো পাতার মধ্যে থেকে দু-চারটে খরগোশ বার হয়ে ছুটে পালাল নদীর ধারের জঙ্গলের দিকে। শিয়ালগুলি এত ভীরু নয়, তারা প্রথমটা একবার চঞ্চল হয়েই স্থির হ'ল। সাহেবডাঙার দিকে বুনো শূয়োরগুলো নিজেদের আড্ডায় বার কয়েক গোঁ-গোঁ ক'রে উঠল। শীতকালের আমেজ এখনও আছে, সাপেরা এখনও মাটির তলায় না খেয়ে 'ছ-মেসে' দম নিয়ে অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে- তারা মাথা তুলতে চেষ্টা করলে; কিন্তু পারলে না। পাখী ও করালীর বিয়ে।

কাহারপাড়ায় মাতন লাগল। তেল হলুদ রঙ নিয়ে মাতামাতি। করালীর সঙ্গে পাখীর সাঙা, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ। নসুরাম—করালীর নসুদিদি—গাছকোমর বেঁধে তেল-হলুদ মেখে, কাপড়ে রঙ নিয়ে হা-হা ক'রে হাসছে আর গাইছে—"আমার বিয়ে যেমন তেমন—দাদার বিয়ের আয়রেশে আয় ঢকাঢক মদ খেসে।"

প্রচুর মদ, বড় বড় হাঁড়ি থেকে বাটি ভ'রে তুলে ঢেলে দিচ্ছে একজন, সকলে আকণ্ঠ পান করছে। করালী দরাজ হাতে খরচ করছে। তার সঙ্গে কাহারপাড়ার কার সঙ্গ? সে হ্যাট হ্যাট ক'রে তাড়িয়ে লাঙ্গল চ'ষে না, হিম-প্লো হাঁক হেঁকে পাল্কি ব'য়ে খায় না, সে 'অ্যাল' কোম্পানিতে চাকরি করে, নগদ 'ওজকার'। সে সেটা দেখিয়ে দিতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায় এই সুযোগে। সে দেড়কুড়ি টাকা নগদ খরচ করেছে। খাসী কিনেছে, ছোলার ডাল কিনেছে—জ্ঞাতিভোজনে সে চুনোপুঁটির অম্বল আর কাঁচা কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত দেবে না। পাখীকে শাঁখা-শাড়ি-সিঁদুর-নোয়া ছাড়াও দেবে অনেক জিনিস, অনেক গয়না: রূপদস্তার নয়, রূপোর গয়না। হাতে চারগাছা ক'রে আটগাছা চুড়ি, গলায় দড়ি-হার, কোমরে এ ছাড়া একপ্রস্থ গিল্‌টির গয়না—সুতহার, পার্শী মাকড়ি, হাতে বাজু অনন্ত বালা। পাড়ার ঝিউড়ী-বউড়ীরা ধন্য ধন্য করেছে করালীকে। ছেলে-ছোকরারাও বাহবা দিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করছে, রেল কোম্পানির ওই আজব কারখানায় চাকরির চেষ্টা ওরাও অতঃপর করবে। পরক্ষণেই দ'মে যাচ্ছে। যে মাতব্বর আছে, সে কি ও-

মুখে কাউকে হাঁটতে দেবে? করালীর মত বুকের পাটা তাদের নয়, তারা বনওয়ারী মাতব্বরকে অমান্য ক'রে রেল কোম্পানিতে খাটতে যেতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে বনওয়ারীর মূর্তি। চোখ বড় করে হাত তুলে বলছে, পিতিপুরুষের বারণ। সাবোধান।

কিন্তু বনওয়ারী মাতব্বর হয়তো করালীকেও এবার কায়দা করলে। তাকে বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, পঞ্চায়েতের হুকুম অমান্য করা চলবে না। দেবতা-গোসাঁইকে মানতে হবে, অনাচার অধর্ম করবে না। পাকাচুলের কথা না শোন না-ই শুনবে, কিন্তু প্রবীণ মুরুব্বির 'রূপমান' কখনও করবে না: করালী সে প্রতিজ্ঞা করেছে।

এই বিয়ের খরচ নিয়েও বনওয়ারী তাকে বলেছিল—এত ভাল লয় করালী। যা রয় সয় তা করতে হয়। এত খরচ করতে তু পাবি কোথা?

করালী অন্য সময় হ'লে বলত আজারা মানিক কোথা পায়? নিশ্চয় বলত এ কথা এবং মুখ টিপে হেসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত কথাটা। কিন্তু এবার সে হাত জোড় ক'রে বনওয়ারীকে বললে—হেই কাকা, তোমাকে জোড় হাত ক'রে এবার বলছি, এবার কিছু বলো না। বিয়ে আমার পাখীর সঙ্গে।

বনওয়ারী পরিতুষ্ট হয়ে হেসে বললে—আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে করালীকে একটু আড়ালে ডেকে প্রশ্ন করলে, কিন্তুক বাবা, একটি কথা বল দেখি নি, এত টাকা তু পেলি কোথা? কোম্পানির কিছু চুরিচামারি করিস নাই তো? দেখ? ফেসাদ হবে না তো ইয়ের পরে?

করালী তার গায়ে হাত দিয়ে বললে—এই তোমার গায়ে হাতে দিয়ে বলছি। সে সব ভেবো না তুমি। মাইরি বলছি।

বনওয়ারী চলে গেল বসনের বাড়ির দিকে। করালীর কাকা, পাখীর মামা সে, পাড়ার মাতব্বর, তার দায়িত্ব কত।

করালী হলুদ তেল মেখে স্নান ক'রে টেরি কাটতে বসল। নতুন আয়না-চিরুনি কিনেছে। গোলাপী রঙের বুকে-ফুল-কাটা গেঞ্জি গায়ে দেবে। নতুন একখানা মিহি ধুতি হলুদ রঙে রাঙিয়েছে: সেগুলো নসুদিদি সামনে রাখলে পাট ক'রে। আর রাখলে একখানা বাহারের 'থইলো' অর্থাৎ তোয়ালে; করালী বলে—তইলা, নসু বলে—থইলা। কাহারপাড়ার উপকথায় বরের সাজসজ্জায়—করালী কলিযুগ এনেছে, কলিযুগের ছেলেছোকরা ঝিউড়ী-বউড়ীরা এ সব দেখে মোহিত হ'লেও প্রবীণেরা এটা বরদাস্ত করতে পারছে না। তারা সবাই একটু ভুরু কুঁচকে এড়িয়ে চলছে। আপনাদের মধ্যে বলছে, এতটা ভাল নয়। মদের গন্ধেও তাদের মন খুব সরস হয়ে উঠছে না। অবশ্য দু-এক পাত্র ক'রে সবাই খেয়েছে; কিন্তু ছোকরা এবং মেয়েদের মত মাতনে মন মেতে উঠতে চাচ্ছে না তাদের। তবে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে করালীকে। যেমন জোয়ান, তেমনই সুন্দর, তেমনই পোশাক। কাহারপাড়ায় ও যেন মোহন সাজে এক নতুন নটবর এসেছে।

•

প্রহ্লাদ হ'ল বনওয়ারীর পরের মান্যের লোক। সে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত। সে বললেই

মুখ খুলে—কাজটা ভাল করলে না বনওয়ারী ভাই। মাতব্বরের মতন কাজ হ'ল না। করালীকে শাসন না ক'রে তার দণ্ড না করে এই 'পেকার' 'আসকারা' দিলে, এর ফল ভাল হবে না। তাও একজনার ঘর ভেঙে—

গুপী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ভাই রে, ওই নয়ানের বাপের 'পেতাপ' কত ভেবে দেখ। 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা'। মাতব্বরের এ বিচার ভাল হল না।

রতন—লটবরের বাপ ; অবাধ্য ছেলে লটবর, করালীর অনুরক্ত ভক্ত। অবাধ্য ছেলের দায়ে রতনকে করালীর অর্থাৎ লটবরের দলের টান টানতে হয়, সে বললে—তা ছোক্‌রা বাহাদুর বটে। করলে খুব।

নিমতেলে পানু অল্পবয়সী হ'লেও প্রবীণদের দলেই চলে ফেরে, সে ফুট কাটতে অদ্বিতীয়, সে বললে—লুট—লুট—লুটের পয়সা, বুঝলে ? আমাদের মত চাষে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলায়ে এই ধুম করতে পারত, তবে বুঝতাম। বুল্লে কিনা, অ্যালের পুরানো 'সিলপাট' কাঠ চুরি ক'রে চন্ননপুরে কতজনাকে বিক্রি করেছে—সে আমি জানি।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ভাবছে। মনে পড়েছে আগুনের আঁচে-ভরা বাঁশতলা, মনে পড়েছে বটতলায় কালোবউয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা।

করালী এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। তার বগলে দুটো পাকি মদের বোতল। নামিয়ে দিলে প্রহ্লাদ-রতনের সামনে।—নাও কাকা, আরম্ভ কর, আরও আছে।

ওদিকে গাল দিচ্ছে নয়ানের মা।

নয়ান চুপ ক'রে ব'সে আছে নিজের দাওয়ায়। বুকটা 'দুঁপছে', পাঁজরাগুলো উঠছে, নামছে, কালো কঙ্কালসার তোবড়ানো মুখের মধ্যে সাদা চোখ দুটো হাঁসুলী বাঁকের মাথায় কত্তাবাবার থানের দিকে চেয়ে রয়েছে—স্থির নিস্পলক হয়ে। সে মনে মনে বাবাকে ডাকছে। আর কল্পনা করছে ভীষণ কল্পনা।

নয়ানের মা তারস্বরে গালাগাল দিচ্ছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে করালীকে এবং পাখীকে। কত্তাবাবাকে, কালরুদ্রকে ডাকছে বিচার করবার জন্য। সমস্ত সমাজের প্রবীণদের উদ্দেশে বনওয়ারীর আচরণের প্রতিবাদ করবার জন্য বলছে—মঙ্গল নাই, মঙ্গল নাই, এমন মাতব্বর যেখানে। মধ্যে মধ্যে তাদের অর্থাৎ ঘরভাঙাদের পূর্বগৌরব স্মরণ ক'রে বিলাপ করছে।—বনওয়ারী মাতব্বর। মাতব্বরের এই কি বিচার ? এমন মাতব্বর যেখানে, সেখানের মঙ্গল নাই। একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে আর একজনের ঘর গড়ার নাম মাতব্বরি ? শত্তুর, চিরকালের শত্তুর ওই কোশকেঁধেরা এই ঘরভাঙাদের বাড়ির। এই বাড়ি ছিল একদিন মাতব্বরের বাড়ি, এই বাড়ির উঠানে উবু হয়ে ব'সে লোকের বাপ-ঠাকুরের হাঁটুতে পাছায় কড়া পড়েছে। তারপর অনাথা ছেলের কালে উড়ে এসে জুড়ে বসল। হালে উঠতি ঘোষ বাবুদের দেমাকে বড়কে বড় মানলে না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হয়ে পড়ল। বিধেতা এর বিচার করবেন।

নয়ান ব'সে বসে ওই ন্যাড়া-মাথা, গলায় রুদ্রাক্ষ, ধবধবে পৈতে, পরনে গেরুয়া, পায়ে খড়ম—কত্তাঠাকুরকে যেন মনশ্চক্ষে দেখছে। বেলগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন—একটি কুটিল

চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে। চেয়ে আছেন তিনি করালীর ঘরের দিকে। পায়ের তলায় প'ড়ে আছে সেই বিরাট চন্দ্রাবোড়া—করালী যাকে মেরে বাহাদুরি নিয়েছে। সে কি মরে ? বাবার সাপ সে। কত্তার বাহন। সে বেঁচে উঠেছে। লক লক ক'রে জিব নাড়ছে। বাসরঘরে ওই লাপ ঢুকবে।

বসনের বাড়িতেও অনেক মদ, অনেক নেশা, অনেক নাচ, অনেক গান। সুচাঁদ বলে—সিঁদুরের মত 'অঙ' লাগবে চোখে, তবে তো বিয়ের মাতন। চারিদিকে 'আতদিন' অক্তসন্ধ্যে নেগে থাকবে।

সুচাঁদের সে রঙ চোখে লেগেছে।

প্রথমটায় সে কিছুটা মদ্যপান ক'রে ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে ; তারপর একটা বাটিতে মদ আর আঁচলে মুড়ি লঙ্কা নিয়ে বাঁশবনের ধারে ব'সে কেঁদেছে। কেঁদেছে তার মরা বাপের জন্য, মরা জামাই অর্থাৎ পাখীর বাপের জন্য—আঃ, এমন দিনে তারা বেঁচে নাই মধ্যে মধ্যে চোখ মুছে কান্না বন্ধ ক'রে মুখে মুড়ি চিবিয়ে লঙ্কার ঝাল জিভে ঠেকিয়ে মদ খেয়ে নিচ্ছিল।

তাকে ডেকে নিয়ে গেল বসন। তখন সুচাঁদ কাঁদছিল মরা জামাইয়ের জন্য। বসনও কাঁদলে। সে কাঁদলে শুধু মৃত স্বামীর জন্য নয়, জাঙলের চৌধুরী-বাড়ির ছেলের জন্যও কাঁদলে। 'তিনি' যদি আজ বেঁচে থাকত। পাখীর মুখ অবিকল তার মত। তেমনিই তারই মত গোরা রঙ। রঙ-কালো বসনের কোলে ছেলেবেলায় ফরসা-রঙ পাখীকে যা চমৎকার মানাত। যেন সবুজ গাঁদা গাছে হলুদ রঙের গাঁদা ফুল ফুটেছে। এই কথাটি বলত চৌধুরীবাবুর ছেলে নিজে। তিনি থাকলে কত ধুম করত বসন।

সুচাঁদ উঠে আবার মদ্যপান ক'রে এবার উঠানে ব'সেই হঠাৎ কাঁদতে লাগল। মেয়েরা গান করছিল। রঙের গান। কান্না শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল ; সুচাঁদ এবার ভয়ঙ্কর নাম ধরে কাঁদছে। বাবার নাম ধ'রে।

—ওগো কত্তাবাবা গো, ওগো কত্তাঠাকুর গো। মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সবার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে বাবা ; তোমার বাহন মারার পিতিবিধেন হ'ল না বাবা। তোমার মহিমে তুমি পেচার কর বাবা। তোমার বাহনকে বাঁচাও তুমি বাবা।

বাবার বাহন। সেই চন্দ্রবোড়া সাপটি। বসন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। পাখী চমকে উঠল।

বনওয়ারী বসনদের বাড়ি থেকে ফিরে যাবার পথে একটা গাছতলায় থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিল নয়ানের মায়ের গালিগালাজ। ওই সঙ্গে সুচাঁদের বিলাপ তার কানে যেতেই সে বিস্ফারিত চোখে ঘুরে দাঁড়াল। করালী সাপটিকে মেরেছে। এ বিরাট অজগর তার প্রথম অস্তিত্ব জানিয়েছিল ওই বাবার 'থান' থেকে। সে যে বাবার বাহন, তাতে তো তারও সন্দেহ নাই। সেও থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

হে বাবা। হে কত্তাঠাকুর। হে কাহারদের মা-বাপ ! মাজ্জনা কর বাবা মাজ্জনা কর। অবোধ মুখ্যু করালীকে মাজ্জনা কর। বনওয়ারীকে মাজ্জনা কর। পুজো দোব বাবা, আবার

পুজো দোব।

সন্ধ্যার আঁধার তখন ঘনিয়ে আসছে। বাঁশবনের তলায় জমেছে অপদেবতার ছোঁয়াচ-লাগা থমথমে ভর-সনজের মুখ-আধারি। সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি বনওয়ারী এসে উঠল বাবার থানে। বেলগাছতলায় হাঁটু গেড়ে ব'সে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে মনে মনে বাবাকে প্রার্থনা জানাতে লাগল। বনওয়ারী একজন অতিসাহসী। কতবার কত অপদেবতার অস্তিত্ব সে অনুভব করেছে, কিন্তু ভয় পায় নাই। একবার মনে আছে—সন্ধ্যার পর মাছ নিয়ে আসছিল ওপারের মহিষডহরির বিল থেকে। দু পাশে দুজন এল শেয়ালের রূপ ধ'রে। এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে কত ফাঁদই তারা পেতেছিল। বনওয়ারী কৌতুক অনুভব করেছিল। কত সন্ধ্যায় বাবার থানে এসে প্রণাম করেছে। রাতদুপুরেও এসেছে। গা কাঁপে নাই। আজ চোখ বুজতেই মনে হচ্ছে বাবা যদি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন। করালী মেরেছে বাবার বাহনকে, সেই করালীকে সে ফিরিয়ে এনেছে স্নেহ-সমাদর ক'রে। বাবার ক্রুদ্ধ মূর্তি তার মুদিত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই চিত্রবিচিত্র শিস-দেওয়া চন্দ্রবোড়া দেখতে দেখতে ফুলে ফুলে মাথা তুলে উঠতে থাকে—মাথা ওঠে তালগাছের ডগায়, চোখের দৃষ্টিতে ধক-ধক করে আগুন, গায়ের চিত্রবিচিত্র দাগগুলি বাড়তে থাকে, জিভ ওঠে লকলকিয়ে—কামারের আগুনে তাতানো অগ্নি 'বন্ন' ইস্পাতের মত ; সেই অজগরের মাথায় খড়ম পায়ে দিয়ে, গেরুয়া প'রে, ন্যাড়া-মাথা বাবাঠাকুর ভেসে ওঠেন। বাবার গলার রুদ্রাক্ষগুলি হয়ে ওঠে মড়ার মাথা, বুকের ধবধবে পৈতে হয়ে ওঠে দুধে-গোখরোর পৈতে।

বনওয়ারী থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

বহুক্ষণ পর সে কোনক্রমে শান্ত হয়ে মনে মনে বলে-বাবা, পুজো দোব, মার্জ্জনা কর তুমি। তারপর বলে—যদি মার্জ্জনা না কর বাবা, জানিয়ে দাও। পড়ুক, তোমার গাছ থেকে একটি বেল খ'সে পড়ুক। আমি মনে মনে পাঁচ কুড়ি গুনছি।

সে গুনতে থাকে। এই দুই তিন চার...এক কুড়ি। আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট--

পাঁচ কুড়ি শেষ হ'ল।

বেল পড়ল না। বনওয়ারী এবার উঠল সেখান থেকে।

পাড়ায় তখন পরিপূর্ণ মাতন। মুরুব্বিরা ভরপেটে পাকি খেয়েছে, টলছে। মেয়েরা নাচছে। আঁধার রাত্রিতেও চারিদিকে যেন রক্তসন্ধ্যার রঙ লেগে রয়েছে। সুচাঁদের উর্দ্ধ অঙ্গে কাপড় নাই। সে নাচছে। কাপড় ধুলোয় লুটুচ্ছে। সেও নাচবে।

বসন করালীও ঠিক করেছে, পুজো দেবে। বনওয়ারী খুশি হল। পুরো বোতল পাকি মদ নিয়ে সে বসল। খেতে খেতে হঠাৎ উঠল। বায়েনদের বাজনা ঠিক হচ্ছে না। হাতে তাল দিয়ে সে বললে—বাজাও বাবা, বাজাও—বর আসিলো বর আসিলো, ও বউ, তুমি অঙ্গ তোল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা, বর নামিলো বউ নামিলো, ও বর, বউয়ের সান্-টি খোল।

কাঁসি-বাজিয়ে ছোকরা নিজেই বলছিল—কাঁই-কাঁই-কাঁই—কিটি—কিটি—কাঁই-কাঁই।

বনওয়ারী তাকে বাহবা দিলে—আচ্ছা, আচ্ছা ! সঙ্গে সঙ্গে কে চাপা হাসি হেসে উঠল। কে রে ? কে ? কোন্ মেয়ে ? কার এত বাড় ? বনওয়ারী ঘোর-লাগা চোখ তুলে চাইলে।

চোখ তুলেই কিন্তু তার রাগ প'ড়ে গেল।—ওরে বাপ রে। তুমি কখন হে? কি ভাগ্যি আমাদের, কি ভাগ্যি। আটপৌরে পাড়ার মাতব্বরের গিন্নি—কালোবউ। কালোশশী! কালোবউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে, উপরে তার ঝিলিক্ দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না।

কালোবউ তাকাচ্ছে; কোন্ দিকে? বনওয়ারী চারিদিক চেয়ে দেখলে, চারিদিকে মাতন।

শেষরাত্রে মাতন স্তব্ধ হ'ল। ভোরবেলা কাহারপাড়ায় সেদিন অগাধ ঘুম। বনওয়ারীকে কে ঠেলে জাগিয়ে দিলে। বনওয়ারী উঠে বসল। বটগাছতলায় ঘুম ভাঙল তার। সামনে রোদের চিকচিকে ছটা যেন হাসছে। বনওয়ারীও হাসলে। কালোবউ নাই।

চার

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় দিন গেলে যে-রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙল-চন্দনপুরের রাত্রির অনেক তফাত। বাঁশবন যোগান দেয় তার তলায় লুকিয়ে-থাকা আদ্যিকালের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। তার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকে, হরেক রকম পোকা ডাকে, তক্ষক ডাকে, টকটক শব্দ ক'রে, প্যাঁচা ডাকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে, আবার গভীর রাত্রে ডাকে হুম-হুম পাখি। বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপ-দপ ক'রে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির মত ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমূলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যাঁ-ক্যাক ক্যাঁ-ক্যাক ডাক ওঠে, কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়—গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে—সেটা উঠে যাচ্ছে সোজা উপরে। সেটা ওদের খেলা।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা তারই মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জ্বেলে কত্তাঠাকুরের নাম নিয়ে কোনমতে জটলা পাকিয়ে ব'সে থাকে। ছেলেছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্র মাসে ভাদু-ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা-দশভূজার পুজোয় গায় পাঁচালী, কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখন গানবাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, ধান-কাটা ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন ক'রে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের, বোলানের গানের পালা।

মাঝে মাঝে এরই মধ্যে আসে দু-দশটা রাত্রি, যার সঙ্গে অন্য সকল রাত্রির কোন মিল নাই। বিয়ে-সাদীর রাত্রি, আর বারো মাসে বারোটা পূর্ণিমা কি 'চতুকদশী'র রাত্রি, তার মধ্যে আষাঢ়-শাঙন-ভাদরের 'ডাউরী' অর্থাৎ বাদল-লাগা পূর্ণিমা 'চতুকশশী' বাদ। বাকি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আলো ঝলমল করে। সেই কয়েকটা রাত্রে আমোদ লাগে, এক দিকে আলো অন্য দিক অন্ধকার—বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকার সেই কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে বাঁশতলার জট-পাকানো শিকড়গুলোর মধ্যে, কত কালের ঝরা বাঁশপাতার বিছানায়।

করালী ও পাখীর বিয়েতে বাঁশবনের অন্ধকার ঘুঁটে-কেরোসিনের লালচে আলোর ছটায়

ঘুমিয়ে থাকল কদিন। ঢোল-কাঁসি-সানাইয়ের বাজনা আর মেয়েলী মিহি গলার গানের কাছে হার মানলে—ঝিঁঝি, প্যাঁচা, তক্ষক, পোকা-মাকড়, এমন কি অপদেবতারা পর্যন্ত।

বিয়ে চুকে গেল। কেরোসিন-ভেজানো ঘুঁটের ছাইগুলি পর্যন্ত সাফ ক'রে সারকুড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল, হাঁড়িগুলির কতক ফেরত গেল আবগারি দোকানে, কতক খালি হয়ে প'ড়ে রইল উঠানের পাশে। কাহারপাড়ার লোকদের শরীর থেকে তেল হলুদ মিলিয়ে গেল—আবার অঙ্গে লাগল মাঠের ধুলো, মাথায় লাগল খড়ের কুটো। শুধু কাপড়ে এখনও ধুলো-ময়লার মালিন্যের মধ্যেও হলুদ ও লাল রঙের ছোপ লেগে আছে। বায়েনরা সঙ্গে সঙ্গেই বিদেয় হয়েছে; কাহারপাড়া প্রায় নিঝুম। শুধু নয়ানের মা আজও থামে নাই, সে গালিগালাজ দিয়েই চলেছে। তার আক্রোশ যেন বনওয়ারীর উপরেই বেশি। সে অভিসম্পাত দেয়—যে 'ঘরভাঙাদের' মাতব্বরি ঘুচিয়ে তাদের বউ কেড়ে অন্য জনাকে দিলে, পাকা ঘর ভেঙে দিলে, তার ঘরও ভাঙবে—ভাঙবে—ভাঙবে। হে কত্তাঠাকুর! হে বাবা গোসাঁই! বিচার কর, তুমি এর বিচার কর।

মধ্যে মধ্যে বলে—মনে পড়ে না! সে সব দিন মনে পড়ে না! বলতে বলতে নয়ানের মা কেঁদেও ফেলে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জল মুছে সে আগুনের মত তপ্ত গলায় বলে—আমার সব্বনাশ করতে আজ সাধু সেজেছে!

তা দিক। কাহারেরা পুরনো গালাগালিতে কোন কালে কান দেয় না। তার উপর এসে পড়েছে কাজ। উদয়াস্ত কাজ। গম কাটা, সরষে কাটা আরম্ভ হ'ল। ওদিকে জাঙলে শাল আরম্ভ হয়েছে। আখ কেটে মাড়াই ক'রে গুড় তৈরি করার আয়োজন। জাঙলের সদগোপ মহাশয়দের কৃষাণ কাহারেরা, তারাই লাগিয়েছে আখ।

এ কাজ আগে রতন কাহারদের ঘরে বাঁধা ছিল। দিনরাত্রি আখ কাটা চলেছে, খোসা ছাড়াচ্ছে, বোঝা বাঁধছে, মাথায় ব'য়ে এনে ফেলেছে মাড়াই-কলের সামনে। পেল্লাদ বসেছে কলের সামনে—সে-ই কলে যুগিয়ে দিচ্ছে আখ। হুঁশিয়ারির কাজ, একটু বেহুঁশ হ'লেই কল আঙুল টেনে নেবে; গরু থামাতে থামাতে গোড়া পর্যন্ত আঙুল চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে কেটে প'ড়ে যাবে। ওই রতনের বাবার নাম ছিল 'কলকাটা'; কলে তার চারটে আঙুল কেটে গিয়েছিল। শুধু বেঁচেছিল বুড়ো আঙুলটি। রসিক লোক ছিল রতনের বাপ। সে বলত—আঃ, বুড়ো আঙুলটা আমাকে লবডঙ্কা দেখাতে বেঁচে গেল! চার-চারটে আঙুল গেল, ডান হাতটি খোঁড়া হ'ল—বেঁচে রইল বুড়ো আঙুলটি। হে কত্তাঠাকুর! 'শ্যাষ-ম্যাষ' এই কল্ল্যা বাবা!

তবে কিনা মনিব মহাশয়েরা দয়ালু, ওই কত্তাঠাকুরের পরই যদি কেউ জগতে 'রাখলে রাখতে মারলে মারতে' পারেন, সে ওই মনিব মহাশয়েরা। দয়ালও বটেন আবার দণ্ডও দেন। রতনের বাপের মনিব দয়া করেছিলেন, ছেরজনম রতনের বাপকে মাসে পাঁচ শলি অর্থাৎ আড়াই মণ ধান আর এক টাকা 'য্যাতনে' গরু-বাছুরের সেবার তদ্বির আর চাষবাসের দেখাশুনা করতে চাকর রেখেছিলেন। রতনের বাপ অবিশ্যি ক্রমে ডান হাতের ওই বুড়ো আঙুলের জোরেই কায়দা ক'রে কাস্তে ধ'রে খড়ও কাটত, অল্পস্বল্প সময়ের জন্য কোদালও চালাত; লাঙলের মুঠো বাঁ হাতেই ধরে, তবে ডান হাত দরকার গরু চালাবার জন্য, তাও

সে সুকৌশলে ওই লবডঙ্কা দেখিয়েই চালিয়ে নিত। মনিব রতনকেও রেখেছিলেন রাখাল, ক্রমে রতন বড় হয়ে সেই বাড়িতেই কৃষাণি করেছে। রতনের বাপ রতনকে কলের মুখে যেতে 'নেষেধ' ক'রে দিয়েছে, কত্তাঠাকুর নাকি স্বপ্নে তার বংশকে কলের কাছে যেতে বারণ করেছেন ; বিশ্বকর্মাঠাকুর লোহা-লক্কড়ের দেবতা—তার স্থানে অপরাধ করেছিল রতনের বাপ, সে পাপে তার এই শাস্তি ; কবে কামারশালায় ফাল মেরামত করাতে গিয়ে মদের ঘোরে অশুদ্ধ করেছিল বিশ্বকর্মার আটন। তার শাস্তিতেই রেহাই নাই—বংশের উপরেও শাপমন্যি পড়ে আছে।

রতন আছে গুড় তৈরির কাজে। গুড় তৈরির ভিয়েনে সকলের উপরে বনওয়ারী ; এক হেদো মণ্ডল মহাশয় ছাড়া—জাঙল, বাঁশবাঁদি, কোপাইয়ের ওপারে গোয়ালপাড়া, রাণীপাড়া, ঘোষগ্রাম, নন্দীপুর, কর্মমাঠ এই সাতখানা গ্রামে গুড় তৈরির কাজে বনওয়ারীর জুড়ি কেউ নাই। বনওয়ারীর 'হাতে তোলা' গুড় ঠাণ্ডা হতে হতে জমতে থাকে—ঢেলা বেঁধে হয় মিছরির চাঁইয়ের মত, দানা হয় মোটা, স্বাদে এমন মিঠা যে চিনি ফেলে সে খেতে হয় ; সব চেয়ে বড় গুণ—বছর ধ'রে রেখে দিলেও গন্ধ হয় না।

মস্ত বড় চুলোয় দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, মাথার উপর বাঁশের কাঠামো ক'রে তালপাতা দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে একটা। চুলোর সামনে ঢিপির উপর বসেছে বনওয়ারী। চুলোর মুখে আখের খোসা দিয়ে জ্বাল দিচ্ছে রতনের ছেলে লটবর। প্রকাণ্ড কড়াইটার মধ্যে আখের রস জ্বাল খেয়ে উথলে উথলে উঠছে। বনওয়ারী ছাঁকনায় ভরে 'গাদ' অর্থাৎ ময়লা তুলে একটি টিনে জমা ক'রে রাখছে। ওগুলো খাবে গরুতে। রতন আছে বনওয়ারীর পাশে। মধ্যে মধ্যে বনওয়ারী উঠে স'রে দাঁড়ালে সে বসছে তার জায়গায়। মণ্ডল মহাশয়রা একপাশে ব'সে আছেন। হেদো মণ্ডল আছেন, আরও আছেন জনকয়েক। এবার মণ্ডল মহাশয়দের কড়া নজর গুড়ের উপর। পিথিমীতে যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধ চলছে—সায়েব মহাশয়দের মধ্যে। জিনিসপত্রের নাকি দর চড়বে। ধান চাল গুড় কলাই সমস্ত কিছুরই দর উঠবে। তাই মণ্ডলেরা 'সতর' হয়েছেন, একটি ভাঁড় গুড় যেন না সরে। সরাবে আর কে? সরাতে তো কাহাররাই। বনওয়ারী মনে মনে একটু 'বেথা' পেয়েছে এতে। অবিশ্যি কাহারেরা সাধু নয়, সবাই অবিশ্যি বনওয়ারী অতন পেল্লাদ নয় ; চুরি 'খানিক আদেক' করে আর সকলে। কিন্তু যতক্ষণ বনওয়ারী হাজির আছে শালের চালায়, ততক্ষণ কারুর ক্ষমতা নাই এক হাতা গুড় চুরি করে। এ কথা সবাই জানে। তবু বনওয়ারী থাকতে এমন নজর রাখার মানে তো বনওয়ারীকে অবিশ্বাস করা। তা করুন। বনওয়ারী আপন মনেই গুড় তৈরির কাজ ক'রে যায়। সে ভাবে যুদ্ধের কথা।

এ দুনিয়া আজব কারখানা! বৈষ্ণব ফকির গান করতে আসে, তাদের গানে শুনেছে বনওয়ারী—এ দুনিয়া আজব কারখানা। ফকিররাও কাহারপাড়াতে আসে। তারা বলে—আল্লা-তালার আজব কারখানা। তাই বটে। বনওয়ারী মনে মনে স্বীকার করে সে কথা। বাউল আসে, বৈষ্ণব আসে, সন্ন্যাসী আসে, সবাই ওই এক কথাই শুনিয়ে যায়। কাহারেরা শোনে, ভাবে। আগে দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরান-পাখীর কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত। মায়ের 'গভ্যের' মধ্যে ব'সে কারিগর খাঁচা তৈরি করে—হাড়ের শলা

দিয়ে খাঁচা তৈরি ক'রে পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দেয়, তার মধ্যে সুড়ুৎ ক'রে এসে ঢোকে একটি পরান-পাখি। সে পাখি নাচে, বুলি বলে, কত রঙ্গ করে। তার পরে আবার একদিন ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে পালায়। ভেবে ভেবে কূলকিনারা মিলত না, কাহাররা 'পিতিপুরুষ'—ক্রমে নীলবর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে 'পরানপাখি'র আনাগোনার পথের দাগ আর সেই আজব কারিগরের আস্তানা খুঁজত ; খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বাবা-ঠাকুরের বেলতলায়, এবং 'কালারুদ্দে'র দরবারে লুটিয়ে প'ড়ে বার বার বলত—অপরাধ মাজ্জনা কর বাবা। কোলের কাছে অন্ধকার, তুমি 'অইচ' পক্ষ দিয়ে ঢেকে, বক্ষ দিয়ে আগুলে,—আর তোমাকে আমরা খুঁজে মরছি কোথা কোন্ বেম্মাণ্ডে বেম্মাণ্ডে।

এখন কিন্তু কোম্পানির কলের গাড়িতে, 'অ্যালের' পুলে, তারে তারে টেলিগেরাপে, হাওয়া-গাড়িতে -দুনিয়ার আজব কারখানা তারা যেন চোখে দেখছে। তার উপরেও আজবকাণ্ড এই যুদ্ধ। অবাক রে বাবা। কোথা কোন 'দ্যাশে' সাত সমুদ্দুর তেরো 'ল্দী' পারে কে করছে কার সঙ্গে যুদ্ধ, এখানে চড়বে ধানের দর, চালের দর, আলু গুড় কলাই তরিতরকারির দর। জাঙলের সদগোপ মহাশয়রা কোমর বাঁধছে—টাকা জমাবে ; বলাবলি করছে কাপড়ের দর চড়বে। আবার নাকি কোম্পানিতে যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করবে

তবে কাহারপাড়ার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে যারা ছায়ার ঘেরায় বাস করে তাদের ভাবনা নাই।

ধান চাল গুড়ের দাম বাড়লে তাদের কিছু লাভ নাই। তারা মনিবের ক্ষেতে খেটে খায় : ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়, তাও ছ-মাস খেতে-খেতেই ফুরিয়ে যায়—বাকি ছ-মাস মনিবের কাছে 'দেড়ী'তে ধান নেয়, বেচবার মত ধান চাল তাদের নাই। বেচেও না, কেনেও না বাড়ির কানাচে শাকপাতা হয়, পুকুরে বিলে নালায় নদীতে শামুক গুগলি আছে—ধ'রে নিয়ে আসে। কয়লার দাম চড়ে ; কাহারেরা জীবনে কখনও কয়লা পোড়ায় না, নদীর ধারে ঝোপজঙ্গল থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে ; গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়, তার দুচারখানা নিজেরা পোড়ায়—বাকি বিক্রি করে চন্দনপুরে জাঙলে কাপড়ের দর চড়লে কষ্ট বটে। তাই বা কখানা কাপড় তাদের লাগে ? পুরুষদের তো ঘর সময় ছ মাস অধেক দিন গামছা পরেই কাটে। বাকি অর্ধেক দিন—ছ-হাত মোটা কাপড় পরে।

বছরে চারখানাতে 'ছচলবছল' অর্থাৎ স্বচ্ছল, তিনখানা হ'লেও চলে যায়। মেয়েরা 'একটুকুন' সাজতে গুজতে ভালবাসে, কোপাই নদীর 'আলবোড়েমি' তাদের চিরকাল আছে, তাদের দু'একখানা মিহি ফুলপাড় শাড়ি চাই-ই। দুখানা হ'লেই খুব। বাইরে যাবার সময় পরে। ঘরে মোটা খাটো কাপড়েই চলে। তার জন্যেও খুব বেশি ভাবতে হয় না। ফুলপাড় মিহি শাড়ির দাম যোগাতে হয় না ঘরের কর্তাকে, মেয়েরা ও নিজেরাই রোজগার ক'রে নেয়—চন্দনপুর জাঙলে রেজা খেটে, ভদ্রজনের বাবুভাইয়ের কাছ থেকে। আর একটা যুদ্ধ দেখেছে বনওয়ারী। তেরশো বিশ একুশ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল—কয়েক বছরই ছিল ; বেশ মনে আছে বনওয়ারীর। ছ টাকা জোড়া কাপড় হয়েছিল। ধানের দর হয়েছিল চার টাকা। এই তখুনি চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা কয়লার কারবারে ফেঁপে রাজা হয়ে উঠল। বনওয়ারীর মনিব মাইতো ঘোষ পাট কয়লা বেচে কম টাকা করে নাই। অনেক টাকা।

চন্দনপুরের চার পাঁচ ঘর জমিদার-বাড়ি ভেঙে গেল, মহাল বিক্রি করলে ; জাঙলের চৌধুরী-বাড়ি একেবারে 'নাজেহাল' হয়ে ফেল প'ড়ে গেল। জাঙলের সদগোপের বৃদ্ধি ওই যুদ্ধের সময়। আগে সবাই ছিল খাঁটি চাষী, কাহার-কৃষাণদের সঙ্গে তারাও লাঙলের মুটো ধরত, কোদাল ধরত, খাটো কাপড় পড়ত ; যুদ্ধের বাজারে ধান চাল কলাই গুড় বেচে সবাই ভদ্রলোক হয়ে গেল। এবার আবার সবাই কোমর বেঁধেছে, এ যুদ্ধে যে তারা কি হবে, কে জানে। তবে তাদের মঙ্গলই কামনা করে কাহারেরা। তাদের লক্ষ্মীর বাড়-বাড়ন্ত হ'লেই কাহারদের মঙ্গল, তাদের মা লক্ষ্মীর 'পাঁজের' অর্থাৎ পদচিহ্নের ধুলো কুড়িয়েই কাহারদের লক্ষ্মী। যুদ্ধে কাহারদের কিছু যায়-আসে না।

সদগোপ মহাশয়রা চট বিছিয়ে ব'সে যুদ্ধের কথাই বলছেন। কথা হচ্ছে—মসনের চাষে এবার জোর দিতে হবে। চন্দনপুরের বাবুদের 'গ্যাজেটে' অর্থাৎ খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে—মস্‌নের তেলের দরকার হবে যুদ্ধে, ওর দরটা খুব বেশি চড়বে।

বনওয়ারী আপন মনেই সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়তে থাকে।

আজব কারখানাই বটে রে বাবা ! ধান-চাল, কলাই-পাকড়, গুড়-আলু, এ সবের চেয়ে দর বাড়বে মস্‌নের। 'প্যাটের' খাদ্য নয়, গায়ে মাখবার 'ত্যাল' নয়, পরবার কাপড়ের তুলো নয় ; মসনের পুলটিস দিতে হয় এই জানে বনওয়ারী—তার ত্যাল, এ লাগবে কিসে ?

ঝম-ঝম—গম-গম—ঝম-ঝম—গম-গম।

দশটার ট্রেন চলেছে কোপাইয়ের পুল পার হয়ে। মণ্ডল মহাশয়রা এইবার গা তুলবেন, বাড়ি যাবেন খেতে। খেয়ে-দেয়ে আসবেন হেঁদো মণ্ডল আর যাঁর গুড় হচ্ছে তিনি, আরও একজন। হেঁদো মণ্ডল পড়বেন চিত হয়ে—নাক ডাকবে কামারের হাপরের মত, হাঁ হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে ফরর্ ফরর্ শব্দ হবে।

এই মণ্ডলেরা যখন থাকবেন না, তখন একবার তাদের আরামের সময়। প্রাণ খুলে তারা দু-দশটা রসবিলাসের গালগল্প করবে।

মণ্ডলেরা চ'লে যেতেই বনওয়ারী উঠল। উঠে এসে আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে ওই চটের উপর ব'সেই বললে, লটবর, একবার ভাল ক'রে তামাক সাজ তো। আর অতনা, 'রসির' ভাঁড়টা একবার দিস। জল আনিস খানিক, হাত মুখ ধুতে হবে।

কাহারপাড়ায় এইবার ঢোলের বাজনা থামবে। এ ঢোল বায়েনদের বাজনা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে আদ্যিকালের অন্ধকার মিশে যে অন্ধকার নামে কাহারপাড়ায়—তার প্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য যে একঘেয়ে গান-বাজনার আসর বসে ওদের, সেই গানবাজনার আসরের ঢোল। চৈত্র মাসে আসছে ঘেঁটুগানের পালা। তারই উদ্যোগপর্ব চলেছে। একটা ঢোল থামল। এখনও দুটো ঢোল বাজছে। বাঁশবাঁদিতে তিনটে ঘেঁটুর দল। একটা কাহারপাড়ার পুরনো দল, একটা আটপৌরেপাড়ার, এর উপর বছর দুই হ'ল করালী একটা নতুন দল করেছে। করালীর দলে নসুদিদি আছে—সে নাচে কোমর ঘুরিয়ে ঝুমুর দলের মেয়ের মত। করালী একটা বাঁশের বাঁশি কিনেছে, সে সেটা বাজায়। ও দলের এখন চলতি খুব। গান বেঁধে নিয়ে আসে চন্দনপুরের মুকুন্দ ময়রার কাছ থেকে। নতুন রকমের গান। এবার নাকি যুদ্ধ নিয়ে গান বেঁধেছে ময়রা মহাশয়।

"সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই।
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্‌খাগোড়াই—
ও হায়, মরব মোরাই উলখাগোড়াই।"

বনওয়ারীর আর মনে নাই। তবে শুনেছে একদিন সমস্তটা। ময়রা জানে অনেক। হাজার হ'লেও চন্ননপুরের ময়রা। চন্ননপুরে ডাকে 'গ্যাজেট' আসে, আবার ট্রেনে গ্যাজেট আসে। রোজ বেলা দুটোর সময় ছেলে-ছোকরারা ভিড় ক'রে ইস্টিশানে আসে, গার্ড সাহেব কাগজের বাণ্ডিল নামিয়ে দিয়ে যায়, বনওয়ারী স্বচক্ষে দেখেছে। মুকুন্দকেও 'গ্যাজেট' পড়তে দেখেছে সে। গানের মধ্যে অনেক কথা দিয়েছে সে। গান্ধীরাজার কথা পর্যন্ত আছে। মন্দ লাগে নাই বনওয়ারীর ; ভালই লেগেছে। করালী ছোকরার নতুন দলের বিরুদ্ধে বনওয়ারীর আপত্তি অনেক দিনের। ছোকরা রেলে চাকরি ক'রে সেখান থেকে অনেক খারাপ ব্যম্পার নিয়ে আসে। এবার কিন্তু গানটি ভাল এনেছে। অনেক কথা শুনবে লোকে। ছোকরাও এবার বাগ মেনে এসেছে। ভাল করে বাগ মানাতে হবে ওকে। করালী যদি 'ধরম' তাকিয়ে ইজ্জত রেখে সোজা রাস্তায় চলে, তবে করালী হতে কাহারপাড়ার অনেক 'হিতমঙ্গল' হবে ব'লেই বনওয়ারীর বিশ্বাস। নইলে ও-ই উচ্ছন্ন দেবে কাহারপাড়াকে। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই কালকারখানার তেলকালি-ভরা অলক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়। ছেলেগুলো গাঁ ছাড়বে, পক্ষিবহন ছাড়বে, পিতিপুরুষের কুলকর্ম জলাঞ্জলি দেবে। মেয়েগুলোও যাবে পিছনে পিছনে। বনওয়ারী তা হ'তে দিতে পারবে না, কখনও না। তাই সে করালীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে আদর ক'রে তার আবদার রেখে কোলগত ক'রে নিতে চায়। তাই তার মন খুঁতখুঁত করলেও সে নয়ানের ঘর ভেঙেও পাখীর সঙ্গে করালীর বিয়ে দিয়েছে। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সে কারণটা তার মনই জানে, আর কেউ জানে না। কালোশশীকে সে যে ভালবাসে। সে ভালবাসা তার মনের মধ্যে কুলকাঠের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছেই—জ্বলছেই। ওদেরও তো সেই ভালবাসাই।

রতন 'রসি' মদের ভাঁড়টা নিয়ে এসে কাছে বসল

বনওয়ারী বললে, পেহ্লাদকে ডাক।

প্রহ্লাদও এসে বসল। বনওয়ারী প্রশ্ন করলে, রস ক পাতনা হ'ল রে?

প্রহ্লাদের হাতে ছটা আঙুল—সে বললে, এক হাত। তারপর হেসে এবার বলল, ছ পাতনায় পড়ল।

ওরে বাপ রে। আটপৌরেপাড়ায় এবার ঘেঁটুর ধুম দেখা যায় খুব। ঢোলের শব্দ এই রাত্রিতে জোরালো হয়ে উঠল। করালীর দলের ধুমের কথা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আটপৌরেপাড়ায় হঠাৎ এত ধুমের কারণ কি?

হবে। পরম এবার জমি নিয়েছে চন্দনপুরের বাবুদের কাছে, এবার ওর শরীরে বল বেঁধেছে, মনে মনে তেজ হয়েছে। হাসলে বনওয়ারী। জমি সেও নিয়েছে। পরমেব চেয়ে বেশি জমিই নিয়েছে সে।

প্রহ্লাদ হেসে বললে—আটপৌরেপাড়ায় এবার ঘেঁটুর ধুম বটে। ওদের গান শুনেছ?

—না। হাসলে বনওয়ারী।

—শুনো একদিন। প্রহ্লাদ উঠে গেল। কলের দাঁতওয়ালা চাকায় ক্যা-কটো-কটো শব্দ উঠেছে, তেল দিতে হবে।

—আটপৌরেপাড়ায় গান। বনওয়ারী আবার হেসে বললে, ওদের তো সেই পুরনো গান। ওদের চেয়ে আমাদের পুরনো গান অনেক ভাল। সে গান বনওয়ারীরই বাঁধা।

"তাই ঘুনাঘুন—বাজেলো নাগরী—
ননদিনীর শাসনে,—চরণের নূপুর থামিতে চায় না।
ঘরে থাকিতে মনো চায় না। ও—তাই—তাই ঘুনাঘুন।"

রতন চুপ করেই ছিল, সে এতক্ষণে বললে—এবার ওরা লতুন গান গাইছে।

—লতুন গান? বাঁধলে কে?

—তা জানি না। তবে—

—কি তবে?

—তবে গানে করালীকে তোমাকে শাপ-শাপান্ত করেছে। মধ্যে মাঝে

—কি মধ্যে মাঝে?

মৃদুস্বরে রতন বললে—বাপু, গজু-গজু ফুসু-ফুসু চলছে, ওই পানা হারামজাদা নাকি উ-পাড়ায় শুনেছে, কালোশশীকে নিয়ে—

চমকে উঠল বনওয়ারী।

একটু পরে সে বললে—এইটুকুন দেখিস তু। আমি একবার শুনে আসি কি গাইছে শালোরা।

পাঁচ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বাঁশবনের অন্ধকার রাজ্যময় ভিতরে বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—বাঁশবনের গোড়ায়, আদিমকাল থেকে ঝ'রে পড়া পচা বাঁশপাতার নিচে, ঝোপঝাড়ের ঘন আবরণের মধ্যে, বটগাছের কাণ্ডের গহ্বরে, কাহারপাড়া আটপৌরেপাড়ার ঘরের কোণ-কানাচ থেকে মানুষগুলির মনের কোণে পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

আটপৌরেদের ঘেঁটুগানের জোর সত্যিই এবার খুব বেশি। লহর ছুটিয়েছে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে শুনলে।

"হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে, তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতি বাড় বাড়িল যারা তাদের ভে-ঙে পাড়ো।"

ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল বনওয়ারীর বুকটা। সেই সাপ নিয়ে ঘেঁটুগান বেঁধেছে আটপৌরেরা। অভিসম্পাতটা অবশ্যই করালীকে, কিন্তু তবু তার খানিকটা অংশ বনওয়ারীর উপরেও এসে পড়েছে ব'লে তার নিজেরই মনে হ'ল। ছমছম ক'রে উঠল চারিদিক, মনটা কেঁপে উঠল।

"বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা
সাঁজের পিদীম বলো ফুঁ দিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের এ কি লীলা সনজে বেলাতে।
মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় হায় কি গলাগলি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি।
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সনজে দেখালে
হায় কলিকালে—"

বনওয়ারীর হাত পা যেন অসাড় হয়ে গেল।

কালোশশীর সঙ্গে তার এই বটতলাতে দেখা হওয়ার কথা তা হ'লে কেউ নিশ্চয় দেখেছে। যে-ই দেখুক, কিন্তু সত্যই তো এটা তার অপরাধ। কাপড় সে ছেড়েছিল। বাড়ি ফির প্রদীপ জ্বেলে ধূপ নিয়ে আসবার সময় কথাটা তার মনে হয়েছিল, কিন্তু স্নান তো করে নাই। স্নান করা তার উচিত ছিল। তা ছাড়া আজ মনে হচ্ছে, বাবার বাহনকে মেরেছে যে করালী, তাকে শাস্তি না দিয়ে এমন ভাবে সমাদর করা তার অপরাধ হয়েছে—একশো বার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু দেখলে কে? পরম নিশ্চয় নয়। পরম দেখলে কখনই চুপ ক'রে থাকত না। কালোশশীর মতিগতি সবাই জানে; মধ্যে মধ্যে ভূপ সিংহ মহাশয় এখনও আসেন, চন্ননপুরে গেলে কালোশশী এখনও অনেক জনের সঙ্গে ঢ'লে প'ড়ে কথা বলে, সে সব কথার মানে দু রকম হয়। জাঙলেও সদগোপ মহাশয়দের মধ্যে আধাবয়সী যাঁরা, তাঁদের দিকেও বাঁকা চোখে তাকিয়ে কালোশশী মুচকে হাসে। সবই সত্যি, সবই জানা কথা, তার সঙ্গেও এককালে মনে মনে 'অঙ' ধরেছিল এও জানে লোকে; কিন্তু এমন ঘটনা পরম চোখে দেখে কখনও সহ্য করতে পারত না। তখনই 'হাঁকার' মেরে সে লাফিয়ে এসে পড়ত। বনওয়ারীর সঙ্গে এক হাত হয়ে যেত। হয়তো দুজনের একজন শেষ হয়ে যেত সেই দিনই—তখনই। কাহারপাড়া এবং আটপৌরেপাড়ায় রেষারেষি আছে একটা—চিরদিন 'পিতিপুরুষ' ধরে। আটপৌরেরা বলে, আমরা পাল্কি বহন করি না, আমাদের ঘোড়া 'গোত্ত' নয়। তাদের গোত্র ঘোড়া গোত্র নয়, 'বাহন গোত্র', ওরা ঠাট্টা ক'রে বলে, ঘোড়া গোত্র। ঘোড়া গোত্র হোক আর বাহন গোত্রই হোক, সে করেছেন ভগবান—ওই বাবাঠাকুর। আটপৌরেরা কি? লাঠি কাঁধে দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছেন, ঠেঙাড়ে ডাকাত গোত্র যে তোদের। দূত গোত্তও যা, ও ডাকাত-ঠেঙাড়ে গোত্তও তাই। এখনও পর্যন্ত বেটারা থানার খাতায় দাগী, হাজরে দিতে হয়, চৌকিদার রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডাকে। কোন বেটা আটপৌরের ঘরের চালে খড় নাই ভাল ক'রে, হাঁড়িতে অর্ধেকের বেশি চাল নাই। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে কাহারদের ঝগড়া চিরকালের। এককালে অবিশ্যি ওদেরই প্রতাপ ছিল বেশি। সে আমলটা হাঁসুলী বাঁকের চুরি-ডাকাতির আমল। এখন সকলে চুরি ছেড়ে চাষবাস করছে, এখন কাহারদের উন্নতির কাল। আগে আটপৌরেরা কাহারদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, আজ হিংসে করে। এ গান কোন বেটা হিংসুটে আটপৌরের বাঁধা। ব্যাপারটা জানতে হবে বনওয়ারীকে।

বলতে পারে একমাত্র কালোশশী। কালোশশীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে তাকে। কিন্তু ভয় হয়। কালোশশীর মধ্যে নেশা আছে, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ক্ষিদের সময় মুখের অন্ন ছেড়ে উঠে আসা যায়, কিন্তু কালোশশীর কাছে গিয়ে মাতাল না হয়ে ফিরে আসা যায় না। এ মদ তার খাওয়ার উপায় নাই। তার সে দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। কাহারপাড়ার সে মাতব্বর। মাতব্বরের নিন্দে হ'লে মাতব্বরী থাকে না, লোকে মুখ টিপে হাসে—শাসন মানে না। তার পাপে জাতজ্ঞাতের অকল্যাণ হয়। যে পাপ সে করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তই তাকে করতে হবে।

গাছতলা থেকে আবার সে বেরিয়ে সন্তর্পণে চলল আখের শালের দিকে। শালে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত মণ্ডল মহাশয় এসে গিয়ে থাকবেন। বনওয়ারীকে গরহাজির দেখে হয়তো গাঁ-গাঁ শব্দে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছেন। বনওয়ারী একটু দ্রুতপদেই চলল। কতকগুলি গালিগালাজ শুনতে হবে আর কি। বনওয়ারী না হয়ে অন্য কেউ হ'লে তার অদেষ্টে নির্ঘাত 'পেহার' জুটত। বনওয়ারীর গায়ে হাত তুলতে কেউ সাহস করে না। সাহস ক'রে হাত তুললে বনওয়ারীও তার হাত ধ'রে ফেলবার সাহস রাখে। অবিশ্যি এক চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা ছাড়া। বাপ রে, বাপ রে, কি ধনদৌলত চারিদিকে। যাকে বলে, মা-রাজলক্ষ্মী অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার প'রে 'বানারসী' কাপড় প'রে বিয়ের কনেটির মত গয়নার ঝুম-ঝুম-ঝুম-ঝুম ঠিন-ঠিন শব্দ ক'রে বানারসী কাপড়ের খসখস শব্দ তুলে অহরহ বেড়াচ্ছেন। কাহার বনওয়ারী পাল্কি ব'য়ে বুড়ো হ'ল, এ অঞ্চলে কত বড় বড় বাড়ির বিয়ের কনেকে পাল্কি ব'য়ে শ্বশুরবাড়ি এনেছে, বনওয়ারী বলে—'নক্ষ্মীকে এনেছি নারায়ণের বৈকুণ্ঠে।' গয়না কাপড় সে অনেক দেখেছে, অনেক সুবাস শুঁকেছে, অনেক গয়নার বাজনা শুনেছে। কিন্তু চন্দনপুরের বাবুদের মতন বর্জরের গয়না কাপড়ের 'বন্ধ' এ আর সে দেখে নি।

খুব 'ত্বরিত গমনে' চলতে চলতে হঠাৎ বনওয়ারী যেন আপনিই থেমে গেল। পা যেন আটকে গেল। পশ্চিম দিকে বাঁ পাশেই বাবাঠাকুরের থান। ডান দিকে দূরে দোয়েম জমির মাঠে আখ কাটছে কাহাররা, ঝুপঝাপ খসখস শব্দ উঠছে। কথাবার্তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সামনে জাঙলের আমবাগানে শাল চলছে, আলোর ছটা আসছে। কিন্তু সমস্ত কি ভুলে গেল বনওয়ারী? সে ধীরে ধীরে চলল বাবাঠাকুরের থানের দিকে। অপরাধ—অপরাধ হয়েছে বনওয়ারীর। হে বাবাঠাকুর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর। আঃ, কি মতিভ্রমই হ'ল করালীর! হায়, হায়, হায়। ধর্ম্মনাশা করালী। বাবার বাহনটিকে হত্যা করলে পুড়িয়ে? কি 'বিচিত্ত বন্ন', কি বাহার, কি শিস, কি 'পেকাণ্ড' বড়। তা ছাড়া কালোবউকে নিয়ে তার কি মতিভ্রম হ'ল এই 'পবীণ' বয়সে। হে বাবা, হে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তুমি এ দোষটি নিয়ো না বনওয়ারীর। করালীকেও ক্ষমা ক'রো বাবা। আর বনওয়ারীর একটি দোষ ক্ষমা ক'রো, ওই কালোশশীকে নিয়ে দোষটি তুমি ধ'রো না। কালোবউয়ের সঙ্গে তার ছেলেবয়সের 'অঙ'। এই বয়সে এতকাল পরে সে 'অঙ' মনের বারুদের সঙ্গে মিশে তুবড়িবাজির 'অঙিন' ফুলঝুরি হয়ে বেরিয়ে আসছে। আগুন লেগেছে, আর তাকে চাপা দেবার উপায় নেই। কালোবউ—কালোশশী যদি আটপৌরেপাড়ার মাতব্বর পরমের বউ

না হ'ত, তবে হয়তো বনওয়ারীর 'হিয়ের' তাপ এতখানি হ'ত না, আগুন লাগত না মনের বারুদে।

বাবার থানের প্রান্তভাগে বনওয়ারী দাঁড়াল। ওখানটিতে এই 'সনসনে' 'আত্তিকালে' হঠাৎ গিয়ে ঢুকতে নাই। বাবা খেলা করেন এখন, কখনও তপজপ করেন, কখনও খড়ম প'রে খটখট ক'রে বেড়ান, কখনও বেলগাছের ডালটি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন 'কালারুদ্দু' বাবার দরবারের দিকে চেয়ে।

হাততালি দিয়ে বাবাকে নিজের আগমনের কথা জানিয়ে সে আরও খানিকটা অগ্রসর হ'ল। কিছুদিন আগেই বাবার থান পুজো দেবার জন্য তারা পরিষ্কার করেছিল। হাঁসুলী বাঁকের পাষাণ মাটিতে এখন শীতের টান পড়েছে, আস্তে আস্তে তার উপর খরার অর্থাৎ গ্রীস্মের রোদের আমেজ লাগছে। জল নাই ; পরিষ্কার বাবার থানটি তাই এখনও পরিষ্কারই আছে। বনওয়ারী সেইখানে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। মনে মনে মানসিক করলে—বাবা, ক্ষমা কর তুমি, তোমার বেলতলাটি আমি বাঁধিয়ে দেব।

ঠিক সেই ক্ষণটিতেই একটা গোলমাল উঠল কাহারপাড়ায়।

ছয়

হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায় সনসনে রাত্রিতে গোলমাল চিরকাল ওঠে। এই সময়ে পুরনো ঝগড়া নতুন ক'রে বাধে। লোকে ঘুমোয়, সেই সময়ে কেউ ঘুম ভেঙে বাইরে এসে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সাধ মিটিয়ে গাল দিতে আরম্ভ করে। যদি প্রতিপক্ষটিও সেই সময়ে জেগে ওঠে দৈবক্রমে, তবে লেগে যায় চুলোচুলি। তা ছাড়া হঠাৎ লোকের সাড়ায় গোলমাল ওঠে কাহারপাড়ায়। জাঙলের চন্দনপুরের ছোকরারা সেই সময়ে শিস দেয়, সিটি দেয়, উঠানে টুপটাপ ক'রে ঢেলা ছুঁড়ে ইসারা জানায় কাহার-বাউড়ীর আলাপী মেয়েদের। মায়েরা পিসীরা মাসীরা শাশুড়ীরা শুনতে পেলে গোল হয় না, বাপেরাও বড় কিছু বলে না, কিন্তু ননদ কি স্বামী কি ভাই শুনলে গোলযোগ বাধবেই। চোর কাহারপাড়াতে আসে না ; এসে নেবে কি? তা ছাড়া কাকের মাংস কাকে খায় না, কাহারেরা একদিন নিজেরাই চোর ছিল ; আজ চুরি ছাড়লেও চোর নাম আছে, চুরির হদিসও ভুলে যায় নাই। বনওয়ারী কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলে গোলমালের মধ্যে কার কার গলার 'রজ' অর্থাৎ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাঁসুলী বাঁকের এই একটি মজা আছে। কোপাইয়ের ধারের বাঁশবনে ধাক্কা খেয়ে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার চেঁচামেচি স্পষ্ট হয়ে ফিরে আসে।

গলা শোনা যাচ্ছে নসুবালার। ওঃ, পুরুষের মেয়েলী ঢঙ হ'লে সে পুরুষ ঝগড়ায় মেয়ের বাড়া হয়ে উঠে। নসুকে নিয়ে আর পারা গেল না। হুঙ্কার দিচ্ছে করালী। তারস্বরে মেয়ের গলায় চীৎকার করছে কে?—ওগো, 'অক্ষে' কর গো, বাঁচাও গো।

নিশ্চয় মারপিট করছে করালী। কাকে? সুচাঁদ পিসীকে? পাখীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সুচাঁদ করালীকে ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু সুচাঁদের গলা হেঁড়ে গলা ; হাঁড়ির

ভেতর মুখ ভ'রে মেয়েতে কথা বললে যেমন আওয়াজ বের হয় তেমনই,—এ তো সে গলা নয়। তবে পাখীকে ঠ্যাঙাচ্ছে নাকি? কিছু বিশ্বাস নেই করালীকে।

আর্তনাদ কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে।

হাঁসুলী বাঁকের চারিদিকে বাঁশবন—'অরুণ্যের' অর্থাৎ অরণ্যের মত, সেখানে ডাল পড়লে ঢেঁকি না হোক, পাতা পড়লে কুলো না হোক, লড়াই লাগলে টুঁটি-ছেঁড়াছেঁড়ি হয়। 'অরুণ্যে' বাঘ-ভাল্লুকে আপন এলাকায় থেকে চেঁচায়, কাহারপাড়ায় আপন আপন আগুন থেকে গাল পাড়ে। তারপর এক সময় লাগে হাতাহাতি। তখন এ ওর টুঁটি টিপে ধরে, ও এর টুঁটি ধরতে চেষ্টা করে। এদের যে মাতব্বর, মরণ তারই। মরণ বনওয়ারী। ছুটল বনওয়ারী।

করালীই বটে। করালী নির্মমভাবে প্রহার করছে রুগ্ন নয়ানকে। চারিপাশে মেয়েরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নসুবালা হাতে তালি দিয়ে বলছে—লাক ছিঁড়ে দে, লাক ছিঁড়ে দে ছুঁচো কুকুরের।

সুচাঁদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিতেই কাহারদের মেয়েরা পুরুষদের লড়াই দেখে চিরকাল। সুচাঁদের দৃষ্টির মধ্যে খানিকটা ভয়ের আভাস দেখা দিয়েছে।

সুচাঁদ এ গল্প চিরদিন করবে। ঠিক এমনই দৃষ্টি তখন ফুটে উঠবে চোখে। বললে—বাবা রে, সে কি 'লড়ন'। সে যেন মহামাবণ। করালীর সে কী 'মত্তি'। সম্ভবত মনে মনে সে ভয় পায়, করালী যদি তাকে এমনি ক'রে মারে।

বসন চেষ্টা করছে করালীকে ছাড়াতে।—উঠে এস করালী; ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওগা মানুষ নয়ান। করালী—করালী।

পাখী ফোঁসফোঁস ক'রে কাঁদছে।

আর্ত চীৎকার করছে নয়ানের মা। সে প'ড়ে আছে উঠানের ওপর। মাথাব চুল খুলে 'রঙ্গে'র কাপড় খসে গিয়েছে; বুকে পিঠে ধুলোর চিহ্ন; কেরোসিনের ডিবের লালচে আলোয় তাকে মনে হচ্ছে রাস্তার পাগলিনীর মত। হারামজাদা নিশ্চয় তাকেও মেরেছে; ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, এতে আর সন্দেহ নাই। কী নিষ্ঠুর, কী দুর্দান্ত।

বনওয়ারী গিয়ে করালীর ঘাড়ে হাত দিয়ে ধ'রে দাঁতে দাঁত টিপে বললে—ছেড়ে দে।

বনওয়ারীর গলার আওয়াজের মধ্যেও বনওয়ারী আছে। চমকে মুখ তুলে তাকালে করালী।

—ছেড়ে দে।

ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও করালী বললে—ছেড়ে দোব? ওকে আমি মেরে ফেলাব।

—মেরে ফেলাবি?

নসু হাত-পা নেড়ে অঙ্গ দুলিয়ে ব'লে উঠল—ফেলাবে না? মেরে ফেলাবে না কেনে, শুনি? তোমার পরিজনের লোক যদি কামুড়ে ধ'রে লাক কেটে দিতে যায়, তবে তুমি তাকে মেরে ফেলাবে না? ছেড়ে দেবা? গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সন্দেশ খেতে দেবা?

নয়ানের মা ছেলের কাছে এসে ছেলেকে তুলতে চেষ্টা করছিল, সে ব'লে উঠল—কার পরিবার? লয়ানের বিয়েলো বউ লয় উ? যে পরিবার স্বামীর ওগ দেখে ফেলে চ'লে

যায়, সাঙা করে, তার নাক কেটে দেবে না?

বনওয়ারী বুঝে নিলে ব্যাপারটা। পাখী এসে সামনে দাঁড়িয়ে আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা। সে নিজের নাকটা দেখিয়ে বললে—দেখ।

নসুবালা একজনের হাত থেকে কেরোসিনের ডিবেটা প্রায় কেড়ে নিয়ে পাখীর নাকের সামনে ধ'রে বললে—ব'ল, চোখ তো আছে, মাতব্বর মানুষ, বিচেরও আছে, বলি একবার দেখ। নাকে কামুড়ে কি করেছে, দেখ। 'সব পুত থাকতে নাতির মাথায় হাত।' হাত গেল, আঙুল গেল, পিঠ গেল, কাঁধ গেল, গিয়ে নাকে কামড়?

সত্যিই নাকে দাঁতের দাগের ঘের জুড়ে লালচে রক্তাভ দাগ হয়ে গিয়েছে। নয়ানের দিকে তাকালে বনওয়ারী। হাঁপানীর রুগী বেচারা, নির্জীবের মত প'ড়ে আছে, যে শাসন তার হয়েছে তার উপর শাসনের আর উপায় নাই। তা ছাড়া নয়ানের উপর যে আঘাত দিয়েছে, তার জন্য বনওয়ারীর মনে যে অন্যায়বোধটুকু খচখচ করছিল, সেটাও এই সুযোগে বড় হয়ে উঠল। সে কিছুতেই মানতে পারলে না, শাসনটা ন্যায্য শাসন হয়েছে। বনওয়ারী বললে—বোঝলাম, সব বোঝলাম। কিন্তু তবু অন্যায় হয়েছে। নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে। ওগা মানুষটা যদি ম'রে যেত? মুখ এখে বাক্যি আর ঠাঁই একে মার—পিতিপুরুষে ব'লে যেয়েছেন ই কথা।

করালী ব'লে উঠল কোম্পানীর আইনে মেয়েমানুষকে এমন ক'রে কামুড়ে দেওয়ার জন্য জ্যাল হয়।

বনওয়ারী গর্জে উঠল করালী।

—কি। আমি অন্যায় কি বললাম।

- এই দেখ। চন্ননপুরে পালাতে হয়েছিল তোকে গাঁ ছেড়ে। আমি তোকে সব ক্ষমাঘেন্না ক'রে আবার এনেছি গেরামে। যখন আনি, তখন কি কি বলেছিলাম মনে কর। আমার কথা শুনে চলতে হবে, পবীণদের অমান্য কর্ব্বি না, অধম্ম অনাচার করবি না। তু স্বীকার করেছিলি কি না?

করালী জবাব দিলে না কথার। পাখীকে টেনে বললে—চ'লে আঃ

চ'লে গেল তারা। নসুবালা কোমর ঘুরিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠল—আঃ ম'রে যাই। চল গো চল। ঘর চল সব। সেই যে বলে--

"চোখের জলে নরম হ'ল মাটি—
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিত।"

ব'লেই সে ঠোঁটে পিচ কেটে সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেল।

হয়তো সেই মুহূর্তে বনওয়ারী একটা কাণ্ড ক'রে বসত কিন্তু তখন নয়ানের মা তার পায়ের কাছে মাথা রেখে পায়ে হাত দিয়ে কেঁদে বলছিল—বিচার কর, তুমি বিচার কর, মাতব্বর তুমি, বিচার কর।

বনওয়ারী মাথা হেঁট করলে, অবিচার সে করেছে। পরক্ষণেই সে নয়ানকে দুই হাতে তুলে নিয়ে দাওয়ার উপর এনে সেখানে পাতা তালপাতার চ্যাটাইয়ের উপর শুইয়ে দিয়ে বললে—জল আন দেখি। মুখে কপালে জল দাও। ছেলেকে সোস্থ কর আগে।

সকলেই প্রায় চ'লে গিয়েছিল। নয়ানের মা এককালে ছিল মাতব্বরের পরিবার, ঘরভাঙাদের ঘরের গিন্নী, তার অহঙ্কার ছিল বেশি, সে অহঙ্কার তার ভেঙে গেল যখন থেকে, তখন থেকে সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। তাই তার প্রতি কারু সহানুভূতি নাই। কাহারপাড়ার লোকে শুধু ঠোঁটে হাসতে জানে না ; ওদের সহজ কথা ; ওরা বলে—আকাশের তারা জলে ফোটে, আকাশে ম্যাঘ থাকলে কি পুকুরে পানা থাকলে সে হবার জো নাই। 'তোর সঙ্গে ভাব নাই তো হাসলে হবে কি?'

ব'সে ছিল কেবল সুচাঁদ।

সে আক্ষেপ করছিল—আঃ 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা', সেই ঘরভাঙাদের আজ এই অ্যাবস্থা।

সে ব'সে ব'সে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ব'লে যায় অভ্যাস মত। 'ঘরভাঙাদের পবল পেতাপ', জাঙলের চৌধুরীরা বাবাঠাকুরের 'কিপায়' যখের ডিঙির ধনে বড়লোক, সায়েবডাঙার নীলকুঠীর সায়েবদের বাগ-বাগিচা ক্ষেতখামার জমিদারির মালিক। সেই চৌধুরীদের জোতদার—'পেধান' জোতদার ঘরভাঙারা। নয়ানের কত্তাবাবার গলার হাঁকার কি। 'মোচের' 'বেক্কম' কি। আঙা চোখের তারার ঘুরণ কি। বাবা, আজ নয়ানের বউকে কেড়ে নিয়ে তোমরা দিলে করালীকে। সেক'লে চৌধুরীবাবুর ছেলের কামরায় নয়ানের বাবা দিয়ে আসত কাহারপাড়ার বউ বিটী। বসনকে আমার সেই তো ধরেছিল বাবুর লগরে। নয়ানের বাপ বাবুর মদের পেসাদ পেত, মাসের পেসাদ পেত, সকল ভোগের পেসাদ পেত।

নয়ান এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে। চোখ মেলে চাইল সে। বনওয়ারীকে দেখে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বনওয়ারী তার কপালে হাত বুলিয়ে বললে—ঘুমো। তু টুকচে সেরে ওঠ, তোরও সাঙা দিয়ে দোব আমি। করালী তোর বউকে সাঙা করেছে, বলিস তো—করালী যে বউকে ছেড়েছে সেই বউকে সাঙা দিয়ে দোব তোর।

সুচাঁদ বললে—কি বলছিস ব্যানো? অ্যাঁ। কি অন্যায় আমি করলাম রে? আজ মাতব্বর হয়েছিস। তোর গায়ে লাগছে ঘরভাঙাদের মাতব্বরির কাহিনী, সে আমি জানি ; কিন্তুক লয়ানের বাবার পাশে পাশে তোর ঘোরা তো আমার মনে আছে। লয়ানের বাপ চৌধুরীবাবুর কামরাতে থাকত, আমোদ করত। তু ঘরভাঙাদের পাঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতিস, সে কথা তু ভুলতে পারিস আমি তো ভুলতে পারি না। তু আজ হারামজাদা করালীর পক্ষ নিয়েছিস। লয়ানের মা আজ না হয়—

বনওয়ারী বেশ উঁচু গলায় ধমক দিয়ে উঠল—পিসী।

সুচাঁদ শুনতে পেলে এবং তিরস্কারের সুর বুঝতেও পারলে। সেও চীৎকার ক'রে উঠল—কেন রে? তোকে ভয় ক'রে বলতে হবে নাকি কথা? লয়ানের মায়ের সঙ্গে তোর গুজু গুজু আর কেউ না জানুক আমি জানি। লদীর ধারে একদিন উয়োর পায়ে ধরেছিলি, আমি দেখেছিলাম।

বনওয়ারী এসে দাঁড়াল সুচাঁদের সামনে।

সুচাঁদও উঠে দাঁড়াল। সে ভয় পেয়েছে। কাহারদের মাতব্বর বড় ভয়ঙ্কর। সে সঙ্গে

সঙ্গে বনওয়ারীর কথা ছেড়ে করালীকে গাল পাড়তে লাগল।—করালীকে গাঁয়ে আনলি, ও থেকে গাঁয়ের সব্বনাশ হবে। বাবার বাহন মেরেছে ও। চন্ননপুরে মেলেচ্ছ কারখানায় কাজ ক'রে মেলেচ্ছ হয়েছে ও। আমার গায়ে ব্যাঙ দিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে পাখীর বিয়ে?

বলতে বলতেই সুচাঁদ চ'লে গেল।

বনওয়ারী উঠানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে যাচ্ছিল শালের দিকে। মৃদু কণ্ঠে কে ডাকলে—শোন।

নয়ানের মা দাঁড়িয়েছে এক দাওয়ার ধারে খুঁটিটি ধ'রে

বনওয়ারী একটু বিব্রত হ'ল।

নসুবালার ছড়ার ইঙ্গিত সত্য, সুচাঁদের কাহিনীও সত্য। নয়ানের মায়ের কাছে আজ মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। অন্যায়—অনেক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। বনওয়ারীর এ অন্যায় ইচ্ছাকৃত অন্যায়। সে-আমলের কথা সে-সব। নয়ানের বাপ দাঁতাল কুঞ্জ তখন মাতব্বর, বনওয়ারী ছিল কুঞ্জর বন্ধু, কিন্তু তাকে ঈর্ষা না ক'রে পারত না। মাতব্বরির উপর দৃষ্টি পড়েছিল। বনওয়ারীর বাপ তখনও বেঁচে। কুঞ্জ তখন চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে ঘোরে। সেই সময় বনওয়ারী প্রতারণা করেছিল নয়ানের মার সঙ্গে।

নয়ানের মা কাছে এসে দাঁড়াল। বনওয়ারী বললে—নয়ানের আমি সাঙা দিয়ে দোব বাসিনীবউ, পিতিজ্ঞে করেছি আমি।

নয়ানের মা কাঁদছিল।

বনওয়ারী বললে—নয়ান সেরে উঠুক, আনন্দে ঘরসংসার কর। আর—আর যদি নয়ান ভাল ক'রে না সারে, তবে কাউকে নিয়ে খেটে-খুটে খাবে আর—। সে চুপ ক'রে গেল, কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে না। মাতব্বর হয়ে কথাটা উচ্চারণ করা উচিত নয়।

বউয়ের রোজকার, বিটীর রোজকার কাহারপাড়ায় 'শাক-ঢাকা মাছ'। জানে সবাই। বনওয়ারী বলতে চেয়েছিল সেই কথা।

বনওয়ারী বললে আমি তবে যাই। শালে গুড় ফটবে।

পিছন থেকে টান পড়ল তার কাপড়ে। চকিত হয়ে বনওয়ারী ফির অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি প্রখর। তা ছাড়া কাহারদের বুকের কথাও জানে কাহার মাতব্বর। কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।

বিশ বছরের সন্তানের জননী নয়ানের মা। তার চোখের দিকে বনওয়ারী চেয়ে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। নয়ানের মা বললে—মনে আছে? পায়ে ধরেছিলে নদীর ধারে সুচাঁদ পিসী বলে গেল।

—নয়ান রয়েছে ঘরে, বাসিনীবউ।

—সে ঘুমিয়েছে। জান, তখনও মাতব্বরি ঘরভাঙাদের। আমি তখন ঘরভাঙাদের বউ।

—বাসিনীবউ, আমি তো তোমার অসম্মান করি নাই ভাই।

বাসিনীবউ তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ জ্বলছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। বাসিনীবউ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে।

বনওয়ারী মনে মনে বাবা-ঠাকুরকে স্মরণ করলে। সে দাঁড়াল বাবার থানের দিকে

মুখ ক'রে। বাঁশবনে অন্ধকারে ভয়-ডর লাগলে বাবার থানের দিকে তাকালে সে ভয় কেটে যায়। বাবার থানে গভীর রাত্রে আলো জ্বলে।

সুচাঁদ পিসী বলে—আমার বাবার বাবা দেখেছেন, ঘরভাঙাদের কত্তা দেখেন, অমাবস্যার 'এতে' বাবার থানে আলোয় আলোয় 'আলোকীন্নি'। সেই জন্যই কাহারপাড়ার প্রতি ঘর ওই বাবার থানে প্রতি অমাবস্যায় একটি ক'রে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে।

বাবার থানে অমাবস্যার পিদীম দিলে বাবা তার মঙ্গল করেন ; তার ঘরে নিত্যি 'সনজেতে' আলো জ্বলবে, গভীর 'অরুণ্যে' তেপান্তরে পথ হারালে পথ খুঁজে পাবে—ওই আলো কাহারদের চোখে ফুটে উঠবে। যমপুরীতে 'অন্ধকারে' থাকতে হবে না, বাবার থানে যতগুলি পিদীম দেবে, সেখানে ততগুলি পাবে। তবে 'এড়া' কাপড়ে, পাপের কথা মনে ভাবতে ভাবতে পিদীম দিলে তার ফল—'আগড়া ধানের মত', খোসার মধ্যে শাঁস থাকে না, তুষের মধ্যে চাল থাকে না,—তেলকালির দাগ ধরা মাটির 'ডেলুই' অর্থাৎ প্রদীপ শুকনো আধ-পোড়া শলতে নিয়ে প'ড়ে থাকে, 'পিদীমে শীষ জ্বলে না।

বনওয়ারী এই একটু আগে বাবার থানে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। মানত ক'রে এসেছে। ব'লে এসেছে, যে পাপ সে করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে মাতব্বর ;—রাজার পাপে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের পাপে 'গেরাম' নাশ, কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার, 'পিত্তের' অর্থাৎ পিতার পাপে 'পুত্তের' দণ্ড। সে মাতব্বর হয়ে গেরামের সব্বনাশ ডেকে আনবে না। বাবার কাছে তবু সে বলেছে কালোশশীর কথা, আর তার সঙ্গে রঙের খেলার 'রনুমতি' অর্থাৎ অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আর না। তা ছাড়া 'লোকসমাজে' নিন্দে হয়, 'চিলোকে' অর্থাৎ স্ত্রীলাকেরা করে হাসাহাসি, পুরুষে করে কানাকানি, উঁচু মাথা হেঁট হয়, মাতব্বরির আসন করে টলমল, শেষ পর্যন্ত মা-বসুন্ধরা ফেটে গিয়ে সে আসন 'গেরাস' করেন। সে বাবার থানের দিকে চেয়ে বাবাকে মনে মনে ডাকলে।

সত্যিই আলো চমকে উঠল। বাবার থানে নয়, আকাশে। চমকে উঠল দু'জনেই। কখন আকাশ ঘিরে মেঘ জমে উঠেছে। বিদ্যুৎ দিলে এই প্রথম। মেঘ ডেকে উঠল গুর-গুর ক'রে।

বনওয়ারী এবার ভয়ে চমকে উঠল।

বাবার থানের আলো আকাশে বিদ্যুৎ হয়ে 'ললপাচ্ছে' অর্থাৎ চমকাচ্ছে। বাবার হাঁক আকাশে আকাশে বেজে উঠেছে। কিন্তু পর-মুহূর্তে সামলে নিলে নিজেকে। ওদিক থেকে কে হাঁকছে—মুরুব্বি, মুরুব্বি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শালে কড়াইয়ে গুড় ফুটছে। জল পড়লে সব খারাপ হবে। সে ছুটল। নয়ানের মা সেই দুর্যোগ-ভরা আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল হঠাৎ—বাহনের মাথায় চেপে নাচ বাবা। নকনক করুক তোমার বাহনের জিভ। হে বাবা। হে বাবা!

বনওয়ারীও মনে মনে বলেছিল—হে বাবা, হে দয়াময়, খুব রক্ষে করেছ বাবা। খুব রক্ষে করেছ।

শালে তখন হুড়োহুড়ি প'ড়ে গিয়েছে। উপরের ছাউনিতে খড় দিতে হবে। হেদো মণ্ডল খুব হাঁকডাক করছেন। অতনার বেটা লটবর উঠেছে ছাউনির উপর। মধ্যে মাঝে বাবা

কালারুদ্রের নাম নিচ্ছে।

—শিবো হে। জয় বাবা কালারুদ্দু। ত্রিশূলের খোঁচায় 'ম্যাঘ' উড়িয়ে দাও বাবা। জল হলে গুড় মাটি হবে বাবা। আমের মুকুল যাবে বাবা। 'ফাল্গুনের জল আগুন'। ম্যাঘ উড়িয়ে দাও, এবার গাজনে আধ মণ গুড়ের শরবৎ মানত রইল। জয় বাবা কালারুদ্দু, গাজনে এবার পাঁচপো তিলত্যালের পিদীম দোব বাবা। শিবো হে, খাস আমের গুটি তোমার ভোগে দোব বাবা।

বনওয়ারী আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিল স্থির দৃষ্টিতে।

বিদ্যুতের আলোয় সে দেখছিল, মেঘ যেন কড়াইয়েব ফুটন্ত গুড়ের মতই উথলাচ্ছে। সাদায় কালোয় ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ দিকে দিকে। জল 'অনিবার্য'। সকালের মেঘ ডাকলে নামে না, কিন্তু অকালের মেঘ নামবেই। বর্ষণের কাল আষাঢ় শাওন ভাদ্দ আশ্বিন। বাকি সকল মাস অকাল। বর্ষার সময় মেঘ ডাকলেও অনেক সময় বৃষ্টি নামে না। এ মেঘ অকাল মেঘ, বিশেষ মাঘ-ফাল্গুনের মেঘ, সাড়া দিলে অঙ্গ নাড়া দিয়ে ঝরবেই। ফাল্গুনের জল আগুন, আমের পক্ষে তো নির্ঘাৎ আগুন। সমস্ত মুকুলে ঝাঁই লেগে যাবে। আম হবে না। আঃ -'আমে দেখে ধান'। আম না হ'লে ধান হবে না। তবে বৃষ্টি হ'লে সায়েবডাঙায় কাজ লাগবে। কাঁকর মাটি ভিজে নরম হবে। জমি তৈরির একটা 'বাত' অর্থাৎ সময় পাবে। সায়েবডাঙায় জমি অনেকটা পেয়েছে বনওয়ারী।

নামল বৃষ্টি ঝম ঝম ক'রে বাবা কালারুদ্দু কান দিলেন না ওদের প্রার্থনায়। রতন তার মুনিব হেদো মণ্ডল মহাশয়কে বললে—মুনিব মাশায়, আধ মণ গুড়ের মানতে বাবার মন উঠল না। এক মণ মানত করেন।

হেদো মণ্ডল পুরানো কালের লোক, তিনি কাহার নন। জলের ছিটে থেকে বাঁচবার জন্য বুড়ো বটগাছটার কাণ্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে বললেন—ভাগ বেটা কাহার কোথাকার, মানত করলে জল থামে।

—তবে গুড়টা মাটি হবেন মাশায়।

গাছের কাণ্ড বেয়ে কয়েকটা মোটা ফোঁটার জল মণ্ডল মহাশয়ের কল্কের উপর প'ড়ে ফাঁস শব্দ করে ক'ল্কেটা নিবিয়ে দিলে, মণ্ডল মশায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকালেন, বললেন—অ-হ্-হ।

রতন বললে—মুনিব মাশায়।

—নিকুচি করেছে বেটা কাহারের—মুনিব মাশায়, মুনিব মাশায়। হুঁকোটা ফেলে দিয়ে হেদো মণ্ডল খপ করে ধরলেন রতনের মাথার চুল, দমাদম কষিয়ে দিলেন কয়েকটা কিল। ছাড়া পেয়েই রতন বললে—দ্যান, কল্কেটা খসিয়ে দ্যান, আগুন ক'রে দিই।

ওদিকে শালের কড়াইয়ের পাশে বনওয়ারী অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। কড়াইয়ের ফুটন্ত রসে খড় ও তালপাতার ছাউনি ভেদ ক'রে জল পড়ছে। আঃ, এমন যত্ন ক'রে গুড় তুলেছিল সে, সব মাটি হয়ে গেল। গন্ধ হবে, স্বাদ নষ্ট হবে। হায়। হায়। হায়।

পানু দূরে গাছের তলায় জল বাঁচিয়ে ব'সে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে এরই মধ্যে

সরস রসিকতায় মজলিস জমিয়ে তুলেছে। রসটা জমিয়ে তুলেছে সে হেদো মণ্ডলের গুড় নষ্ট হওয়ায় আনন্দ অনুভব ক'রে।—বেশ হছে, আচ্ছা হচ্ছে, লাগাও বাবা লাগ্ ঝমাঝম। যাক বেটার গুড় খারাপ হয়ে। ভারি বজ্জাত বেটা। মা-দুগ্‌গার অসুর।

হঠাৎ সেখানে এসে বসল মাথলা। তার সঙ্গে এল প্রহ্লাদ। জলে তাদের সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। প্রহ্লাদ ব'সেই বিনা ভূমিকায় বললে, পানা, তু কিন্তুক সাবধান।

—কেনে ?

—কেনে ? বনওয়ারী এতক্ষণ কোথা যেয়েছিল জানিস ?

—কোথা ?

—আটপৌরেপাড়ায় ঘেঁটুর গান শুনতে।

মুখ শুকিয়ে গেল প্রাণকৃষ্ণের। বনওয়ারীর প্রতিহিংসা বড় ভীষণ। মাতব্বর রাগে না তো রাগে না, রাগলে কিন্তু রক্ষা নাই।

প্রহ্লাদ বললে—ওদের ঘেঁটুগান এবার তু করেছিলি আমি জানি।

পানু এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, এবার সে তার স্বভাবগত চাতুর্যের সঙ্গে ব'লে উঠল—মাইরি না; মাইরি বলছি, ছেলের দিব্যি ক'রে বলতে পারি, কিছুই জানি না আমি। তারপর সে বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে—আটপৌরেওলারা এবার নতুন গান বেঁধেছে নাকি ঘেঁটুতে ? কি গান ? মজার গান নাকি ? ব'লে সে অকারণে হি-হি ক'রে হাসতে লাগল।

প্রহ্লাদ বললে—বুঝবি মজা, এইবার বুঝবি। মুরুব্বির সঙ্গে কালোশশীকে জড়িয়ে গান। ঠেলা বুঝবি এইবার।

পানু বললে—মুরুব্বির সঙ্গে কালোশশীকে জড়িয়ে ? তা হ'লে নিশ্চয় ওই করালীদের কাণ্ড। ওই নসুবালা-হারামজাদী—

—কে রে ? কে ? কি কাণ্ড.করালীর ?—বলতে বলতে পিছন থেকে এসে দাঁড়াল কে একজন। লোকটার গায়ে একটা আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড একটা বোঝা। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু গলার আওয়াজে বোঝা গেল, সে করালী। মাথায় ওটা কি ?

প্রহ্লাদ প্রশ্ন করলে—করালী ? মাথায় কি রে ?

—তেরপল গো কাকা।

—তেরপল ?

—হ্যাঁ। ইস্টিশান থেকে এনেছিলাম একটা। তা জল দেখে মনে হ'ল, তোমাদের গুড় লষ্ট হবে। তাই নিয়ে এলাম, দাও চাপিয়ে চালের ওপর। এক ফোঁটা জল পড়বে না; একটা তেরপলের জামা গায়ে দিয়ে সে তেরপলটা মাথায় ব'য়ে এনেছে। অদ্ভুত লাগছে ওকে। ঠিক সাহেবের মত। প্রহ্লাদ লাফিয়ে উঠল—বনওয়ারী। ব্যানো।

করালীকে প্রায় টানতে টানতেই সে নিয়ে গেল শালের উনোনের কাছে। হতাশভাবে সকলে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনদুয়েক ছোকরা মুনিষ কোদাল ধরেছে, উনোনের মুখটার চারিদিক ঘিরে বাঁধ তৈরি করছে, জল যেন গড়িয়ে এসে উনোনের ভিতরে না ঢোকে, উনোন যেন নিবে না যায়। হেদো মণ্ডল হাউ হাউ ক'রে চীৎকার করছেন—ছাতা

নিয়ে আয়, ছাতা এনে কড়াইয়ের ওপরে ধর। মণ্ডল মশায়ের বুদ্ধি 'হ'রে' যেয়েছে, অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ জলে ছাতা ধ'রে মাথাই বাঁচে না, তা শালের কড়াই?

প্রহ্লাদ কলরব ক'রে ব'লে উঠল—হইছে বনওয়ারী, হইছে। করালী রুপায় করেছে, ত্যারপল নিয়ে আইচে। দাও চাপিয়ে চালে।

তেরপল! রেল-ইস্টিশানের তেরপল! চাল-ধানের বস্তার উপর বর্ষার সময় চাপিয়ে দেয়, একটি ফোঁটা জল পড়ে না—সেই তেরপল?

হেদো মণ্ডল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর আর তর সইছে না।

—দে দে, চাপিয়ে দে। ওঠ্। উঠে পড়্।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—তা ভালই হইছে—হ্যাঁ, ভালই হইছে। দে, তা চাপিয়ে দে।

করালী বলে—তোমার জিম্বা রইল কিন্তু মুরুব্বি। তুমি অইচ ব'লেই আনলাম আমি, লইলে লাখ টাকা দিলে দিতাম না আমি—তা সে আজাই হোক আর রুজীই হোক, হ্যাঁ।

হেদো মণ্ডল কথাটা শুনে একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—বলিহারি রে বলিহারি! খুব বলছিস যে! অ্যাঁ? আবার একটু হেসে বনওয়ারীর দিকে তাকিয়ে মণ্ডল বললেন—তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে—হাঁ, বেটা খুব বাহাদুর।

করালীর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হ'লে হয়তো ভুরু কুঁচকেই মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যেত, কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল—কি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দনোকের উ কি কথা।

এক মুহূর্তে শালের সমস্ত কাহারেরা হতভম্ব হয়ে গেল। বনওয়ারী শঙ্কিত হয়ে উঠল। হেদো মণ্ডল সাক্ষাৎ দুর্গা মায়ের অসুর, এইবার হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়বেন করালীর উপর। কিন্তু আশ্চর্য, হেদো মণ্ডল কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন তেরপলের জামা-পরা করালীর দিকে চেয়ে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হেদো মণ্ডল শুধু বললেন—ক্যানে, অন্যায় কি বললাম আমি? কি রে বনওয়ারী, কি অন্যাযটা বলেছি, তুই বল্ দেখি?

বনওয়ারী উত্তর দেবার পূর্বেই করালী বললে—মুরুব্বির কাছে উ সব তো অন্যায় লাগবে না, উ সব ওদের গা-সওয়া হয়ে যেয়েছে। বলি—বেটা কিসের মশায়, বেটা? ব'লেই সে হনহন ক'রে চ'লে গেল। বলতে বলতে গেল—বেটা শালা হারামজাদা গুখোরবেটা লেগেই আছে—ভদ্দনোকের মুখে লেগেই আছে। ভদ্দনোক! মাথা কিনেছে! অঃ—

সে এসে দাঁড়াল সেই গাছতলায়। কই, পানা কই? সে 'যেল' অর্থাৎ গেল কোথায়?

যারা ব'সে ছিল তারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে করালীর কাণ্ড দেখে। ভাবছে, করালী করলে কি? এও কি সম্ভব হয়? অবাক ক'রে দিয়েছে করালী। ছোকরার বুকের পাটা বটে! সঙ্গে সঙ্গে এও তাদের মনে হচ্ছে যে, করালী কথাটা কিন্তু ঠিক বলেছে। ওই বাক্যগুলি মণ্ডল মশায় বাবু মশায়দের মুখে লেগেই আছে। রাগ হ'লে কথাই নাই, আদর করবেন, তাও বলবেন—বলিহারি রে শালো! আদর ক'রে 'কেমন আছিস' শুধাবেন, তা বলবেন—কিরে হারামজাদা, রইছিস কেমন? কথাটি করালী বলেছে ঠিক। তবে—। তবে

এমন চ'ড়ে উঠে না বললেই হ'ত।—লঘু-গুরু তো মানতে হয়। ভগবান, বাবা কালারুদ্দের বিধানে তো এ সব লেখাই আছে, পায়ে মাথায় সমান নয়।

করালী আবার প্রশ্ন করলে—বলি, সে শালো গেল কোথা রে? আ কাড়িস না যে? অ্যাঁ!

মাথলা বললে—সে পালালছে কোথা।

—পালালছে! শালো খ্যাঁকশ্যাল। পেলে হয় শালোকে।—করালী আর দাঁড়াল না। তেরপলের জামাটা পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চ'লে গেল, যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে!

তেরপলের তলায় একটি ফোঁটা জল পড়ে না। নির্বিঘ্নে চলছে গুড় তৈরির কাজ। উনোনের পাশে লম্বা বাঁখারিতে নারকেলের মালা-গাঁথা হাতা নিয়ে গাদ অর্থাৎ ময়লা তুলতে তুলতে বনওয়ারী ভাবছিল ওই করালীর কথা। ছোকরা অসম্ভব কাণ্ড ক'রে তুলেছে। যা-খুশি তাই করছে। কোন বিধিবিধান মানছে না, শাসনের বাইরে গিয়েছে, কথায় কথায় ঝগড়া, পদে পদে বিপদ বাধিয়ে তুলছে।

আজই যদি তেরপলটার নেহাত দরকার না থাকত, তবে হেদো মণ্ডল ছাড়তেন না। কাণ্ড একটা ঘ'টে যেতই। নাঃ, বনওয়ারীর এ বড় খারাপ লাগছে। কাঁটাগাছ—করালী সেই কাঁটাগাছের চারা, তুমি আদর ক'রে কোল দিতে যাও, বুকে তোমার বিঁধে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেবে। তবে বেটা-ফেটা কথাগুলি খারাপ বটে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বনওয়ারী। আঃ, ছোকরাটি যদি ভাল হয়ে চলত, 'শলা-সুলুক' নিত মানত। ওই চন্ননপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ ক'রে দিলে।

বৃষ্টি আরও জোরে এল। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস। বৃষ্টির জলের ঢল নামছে, গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছে। ওঃ, তেরপলটা না হ'লে আজ সব মাটি হ'ত। সব বরবাদ যেত। ওঃ, ঝম-ঝম ক'রে জল। কাহারপাড়ায় মেয়েছেলেগুলো কলকল করছে। ফাল্গুন মাস, চালে এখনও নতুন খড় পড়ে নাই, পুরানো খড় পচেছে, উড়ে গিয়েছে, দেবতার জল সবটুকুই ঘরে পড়ছে আজ। আহা-হা, সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারে না।

—ছেড়ে দাও বাবা, দেবতা হে, কালারুদ্দু, ক্ষান্ত দাও বাবা। কাহারদিগে আর মেরো না। মাইতো ঘোষ বলেন—এল ডাউরী ম'ল বাউরী। বাদলা বর্ষা হ'লে কাহারদেরই মরণ।

বাতাসে গাছপালার মাথা দুলছে। বাঁশবাঁদির বাঁশবনে মাতন লেগেছে। ঝরঝর শব্দে বৃষ্টি পড়ছে বাঁশের পাতায়, ক্যাঁ-কট-কট-কট শব্দ উঠছে দোলনলাগা বাঁশে বাঁশে ঘষা খেয়ে। মাঠ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে।

হঠাৎ প্রহ্লাদ কোদালখানা হাতে নিয়ে উঠল।

—কোথা যাবি?

—ওই দেখ। প্রহ্লাদ দেখাল, গ্রাম-গড়ানি জলের ধারার মধ্যে এক পাশে কষের কালির মত একটা জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। কার সার-ডোবা ভেসেছে। সার-ধোয়া জলের ওই রঙ, ওই ধারা। কিছুতেই জলের সঙ্গে গুলে এক হয়ে যাবে না, এক পাশ ধ'রে চলবে। আর ওতে পা দাও, দেখবে ফুটন্ত জলের মত গরম। পাশে মাটি-রঙের জলে পা দাও, দেখবে ঠাণ্ডা।

প্রহ্লাদ বললে—আমার আউশের ভুঁইখানা ছামনেই, দিই কেটে ঢুকিয়ে, ই একবারে জমির সালসা।

—দে, ঘুরিয়ে দে। বনওয়ারীর জমি দূরে। আর সায়েবডাঙায় কোদাল চলবে এইবার।

ওঃ, বুনো শুয়োরগুলো চীৎকার করছে সায়েবডাঙায়। বেটারা ভিজে মাটি খুঁড়ে কন্দ খেতে বেরিয়েছে। সায়েবডাঙার মাটি নরম হয়েছে।

সাত

সায়েবডাঙা, কেউ বলে—কুঠিডাঙা।

পাথুরে মাটির ঢলন একটা—খানিকটা উঁচু খানিকটা নিচু, আবার খানিকটা উঁচু—লাল কাঁকরে ভরা—ঢেউ খেলানোর ভঙ্গিতে একটা ঢলন যেন নেমে এসেছে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের দেশ থেকে। পশ্চিম থেকে পূবে চ'লে এসেছে একটা ব-দ্বীপের চেহারা নিয়ে। এই ঢলনের আশেপাশে বাংলা দেশের মাটি। সেখানেই দেশের চাষের মাঠ, সে সব মাঠে নানা ফসল ফলে। হাঁসুলীর বাঁকে—এই লাল মাটির একটা ফালি এসে শেষ হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের উত্তর-পশ্চিম মাথায়। এইখানে নীলকর সায়েবেরা তাদের কুঠী তুলেছিল। এই মাটিতে আট মাস ঘাস জন্মায় না, আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত কঠিন রোগে চুল-উঠে-যাওয়া মানুষের মাথায় সদ্য-গজানো রোগা চুলের মত পাঁশ-সবুজ রঙের ঘাস গজায়। উঁচু সায়েবডাঙায় ঢলন ক্রমশ নিচু হয়ে কোপাইয়ের চরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। কোপাইয়ের বন্যার ভয়েও বটে, এবং বন-জঙ্গলে কাদা নাই—ঝকঝকে তকতকে ব'লেও বটে, সাহেবেরা এইখানে কুঠি তুলেছিল। সাহেবদের আমলে এই ডাঙা ছিল রাজপুরী।

সুচাঁদ বলে—বাবা বলত, অ্যাই বড় বড় ঘোড়া, এই ঝালর দেওয়া সওয়ারী অর্থাৎ পালকি। এই সব বাংলা-ঘর, ফুল বাগিচা, বাঁধানো খেলার জায়গা, কাঠ-কাঠের আসবাব; সে ঐশ্বর্যের কথা এক মুখে বলা যায় না। এক দিকে কাছারি গমগম করছে। বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত পাইক আটপৌরেরা—মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি নিয়ে ব'সে পাহারা দিত। জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকত চাষী সজ্জনেরা—ভয়ে মুখ চুন। দু-দশজনাকে বেঁধে রাখত। কারুর শুধু হাতে দড়ি, কারুর বা হাত-পা দুইই বাঁধা। সায়েব লোক, রাঙা রাঙা মুখ, কটা কটা চোখ, গিরিমাটির মত চুল, পায়ে অ্যাই বুট জুতো—খটমট ক'রে বেড়াত, পিঠে 'প্যাটে' জুতো সুদ্ধ লাথি বসিয়ে দিত, মুখে কটমটে হিন্দী বাত—মার ডালো, লাগাও চাবুক, দেখলাও শালোলোগকো সাযেব লোকের প্যাঁচ। কখনও হুকুম হ'ত—কয়েদ করো। কখনও হুকুম হ'ত—ভাঙ দেও শালোলোকের ধানকো জমি। নয়তো, কাটকে লেও শালোকে জমির ধান। সে তোমার বামুন নাই, কায়েত নাই, সদ্‌গোপ নাই—সব এক হাল 'আতে' সারি সারি বাতি জ্বলত—টুং-টুং—ক্যাঁ-কোঁ—ভ্যাঁ-পো ভ্যাঁ-পো বাজনা বাজাত, সায়েব মেম বিলিতি মদ খেত, হাত ধরাধরি ক'রে নাচত, কয়েদখানায় মানুষ চেঁচালে হাঁকিড়ে উঠত বাঘের মত—মৎ চিল্লাও। বেশি 'আত' হ'লে সেপাইরা বন্দুকের রজ করত—দুম-দুম-দুম-

দুম। হাঁক দিত—ও—হো—ই। তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—চোর বদমাস হুঁশিয়ার। চোরই হোক আর সাধুই হোক এতে ওদিকে হাঁটলে অক্ষে থাকত না; দুম ক'রে গুলি ক'রে দিত।

সেই ভাঙা এখন ধু-ধু করছে। নীলকুঠির চিহ্নের মধ্যে আছে কেবল সাহেবদের লাগানো আমবাগান। তারই মধ্যে ভাঙা নীলের হৃদগুলো, আর বাংলোর কিছু কিছু ভিত। সেগুলোর চারিপাশে ঘন ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। কাঁকুরে পাথুরে ডাঙার এই ঠাঁইটুকুতে সাহেবরা সার মাটি দিয়ে খুঁড়ে-খুসে জল ঢেলে অদ্ভুত উর্বর ক'রে তুলেছিল। তখন ছিল বাগান, এখন জঙ্গল। বাকিটা চিরকালের সেই লাল মাটি ধু-ধু করছে।

সুচাঁদ ডাঙাটার ধারে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে আক্ষেপ করে। চোখ দিয়ে তার সত্যই জল পড়ে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ায় মানুষের প্রকৃতি আছে, চরিত্র নাই। অল্পেই ওরা হাসে, অল্পেই ওরা কাঁদে; নিজের দুঃখেও কাঁদে, পরের দুঃখেও কাঁদে। মহাবনে মহাগজ পতনের সংবাদ পেলে কৌতূহলবশত দেখতে যায় এবং এত বড় দেহটি অসাড় হয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে। তবে ওদের পুণ্য নাই, ওদের চোখের জলের স্পর্শে মৃত জীবন্ত হয়ে উঠে না। সুচাঁদের মুখে সাহেবডাঙার গল্প শুনে সবাই চোখ মোছে, তবে সুচাঁদের মত এত কাঁদতে কেউ পারে না। সুচাঁদ সেই উপকথার শেষের যুগের মানুষ যে।

সুচাঁদ চোখ মুছে বলে—আঃ আঃ, রোপোকথায় সেই যে বলে, রাক্ষুসীর খাওয়া পুরী, এ তাই। খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ করছে।

সত্যই খাঁ-খাঁ করে। মানুষজন ওদিকে বড় কেউ আসে না। দাঁতালের আড্ডা, জঙ্গলে-ভরা ভাঙা নীলকুঠি। রাত্রে ওরাই দল বেঁধে বার হয়, ছুটে গিয়ে পড়ে নদীর ধারে, দাঁতে মাটি চিরে নানান গাছের মূল তুলে খায়। ধানের সময় মাঠে গিয়ে পড়ে। মাঠে মাচান বেঁধে টিন বাজিয়ে কাহারেরা তাদের তাড়ায়। ছোট ছোট বাখারিতে শক্ত দড়ি-গাঁথা বঁড়শি বেঁধে মদের মেয়া ও কলার টোপ গেঁথে ছড়িয়ে দেয় মাঠময়, ধান খেতে এসে মুখে বঁড়শী গেঁথে পায়ে দড়ি আটকে দাঁড়িয়ে থাকে, সকালে কাহাররা ধরে মারে। বেশি উপদ্রব হলে দল বেঁধে গিয়ে মেরে আসে ওদের।

সেই কুঠিডাঙায় কোদালের কোপ পড়ছে।

জল ঝড় হয়ে গিয়েছে দু'দিন আগে। বৃষ্টি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই হয়েছে। চন্দনপুরের বড়বাবুরা সাঁওতাল মজুর লাগিয়েছেন প্রায় দেড়শো। এই লাল কাঁকুরে মাটির একটি বিশেষত্ব আছে। যে মাটি পাথরের মত শক্ত, কোদালে কাটে না, কোপ মারলে খানিকটা লাল ধুলো ওড়ে, চোখে মুখে মিহি বালি ছিটকে লাগে, সেই মাটি বৃষ্টিতে ভিজলে কয়েকদিন ধরে ভুরোর মত নরম হয়ে থাকে। মাটির এই অবস্থার নাম 'বতর'। এখানকার মাটিকাটার সুযোগ এই বতরে। এ সুযোগ চলে গেলে মাটি-কাটা আবার কঠিন হয়ে পড়বে। সাহেবডাঙার যে ঢালটা নেমেছে কোপাইয়ের দিকে, সেই ঢালে চাষের জমি তৈরি হচ্ছে। ঢালের শেষ অংশটায় চন্দনপুরের বড়বাবুদের নিজের জমি তৈরি করছে সাঁওতালরা।

কাছাকাছি জাঙলের সদগোপ মহাশয়দের কয়েকজন সেলামী দিয়ে খাজনা-বন্দোবস্তিতে

জায়গা নিয়েছে। তারা নিজেরা ব'সে আছে। খাটছে কিষাণ মাহিন্দার সঙ্গে দু'চারজন মজুর। বনওয়ারী সবচেয়ে খারাপ পাঁচ বিঘা জায়গা নিয়েছে। বিনা সেলামীতে জমি, নীরস তো হবেই। তা ছাড়া কাহারদের অদৃষ্টে এর চেয়ে ভাল জমি হবেই বা কেন? সে নিজেই কোপাবে মাটি, সেই মাটি ঝুড়িতে তুলে মাথায় ব'য়ে আলবন্দী করে ফেলবে বনওয়ারীর বউ আর সুচাঁদ পিসী। সুচাঁদ পিসীকে বনওয়ারী মজুর দেবে অবশ্য। তিনপহর খাটবে, চোদ্দ পয়সা নগদ পাবে আর পাবে জলখাবার মুড়ি। এ ব কথা আছে—বিকেলবেলা ঠাণ্ডার সময় ছুটির পর প্রহ্লাদ রতন পানু আরও জনকয়েক কোদাল নিয়ে এসে মাটি কেটে রেখে যাবে। পরের দিন সেই মাটি তুলে ফেলবার জন্য পাড়ার কয়েকজন মেয়েকে লাগাবে বনওয়ারী। বনওয়ারী হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রণাম করলে—'আচোটা মাটিকে' অর্থাৎ ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমার অঙ্গে আঘাত কার নাই মা, তোমার অঙ্গকে মাজ্জনা করছি। সেবা কবছি তোমাব। তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে অচনা হয়ে থেকো। তারপর সে কোঁচড় থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে—বাবাঠাকুরেব পুজোর ফুল। জয় বাবা, তুমি অক্ষে কর। যেন পাথর না বাব হয়, কোন জন্তু-জানোয়ার না বাব হয়। হাতে তালি দিয়ে বললে—কীটপতঙ্গ, সাপ-খোপ সাবধান, তোমরা স'রে যাও। আমি আজার কাছে জমি নিয়েছি, দেবতার কাছে আদেশ নিয়েছি—এ জমি আমি কাটব। সে কোপাতে লাগল। সদগোপ মহাশয়েরা নিজে হুঁকোয় তামাক খেয়ে মধ্যে মধ্যে কৃষাণ মাহিন্দারদের দিচ্ছেন। সাঁওতালেবা 'চুটা' খাচ্ছে। বনওয়ারী দু পয়সাব বিড়ি কিনে এনেছে, নিজে খানিকটা খেয়ে এঁটো বিড়ি বউকে দিচ্ছে, সুচাঁদকে দিচ্ছে গোটা বিড়িই। পিসীও বটে, তা ছাড়া পুরো একটা বিড়ি না খেলে সুচাঁদের নেশা হবে না। কিন্তু সুচাঁদও বিড়ি খেতে চায় না, তামাকই তার সবচেয়ে প্রিয়। হঠাৎ সুচাঁদ হেদো মণ্ডলের কাছে গিয়ে বললে—কল্কেটা একবার দাও কেনে গো।

মণ্ডল বিনা বাক্যব্যয়েই কল্কেটা নামিয়ে দিলেন। সুচাঁদ মণ্ডলের সামনেই উবু হয়ে, অবশ্য লজ্জা ক'রে পিছন ফিরে বসে নারীত্বের ভূষণ বজায় রেখে তামাক খেতে লাগল। হঠাৎ একসময় লজ্জা ভুলে সামনে ফিরে বললে—তুমি তো তবু কল্কে দিলে মোড়ল, পানাব মুনিব হ'লে মারতে আসত আমাকে। অথচ আমার মেয়ের তরে যখন অণ্ড ধরেছিল, তখন আমার পায়ে ধবতে এসেছিল।

হেদো মণ্ডল ধমক দিয়ে চীৎকার করে বললেন—থাম, এখানে বকবক করিস না। হেদো মণ্ডলের গলার আওয়াজ একেই খুব জোর, তার উপর সুচাঁদকে কালা জেনে চীৎকার করেই কথা বলায় সুচাঁদ স্পষ্ট শুনতে পেলো কথাগুলি। এর জন্যে সে হেদো মণ্ডলের উপর বরাবরই খুব সন্তুষ্ট।

—বকবক করব না?

—না।

কিছুক্ষণ হেদো মণ্ডলের মুখের দিকে চেয়ে রইল সুচাঁদ, তারপর বললে—সব শেয়ালের এক রা। তা বেশ। আবার সে তামাক খেতে লাগল। আবার বললে—তোমরা আর কোদাল ধরবা না, লয়?

হেদো মণ্ডল বলে উঠলেন—এ-হে-হে! এ মাগী তো বড় জ্বালালে দেখছি।

—কেনে? জ্বালালাম কি ক'রে? বলি জ্বালালাম কি ক'রে? তোমার বাবাকে দেখেছি, নিজে হাতে কোদাল ধরে ওই লম্বা বাকুড়ি কাটতে। হঁস হঁস ক'রে সে কী কোদালের কোপ। তোমরাও তো কাটতে গো মাটি নিজে হাতে। আমি তো ভূশণ্ডী কাক—আমার তো দেখতে বাকি নেই কিছু।

কথাটা সত্য, কিছুকাল অর্থাৎ বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও এই সব মণ্ডল মহাশয়েরা পুরাপুরি চাষী ছিলেন। জমি কাটাইয়ের কাজ থেকে আরম্ভ ক'বে চাষের কাজ পর্যন্ত কিষাণ মাহিন্দার এবং মজুরদের সঙ্গে নিজেরাও প্রত্যেক কাজটি ক'রে যেতেন, তাতে অপমান বোধ করতেন না। এই বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এমন ওলটপালট হ'ল যে, সদ্‌গোপ মহাশয়েরা এখন আধাবাবু হয়ে উঠেছেন। হেদো মণ্ডল নিজেও এ কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারেন, তাঁর শরীরে প্রচুর ক্ষমতা এখনও এবং চাষে-কর্মে তাঁর গভীর অনুরাগ। সকল কাজ পূর্বের মত করতে তাঁর ইচ্ছাও হয়, কিন্তু পাবেন না। পারেন না, নিজেদের জাতি-জ্ঞাতির কাছে লজ্জা পেতে হবে বলে; আঃ, হায় রে! কি যে ইংরিজি বাবুগিরির ঢেউ এল দেশে! এই বলে মনে মনে আক্ষেপ করেন তিনি। বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে তবুও তিনি অনেক কাজ করেন। কিন্তু সুচাঁদের কাছে স্বীকার করতে পারেন না সে কথাটা। তিনি বিরক্ত হয়েই বললেন—বকিস না মেলা। তোরা যে মরা কুকুর বিড়েল ফেলা ছেড়েছিস, আবার রব তুলছিস মরা গরু কাঁধে করে ফেলব না, বাড়ির নর্দমা পরিস্কার কববি না বলছিস। বলি, তোরা এত বাবু হলি কি করে? তোরাও বাবু হচ্ছিস, আমরাও বাবু হচ্ছি। না হ'লে আমাদের মর্যাদা থাকে কি ক'রে?

সুচাঁদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বনওয়ারীকে। বললে—ওই—ওই মুচ্ছুদ্দি, বুঝলে মণ্ডল—ওই বনওয়ারীর মাতব্বরি এসব। ওই ধুয়ো তুলেছিল মরা কুকুর বেড়াল ফেলব না। তা'পবেতে সবাই মিলে গুজুর গুজুর ক'রে ধুয়া ধরেছে—গরু ফেলতে হ'লে কাঁধে ক'রে ফেলাব না, গাড়ি চাই; জলনিকেশী লালা ছাড়াব, কিন্তু এঁটো-কাটা-ময়লা মাটির পচা নদ্দমাতে হাত দোব না। আমি বলি, বাপ পিতামোর আমল থেকে ক'রে আসছিস, করবি না কেনে? তা বনওয়ারী ঘাড় লেড়ে বলে—উঁ-হুঁ; মুদ্দোফরাস মেথরের কাজ করবে কেনে?

হেদো মণ্ডল এবার ক্ষেপে উঠলেন—বনওয়ারীর দোষ? বলি, হ্যাঁ বে মাগী, তোর নাতজামাই করালী যে সেদিন আমাকে বললে—বেটা-ফেটা ব'লো না মশাই, সেও কি বনওয়ারীর দোষ নাকি?

সুচাঁদ গালে হাত দিলে—সেই মারে! তারপর বললে—ওকে আমি দু-চক্ষে দেখতে লারি। পাড়ার সব্বনাশ কববে—দেখো তুমি, সব্বনাশ করবে।

বনওয়ারীর কানে কথাগুলি সবই যাচ্ছিল। সুচাঁদ পিসী কালা, হেদো মণ্ডল চীৎকার ক'রে কথা বলছে। সুতরাং সে কেন, এখানকার সকলেই শুনতে পাচ্ছে। সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ডাকলে—বলি, তামুক খাবা আর কতক্ষণ?

সুচাঁদ ব্যস্তভাবে উঠল। বনওয়ারীকে খাতির সে করে না, কিন্তু আজ বনওয়ারী সুচাঁদের

প্রায় মনিব-স্থানীয়, নগদ চোদ্দ পয়সা এবং জলখাবারের মুড়ি দেবে সে। উঠেও সে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ দুঃখের আবেগে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে, তারপর হেদো মণ্ডলকে বললে—আমার ললাট দেখ কেনে মণ্ডল মশায়। এই বুড়ো বয়সে মজুরী খাটছি। ওই করালীকে বিয়ে করেছে ব'লেই লাতিনের সাথে বসনের সাথে ভিনু হয়েছি আমি।

আবার সে বসল। গলা ফাটিয়ে মণ্ডলকে বললে—আমি বলেছিলাম বসনকে, ওই হারামজাদী পাখীকে—নয়ানের হাঁপানী ধরেছে, ভাল হয়েছে, নামের মরদ নামে থাকুক। পাখীর এমন উঠতি বয়স, কিছু ওজগার-টোজগার ক'রে লে। তা'পরেতে খানিক-আদেক বয়েস হোক—এক কুড়ি, ড্যাড় কুড়ি হোক, তখন 'ছাড়বিড়' ক'রে সাঙা দিবি। না কি বল মণ্ডল? সুচাঁদ আবার কাঁদতে লাগল—আমার প্যাটের বিটি বসন, বসনের প্যাটের বিটী পাখী—

এবার বনওয়ারী কাছে এসে দাঁড়াল। সুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চল বাবা, চল। এই দুটো পবানের বেথার কথা মণ্ডল মশায়কে বললাম। খুঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে সে নিজের কাজের জায়গায় দিকে। বনওয়ারী মাটি বোঝাই ঝুড়িটা তার মাথার উপর তুলে দিতেই সুচাঁদ বনওয়ারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর অনুনয় ক'রে বললে—রাগ করেছিস, হা? বনওয়ারী?

বনওয়ারী উত্তর না দিয়ে ঘুরে কোদালটা ধ'রে মাটিতে কোপ মারতে আরম্ভ করলে। মোটা বলিষ্ঠ হাতে রাগের মাথায় সে কুপিয়েই চলল। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নিলে, ধুলো-মাখা হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম টেনে চেঁছে ফেললে। দেড়শো সাঁওতালের টামনার কোপে বাবুদের কাজ এগিয়ে চলেছে কোপাইয়ের বানের মত। আর তার কাজ চলেছে রিমিঝিমি বর্ষার ধানের জমিতে গবুর খালে জল জমার মত। তা হোক। এমনি ক'রেই চিরদিন কাজ চ'লে আসছে। বাবুদের কাজ চলবে দিনকয়েক—যতদিন 'বতর' থাকবে ততদিন, তার কাজ চলবে বারো মাস। রোজ বিকালে এসে সে খানিকটা ক'রে কেটে যাবে। এবার মাত্র একখানা জমি তৈরি করবে। বাকি জমিটা চষে দিয়ে ভাদ্র মাসে কতকটা 'তেপেথে' অর্থাৎ তিন পক্ষীয় কলাই, কতকটা ঘেসোমুগ, কতকটা বরবটি ছিটিয়ে দেবে। তারপর আসছে মাঘে যে জলটা হবে, সেটা হলেই লাঙল চালিয়ে মই দিয়ে ঠেলে মাটি সরিয়ে আল-বন্ধনের চেষ্টা করবে; তারপর কিছু মাটি কেটে সমান করবে; সঙ্গে সঙ্গে আল-বন্ধনও শক্ত হবে। এভাবে জমি করায় সুবিধাও আছে, ধীরে ধীরে ঠেলে ঠেলে পাশের পতিতের মধ্যে চল না কেন এগিয়ে। নজর পড়বে না কারও। পাঁচ বিঘা জমি নিয়েছে বনওয়ারী—ওটাকে সাড়ে পাঁচ বিঘা তো করতেই হবে।

প্রথম ফসল উঠলে সে ফসলের ভোগ দিতে হবে বাবাঠাকুরের থানে, মুগসিদ্ধ বরবটি-সিদ্ধ আর এক বোতল পাকি মদ। কালারুদ্দুর পুরুত মশায়কে দিয়ে আসবে গোটা কলাই। বেরাহ্মন পুরুতের মুখেই বাবা খেয়ে থাকেন। তারপর দিয়ে আসবে চন্ননপুরে বড়বাড়ি, নতুন মালিকবাড়ি। মুখুজ্জে বাড়িতে 'আজলক্ষ্মী'র ভোগে লাগবে, 'আজা' মহাশয়ের বদনে উঠবে। আর দিতে হবে জাঙলের দু-পুরুষে মনিব ঘোষ-বাড়িতে। তা না দিলে হয়? এই সব দিয়েথুয়ে যদি থাকে, তখন পাড়াতে একমুঠো ক'রে দিতে হবে। তার পরে থাকে

থাকবে, না থাকে—তাতেও বনওয়ারীর 'দুক্ষু' থাকবে না। চাষের দ্রব্য—'মা-পিথিমির দান', এ পাঁচজনকে দিয়েই খেতে হয়। বিশেষ ক'রে প্রথম বছরের ফসল। দেবতা-ব্রাহ্মণ-রাজা মনিব-জ্ঞাত-গোষ্ঠী সবাইকে দিয়ে যদি থাকে তো নিজে খাবে,—না থাকে হাত-পা ধুয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকবে। যা দেবে তা তোলা থাকবে—আসছে বছর দুনো হয়ে ঘরে আসবে ; যমপুরীর খাতাতেও জমা হয়ে থাকল তোমার নামে।

মনের আনন্দে হুম-হাম ক'রে কুপিয়ে চলল বনওয়ারী। বনওয়ারীর বউ ছুটে ছুটে বইছে ঝুড়ি-ভর্তি মাটি। সুচাঁদ পিসী খুঁড়িয়ে চ'লে এক ঝুড়ি ফেলে ফিরতে ফিরতে সে দু-তিন ঝুড়ি ফেলে আসছে। তার গরজের তুলনা কার সঙ্গে। এ জমি যে তার নিজের হবে।

ওঃ। সেরেছে রে। পাথর লেগেছে। কোদালের তলায় খং-খং ক'রে শব্দ উঠছে। মাটি সরিয়ে দেখলে বনওয়ারী। হাতখানেক মাটির নিচেই রয়েছে—নুড়িপাথর।

মাথায় হাত দিয়ে বসল বনওয়ারী। নুড়িপাথর এমন-তেমন নয়, একটা মেঝের পাড়নের মত ; ইয়া বড় বড় নুড়ি, আধ হাত তিন পো পুরু স্তর জমে আছে। কোদাল দিয়ে টামনা দিয়ে কোপ মারলে ধার ভেঙে যাবে, ভোঁতা হয়ে যাবে অস্ত্র, কিন্তু তাতে তো পাথর উঠবে না। সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। টামনার বাঁটের উপর হাত রেখে ভাবতে লাগল—উপায় ?

বাবুদের সাঁওতাল মজুরেরাও পেয়েছে পাথরের স্তর। টামনা রেখে গাঁইতি ধরেছে। বাবু মহাশয়দের কারবারই আলাদা, আগে থেকেই 'রনুমান' অর্থাৎ অনুমান ক'রে গাড়ি বোঝাই ক'রে গাঁইতি এনেছে। হেদো মণ্ডল বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। সেও ভাবছে, পাথর লাগলে মুশকিল হবে। হেদো মণ্ডল বললেন—লাগল তো ? অর্থাৎ পাথর।

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, লেগেছে।

—আমি জানতাম। হেদো মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, চ'লে গেলেন বাবু মহাশয়দের চাষবাবুর কাছে। গুজু-গুজু ফুসু-ফুসু লাগিয়ে দিলেন। বনওয়ারী হেসে ঘাড় নাড়লে অর্থাৎ 'ঢাকে ঢোলে বিয়ে তাতে কাশতে মানা।' চাষবাবুকে কিছু দিয়ে গাঁইতি ভাড়া নেবেন। তার আর চুপিসাড়ে কথা কিসের বাবা।

বনওয়ারীর স্ত্রী হতাশ হয়ে পাশে উবু হয়ে ব'সে পড়ল। সে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি হবে ?

সুচাঁদ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—ছেড়ে দে, বুল্লি, বাবা—ছেড়ে দে। পাথরের মধ্যে কোথা কোন দেবতা আছে, অসুরের কাঁড়ি আছে, তাতে চোট মেরে কাজ নাই—ছেড়ে দে।

সে তুলে নিলে একটা গোল নুড়ি। নুড়িটার কালো গায়ের মাঝখানে গোল সাদা দাগ—ঠিক পৈতের মত। বললে—দেখ। তারপর তুলে দেখালে একটা টুকরো অসুরের কাঁড়ি। ঠিক গাছের গুঁড়ির মত চেহারা, এগুলিকে সুচাঁদ বলে—অসুরের কাঁড়ি। অর্থাৎ অসুরের হাড় জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন, তাদেরই হাড়। এ সব কাহারদের পিতিপুরুষদের কথা। কিন্তু বনওয়ারীদের আমলে ও সব বিশ্বাস চ'লে গিয়েছে। সুচাঁদ

পিসীর মিথ্যে ভয়। জমি কাটছে বনওয়ারী জীবন-ভোর ; পাথরের গায়ে পৈতের মত দাগ হাজারে হাজারে দেখেছে। দেবতা কি হাজারে হাজারে ছড়িয়ে থাকে। পাথরে ও-রকম দাগ থাকে। অসুরের কাঁড়িও তাই। তবে ভাবনা একমাত্র এ পাথর কাটবে কি ক'রে ? গাঁইতি না হলে 'রসম্ভব' অর্থাৎ অসম্ভব। কিন্তু গাঁইতি কাহারেরা ধরে না। ঐ ছুঁচালো অস্ত্রটি কখনও তো ধরা হয় নাই, সায়েব লোকের 'রামদানি' অর্থাৎ আমদানি করা অস্ত্রটি যে শূলের মত। ওতে মা-বসুন্ধরার বুকে আঘাত করা কি উচিত। তার উপর পাবেই বা কোথা। বাবু মহাশয়ের চাষবাবুকে ঘুষ দেবার মত টাকা তার কোথা ?

হঠাৎ মনে পড়ল করালীর কথা। করালী পারে। চন্ননপুরের রেল-কারখানায় গুদাম বোঝাই গাঁইতি। সে দিতে পারে। কিন্তু—

হেদো মণ্ডল এসে বললেন—কি রে, হতভম্ব হয়ে গেলি যে। চোট মেরেই দেখ।

তা বটে। চোট মেরে দেখাটা দরকার, কতখানি পাথর আছে। মনে মনে প্রণাম ক'রে সে চোট মারতে আরম্ভ করলে। খং—খং—খং। লোহা এবং পাথরে আঘাত লেগে শব্দ উঠতে লাগল। পাথরের স্তরটা আধ হাতের মত পুরু, নিচে মোলাম কালো মাটি। বাহবা, বাহবা। একেবারে উৎকৃষ্ট ধরনের মাটি। গাঁইতি ধরতেই হবে। না ধ'রে উপায় নাই। কুঁদোর মুখে বাঁকা এবং সোজা, নেযাইয়ের উপর হাতুড়ীর নিচে লোহা জব্দ, গাঁইতির মুখে মাটি-পাথর জব্দ। সে দেখেছে চন্ননপুরের লাইনে—দূর থেকে দেখেছে অবশ্য—পশ্চিমা মজুরের হাতে গাঁইতির ঘায়ে পাথর খান খান হয়ে যায়। তাদের চেয়ে কম জোরে কোপ মারে না কাহারেরা।

—আঃ। আরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে।

টামনা ছেড়ে দিয়ে বনওয়ারী কপালখানা চেপে ধরলে। হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে তার কুচি ছিটকে এসে তার কপালে লেগেছে। ওঃ, বাঁটুলের মত বেগে, কিন্তু তার চেয়ে ভীষণ। বাঁটুল গোল, তার ধার নাই, এটা ধারালো ভাঙা পাথর।

হাতের তালুতে আগুনের মত 'তাই' অর্থাৎ তাপ ঠেকছে কিসের ? হুঁ, তা [illegible]ল নিয়েছে। 'অক্ত' নিয়েছেন মা-বসুমতী।

ছুটে এল বনওয়ারীর পরিবার। দেখি, দেখি। অক্ত পড়ছে যে গো। হেই মা। কি হবে। পিসী-অ পিসী।

হেদো মণ্ডলের হাতের কঙ্কে দেখে সুচাঁদ আবার একদফা তৃষিত হয়ে উঠেছিল। সে শুনতেই পেলে না বনওয়ারীর পরিবারের কথা।

হেদো মণ্ডল দেখেছিলেন, তিনি উঠলেন না, শুধু বললেন—নিয়েছে নাকি ?

বনওয়ারী হেসে বললে—হ্যাঁ।

হেদো বললেন—ও তো জানা কথাই। নেবেই। না নিয়ে ছাড়বে না। লাগিয়ে লে, মাটি লাগিয়ে লে।

বনওয়ারী একমুঠো মাটি তুলে চেপে ধরলে কপালের ক্ষতস্থানে। এতক্ষণে সুচাঁদ দেখতে পেয়ে সামনে উবু হয়ে বসল।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা। মা-বসুমতী।

মা-বসুমতী যেমন দেন, তেমনিই নেন। আমন ধানে চালে ফসল তোমাকে খাওয়াবেন, কিন্তু শেষকালে 'দ্যাহখানি' নেবেন, পুড়িয়ে দিলেও নিদেনপক্ষে ছাইমুঠোটি তাঁকে দিতে হবে। বেঁচে যতদিন আছ, নখ চুল এ দিতে হবে। মধ্যে মাঝে দু-চার ফোঁটা 'অক্ত'। 'যে প্যাটে ছেলে ধরে সে প্যাট কি অল্পে ভরে?' এত মানুষ এত পশু পাখী পেসব করেছেন মা, বুক চিরে ফসল দিচ্ছেন, তার তেষ্টা কি শুধু মেঘের জলে মেটে? মায়ের বুকে চোটাতে গেলে 'অক্ত' দিয়ে মায়ের পূজা দিতে হয়। না দাও, মা ঠিক তোমার দু-চার ফোঁটা রক্ত বার ক'রে নেবেনই। নিয়েছেন মা তাঁর পাওনাগণ্ডা। বনওয়ারী রক্তমাখা মাটি মুঠো ক'রে জমির এক কোণে পুঁতে দিলে।

তবে এ লক্ষণ ভাল; রক্ত যখন নিয়েছেন মা, তখন দেবেন—তাকে দু হাত ভ'রে দেবেন।

ঝম-ঝম-গম-গম। গম-গম-ঝম-ঝম। পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, হাঁসুলী বাঁকের বাঁকে বাঁকে পঞ্চশব্দের বাজনার মত ধ্বনি তুলে দশটার গাড়ি চলেছে কোপাই পাগলীর বুকের ওপরের লোহার মালার পুল পার হয়ে।

মুখুজ্জেবাবুদের সাঁওতাল মজুরেরা গাঁইতি টামনা ঝুড়ি ফেলছে ঝপাঝপ। দশটায় এ বেলার মত ছুটি।

হাঁসুলীর বাঁকে বোশেখ মাসে দ্বাদশ সূর্যের উদয়।

এখানে গ্রীষ্মের দিনে খাটুনীর সময় সকাল ছটা থেকে দশটা। আবার ও-বেলায় তিনটে থেকে ছটা।

বনওয়ারীও কোদাল ঝুড়ি তুললে। ও-বেলার খাটুনী বনওয়ারী খাটবে না। বনওয়ারীর ও-বেলার পালা আরম্ভ হবে সন্ধ্যেবেলা থেকে। চাঁদনী রাত্রি আছে, ফুর ফুর ক'রে 'বাওর' অর্থাৎ বাতাস বইবে, মদের নেশার আমেজটি লাগবে, পাড়াপ্রতিবেশী পাঁচজনকেও পাওয়া যাবে, তখন আবার কাজ আরম্ভ করবে বনওয়ারী। বাবুদের পয়সার খেলা, জাঙলের সদগোপ মহাশয়দেরও কতকটা তাই,—কতকটা দাপটের খেলাও বটে, জবরদস্তি কাজ আদায় ক'রে নেয় তারা। বনওয়ারীর নিজের গতরের খাটুনি, আর পাড়া-প্রতিবেশীর ভালবাসা 'ছেদ্দার' অর্থাৎ শ্রদ্ধায় কেটে দেওয়ার কাজ। বনওয়ারীর জমি রাত্রে কাটা হবে, জাঙলের মনিবেরা সকালে এসে দেখে বলবেন—এ শালোদের সঙ্গে পারবার জো নেই।

জাঙলের কাছাকাছি এসে সুচাঁদ বললে—বনওয়ারী, তা পয়সা কটা দিবি এখন?

বনওয়ারী কোমরের গেঁজেল থেকে একটি দুয়ানি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—এই এক বেলা খাটুনির দামই দিলাম তোমাকে। উ-বেলা আর আসতে হবে না।

—আসতে হবে না? কেনে?—বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল সুচাঁদের। সে বুঝতে পেরেছে, বনওয়ারী তাকে শুধু আজ ও-বেলার জনাই নয়, বরাবরের জন্যই আর কাজে নেবে না।

বনওয়ারী বললে—তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে নিয়ে কি খেটে পোষায়? না তোমারই আর খাটা পোষায়?

সুচাঁদ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—তা বেশ। দে, তাই দে। তোর ধর্ম তোর ঠাঁই। প্যাটের বিটীই যে কালে বৈমুখ, সে কালে আর পরের ভরসা কিসের? লইলে

আমি এখনও যা খাটতে পারি, তা তোর পরিবারে পারে না।

বনওয়ারী আর কথা বললে না। সে স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে চ'লে গেল গ্রামের দিকে। জলখাবারের সময় হয়েছে, জল খাবে। তার আগে গরুগুলিকে দুইতে হবে ; তাদের মাঠে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক কাজ। একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে আজ। বনওয়ারীর গড়নটা খুব মোটা, তার উপর জোয়ান বয়সের প্রথম থেকেই বাঁক ব'য়ে পালকি ব'য়ে বাঁ কাঁধটা ডান কাঁধের চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। চলেও সে বেঁকে। ডান পা-টা পড়ে জোরে জোরে। হন হন ক'রে সে চলল। ভিজে আলপথের ডান দিকের কিনারায় তার পায়ের ছাপ ব'সে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা জায়গা ভস করে ব'সে গেল। বনওয়ারী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে। বললে—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়লে সে।

বউ বললে—কি ?

—পিঁপড়ে।

অসংখ্য পিঁপড়ে গর্তটার ভিতরে বিজবিজ করছে। অধিকাংশের মুখে ডিম।

বউ বললে আহা, দেখে চলতে হয়। ডিম নিয়ে কেমন আকুলি-বিকুলি করছে দেখ দি-নি !

—তোর মাথা। বনওয়ারী এদিক ওদিক চেয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা পিঁপড়ের সারি দেখিয়ে দিয়ে বললে—ওই দেখ। অনেকক্ষণ থেকে ওরা পালাতে লেগেছে এখান থেকে। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললে -জল ঝড় পেচণ্ড একটা হবে লাগছে।

—জলঝড় হবে ?

—পেচণ্ড।

—পেচণ্ড ?

—হ্যাঁ। পিঁপড়েতে জানতে পারে। বর্ষায় দেখিস না মেঝে থেকে দালে বাসা করে ? দাঁড়া।

ব'লে সে এগিয়ে গেল কর্তার থানের দিকে। ওখানে বেলগাছের গোড়াগুলিতে বারো মাস মানুষের হাত পড়ে না, পড়ে কালেকস্মিনে। এই নিরুপদ্রবতার জন্য বেলগাছ শ্যাওড়াগাছের গোঁড়াগুলি পিঁপড়ের বাসায় ভর্তি। প্রচুর পরিমাণে বালিমাটির কণা তুলে ছোট স্তূপের আকারে উঁচু ক'রে সাজিয়ে চমৎকার বাসা করে। কিন্তু বর্ষার আভাস মাত্র পিঁপড়েগুলি ডিম নিয়ে উঠে যায় গাছের উপরে ; পুরানো গাছগুলির জীর্ণ গাঁঠে ছিদ্র করাই আছে, সেই ছিদ্রগুলি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বাস করে। বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির লক্ষণ জানতে হ'লে বনওয়ারী এই গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে, পিঁপড়েগুলি নিচে নেমে এসেছে, কি উপরে উঠছে।

বেশি দূর যেতে হ'ল না, কর্তার থানের মুখে এসেই তার নজরে পড়ল, কতকগুলো কাক নেমেছে। বেলগাছের ডালে ব'সে আছে সড়ক-ফিঙের ঝাঁক। তারাও মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাকদের আশেপাশে লাফাতে লাফাতে ঠুকরে কিছু খেয়ে চলেছে। পিঁপড়ে খাচ্ছে, তাতে আর ভুল নাই। পিঁপড়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে উপর চলেছে। পক্ষীর ঝাঁক নেমেছে, ওদের ভোজ লেগেছে। প্রচণ্ড জলঝড় একটা হবে, তাতে সন্দেহ নাই। পাড়ার

লোককে সাবধান করতে হবে। এ সব হুঁশ যদি কারু থাকে। বনওয়ারীর আক্ষেপ হ'ল, ব'লেও কাহারদের সে জ্ঞান দিতে পারলে না।

বনওয়ারী বাড়ি ফিরল। বউ আগেই এসেছে। সে বললে—আচ্ছা বাজে করণে তোমার মতি বটে বাপু। সাবি বেনোদা ব'সে আছে। ওদ উঠেছে—ওরা আর যাবে কখন?

বনওয়ারী বললে—চেঁচাস না, চেঁচাস না, বুল্লি মাগী, একদণ্ড দেরিতে সাবি বেনোদা ওদে ননীর পুতুলের মতন গ'লে যাবে না। আমার কর্ম আমি বুঝি। দে বাছুর ছেড়ে দে, কেঁড়েটা দে।

গাইগুলি চীৎকার করছিল বাছুরের জন্য, বনওয়ারী গিয়ে কপালে গলায় হাত বুলিয়ে বললে—হচ্ছে, হচ্ছে। মা সকল, ধয্য ধর একটুকুন। হাসতে লাগল সে।

গাই দুয়ে শেষ ক'রে কেঁড়েটি নামিয়ে দিতেই সাবি বললে—গেরস্তরা বলছে বেজায় জল দিচ্ছিস দুধে। জল একটুকুন কমিয়ো কাকী।

সাবি বেনোদা দুজনে চন্ননপুরে যায় দুপুরবেলা, সুকৌশলে স্তূপীকৃত ঘুঁটে বড় বড় ঝুড়িতে সাজিয়ে নেয়, তার উপর রাখে দুধের ঘটি। চন্নপুরেব ভদ্রলোকের বাড়িতে দুধ রোজ দিয়ে আসে। চার পয়সা সের দুধ। বনওয়ারীর বাড়িতে দুধ হয় চার সের। সেই দুধে কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া পরিষ্কার জল মিশিয়ে বনওয়ারীর বউ পাঁচ সের ক'রে দেয়। দিন গেলে পাঁচ আনা পয়সা। তার মধ্যে দৈনিক পাঁচ পয়সা হিসেবে পায় সাবি আর বেনোদা।

বনওয়ারীর বউ বড় ভালমানুষ। সে ঘাড় নেড়ে বললে—জল তো সেই এক মাপেই দিই মা। বেশি তো দিই না।

বনওয়ারী সাবির দিকে তাকিয়ে বলল—পথে ঝরনার জল মিশিয়ে তোরা আরও কতটা বাড়াস বল দিনি?

বেনোদা বললে—হেই মা গো! আমরা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা। তোমরা বড় স্যায়না হে।—হাসতে লাগল বনওয়ারী।

বেনোদা এবং সাবিও হাসতে লাগল; এ কথার পর আর অস্বীকার করলে না তারা অভিযোগ। বনওয়ারী আবার বললে—একটুকুন কম বাড়িয়ে লিস, মানে মানে—আগে যতটা বাড়াতিস, তার চেয়ে বাড়াস না। তা হ'লে বাবুরা রা কাড়বে না।

কথাটা সত্য, সাবি এবং বেনোদা—শুধু তারাই বা কেন—কাহারপাহার যে সব মেয়ে পরের দুধ নিয়ে চন্নপুরে যোগান দিয়ে আসে, তারা সকলেই ওই কাজ করে। পথে দুধে খানিকটা জল ঢেলে দুধ বাড়িয়ে দৈনিক দুটো চারটে পয়সা উপরি উপার্জন করে।

বনওয়ারী স্ত্রীকে বললে—ডিমগুলান দিয়ে দে।

স্ত্রী বললে—মনিব-বাড়িতে দেবে বলছিলে যে?

—দে দে। এখন পয়সার টানা, জমি কাটতে নোকজনকে পয়সা লাগবে।

মনিব। মনে মনেই জল্পনা-কল্পনা করে বনওয়ারী, মনিব যে এখন কে হবেন কে জানছেন! চন্নপুরে বড়বাবুর চরণ যদি পায়, তবে—

মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সেই হাসিমুখেই চলল সে করালীর বাড়ির দিকে।

করালী নাই নিশ্চয়ই। পাখীকে ব'লে আসবে—করালীকে বলিস আমার গোটাকয়েক গাঁইতি চাই। একটু পাড়া ঘুরেই চলল সে, কার ঘরের চালের কেমন অবস্থা দেখে নিচ্ছিল। দু-চার দিনের মধ্যে জল একটু বেশি পরিমাণেই হবে ; সামনে বৈশাখ মাস—জল হ'লে ঝড় হতেই হবে।

'পাথর' অর্থাৎ শিলাবৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। সকলকে সতর্ক ক'রে দিতে হবে।

কাহারপাড়ার ঘর। বানে ডোবে, ঝড়ে ওড়ে। দালান নয়, কোঠা নয়, ইট নাই, কাঠ নাই ; মাটির দেওয়াল, বাঁশবাঁদির বাঁশ, হাঁসুলী বাঁকের নদীর ধারের সাবুইয়ের দড়ি আর মাঠের ধানের খড়—এই নিয়ে ঘর। কোঠাঘর করতে নাই—বাবাঠাকুরের বারণ আছে। তা ছাড়া কোঠায় শোবে বাবুরা, সদগোপ মহাশয়েরা। কাহারদের কি তাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে হয়? না সাজে?

বনওয়ারীর ভুরু কুঁচকে উঠল। নাঃ, আর পারলে না সে। কাহারদের শিক্ষা হবে না এ জীবনে। তার হাড়ে আর কুলারে না। সকলের চালই ফুরফুর করছে। কারুর চাল তেমন ভাল নয়। এখন কারুর হুঁশ নাই। এখন বেশ লাগছে। 'আত্তিরে' ঘরে শুয়ে চালের ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো আসে, 'দেবসে' 'ওদ' আসে, বেশ লাগছে। গ্রাহ্য নাই। গ্রাহ্য হবে বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এলে সেই ঘোর লগনে। চালের অবস্থা একমাত্র তার ঘরেরই ভাল। এরই মধ্যে চালে সে নতুন খড় দিয়েছে। আচ্ছা বাহার খুলেছে। ওই আর একখানা ঘরের চালেও নতুন খড়। ওখানা তো করালীর ঘর। হ্যাঁ, করালীর ঘরই তো। বাহাদুর ছোকরা। সে এগিয়ে গেল এর ঘর ওর ঘর দেখতে দেখতে। করালীর ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল সবিস্ময়ে। এ দিক দিয়ে তার পথ নয়। এ পথে সে বড় হাঁটে না। পাড়ার মাতব্বর সে, দরকার না হলে সে কারও বাড়ি যায় না। করালীর বাড়ি সে ওদের বিয়ের পরে আর আসে নাই।

হরি হরি হরি। বলিহারি বলিহারি। ঘরখানাকে নিকিয়ে চুকিয়ে রঙ-চঙ দিয়ে করেছে কি? মনের মানুষ নিয়ে ঘর বেঁধেছে কিনা ছোকরা। ঘরের সামনেটার উপরের দিকে ঘন লাল গিরিমাটি দিয়ে রাঙিয়েছে, নিচের দিকটায় দিয়েছে আলকাতরা। দ- য়ায় দিয়েছে আলকাতরা। দরজার দুপাশে আবার লাল নীল সবুজ হরেক রকম রঙ দিয়ে এঁকেছে দুটো পদ্ম। বাঃ বাঃ।

বাড়িতে কেউ নাই। পাখী বোধ হয় ঘাস কাটতে গিয়েছে। করালী তো সকালেই গিয়েছে চন্নপুর লাইনে খাটতে। নসুও গিয়েছে চন্নপুরে মজুরদের সঙ্গে খাটতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দেখলে। মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল তার।

—ক্যা গো? ক্যা দাঁড়িয়ে? এক বোঝা ঘাস মাথায় ক'রে পাখী এসে বাড়ি ঢুকল। বোঝার ঘাসগুলি তার চোখের সামনে ঝুলে রয়েছে ব'লে মানুষটাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে না সে।

—আমি রে পাখী। তোদের ঘর দেখতে এসেছি মা। বা-বা-বা। এ যে রিন্দভোবন ক'রে ফেলালছে করালী।

বোঝা উঠানে ধপ ক'রে ফেলে পাখী তাড়াতাড়ি ঘর খুলে একটা নতুন কাঠের চৌকো

টুল বার ক'রে দিলে—ব'স মামা।

—বা-বা-বা ! এ যে টুল রে ! বলিহারি বলিহারি ! ভদ্দরজনের কারবার ক'রে ফেলালছে করালী !

পাখী ঘর থেকে একটা নতুন হারিকেন, একখানা নতুন সস্তা দামের শতরঞ্চি, একটা রঙচঙে তালপাতার পাখা এনে সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—এই দেখ, মানা করলে শোনে না ; আজেবাজে জিনিস কিনে টাকা-পয়সার ছেরাদ্দ করছে।

হা-হা ক'রে হেসে বনওয়ারী বললে—ওরে বাবা, নতুন বিয়ের এই বটে। তার ওপরে বউ যদি মনে ধরে, তবে তো আর কথাই নাই। তা তোকে মনে ধরা তো ধরা—দুজনাতে মনের মানুষ।

পাখী মুখে আঁচলটা দিয়ে হাসতে লাগল মামার কথা শুনে।

বনওয়ারী উঠল, বললে—আসছিলাম তো বাড়িতেই। পথে পাড়াটাও ঘুরলাম, সব চাল দেখে এলাম। একটা পেচণ্ড ঝড়জল হবে লাগছে কিনা। তা তোদের ঘরে এসে দাঁড়ালাম, এমন ঝকমকে ঘরদোর দেখে দাঁড়াতে হ'ল। যাই, এখন দেখি—কার চালে খড় আছে কার চালে নাই। মাতব্বর হওয়ার অনেক ঝক্কি মা।

পাখী বললে—ঝক্কি নিলেই ঝক্কি, না নিলে ক্যা কি করবে ? ওই তো আটপৌরেপাড়ার মাতব্বর পরম—সে ঝক্কি নেয় ? এত সব খোঁজ করে ? কার চালে খড় নাই, কার ঘরে খেতে নাই—দেখে বেড়ায় ? কারও দোষ-গুণ বিচার করে ? তুমি এই যে আমার ঘর ক'রে দিলে, লইলে আমি চলে যেয়েছিলাম চন্ননপুরে ওর সঙ্গে। তা'পরেতে নিকনে কি ঘটত কে জানে। হয়তো আবারও কারুর সঙ্গে চ'লে যেতাম বিদ্যাশ বিভুঁয়ে। তোমার দয়াতেই আমার সব। তুমি ধার্মিক লোক, মা-লক্ষ্মীর দয়া অয়েছেন তোমার 'পরে। কত্তাঠাকুরতলায় ধূপ দাও, পিদীম দাও, তোমার ধরমবুদ্ধি হবে না তো হবে কার ? পাখী হঠাৎ হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে।

বনওয়ারীর বড় ভাল লাগল পাখীকে আজ। বড় ভাল মেয়ে পাখী। বসনের কন্যে, 'অক্তে' চৌধুরী মশায়দের 'অক্তের' মিশাল আছে, হবে না ভাল কথা। আনন্দে তৃপ্তিতে তার মন জুড়িয়ে গেল, হিয়েখানি যেন ভ'রে উঠল গরমকালে মা-কোপাইয়ের 'শেতল' জলে-ভরা 'আঙা' মাটির কলসের মত। মনে মনে সে কত্তাঠাকুরকে প্রণাম করলে, বললে—বাবাঠাকুর এ সব তোমার দয়া। তুমি মাতব্বর করেছ, তুমিই দিয়েছ এমন মন, মতি। তুমি অক্ষে করবে কাহারদের ঘরবাড়ি ঝড়ঝাপটা থেকে। বনওয়ারী তোমার অনুগত দাস, তোমার হুকুমেই সে কাহারপাড়ার চাল দেখছে। লাঙল টানে গরু, তার কি বুদ্ধি আছে, না সে জানে কোন্ দিকে ঘুরতে হবে, ফিরতে হবে ? পিছনে থাকে লাঙলের মুঠো ধ'রে চাষী, তাকে গরু দেখতে পায় না ; কিন্তু হালের মুঠোর চাপের ইশারায় গরু ঠিক চলে। বনওয়ারী সেই গরু ! বাবাঠাকুর, কত্তাবাবা, তুমি হ'লে সেই চাষী।

তা নইলে করালীর মতিগতি ফেরে ! চন্ননপুরের কারখানায় পাকা-মেঝের কোয়ার্টার ছেড়ে কাহারপাড়ার বাড়িতে রঙ ধরিয়ে ফিরে আসে ! কথাবার্তা মিষ্টি হয় ! না, করালী অনেকটা সোজা হয়েছে। এই তো সেদিন নিজে থেকে তেরপল দিয়ে এল গুড়ের শালে।

কোনও রকমে ওকে ঘরবশ ক'রে চন্ননপুর ছাড়িয়ে কাহারদের কুলকর্মের কাজে লাগাতে হবে ; ধরমের পথ ধরিয়ে দিতে হবে। সে একদিনে হবে না। 'কেমে-কেমে' 'ধেয়ো-ধেয়ো' বাঁকা বাঁশকে যেমন তাতিয়ে চাপ দিয়ে সোজা করতে হয় তেমনই ভাবে। পাড়ার লোকে ক্ষেপে উঠেছিল করালীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার তো দশের মত হট ক'রে মাথা গরম করলে চলে না! ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে তাকে।

ছোঁড়ার একটা দোষ হ'ল 'লবাবী' করা। অ্যাই টেরি, অ্যাই জামা, অ্যাই কাপড়, অ্যাই একটা 'টরচ' আলো, একটা বাঁশী, যেন বান্নুর বেটা বাবু বেড়াচ্ছে, কে বলবে কাহারদের ছেলে! মুখে লম্বা লম্বা কথা। লোকে এ সব সহ্য করতে পারে না। তাও অনেক করেছে—অনেক। তবে নাকি শোনা যাচ্ছে, ছোঁড়া আজকাল বে-আইনী চোলাই মদের কারবার করছে চন্ননপুরে। কাহারপাড়াতেও আনছে। রাত্রে মজলিস ক'রে এই মদ খায়। সাবধান করতে হবে। শাসন করতে হবে।

বনওয়ারীর মনের মধ্যে একটি সাধ হয়। করালীকে নিয়ে সাধ। সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহারপাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে। সর্বনাশের পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহারপাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে—লাগতে লাগবে তার সঙ্গে। সে পথে করালী গেলে বনওয়ারী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তার ইচ্ছা তাকে কোলগত ক'রে নেয় ; ওর 'পুত্ত'সন্তান নাই। ডান হাত থেকে বঞ্চিত করেছেন ভগবান। বনওয়ারীর ইচ্ছে, বিধাতা যা তাকে দেন নাই—নিজের কর্মফলের জন্যে—সে তা এই পিথিমীতে অর্জন করে।

পুণ্য তার আছে। বাবার চরণে মতি রেখেছে, নিত্য দু বেলা প্রণাম করে, বাবার থান আগলে রাখে। আঁধার পক্ষের পনরো দিন সনজেতে পিদীম দেয়। জ্ঞানমত বুদ্ধিমত ন্যায্য বিচারই করে সে। নয়ানের বউ পাখীকে করালীকে দিয়ে অন্যায় একটু করেছে, নয়ানের মা চোখের জল ফেলেছে—তাকে শাপ-শাপান্ত করেছে। তা করুক, বনওয়ারী নিজের কর্তব্য করবে। নয়ানের একটি সাঙা দেবে সে, কনে এর মধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলেছে। মেয়েটির রীতকরণ একটুকুন চনমনে, কালামুখী বদনাম একটু আছে তার ওপর গাঁয়ের সমাজে। তা থাক, নয়ানের মায়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই এমন মেয়ে সে ঠিক করেছে। নয়ান যদি সেরে না ওঠে, তবে ওই মেয়েই রোজকার ক'রে নয়ানের মাকে খাওয়াবে।

লোকে না ভেবে কথা বলে। ভদ্রলোকে বেশি ব'লে। তারা বলে—ছোটলোকের জাতের ওই করণ। তাঁরা হলেন টাকার মানুষ, জমির মালিক, রাজার জাত। তাঁদের কথাই আলাদা। কথাতেই আছে, 'আজার মায়ের সাজার কথা'। নয়ান যদি তাঁদের জাতের হ'ত, তবে নয়ান ম'রে গেলেও থাকত তার টাকা জমি, তাই থেকে নয়ানের মা একদিকে কাঁদত, একদিকে খেত। আর কাহারদের জাত ? না জমি, না টাকা, নয়ান ম'রে গেলে নয়ানের মায়ের সম্বল হবে গতর, গতর গেলে ভিক্ষে। তার চেয়ে এ মন্দের ভাল। পাপ পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, সে বুঝতে পারে মেয়েলোকের সতীত্বের মূল্য। কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণসেবা করে হাড়ি ডোম

বাউরী কাহার। শ্মশানে থাকে চণ্ডাল। বিধির বিধান এসব। কাহারদের মেয়েরা সতী হ'লে ভদ্র-জনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার-জন্মের এ কর্ম স্বীকার যে করতেই হবে।

পাখী কিন্তু পাখীর মতই কলকল ক'রে চলেছিল ভোরবেলার পাখীর মত। কত প্রশংসাই সে ক'রে গেল। বাবার চরণে পেনাম জানিয়ে কাহারজনমের কথা ভাবছিল বনওয়ারী। হঠাৎ পাখীর কণ্ঠস্বর পরিবর্তনে সে একটু চমকে উঠল।

গলা খাটো ক'রে পাখী বললে—জান মামা, ঐ মিচকেপোড়া চিপেষষ্ঠী নিমতেলে পানা সেদিন বলছিল—দেখ কেনে মাতব্বরের ধরম, এই বছর না ফিরতে বেরিয়ে যাবে। ফেটে যাবে। পাপ ক'রে বাবাঠাকুরের ঠাঁই ছোঁয় কেউ তবে বাবা তাকে ক্ষমা করে না। তুমি নাকি— ? পাখী চুপ করলে।

—কি ? আমি নাকি— ? কি করেছি আমি ?

—ক্যা জানে বাপু। আমার আগেকার শাউড়ী, আটপৌরেপাড়ার কালোবউ—এইসব পাঁচজনকে নিয়ে নানান কথা নানান কেচ্ছা করছিল বলে, সে নাকিনি দেখেছে।

বনওয়ারীর বুকটা হঠাৎ ফুলে উঠল রাগে। কানে শোনা কথা, মিথ্যে নয় তা হ'লে।

পাখী বলল—আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুগান কে বেঁধেছে জান ? ওই পানা।

—পানা ?

—হ্যাঁ। নসুদিদির তো ভাবীসাবীর অভাব নাই। ওই আটপৌরেপাড়ার দলের কোন ছোঁড়া বলেছে।

—হুঁ। বনওয়ারী মাটির দিকে চেয়ে একটু ভেবে নিলে—আচ্ছা।

পাখী আবার বললে—সে তো এগে একেবারে কাঁই। বলে—মারব শালোকে। পানা নাকিনি থানায় কি সব লাগান-ভাজান ক'রে এসেছে ওর নামে। ও নাকি চন্ননপুরে চোলাই মদ বিক্কি করে, লুকিয়ে অ্যালের সিলিপাট বিক্কি করে। আমাদের বাড়িতে নাকি সনজে-বেলায় ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা বসে, নাচগানের ছাউনি দিয়ে ভেতরে ভেতরে নাকি চুরি-ডাকাতির শলাপরামশ্য হয়। চোরের দল গড়ে।

সর্বনাশ। বনওয়ারী চমকে উঠল। পানা, হারামজাদা পানা, ঘরভেদী পানা, কাহারপাড়ার পাপ পানা। পানাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসা অতি সহজ কাজ। কাঠির মত চেহারা, পাখীর মত নাক, ছুঁচোর মত লম্বাটে সরু মুখ পানার, কিন্তু হারামজাদা নিজের চোখে কিছু যেন দেখেছে বলেছে। কি দেখেছে ?

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল বনওয়ারীর, পানার মনিব পাকু মণ্ডল মহাশয়ের কথা। পাকু মণ্ডল বলছিলেন—পানা তাঁকে বাঁশঝাড় বিক্রি ক'রেছে। পাকু মণ্ডলের সন্দেহ নাকি পানা এর মধ্যে কিছু গোলযোগ করেছে। বাঁশঝাড় দেখে তার মনে হয়েছে, ঝাড় একটা নয়, ঝাড় দুটো। চৌহদ্দীটা শুনতে বলেছেন একদিন বনওয়ারীকে। পাকু মণ্ডলের কাছে যেতে হবে তাকে। এক্ষুনি যাবে সে।

উঠে পড়ল বনওয়ারী। করালীর বাড়ি থেকে হনহন ক'রে বেরিয়ে সেই দুপুর রৌদ্রেই চলল সে পাকু মণ্ডলের কাছে।

পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। যাঃ, পাখীকে আসল কথাটাই বলা হ'ল না ; গাঁইতির জন্যে বলতে এসে পানার চতুরালির কথা শুনে মাথা ঘুরে গেল তার। ভুলে গেল আসল কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে। মাতব্বরির যত সুখ তত দুঃখ। চড়কের পাটা থাকে মানুষের মাথায়, সেই পাটায় গজাল পোঁতা থাকে, তার উপর শুতে হয় গাজনের প্রধান ভক্তকে। মাতব্বরিও তাই। মানুষের মাথার উপরে কাঁটাভরা পাটায় শোয়া। হে ভগবান। পানা তার সর্বনাশ করবে। এটা অবশ্য তার পাপ, তার অন্যায়। কিন্তু সে তো মানুষ ! কালো-বউ—

হঠাৎ মাথায় যেন তার বিদ্যুতের মত খেলে গেল—চড়কের পাটা। সামনে গাজন। বাবা কালারুদ্দের চড়কের পাটায় শুয়ে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে, লোকের সামনে প্রমাণ করবে তার কত পুণ্য।

আট

শিবো হে। সকল বুড়ার আদি বুড়া, সকল দেবতার বড় দেবতা—বাবা বুড়া শিব, বাবা কালারুদ্দু। বেলতলার বাবাঠাকুর, কাহারদের দেবতা। তাঁরও দেবতা বাবা কালারুদ্দু। ধম্ম রঞ্জ—যে ধম্মরাজ—তারও বড় বাবা কালরুদ্র।

এবার বাবা কালরুদ্রের গাজনে চড়কের গজাল পেটা ঘুরনচাকির গজালের মাথায় শোবার পুণ্য সে অর্জন করবে। করতেই হবে তাকে।

বাবা কালারুদ্দু—কর্তাঠাকুরের উপরওয়ালা—বাবাঠাকুরের বাবা। 'লারায়ণে'র যেমন 'লারদ', বাবা কালারুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়া-মাথা গেরুয়া-পরা খড়ম-পায়ে দণ্ড-হাতে কর্তাঠাকুর। কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম, কালরুদ্রের হুকুমের মরণ-বাঁচন। গতবারে গাজনের ঠিক পনেরো দিন পরেই বাবা কালারুদ্দের প্রধান ভক্ত মারা গিয়েছে। প্রধান ভক্তই চড়কের পাটার গজালের ডগায় শোয়, সে-ই দু'হাতে আগুন ফুলের 'আঁজলা' অর্থাৎ অঞ্জলি নিয়ে চাপিয়ে আসে বাবার মাথায়, সে-ই নাচে আগুনের ফুলের উপর। মড়ার মাথা নিয়ে তাকেই খেলতে হয়। নিজের অনেক পুণ্য—আর অনেক বেশি দেবতার দয়া না থাকলে কালরুদ্রের প্রধান ভক্ত কেউ হতে পারে না। এবার সেই প্রধান ভক্তের খালি ঠাঁইয়ে বনওয়ারী গিয়ে শোবে। সংকল্প দৃঢ় ক'রে ফেললে সে। বাবা কালারুদ্দের প্রধান ভক্ত চিরকাল হয় নীচ জাতের লোক। সেই আদ্যিকালের বাণগোঁসাইয়ের কাল থেকে। সুচাঁদ পিসী বাণগোঁসাইয়ের কাহিনী বলে। বাণগোঁসাই ছিল ছোটজাতের রাজা, কিন্তু ভোলা মহেশ্বর কালারুদ্দের ভক্ত। মদ খেত, 'মাস' খেত, কিন্তু বাবার চরণে ফুল দিত, গাজনে সন্নেস করতে কখনও ভুলত না। সন্নেস ক'রে আগুনের আঙারের ওপর ব'সে বাবাকে ডাকত, লোহার কাঁটার শয্যেতে 'শয়েন' করত, সোনা রূপো হীরে মানিকের গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত। কিবা 'আত্তি' কিবা দিন গাল বাজিয়ে বম্-বম্ করত, বাবার

নামগান করত। 'শিবো হে—শিবো হে—শিবো হে!' বাবার দয়াও তাঁর ওপর খুব। পিথিমীর 'আজা-আজড়া' থেকে দেবতারা পর্যন্ত বাণগোসাঁইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠত না। গোসাঁইয়ের একশো পরিবার। একটি মাত্র সন্তান—তাও কন্যে; কন্যের নাম 'রুষা' অর্থাৎ উষা। সেই রুষাকে দেখে লারায়ণের লাতির মন টলল। লারায়ণের লাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বাণগোসাঁইয়ের বাড়িতে রুষাবতীর ঘরে। বাণগোসাঁই জানতে পেরে বলে—কাটব লারায়ণের লাতিকে। লারায়ণের আসন টলল, মুকুট লড়ল। লারায়ণ বললেন, লারদ, আসন কেনে টলে মুকুট কেনে লড়ে, গুনে দেখ তো? লারদ খড়ি পেতে গুনে বললেন বিবরণ। লারায়ণ ছুটে এলেন, গোসাঁইয়ের বাড়িতে হানা দিলেন। অ্যাই লেগে গেল লড়াই। পিথিমী টলমল করতে লাগল। জলে আগুন লাগল, মাটির বুক ফেটে উঠতে লাগল, আকাশের তারা খ'সে পড়ল, 'ছিষ্টি গেল গেল' রব উঠল। লারায়ণ 'চক্ক' নিয়ে কেটে ফেললেন বাণগোসাঁইয়ের হাত পা। তবু গোসাঁই হারে না, মরে না, মরে—আবার বাঁচে। তখন এলেন বাবা কালারুদ্দু। কালারুদ্দু আর লারায়ণ—হরি আর হর; হরি-হরের মিলন হল। বাবা কালারুদ্দু মাঝে প'ড়ে রুষাবতীর সঙ্গে লারায়ণের লাতির বিয়ে দিলেন। হরি বললেন বাণগোসাঁইকে—তোমাকে আমি বর দোব। বর লাও। তোমার কাটা হাত-পা জোড়া লাগবে, তোমাকে পিথিমীর আজা ক'রে দোব। বাণগোসাঁই বললেন—না। কাটা হাত পা আমি চাই না। আজাও আমি হব না। বর যদি দেবে তো বর দাও কালারুদ্দুর সাথে আমারও যেন পুজো হয়। আমার জাত-জ্ঞাত পেজা সজ্জন ছাড়া বাবার গাজনে ভক্ত যেন কেউ না হয়। হরি-হর দুজনেই বললেন—তথাস্তু। সেই জন্যেই তো গোসাঁইয়ের হাত পা নাই, কেবল আছে ধড় অর্থাৎ শরীরটা আর মুণ্ডু। অর্থাৎ সেই কারণে বাণগোসাঁই আজ কালারুদ্দুর ভক্ত দেবতা। আগে বাণগোসাঁইয়ের পুজো হবে, তবে বাবা পুজো নেবেন। এই কালারুদ্দু বাবার দয়াই তাদের সম্বল। সেই ভরসাতেই কালারুদ্দুর পুজোয় তারা নির্ভয়ে দেবকাজে এগুতে পারে, নইলে তাদের পুণ্য কতটুকু?

সেই বাবা কালারুদ্দু লারায়ণের আশীর্বাদ আর কাহারদের জেবন-মরণের মালিক বাবা কত্তাঠাকুরের স্নেহ তাকে পেতেই হবে। এইবার বনওয়ারী বাবার প্রধান ভক্ত হয়ে চড়কের পাটায় চাপবেই। বনওয়ারী ঠিক করলে, যা হয় হবে। সে চাপবেই চড়কের পাটায়। পাপ যা আছে, সে খণ্ডিয়ে যাবে এই 'বের্‌তোর' অর্থাৎ ব্রতের পুণ্যে। কর্তাঠাকুরের দয়ায় বাবা কালারুদ্দুর পেসাদে গাজনের পাটায় শোওয়া সহ্য হলে নিন্দুকের মুখ বন্ধ হবে। যদি সহ্য না হয়, সে যদি পাপের তাপে ওই চড়কের পাটার উপরেই ফেটে ম'রে যায়, তাতেও তার 'দুক্ক' কি? 'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি?' সে আবার দশের মধ্যে গণ্য নয়, সে এ পাড়ার পেথম এবং প্রধান, সে মাতব্বর।

কিন্তু পানার শাস্তির প্রয়োজন। শাস্তি অবশ্য দিলেই হ'ল। যে কোন ছুতোয় একদিন ঘাড় ধ'রে অঙ্গখানি ছেঁচে দিতে বনওয়ারী এখনি পারে। ঘাড়ে ধরলেই টিকটিকির মত পরাণকেষ্টর পরাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যাবেন। তবে তা সে করবে না। সত্যকার অন্যায় খুঁজে বার করতে হবে। সত্যিই কেষ্ট পেয়ে চলল সে পাকু মণ্ডলের কাছে!

কীর্তিটি জটিল;—'ছিমান প্রাণকেষ্টোর একটি জটপাকানো কীত্তি।'

পানুর মুনিব পাকু মণ্ডল অতি বিচক্ষণ হিসাবী লোক। তার হিসাবের পাক অত্যন্ত জটিল—খুলতে গেলেও জট পাকায়, সেই জন্যই তার আসল নামের পরিবর্তে পাকু নাম দিয়েছে লোকে। রতনের মনিবের স্থূল চেহারার জন্য নাম হয়েছে 'হেদো মণ্ডল'। এ নামগুলি দেয় কিন্তু কাহারেরাই। এ বিষয়ে তাদের একটা প্রাক্‌পৌরাণিক মৌলিকত্ব আছে। বস্তু বা মানুষের আকৃতি বা প্রকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে নিজেদের ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী বেশ সুসমঞ্জস নামকরণ করে। যাক সে কথা! পাকু মণ্ডলের কৃষাণ প্রাণকৃষ্ণ। সাত বছর ধরে কৃষাণি করছে। প্রতি বৎসরই কৃষাণেরা বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের কাছে খোরাকির ধান ঋণ নিয়ে থাকে। বৎসরান্তে পৌষ মাসে ধান তুলে মাড়াই ক'রে হিসাব-নিকাশ হয়। শতকরা পঞ্চাশ হারে সুদ অর্থাৎ এক মণ ধান ঋণ নিয়ে দেড় মণ দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে শোধ না হ'লে সুদ ও আসল দেড় মণই পর-বৎসর আসলে দাঁড়ায় এবং তার সুদ আসে তিরিশ সের এই চিরকালের নিয়ম। এ ছাড়াও অবশ্য আপদে বিপদে মনিবের কাছে সারের দাদন নিয়ে থাকে। কেউ কেউ মনিবদের বেচে দেয় সে সার! মনিবকে বলে—চন্ননপুরের বাবুরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছে। সেটা ধার দাঁড়ায়। তার সুদ চলে টাকায় দু পয়সা। যাই হোক, এবার পাকু মণ্ডল তিন বৎসর হিসাবনিকাশ ক'রে পানুর কাছে নিজের পাওনা ধার্য ক'রে শোধের জন্য চেপে ধরেছিল। পানু তাই এ কীর্তি করেছে। নয়ান কাশীর রোগী—হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই মারা পড়বে। বউ পাখী পালিয়েছে। নয়ান নয়ন মুদলে কে তার হয়ে দাবি-দাওয়া করবে? ওই বাঁশঝাড়টা তাই চক্ষু বুজে বেচে দিয়েছে। নয়ানের আবার বিয়ে-সাঙার চেষ্টা করেছে বটে বনওয়ারী, কিন্তু হবে ব'লে মনে হয় না। ওদের বেচাকেনার দলিল-দস্তাবেজ নাই, পাড়ার দু-চারজনকে ডেকে মুখে বলাকওয়া হয়—'আমি বেচলাম। এই পঞ্চজন সাক্ষী রইল।' পাকু মণ্ডল কিন্তু হুঁশিয়ার লোক; তিনি ডেমিতে লিখিয়ে পানুর আঙুলের টিপছাপ নিয়েছেন। চৌহদ্দী ক'রে নিয়েছেন; নিজের পাড়ার পঞ্চজন সাক্ষীরও সই নিয়েছেন। তিনি পানাকে মুখে মুখে বলেছেন—তুমি বেটা সহজ পাত্তর নও হে! বেটার চেহারা যেমন লিকলিকে চারত্তিরও তেম, এঁকাবেঁকা। পাকু মণ্ডলের কাছে চৌহদ্দী সমেত সব বুঝে নিলে বনওয়ারী। কিন্তু মণ্ডলের কাছে বনওয়ারী ব্যাপারটা ফাঁস ক'রে দিলে না। তার মত মাতব্বরের সে কাজ নয়। পাড়ার লোককে বাঁচাতে হবে আগে। পানুকে জব্দ করবার অস্ত্রটি সে নিজের হাতে রাখবে শুধু। পানুকে বধ করবার অস্ত্র তার চাই।

এই সব কারণেই পাকু মণ্ডলের কাছে সত্য কথা না ব'লে বললে—হ্যাঁ, একটা বাঁশঝাড় আছে ওখানে পানার। তা আপনাকে দেখে বলব পরে। একটুকু গোলমাল যেন অইচে আগছেন।

পাকু মণ্ডল শুনে হাসলে গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে। চতুর লোক। বনওয়ারীর মনে হ'ল পানার দোষ তো বটেই। কিন্তু মণ্ডল মহাশয়ও জেনেই করেছেন ব্যাপারটা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মণ্ডল মহাশয়রা এমন অনেক কাজই তাদের দিয়ে করান। তাদের বলেন না।

পাকু মণ্ডল কথাটা বলে নাই বনওয়ারীকে। দলিলে টিপছাপ দেবার সময় পানুর গলা

শুকিয়ে গিয়েছিল, সে তখন সত্য কথা স্বীকার করেছিল। বলেও ছিল—না, ওটা থাকুক মুনিব মশায়। পাকু মণ্ডল শোনেন নাই, শুধু দশ টাকা দামের পাঁচ টাকা কমিয়ে ওই দলিলেই পানুর টিপছাপ নিয়ে বলেছেন—দখলের ভার আমার। তোকে ভাবতে হবে না। আমি প্রকাশও করব না। তু নিশ্চিন্ত থাক্‌। কিন্তু পানাকে আবারও তাঁর জব্দ করবার প্রয়োজন হয়েছে, তাই বনওয়ারীর কাছে প্রকাশ ক'রে দিলেন।

পথে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল বনওয়ারী। আটপৌরেপাড়ায় কিসের জটলা? জটলা কি— ? বুকটা কেমন ক'রে উঠল তার। পানা আটপৌরেদের নিয়ে সেই ব্যাপারটা উপলক্ষ্য ক'রে তুলতামাল ক'রে তুলেছে নাকি?

পরমের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—এই। এই। এই।

হা-হা ক'রে কে হেসে উঠল? এমন দরাজ জোরালো হাসি কে হাসে? তার বুকের হাপরটা তো কম জোরালো নয়। কে? এইবার তার কথার আওয়াজ পেলে বনওয়ারী—এই—এই—এই।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠছে—ঠক-ঠক-ঠক। দুটো কঠিন বস্তুতে ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না বনওয়ারীর, আটপৌরেপাড়ায় খেলা চলছে। পরম সাকরেদদের নিয়ে আখড়া বসিয়েছে। কিন্তু এমন জোরালো সাকরেদ—জবর মরদ কে আটপৌরেপাড়ায়? পরমেব সঙ্গে লাঠি ধ'রে এমন করে হাসে।

পরম হাসছে হা-হা ক'রে।

হঠাৎ একটা ঢেলা এসে তার গায়ে পড়ল। চমকে উঠল বনওয়ারী। কে? বুকখানা আবার চমকে উঠল তার। এ ঢেলা কথা বলে—সে কথা বুঝেছে বনওয়ারী। হ্যাঁ, ঠিক। ওই যে কালোশশী বাঁশবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে ডাকছে তাকে। আঃ, এ কি বিপদ। ছাড়ালে ছাড়ে না? হে বাবা-ঠাকুর, তুমি রক্ষা কর। সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কালোশশীকে জানালে—না। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—লাঠি-খেলার আখড়া।

কালোশশী হেসে উঠল। অদ্ভুত মেয়ে। সাক্ষাৎ ডাকিনী। কামরূপের ডাকিনীব মত যেমন সাহস তেমনি মোহিনী। বনওয়ারী গেল না ব'লে কালোশশীই বেরিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চোখ দুটি টলটল করছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। সম্ভবত কালোশশী মদ খেয়েছে। এখন তাকে কোন বিশ্বাস নাই। অগত্যা সে ইঙ্গিতে আসতে নিষেধ ক'রে নিজেই এগিয়ে গেল।—কি বলছ?

কালোশশী তার হাত ধ'রে বললে—দেখা নাই যে।

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুগান শোন নাই?

—শুনেছি।—কালোশশী পিচ কাটলে। বললে—ওকে তা হ'লে ভয় কর? অর্থাৎ পরমকে?

—ভয়?—হাসলে বনওয়ারী—ভয় একজনাকে করি। বাবাঠাকুরকে। এবার আমি বাবাঠাকুরের আদেশ পেয়েছি ভাই, কালারুদ্দু বাবার চড়কে চাপতে হবে।

শিউরে উঠে কালোশশী তার হাত ছেড়ে দিলে।—না ভাই, তবে তোমাকে ছোঁব না। কপালে হাত ঠেকিয়ে সে প্রণাম জানালে দেবতাকে।

জয় বাবাঠাকুর, জয় কালারুদ্দ ! তোমার দয়ায় পাপীর পাপ খণ্ডায়, যমদূতের হাত থেকে পাপীর পরাণপুরুষকে ছিনিয়ে শিবদূতেরা কৈলাসে নিয়ে যায়। কানায় চোখ পায়, খোঁড়ায় হাঁটে, মানুষের মতি পালটায়। কালোশশীর মতি ফিরেছে।

কালোশশী হেসে বললে—পুণ্যির ভাগ দিতে হবে কিন্তুক।

তারপর আবার বললে—গাজন হয়ে যাক, তা'পরে মাতব কিন্তু একদিন। সে তর্জনী তুলে যেন শাসিয়ে দাবী করলে তার পাওনা। হ্যাঁ, পাওনা বইকি !

বনওয়ারী মনে মনে প্রণাম করলে দেবতাকে। কালোশশী বললে—চুপ ক'রে রইলে যে ? সে বোধ হয় বুঝেছে বনওয়ারীর মনের কথা। ওর ভুরু কুঁচকে উঠেছে। বনওয়ারী এবার হেসে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যেই বললে—হাসছি পরমার কাণ্ড দেখে। বুড়ো বয়সে লাঠি নিয়ে মাতন দেখে হাসছি। কিন্তু এমন মরদ আটপৌরেপাড়ায় কে হে, পরমের লাঠি ধ'রে 'হা-হা ক'রে হাসে ?

কালোশশী বললে—তোমার পাড়ার করালী।

চমকে উঠল বনওয়ারী।—করালী ?

—হ্যাঁ, করালী। কদিন ধ'রেই পরামশ্য চলছে আটপৌরেদের, করালীকে হাত করবে। জংশনে সেদিন না'কি দাঙ্গা লেগেছিল দু দলের খালাসীতে, করালী তাতে খুব জোর লাঠি ধরেছিল।

—করালী ! বিস্মিত হ'ল বনওয়ারী। সে তো শোনে নাই কথাটা।

—হ্যাঁ। তাই ওকে হাত করবে। তা ছাড়া ওকে পেলে অ্যাল-লাইনে ডাকাতি করবার খুব সুবিধে হবে ; তাই ডাকছে ওকে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বনওয়ারী বললে—তাই মতলব হচ্ছে নাকি ? পরমের পাখা গজালছে তা হ'লে ?

—পাখা যার ওঠে হে, তার আর ঘোচে না। পালক উঠে যায় আবার গজায়।—হাসলে কালোশশী।

বনওয়ারী ঘুরে বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দূরের আখড়ার দিকে তাকা.   খটখট শব্দ এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু করালী শেষ পর্যন্ত— ? হে ভগবান !

—চললাম। লোক। মৃদুস্বরের দুটি কথার সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারী ফিরে তাকিয়ে দেখলে, কালোশশী আত্মগোপন ক'রে চলে যাচ্ছে নিবিড়তর বনের মধ্যে। বনওয়ারী ডেকে বললে—একটা কথা। করালী কি দলে মিশেছে ? জান ?

একবার দাঁড়াল কালোশশী। একটু ভেবে বললে—তা জানি না। এখনও মনে লাগছে দলে মেশে নাই। তবে চারে ভিড়েছে। তা'পরেতে টোপে ধরলে ঘাই মারবে। মনের মতলব আমি বুঝি তো !

কালোবউ চ'লে গেল। বনওয়ারী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সাপের হাঁচি বেদে'তে চেনে। পরমকে কালোবউ ঠিক চেনে। হে ভগবান, আবার কাহার-পাড়ায় দারোগা আসবে, হাঁকবে—এই করালী কাহার ! জমাদার হাঁকবে—করালীয়া ! আরে সারোয়া !

নয়

না না না। সে হতে দিতে পারবে না বনওয়ারী। সে যতকাল বেঁচে আছে, তার মাতব্বরির আমলে কাহারপাড়ার কারও 'রঙ্গে' অর্থাৎ অঙ্গে ওই দাগ লাগতে সে দেবে না। যত ঘেন্নার দাগ, তত দুঃখের কষ্টের দাগ। চোরকে সাধে বলে দাগী। ভাবলেও শিউরে ওঠে বনওয়ারী। একা বনওয়ারী নয়। এ পাড়ার প্রবীণেরা সকলেই শিউরে উঠবে।

কাহারপাড়ার উপকথায় ওই দাগের কথা মনে হ'লেই শিউরে ওঠে বনওয়ারী। স্মরণ হয় বর্ষার উপকথায় কালো অমাবস্যের 'আন্তিকাল', ঝমঝমিয়ে আকাশ ভেঙে মাটিতে নামছে, কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁকে বাঁকে জল ছুটছে, তাতে 'অঙ' ধরেছে লালচে ; কাহারদের চোখে তার ছটা জাগত সেকালে। দূর মাঠ থেকে একটি শেয়াল ডাকত। সুটসাট ক'রে বেরিয়ে পড়ত কাহারেরা। মাথায় ফেটা বেঁধে মুখে চুন-কালি মেখে, হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

হে বাবাঠাকুর তুমি 'অক্ষে' কর।

বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতন গুপী—এরা সকলেই ছেলেবেলায় সে সব কিছু কিছু দেখেছে। সুচাঁদ চোখে দেখেছে, সে আজও সেই গল্প করে, চোখ বড় হয়ে ওঠে, ভারী গলায় বলে—"কোপাইয়ের সে 'মনন্তরার' বানে ডুবে দেশ 'শোশান' হয়ে গেল। কুঠি উঠে গেল। সায়েব মশাইরা গেলেন। কাহারপাড়া অনাথা হ'ল। মুনিব গেল, না বাপ গেল। পেটের তরে ভাবতে হ'ত না ; সকালবেলাতেই ষোলজনা কাহার কুঠির কাছারিতে গিয়ে হাজির হ'লেই খালাস। পালাপালি ক'রে ষোলজনা ক'রে যেত কাহারেরা। কাহারপাড়ায় তখন দু কুড়ি আড়াই কুড়ি মুনিষ। মোষের কাঁধের মত ইয়া-ইয়া কাঁধ। কুঠি উঠে গেল, বানে ঘরবাড়ি ভেঙে গেল, মড়ক লাগল. তখন যে 'যেমনে' পেলে—এ-গাঁ সে-গাঁ পালাল। কেউ গেরামে মরল, কেউ ভিন গেরামে মল, কেউ পথে মরল, প'চে ফুলে ঢোল হয়ে গ'লে গেল—গতি পর্যন্ত হ'ল না।" তা'পর আবার সব গেরামে ফিরল। ফিরল তো দেখলে, পথের ফকির। চৌধুরীরা চাকরাণ জমি কেড়ে নিলে। দয়া ক'রে দিলে শুধু ভিটেটুকুন। কাহারেরা সকালে উঠে চৌধুরী বাড়ির মা-দুগগাকে আর ওই কত্তাকে 'পেনাম' করত। 'তেনারা' স্বপন না দিলে ওটুকুও দিত না চৌধুরী মাশায়। তখন হ'ল 'প্যাটের'। চৌধুরী মাশায় বললে, চাষে বাসে খাটতে, কৃষেণ মান্দেরী করতে। তা সদগোপ মাশায়রা কেউ রাখবে না কাহারদিগে। কাহারেরা সায়েব মাশায়দের আমলে সদগোপ মাশায়দের জমিতে জোর ক'রে 'লীল' অর্থাৎ নীল বুনেছে, ধান কেটে নিয়েছে, ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কাহারেরা চাষেরই বা জানে কি? সত্যিই কাহারেরা 'চাষকর্ম' ভাল ক'রে জানত না। তবু চৌধুরী মাশায়ের কথায় ছেলেছোকরাকে 'বাগাল মান্দের' অর্থাৎ রাখাল মাহিন্দার রাখলে। বড় বড় জোয়ানেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। তখন আটপৌরেপাড়ায় হ'ল চোরের দল। 'এতে' 'দুপুরের শ্যাল' ডাকলে সুটসাট ক'রে বেরিয়ে ই-গাঁ সিঁ-গা থেকে চুরি-চামারি ক'রে আনত। ক্রমে পেটের দায়েও বটে, মতিভ্রমের কারণেও বটে—কাহারেরা ধরলে ওই পথ।

রাত্রের অন্ধকারে কালো কাহারদের দেখতে হ'ত আরো কালো, গলার 'রজ' হ'ত জন্তু-জানোয়ারের মত, চোখ দুটো জ্বলত আঙরার মত। তারা চুপি চুপি গিয়ে গেরস্থ-বাড়িতে সিঁদ দিত, দরজার কুলুপ ভাঙত ; সোনাদানা চালধান বাসনকোসন কাপড়চোপড় যা পেত নিয়ে আসত। সকালে উঠে বুক ধড়ফড় করত, ওপারে যমরাজার ধর্মের খাতায় নাম লেখা যেত। এপারে পুলিস এসে ঘর খানাতল্লাস করত। মেয়েদের পর্যন্ত কাপড় ঝাড়া নিত! পুরুষদের মা-বোন তুলে গাল দিত, থানার হাজতে পুরে চালাত কিল চড় লাথি।

আজও আটপৌরেপাড়ায় সেই বৃত্তান্ত চলছে। তবু ওদের হায়া নাই। বেহায়ার দল ওই আটপৌরেরা! অনেক কষ্টে কাহারেরা নিষ্কৃতি পেয়েছে। সুচাঁদ বলে—

এক পুরুষ গেল, দু পুরুষে সবাই দাগী হ'ল। কাহারেরা তখন চাষেবাসে মন দিলে ; চুরি-চামারিও করত কিন্তুক আগের মতন লয়। তবু দাগীর বিপদ যাবে কোথায়? চুরি হ'লে কাহারপাড়ায় পুলিস আসত, ধ'রে বেঁধে নিয়ে যেত—দোষেও নিয়ে যেত, বিনি-দোষেও নিয়ে যেত। মধ্যে মধ্যে বদমাইসী মকদ্দমায় গুষ্টিসমেত নিয়ে টানাটানি। এই তখন আমার দাদা—ওই বনওয়ারীর বাপ—গেরামের মধ্যে পবীন সৎলোক ঘোষবাড়ির আশ্চয় পেয়েছে—ঘোষ মাশায়রা অনেক তদ্বির ক'রে থানার খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দিলেন। দাদাই তখন বললে—পিতিজ্ঞে কর সব, চুরি কেউ করবে না। নয়ানের বাবা—ছোকরা বয়স, চৌধুরী মাশয়দের বাড়ির লোক সে, সে তো গেরাহ্যিই করলে না। চৌধুরী মহাশয়দের দয়াতে ঘরভাঙারা পুলিশের হাত থেকে অক্ষে পেলে। তখন গেরামের দুটো দল হয়ে গেল। একদল দাদার কথা শুনলে। একদল হেসেই উড়িয়ে দিলে। তা'পরেতে নয়ানের বাবা কাঁচা বয়সে মরলে পর দাদা হ'ল মাতব্বর। দাদা অ্যানেক কষ্টে কাহারপাড়ার চোর নাম ঘুচালে। তাও দু-একজনা মানত না, শুনত না ; এই গুপের দাদা কেলো 'ছেরোটা' কাল চুরি ক'রে এল। গাঁয়ে দল নাই তো ডোমেদের সাথে চুরি করত। বনওয়ারী কত মারধোর করত, কালাচাঁদ তাও শুনত না। পুলিসে ধ'রে নিয়ে যেত। হাসতে হাসতে যেত, বলত—শরীল সেরে আসিগা দিনকতক। তা জ্যাল থেকে ফিরত এই 'ভাকুম-কুমো' অর্থাৎ মোটাসোটা হয়ে। শেষ কথাটি ব'লে হাসে সুচাঁদ।

মধ্যে মধ্যে আফসোসও করে সুচাঁদ। আঁচলের খুঁটে চোখ মোছে আর বলে—আঃ, কি সব কাল ছিল, আর কি হল! সে সব ছিল মরদ। এই বুকের ছাতি এই সাহস—মেয়েকে সোনার গয়না পরিয়েছে, আতে এই ঝকঝকে কাপড় পরিয়েছে। হোক কেনে আতের আঁধারে, পরিয়েছে তো। এখনকার মরদ, না শ্যাল কুকুর।

বলুক, সুচাঁদ যা বলে বলুক। আড়ালে আবডালে কাহারদের যারা মতিভ্রষ্ট তারা যা বসে বলুক। বনওয়ারী আর সে পাপ পাড়ায় ঢুকবে না। আজ করালীকে নিয়ে সে ভয় দেখা দিয়েছে। করালী ছোকরাটির গায়ে 'তাগদ' আছে, ছাতিতে সাহস আছে, মাথাও খেলে বেশ। ভয় যে সেইখানে। কাঁচা বয়সের দশজনা মদ-মাতালি করতে গিয়ে শেষে একটা কুকর্ম না ক'রে বসে! 'ধর্মপথে অধিক রাতে ভাত।' যে ধর্মপথে থাকে তার যদি উপবাসেই দিন যায় তবে ধর্ম নিজে অর্ধেক রাত্রে তাকে অন্ন যুগিয়ে দেন। বনওয়ারী করালীকে বলবে, সৎ পরামর্শ দেবে।

বাড়িতে ফিরেই মেজাজ তার আরও বিষিয়ে উঠল। হি-হি-হি-হি ক'রে পাখী হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছে। এ কি হাসি? এত হাসি কি মেয়েছেলের ভাল? বনওয়ারীকে দেখেও পাখীর হাসি কম হ'ল না। অন্য কেউ হলে কাপড়ের আঁচল দিয়ে অন্তত মুখটা ঢাকত। পুরুষমানুষকে কি দাঁত দেখিয়ে হাসে মেয়েছেলেতে? পুরুষ ব'লে পুরুষ নয়—বনওয়ারীর মত পুরুষ, সম্মানের মানুষ। পাখী ব'লেই পেরেছে এটা। করালীবাবুর 'অঙ' ক'রে বিয়ে করা বউ যে। করালীর দেমাকে পাখীর দেমাক বেড়েছে। কাহারপাড়ার কন্যেরা বউয়েরা ক্ষেপলে অবশ্য বানভাসা কোপাই; কিন্তু সহজে তারা নীলবাঁধের জল, শান্ত স্থির।

গম্ভীর ভাবে বনওয়ারী বললে—কি? বেপার কি? এত গোঁ-গোল-করা হাসিটা কিসের?

গোপালীবালা ঘোমটাকে কপাল পর্যন্ত তুলে দিয়ে অল্প হেসে বললে—পাখী যা 'ভিকনেস' করতে পারে।

'ভিকনেস' অর্থাৎ ব্যঙ্গভরে মানুষকে নকল করা; পাখী ভিকনেস করছিল রেল-কোম্পানীর সাহেবের মেমের। সরু গলা ক'রে ইংরিজী বাক্য নাকি সে অবিকল তুলে নিয়েছে—গুড-মুনিং-বুভ-টিংটং; অনুস্বার লাগিয়ে অনর্গল ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে সে। ইস্টিশান-মাস্টারের ভুঁড়ি দুলিয়ে চলা নকল করে দেখিয়েছে। এবং গোপালীবালার চেয়ে নিজেই হেসেছে বেশি। কঠিন বাক্য উচ্চারণ করতে গেল বনওয়ারী, হঠাৎ তার নজরে পড়ল—তার দাওয়ার উপর চারখানা নতুন গাঁইতি, টকটকে লাল রঙ মাখানো, যেন 'ত্যাল'-সিঁদুর দিয়েছে যন্ত্রটায়। এ গাঁইতি রেল-কোম্পানির এবং আনকোরা নতুন। এত গাঁইতি করালী এনেছে জংশন থেকে. এবং পাখী যখন এমন অসময়ে এসে হাসছে তখন পাখীই নিয়ে এসেছে করালীর বাড়ি থেকে তার বাড়ি। রূঢ় শাসনবাক্য বনওয়ারীর গলায় এসে আটকে রইল। সে নীরবে এসে দাওয়ায় উঠে গাঁইতিগুলি নেড়ে দেখলে। খাসা জিনিস। সাহেব কোম্পানির যন্ত্র। সায়েবরা তো যে সে নন, সাদা রঙ, কটা চোখ, ওঁরা না পারেন কি? কল চলে গড়গড়িয়ে লাইনের উপর। আকাশ ফেঁড়ে ভরভরিয়ে চলে উড়োজাহাজ। যুদ্ধ লেগেছে। অনেক উড়োজাহাজ এ দেশ পর্যন্ত এসেছে। বনওয়ারী তিনখানা উড়োজাহাজ দেখেছে।

পাখী বললে—কার কাছে শুনেছে, তোমার গাঁইতি চাই। তা আমাকে বললে, যা, এখুনি দিয়ে আয়। তাই নিয়ে এলাম।

বনওয়ারীর মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এল আশীর্বাদ।—বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। আঃ, কি 'রোপকার' যে হল। সে একখানা গাঁইতি তুলে নেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে। তারপর বললে—তা করালী দেখালে অ্যানেক রকম। বাহাদুর বটে।

—আজ্যের জিনিস মামা—আজ্যের জিনিস। আখবার ঠাঁই নাই—ওই ডাঁই ক'রে এখেছে। বারণ করলে শোনে না।

—পরমকে গাঁইতি দিয়েছে নাকি?

—কাকে? পরম মামাকে? না। ওকে আমি দু চক্ষে দেখতে নারি। দেখ কেনে, এসে অবেলায় ধ'রে নিয়ে গেল—লাঠি খেলবি। নাচতে নাচতে ধেই ধেই ক'রে চ'লে গেল। বলে—চল। আমি থাকতে কাহারপাড়ার মান যেতে দোব না আটপৌরেদের কাছে।

বনওয়ারী খুশি হ'ল একটু, এ কথা যে বলেছে করালী—একটা কথার মত কথা বলেছে বটে! কিন্তু ছেলেমানুষ, ঘোরফেরটা বুঝতে পারে নাই। ওরে বাবা, খাবার দিয়ে ফাঁদ পাতাই হ'ল সংসারের নিয়ম। সাবধান করতে হবে করালীকে। বললে—তা বেশ। তা আজ যেয়েছে বেশ করেছে—আর যেতে দিস না। হাজার হ'লেও পরম দাগী। ওর সাথে লাঠি খেলা ভাল লয় বাছা। বুঝলি?

চোখ বড় ক'রে পাখী বললে—তা তো ভাবি নাই মামা। ঠিক বলেছ তো তুমি। যাব, আমি আখুনি যাব।

—না। আসবে, আখুনি আসবে খানিক বাদে, তখন বারণ করিস। আর—একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললে—সনজেতে পাঠিয়ে দিস মজলিসে। সমঝিয়ে দোব আমি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল জংশনে দাঙ্গার কথা। বনওয়ারী ঘুরে বেশ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বললে—করালী নাকি জংশনে দাঙ্গা-টাঙ্গা কি করেছে পাখী?

- ও বাবা। তা জান না? হিঁদু খালাসীরা এক দিক, মোছলমানেরা এক দিক। একজন মোছলমান খালাসী হিঁদু কামিনের হাত ধ'রে টেনেছিল। তাই নিয়ে ঝগড়া। তা'পরেতে লাঠালাঠি। বানের এগুতে হাদি—চ'লে গেল এক লাঠি নিয়ে। খুব ঠুঁকে দিয়ে আইছে।

বিস্মিত নয়, স্তম্ভিত হয়ে গেল বনওয়ারী। কাহারেরা মুসলমানদের চেয়ে কম শক্তিমান নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত মুসলমানদের সম্মানই ক'রে এসেছে ওরা। মুসলমানেরা কাহার-মেয়েদের দু-চার জনকে নিয়েও গিয়েছে, কিন্তু তাদের কলহ কেউ করতে সাহস করে নাই। ওরা 'শ্যাখ', 'পাঠান'। ছোকরাটা যদি বনওয়ারীর 'পুত্তু' হ'ত। একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী।

সন্ধ্যাবেলার মজলিসে করালী এল।

বনওয়ারী তাকে বুঝিয়ে বললে। ছেলেছোকরারা সকলেই হাজির ছিল আজ, করালী যখন এসেছে তখন তারা থাকবে কোথায়? সকলে চুপচাপ ব'সে শুনলে বনওয়ারীর কথা।

হাঁসুলী বাঁকের সাধারণ মন্থর জীবনের ঠাণ্ডা মজলিস। মদ সকলেই খেয়েছে কিন্তু সে পরিমিত পরিমাণে। সারা দিনের খাটুনির পর যেটুকু খেলে রাত্রে সুনিদ্রা হবে, সকালে গা-গতরে ব্যথা থাকবে না—সেইটুকু। মজলিস বসে নীল বাঁধের ঘাটের উপরে যে ষষ্ঠীতলার বটগাছটি আছে তারই তলায়। সাধারণের জায়গা এটি। সেই প্রথম আমল থেকে এখানে মজলিস ব'সে আসছে। নীলকুঠি ভাঙতে থাকে, তখন নীলকুঠির ভাঙা গাথনির চাঙড় কতকগুলি এনেছিল কাহারেরা, সেইগুলি সুদীর্ঘকাল ধ'রে আসনের কাজ ক'রে আসছে। প্রবীণেরা সেই সব চাঙড়ের উপর বসে। গাছের তলায় ঠিক মাঝখানটিতে যে চাঙড়টি সেইটিতে বসে মাতব্বর। বনওয়ারী সেই চাঙড়টির উপর ব'সে হাত নেড়ে বেশ বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বলে—বাপধন, করালীচরণ, বুয়েছ কি না তোমাকে বলছি আমি।

—আমাকে? করালী বিস্মিত হ'ল। সে তো আজকাল বনওয়ারীকে মান্য ক'রেই চলেছে। তার সঙ্গে একটা সদ্ভাব স্থাপন করতে অন্তরে অন্তরে ব্যগ্র হয়েই উঠেছে। বনওয়ারী তাকে

স্বীকার করেছে, তাকে খানিকটা খাতির করেছে—এটা সে বুঝতে পারে। পানাই হোক, পেল্লাদই হোক, আর রতনই হোক, সকলের চেয়ে তার খাতির বেশি—এটা বনওয়ারীর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। সেও বনওয়ারীকে মনে মনে খানিকটা যেন বাপখুড়োর মত ভালবেসেছে। সেই কারণেই সে সেদিন ওই তেরপলটি ঘাড়ে ব'য়ে নিজে থেকে দিয়ে এসেছে গুড়ের শালে। আজ খবর পাবামাত্র সে চারখানা গাঁইতি পাখীর ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত করার পরেও তাকেই বলবে কথা। সে ভুরু কুঁচকে বললে—বল। সে সামনে চেপে বসল। মনে মনে সংকল্প করলে—বনওয়ারী অন্যায় কথা বললেই কড়া জবাব দিয়ে দেবে।

বনওয়ারী ও-বেলার মনে-করা কথাগুলি বললে। বললে—বাবাধন, ধরমের পথে থাকলে বাবাঠাকুর আদেক এতে—মানে ধরগা যেয়ে—দোপর-তিনপোর এতে নিজে ভাত এনে ছামনে ধ'রে আমাকে বলবেন—লে বেটা, ধরমের পথে থেকে আজ ভাত জোটে নাই, লে, খা।

কথাগুলি ভাল। গোটা কাহারপাড়ার প্রবীণদেরই আধ্যাত্মিক মনোভাব গদগদ হয়ে উঠল: কেউ বললে—হরি বল মন, হরি বল। কেউ বললে—শিবো হে! কেউ বললে—এ সংসারে মরণই সত্যি। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে তারা দেবতাকে। করালীর কিন্তু হাসি পেল। কথাগুলির বিপরীত কোন সত্যে সে বিশ্বাসী ব'লে নয়, ওই কথা বলার ভঙ্গি দেখে তার হাসি পায়। চন্ননপুরে মিটিং শুনেছে সে। কি ক'রে যে বাবুরা বক্তৃতা করে। ওঃ, সে শুনে চনচন ক'রে ওঠে 'শরীল'। তবু হাসি গোপন করলে, শুধু একটু হাসিমুখেই বললে—তা বলছ ভালই, কথাও ভাল।

বনওয়ারী প্রবীণদের দিকে চেয়ে বললে—কি হে মাতব্বরেরা, ল্যায় বললাম, কি অল্যায় বললাম? বল কেনে হে? ছোকরাদের এমন আলাদা আড্ডা ভাল নয়।

রতনের ছেলে মাথলা করালীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, রতনের কথা শোনে না, কিন্তু রতন তার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ছাড়তে পারে না, রতন সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—এর আর কথা আছে বনওয়ারী? আর তুমি কি অল্যায্য বলবার লোক?

তামাক খাচ্ছিল প্রহ্লাদ, সে অনেকটা নিরাসক্তভাবেই বললে—লাও, খাও। হুঁকোটি বনওয়ারীর হাতে দিয়ে সে মূল প্রশ্নের উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কথা তুমি ঠিক বলেছ। বলুক কেনে ছোকরারা কি বলছে।

—কি হে সব, তোমরা কি বলছ? ও সব ছাড়। একত্ত হয়ে আড্ডা কর। না, কি?

অপর সকল প্রবীণও ওই প্রহ্লাদের দলে। এতখানি উৎকণ্ঠার প্রয়োজন তারা বুঝতেই পারছে না। ছোকরাদের দল যদি আলাদা আসর ক'রে গান-বাজনা ক'রে 'অঙচঙে'র কথাই কয়, একটু-আধটু মদই খায়—তাতে এত সব কথা কেন? তিলকে তাল ক'রে তুলেছে বনওয়ারী। তবুও তারা বললে—কথা তো ভালই। অল্যায্য আর কে বলবে?

বনওয়ারী এইবার উঠে বললে—তুমি তা হ'লে শোন দিকিনি করালী। গোপনে একটি বাক্যি বলব তোমাকে।

—গোপনে? বেশ, চল। শুনি।

একটু স'রে এসে বনওয়ারী বললে—আটপৌরেপাড়ার পরমের আখড়ায় লাঠি খেলতে

যাওয়া তো ভাল কথা লয় বাবা।

—কেনে ?

—সে দাগী ডাকাত বাবা। সাধুজনের সঙ্গে সাধু থাকে, চোরের সঙ্গে চোর, ছেনালের সঙ্গে ছেনাল। কাহারপাড়ার সঙ্গে ওই কারণে আটপৌরেদের মিল হ'ল না। বুয়েচ ?

করালী বললে—পরম যি ঠাট্টা করলে। তাতেই তো যেলাম—বলি কাহারপাড়ার মরদ দেখ একবার।

বনওয়ারী বললে—ওই বাবা, ওই অকম ক'রেই বুড়ো ডাকাত ছেলেছোকরাকে দলে টানে। বুয়েচ ? পেথম পেথম লাঠি খেলা, হাসি-ঠাট্টা, মদ-মাংস খাওয়া, তা'পরেতে কানে মন্তর। একবার সঙ্গে যেয়েছ তো আর ছাড়ান নাই। ধম্মের পাক সাতটা, পাপের পাক সাতান্নটা। বুয়েচ ? আর খোলা যায় না, ছেঁড়া যায় না। দলে যাব না বললেই তখন ধরিয়ে দেবে।

করালী বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইল। সত্যই সে এ কথাটা ভাবে নাই। তবে কথা বনওয়ারীমামা ঠিক্যাক বলেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে অকুণ্ঠিতভাবে ব'লেও ফেললে—ই সব কথা আমি ভাবি নাই মামা।

—অ্যাই। ভাব নাই তো। এস, আর যেয়ো না। ছেঁয়া মাড়িয়ো না। করালীর হাত ধ'রেই সে মজলিসে ফিরে এল।

মজলিসে তখন নসুবালা হাত-পা নেড়ে, অঙ্গ দুলিয়ে সে এক কাণ্ড 'সেজ্জন' অর্থাৎ সৃজন ক'রে তুলেছে। ব্যাপারটার মূল হ'ল নিমতেলে প্যাকাটি প্রাণকৃষ্ণ। বনওয়ারী করালীকে নিয়ে উঠে যেতেই অভ্যাসমত সে বনওয়ারীর ভূমিকায় মাতব্বরি শুরু ক'রে দিয়েছিল। বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে ভঙ্গিতে বলেছিল—বনওয়ারীকাকা যা বলেছে তার চেয়ে ভাল কথা আর হয় না। ছেলেছোকরার এ সব মতিগতি ভাল লয়। ধর যেয়ে, কেউ ছাড়ছে কুলকর্ম, অক্তের ত্যাজে ধরাকে সরাখানটা দেখছে। না কি গো ?

প্রতিটি কথা তার করালীর দিকে নিক্ষিপ্ত গুপ্তবাণ। বুঝতে বাকি কারও রইল না।

নসুবালা ব'সে ছিল পুরুষদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। সে এবার উঠে এসে পানুর মুখের সামনে হাত নেড়ে শরীর দুলিয়ে ব'লে উঠেছিল—আ ম'রে যাই, গুড় দি। তোমার গাল চেটে খাই। 'কিরে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো' আমার। উনি বলছেন—আমরা ছেলেছোকরা। বলি তোর মতিগতি তো ভাল। বলি হা রে মুখপোড়া চিমড়ে শকুনি, কি করেছি আমরা ? বল শুনি ? মাতব্বরের দোসর আমার। বাঘের পেছুতে ফেউ—সানাইয়ের পোঁ।

করালী এসেই নসুর হাত ধ'রে টেনে সরিয়ে এনে বললে—চুপ কর্ তু। ব'স। তারপর সে এগিয়ে এসে ওই মজলিসের মধ্যে সর্বসমক্ষে বনওয়ারীর পায়ে হাত দিয়ে বলল—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, এমন কাজ কখনও করব না।

বনওয়ারী এতটা কল্পনাও করে নাই, এবং এর পরের কি উত্তর তাও সে ভেবে পেলে না। করালীর উপর স্নেহে সে আর্দ্র হয়ে উঠল।

পাঁচজনে তারিফ ক'রে উঠল করালীর—বা-বা-বা।

—হ্যাঁ রে বাবা। পথ চলবি, আপথ কুপথ খাল বিল বাঁচিয়ে চলিস।

পানু কিন্তু উঠে দাঁড়াল, বললে—পা ছুঁয়ে তো বললে। কিন্তু চোলাই মদের কথাটা? সেটা অন্যায় নয়?

এবার করালী ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে তার গালে। দুর্বল চেহারার লোক সে, করালীর হাতের চড় খেয়ে সে 'বাপ' ব'লে বসে পড়ল। করালী বললে—দেখাতে পার তুমি শালো? পেমাণ করতে পার?

বনওয়ারী খুশি হ'ল। খুব খুশি হ'ল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হেঁকে উঠল—করালী, অন্যায় করলে তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। ব'স তুমি।

—তা বসছি আমি। হোক, এর বিচার হোক। তুমি আমার ঘর পেতে দিয়েছ, তোমাকে আমি মানি। একশো বার হাজার বার আমি মানি। ধাম্মিক লোক তুমি, মাতব্বর তুমি, তোমার কথা শুনতে পারি। তা ব'লে ওই নিকলিকে সড়িঙ্গের কথা শুনব আমি।

—ব'স ব'স।

সকলেই বসল। কেবল প্রাণকেষ্ট বসল না। সে গটগট ক'রে মজলিস থেকে বেরিয়ে গেল। বনওয়ারী করালীকে শাসন করলেও সে বেশ অনুভব করতে পারছে—করালীর প্রতি তার স্নেহাধিক্যের পরিমাণ। শুধু তাই নয়, সে বেশ বুঝতে পারছে বনওয়ারী এইবার তাকে নিয়ে পড়বে। কয়েকবারই সে লক্ষ্য করেছে তার প্রতি বনওয়ারীর বক্র ক্রূর দৃষ্টি। বুঝতে ঠিক পারছে না, কিন্তু—তার উপর তার অভিমানও হ'ল। সে বেরিয়ে চ'লে গেল।

—চ'লে যেছিস যে পানা?—জিজ্ঞাসা করলে মাথলা।

উত্তর দিলে না পানা।

—কি রে, আ কাড়িস না যে?

পানা এবার বললে—ছুঁচোর সাকরেদ চামচিকের কথার জবাব পানকেষ্ট দেয় না।

করালীর লাফিয়ে ওঠার কথা, উঠতও সে লাফিয়ে এবং কাণ্ডও একটা ঘ'টে যেত; কিন্তু তার আগেই বনওয়ারী ডাকলে পানকেষ্ট। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে।

প্রাণকৃষ্ণের গলার সাড়া পাওয়া গেল তার নিজের উঠানের নিমতলা থেকে। চীৎকার ক'রে সে বললে—সাধু নোক, আটপৌরেপাড়ার বটতলাতে সনজেবেলা সাধন-ভজন করেন। মনে করলাম—থাক, বলব না, মানী নোক—। কিন্তু সে কথা সে শেষ করতে পারলে না। আতঙ্কে সে চমকে উঠল, বনওয়ারী এসে তার হাতখানা সজোরে চেপে ধরেছে।

পানু শুয়ে পড়ল মাটিতে। যাব না আমি। জাত-জ্ঞাত কেউ আপনার লয় আমার। লরমকে ধরম দেখায়। আমি মানি না কারুকে।

বনওয়ারী তার ঘাড়ে ধ'রে খাড়া ক'রে তুলে দিলে। তারপর ধাক্কা দিয়ে নিয়ে এল মজলিসে। পানু আর উপুড় হয়ে পড়বার অবকাশ পেলে না। পানুকে ঠেলে মজলিসের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বললে—লয়ানের বাঁশঝাড় নিজের ব'লে পাকু মোড়লকে বেঁচে দিয়েছিস কেনে?

পানুর চীৎকার ঝংকার এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

—বল্ ! মজলিসে বল্ !

এবার পানু ফ্যালফ্যাল ক'রে বনওয়ারীর দিকে চেয়ে বললে—ক্যা বললে ? অর্থাৎ কে বললে ?

—তোর মুনিব খোদ পাকু মোড়ল আমাকে বলেছে। চৌহদ্দী পড়ে শুনিয়েছে—অতনের দরুন কেনা, হেদো মণ্ডলের বাঁশঝাড়ের পূব্ব, বনওয়ারীর মানে—আমার বাঁশঝাড়ের দক্ষিণ, কোপাইয়ের বাঁধের উত্তর, গুপীর দরুণ কেনা ঘোষ মাশায়দের বাঁশঝাড় আর শিরীষগাছের পচ্চিম। এর মধ্যে আমি—নিমতেলে পানকেষ্ট কাহার নিজহাতে লাগানো বড় বাঁশঝাড় একটি—বাঁশ সাড়ে আট গণ্ডা—আট টাকায় বিক্রয় করিলাম।

পানু উঠে ব'সে বললে—হ্যাঁ, তা বিক্রয় করেছি আমি। সে তো আমার নিজের বাঁশঝাড়। আমি নিজের হাতে লাগালছি।

- হ্যাঁ হ্যাঁ—লাগালছ। 'না' বলি নাই আমি। আমার বাঁশঝাড়ের পূবে—নয়ানের বাবার লাগানো বাঁশঝাড়, তার পূবে ঘোষ মাশায়দের বাঁশঝাড়ের মধ্যিখানে খালি জায়গায় তুমি লাগালছ একঝাড় বাঁশ ও-বছর আগে, তাতে দুগণ্ডা বাঁশও জমে নাই এখনও। নয়নের ঝাড়ের সাথে লাগালাগি হয়েছে, এই সুবিধেতে তুমি গোটা সাড়ে আট গণ্ডা বাঁশসমেত বাঁশঝাড় মুনিবকে বেচে দিয়ে এসেছ। বল, কেনে বিক্কি করেছ পরের ধন নিজের ব'লে ?

মজলিসে কলরব উঠে গেল।

—অন্যায়, মহা অন্যায়, হে ভগবান। সমস্বরে সকলে চীৎকার ক'রে উঠল।

নসুবালা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠল—হেই মা রে। ব'লে কিছুক্ষণ স্থির বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তার পর ঘাড় নেড়ে বললে—ঘোর কলি মা। আমের ধন শ্যামে বিক্রয় করছে।

পানু কাতরভাবে বললে—আমি কি কবব ? মুনিবই আমাকে নিকে দিতে বললে।

বললে ? করালী ব'লে উঠল—চন্ননপুরের বাবুদের পাকা বাড়িটা নিকে দিতে বললে দিবি ?

বনওয়ারী বললে—করালী, চুপ কর তুমি।

পানু কাঁদতে লাগল। বনওয়ারী করালীকে চুপ করতে বলতেই সে কেঁদে ফেললে।

বনওয়ারী বললে—ফোঁপাস না, বুল্লি, ফোঁপাস না। ওতে কেউ ভুলবে না।

পানু বললে—আমার বেবরণটা পঞ্চজনে দয়া ক'রে শোনেন—না কি আমি বানের জলে ভেসে আইচি ? অপরাধ তো হয়েছে আমার, সাজা নিতে তো আমি পস্তুত।

বনওয়ারী নিজের পাথরটায় ব'সে বললে—বল্, কি বলছিস ?

পানুর বিবরণ অন্য কিছু নয় নিজের অন্যায়ের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন যুক্তিতর্ক নয়, নিতান্তই নিজের মন্দভাগ্য এবং মনিবের কঠিন আচরণের করুণরসসিক্ত ইতিবৃত্ত। এইটুকু পানুর কাপুরুষ এবং কুটিল মনের উপস্থিতবুদ্ধি। পানু বললে—মুনিবে যে মেরে ফেলাইছে তার পিতিবিধেন কর পাঁচজনায়। 'ধরে মারে সয় ভাল।' আমাকে মুনিব ধ'রে নিকে লিলে—আমি কি করব ? মাশায়, তিন বছর হিসেব করলে না, ই বছর হিসেব ক'রে বললে—পঁচিশ টাকা পাওনা তোর কাছে। দে, ফ্যাল্। তা বললাম—বছর বছর হিসেব

করলেন না—না ক'রে একবারে এমনি মোটা পাওনা কি ক'রে দোব আমি? তা বললে—তা, আমি কি জানি? তু শালোদের ওজগারই কি কম? তুমি শালোর মাঠ থেকে ধান সরাচ্ছ। ঘর থেকে এনে শোধ দাও। কি করব মাশায়, বললাম—আপনকার জমির পাশে সরকারী গোপথ ভেঙে যে জমিটুকুন বেড়েছে, সেইটুকুন তো আপনকারই হয়েছে—তারই দরুন বলেছিলেন দশ টাকা দেবেন, সেই ল্যান আর বাঁশঝাড় একটা আছে ল্যান, লিয়ে আমাকে রেহাই দ্যান। তা সে কী গালাগাল করলে।—ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগলে পানু।

পানু চতুর, নিঃসংশয়ে বুদ্ধিমান। মুহূর্তে ঘুরে গেল মজলিসের মনোভাবের মোড়। পানু যে কথাটা বলেছে, সেটার সঙ্গে সকলেরই অন্তরের কথার অল্পবিস্তর মিল আছে। বনওয়ারীর মত মাতব্বর, সচ্ছল ব্যক্তির পর্যন্ত মিল আছে। সদগোপ মহাশয়দের সঙ্গে নিয়মিত হিসাব হয না। ঘোষবাড়িতে বনওয়ারীও এবার হিসাব করিয়ে উঠতে পারে নাই। দু'বছর তিন বছর পর হিসাব হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষাণদের ঋণ দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য মনিব অন্যায় হিসেব কবেন না। সে অন্যায় কথা বলা চলে না, বললে পাপ হবে। ঋণ দাঁড়াবারই কথা, সম্বৎসরের ছ'মাস—বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের কাছে ধার করে খাওয়া হয়, বাকি ছ'মাস তাও একরকম মনিবের কাছ থেকেই নেওয়া। মনিবেব পাওনা শোধ না ক'রে ফসলের কৃষাণী পাওনা তিন ভাগেব এক ভাগ থেকে কিছু কিছু নিয়েই চলে ; এটাব সুদ লাগে না—সেও মালিক দয়া ক'রেই নেন না বলতে হবে। তারপর গম, ছোলা, গুড়, আলু, সরষে, তিসি—এ সবের ভাগ মনিব কাটেন না। সুতরাং ঋণ যে শোধ হয় না, তাতে কোন সংশয় নাই। তবে বছর বছর হিসেব করলে এগুলো শোধ করা সহজ হয়। দু' বছব তিন বছর অন্তর মনিব হিসেব নিয়ে বসলে ভয়ে বুক শুকিযে যায়। ভরসার মধ্যে মা কোপাইয়ের চরে অনেক পতিত আর বাঁশবাঁদিতে বাঁশের 'মুড়ো'র অর্থাৎ শিকড়সুদ্ধ বাঁশের অভাব নাই, প্রতি বৎসর কাহারেরা দুটো চারটে বাঁশঝাড় লাগায়, দু-চারটে বট-প'কুড়ের চারা বা ডাল পোঁতে। সেই বাঁশঝাড় আর গাছগুলি মনিবেরা নিযে রেহাই দেন। প্রতিজনেই মনিবের জমির পাশে যেখানে যতটুকু সরকারী পতিত জমি থাক—সে পতিত ডাঙাই হোক বা জলাই হোক বা জলনিকাশী নালাই হোক কিংবা গোপথ হোক—সেইটুকুকে কেটেকুটে বা ভরাট ক'রে আলবন্ধন দিয়ে মনিবের জমির সঙ্গে চাষ করে। সেগুলি নিয়েও রেহাই দেন মনিবেরা।

পানুর কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে সকলে চুপ ক'রেই রইল। কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললে। বনওয়ারীও ফেললে দীর্ঘনিশ্বাস। বনওয়ারীও এমনি খানিকটা নালা ভেঙে জমি করেছে। ঘোষেরাও বছর কয়েক হিসেব করেন নাই তার সঙ্গে।

শুধু করালী ব'সে পা নাচাতে লাগল। সে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত মানুষ, চন্দনপুরে খাটে, নগদানগদ মাইনে ; সে ব'লেও ফেললে—মারো ঝাড়ু চাষের মুখে।

বনওয়ারী বললে—আই করালী।

করালী বললে—তবে পিতিবিধেন কর। পানা যা বলেছে, তা তো মিথ্যে লয়।

—বল ভাই করালী, বল।

কাউকে কিছু বলতে হল না। ওদিকে তখন মেয়েরা কথা বলতে শুরু করেছে। মজলিসের ঢেউ ঘরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। একেবারে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ফুটে উঠেছে ঝগড়াটার মধ্যে।

পরস্পরের শত্রু নয়ানের মা এবং করালীর নসুদিদি একত্রিত হয়ে প্রাণকেষ্টর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। নয়ানের মা অগ্নি-বর্ষণ করছে।

পানুর বউ দুলে দুলে নসুকে গাল দিয়ে চলেছে—ওলো বেটা্খেকী লো, ওলো ভাতারখাকী লো, নিব্বংশের বেটী লো—তোর মুখে আগুন দি লো—। ভুলেই গিয়েছে যে নসুবালা কারও কন্যা নয়, সে পুরুষ, তার স্বামীও নাই, পুত্রও নাই।

নসুবালা আবার নেচে নেচে গালাগাল দিচ্ছে—নোকের জোড়া বেটাকে আমি এমনি ক'রে নেচে নেচে খালে পুঁতব। নোকের ভাতার মরবে—ওগ নাই, বালাই নাই, ধরফড়িয়ে মরবে, আমি ধেই ধেই ক'রে নাচব।

বনওয়ারী বিরক্ত হয়ে প্রহ্লাদ এবং রতনকে বললে—যা তো রে বাপু একজনা, মেয়েগুলোকে গলায় ধ'রে আপন আপন ঘরে দিয়ে আয়।

মেয়েদের ঝগড়া অসহ্য হ'লে কাহারদের ঝগড়া বন্ধ করার এই ব্যবস্থা। এতেও না মানলে তখন প্রহার।

পানু গোটা মজলিসের মন আরও বেশি ক'রে পাবার জন্য বললে—ঘাকতক গুমাগুম দিয়ো, বুল্লে প্রেহ্লাদকাকা, আদি বলছি—আমার ওই পরিবারটাকেও দিয়ো ঘাকতক।

সঙ্গে সঙ্গে করালী উঠে গেল, নসুবালাকে সে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে দেবে।

মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হ'ল। সকলে মজলিসে ফিরে এসে আবার বসল। বনওয়ারী স্থির দৃষ্টিতে পানার দিকে তাকিয়ে আছে। পানা দৃষ্টি তুলছে আর নামাচ্ছে। একবারও সে দেখলে না যে বনওয়ারীর দৃষ্টি তার দিক থেকে ফিরেছে। সে চতুর বুঝছে সব। মধ্যে মধ্যে কান ম'লে বলছে—এই—এই, আর যদি করি—। তারপরই ফেলছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল। বনওয়ারীর ঠোঁটের কোণে মধ্যে মধ্যে হাসিও খেলে যাচ্ছে।

—মাতব্বর! হাত জোড় ক'রে আবেদন করলে পানা।

—আর করবি এমন কাজ? বনওয়ারী জানে পানু বুঝতে পারছে কাজের সত্যকার অর্থ।

—কান মলেছি দশবার। আবার মলছি।

—আচ্ছা যা। ব্যবস্থা করছি আমি। ধরব গিয়ে মণ্ডলকে। বলব, ভুল হয়ে যেয়েছে—আর তা আপুনি জেনেশুনেই পানাকে দিয়ে করিয়েছেন। না হয়, লয়ানকে দিয়ে আমার মুনিবের নামে লিখিয়ে দোব লয়ানের ঝাড়। লেগে যাবে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

প্রহ্লাদ বললে—এটা আচ্ছা হবে, বুল্লে কিনা ব্যানো ভাই, আচ্ছা! পাকু মণ্ডলের পাক টান মেরে ছিঁড়ে দেবে ঘোষ। হুঁ হুঁ বাবা, ঘোষ হল ভাগলপুরের ষাঁড়।

খুব হেসে উঠল সকলে।

—কিষুক হিসাবের কথা? জিজ্ঞাসা করলে রতন। সে হেদো মণ্ডলের কাছে এমনি একটা বকেয়া হিসাবের বন্ধনে পড়েছে। হেদো শুধু কথা ব'লে ক্ষান্ত হন না, গদাগদ কিল মারেন।

—হবে, হিসেবও হবে। চল, সবাই মিলে যাই একদিন।

—কালই চল সকলে। রতন বললে।

—কাল হবে না ভাই। কাল গাজনের উতুরী পরবার দিন।

—সি তো যে গাজনের পাটায় চাপবে।

—এবার আমি চাপব। বনওয়ারী বললে।

—তুমি?

—হ্যাঁ।

—না, না। কাজ নাই বনওয়ারী। কিসে খ্যানত হয়। কাজ নাই।

—উঁ-হু। বাবাঠাকুর পেত্যাদেশ করেছেন, রূপায় নাই।

—বাবাঠাকুর। মজলিস স্তব্ধ হয়ে শিউরে উঠল।

বনওয়ারী বললে—কাল এতে অ্যাই ভোরবেলাতে, ঠিক স্বপনটিও ভাঙল, কাককোকিলও কলকল ক'রে উঠল।

ভোরের স্বপ্ন একেবারে প্রত্যক্ষ অব্যর্থ। সকলে হাতজোড় ক'রে প্রণাম করলে দেবতাকে।

—তা ছাড়া—বনওয়ারী বললে—বাবাঠাকুরের রজগরটি আমাদেরই ভুলচুকে পুড়ে মরেছে তো। পাপটা খালন করতে হবে, চড়কে চাপার মানত তখুনি করেছিলাম আমি। হঠাৎ হেসে বললে—বয়েসও তো হ'ল। না হয় ফেটেই মরব।

ভোরবেলায় বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গিয়ে নামল। গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা। কালই সে কাটোয়ায় যাবে গঙ্গাস্নান করতে, গঙ্গাস্নান ক'রে কালরুদ্রের মাথায় ঢালবার জন্যে ভার ব'য়ে নিয়ে আসবে গঙ্গাজল। যাবার সময়টা ট্রেনেই যাবে। আসবার সময় কাঁধে ভার নিয়ে দুলতে দুলতে দশ ক্রোশ রাস্তা চ'লে আসবে মনের আনন্দে 'শিবো হে, শিবো হে' হাঁকতে হাঁকতে। কোশকেঁধে বনওয়ারীর কাছে দশ কোশ কতটুকু।

কালারুদ্দুতলায় ঢাক বাজছে, আজ থেকে সকাল-সন্ধ্যে ধুমুল শুরু হ'ল।

ড্যাডাং ড্যাডাং—ড্যাং—ড্যারা ড্যাং—ড্যাডাং

এ-র্—রর্—রর্—ড্যাডাং।

লোহার কাঁটা-ভরা চড়কের পাটার উপর শুয়ে বনওয়ারী ঘুরবে। আকাশের দিকে চেয়ে ডাকবে—শিবো হে, শিবো হে, শিবো হে!

তাতে মরতে হয় মরবে, খেদ নাই।

গোটা কাহারপাড়ায় আজ সে দেবতা হয়ে উঠেছে। সকলে তার পথে গোবরজল ছিটিয়ে পবিত্র ক'রে দিচ্ছে।

পাখী এসে বললে—গঙ্গাজল চাই তো? শুধিয়ে গিয়েছে।

—কে? করালী?

পাখী হাসলে।

—আমি নিজেই যাব কাটোয়া। যাবার সময় ট্যানে যাব। আসবার সময় হাঁটব।

—ট্যানে কিন্তুক টিকিট কেটো না। সে ঠিক ক'রে দেবে।

তৃতীয় পর্ব

এক

ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডাং : ড্রাররর—ড্যাডা-ড্যাং। ড্রারর্—ড্যাডাং—ড্রারর ড্যাডাং।

বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুক্কো-ডাঁটির মাথায় চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ-মৌ করে বাবা কালারুদ্দুর থান ; 'পাটাগনে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায় 'উত্তুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, পরনে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'ত্রিপুণ্ডক', রুক্ষ চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই-ধেই ক'রে নাচে। হাড়ি-ডোম-বাউড়ী-কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে। এবার শিরভক্ত বনওয়ারী। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই গোটা কাহারপাড়াটাই গাজনে 'উত্তুরী' পরেছে। শিবো হে, শিবো হে। জয় শিবো—কালারুদ্দু—। বম বম বম। বম বম বম্। ঢাকে বাজে—ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডা-ড্যাং-ড্যাং।

গজাল-পেটা চড়কপাটার উপর শুয়ে আছে শিরভক্ত বনওয়ারী। ষোলজন ভক্তের কাঁধের 'সাঙ' অর্থাৎ বাঁশের ডাণ্ডার উপর চড়ক চলেছে—ঘুরছে বন-বন্-বন্-বন—বন্-বন।

চৈত্র-সংক্রান্তি শেষ হয়ে গেল। বছরের শেষ রাতটি 'পেভাত' অর্থাৎ প্রভাত হ'ল, গোটা রাতটি নাচলে কালারুদ্দের ভক্তরা। শিবো হে, কালারুদ্দু হে, বম্ বম্ বম্—বম্-ববম বম-ববম বম। চড়কের পাটা পাক দিয়ে 'চক্কর' অর্থাৎ চক্রের মত ঘুরল বন-বন ক'রে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-বনে আদ্যিকালের অন্ধকার 'চ'কে চ'কে' অর্থাৎ চমকে চমকে উঠল। কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীরা কলকল ক'রে উঠল। সাপেরা গর্তের মধ্যে পাক ঘুরে ফণা তুললে। জন্তু-জানোয়ার গা-ঝাড়া দিলে। তারাও জানলে—বছর শেষ হ'ল। তারাও প্রণাম জানালো—শিবো হে, কালারুদ্দু হে।

বছরের প্রথম দিন, গাজন শেষ হ'ল। শিব চললেন জল-শয়নে কালীদহের তলায় ; গোটা বছরটি থাকবেন সেথায়, আবার উঠবেন বছরের শেষে গাজনে, এক মাস আগে আগামী চৈত্রের শুভদিন অর্থাৎ পয়লা। বলবেন—সূর্য হে চন্দ্র হে, আমি উঠলাম—বছর শেষ কর। শিব জলশয়নে যাচ্ছেন ;—সেই মিছিল চলেছে—জঙ্গলের কালারুদ্দুতলা থেকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়া হয়ে হাঁসুলী বাঁকের কালীদহে। প্রথম চলেছে ঢাক, কাঁসি, শিঙে, বাদ্যভাণ্ড ; তারপর চলেছে সঙ। সঙ হ'ল—বাবার ভূতপ্রেত দানা-দৈত্যের দল। মানুষেই

সেজেছে, নন্দী ভৃঙ্গী 'তিজট' 'দন্তবক্ক'—আরও কত ভূত তার নাম কে জানে ! যারা সেজেছে তারাও জানে না। এবার সঙে কাহারপাড়ার লোক বেশি। হবে না কেন, এবার বনওয়ারী কাহারপাড়ার মাতব্বর যে শিরভক্ত। সঙের দলের পিছনে চলেছে ভক্তের দল। সারিবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে চলেছে—মাথার উপরে তালে তালে নাচাচ্ছে বেতের দণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে পায়ের সারি। তাদের পিছনে চড়কপাটা। ঘুরছে বন-বন। চড়কপাটায় গজালের কাঁটার উপর শুয়ে আছে বনওয়ারী আকাশের দিকে মুখ ক'রে। তার পিছনে বাণগোসাঁই, তার পিছনে 'বাবার দোলা' অর্থাৎ চতুর্দল—আসলে একটি ডুলি। ডুলির আশেপাশে ধূপ গুগগুল জ্বলছে। আর খবরদারি ক'রে চলেছেন জাঙলের সদগোপ মহাশয়েরা। চৌধুরী-বুড়োকে পর্যন্ত আজ বের হ'তে হয়েছে। হেদো মণ্ডল, পাকু মণ্ডল, নাকু পাল, এমন কি মাইতো ঘোষও চলেছেন।

না চ'লে উপায় আছে। সকল দেবতার আদি দেবতা—কালারুদ্দু। দিন বল, রাত বল, মাস বল, বছর বল, আদি বল, অন্ত বল—সব কিছুর মালিক হ'লেন উনি। শিবো হে। শিবো হে। চড়কের পাটার উপর শুয়ে বনওয়ারী মনে করে কথাগুলো, আব প্রণাম জানায় বাবাকে। প্রাণ নাও বাবা, মান রাখ ; আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু কাহারদের মঙ্গল কর—শিবো হে, আসছে জন্মে উচ্চকুলে জন্ম দিয়ো। বাবাঠাকুর তোমারই শিষ্য বাবা, তাঁরও পুজো দিয়েছি, তোমার চড়কের পাটায় লোহার কণ্টকে শুয়ে তোমার চরণে মিনতি করি বাবা, তুমি তাকে প্রসন্ন হতে বল, তোমার শিষ্যকে বল—তাঁর বাহন-'হত্যে'র অর্থাৎ সেই অজগরটিকে পুড়িয়ে মারার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন, যেন হাঁসুলী বাঁকের অমঙ্গল না হয়। ক্ষেত ভ'রে ধান দাও, ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা কর, কোপাই বেটীকে ক্ষ্যাপা বানে ভাসতে বারণ কর।

কাহারপাড়ায় আজ মহাধুম।

বনওয়ারী এবার শিরভক্ত, চড়কের পাটায় চেপেছে—এবার কালীদহে যাবার পথে ডুলি, চড়কের পাটা নামবে কাহারপাড়ায়। এই দুবার নামছে। একবার নেমেছিল অনেককাল আগে, তখন নীলকুঠির আমল—কাহারপাড়ার মাতব্বর তখন গণ্ডার কাহার। এই দশাশয়ী 'পেরকাণ্ড' চেহেরা ছিল ব'লে নীলকুঠির দেওয়ান জাঙলের চৌধুরী নাম দিয়েছিলেন– গণ্ডার কাহার। গণ্ডার কাহারের বংশ নাই। গণ্ডার সেবার চেপেছিল চড়কের পাটায়। মদ খেয়ে পাটায় চড়েছিল ব'লে বংশটাই শেষ ক'রে দিয়েছেন বাবাঠাকুর। সেই সেবার কালারুদ্দুর ডুলি নেমেছিল কাহারপাড়ায়। সেও নাকি খুব ধুম হয়েছিল। সাহেবান মহাশয়রা 'বশকিশ' করেছিলেন অনেক। এবারও খুব ধুম। এবার দ্বিতীয়বার বাবার ডুলি নামবে কাহারপাড়ায়।

ডুলি নামবে ওই মজলিস যেখানে বসে, সেইখানে। গোবরজল দিয়ে জায়গাটি পরিপাটি ক'রে নিকানো হয়েছে, বেদী বাঁধা হয়েছে, গোটা কাহারপাড়াই আজ ঝকঝক তকতক করছে। এঁটো কালো হাঁড়ি সরানো হয়েছে, মুরগী হাঁস আজ ঘরে বন্ধ, ছেলেপিলে সাবধান, বউ-বেটী গিন্নী-বান্নি সব কাচা কাপড় প'রে, চান সেরে, চুল এলিয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আসবেন।

হাঁকডাক ক'রে বেড়াচ্ছে করালী।

বনওয়ারী চেপেছে চড়কে। করালী পাড়ায় ঘুরছে চরকির মত। গোটা পাড়াটাকে সে-ই সাজিয়েছে। সাজিয়েছে, আচ্ছা সাজিয়েছে, বাহা-বাহা সাজিয়েছে। এই কথা ছাড়া, প্রশংসা প্রকাশের ভাষা কাহারদের নাই। সকলে একবাক্যে বলছে—আচ্ছা ছোকরা, বাহাদুর ছোকরা। বাঁশবাঁদিতে বাঁশের অভাব নাই, গাছপালার অভাব নাই; করালী তার দলবল নিয়ে বাঁশেপাতায় ফটকই করেছে চারটে। মজলিসের 'থানটি'তে চার কোণে খুঁটি পুঁতে পাতা দিয়ে মুড়ে মাথার উপর টাঙিয়েছে সেই তেরপলখানি; রঙিন কাগজ কিনে এনেছে নিজের পয়সায়, তাই দিয়ে শেকলের মত মালা তৈরি করেছে একরাশ। তাই জড়িয়ে দিয়েছে খুঁটিতে খুঁটিতে লম্বালম্বি কোণাকুণি; লালে নীলে সবুজে সাদায় রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। জাঙলের সদগোপ মাশায়দের খাতির করবার জন্যে সিগারেট কিনে এনেছে চন্নপুর থেকে। ও ছাড়া আর কি দিয়ে খাতির করবে। কাহারদের ছোঁয়া আর তো কিছু খাবেন না—পান পর্যন্ত না। নিজেও সিগারেট টানছে আর ঘুরছে। পাখী ঘুরছে ঘুরঘুর ক'রে, তার পরনে চমৎকার বাহারে ডুরে শাড়ি। বউবিটীরা তার দিকে আর করালীর দিকে তাকাচ্ছে। পাখী বুঝছে সব। হাসছে।

বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালা জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মজলিসের বেদীর সামনে। ধুনুচিতে মধ্যে মধ্যে ধুনো দিচ্ছে। শান্ত ভাল মানুষ, চুপ ক'রে রয়েছে। তার পাশে বসেছে সুচাঁদ। চোখ বড় বড় ক'রে মোটা গলায় গল্প বলছে—বলছে গাজনের গল্প। প্রতিবার গাজনেই বলে, এবারও বলছে। গল্প না ব'লে চুপচাপ ব'সে থাকতে হলে সুচাঁদের মনে হয়, সে যেন কত কাঙাল দুঃখী হয়ে গিয়েছে, লোকে তাকে হেনস্তা করছে। তাই লোকে শুনুক না শুনুক গল্প সে ব'লে যায়। বলে—তোরা শুনে আখ, বুড়ী হ'লে বলবি। গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না। হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না।

পাখী বলে—তবে যে বললে, ছিষ্টি ছিল না তখন। চন্দ না, সূয্যি না, পিথিমী না, মানুষ না, পশু না, পক্ষী না—

—হ্যাঁ লো, হ্যাঁ। ছিলই না তো, কিছুই ছিল না। কিছু—কিছু না, তারপর কিছু না থাকার ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব বুঝাবার জন্য শেষ দীর্ঘ ক'রে টেনে বলে—'কি-ছু-ই না—'। ব'লে দু-হাত নেড়ে দিলে।

—কি-ছু—ই না?

—কি-ছু—ই না? অন্ধ—কা—র, আঁ-ধা-র থমথম করছে। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। শরীরে রোম খাড়া হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর হ'ল গম্ভীর থমথমে, বললে—আঁধারের মধ্যে শুধু কালারুদ্দের চড়ক ঘুরছিল বন্-বন্, বন্-বন্, বন্-বন্। ব'লে সে হাতখানি তুলে ধরলে। ইঙ্গিতে সেই আদিকালকে যেন দেখিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সৃষ্টির আদিকাল পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিলে তার আঙুলের ইঙ্গিতকে।

আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত কতকাল, তার সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ণয়ের শক্তি ওদের নাই, হয়তো প্রয়োজনও নাই; কিন্তু শক্তিহীন মনের বিস্মিত উদাসীনতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অনুমানের আভাস ওদের বুকে জেগে উঠেছে। তাই সম্বল ক'রে বাবা কালারুদ্দুকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে করজোড় ক'রে।

করালী ছুটতে ছুটতে এল। এসে পড়েছে, এসে পড়েছে।

বাবা এসে নামলেন কাহারপাড়ার নীলবাঁধের পাড়ে মাতব্বরদের মজলিসে পবিত্র ক'রে বাঁধানো নতুন মাটির বেদীতে।

সুচাঁদ পাখীকে এবং করালীকে টেনে এনে বললে—পেনাম কর্। পেনাম কর।

বনওয়ারী একটু হাসলে পাটার উপর শুয়েই। পিসী ঠিক আছে। গোদালড়ি ছাঁদনদড়ি যখন যার কাছে থাকে তখন তারই। পিসীর সঙ্গে করালী-পাখীর মিটমাট হয়েছে, এখন আর পিসী ওদের ছাড়া আর কাউকে জানে না।

করালী-পাখীর সঙ্গে সুচাঁদের মিটমাট হয়েছে এই সেদিন, গাজনের প্রথমেই। চড়কপাটার উপর শুয়েই বনওয়ারী কথাগুলি মনে করলে।

সেদিন সুচাঁদের কান্না শুরু হয়েছিল সকালেই। কাঁদছিল বাবার বাহনের জন্য। গাজন আসছে, বাবার বাহনকে মনে প'ড়ে গিয়েছে। বনওয়ারী বিরক্ত হ'লেও কিছু বলতে পারে নাই। উপোস ক'রে শুয়ে ছিল—ভালও লাগে নাই বুড়ীকে নিয়ে বকাবকি করতে : কাঁদুক। দুঃখ এই যে কেঁদে মানুষ ম'রে যায় না।

আদ্যিকালের বুড়ী ও। উপকথার বুড়ীর মত ওর 'কাঁদি-কাঁদি মন করে, কেঁদে না আত্যি মেটে' অর্থাৎ আত্মার তৃপ্তি হয় না। ওরা কারণেও কাঁদে, অকারণেও কাঁদে।

হঠাৎ বাহনের জন্য কান্না বন্ধ ক'রে বুড়ী কাঁদতে লাগল ওর বাপের জন্য। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল—ওরে বাবা, আমাকে সঙ্গে কর রে। তুমি কোথা গেলে রে। আমি কোথা যাব রে। ওরে আমার কি হবে রে। একেবারে মড়াকান্না।

আর সহ্য হ'ল না বনওয়ারীর। সে উঠল। নীলবাঁধের ঘাটে বুড়ী কাঁদছিল, তার মুখের কাছে হাত নেড়ে চীৎকার ক'রে বললে—বলি সকালবেলা থেকে এমন ক'রে কাঁদছ কেনে?

সুচাঁদ চোখ মুছে মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমত তার প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলে—কাঁদছি কেনে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাঁদছ কেনে?

—আমার মন।

—তা বললে হবে না।

—আমি কাঁদতে পাব না?

—না।

—তবে আমি কোথায় যাব?

—যাবার কথা কে বলেছে?

—তবে?

—বিনি কারণে কাঁদতে পাবা না।

—বিনি কারণে কাঁদতে পাব না?

—হ্যাঁ।

—পাব না?

—না না না।

সুচাঁদ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। উঠে কোমরে কাপড় বেঁধে চন্ননপুরের বাবুদের বাড়ির রাসের উৎসবে বারুদের কারখানার বোম ফাটার মত ফেটে পড়ল।

—বিনি কারণে? বিনি কারণে? বিনি কারণে?

চীৎকার করতে করতে সে এসে মজলিসের মাঝখানে পা ছড়িয়ে ব'সে মাটিতে একরাশ ধুলো উড়িয়ে বললে—মাতব্বর। পঞ্চায়েৎ। কই, বিচার করুক পঞ্চায়েৎ। আমি থাকব কার কাছে? আমাকে খেতে দেবে কে?

উপবাসী বনওয়ারী ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। তা ছাড়া কালারুদ্দের শিরভক্ত হয়েছে সে, সন্ন্যাসের সময় সংসারের ধুলো-মাটি ঝগড়া-ঝাঁটি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে তাকে বারণ। তার অভাবে প্রহ্লাদ সকলকে নিয়ে মজলিস করছিল। প্রহ্লাদ সুচাঁদের আস্ফালনে বিস্মিত হ'ল না, কারণ পিসীর ধরনই ওই। পিসী হ'ল 'অরুণ্য' অর্থাৎ অরণ্যের মত, অরণ্যে যেমন ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, অরণ্য যেমন মাতলে ঝড় ওঠে, কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসী তিলকে করে তাল, উইঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগন ফাটিয়ে চেঁচায়, হা-হা ক'রে হেসে ধেই ধেই ক'রে নাচে। প্রহ্লাদ হেসে ফেললে।

সুচাঁদ ক্ষেপে গিয়ে কপাল চাপড়াতে আরম্ভ করলে।—আমাকে খেতে দেবে কে? আমাকে খেতে দেবে কে? হাসছিস? তু হাসছিস?

প্রহ্লাদ এবার গম্ভীর স্বরে বললে—কেনে, তোমার কন্যে রয়েছে।

—খাব না, আমি কন্যের ভাত খাব না।

—তবে নিজেই খেটে খাব'।

—খেটে খাব?

—হ্যাঁ, তুমি তো এখনও খাটতে পার।

—নিশ্চয় পারি। খুব পারি, তোদের পরিবারদের চেয়ে বেশি পারি। বনওয়ারীর ওই মুখে-ময়দা-নেপা পরিবারের চেয়ে বেশি পারি। হেই পারি। হেই পারি।

সে অঙ্গভঙ্গি ক'রে কত খাটতে পারে বুঝিয়ে দিলে, দেখিয়ে দিলে

প্রহ্লাদ হেসে বললে—তাই তো আমরাও বলছি গো।

—তবে? সেদিন বনওয়ারীর কাছে খাটতে গেলাম, তা বনওয়ারী এক দো-এর খাটিয়ে ল'টা পয়সা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিলে। সারা দোপ'র পুকুর-ডোবায় চারিপাশ ঘুরে একটি পাতগুগলি তুলে আনলাম, তা কে আমাকে এঁধে দেয়?

এবার বনওয়ারী বললে—চেঁচিয়ো না, থাম। বনওয়ারী ফিরে এসেছে বাড়ির পথ থেকে।

—অ্যাঁ। বনওয়ারীকে দেখে একটু থমকাল সে।

—থাম। আগে থাম।

—থামব?

—হ্যাঁ, থাম।

—থামব, কই জবাব দে আমার কথার।

বনওয়ারী বললে—তুমি খাটতে গিয়ে হেদো মণ্ডলের সঙ্গে ব'সে তামুক খাবে, গল্প

করবে—

সুচাঁদ তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই যথাসাধ্য সবিনয়ে ব'লে উঠল—আর করব না, আর তামুক খাব না।

বনওয়ারী গম্ভীরভাবে বললে—তা ছাড়া তুমি ওই মণ্ডলকে কি সব বলছিলে?

—কি বললাম? কিছুই না!

—কিছুই না? বল নাই তুমি? মরা কুকুর বিড়েল ফেলা, নন্দমা পরিষ্কারের কথা নিয়ে বল নাই যে, এ ওই বনওয়ারীর মাতব্বরি?

নির্বাক হয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল সুচাঁদ বনওয়ারীর মুখের দিকে।

বনওয়ারী বললে—বল কেনে, বল নাই তুমি হেদো মণ্ডলকে?

শান্ত কণ্ঠে এবার সুচাঁদ বললে—হ্যাঁ, তা বলেছি বাবা। তা এসব তো পিতিপুরুষে করত, তাই বলেছি। আর সিটি তো তোমারই কীত্তি বাবা।

—হ্যাঁ গো। আমারই কীত্তি বটে। তা অল্যায়টা কোনখানে? আমরা মেথর, না মুদ্দফরাস?

সুচাঁদ চুপ করে রইল। কিন্তু মরা কুকুর বিড়াল ফেলা, মরা গরু কাঁধে ব'য়ে ফেলার যে অন্যায়টা কোন্‌খানে, সে তাও বুঝতে পারলে না।

প্রহ্লাদ এবার বললে—জাঙলের সদ্‌গোপ মাশায়রা পিরান গায়ে দিতে শিখলে, বামুনদের মড়া কাঁধে ক'রে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেত, তা ছাড়লে। আমরাই বা এ-সকল কম্ম করব কেনে?

ওসব ছেড়ে দিয়ে সুচাঁদ এবার নিজের কথা বললে—তা আমি যাব কোথা তা বল। বসন আমার প্যাটের বিটী, সে খেতে দেবে না। দুটো পাতগুগলি খেতে সাধ, তা—

এবার বসন্ত এগিয়ে এল নিজের উঠান থেকে। সে শান্ত মানুষ, শান্ত কণ্ঠেই প্রতিবাদ ক'রে বললে—ছা—'টে'। বলি কবে বলেছি তোকে খেতে দোব না? ভাত বেড়ে তোর ছামনে দিয়েছি—তু ফেলে দিয়েছিস।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুচাঁদ বললে—ফেলে দিয়েছি?

—দিয়েছিস কিনা আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌?

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল—বেশ করেছি, খুব করেছি। দোব না? করালীর সঙ্গে পাখীর সাঙা দিলি কেনে? ওর এত বড় বাড়—আমার গায়ে ব্যাঙ দেয়—

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে বললে—তার জন্য করালী তোমার পায়ে ধরবে।

—পায়ে ধরবে?

—হ্যাঁ। ওই করালী? ডাক করালীকে। সে নিশ্চয় এতক্ষণ চন্ননপুর থেকে ফিরেছে।

সুচাঁদ ঘাড় নেড়ে বললে—না। শুধু পায়ে-ধরা লোব কেন আমি? আমার লাতিনকে সাঙা করলে, একখানা ভাল কাপড় দিয়েছে আমাকে? বোতল বোতল পাকী মদ খায়, আমাকে দিয়েছে?

করালী এল, বললে—দোব, আমি দোব।

—দে, এখুনি দে। আমি মদ খেয়ে লতুন কাপড় প'রে লাচব।

এগিয়ে এল পাখী। সুচাঁদের হাত ধ'রে টেনে বললে—আয়, এখুনি আয়। এখুনি।

সুচাঁদ অন্য হাতে নিজের পা দেখিয়ে বললে—ধরুক, করালী আমার পায়ে ধরুক, তবে যাব।

করালী শুধু পায়েই ধরলে না, সুচাঁদকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে বললে—চল্, তোকে কোলে ক'রে নিয়ে যাব। চল্।

ছোকরার দল সব ছুটল করালীর বাড়ির দিকে।

সেই দিন থেকে সুচাঁদ প্রায় পাখীর বাড়িতেই আড্ডা গেড়েছে। ওইখানেই থাকে, পাকী মদ খায়, সিগারেট খায়, নসুবালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচে, শুধু ভাত খাবার সময় বসনের কাছে আসে। ভাত সে করালীর ঘরে খেতে পারে না। এক, পেটের বেটীর ভাত খায়, তারই লজ্জায় বলে—আমার মরণ নাই, প্যাটের হায়া নাই, বেটীর ভাত খাই সেই লজ্জা। আবার নাত-জামাইয়ের ভাত। চড়কের পাটায় শুয়ে সব কথা মনে পড়ল বনওয়ারীর, হাসলে একটু।

কালারুদ্দু কাহারপাড়ায় বসলেন—ধপে-ধুনোয়, প্রদীপের আলোয়, তেলে-সিঁদুরে পূজা নিলেন কাহারপাড়ায়। আবালবৃদ্ধবনিতা মাটির উপর উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ল, প্রণাম জানালে। এল না শুধু নয়ান এবং নয়ানের মা। নয়ান বললে—আমি পেনাম ক'রে কি করব? মরার বাড়া গাল নাই। মরবার লেগে ব'সে আছি। করালীকে পেনাম করতে বল গা। কুৎসিত ভাষায় পৃথিবীকে গাল দিতে শুরু করলে, তারপর হাঁপাতে লাগল।

নয়ানের মা ছেলের বুকে হাত বুলাতে লাগল। কথার জবাবই দিলে না। সন্ধ্যার সময় তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল কালীদহে স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এলোচুলে চিলের মত তীক্ষ্ণস্বরে গাল দিতে দিতে পাড়ায় ফিরল—চড়কের পাটায় পাপ ক'রে চেপে যে তোমার মহিমে নষ্ট করলে, তাকে তুমি ফাটিয়ে মার বাবা। যে ব'বাঠাকুরের বহিনকে পুড়িয়ে মারলে তাকে তুমি ধ্বংস কর বাবা। কোপাইয়ের বানে ভসিয়ে দাও ব'বা পাপ আজন্বি, ঝড়ে উড়িয়ে দাও বাবা। হে ব'বাঠাকুরের মরা বাহন, আকাশে মাথা তুলে ফোঁসফঁসিয়ে হেলেদুলে তুমি রে-রে ক'রে এস বাবা।

গোটা পাড়াটা শুভদিনে সচকিত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

দুই

নয়ানের মা যে অভিসম্পাতই দিক, বনওয়ারী তার উপর রূঢ় হ'তে পারলে না। সে মাতব্বর, তার সে কর্তব্য নয়। বরং নয়ানের প্রতি যে অবিচার সে করেছে তার প্রতিকারের জন্যই সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নয়ানের সাঙা দেবার জন্য কনে খুঁজতে লাগল। তবে অবসর যে কম। কাজ যে অনেক। বৈশাখ মাস, দিন যাচ্ছে জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের ঘর ছাওয়াতে। কাহারেরা পাকা বারুই, বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতন—এ অঞ্চলের ডাকসাইটে বারুই।

ঘর ছাওয়াবার মজুরিও বেশি। এটা একটা রোজগারের মরসুম তাদের। চন্দনপুর পর্যন্ত যেতে হয় তাদের। এখন যে দিন-রাত্রির মধ্যে বিশ্রাম মিলছে না। দিনে ঘর ছাওয়ানো, রাত্রে রয়েছে জমি কাটার কাজ। শুক্লপক্ষ চলছে, এই পক্ষে চাঁদের আলোয় কাহারদের নিয়ে বনওয়ারী জমিটা কাটছে। গাঁইতি চলছে। পাথরেরা জব্দ হয়েছে। ভাগ্য ভাল, পাথরের 'থাক্' অর্থাৎ স্তরটা খুব পুরু নয়, পাথরের নীচে মাটিও ভাল। বনওয়ারীর কাছে কাহারেরা মজুরি নেয় না, নেয় দৈনিক মদের মূল্যটা। রোজই চন্দনপুরের পচাইয়ের দোকান থেকে দু'টি জালা মদ ওরা ঘাড়ে ব'য়ে নিয়ে আসে, খায়, তারপর সন্ধ্যে পার হ'লেই ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বললেই তারা যে যার 'হাতিয়ার' অর্থাৎ কোদাল-টামনা-গাঁইতি-ঝুড়ি নিয়ে দল বেঁধে চলে সায়েবডাঙার দিকে। পথে বাবাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে নেয়। ধুলো মাথায় নিলেই নির্ভয়—বাস, চল এইবার।

মধ্যে মধ্যে ওদের সঙ্গে করালীও এসে মাটি কেটে দেয়। করালী অনেকটা বশ মেনেছে। ক'দিন আগেই তাক বুঝে বনওয়ারী বলেছে—এইবার তোর মঙ্গল হবে করালী। সুমতি ফিরছে তোর।

করালী হেসে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সামনে ঝুলে-পড়া চুলগুলি পিছনে ফেলে বললে—ত' মতিভ্রম তো হয় মানুষের।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাজ ক'রে যায় বনওয়ারী। সবাই নীরব। শুধু শব্দ করে লোহার হাতিয়ার আর মাটি পাথর—ঠং-খং-খস-ঘং ; সঙ্গে সঙ্গে চারি বেড়ে ঝুড়ির মাটি পড়ে—ঝপ—ঝুপ—ঝাপ। বনওয়ারীর জমি দেখতে দেখতে বেড়ে যায়।

পাশে পরমের জমিটা পড়েই আছে। যে ডাঙা, সেই ডাঙা। কোন একটা চুরি ব' ডাকাতি ক'রে পয়সা হাতে না পেলে পরমের জমি কাটানো হবে না।

কিছুক্ষণ পরে বনওয়ারী আবার কথা বললে। আপসোসের সুরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আঃ, তু যদি ওই খ্যানতটি না করতিস করালী।

—কি ? করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কি করলে সে ? ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

—ওই বাবাঠাকুরের বাহনটিকে—। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না এই ভয়টিকে। ভুলতে তাকে দিচ্ছে না নয়ানের মা। নিত্য সে গালাগালি করছে। যখনই শোনে বনওয়ারী তখনই সে চমকে উঠে। মন তার খারাপ হয়ে যায়

করালীর মনে কিন্তু এজন্য কোন শঙ্কা বা সংশয় নাই। রেল-লাইনে সে কাজ করে মাটি কাটতে গিয়ে কত সাপ বেরিয়ে পড়ে। সাপ দেখলেই মারে। তা ছাড়া ওই সাপটা মারবার কিছুদিন আগে ঠিক এমনি একটা চন্দ্রাবোড়াকে তাদের সায়েব গুলি ক'রে মেরেছে তার চোখের সামনে। সাপটা তার কাছে সেই জন্যেই সাপ ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গীসাথীদের কেউ এ কথা বললেই সে বলে—ভাগ। বনওয়ারীর কথার উত্তরে সে এই কথাটা বলতে পারলে না, তবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ওই তোমার এক কথা। সাপ আবার—

—ও কথা ব'লো না বাবা, ও কথা ব'লো না।

করালী চুপ করে গেল। বনওয়ারীর কণ্ঠস্বরে গুরুগম্ভীর সুর গমগম ক'রে উঠেছে

সে কোদাল ছেড়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম করেছে।

কিছুক্ষণ পর বনওয়ারী আবার বললে—চন্ননপুর ছাড় তু করালী। ওখানে গিয়েই তোর এই সব মতিগতি। কিছু জমি কেন্—

—জমি ?

—হ্যাঁ। জমি কেন্, বলদ কেন্, চাষ কর্।

—সে বুড়ো বয়সে করব। হাসতে লাগল করালী। তারপর বললে—ওরে বাপ রে ! এখন রেলের কাজ ছাড়তে পারি ? যুদ্ধু আবার জোর ধরল। রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হবে। বুয়েচ ? মজুরি বেড়ে ডবল হবে। এখন লোক-লোক শব্দ উঠেছে।

যুদ্ধের ব্যাপার। কালারুদ্দের মন, মহিমা। তিনিই লাগান যুদ্ধ। তাঁর চড়কের পাকে ঘটে বড় বড় ব্যাপার। আকাল আসে, মহামারণ আসে। যুদ্ধও এসেছে।

যুদ্ধ; নাকি ঘোর 'যুদ্ধ' লেগেছে। সেই যুদ্ধের জন্যই নাকি এদিকেও অনেক ব্যাপার হবে। লাইন বাড়বে। কোথা নাকি উড়োজাহাজের আড্ডা হবে। গোটা রেল-লাইনই নাকি যুদ্ধু-কোম্পানী নিয়েছে কেড়ে। অনেক নতুন লোক নেবে। অনেক খাটুনি, অনেক মজুরি। দেশ-বিদেশ, রেঙ্গুন, না কোথা বোমা পড়েছে ! 'জাপুনি' না কারা আসছে ! কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে। চন্ননপুরেও নাকি আসছে কলকাতার লোক। চন্ননপুরে হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়েছে।

বাঁশবাঁদির হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়েও উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। পক্ষীগুলা কলরব ক'রে ওঠে, দূর আকাশে বিন্দুর মত উড়ন্ত চিলগুলো জাহাজ দেখে ভয় খেয়ে পাখা গুটিয়ে সনসন্ ক'রে নেমে পড়ে। কাহারপাড়ার মেয়েপুরুষ অবাক হয়ে দেখে। ছেলেগুলো অবোধ, মাঠে মাঠে ছুটতে থাকে উড়োজাহাজের সঙ্গ নিয়ে। আকাশে মেঘ থাকলে উড়ে চলে মধ্যে মধ্যে মেঘের ভিতর ঢাকা পড়ে, আবার মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে ; গোঁ-গোঁ শব্দে যায় কোন্ মুল্লুক থেকে কোন্ মুল্লুকে।

প্রথম যেদিন উড়োজাহাজ উড়ে যায়, সেদিনের কথা বনওয়ারীর আজও মনে আছে। রাত্রিকাল, নয়ানের মা গাল পাড়ছে, বনওয়ারী ব'সে আছে একা। হঠাৎ বাঁশবাঁদির অন্ধকার কাঁপিয়ে আকাশের কোণে সে এক মহাশব্দ।

গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে আকাশের দূর কোণ থেকে। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে এল।

বনওয়ারীর হাত-পা কাঁপতে লাগল।

বাবার বাহন ফণা তুলে আবার কোন নতুন রূপ ধ'রে আসছে নাকি ! সমস্ত কাহারপাড়া অন্ধকার আকাশপানে উদ্‌গ্রীব শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লাল-নীল দু'টো তারা যেন ছুটে আসছে। তার সঙ্গে ওই শব্দ।

করালীর সাকরেদ মাথলা ও নটবর বললে—উড়োজাহাজের শব্দ। উড়োজাহাজ। ওরই 'আড্ডা হবে চন্ননপুরের পাশে কোন্‌খানে।

হে ভগবান ! হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল অলুক্ষণে উড়োজাহাজ !

এখন আর ভয় হয় না। কিন্তু এ যে অলক্ষণ, তাতে সন্দেহ নাই। ধানের দর চড়তে লেগেছে। কাপড়ও চড়ছে। অন্য 'দব্য' অর্থাৎ দ্রব্যের দরও চড়েছে, কিন্তু কাহারদের আছে

শুধু খাওয়া আর পরা—অন্য দ্রব্যের দর চড়লে বেশি কিছু যায়-আসে না।

রাত্রি ন'টার গাড়ি ঝমঝমিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে কোপাইয়ের পুল পার হ'লেই জমি কাটার কাজ শেষ ক'রে কাহারেরা বাড়ি ফেরে।

খেটেখুটে আর মজলিস জমে না। যে যার শুয়ে পড়ে। শুধু করালীর ঘরে আরও কিছুক্ষণ মজলিস চলে। ছোকরার দল, খেটে ওদের ক্লান্তিও হয় না, আর বয়সের কারণে খানিকটা আমোদ না ক'রে ঘুমও আসে না। ওদের মজলিসে আজকাল মাঝখানে বসে হাঁসুলী বাঁকের আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী সুচাঁদ। ওর এক পাশে গা ঘেঁষে বসে নসুবালা, অন্য দিকে পাখী। চারিপাশে বসে ছোকরারা। ছোকরারা মাতব্বরের জমি কেটে না ফেরা পর্যন্ত যত অল্পবয়সী মেয়েরা বসে। পুরুষেরা ফিরলেই ঘরে ফেরে তারা। মধ্যখানে জ্বলে একটা নতুন লণ্ঠন। হাঁসুলী বাঁকে সেকালে জ্বলত পিদীম। তাও নিম এবং রেড়ীর তেলের। নিমফল কুড়িয়ে, রেড়ীর ফল সংগ্রহ ক'রে গড়াঞী-বাড়ি থেকে পেষাই ক'রে আনত। 'কেরাচিনি' অর্থাৎ 'কেরোসিন' উঠে 'লম্প' অর্থাৎ ডিবে হয়েছে। লণ্ঠন আজও কাহারদের কেউ কেনে নাই। বনওয়ারীর বাড়িতে আছে একটা, তাও ঘোষ-বাড়ির দেওয়া পুরনো। পানার ঘরেও একটা আছে, সেটাও পুরনো—সেই মনিব-বাড়ি থেকে চুরি করা। পুরনো রঙ ঢাকতে প্রাণকেষ্ট তাতে আলকাতরা মাখিয়েছে। নয়ানদের বাড়ি সে আমলের চৌধুরীবাড়ির একটা ভাঙা লণ্ঠন প'ড়ে আছে। তলাটা ফুটে গিয়েছে, মাথাটা নাই, কাচটা ভাঙা; সেটার আবার চারিপাশে তারের বেড় দেওয়া আছে। এসব আলোর কোনটাই ওরা বড় একটা জ্বালে না। পালে-পার্বণে দায়ে-দৈবে জ্বালে। একটা লণ্ঠনের তেলে চারটে লম্প জ্বলে। সুতরাং কেন জ্বালবে কাহারেরা? চন্ননপুরের কারখানার চাকরে করালীর কিন্তু লণ্ঠন জ্বালা চাইই—। সুচাঁদের আবার সেটি চাই ঠিক মুখের সামনে। একেবারে উজ্জ্বল ক'রে জ্বলা চাই। তাকিয়ে দেখে আর হাসে। মধ্যে মধ্যে আরও একটু দম বাড়িয়ে দেয়, একটু বাড়াতে গিয়ে বেশি বেড়ে গেলে হাউ-মাউ ক'রে ওঠে—গেল রে—গেল রে—হেই মা রে। ও পাখী—ও নসু—। ওরা কমিয়ে দিলে শান্ত হয়ে বলে—হু—হু, সায়েবী কল।

পাখী বলে—মরণ, লণ্ঠনেই মজেছে বুড়ী।

সুচাঁদ চুলের গোড়া থেকে দু আঙুলে টিপে টেনে বার ক'রে নসুকে বলে—দেখ তো ভাই, ডেঙুর না নিকি?

নসু বলে—ও মাগো, এ যে ডেঙুর। অ্যাই একেবারে বলদের মতন। ব'লে সেটা নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উপর রেখে ডান হাতের নখ দিয়ে টিপে মারে—পট ক'রে শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে নসুও মুখে শব্দ ক'রে—হুঁ। ওই শব্দটি না করলে উকুনের স্বর্গ হয় না।

পাখী বলে—ওই শোনের নুড়িগুলান কেটে ফেলাস। উকুনের রাজ্যি হয়েছে।

—কি বললি? কেটে ফেলাব?

—হ্যাঁ।

—চুলগুলান?

—হ্যাঁ।

—আমার চুল শোনের নুড়ি?

—লয়? আয়না নিয়ে দেখবি?

চীৎকার ক'রে ওঠে বুড়ী—আতে আয়না? না। দেখে কাজ নাই আমার।

—কেনে?

—এই বুড়ো বয়সে কলঙ্ক হবে।

সমস্ত মেয়েরা এবার হেসে ভেঙে পড়ে। নসুবালা গান ধ'রে দেয়—

"লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—
কলঙ্কিনী রাইমানিনী—নাম রটেছে দ্যাশে দ্যাশে।"

হঠাৎ ওই সুরে সুর মিশিয়ে অতি সুন্দর পুরুষালি গলায় কে বাড়ির বেড়ার ধার থেকে গেয়ে উঠল—

"শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে—
ঝাঁপ দিব সই কালীদহে,
কালীনাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যায়ে।"

সকলেই চমকে উঠল। কে লো?

সুচাঁদ এবার হেসে গড়িয়ে গড়ল, বললে—রবশ্যায়ে এল।

নসু লাফ দিয়ে স'রে এসে বললে—উ মুখপোড়া কোথা থেকে এল লো? মড়া মরে নাই তা হ'লে?

পাখী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

এইবার গায়ক এসে বাড়ি ঢুকে লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়াল। অদ্ভুত বেশ। মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল—কিন্তু মহাদেব নয়, গাজনের সঙের নন্দীর বেশ।

পাখী হাততালি দিয়ে উঠল।—পাগলদাদা!

পাগল কাহার-পাগল-পাগল ভাব, কারুর ভালতে নাই, কারুর মন্দতে নাই। ঘর নাই, সংসার নাই, 'স্ত্রী' নাই, 'পুত্র' নাই, বিচিত্র মানুষ পাগল। একটি মাত্র কন্যা, তার বিয়ে দিয়েছে ভিন গাঁয়ে। এখানে যদি দশ দিন থাকে তো পাগল সেখানে থাকে পনেরো দিন, বাকি পাঁচদিন এখানে ওখানে সেখানে। নেহাত অভাব হ'লে কিছুদিনের জন্য কাজকর্মে মন দেয়, নগদ মজুরিতে রোজ খাটে, খায়। খাটুনির অভাব নাই, লোকটার বিদ্যে অনেক। ঘর ছাওয়ার কাজে ওস্তাদ, মাটির দেওয়ালের কাজে পাকা কারিগর, ঘর লেপনের কাজে সুন্দর হাত, বাঁশ কেটে ফেলে দাও, ঝুড়ি তৈরি ক'রে দেবে পাকা ডোম কারিগরের মত, খাঁচা তৈরি করবে। লোকটার সবেই পাকা হাত। সবচেয়ে সেরা বিদ্যে গান, নিজেই গান বেঁধে গায়, গানও অতি চমৎকার। এখানকার ঘেঁটুগান একালে বরাবর পাগল বেঁধে আসছে। বনওয়ারীর পরম বন্ধু। কার নয়? সবারই বন্ধু পাগল গলাগলি ঢলাঢলি নিয়েই থাকে। হবে না কেন? সুচাঁদ পিসী বলে—পাগলের মা অঙ খেলেছিল বোষ্টম আজমিস্ত্রী আখাল আজা দাস বোষ্টমের সঙ্গে। চন্ননপুরে নয়, জাঙলে বাবা কালারুদ্দুর থানটিতে যখন পাকা ইমারতের কাজ হয়, তখন জাঙলের চৌধুরীরা খুঁজে খুঁজে বোষ্টম আজমিস্ত্রীকে এনেছিলেন

কাটোয়া থেকে। পাগলের গায়ে আছে সেই বোষ্টমের অস্ত। এককালে পাগলই আনত চন্ননপুরের সকল খবর। সে তখন নিত্য যেত চন্ননপুর। চন্ননপুরের বামুন-বউ লালঠাকরুণের সঙ্গে সে 'দিদি' পাতিয়েছিল। ছেলে ছিল না, বিধবা মানুষ, কি যে ভক্তি হয়েছিল পাগলের, 'দিদি' বলতে অজ্ঞান হ'ত, রোজ যেত দিদির বাড়ি একটি ঘটিতে দুধ নিয়ে। ঘরের গাই নিজে হাতে দুয়ে কাপড় ছেড়ে নির্জলা দুধ দিয়ে আসত ; পাগলের দিদি লালঠাকরুণ 'আন্তিকালে' সেবা করতেন, একাদশীর পরদিন লালঠাকরুণ পারণ ক'রে পাগলকে পেসাদ দিতেন। চন্ননপুরে কারুর বাড়িতে ভোজ-কাজ হ'লে লালঠাকরুণ থালা নিয়ে যেতেন, বলতেন—আমার বাড়িতে পুরুষ নাই, আমার ছাঁদা দাও, আমি নিয়ে যাব, কাহার-ভাইকে খাওয়াব। খাওয়াতেন তিনি। লালঠাকরুণের স্বগগ হয়েছে। পাগলও চন্ননপুর ছেড়েছে, হেথা-হোথা যাওয়াও বেড়েছে। এখন নেশা পড়েছে কন্যের কন্যে পাঁচ বছরের কন্যে, নাতনীর ওপর। তাকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে—গান বেঁধেছে—"এ বুড়ো বয়সে তুমি আমার লতুন নেশা হে।"

ওই নেশায় ম'জে সে দেশ ছাড়ায় হাঁসুলী বাঁকের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবার ঘেঁটু ভাল হয় নাই। বনওয়ারী মনে মনে আফসোস করেছে, পাগল থাকলে আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুর জবাব দিত সে। গাজনের সময় পাগল থাকলে গাজন আরও জমত। সকলেই পাগলের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ আজ সে এসে উপস্থিত হ'ল বছরখানেক পর। উপস্থিত হ'ল বিচিত্র বেশে।

সুচাঁদ বললে—এলে তা হ'লে ? ব'স ব'স। তা ই ব্যাশ কেনে ? গাজন তো ফুরিয়েছে।

পাগল বললে—এই ব্যাশেই বেরিয়েছিলাম, বলি—গাজনের সঙে একেবারে গিয়ে নাচতে লেগে যাব। তা পথে কাটোয়ার ধুম দেখে সেইখানেই থেমে গেলাম। গাজন গেল। ব্যাশ আর খুললাম না, এই ব্যাশে গান ক'রে ভিখ মাগতে মাগতে চলে এলাম। কথায় বলে—ভ্যাক লইলে ভিখ মেলে না, জান তো ! তা তোমার দেখলাম, বুয়েচ, পাওনা তোমার ভালই হয়েছে।

নিজের ঝোলাটা দেখালে সে। বললে—অ্যানেক আছে। চাল পেলাম, বেচে টাকা করলাম। হাসতে লাগল সে।

সুচাঁদ বললে—এখানেও এবারে খুব ধুম।

—শোনলাম। ব্যানো চড়কে চেপেছিল।

—হ্যাঁ। বাবা নেমেছিল এবার কাহারপাড়ায়।

—হ্যাঁ, তাও শোনলাম। করালীর খুব নাম শোনলাম। পাখীর সঙ্গে অঙের কথা শোনলাম, সাপ-মারার কথা শোনলাম। তা বেশ, তা বেশ। ব'লেই সে হঠাৎ সুচাঁদের গা টিপে এবং ইঙ্গিত দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে—তা এই বারেতে আমার বেবস্থা কর। না, কি ?

নসু চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল দিয়ে উঠল—মর, মর খালভরা।

কথাটা কৌতুকের। পাগল নসুবালাকে ওই স্ত্রী-বেশের জন্য ক্ষ্যাপায়, বলে—বিয়ে করব। নসু একেবারে ক্ষেপে যায়। ছুটে পালায়।

এই হাসি-কৌতুকের মধ্যেই কোপাইয়ের পুল পার হয়ে নটার ট্রেনে চ'লে গেল। মেয়েরা যে যার উঠল। করালীর দল ফিরল। পাগল তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—বলিহারি, বলিহারি!

—পাগল-দাদা?

পাগল গান ধ'রে দিলে—

"পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
হায় সখি গো—সনজে হ'ল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না।"

করালী গানের বাহবা দিলে না, ঢোল পেড়ে বসল না। বরং উল্টে পাগলের হাত ধ'রে টেনে বললে—ঠিক নোক পেয়েছি।

—আই দেখ, নোক কিসের?

—ঠিক কথা বলবার। বল তুমি, বল।

—কি?

—ব'স নসুদিদি, বার কর বোতল।

নসু ঝংকার দিলে—পারব না। উ মুনষে ভারি বদ। মুনষে অর্থাৎ মানুষটি—মানে এই পাগল।

এতক্ষণে করালী হাসলে। বললে—মর মুখপুড়ী মর। বুড়ো বয়সে ঢঙ দেখ।

সুচাঁদ একদৃষ্টে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল, মুখের দিকে তাকিয়ে শুনলে কথা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না ওর। সুচাঁদ এবার বললে—দেখ কেনে, আমাকে আবার বলে—বুড়ো বয়সে ঢঙ।

নসু গজগজ করতে করতে বোতল এনে দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলে করালীর হাতে।

করালী বললে—অন্যায় কোনখানটা বল?

কথাটা হ'ল—বনওয়ারী বাড়ি ফিরবার পথে করালীকে এবং করালীর অন্য অন্তরঙ্গদের সাবধান করেছে, শাসিয়েছে। যুদ্ধ লেগেছে—চন্ননপুরের কারখানায় অ[illegible] লোক চাই, মজুরি ডবল হয়ে গিয়েছে। অনেকে গোপনে করালীকে বলেছে, তারা যে[illegible] চায়। কিন্তু বনওয়ারী বলেছে—খবরদার। খবরদার। হাঁসুলী বাঁকের গণ্ডি পেরিয়ো না বাবারা। চন্ননপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিকে। কিন্তু আসলে ওই হ'ল দক্ষিণপুরী। উপকথায় আছে—সব দিক পানে চেয়ে দেখো, মন চায় তো হাঁটতেও পার, কিন্তু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ে দেখো না; ওদিকে, ও পথে হেঁটো না।

শেষে গম্ভীর গলায় বলেছে—সাবোধান। সাবোধান।

করালী বলতে চায়—কিসের সাবোধান? বল তুমি পাগলদাদা, তুমি হ'লে গুণী নোক, তুমি বল, কিসের সাবোধান?

পাগল বললে—হুঁ, তুইও মন্দ বলছিস না ভাই, বনওয়ারীও মন্দ বলছে না।

নসুবালা সুযোগ পেয়ে ব'লে উঠল হাত নেড়ে—তুমিও মন্দ বলছ না ভাই। তুমিও ভালি, আমিও ভালি—ন্যাজ বাঁধা দিয়ে চরতে গেলি। তুইও মন্দ বলছিস না—বনওয়ারীও মন্দ বলছে না। খুব বলা হ'ল।

সকলে হেসে উঠল। পাগল কিন্তু চটল না, অপ্রস্তুতও হ'ল না। সেও হাসতে লাগল।

করালী বললে—এখন যে কামিয়ে লেবে, সেই কামিয়ে লেবে। তা ছাড়া ছেরকাল চাষই করবে নাকি? আমি চাষ করলে এম্নি হ'ত আমার। ওই জাঙলের সদগোপদের কিল খেয়ে জান যেত। জান, মাথলা এবার চাষ ক'রে কি পেয়েছে? পাঁচ আড়ি ধান। ধুর্! মার চাষের মাথায় ঝাড়ু!

সকলেই সমর্থন করে, কিন্তু নীরবে। কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল মজলিসটা। হঠাৎ সুচাঁদ বললে—যুদ্ধ যুদ্ধ! কিসের যুদ্ধ বাবা! ক্যা জানে?

করালী বললে—মরণ! সায়েব নোকের যুদ্ধ। ইংরাজ, জারমুনি, জাপুনী—

সুচাঁদ বললে—তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু। যুদ্ধ হয়েছিল সেকালে। বর্গী এয়েছিল। ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে। সে বাবা শুনেছি বাপ-পিতেমর আমলে। অ্যাই বর্গীরা এল। ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ টগবগ ক'রে তরোয়াল ঘুরিয়ে—কেটে-কুটে ঘর-দোর জ্বালিয়ে ভেঙে—মানুষের নাক কেটে কান কেটে হাত কেটে মুণ্ডু কেটে—খচাখচ—খচাখচ, চলে গেল! লোকে তাদের ভয়ে পোড়া মালসা মাথায় দিয়ে জলে গলা ডুবিয়ে ব'সে থাকত।

পাগল বলে—হ্যাঁ দিদি, সাঁওতাল হাঙ্গামা—সেটা বল?

বুড়ীর চোখ বড় হয়ে ওঠে। এই সিঁদুরে মুখ আঙিয়ে, কালো যমের মত সব—হেই বাবা! গাঁ কেঁপে ওঠে মা।

বুড়ী ব'লে যায় সে গল্প। পাখী বিরক্ত হয়ে বলে—গান কর পাগলদাদা!

—গান?

—হ্যাঁ। যুদ্ধু আর যুদ্ধু; ই কোথা যুদ্ধু হচে—আর উ কোন কালে হয়েছে। তার চেয়ে তুমি রাম-রাবণের পাঁচালী বল।

পাগল শুরু করলে। করালী উঠল মজলিস থেকে। মাথলাদের নিয়ে বাইরে গিয়ে পরামর্শ শুরু ক'রে দিলে। করালী বনওয়ারীর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। তা ছাড়া, এ কি রে বাপু? সাবোধান আর সাবোধান! বেটাছেলের আবার সাবোধান আছে? সে বললে—চল, তোরা চল—চল, তা'পরেতে যা হয় হবে।

মাথলা বললে—এই দেখ, কাউকে বলি নাই, দেখাই নাই, এই দেখ। সে করালীর হাতখানা নিয়ে নিজের মাথায় চুলের মধ্যে গুঁজে একটা স্থান দেখিয়ে দিলে।

করালী শিউরে উঠল—কাটল কি ক'রে?

—মুনিব মেরেছে পাঁচন দিয়ে।

—কেনে?

—আমি বললাম, কৃষাণি করতে লারব। তা বলে—পাঁচ টাকা পাব দে, দিয়ে যেখানে খুশি যা। আমি বললাম, মশায়, আপুনি যদি টাকাই পাবেন, তবে আমি পাঁচ আড়ি ধান ফেরত পেলাম কেনে? হিসেব ক'রে আপুনিই তো দিয়েছ? তা আমার হাতের পাঁচনটা ফরাম্ ক'রে টেনে নিয়ে মেরে দিলে এক বাড়ি। কেটে গেল মাথা। তা আবার দয়া ক'রে খানিক ন্যাকড়া পুড়িয়ে লাগিয়ে দিয়ে এক আঁচল মুড়ি দিয়ে বললে—ফের

চালাকি করবি তো আবার ঠ্যাঙাব।

করালী বললে—দাঁড়া। ব'লে হনহন ক'রে ঘরে ঢুকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল। মাথলার হাতে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললে—কালই ফেলে দিয়ে আসবি,—বুঝলি? তারপর সটান চ'লে যাবি চন্ননপুরে। মাথলা আমার সঙ্গেই যাবে। আমি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকব ইস্টিশানের সিগনালের ধারটিতে, বুঝলি?

পাগলের তখনও চলেছে পাঁচালী। রাম-রাবণের যুদ্ধ।—সীতাকে নিয়ে বনে গেলেন রাম। দেশসুদ্ধ লোকে কাঁদল। রাম চলেন, সীতা চলেন, লক্ষ্মণ চলেন পিছনে পিছনে। পথে গুহক চণ্ডালের সঙ্গে পাতালেন মিতালি। এ-বন সে-বন ঘুরতে ঘুরতে শেষে 'সুপ্যনখার' সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মণ তার নাক কাটলেন। রেগে এলেন রাবণ। সোনার হরিণের মায়া দেখিয়ে সীতাকে হরণ করলেন। রাম-লক্ষ্মণ খুঁজতে খুঁজতে কাঁদতে কাঁদতে বনের বানরকে দিলেন কোল, মিতালি করলেন। জয়রাম ধ্বনি দিলে বানরেরা। সাগর বাঁধলেন, লঙ্কায় এলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অগ্নিবাণ নিবে যায় বরুণবাণে। বরুণবাণ ওড়ে বায়ুবাণে। সর্পবাণ কাটে অর্ধচন্দ্রবাণে। ব্রহ্মবাণে জ্ব'লে ওঠে দাউদাউ ক'রে আগুন। মহাপাপী রাক্ষসের বুক কাঁপতে থাকে। পৃথিবী কাঁপে থরথর ক'রে। পশুপক্ষী কলরব করে। নদীর জল স্তম্ভিত হয়। গাছপালা ঝলসে যায়।

পাখী এবং শ্রোতারা নির্বাক হয়ে শোনে। হাঁসুলী বাঁকে কাহারদের পূর্বপুরুষেরা কেঁপেছিল সেকালে। হাঁসুলী বাঁকের পশুপক্ষী কলরব করেছিল, কোপাইয়ের জল স্তম্ভিত হয়েছিল। বাঁশঝাড়গুলির পাতা ঝলসেছিল। যত কালই হোক, হাঁসুলী বাঁক তো ছিল সেকালে। সেই রাম-রাবণের যুদ্ধের কালে।

হঠাৎ পাখী চকিত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর শব্দ উঠেছে আকাশের দুই কোণে।

তিন

"ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত।"

করালী হ'ল নিম, আর ঘি হ'ল বনওয়ারীর উদার স্নেহ। কথাটা বললে নিমতেলে পানু। সকালেই আজ যাবার কথা জাঙলে ঘোষ-বাড়ি—বনওয়ারীর মনিব-বাড়ির ঘর ছাওয়াতে। ঘোষেদের বাইরের বাড়িটার নাম বাংলাকুঠি; একতলা লম্বা ঘরখানি সাহেবদের ডাকবাংলার 'ফেশানে' তৈরি করেছেন মাইতো ঘোষ মহাশয়; চুনকাম করিয়েছেন, মেঝে বাঁধিয়েছেন, দরজায় জানলায় সবুজ বিলাতী রঙ দিয়েছেন, ভিতরে ঘরজোড়া চাঁদোয়া খাটিয়েছেন—যাতে না চালকাঠামো দেখা যায়, মায় টানা পাঙখাও খাটিয়েছেন। বাহারের ঘর। জাঙলে লোকের কুটুম-সজ্জন এলে ওইখানেই বাসা দেওয়া হয়। যাদের বাড়ির কুটুম, তাদেরই রাখাল অথবা মান্দের অথবা কৃষাণের ছেলে এই কাহারনন্দনই কেউ বারান্দায় ব'সে টানাপাঙখা টানে। কাজেই ঘরখানার সব কিছু কাহারপাড়ার নখদর্পণে। সেই ঘরখানা

এবার ছাওয়াবার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ সেদিন হনুমানের সন্ন্যেসীর দলে যুদ্ধ লেগে ধমাধম লাফিয়ে ঘরখানার চাল একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছে।

হনুমানের সন্ন্যেসীর দল ক্ষেপলে ভীষণ ব্যাপার। সাধারণত হনুমানের দলে থাকে বিশ-পঞ্চাশটা হনুমতী, তাদের দলপতি থাকে এক বিরাট হনুমান, কাহারেরা বলে গাঁদা-হনুমান, এই লম্বা এই সাদা দাঁতে দাঁতে অনবরত শব্দ করছে কট-কট-কট-কট, খ্যাঁকাচ্ছে খ্যাঁকোর-খ্যাঁক। মধ্যে মধ্যে গম্ভীর গলায় উ-প শব্দ ক'রে লাফ দিয়ে চলছে এ ডাল থেকে ও ডাল ; এ গাছ থেকে ও গাছ, গাছ থেকে পাশের ঘরের চালে ধম ক'রে লাফিয়ে পড়ছে। দলের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ হনুমান নাই। দলের প্রতিটি হনুমতী প্রসব করে তার সন্তান। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। প্রসব হ'লেই সর্বাগ্রে সে খবর নেবে—বাচ্চাটা হনুমান না হনুমতী, হনুমতী হ'লে থাকবে, হনুমান হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ নখে বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেঁড়ে ফেলবে।

পুরুষ-সন্তান হ'লে হনুমতীই পালায়—এখানে ওখানে লুকিয়ে থেকে সন্তানকে খানিকটা বড় ক'রে ওই সন্ন্যেসীর দলে সমর্পণ ক'রে আবাব ফিরে আসে নিজের দলে। সন্ন্যেসীর দলের দলপতির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই দলের দলপতির যুদ্ধ বাধে। ভীষণ যুদ্ধ। আঁচড়-কামড় চড়-চাপড়—সে রক্তারক্তি ব্যাপার। এ ওর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায়, ও এব বুকে নখ বসিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায় তার হৃৎপিণ্ড। উ-প উ-প শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে, গোটা গ্রামের চাল তছনছ হয়ে যায়, দুপ-দাপ শব্দে এ চাল থেকে ও চালে লাফ দিয়ে এ ওকে ও একে অনুসরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশে সন্ন্যেসীর দল উৎসাহভরে আক্রোশভরে লাফ মারে। হনুমতীর দলও লাফ দিয়ে এ-চাল ও-চাল ক'রে ফেরে, তাবা লাফ দেয় উৎসাহে এবং আশঙ্কায়। একজন হার না মানা পর্যন্ত যুদ্ধ থামে না। একনাগাড়ে তিন দিন চার দিন যুদ্ধ চলে।

এর উপায় নাই, প্রতিবিধান নাই। মাইতো ঘোষের বন্দুক আছে, তিনি আক্রোশে গুলি করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু বাড়ির লোক, গ্রামের লোকে দেয় নাই। হনুমান—বীর হনুমান—রামচন্দ্রের বাহন ; তিনি তাদের দিয়ে গিয়েছেন গাছের ডাল এবং ঘরের চালের রাজত্ব ; মানুষের ফসলের একটা ভাগও দিয়ে গিয়েছেন। 'উনি'রা হলেন পবন-নন্দন, ওঁদের মারলে পবনঠাকুর মেঘ আনবেন না সে অঞ্চলে, অনাবৃষ্টি হবেই। বনওয়াবীও হাত জোড় করেছে মাইতো ঘোষকে। জল না হ'লে জাঙলের সদগোপেরা তবু বাঁচবেন, ঘরে ধান আছে টাকা আছে। কিন্তু কাহারদের যে সর্বনাশ। তারা খাবে কি? সবংশে সগোষ্ঠী অনাহারে শুকাবে যে। সে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, গোটা কাহারপাড়া একত্র ক'রে তিন দিনে ঘরখানাকে ছাইয়ে দেবে। ঘোষ জোর তাগিদ দিয়েছেন পরশু। কলকাতা থেকে তাঁর এক বন্ধু আসবেন মেয়েছেলে নিয়ে, বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে আসবেন, যুদ্ধ যতদিন না মেটে বাস করবেন ; সুতরাং ঘরে লাগতেই হবে। গতকাল থেকেই তিনি লাগবার জন্য বলেছিলেন ; কিন্তু আর এক মণ্ডলের ঘরে লেগেছিল—ঘর আধ-ছাওয়া হয়ে রয়েছে ; তাই কালকের দিনটি ছুটি ক'রে নিয়েছিল বনওয়ারী। আজ লাগবে—শপথ ক'রে এ কথা বলে এসেছে। সকালেই সকল কাহার—বুড়ো যুবা এসে জুটল, এল না

মাথলা নটবর ফড়িং হেবো। করালীর কথা আলাদা। সে চন্ননপুরে খাটে, কাহারপাড়ার কাহার হয়েও কাহার নয়—এক গাছের ফল বটে, কিন্তু নিজেই বোঁটা ছিঁড়েছে। কিন্তু চার-চারটে জোয়ান ছোকরা এল না কেন ?

আর কেন ? তারা চারজনে করালীর সঙ্গে চন্ননপুরে গিয়েছে। রেলে কাজ নেবে। নিয়ে গিয়েছে করালী। দলের সকলে ঘাড় নাড়লে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বনওয়ারী গুম হয়ে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। নিমতেলে পানা সুযোগ বুঝে বললে—ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত !

বনওয়ারী উত্তর দিতে পারলে না কথাটার। ঘোষ মহাশয়ের ঘর ছাওয়া অবশ্য আটকাবে না, কিন্তু এ কি হ'ল ? এত ক'রে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে করালীর মতি ফিরল না, নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে ছোকরাদের নিয়ে গেল ! কাহারপাড়ায় ভাঙন ধরিয়ে ছোকরাদের হাঁটাচ্ছে চন্ননপুর– ওই দক্ষিণপুরীর পথে !

পাগল এল এতক্ষণে। সে রাত্রিটা ছিল করালীর উঠানে শুয়ে। গরমের দিন, খোলা উঠানে নিজের ঝুলিটা মাথায় দিয়ে একখানা মাদুরের উপরে শুয়েছিল। কাহারদের বাড়িতে মাদুর বড় একটা নেই, খেজুরপাতা তালপাতার চ্যাটাই ওরা নিজেই বুনে নেয়, ওই ওদের সম্বল, কিন্তু করালী তাকে মাদুর দিয়েছিল—নতুন মাদুর। সকালে উঠে সে এল বনওয়ারীর ওখানে। বৈশাখ মাস—ঘর ছাওনের সময়, ওইখানেই সকলের সঙ্গে দেখা হবেই। হাসিমুখে গান ধ'রে সে এসে দাঁড়াল—

"মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে—
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমাকে ফিরে হে !"

কিন্তু মজলিসের লোকেরা শুধু একবার মুখ তুলে একটু শুকনো হাসি হেসে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতনের তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা, তারাও চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বনওয়ারী বললে—এলি কখন ?

—কাল এতে। কিন্তু বেপারটা কি ?

—অ্যানেক। তা এয়েছিস ভালই হয়েছে। চল্।

—কোথা ?

—ঘোষ মাশায়ের বাংলাকুঠি তিনদিনে শ্যাষ ক'রে দিতে হবে।

—অ্যাই দ্যাখ্, আমাকে কেনে ? আমাকে ছেড়ে দে।

—কেনে ?

—আমার ভাই—। হাসলে পাগল, বললে—গান গেয়ে ভিখ ক'রে অস পেয়েছি। উ সব খাটুনি-খুটুনিতে নাই।

—না, তা হবে না। ওঠ্। ভিখ করবি ? লাজ লাগবে না ?

হা-হা ক'রে হেসে উঠল পাগল—পরিবার না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো, চাল না চুলো, দিন না আত, মাস না বছর ; বাঁচা না মরা—আমার আবার লাজ-শরম কিসের ?

বনওয়ারী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে—তোর শরম থাকলে কাল এতে এসে তু আমার বাড়ি না এসে করালীর বাড়িতে উঠিস্। তা তোকেই বলি, করালীকেও বলি,

বলিস্ ছোকরাকে—বলি, কিছু না থাক, জাতধরম তো আছে? না, তাও নাই?

পাগল একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল, বললে—ই কথা বলছ কেনে ভাই?

—বলছি সাধে। বলছি অনেক দুঃখে। সে ছোকরা কজনাকে নিয়ে চন্নপুরে গেল। বেজাত বেধম্মের আড়ৎ—। বনওয়ারী চুপ ক'রে গেল, আর ভাষা খুঁজে পেলে না সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে—তু বলছিস ভিখ মাগবি? গতর থাকতে ভিখ মাগবি? বলি—ওরে, একটা কথা শুধাই তোকে। যদি তোকে খেতে দিয়ে জাতটি কেউ মারতে চায়, মারতে দিবি?

পাগল বললে—চল, কথার দরকার নাই। চল, আমি যেছি।

যেতে যেতে বনওয়ারী বললে—তা পরেতে সাঙাত।

—বল সাঙাত।

—তোর কনে কত বড় হ'ল? ভাল আছে?

—ওই তোমার পাঁচে পড়ল। তা বেশ ডাগর হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এইবার বিয়ে হলেই হ'ল। হাসতে লাগল পাগল। গান ধ'রে দিলে—এ বুড়ো বয়সে সে আমার নতুন নেশা হে।

—সেই গানটি গা দিকিনি।

—কোন্‌টি?

—সেই 'সায়েব আস্তা বাঁধালে'।

পাগলের বাঁধা রেল-লাইনের ঘেঁটুগান। চন্নপুরে যখন প্রথম রেল-লাইন বসে তখন এই ঘেঁটুগান বেঁধেছিল পাগল, এ গান গেয়ে খুব নাম হয়েছিল। আজও কাহারেরা কখনও কখনও গায়।

ঘোষ মহাশয়ের চালে চেপে পাগল গান ধরলে—

ও সায়েব আস্তা বাঁধালে।
হায় কলিকালে।
কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে—

ছোকরারা ধুয়ো গাইলে—

ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।
ও সায়েব আস্তা—

ঝপাঝপ খড় উঠছে, ছুঁড়ছে নিচ থেকে। বিচিত্র কৌশলে—উপরে চালে ব'সে বাবুইরা বাঁ হাতে ধরছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। পাশে গাদা ক'রে রাখছে। বাঁখারিতে বাঁখারিতে বাবুই দড়ির বাঁধন দিচ্ছে, ঠুকছে, তারপর কোমর থেকে কাটারি বা কাস্তে খুলে দড়ি কেটে আবার সেটা কোমরে গুঁজছে।

বনওয়ারী ঘোষের চালের 'টুই'য়ে অর্থাৎ মাথায় দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে তাগিদ মারছে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে একবার দেখছে উত্তরে চন্নপুরকে, একবার হাঁসুলী বাঁকের ঘেরার মধ্যে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে।

হাঁসুলী বাঁকের মানুষগুলি বাঁশবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এতকাল ওই চন্নপুরকে দেখে

আসছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার উত্তরে জাঙল, তার উত্তরে পোয়া তিনেক অর্থাৎ দেড় মাইল দূরে চন্নপুর। কাহারেরা বলে—তা খানিক আদেক বেশি হতে পারেন, কমও হতে পারেন। চন্নপুর চিরকাল ভয়ের জায়গা। কাহারেরা সাহেববানদের গোলামী করেছে, তাদের 'আঙমুখ' 'হাঁসাচোখ' লালচুলকে যত ভয় করেছে, ঠিক ততখানিই ভয় করেছে চন্নপুরকে। চন্নপুরের ঠাকুরমহাশয়দের, দোকানদার বণিক মহাশয়দের গেরাম -'ভগবান-ভগবতী' অর্থাৎ দেবদেবীর গেরাম। ঠাকুরদের ছিল সূর্যের মত তেজ, এক রাস্তায় হাঁটতে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপত কাহারেরা ; কে জানে বাবা, কোন খড়কুটোয় যোগসাজসে ছোঁয়া পড়বে। বণিক মহাশয়দিকে ভয় হিসেবের। বড় বড় মোটা মোটা খাতার গুটি গুটি কালির আখরের লেখন, এক খাতা থেকে এক খাতায় যায়, সুদে সুদে পাওনা বাড়ে, ওদের দোকানে ধার করলে সে পাওনা পাথরের মত বুকে চেপে বসে। ভগবান-ভগবতীকে আরও ভয়। তাঁরা কত্তাঠাকুর নয়, তাঁরা কালরুদ্র নয়, তাঁদের পুজোর ঘটা কত, মহিমা কত। তাঁদের দরবারে পুজোর থান দূরের কথা—কাহারেরা নাটমন্দিরেও উঠতে পায় না, দূর থেকে দেখতে হয়, তাঁদের ভোগের সামগ্রীতে কাহারদের দৃষ্টি পড়লে ভোগ নষ্ট হয়ে যায়। নানা ভয়ে কাহারেরা সাধ্যমতে ওপথে হাঁটত না।

নীচে থেকে এক আঁটি বাবুই দড়ি হুস ক'রে তার সামনে এসে পড়ল। মুহূর্তে বনওয়ারী সেটাকে ধ'রে ফেললে ব'সে পড়ল, বাঁধন দিতে লাগল। কাজ জোর চলেছে। পাগল মাতিয়েছে ভাল। যেমন গলা, তেমনি গাইয়ে। সব চেয়ে সুখ ওকে নিয়ে পাল্কী বহনে। এমন ছড়ার বোল ধরবে।

পাগল গেয়ে চলেছে ঘেঁটুর গান—

লালমুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ—
দ্যাশ-বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
—ও সায়েব আস্তা—
ও সাহেব আস্তা বাঁধালে—কাহার কুলের অন্ন [illegible] ল
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক।
—ও সায়েব আস্তা—

মধ্যে মধ্যে সেকালে তাদের ডাক পড়ত ওখানকার 'বিয়েসাদী'তে পাল্কীবহনের জন্য। লক্ষ্মীনারায়ণকে বহন করে গরুড় পক্ষী, শিবদুর্গাকে বহন করে দুধবরণ ষাঁড় প্রভু, 'পিথমী'তে বর-কনে—সে ঠাকুর মহাশয়রাই হোন আর বণিকেরাই হোন আর মণ্ডলেরাই হোন আর সেখ সৈয়দই হোন, সকল জাতের বর-কনে—বহন করতে আছে এই 'অশ্বগোত্ত' কাহারেরা। কাহারেরা পাল্কী কাঁধে করলেই পবিত্র। পাল্কী চেপে ঠাকুরেরা চান করেন না। ওই পুণ্যেই তাদের বাড়বাড়ন্ত। সে কর্ম ঘুচিয়ে দিয়েছে ওই চন্নপুরের কারখানা।

কালে কালে কাল পালটায়। কালারুদ্দুর চড়কপাটায় ঘুরে কত বছর এল, কত গেল, কে তার হিসেব করে। আঁধার রাত্রে সুচাঁদ গল্প বলে গাজনের। বনওয়ারীর মত কাহার মাতব্বর যারা, তারা উদাস হয়ে গভীর অন্ধকার-ভরা বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে ভাবে, দিশেহারা হয়ে যায় ; কালে কালে কাল কেমন করে পাল্টায়, সে জানে কোপাই-বেটী।

দাঁড়াও গিয়ে কোপাইয়ের কূলে। দেখবে, আজ যেখানে দহ, কাল সেখানে চর দেখা দেয়, শক্ত পাথুরে নদীর পাড় ধ্ব'সে সেখানে দহ হয়।

কিছুটা জানে কালীদহের মাথার বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়' অর্থাৎ এই শিমূল বৃক্ষটি। কত কোটরে ভরা, কত ডাল ভেঙে পড়েছে, কত ডাল নতুন হয়েছে, কত পাতা ঝরেছে, কত ফুলও ফুটেছে, কত ফল ফেটেছে, কত বীজ এখানে ওখানে পড়েছে, কত বংশ বেড়েছে, কত বীজ নষ্ট হয়েছে, ওই উনি কিছু কিছু জানেন। তবে উনি তো কথা যাকে-তাকে বলেন না, বলেন সাধুকে সন্ন্যেসীকে, আর নেহাত যে বাবাঠাকুরের সুনজরে পড়ে তাকে। তাকে বলেন—দেখলাম অনেক কাল বাবা। রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখলাম, কেষ্টঠাকুর কংসকে মারলেন দেখলাম, বর্গীর হাঙ্গামা দেখলাম, সায়েবদের কুঠি দেখলাম, চৌধুরীদের আমল দেখলাম; চন্নপুরের ঠাকুর মহাশয়দের বাবুমশায় হতে দেখলাম, কাহারদের ডাক পড়ল চন্নপুরে—সে তো এই সেদিনের কথা রে বাবা। চন্নপুরের ঠাকুরেবা বাবু হয়ে পিরান পরলেন, মসমসিয়ে জুতো পায়ে দিলেন, ছুতপতিত খানিকটা কম করলেন। না করে উপায় কি বল।

তাঁরা জমি-জেরাদ কিনলেন, টাকা দাদন করতে লাগলেন, ইংরিজী শিখলেন। জমিদারিও কিনলেন কতজনে। চাকরি-বাকরিতে দেশদেশান্তরে যেতে লাগলেন। কীর্তনের দল ছিল চন্নপুরে, সে দল ভেঙে হ'ল যাত্রার দল। সে যাত্রাদলের গান বনওয়ারীও শুনেছে অল্পবয়সে। তারপর হয়েছে থিয়েটার। এই কালে কাহারদের ডাক বেশি ক'রে পড়ল চন্নপুরে। বাবু মশায়দের চাষে খাটতে, বাসে খাটতে, মানে—দালান-কোঠার ইট বইতে, সুরকি ভাঙতে কাহার নইলে চলত না। মেয়েদের ডাক পড়ল মজুরনী হতে। একালে তখন সাহেবানদের কুঠি উঠে গিয়েছে, কত্তাঠাকুরের 'কোধে' সাহেব মেম ডুবে মরেছে, কাহারেরা চুরি-ডাকাতিও করে, আবার চাষও করে।

কিন্তু চন্নপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিক হ'লেও আসলে হ'ল দক্ষিণপুরী, ওখানে গেলে ওদের মঙ্গল হয় না। সেকালে ছিল শাপশাপান্তেব ভয়, একালে হ'ল অন্য ভয়। মেয়ে হারাতে লাগল। রাজমিস্ত্রী সকলেই প্রায় শেখ ভাই সাহেব, তারা মেয়েদেব সঙ্গে 'অঙ' ধরিয়ে কলমা পড়িয়ে বিবি ক'রে ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। বাবুদের চাপরাসীও মেয়েদের নষ্ট করতে লাগল। বাবু ভাইয়েরাও কাহার-মেয়েদের আঁচল ধ'রে টান দিলেন। 'বাম্ভনে'র ছেলে তাঁদের পরশ কাহার-মেয়েরা সইতে পারবে কেন, তারাই ফেটে গেল পাপে। মাতব্বরে মুরুব্বিতে বারণ করলে, দু হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়াল—যাস না। যতটুকু না হ'লে নয়, যে যাওয়াটা না গেলে চলবে না তার বেশি ও-পথ হাঁটিস না।

আবার কাল পাল্টাল। চন্নপুরে এল কলের গাড়ি। লোহার লাইন পাতলে, মাটির সড়ক বেঁধে কোথাও বা মাটিতে 'পুল বন্ধন' হ'ল। চন্নপুর হ'ল 'লদী'র ঘাট। পিথিমীর কালের ভাঙনের সকল ঢেউ এসে আগে আছড়ে পড়ে ওই চন্নপুরে। বাবু মহাশয়েরা সে ঢেউ বুক পেতে নিতে পারেন। তাঁরা 'বাম্ভন', তাঁরা 'নেকনপঠন' জানেন, ভগবান তাঁদের ঘরে দিয়েছেন রাজলক্ষ্মী, তাঁর কৃপাতে ওই ঢেউয়ের মুখে ঘরে এসে ঢোকে ভালটুকু—যেমন কোপাইয়ের বানে ভাগ্যমন্তের জমিতে পড়ে সোনা-ফলানো পলেন মাটি।

কাহারদের বুকে ও ঢেউ লাগলে সর্বনাশ হয়, যেমন কোপাইয়ের বান ভাগ্যহীনের জমিতে চাপায় শুধু বালি, বালি আর বালি। চন্ননপুরে রেল-লাইন পড়ল, তাতে বাবুদের জমির দাম বাড়ল, ব্যবসা-বাজার ফলাও হ'ল, আর কাহারদের হ'ল সর্বনাশ। একসঙ্গে এক দল মেয়ে চলে গেল। করালীর মা গিয়েছে ওই দলে। হায় রে নিলাজ বেহায়া করালী। আবার এসেছে নতুন ঢেউ—যুদ্ধের ঢেউ। যুদ্ধের ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে চন্ননপুরের ঘাটে। চন্ননপুরে লাইন বাড়বে। হাতছানির ইশারা দিচ্ছে করালীর হাত দিয়ে কাহারপাড়ায় অবুঝ অবোধদের কাছে। ভুলিস না, ভুলিস না তোরা।

পাগলও এই সময় তার গান শেষ করে—তারও গানে এই সুর। ইচ্ছে ক'রেই বনওয়ারী তাকে এই গানটা গাইতে বলেছে। শুনুক, যে সব ছোকরা মনে মনে উশখুশ করছে অথচ যেতে পারছে না, দুঃসাহস হচ্ছে না—তারা শুনুক, জ্ঞান হোক। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। পাগল গেয়ে নিক আগে—

জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।

গা, তুই গেয়ে যা পাগল—

মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেলে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।

করালীর মা গিয়েছে কে জানে পাখীর দশায় কি আছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী। পাগল গান শেষ করে, গায়—

লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারখানা
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।

বনওয়ারী বললে তবে? পাগল, সাঙাত আমার, তবে?

কি তবে?

—করালীর খুব পিঠ চাপুড়েছিস শুনলাম কাল এতে। করালীকে গানটি শোনাস।

পাগল চুপ ক'রে গেল। সে ঠ'কে গিয়েছে। একটু পরে হেসে কললে—তু খুব ফিচেল বনওয়ারী।

বনওয়ারী বললে পাখীর কথা বলব না, বলতে নাই আমাকে, আমি মামা। তবে তাকে শুধাস, টাকার জন্যে জাত মরবে, সেটা কি ভাল হবে?

বৈশাখ মাস। দারুণ রোদ। তার উপর আজ বাতাস নাই। দরদর ক'রে ঘেমে সারা হ'ল কাহারেরা। তবু মনের আনন্দে গান গেয়ে কাজ ক'রে চলেছে। হঠাৎ পাগল বললে—ব্যানো, যা হয়েছে ত হয়েছে। বাকিটা কোন রকমে আলগা খড় দিয়ে ঢাকো ভাই, গতিক খারাপ।

আকাশের দিকে চাইলে বনওয়ারী। হ্যাঁ, গতিক খারাপই বটে। আকাশ একেবারে ইস্পাতের 'বন্ন' অর্থাৎ বর্ণ ধারণ করেছে। ছায়া ঠিক পড়ে নাই, তবে রোদ যেন 'আমলে' অর্থাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। ঠিক পশ্চিম দিকটা দেখা যাচ্ছে না। একতলা ঘর, নীচু চাল,

চারিদিকের গাছপালায় ঢেকে রয়েছে দিকগুলির শেষ সীমানা। তবু ঝড় আসবে ব'লে মনে হচ্ছে। বনওয়ারী মনে মনে ডাকলে বাবাঠাকুরকে।—দুটো দিন ঝড় সামলে দাও বাবা, দুটো দিন। মুখে সে তাগিদ দিলে—কতক লোক কাজ কর, হাত চালিয়ে কাজ কর। কতক ওপরে থেকে আলগা খড়ের আঁটি চাপিয়ে দাও। ছোঁড়, খড় ছোঁড়। এই ছোঁড়ারা। এই।

হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল—হো—।

ওরে বাপরে। আচ্ছা গলা। কে? আকাশে আকাশে ছড়াচ্ছে গলার আওয়াজ।

পাগল আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠল।—ব্যানো।

—কি?

—দেখ দেখ।

—কি রে?

—করালী।

—করালী?

—করালী বাবাঠাকুরের শিমুলগাছের ডালে চেপে চেঁচাচ্ছে।

চালে দাঁড়িয়ে উঠল বনওয়ারী। সর্বনাশ। আদ্যিকালের শিমলবৃক্ষ বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়', সেখানে চেপেছে করালী। পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে- হো—। ডাকছে। কাকে ডাকছে?

—হো—ব্যানোকাকা—। হো।— হো—।

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বনওয়ারী। ওই উঁচু শিমলগাছ—কাঁটায় ভরা গদি ডাল। ওর উপর উঠেছে। বাবাঠাকুর যদি ঠেলে দেন। করালীকে লাগছে যেন পুতুলের মত

—হো—ঝড়—ঝড়। ব্যানোকাকা। পেলয় ঝড়। চাল থেকে নাম। চন্ননপুরে খবর এসেছে তারে। হো—ব্যানো-কা-কা।

নামছে, এইবার করালী নামছে।

পানা বললে—পড়বে। এই—

—পড়ল?

—না, সামলেছে। এই—এই। ওঃ, সামলেছে। আর দেখা যাচ্ছে না।

পাখীর কান্না শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল সকলে। কিন্তু বনওয়ারী কাজ ভোলে না খড়, খড়। না ঢেকে কেউ নামতে পাবা না। ঢাক। ঢাক।

পাগল বললে—ব্যানো, এইবার দেখ। কত্তাঠাকুরের বেলগাছ আর শিমুলগাছ এক ক'রে দেখ।

কত্তাঠাকুরের বেলগাছের পিছনে সাহেবডাঙায় ওই 'টেকরের' অর্থাৎ চড়াইয়ের গায়ে আকাশে ও কি? কালচে মেঘের কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে না? হাঁ, হাঁ। ওই যে বিদ্যুৎ 'ললপে' অর্থাৎ চমকে উঠেছে ফুঁ-দেওয়া আগুনের আঁচের মত। এই আবাব। এই আবার। আসছে তা হ'লে, আজই আসছে। আসছে। নির্ঘাত।

আকাশের 'হেঁড়ে' অর্থাৎ বায়ুকোণে মেঘের তুলোর উপর কোন ধুনুরী যেন তার আঁতের

ছিলের আঘাতে আঘাতে পিঁজে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

--আর দু আঁটি খড়, জলদি দাও। মাথাটায় আর দু আঁটি চাপিয়ে দি।—আকাশের দিকে আর একবার চেয়ে দেখে বনওয়ারী চালের উপর শক্ত হয়ে ব'সে মাথায় বাঁধন দিতে লাগল।

—বাস, নাম, নাম। নিজে সে মইয়ের ভরসা ছেড়ে চাল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল নীচের খড়ের গাদায়।

—লে—এইবার দে ছুট। ঘর—ঘর চল।

কাহারপাড়ার নীলবাঁধের মাথায় দাঁড়িয়ে ডাকিনীর মত হাঁক ছেড়ে শাপান্ত করছে নয়ানের মা। ওঃ, একেবারে দু হাত তুলে ডাকছে, নাচছে যেন।

এস বাবা, এস। ক্ষ্যাপা বাবা আমার এস।

এল। হাঁসুলী বাঁকের দেশের কালবৈশাখীর ঝড়। কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোয় লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে। কালো কষ্টিপাথরের গড়া বাবা কালারুদ্রের পরনের রক্তরাঙা পাটের কাপড় যেন ফুলে ফুলে উঠছে। হাঁ-হাঁ ক'রে হাঁকতে হাঁকতে আসছে। দু হাত দোলাতে দোলাতে, বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, সামনে যা পা'রে সাপটে জাপটে ধ'রে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতীর মত, শিঙ-বাঁকানো বুনো মোষের মত, গাছ ভাঙে মাঝখান থেকে, ডালও ভাঙে, মূলসুদ্ধ উপড়েও পড়ে, পাতা ফুল ছিঁড়েখুঁটে সারি সারি। চালের খড় উড়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যায় বানভাসি কুটোর মত। তালগাছগুলো যুদ্ধ করে। মাটিতে মাথা আছড়ে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে, ত যার নামে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ খেলে, কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকে, সে আলোতে চোখে মানুষ আঁধার দেখে, সে শব্দে কানে তালা ধ'রে যায়, মন শুকিয়ে ভয়ে এতটুকু হয়ে ভাবে, 'পিথিমী' আর থাকবে না। তবু ওরই মধ্যে সাহস ক'রে বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড়ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়, ঘটিতে ভ'রে জল দেয় পা ধুতে ; বলে-ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স। বনওয়ারী ঘরের মধ্যে ব'সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। উঃ, অনেকদিন এমন ঝড় হয় নি। ওরে বা[illegible]। কি 'পেচণ্ড ব্যাপার, 'পলয়' হয়ে যাবে হয়তো।

আলোতে ধেঁধে গেল সমস্ত। কড় কড় শব্দে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল পৃথিবী। বাজ পড়ল। কোথায় ? ওরে বাপ রে, মাঠের সেই তালগাছটার মাথা জ্বলতে লেগেছে।

ও কি। ও কার ঘর। কার ঘরের চালখানা দেওয়াল ছেড়ে ঝড়ের বেগে উঠছে আর নামছে। নতুন খড়ে ছাওয়া চাল। করালীর ঘর নয়। হ্যাঁ, করালীর ঘরই তো। ঝড় বইছে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে, ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণটা উঠছে আর নামছে। বুনো মোষ যেন শিঙ লাগিয়ে ঠেলে ঠেলে তুলছে চালাখানাকে। গেল, আর বুঝি থাকবে না। ক্রমশ যেন দেওয়াল ছেড়ে বেশি ফাঁক হয়ে উঠছে। এই—এই সর্বনাশ। দেওয়াল ছেড়ে গোটা চালাখানাই ভেসে উঠল আকাশে ; চলল, তীব্র বেগে ভেসে চলল—মাঠের দিকে, ঝড়ের হাওয়ার মুখে। হঠাৎ একটু কাৎ হ'ল, তারপর হ'ল পুরো কাত—ঘুরপাক খেলে কয়েকবার, নীচে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। হাঁসুলী বাঁকের মাঝমাঠে পড়ল।

বনওয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল পাগল।—কার ঘর, ব্যানো?

—করালীর মনে হচ্ছে।

—করালীর?

—হ্যাঁ।

আর তার সন্দেহ নেই। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে এই ঝড়ের মধ্যেও।

করালীর ঘর উড়েছে, তাতে আক্রোশ মেটার আনন্দে নয়ানের মা তারস্বরে এই ঝড়ের মধ্যেই যেন সুরে সুর মিলিয়ে গাল দিচ্ছে। শিউরে উঠল বনওয়ারী নয়ানের মায়ের গালাগাল শুনে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গালাগাল শাপশাপান্ত কোন কিছুতে বেয়াত করে না, ক্ষমা নাই, ঘেন্নাও নাই তার মধ্যে। চোখের মাথা খায়, গতরের মাথা খায়, স্বামী-পুত্রকে যমের মুখে দেয়, ঘর-সংসার জ্বালিয়ে ছারখারে দেবার জন্য ভগবানকে ডাকে। চুল যায় এলিয়ে, অঙ্গের বসন পড়ে খুলে, সেদিকে দৃকপাত করে না; আক্রোশে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কাহার মেয়ে গাল দিতে দিতে নাচতে থাকে, হাতে তালি দেয়, কখনও কখনও দুলতে থাকে। সে সবই বনওয়ারী জানে। শুনতে কটু লাগে, নইলে ওতে কিছু হয় না—এত অভিজ্ঞতাও তার আছে। গত জনমের 'করমদোষে' ছোট জাত হয়ে জন্মেছে, এ জন্মেতে এমন পুণ্যি কিছু নাই যে যা বলবে তাই ফলবে। ভয় 'বাম্ভন'-বৈদ্য বড় জাত মহাশয়দের জিভকে—ও জিভের বাক্যিতে আর শিবের বাক্যিতে তফাত নাই। নয়ানের মায়ের গালিগালাজ শুনে শিউরে উঠে নাই বনওয়ারী। শিউরে উঠেছে নয়ানের মা ঝড়ের মধ্যে যা দেখেছে তাই শুনে। নয়ানের মা হা-হা ক'রে হাসছে আর হাতে তালি দিয়ে বলছে—ম্যাঘের কোণে বাবার বাহন ফণা তুলে উঠেছে। লকলকিয়ে জিভ 'কাড়ছে' অর্থাৎ বার করছে। ফোঁস-ফুঁসিয়ে গজরাচ্ছে। আগুনের আঁচে ঝলসানো অঙ্গের 'ডাহতে' ক্ষেপে উঠে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঝড় তুলছে। আমি চোখে দেখলাম, চোখে দেখলাম। যে মেরেছে পুড়িয়ে, তার ঘর দিলে উড়িয়ে। হে কত্তাবাবা, হে বাবাঠাকুর, তুমি ক্ষেপে ওঠ বাবা। বাহনের মাথায় উঠে দাঁড়াও এইবার। আকাশের বাজ নিয়ে নষ্টদুষ্টু বদজাতের মাথায় ফেলো বাবা। কড়কড় ক'রে ডাক মেরে হাঁক মেরে ফেলে দাও বাজ। পুড়ে ফেটে ম'রে যাক ছটফটিয়ে। হে বাবা। হে বাবা। হে বাবা।

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বনওয়ারী। সেই 'বিচিত্ত' বরণ ভয়ঙ্কর সাপটির পুড়ে মরবার দৃশ্যটি তার মনে প'ড়ে গেল। সুচাঁদ পিসীই কথা প্রথম বলেছিল। তারও মনে কথাটির উপর বিশ্বাস হয়েছিল কিছু কিছু। আজ নয়ানের মা এ কি বলছে। চোখে দেখেছে সে ওই মেঘের মধ্যে তার ফণা, তার জিভ?

পাগল বিস্মিত হয়ে গেল তার ভীতার্ত দৃষ্টি দেখে। সে ঘটনার কিছুই জানে না। শুধু খানিকটা আভাস পেয়েছে মাত্র। তবুও সে বাঁশবাঁদির কাহার। খানিকটা অনুমান করতে পারছে বনওয়ারীর ভয়। সঙ্গে তারও ভয় লাগছে। সে ভীত কণ্ঠেই ডাকলে—ব্যানো।

—হুঁ।

—কি হ'ল ?

বনওয়ারী আঙুল দেখালে আকাশের দিকে।—ওই দেখ।

বনওয়ারী আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। মোটা মোটা জলের ফোঁটা এসে চোখে পড়ছে, তবু সে চেয়ে আছে আকাশের বায়ুকোণের দিকে। বৃষ্টির ধারায় আকাশের ধুলো ধুয়ে নেমে গিয়েছে মাটিতে। বাতাসের বেগে মেঘপুঞ্জের দ্রুত আবর্তন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদা-কালো মেঘের বিচিত্র বর্ণসংস্থান হয়েছে সেখানে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষের দৃষ্টিতে কত অপদেবতা দেখা দেয়, বর্ষার আকাশে 'হাতী-নামা' এরা পড়ে, কোপাইয়ের বন্যায় বড় মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকা আসা দেখতে পাওয়া যায়। আজও নয়ানের মা দেখেছে মেঘের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে কত্তাঠাকুরের বাহনকে। বনওয়ারীও যেন দেখতে পাচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেঘের চেহারার মধ্যে সেই মা-মনসার বেটী—কত্তাঠাকুরের বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটির দেহের বর্ণবৈচিত্র্যের সঙ্গে মেঘের সাদা-কালো রঙের বর্ণসংস্থানের স্পষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছে।

পাগল বুঝতে চেষ্টা ক'রেও ঠিক বুঝতে পারলে না, বনওয়ারী কি দেখতে পেয়েছে। তবে সেও কাহার, সে আর একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলে মেঘ এবং প্রকৃতির গতিকের মধ্যে থেকে। সে শঙ্কিতভাবে গায়ে হাত দিয়ে বনওয়ারীকে সচেতন ক'রে ডাকলে—ব্যানো—ব্যানো। পাথর, পাথর পড়বে। ব্যানো।

—পাথর ?

—হ্যাঁ, পাথর।

বৃষ্টি অত্যন্ত মৃদু হয়ে এসেছে। দুটি চারটি কুচি শিল পড়তেও শুরু করেছে।

—ঘরকে চল। পাগল বনওয়ারীর হাত ধ'রে টানছে। বনওয়ারী হাত ছাড়িয়ে নিলে।—পাপ করালী। ছাড় পাগল, হাত ছাড়। আগে হে বাবাঠাকুর—ক্ষমা কর তুমি। মাজ্জনা কর।

পাগল টেনে বনওয়ারীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দেখতে দেখতে শিলাবৃষ্টি প্রবল হয়ে উঠল। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে উঠানে নেমে শিলের টুকরো কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করলে, প্রবীণেরা তাদের ধমক দিয়ে উপরে তুললে। ' য়েরা ছুটে গেল নীল বাঁধের ঘাটে। নীলের বাঁধের জলে আছে হাঁসগুলো। মরবে। ওগুলে, হয়তো মরবে। জলে ডুবে অবশ্য ওরা থাকতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে ?

—আয়—আয়—কোর—কোর—কোর। আয়—কোর কোর কোর। তি—তি—তি। চমকে উঠল বনওয়ারী একটি কণ্ঠস্বরে। কালোবউ। কালোবউ দুটো হাঁস বগলে নিয়ে বক্রকটাক্ষ হেনে চ'লে গেল। যাক। ও ভাবনার সময় নাই বনওয়ারীর।

পাগল বললে—ভাগ্য ভাল, ছাগলগুলো ঘরে ঢুকেছে। পাগলের পাশেই ব্যানোর ছাগল চারটে দাঁড়িয়ে জল ঝাড়ছে মধ্যে মধ্যে। রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে রোমন্থন করছে।

শিল পড়ছে অজস্রধারে, ক্রমশ মোটা হচ্ছে আকারে। ঝরঝর শব্দে পড়ছে। চালে ধুপ-ধুপ শব্দ হচ্ছে। জলে চড়-চড় শব্দ উঠছে। নীলবাঁধের পদ্মপাতাগুলো ফুটে-ফেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কাহারেরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখছে শিলাবৃষ্টি। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত থেমে এসেছে। মাঠঘাট ঘরের চাল সব শিলার খণ্ডে ছেয়ে সাদা হয়ে গেল।

*　　*　　*

ঝড়বৃষ্টি শিলাবর্ষণে লণ্ডভণ্ড ক'রে ঘণ্টা দুয়েক পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কালবৈশাখী থেমে গেল। অস্ত যাবার মুখে সূর্যও দেখা দিলে। লাল হয়ে গেল আকাশটা।

ঝড়বৃষ্টির পরে কাহারপাড়ার মেয়েরা ছেলেরা ছুটল বন-বাদাড় খুঁজতে। কোথায় ডাল ভেঙেছে, পালা ভেঙে তালগাছের শুকনো পাতা খসেছে। কুড়িয়ে আনতে হবে। প্রবীণ-প্রবীণারা ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লাগল। খড়-কুটোতে ঝড়ে শিলে ছিঁড়ে খ'সে-পড়া গাছের কাঁচা পাতায় উঠোন ছেয়ে গিয়েছে।

নসুবালা সুচাঁদ কাঁদছে তারস্বরে। হাঁসুলী বাঁকের নিয়ম। বসন মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে।

ওদিকে নয়ানের মা এখনও ধেই ধেই ক'রে নাচছে। ওর ঘরের চালও আধখানা উড়েছে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

পাখী করালীকে বলছে -শোন শোন কি বলছে হারামজাদী। অর্থাৎ নয়ানের মা।

করালী একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে চালশূন্য ঘরখানার দিকে। মধ্যে মধ্যে বলছে শালো।—শালো। শালো, নিলি নিলি, আমার ঘরটাই নিলি?

পাগল এসে দাঁড়াল।

করালী বললে—দেখ।

—দেখলাম।

—শালো, আমার উপর দিয়েই গেল হে ঝড়টা।

—পাথর-টাথর বাজে নাই তো?

বেশ হেসে উঠল করালী। বললে—সে এক কাণ্ড। ঘরের মধ্যে খাটিয়ার তলায় গরুর মত—। হো-হো ক'রে হেসে উঠল করালী। বললে—পাখী কিছুতে ঢুকবে না। টেনে, বুয়েচ কি না; হেঁচড়ে ঢোকালাম। তা'পরেতে খট-খট পট-পট—ওঃ।

মাথলা নটবর এল। মাথলা বললে—আঃ, এমন সুন্দর ক'রে ঘরখানা সাজালে—

—দূর শালো। আবার করব। শালোর চালকে এবার লোহার তার দিয়ে বাঁধেঙ্গা। দেখ না।

তারপর বসল ওদের মজলিস। করালীর মজলিস।

পাগল ধীরে ধীরে অনেক বুঝালে করালীকে। বনওয়ারীর কথা তার মনে লেগেছে। শেষে বললে—বনওয়ারী একটা কথা দামী বলছে। বললে, টাকা দিয়ে যদি কেউ বলে—জাতটি দাও, দেবে তুমি?

হো-হো ক'রে হেসে উঠল করালী। বললে—জাত? জাত লেয় কে? তার ঘর কোন্‌খানে? বলি, জাত মারে কে?

—জাত মারে কে। অবাক হয়ে গেল পাগল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। জাত মারে কে? জাত। জাত যায় পরের এঁটো খেলে, কুড়োলে। ছোঁয়া খেলে যায় না। জাত ওদের গিয়েছে. আমার যায় নাই। বুয়েচ? আমার জাত মারে কে?

পাগল ঘাড় নেড়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল কথাটা। কথাটার মানে নাই, কিন্তু কথাটা কথার মত কথা বটে। ডাকাবুকোর কথা, জবরদস্তের কথা। বেশ কথা।

একজন এসে ডাকলে বাইরে থেকে।—পাগলদাদা, মাতব্বর ডাকছে।

—কেনে রে? এই তো এলাম।

—মিত্তি-গোপালপুরের মিত্তি মশায়ের ঘরের নোক এসেছে। বিয়ে। দুখানা পাল্কীর কাহার চাই। আইবিশের দল চাই।

চার

'ঘোড়াগোত্ত' কাহারদের ডাক এসেছে। বর-কনের পাল্কী বহন করতে হবে। ইনাম বকশিশ—কাপড়, পুরানো জামা, মদ, পেটভ'রে লুচিমণ্ডা। যেতে হবে বইকি। তারা যাবে। আটপৌরেদের 'রাইবেঁশে'র দল আছে, ওদেরও নিয়ে যাবে। আলাদা হ'লে ওরাও কাহার, তারাও কাহার। পরমকে বলা যাক। পরমের ঘরে কালোশশীকেও একবার দেখে আসা হবে।

এই খানিক আগে, শিলনির্মাণের সময়ে কালোশশী এসেছিল নীলবাঁধ থেকে হাঁস তুলে নিতে। যাবার সময়ে বক্র-কটাক্ষ ক'রে গিয়েছে। সম্ভবত রাগ করেছে সে রাগ হবারই কথা। বনওয়ারীরই মধ্যে মধ্যে রাগ ধরে নিজের উপর। মাতব্বরির পদ মনে হয় যেন আগুনে তপ্ত শালের উনোনের খবরদারির আসন। মাতব্বর যদি সে না হ'ত, কালোশশীকে নিয়ে এই বয়সেই সে চ'লে যেত দেশান্তরের কাহার-সমাজে তাকে সাঙা ক'রে ঘর বাঁধত শুধু মাতব্বরির জন্য। ভাবতে ভাবতে নিজেই শিউরে ওঠে বনওয়ারী। বহু ভাগ্যের মনুষ্যজন্ম পেয়েও পূর্বজন্মের হীন কর্মের জন্য নীচকুলে জন্ম হয়েছে, ঘোড়াগত্ত কাহার, মানুষ হয়েও ঘোড়ার মত উচ্চকুলের মানুষদের বহন করতে হয়, পাল্কীর ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে, ঘাঁটা পড়ে সেখানে। বাঁকা বইতে হয়। মনিববাড়ির মরা গরু মোষ কুকুর বিড়াল ফেলতে হয়েছে এককালে—কালের গুণে বহু কষ্টে বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলেই তা থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু চরণের তলে তো থাকতেই হবে চিরকাল। এসব পূর্বজন্মের ফল। আবার এজন্মে মন্দ কাজ ক'রে কাহার থেকেও নীচকুলে জন্মাবে? কালারুদ্দের চড়কের পাটায় সে চেপেছে এবার। চড়ক-পাটার লোহার কাঁটায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে ডেকেছে বাবাকে। বাবা দয়া করেছেন, আবার সে পাপ করবে? আবার? না। না। ক্ষমা কর, প্রভু, ক্ষমা কর।

কিন্তু দেখতে, দেখা করতে দোষ কি? তাতে তো পাপ নাই? কালোশশীকে দেখবে। বুঝিয়ে বলবে তাকে—এ জনমে হ'ল না ভাই, আসছে জনমে যাতে তুমি পাও আমাকে, আমি পাই তোমাকে—তার লেগে বাবার থানে দু বেলা পেনাম ক'রো। কালারুদ্দের থানে

বটগাছের নামালে ঢেলা বাঁধো। আমিও তাই করব। আর মনের আগুনে পোড়ো, আমিও পুড়ি, পুড়ে পুড়ে খাঁটি হই, জ্বলুক। দিবানিশি কুলকাঠের 'আঙোরা'র মত ভালবাসার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলুক। ওই পুণ্যেই পাব আমরা দুজন দুজনকে।

রতন প্রহ্লাদ এবং ছোকরারাও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠছে। অনেক দিন পর মোটা পাওনার ভাল বায়না এসেছে। উৎসাহে সদ্য এতবড় ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির কথা ভুলে গিয়েছে। 'বাত' অর্থাৎ আবহাওয়া হয়েছে ভাল। এই জল এবং শিলাবৃষ্টির পরদিন হবে ঠাণ্ডা। ওদিকে মাঠে হয়েছে কাদা, সেখানে কাজ নাই। মুনিবদের চাল ভিজে ডব-ডব করছে, ও চালে এখন কদিন চাপা যাবে না, 'নিশ্চিন্দি' অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চল সব।

মিত্র-গোপালপুরে কায়স্থ মহাশয়দের উন্নতির অবস্থা। জাঙলের ঘোষ মহাশয়ের চেয়েও বাড়বাড়ন্ত। তাদের ছেলের বিয়ে। ধুমধামের বিয়ে। 'বেলাতী বাজনা', 'গড়ের বাদ্যি' ঢোল সানাই রসুনচৌকি, খ্যামটা নাচ, রায়বেঁশে—সে অনেক কাণ্ড। কাহারদেব কপাল ভাল - বিয়ে রেলরাস্তায় নয়, গাঁয়ের পথে। আট আট ষোল বেহারার দুখানা পাল্কী যাবে। লুচি মিষ্টি পোলাও মাছ মাংস, পেট পুরে খাওয়া—থমথমে অথচ চরণ ঠিক রাখা। তারপর সঙ্গে বিড়ি সিগারেট, ভাল কাষ্টগড়ার তামাক—মধুর মধুর গন্ধ, এ তো কাহারেরা ম'রে স্বর্গে গেলেও পাবে না। তার উপর প্রতিজনের এক-একখানা লাল গামছা কনের বাড়ির বকশিশ।

বরের বাড়ির বিদায়। এ কি ছাড়া চলে ? আর কাহারেরা ছাড়লেই বা মিত্র মহাশয়েরা শুনবেন কেন ? আর তো কলের গাড়ি—মোটর গাড়ির আমদানি হয়ে কাহারদের রেহাইই দিয়েছেন ওঁরা, নেহাত কাঁচাপথ হ'লেই ডাকেন। এ না করলে চলবে কেন ? এই পথের জন্যেই পাল্কীকাহার চাই, নইলে মিত্র মহাশয়রা ভাড়ার মোটর, বাস-মোটব আনতেন।

আট ক্রোশ ক'বে ষোল ক্রোশ পথ। খানিকটা পাকা, তারপর ক্রোশ ছয়েক কাঁচা গরুর গাড়ির পথ—মাঝখানে খানিকটা আলপথ।

পাল্কী নইলে উপায় নাই। কাহারদের সৌভাগ্য।

পাগল আসতেই তার পিঠ চাপড়ে বনওয়ারী বললে—যেতে হবে সেঙাত। শুনেছ তো ?

পাগলের খুব ইচ্ছে নাই, তবুও সে বললে—চল। আজই সকালে কুলকম্ম নিয়ে বনওয়ারী তাকে যে সব কথা বলেছে, তাতে 'না' বললে বিচ্ছেদ হবে হয়তো।

—নাচ খানিক, নাচ।

পাগল নাচলে না। ব'সে পড়ল দাওয়ার উপর। তার মনে এখনও ঘুরছে করালীর কথা। তা ছোকরা খুব জবরদস্ত কথা বলছে—জাত মারে কে ? তার ঘর কোথা ? বটে, কথা ঠিক বটে। তুমি যদি ঠিক থাকো তো জাত মারে কে ? আবার বনওয়ারীর কথাও ফেলনা নয়, পিতিপুরুষের কথা। সে ভাবছে।

বনওয়ারী পাগলের ভাবগতিক দেখে বিস্মিত হ'ল। বললে—তোর হ'ল কি বল দিনি ?

—বলব। গোপনে বলব। কঠিন কথা। বুয়েচ ? মাথা ঘুরে যাবে।

বনওয়ারীর প্রাণে আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে। পাগলের কথায় সে খুব চিন্তিত হ'ল না; সেই পাগল তো। তার উপর করালীর ঘর উড়ে যাওয়ার পর, করালীর দম্ভের কথা সে ভাবতেই পারে না। করালীর ঘরখানা উড়ে যাওয়ায় দুঃখ হ'লেও সে খুশি

হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখও হয়েছে, খুশিও হয়েছে। দুঃখ—ঘরখানা, এমন ঘরখানা, গেল। খুশি—ফাঁড়া কেটেছে, পাপের অপরাধের দণ্ড ওই ঘরখানার চালের উপর দিয়ে গিয়েছে। সে তো চোখে দেখেছে মেঘের মধ্যে বাবার বাহনের রূপ। যাক, ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। এবং মনে মনে ধারণাও হয়েছে যে, করালীচরণ নিশ্চয় মনে মনে বুঝছেন। বাবাধন আজই উঠেছিলেন বাবাঠাকুরের আদ্যিকালের শিমূলবৃক্ষে। অনেক উঁচুতে উঠে খুব উঁচু হয়েছেন ভেবেছিলেন। তা এক ঝাপটে শাসনের নমুনা খানিকটা দেখিয়ে দিলেন বাবা ; এবং এটাও নিশ্চয় যে, এই বনওয়ারী যদি বাবাঠাকুরকে না সন্তুষ্ট ক'রত, তবে করালী এত অল্পে রেহাই পেত না। হয়ত বজ্রাঘাতই হয়ে যেত আজ।

সে চ'লে গেল আটপৌরেপাড়ার দিকে। পরমের উঠানে গলার সাড়া দিয়ে ডাকল—পরম। পরম রইছিস ?

বেরিয়ে এল কালোশশী। পিচ কেটে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ও বাবা। পুণ্যিবান মাতব্বর। কি হে ?

ভুরু নাচিয়ে ইশারা ক'রে বনওয়ারী প্রশ্ন করলে—কই ? সে কোথায় ? অর্থাৎ পরম।

বিচিত্র হাসি হেসে কালোবউ বললে—কে জানে ? হয়তো পেনয়িণীর বাড়িতে। তা তুমি ? তুমি কি মনে ক'রে ? পথ ভুলে ?

কিছুদিন আগের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল বনওয়ারীর, সে বললে—পুণ্যির ভাগ দেবার কথা ছিল ভাই, তাই ভাগ এনেছি।

উত্তরে রসিকতা না ক'রে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে কালোশশী চাপা গলায় বললে—আসছে।

—পরম ? ঘুরে তাকাল বনওয়ারী। পরম বেশ মদ খেয়েছে। টলতে টলতে আসছে।

—ক্যা ? ক্যা রে ? কোন শালো ?

গম্ভীর স্বরে বনওয়ারী বললে—আমি রে পরম।

—তুমি ক্যা রে ? আমিও তো আমি রে।

—আমি বনওয়ারী।

—বনওয়ারী ?

—হ্যাঁ। মিত্তি-গোপালপুরের বিয়ের বায়না এয়েচে। কাহার, আটবশে চাই। তাই খবর দিতে এয়েচি।

—হুঁ। মিত্তি-গোপালপুর ? খুব ধুম। লয় ?

—হ্যাঁ। তা যাবি তো ?

—তা যাব। কিন্তুক—

—কি ?

—তোর সঙ্গে আমার—বুল্লি কিনা, আমার একটা কাজ আছে।

—কি কাজ ?

—আছে। আছে। বুল্লি কিনা, খুব দরকারী কাজ। তা—।

—বল্ কেনে ?

—উঁ-হুঁ। বলব, সে একদিন বলব। বুয়েছিস? বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলব। তা আজ লয়। বিয়েটা সেরে আসি, বুল্লি। কি বল?

—বেশ, তাই বলিস।

বনওয়ারী ফিরল। এই সব পেঁচি মাতালের সঙ্গে তার বনে না। মদ খাবে—মদ কাহারদের পোষ্টাই, তা খাও, কিন্তু টললে চলবে কেনে? পেঁচি মাতাল। কিন্তু এদিকে আবার সামনে কে?

সে হাঁকলে—কে?

—আমি।

—কে তু?

—আমি পানু—পানকেষ্ট।

—পানা? পা থেকে মাথায় রক্ত উঠতে লাগল বনওয়ারীর।—তু এখানে?

—মুনিব-বাড়ি যেয়েছিলাম। বাড়ি যেছি।

—হুঁ। বুঝেছে বনওয়ারী। পানা এখনও পাক দিচ্ছে সুতোয়। দে, তা দে। বনওয়ারী ভয় করে না।

পানু বললে—তুমি? পরমের ঘর আইছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। বায়না আছে আইবেশের। মিত্তিবাড়িতে।

—তুমি সিরগাটটি খাও। আমার মুনিবের ছেলে স্কুলে পড়ে তো, সিরগাট খায়। আজ পকেট থেকে বার ক'রে একেছিল কুলুঙ্গীতে, আমি এক ফাঁকে, বুল্লে কিনা—। হাসতে লাগল পানা। আবার বললে—তা চুরি করাই সার হ'ল। দুটির বেশি ছিল না বাস্কতে। আমি একটি খাব, তুমি একটি খাও।

নিমতেলে পানু ভেতরে তেতো, বাইরে মিষ্টি। বিলাতী নিমের কথা শুনেছে বনওয়ারী, ও সেই বিলাতী নিম। পানু হেসে বললে—ধর্মের কল বাতাসে ল'ড়ে গেল। পিতিফল হয়ে গেল।

বনওয়ারী কোন উত্তর দিলে না।

পানু ব'লেই গেল—ঘর উড়ল করালীর। এত বড় সহ্য হবে কেনে? লতুন ছাওয়ানো ঘর। বাবাঠাকুরের কোধ। একটু চুপ করে থেকে বললে—বাবাঠাকুর ওকে লেবেন, বুয়েচ? এ আমি নিশ্চয় বললাম। তার পমাণ আমি পেয়েছি।

অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা দূর থেকে কে উত্তর দিয়ে উঠল—তা আবার পাবি না? তু ব'লে কত পুণ্যাত্মা, কত তোর সাধনভজন, তু আবার পমাণ পাবি না? বলে, সেই পুণ্যির ছটায় আনারে আলো হয়। নখে তোর তিন কাল, চোখের দিষ্টিতে বক মরে, ঝুলিতে তোর সিঁদকাঠি—তু আবার পমাণ পাবি না?

নসুবালা। কণ্ঠস্বর আর কথার ভঙ্গিতে চিনতে দেরি হ'ল না নসুবালাকে। পানু চুপ ক'রে গেল। বনওয়ারী বললে—নসু?

—হ্যাঁ। নসুবালাই বটি আমি।

—কোথা যাবি?

—মিত্তিবাড়ি চললাম। ওদের লোক পেয়েছি, চ'লে যেছি।

মিত্র-বাড়ির যে লোক বায়না দিতে এসেছে, তারই সঙ্গে নসুবালা চলেছে। মিত্র-বাড়ি। এ অঞ্চলে বিয়ে-বাড়িতে নসুবালার বাঁধা নিমন্ত্রণ। ও নিজেই নেয় নিমন্ত্রণ। গিয়ে হাজির হয়। পরনে মেয়ের সাজ, নাকে নথ, মাথায় খোঁপা, গায়ে গয়না, কাঁধে ঝুড়ি। গিয়ে ঝুড়িটি রেখে প্রণাম ক'রে বলে—এয়োদের মঙ্গল হোক। এলাম মাঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণরা। এঁটোকোঁটা ফেলব, পাট-কাম করব, গান শোনাব, নাচব। যাবার সময় একখানি শাড়ি লোব, খাবার লোব, গুণগান ক'রে নাচতে নাচতে বাড়ি যাব।

নসু তাই চলেছে। বনওয়ারী হাসলে। পানা পালাচ্ছে হনহন ক'রে। নসুবালার তা চোখ এড়াল না। সে তার সিগারেটের আগুনটাকে চলতে দেখে বুঝতে পারছে। সে বললে—আজ ঘর উড়েছে, কাল হবে। বলেছে, এবার লোহার তার দিয়ে বাঁধেঙ্গা। বুঝলি রে সিঁড়িঙ্গি।

পরের দিনই করালী ঘর মেরামতের আয়োজনে লেগে গেল। ভোরে উঠেই চ'লে গেল চন্ননপুর, সেখান থেকে দু দিনের ছুটি নিয়ে ট্রেনে কাটোয়া গিয়ে ফিরল বিকেলে। ফিরল একেবারে ছুতোর মিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে। শুধু আপসোস হ'ল, বনওয়ারী বাড়িতে নাই। থাকলে দেখিয়ে দিত চন্ননপুরের কারখানার কাজ করার মুরদটা। ওরাও সব আজ খেয়েদেয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে মিত্তির-গোপালপুর বিয়ের পাল্কী বইতে। সুচাঁদ বললে—উ কি আমার যে-সে লোক। মোটা চাকরি করে। সায়েব হ'ল মুনিব। সেকালে কুঠীর সায়েবেরা মুনিব ছিল, তখনকার কাহারদের মত ভাগ্যি আমার করালীর।

করালী এ কথাতে চ'টে গেল।—বেশি বকিস না। সায়েবদের পাল্কী বহন করি না আমি।

সুচাঁদ বুঝতে পারে না, করালীর এতে রাগ করার কি আছে। এ নিয়ে ঝগড়াও একটা বাধতে পারত, কিন্তু করালীই ক্ষান্ত হ'ল। নিজের যুক্তির মধ্যেই জোর পায় না করালী। পাল্কী না বইলেও এই সেদিন ছোট একটা খালের ঘাটে তাকে দশজন সাহেবকে কাঁধে তুলে পার করতে হয়েছে। যুদ্ধের জন্য সায়েব এসেছে অনেক।

উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক হয়ে গেল। পরের দিন কিনে-কেটে নিয়েও এল সব। কিন্তু করালীর সবই আশ্চর্য। নতুন বাঁশ কেটে দড়ি কিনে খড় কিনে পুনরায় চাল তৈরি করবার ঠিকঠাক ক'রে সে হঠাৎ ঘোষণা ক'রে দিল—উঁহু, থাক্।

—থাকবে কি? এবং কেন? পাখী বললে—মর্ মর্ মর্, ঢঙ দেখে বাঁচি না!

—ঢঙ লয়, ঘরের চাল উড়েছে—ভালই হয়েছে, এবারে 'নেপাট' ক'রে ভেঙে নতুন কোঠাঘর করব।

—কোঠা?

—হ্যাঁ, ওপরে শোব। নামোতে আন্না হবে, হাঁড়িকুঁড়ি থাকবে।

পাখী আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল করালীর মুখের দিকে। লোকজন বিদায় হতেই সে ছুটে এসে দুই হাতে করালীর গলা জড়িয়ে ধ'রে পা গুটিয়ে ঝুলতে

লাগল মহানন্দে।

করালী অনেক ভাবলে, গবেষণা করলে, বললে—ঘর করব পূবদুয়ারী, পচি বাগে থাকবে সিঁড়ি। দখিন দিকে আর পূব দিকে দুটো 'বারজালা' হবে। ইস্টিশান থেকে নোয়ার তার আনব, ইস্টিশানের টিনের ঘরে কোণে কোণে যেমন তার দিয়ে বেঁধে মাটিতে খুঁটো পুঁতে বাঁধন দিয়ে টান দেয়, তেমনি টান দোব। দেখি, বেটার ঝড় এবার কি ক'রে ঘর ওড়ায়?

পাখীর নাচবার কথাই। পাখী সত্যই নাচল। নসুবালা নাই, সে গিয়েছে বিয়ে-বাড়ি নাচতে, এঁটো পরিষ্কার করতে। সে থাকলে ছড়া কেটে কোমর ঘুরিয়ে নাচত। বসন ভালমানুষ লোক, উচ্ছ্বসিত হওয়া তার স্বভাব নয়, সে শুধু হাসলে। সুচাঁদ প্রথমটা হাসলে, ছড়া কাটলে, তারপর কাঁদলে পাখীর বাপের নাম ক'রে—তুই কোথা গেলি বাবা, দেখে যা রে, পাখীর কোঠা হবে রে।

লোকে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হাঁসুলী বাঁকের ঘর ঝড়ে উড়লে বা আগুনে পুড়লে লোক ঘরের দেওয়াল অবশ্য আধ হাত এক হাত উঁচু ক'রে চাল তোলে, কেউ কেউ উপরের নতুন দেওয়ালে হাঁড়ির মুখ বসিয়ে একটু-আধটু বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা ক'রে নেয়। বানে ঘর পড়ে গেলে নতুন ক'রে পছন্দমত ঘর তৈরি ক'রে ছোটখাটো জানালাও রাখে, ঘরদোর হয়ে গেলে বলে—মা-কোপাইয়ের দয়াতে এ এক রকম ভালই হয়েছে।

যাদের ভাঙে নাই, তারা আপসোস ক'রে বলে—আমার ঘরখানা পডলে বাঁচতাম। শুধু একপাট দ্যাল প'ড়েই ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অইল যি।

সেই সায়েবডোবা চৌধুরী-বাড়িতে মা-লক্ষ্মী এসেছিলেন বানে, সেই বানে গোটা কাহারপাড়া ভেঙেছিল। সেবার নতুন ক'রে হয়েছিল কাহারপাড়া। তার আগে নাকি কাহারপাড়ার ঘরগুলিতে কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সেবার নতুন ক'রে কাহারপাড়া তৈরি হ'ল, ঘরগুলি বর্তমানের আয়তন পেয়েছিল। এখন মাঝখানে মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু চার কোণে এখনও মাথা ঠেকে যায়। এখন কাহারপাড়ার যে বড ঘরগুলি দেখা যায়, সেগুলি সবই বানে ভেঙে যাওয়ায় ওই মা-কোপাইয়ের দয়ায় হয়েছে। সেগুলির কোণেও আর মাথা ঠেকে যায় না, দেওয়ালে উপর দিকে ছোট জানলাও আছে। কিন্তু করালীর এ যে বিষম কাণ্ড। ঝড়ে ঘরের চাল উড়ল, দেওয়াল খাড়া আছে, সেই দেওয়াল খরচ ক'রে ভেঙে নতুন ঘর। তাও আবার কোঠাঘর। যা কখনও কাহারপাড়ায় হয় নাই?

বসন করালীকে ডেকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলে—বাবা, কোঠাঘরে খরচা অ্যানেক। তা—

করালী তাকে অভয় দিলে—তার লেগে তুমি ভেবো না।

বসন পাখীকে জিজ্ঞাসা করলে—হাঁ লো, টাকা কসগুলি আছে বল্ দিনি?

—লবডঙ্কা।

—তবে?

—ধার করবে। ইস্টিশানে একজনা টাকা ধার দেঁয়।

—ও মা গো। বসন শিউরে উঠল।—ধার করবে কি লো?

—হ্যাঁ। হপ্তা হপ্তা সুদ মিটিয়ে দেবে। আর কিছু কিছু আসল দিয়ে শোধ করবে।

অবাক হয়ে গেল বসন। আবার সে গেল করালীর কাছে। করালী তাকে জলের মত বুঝিয়ে দিলে। চন্নপুর ইস্টিশানে একজন মাড়োয়ারী আছে, সে গোটা ছোট লাইন বরাবর লাইনের বাবু থেকে আরম্ভ ক'রে কুলীদের পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। টাকায় নেয় এক আনা হিসাবে সুদ, সপ্তাহে সপ্তাহে এক পয়সা হিসেবে টাকায় সুদ সে আদায় নেয়। মাসের শেষে কিছু ক'রে আসলে উসুল চায়। দিতে পার ভাল, না পার তম্বি নাই। আর তিন মাসের মাসে আসলে উসুল কিছু চাই-ই। করালী তার কাছেই একশো টাকা নেবে। সপ্তাহে তার রোজ এখন আট টাকা চার আনা—ইস্টিশানে দুটো-চারটে মাল বয়, তাতেও টাকা দুয়েক হয়। এই দশ টাকা চার আনা থেকে সপ্তাহে সুদ তাকে দিতে হবে এক টাকা 'ল' আনা। থাকবে আট টাকা এগারো আনা। মহাজন মাড়োয়ারী বলেছে, ও থেকে যদি করালী সপ্তাহে আড়াই টাকা হিসেবে আসলে উসুল দিয়ে যায় তো মোটা হিসেবে দশ মাসে একশো টাকা শোধ হয়—সূক্ষ্ম হিসেব সে পরে ক'রে দেবে। এবং সে হিসেব সে মাস্টারবাবুকে দিয়ে যাচাই ক'রেও নেবে। বিশ্বাস না হ'লে শাশুড়ী মাথলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারে, সেও চাল তৈরি করবার জন্য তার কাছে তিরিশ টাকা ধার নিচ্ছে। নটবরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। মাথলা নটবর এরা এখন চাষ ছেড়ে লাইনের কাজে ঢুকেছে।

বসন আরও অবাক হয়ে গেল। এমন ধারার লেন-দেনের কথা সে কখনও শোনে নাই। হাঁসুলীব বাঁকের উপকথায় এ হিসেব—এ কারবার নতুন। জাঙলের মণ্ডল মহাশয়দের সঙ্গে কাববার তাদের অন্যরকম। ধান নেয়। এক মণ নিলে দেড় মণ দিতে হয়, শোধ না গেলে সুদে আসলে এক হয়ে আবার সুদ টানে। টাকা নেয়, ধার নয়—দাদন। সারের উপর দাদন, দুধের উপর দাদন। নগদ সার বেচাকেনা হয় টাকায় তিন গাড়ি, চার গাড়ি, চাব গাড়ি দরেব সারের দাদনের দর—সাড়ে পাঁচ গাড়ি। টাকায় ষোল সের দুধ, দাদন নিলে দুধের দর দিতে হয় টাকায় বাইশ সের। পাঁচ টাকার উপর দাদন হ'লে দর দিতে হয় চব্বিশ সের। দশ টাকার বেশি দাদনই নাই। ঘটি, বাটি, রুপোর গয়নাও দু-এক পদ বাঁধা দিতে হয় কঠিন বিপদে। তার হিসেব অত্যন্ত জটিল, সে ওরা বুঝতে পারে না, বুঝতেও চায় না, কারণ সে আর কখনও ফেরে না। সুতরাং এমন লেনদেনের কারবার বসনের কাছে পরমাশ্চর্যের কথা।

পৃথিবীতে যা আশ্চর্য, তাই হাঁসুলী বাকে ভয়ের বস্তু। আশ্চর্যকে ঘেঁটে দেখে তার স্বরূপ নির্ণয় করার মত বুদ্ধির তাগিদ ওদের নাই। যদি বা আদিকালে কখনও ছিল, বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে তা ম'রে গেছে। সাহেব সদগোপ বাবুদের শাসন ঠেলে কখনও তা কঠিন এবং ধারালো হয়ে আশ্চর্যকে ভেদ ক'রে ছেদ ক'রে দেখবার মত নির্ভয় বিক্রম লাভ করতে পারে নাই। বসন তাই শঙ্কিত হয়ে উঠল এ প্রস্তাবে। সারাদিন চিন্তা ক'রে সে কোন উপায় দেখতে পেলে না করালীকে নিরস্ত করবার। অবশেষে মনে পড়ল বনওয়ারীকে। সন্ধ্যায় করালীকে ডেকে সে বললে—আমি বলি কি বাবা, আজ কাল দুটো দিন সবুর কর।

করালী আজই কাজ শুরু করতে বদ্ধপরিকর। পুরানো ঘরখানাকে সে তার বন্ধু দুজনকে নিয়ে ভেঙে ফেলতে চায়। সে বললে—সবুর কেনে? কিসের সবুর?

—এই বনওয়ারীদাদা, অতনদাদা, পেল্লাদদাদা—এরা ফিরে আসুক। এদের সব শুদিয়ে-আবিয়ে যা বলবে সবাই, তাই করবে।

করালী হেসেই খুন—আমি ঘর করব তা শুধাব কাকে?

—শুধাতে হয়। মাতব্বরকে তো শুধাতে হবে। একটা রনুমতি নিতে হয়। বিয়েসাদীর মতন এটাও তো শুভকাজ।

—উঁহু, রনুমতি আমার লেখা আছে, হঠাৎ হেসে সে বললে—রনুমতি? কার রনুমতি, কিসের রনুমতি? আমি করব ঘর, আর রনুমতি দেবে মাতব্বর। উঁহু। লে, লে, চালা গাঁইতি। সে নিজেই দেওয়ালে উঠে কোপাতে লাগল।

আশ্চর্যের কথা, ঠিক সময় ছুটতে ছুটতে সুচাঁদ এল, হাঁপাচ্ছিল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—না না না। কোঠাবাড়ি করতে পাবি না—পাবি না—পাবি না।

—যা ম'ল। তু আবার সঙ করতে এলি কেনে?

—ওরে কেউ কখনও করে নাই। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর করলে তু ম'রে যাবি। সইবে না। সুচাঁদ গিয়েছিল গুগলি তুলতে, সেই পুকুরের জলে গুগলি খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়েছে কথাটা, যা পিতিপুরুষে করে না, তা করতে নাই। সয় না। সহ্য হয় না। মানুষ ম'রে যায়।

সুচাঁদ কাঁদতে লাগল। কথাটা বসন্তের মনে হ'ল। সেও শিউরে উঠল।

সুচাঁদের কথার কোন জবাবই দিলে না করালী। সে ভাঙতে লাগল ঘর। আঃ, বনওয়ারী কবে ফিরবে।

* * *

মাথলা নটবর এরাও মুখ ফুটে ব'লে ফেললে—হ্যাঁ ভাই, মাতব্বরকে একবার শুধাবি না? সে এসে যদি আগ-টাগ করে?

করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলোকে পিছনে ফেলে দিয়ে বললে—আগ করে ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাবে। মাতব্বর কে রে? আমার মাতব্বর আমি। তারপর হঠাৎ বললে—চল।

—কোথা?

—চল্। আজ আবার শিমূলগাছে উঠব। সেদিন গাছে উঠেছিলাম ব'লে নাকি ঝড়ে আমার ঘর উড়েছে। আজ আবার গাছে উঠব। আজ কি হবে হোক।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলল। মাথলারা সভয়ে অনুসরণ করলে। না ক'রে উপায় নাই। করালী এখন ওদের সর্দার যে। চন্নপুরে ওর তাঁবেই বেচারাদের খাটতে হয়।

করালী বললে—ভাল করলে মন্দ হয় কিনা। চন্ননপুরে তারে খবর এল—পেচণ্ড ঝড় আসছে। তুদিকে পেলাম না, ছুটে গাঁয়ে এলাম—গেরাম সাবধান করতে। এসে দেখি, গাঁয়ের মরদরা সব জাঙল গিয়েছে ঘোষেদের ঘর ছাওয়াতে। কি করি? আকাশ দেখি

কালচে হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, চারদিকে ঝোপের আড়ালে চালে ব'সে ঠাওর পায় নাই। উঠে পড়লাম শিরীষ গাছে। উঠে দেখি, পুঁচি দিকে—অঃ, সে কি ঘটা, কি বলব মাইরি। তা শিরীষ গাছটা তো খুব উঁচু লয়, দেখে সুখ হ'ল না। তখন উঠে পড়লাম ওই গাছটাতে। বলিহারি। বলিহারি। সে আচ্ছা বাহার হয়েছিল।

নটবর বললে—হয়েছিল, দেখেছিলি, বেশ করেছিলি। আজ আর থাক। কাজ কি দেবতার গাছে উঠে?

শিমূলগাছটার কাণ্ডটা বিশাল, ওটাকে আঁকড়ে ধ'রে ওঠা অসম্ভব। করালী কাণ্ডটার গায়ের কোটর ধ'রে উঠতে শুরু ক'রে দিলে। উপরে প্রথম ডালটায় উঠে নটবরের দিকে থুথু ফেলে বললে—ভাগ শালা।

তারপর বললে—বাঃ, এখান থেকে দয়ে ঝাঁপ দিতে ভারি সুবিধে মাইরি।

—এই, এই, দয়ে কুমীর আছে, বাবাঠাকুর আছে।

—তা বটে। কুমীর থাকতে পা'রে।

দয়ে ঝাঁপ খাওয়া মুলতুবী রেখে উপরের দিকে উঠতে লাগল সে। উঠে সে আজ আবার হাঁক মারলে—হো—

অর্থাৎ দেখ, দেখ, আবার আমি উঠেছি শিমূলগাছে—

গোটা কাহারপাড়া সে হাঁক শুনে গাছের দিকে সভয়-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

পাঁচ

বিয়ের পাল্কীবহন দু দিনের আমোদ। কোন কোন বিয়েতে তিন দিনও লাগে—সে খুব দূর পথ হ'লে। গায়ে-হলুদের দিনই বর রওনা হয়, কনে-বাড়িতে হয় নান্দীমুখ। নইলে রওনা বিয়ের দিন। বিয়ের দিবসে বর নিয়ে কন্যের বাড়িতে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে—খাওয়া-দাওয়া আমোদ। তার পরের দিন বর নিয়ে বউ নিয়ে আবার সনজে নাগাদ বরের বাড়ি ফেরত-গোষ্ঠ। তার পরেতে বিদেয়, ঘরে ফেরে কাহারেরা এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে দুপুর রাত্রিও হয়ে যায়। গা-গতরে ব্যথা একটু আধটু হয় বইকি, তবু প্রচুর মদের নেশায় হৈ-হৈ ক'রে ফেরে। বিয়েতে দু দিন মদ খায় বটে, কিন্তু বেশি খাওয়া বারণ। পাল্কী কাঁধে পা ঠিক রেখে যেতে হবে—পরস্পরের পায়ে পায়ে পা ফেলে যেতে হবে। এর পায়ে ওর পায়ে ঠোক্কর খেলে পাল্কী নড়বে। পা টললে পাল্কী টলবে। বর-কনের মাথায় ঠোক্কর লাগবে পাল্কীর কাঠে, সে একটা খ্যানত। তারপরেতে রাস্তা, আলপথ, খানা, মেটেপথে চলতে হয়—বেশি নেশা করলে চলবে কেন? তাই ফেরত গোষ্ঠের পর পেট ভ'রে মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে কাহারেরা। পাওনাগণ্ডা ভাগ মদের দোকানে হয়। ঢুকবার আগেই যে যার বুঝে নেয়, নয়তো মাতব্বরের কাছে জমা থাকে, বাড়ি ফিরে পরের দিন নেশা ছুটলে আপন আপন ভাগ নিয়ে আসে। বনওয়ারীর দলের নিয়ম—পরের দিন বুঝে নেওয়া। রতন প্রহ্লাদ প্রভৃতিরা বলে—মানুষ বুঝে কই কথা,

দেবতা বুঝে নই মাথা। অর্থাৎ মাথা নোওয়াই। বনওয়ারীর কাছে টাকা থাকা আর লক্ষ্মীর হাঁড়িতে সিঁদুর মাখিয়ে তুলে রাখায় কোন তফাৎ নাই। বনওয়ারী বলে—পরের ধন কালারুদ্দের কণ্ঠের বিষ : নিজের লোকের জিনিস ফেলে দেবার উপায় নাই, রেখে সোয়াস্তি নাই, পেটে দিলে ইহকাল তো ইহকাল—পরকাল পর্যন্ত জ্বালিয়ে খাক ক'রে দেবে।

পাওনাগণ্ডা মন্দ হ'ল না—ষোলো কাহারে দুখানা পাল্কী, পাল্কী পিছু ষোলো টাকা—অর্থাৎ প্রত্যেকে দু টাকা হিসাবে বিদায়, ষোলো জনে ষোলোখানা গামছা, কনের বাড়িতে বিদায়-বকশিশ পাঁচ টাকা অর্থাৎ পাল্কী পিছু আড়াই টাকা, মদের ইলাম দুখানা পাল্কীতে দু গোলা অর্থাৎ দু জালা মদের মূল্য। পরমের দলও বেশ পেয়েছে—রায়বেশে গিয়েছিল ছ'জন, বকশিশ-বিদায় নিয়ে পেয়েছে বারো টাকা। এ ছাড়া এক গোলা মদ। মদের দিক দিয়ে পরমেরা বেশি পেয়েছে। তাতে বনওয়ারী কাউকে আপত্তি করতে দেয় নাই ; ছি, ও সব হ'ল ছোট নজরের কাণ্ড। পরমেরা খেলা দেখিয়েছে ভাল। হ্যাঁ, লাঠিতে পরম ওস্তাদ বটে, যাকে বলে—একখানা খেল দেখিয়ে দিয়েছে। পাঁচ-পাঁচটা সাকরেদ লাঠি নিয়ে ঘিরলে, পরম পাঁচটাকেই হটিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে এল। দুজনের মাথা ফেটেছে, একজনের আঙুল এমন ছেঁচেছে যে, ভুগবে ছোকরা কয়েক দিন। দু পক্ষের কর্তারা ধরেছিলেন—বনওয়ারীকে ধরতে হবে লাঠি পরমের সঙ্গে। পরমই বলেছে—লাঠি খেলা দেখবেন তো বনওয়ারীকে বলেন। হ্যাঁ, একহাত খেলে সুখ পাই, আপনারাও দেখে সুখ পান। বনওয়ারী হাতজোড় করেছে। লাঠি খেলা সে দেখিয়েছে, কিন্তু একা একা ; রতন প্রহ্লাদের সঙ্গেও দু হাত খেলেছে। কিন্তু পরমের সঙ্গে খেলে নাই। কাজ কি ? দু পাড়ায় রেষারেষি চিরকাল। তা ছাড়া পরম ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, ওকে বিশ্বাস করে না বনওয়ারী। আর কালোশশী আছে মাঝখানে। মনে পড়েছে আটপৌরেপাড়ায় ঘেঁটুগানের কথা। পরমের হাসিটাও ভাল লাগে নাই। যাক, বাবার কৃপায় বিয়েসাদীর কাজ হৈ-হৈ ক'রে ভালয় ভালয় মিটে গেল। আমোদও হ'ল খুব। অনেকদিন এমন আমোদ হয় নাই। পাল্কীতে পাল্কীতে জবর পাল্লা হয়েছে।

যাবার সময় খুব জমে নাই। দুখানা পাল্কীর একখানাতে ছিল বর, একখানিতে ছিল 'গুরুঠাকুর'। জমেছিল আসবার সময়। এক পাল্কীতে বর, এক পাল্কীতে কনে। দুই পাল্কীতে পাল্লা—কে আগে যাবে ? এ পাল্লার আমোদ হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সেই প্রথম কালের আমোদের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে কালে তারা ছিল কুঠির দরবারের গোলাম, যে কালে দেশে বড় বড় বাড়িতে ছিল মতির ঝালর দেওয়া কিংখাবে মোড়া পাল্কী, পাল্কীর ডাঁটে থাকত রূপোর মকর মুখ, কি বাঘের মুখ, কি সিংহের মুখ। কত্তা-গিন্নীর পাল্কী কাঁধে নিয়ে পাল্লা চলত। হাঁসুলী বাঁকের চাকরাণভোগী কাহারদের গায়ে তেজ জাগত, পায়ে দৌড় জাগত—সোয়ারী পিঠে ঘোড়ার মত। সায়েব-মেমকে, কত্তা-গিন্নীকে কাঁধে নিয়ে পাল্লা দিয়ে তালে তালে 'প্লো-হিঁ'—প্লো-হিঁ' শব্দে হাঁক মেরে চারিদিকে 'সোর' জাগিয়ে ছুটত তারা। সে কাল চলে গিয়েছে। এখন ভাঙা পাল্কীর আমল। কাহারদেরও আর চাকরাণ নাই, দেশেও আর সে সব পাল্কী নাই। সে আমলের সে সব পাল্কী-চড়িয়ে কর্তা-গিন্নীও নাই। এ-ই কর্তার চেহারা, পাকি আড়াই মণ ওজন। তেমনি চেহারা গিন্নীর,

দু মণের তো কম নয়, তার উপর গিন্নীর গায়ে গয়না, সেও কোন্ না আধ মণ ওজন হবে। পাল্কী কাঁধে উঠল তো মনে হ'ল, কাঁধ কেটে বসে গেল। এক একজন আবার এর চেয়েও জবরদস্ত হতেন। তাঁকে নিয়ে পাল্কী তুললে মাথা ঝনঝন ক'রে উঠত, বুকের কলিজায় চাপ পড়ত। রসিক বেহারারা নানা বোলের মধ্যে-মাঝে বলত—বাবু বড় ভা—রী। লোকে আজও বেহারার বোলের ঐ লাইনটাই ব'লে থাকে, তারা রসিকতা করে বলে—বেহারারা বলে, শালা বড় ভা—রী। হরি হরি রাধাকৃষ্ণ। তাই পারে বলতে কাহারেরা? এই বিয়েতে অনেককাল পরে দুখানা পাল্কীতে পাল্লা চলেছে। সচরাচর এক পাল্কীতেই বর-কনে আসে আজকাল, তাই পাল্লার সুযোগ মেলে না। মিত্র মহাশয়রা দুখানা পাল্কী করেছিলেন।

আট ক্রোশ পথ মাতিয়ে, পথের ধুলো উড়িয়ে চ'লে এসেছে। চার-চারজন কাঁধ দিয়ে চলেছে এক-এক পাল্কীতে, বাকি চার-চার জন ছুটে এসেছে সঙ্গে। সে প্রায় ঘৌঘুড়ির মত জোরে এসেছে। বর যাবে আগে, কি কনে যাবে আগে? কত্তা আগে, না গিন্নী আগে? 'নক্ষী' আগে, না 'লারায়ণ' আগে? প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। বনওয়ারীর পাল্কীতে বনওয়ারী আছে আর আছে সেই পাগল কাহার, পাল্কীর আগের ডাণ্ডায় প্রথমেই আছে পাগল। সে হাঁসুলীর বাঁকের কাহারপাড়ার আদ্যিকালের গান গাইতে গাইতে এসেছে। গান গাইতে পাগলের জুড়ি কেউ নাই। পাগল গেয়েছে—

—সরাসরি ভাল পথে—

পিছনওয়ালারা হেঁকেছে—প্লো-হিঁ।

—জোর পায়ে চলিব।

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

—আরও জোর কদমে—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

পাগল হাসতে হাসতে সুর ক'রে এবার বলে—বরেরো পাল্কী। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ।—পড়িল পিছনে—

- প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ।

—আগে চলে লক্ষ্মী

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ--

—পিছে এস লারায়ণ।

বরের পাল্কীর সামনে আছে রতন, সেও হাঁকলে—জোরে ভাই, জোরে ভাই—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। কনের পাল্কীতে কনে বরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে, বরও হাসছে পাল্কীতে ব'সে—এ কথা তারা জানে।

হঠাৎ বনওয়ারী জোরে হাঁকে—বেহারা সাবোধান।—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ।—আলপথে নামিলাম। পায়ে পায়ে—পায়ে পায়ে। অর্থাৎ পা যেন ডাইনে বাঁয়ে না পড়ে, একটি পায়ের দাগে আর একটি পা, একজনের পায়ের ছাপের উপর আর একজনের পায়ের ছাপ ফেলে সাবধানে এস বেহারারা। এসব জায়গায় বনওয়ারী নিজে সুর ধরে, পাগলকে

বিশ্বাস করতে পারে না। সে যে-রকম আলাভোলা লোক, হয়তো গানের ঝোঁকে পথের কথা না বলে বর-কনের কথাই ব'লে যাবে। পিছনে বেহারারা পড়বে বিপদে। বনওয়ারী হাঁকলে—ফেলে ফেলে সাবোধানে, এস রে বেহারা। ডা-ই-নে বেঁ-কি-ব। হুঁশ ক'রে—হুঁশ ক'রে। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। সামনে উঠতি—আলকাটা নালা ভাই। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। পিছে টান পড়িছে। পিছন হতে প্লো-হিঁর বদলে শব্দ হ'ল—কাঁধ—কাঁধ। থামল পাল্কী। একজন পাল্কী ছাড়বে, একজন কাঁধ বদলাবে, অর্থাৎ ডান থেকে বাঁ কাঁধে নেবে।

দেখতে দেখতে ডান পাশ দিয়ে বরের পাল্কী নিয়ে রতন হাঁকতে হাঁকতে চ'লে গেল হুম্-হুম্ শব্দে। গুনে বোল ব'লে জোরে ছুটেছে।

—হেঁইয়ো—হুঁশিয়ার—

—প্লো-হিঁ।

—পাশ কর পাল্কী—

—প্লো-হিঁ।

—কর্তার হুকুমত—

—প্লো-হিঁ।

—গিন্নীর পাল্কী—পিছনে পড়িল—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

পার হয়ে চ'লে গেল ওরা।

বনওয়ারী পাগল আবার ছুটল—বরের পাল্কী এগিয়ে গেল, চল চল। জোর কদমে আবার চলল কনের পাল্কী।—কদমে-কদমে বেহারা চল রে। পাগল আবার সুরে হাঁক ধরে—কত্তা আগে গেল। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। ছুটে চল বেহারা, ধর ওই পাল্কী। জোরসে জোরসে। আগে যাবে লক্ষ্মী। তবে তো লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটবে। লক্ষ্মীর কাছে হেরে 'লারায়ণ'ও হাসবে। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। বর এবং কনে যে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসেছে, এ ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে। পাল্কীর ডাণ্ডা বেয়ে সে হাসি এসে ওদের পরশ দিয়ে যায় যে।

অনেককাল পর এবার ভারি আমোদ গিয়েছে। পান সুপারি চিঁড়ে মুড়কি লুচি মিষ্টি প্রচুর বেঁধে নিয়ে ফিরল কাহারেরা।

মিত্রকর্তা বনওয়ারী এবং পরমের পিঠ চাপড়ালে—বাহবা। খুব খুশি হয়েছি।

পরমেরা ঘাঘরা, বডিজ, পায়ের নূপুর, কানের মাকড়ি খুলে ফেললে। পুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে রওনা হ'ল। বনওয়ারীকে ডাকলে—আয়।

হাসলে বনওয়ারী, বললে—চল, মাতালশালায় আসর পাত গিয়ে ; আমরা যাচ্ছি—আমাদের কম্ম এখনও বাকী আছে।

পরম ব্যঙ্গভরে বললে—হুঁ। বটে বটে। ঘোড়াদিগে গাড়ি তুলে দিতে হবে আস্তাবলে।

কাহারদের অশ্বগোত্র। তাই ঠাট্টা করলে। বনওয়ারীকে এখন পাল্কী দুখানি নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে চন্ননপুরে বড়বাবুদের বাড়ি। পাল্কী দুখানা তাঁদের। মিত্রেরা চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের জন্য। পাল্কী দুখানির জন্য দুটি বড় মাছ বাবুদের সম্মানী দিতে হবে। বিয়েসাদীতে

পাল্কী নিলে মাছ দিতে হয়। জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী নিলে সিধে দিতে হয়—ঘি-ময়দার সিধে। এগুলি বহন ক'রে নিয়ে যায় কাহারেরাই। এই কাজ সেরে তবে বনওয়ারীদের ছুটি। তবে এ কাজটা ছেলে-ছোকরাদের। তারাই বরাবর করে। খালি পাল্কী দুই কাহারে ব'য়ে নিয়ে যায়, এক কাহার নেয় মাছ, কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুজনের একজনই হাতে ঝুলিয়ে নেয় মাছটা। সাধারণ গেরস্তে মাছ দেয় দু'সের ন'পো, বড় জোর আড়াই সের ওজনের। এর বেশি ওজনের দিতে পাবে কোথায় তারা? যার থাকে, সেও নজরের জন্যে দিতে পারে না। মিত্র মহাশয় মানী লোক, দুটো মাছ দিয়েছেন দশ সের ওজনের। বড়বাবুদের বাড়ি যাবে, ছোট কি দেওয়া যায়? বনওয়ারীও ঠিক ওই জন্যেই ছেলে-ছোকরাকে ভারটা না দিয়ে নিজেই যাবে। বড়বাবু রাজলক্ষ্মীর আশ্রিত, তাঁকে দর্শন হবে, প্রণাম হবে। বাবু মাছ দেখে খুশি হবেন। বলবেন—তুই? কে বল তো তুই?

বনওয়ারী বলবে—আজ্ঞে হুজুর, আমি বনওয়ারী। আপনার চাকর, পেজা হয়েছি নতুন। সায়েবডাঙায় জমি নিয়েছি।

এ ছাড়া আরও একটু কারণ আছে। নসুবালা এক ফাঁকে এসে বলে গিয়েছে—ব্যানোকাকা, বর বলেছে তোমাকে দেখা করতে। দেখা না ক'রে যেয়ো না যেন। লুকিয়ে বললে আমাকে। কনে হাসছিল।

বনওয়ারী পাগল রতন প্রহ্লাদ পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকে হেসেছে। পাল্লা দিয়ে পাল্কী নিয়ে আসার জন্য বরকনে দুজনেই খুব—খুব খুশি হয়েছেন। গোপনে রাঙাহাতের 'বশকিশ' আসবে। সেটা আর পরমকে সে জানাতে চায় না। ওরা মনে মনে হিংসে করবে। হয়তো ওরাও গিয়ে বরের কাছে দাবি করবে। কথাটা লোক-জানাজানি হবে। বরকনে হাজার হলেও ছেলেমানুষ, বিয়ে-ব্যাপারে দশের কাছে আশীর্বাদী দু-দশ টাকা ওঁরা পেয়েছেন, তা থেকেই দেবেন, দেশসুদ্ধ লোককে দু'হাতে বিলুতে পাবেন কোথায়? পরমকে দিলে বাজনদার আসবে, বাজনদারের পিছনে রোশনাইদার আসবে, তার পিছনে এ-ও-সে কতজন আসবে তার ঠিক আছে?

ওই যে। নসুবালা হাতছানি দিয়ে ডাকছে খিড়কীর দোরে। নসুবালার কাপড়খানা একেবারে 'অঙে-অঙে' 'অক্তসনজে' হয়ে গিয়েছে। খুব রঙ মেখেছে নসু। গলা ভেঙে গিয়েছে। গান গেয়েছে দিনরাত। হাতে দু'হাত ভ'রে কাচের রেশমী চুড়ি পরেছে।

বনওয়ারী পাগল এগিয়ে গেল। পাগল মুচকি হেসে বললে—তা হ'লে গাঁয়ে ফিরে আমার সাঙাটাও হয়ে যাক ব্যানো-ভাই। কনে তো তৈরি।

নসুবালা গাল দিয়ে উঠল—মর মর, মুখপোড়া। ভদ্দনোকের ঘর মান না। নিলেজো, গলায় দড়ি দেগা।

পাগল হঠাৎ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—ও বাবা, যাব কোথা? কনের নাকে ঝিকমিক করে। ও তো পেতল নয়, ওটি তো দেখি নাই যখন এলি সেদিনে।

গা দুলিয়ে পরম পুলকে নসু এবার বললে—আদায় করেছি হে, আদায় করেছি। কনের কাছে। সোনার 'সামিগ্যি' এই—এই এত। নাকছাবি চার পাঁচ গণ্ডা। কানের ফুল মাকড়ি আট-দশটা। কাপড় এক মোট। কনে নাকছাবিটি দিলে। গিন্নীমা পাছাপেড়ে শাড়ি দেবে।

বরকে বলেছি—দাদাবাবু, কাহার ব'লে আমি ননদপেটারি পাব না কি ? তা হবে না, সে ছাড়ব না আমি—হ্যাঁ। নতুন ডুরে কাপড়—। হঠাৎ লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। বর মহাশয় বেরিয়ে এসেছেন। বর পাঁচ টাকার একখানি নোট বনওয়ারীর হাতে দিয়ে বললেন—কনের পাল্কীর বেহারারা তিন টাকা নিয়ো, আমার বেহারাদের দু টাকা।

বনওয়ারী খুশিই হয়েছিল, কিন্তু নসুবালা ব'লে উঠল—হেই মা রে, তিন টাকা ? তিনে দোশমন ! না দাদাবাবু, শুভকাজে দোশমন করতে নাই। আর এক টাকা দাও তুমি

বর হেসে বললেন—তোকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। ব'লেও কিন্তু এক টাকা না দিয়ে পারলেন না।

বনওয়ারী বললে—জয়-জয়কার হোক বাবু মাশায়।

পাগল বললে—একটি পাওনা রইল কিন্তুক।

বর বললেন—কি, বল ?

—খোকাবাবু হ'লে আমরা কিন্তু বউদিদি আর খোকনকে বহন করে আনব ; বায়না আমাদের হয়ে রইল।

বর লজ্জা পেয়ে হাসলেন। নসু হাতে তালি দিয়ে নেচে উঠল।

তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন।

মাতালশালায় এসে বসল বনওয়ারী। জ'মে উঠেছে মাতালশালা। ব'সে গিয়েছে দলে দলে মাতালেরা। জেলেরা এক জায়গায়, সাঁওতালেরা এক জায়গায়, ডোমদের দল বসেছে আমগাছের তলায়, হাড়ীরা বসেছে ওপাশে, চন্ননপুরের বাউরীরা বসেছে আলাদা, বাগদীরা ওখানে ব'সে বড় মদ খায় না, বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাড়ায় বসে খায়। পরম দলবল নিয়ে বসেছে ডোমেদের দলের কাছাকাছি। বনওয়ারী আশা করেছিল, আজ অন্তত এই একসঙ্গে বিয়ের কার্য সেরে ফেরার পথে সকলে একসঙ্গেই বসবে। ক্ষুণ্ণ হ'ল সে। বললে—পরম হোথা গিয়ে বসল।

গুপী বললে—যাক বাপু, যার যেথা মন সেথাই বিন্দাবন ; বেশ বসেছে।

বনওয়ারী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলে, পথে কিছু ঘটেছে। পরমকে তো সে জানে। হেসে বসল সে। ব'সে বললে—হ'ল কি ? ল্যাই করেছে বুঝি পাওনা নিয়ে ? অর্থাৎ ঝগড়া

—পাওনা নিয়ে ল্যাই হ'লে বুঝতাম—মনের ঝাল। জাত নিয়ে, গোত্ত নিয়ে ল্যাই

—জাত নিয়ে, গোত্ত নিয়ে ?—বনওয়ারীর কপালের শিরা ফুলে উঠল।

পাগল বললে—ছাড়ান দাও। লাও, ঢাল ঢাল।

—ছাড়ান কিসের ? তোর ঘেন্নাপিত্তি সব গিয়েছে পাগল।

—তু খেপেছিস ব্যানো ! জাত নিয়ে ঝগড়া কিসের ? যে বড় সে বড়, যে ছোট সে ছোট। ভগবান যা ক'রে পাঠাল্ছেন, তাতে কার কি হাত ? আসল জাত নিজের নিজের আচার-আচরণে, কাম-কম্মে।

বনওয়ারী বুঝে গেল। এইটি ওর গুণ।—ঠিক ঠিক, এ তু ঠিক বলেছিস, বাস্। লাও, ঢাল। ছোট বললে ছোট হয় না, খুঁড়িয়ে দাঁড়ালে বড় হয় না। বাস।

পাগল গান ধরলে। মুড়ি বেগুনি ফুলুরির সঙ্গে চলতে লাগল মদ। বনওয়ারী হঠাৎ পাগলকে ডেকে দেখালে--দেখ, শ্যালো জাত দেখায়, শালোর করণ দেখ।

সকলেই দেখলে, পরম ডোমেদের আসরের মাঝখানে গিয়ে বসেছে। মদও খাচ্ছে।

পাগল বললে—ছাড়ান দাও।

—ছাড়ান দোব কেনে? এ তো পরমের ডোমে জাত দেওয়া হ'ল।

—নিশ্চয়।—সকলেই একবাক্যে সায় দিলে।

শুধু পাগল বললে—ওহে, ওতে জাত যায় না। জাত যার যায় তার যায়—এমনিতেই যায়। যার যায় না, তার যায় না। জাত না দিলে, লেয় কে? তার নাম কি, ঘর কোথা?

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

পাগল বললে -লাখ কথার এক কথা বলেছে করালী। ঠিক বলেছে। সেদিন থেকে ভেবে আমি দেখলাম। সার কথা বলেছে ছোকরা।

—করালী। করালী বলেছে?

—হ্যাঁ। সেদিনে বললাম তো তোমার কথা। তুমি বলেছিলে, শুধাস করালীকে। তা করালী বললে—আমার জাত আমি না দিলে লেয় কে? তার ঘর কোথা? তা ছাড়া আর একটি কথা বললে—ভীষণ কথা। বললে ছোঁয়া খেলে জাত যায় না, জাত যায় এঁটো খেলে। জাত আমার যায় নাই, আমি কারুর এঁটো খাই না। কাহারেরা সদগোপদের এঁটো কুড়িয়ে খগেে যায়।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বনওয়ারী মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

শুধু পানা বললে- আমি কিছু বলব না বাবা। সবেই দোষ আমার হয়। বুয়েচ।

বনওয়ারী তার হাতখানা ধ'রে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—তু বেটার ওই সরিঙ্গে মুখ দেখলে আমার সব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। স'রে যা, সম্মু থেকে তু স'রে যা।

রতন বললে—ওঠ, ওঠ, ঘর চল। আর লয়।

বনওয়ারী বললে—এক গোলা গোটা নিয়ে লে। মেয়েছেলে—। এক গোলা লইলে হবে না।

পাড়ার জন্যে মদ নিতে হবে। তারা মদ খেলে, আমোদ করলে—পাড়ার লোকে খাবে না, এ কি হয়? পাড়ার জন্য মদ নেওয়ার নিয়ম বরাবর আছে।

পরম শুধালে -উঠলি নাকি?

গম্ভীরভাবে বনওয়ারী বললে—হ্যাঁ।

পরম বললে তার দলকে—ওঠ্। আমাদেরও ওঠ।

চন্ননপুর আর বাঁশবাঁদির মধ্যে মস্ত একটা মাঠ—ক্রোশখানেক লম্বা। পোয়া-তিনেক গিয়ে প্রথম পড়বে বাঁ হাতের দিকে জাঙল গ্রাম, তারপর বাঁশবাঁদি। রাস্তার মাঝামাঝি এসে পরম ডাকলে—বনওয়ারী।

বনওয়ারী আগে চলছিল, সাড়া দিলে—কে? কে ডাকলি?

—আমি পরম। হ্যাঁ। তোর সাথে একটা কথা আছে।

—আমার সাথে? কি?

—বলি দাঁড়া।

পরম দু দলকেই বললে—চ, চ, তোবা এগিয়ে চ। আমরা কথা বলতে বলতে যাই। একটা গোপন কথা আছে আমাদের।

পাগল সকলকে ডেকে নিয়ে গেল—চল—চল। সঙ্গে সঙ্গে সে গান ধ'রে দিলে—

গোপনে, মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়,
ও হায় ঠাণ্ডা শেতল সাঁজবেলায়।

খপ করে বনওয়ারীর হাত চেপে ধরলে পরম। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল বনওয়ারীর মুখের দিকে। বনওয়ারী বুঝে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস নিয়ে ছাতিটা ফুলিয়ে দাঁড়াল। বললে—মার কববি? অর্থাৎ মারামারি করবি?

পরম বললে—করালীকে কি বলেছিস? আমি ডাকাত, আমি দাগী?

বনওয়ারী হেসেই বললে—নোস তু উ সব? তু নিজেই বল কেনে?

এবার পরম দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে শালো সাধু নোক, আমাদের পাড়ার বটতলাতে তোমার কিসের ভজন?

পরমের লজ্জা নাই। 'ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয়' কিসে? যে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে থাকে, উপর মুখে থুথু ছুঁড়ে যে নিজের গায়েই মাখে, এ জ্ঞান তার থাকবে কি ক'রে? নিজের ঘরের মেয়ের কেলেঙ্কারি নিয়ে ঝগড়া করা আর উপর দিকে থুথু ছোঁড়া একই কথা। জ্ঞানও নাই, ঘেন্নাও নাই; যার ঘেন্না নাই, তার লজ্জাও নাই। কিন্তু বনওয়ারীর লজ্জা আছে, কেলেঙ্কারিকে ভয় তাকে করতেই হয়, গোটা কাহারপাড়ার মাতব্বর সে। আগেকার কাল ছিল আলাদা। এ কাল আলাদা। আর এ কালের এই হালচাল—বনওয়ারীরাই বাপ-বেটা দু'পুরুষে প্রতিষ্ঠা করেছে কাহারপাড়ায় 'মেয়েদের পানে তাকিও না'। মানে না সবাই, তবুও অনেক হাল ফিরেছে। সুতরাং নেশার মধ্যেও বনওয়ারী মাথা ঠিক রেখে বললে—হাত ছাড় পরম। উ সব মিছে বাজে কথা।

—ও শালো, পানা আমাকে বলেছে। সে নিজের চোখে দেখেছে তোমার কীত্তি। চাপা গলায় অকুণ্ঠভাবেই ব'লে গেল পরম, একবার বাধল না মুখে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে রইল। না, উত্তর দেবে না সে। পাপ তার বটে, তবুও উত্তর তার আছে। সে উত্তর দিতে গেলে কালোশশীকে দোষ দিতে হয়। পরমের অবহেলার জন্য সে-ই বনওয়ারীকে টেনেছে পাপের পথে। বনওয়ারী তাকে ডাকে নাই। কিন্তু সে কথা সে বলবে না, বলতে পারবে না।

পরম হঠাৎ তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে, বললে—কি শালো, চুপ ক'রে অয়েচ যে। ধাম্মিক। মাতব্বর।

আর আত্মসম্বরণ করা সম্ভবপর হ'ল না বনওয়ারীর পক্ষে। সে হুঙ্কার দিলে—পরম।

মত্ত পরম দু হাতে শূন্যলোকে অনুসন্ধান ক'রে বললে—লাঠি? আমার লাঠি?

মনের উত্তেজনায় পরম লাঠি ফেলে দিয়ে দু হাতে বনওয়ারীর হাত চেপে ধরেছিল। খেয়াল নাই। মুহূর্তে বনওয়ারী পরমের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তার হাতে লাঠি নাই।

পরম লাঠি পেলে মানুষ-খেকো বাঘ। লাঠি পরমকে আর কুড়িয়ে নিতে দেবে না সে।

এর পর আরম্ভ হল যুদ্ধ। নিঃশব্দে—সেই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে তারা দুজনে বন্যপশুর মত পরস্পরকে আক্রমণ করলে। জড়াজড়ি ক'রে দুজনে এ অঞ্চলের পাষাণের মত মাটির উপরে প'ড়ে গড়াতে লাগল। কখনও এ উপরে, কখনও ও উপরে। পরম ডাকাত, পরম খুনে,—সে উপরে উঠে নিষ্ঠুর নৃশংসভাবে বনওয়ারীকে আঘাত করবার চেষ্টা করছিল। কোশকেঁধের ঘরের ছেলে বনওয়ারীর গায়ের শক্তি বেশি, সে তাকে প্রতিহত করলে কিন্তু মারাত্মক আঘাত করতে চাইল না। না, তা সে করবে না।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথার রাত্রে দাঁতালে দাঁতালে লড়াই হয়। গাছের মাথায় হনুমানের দলে বীরে বীরে যুদ্ধ হয়। সুচাঁদ বলে—হাঁসুলী বাঁকে মাঝে মাঝে মরদে-মরদেও খুনোখুনি 'অক্ত-গঙ্গা' হ'ত সেকালে। কাহারপাড়ার মরদে-মরদে সে খুনোখুনি এখন নাই। সেকালে হামেশাই হ'ত। দুই 'দানোতে' অর্থাৎ দানবে যেন যুদ্ধ লাগত। দুই বুনো দাঁতালে গুঁতোগুঁতির মত লড়াই। একালে সে লড়াই লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় কি? পরম আক্রমণ করলে ঠেকাতেই হবে। ঠেকাতে গিয়ে মার খেয়ে রাগও জাগছে। এইবার সেও মারবে— হুঁশিয়ার পরম। আবার সে নিজেকে সামলে তাকালে রাস্তার দিকে। পরম এবং বনওয়ারীর সঙ্গীরা তাদের পেছনে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়েছে বনওয়ারীর ইচ্ছা হ'ল ওদের চিৎকার ক'রে ডাকে। কিন্তু না, সে বড় লজ্জার কথা। সে হ'ল হার মানার সামিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। প্রাণপণে টেনে পরমকে নিয়েই উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগে তাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেললে। এই আছাড়েই পরম প্রায় অসাড় হয়ে পড়ল। বনওয়ারীরও খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তবু সে চেপে বসল পরমের বুকে। মারলে আরও কয়েকটা নিষ্ঠুর কিল। তারপর ছেড়ে দিলে। সে পাশে বসে হাঁপাতে লাগল। সর্বাঙ্গ যেন থেঁতলে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর কোনরকমে সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। পরমও তখন উঠে বসেছে। বনওয়ারী গিয়ে তার হাত ধ'রে টেনে বললে—উঠতে পারবি?

পরম গর্জন ক'রে উঠল—ছাড়।

বনওয়ারী তাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে চলল। পরম বারকয়েক ওঠবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে পড়ল সেই মাঠের উপরেই।

* * *

গ্রামে তখন মদ নিয়ে আনন্দ চলেছে, তার সঙ্গে নানা উপাদেয় খাদ্য। বনওয়ারী গ্রামের প্রান্তে থমকে দাঁড়াল। কি ভেবে, গ্রামে না ঢুকে পাশের পুরানো কালের ঘন গাছপালার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে উঠল আটপৌরে পাড়ায়। আজ যেন কালোবউ শতগুণ লোভনীয় হয়ে তাকে আকর্ষণ করছে। শরীরের মধ্যে যেন এখনও রক্ত গরম আগুন হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আজ কালোবউকে নিয়ে এখুনি সে চ'লে যায় নিজের ঘরে। কোন পাপ হবে না। পরম নিজেই সে পাপ হওয়ার পথে কাঁটা দিয়েছে। সে কম্পিত হাতে গোটাকয়েক ছোট ঢেলা তুলে নিয়ে পরমের উঠান লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ল।—টুপ, টুপ, টুপ। সুচতুর মেয়ে

কালোশশী ঠিক বুঝতে পেরেছে। আবছা অন্ধকারে সাদা মূর্তি উঠানে এসে দাঁড়াল।

সে এবার মৃদু গলাঝাড়ার শব্দ করলে। চতুরা কালোবউয়ের কান এদিক দিয়ে বেহালার তারের মত, খুট করলেই তারে সাড়া জাগে। চকিত দৃষ্টি হেনে বনওয়ারীকে দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে। মুখ ভ'রে হেসে বললে—তুমি। ঠিক বুঝেছি আমি, সে-ই বটে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ কি, হাঁপাইছ কেনে?

—পরমের সাথে হয়ে গেল এক হাত।

গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল কালোবউ—এ কি। অক্ত?

—হ্যাঁ। সি প'ড়ে আছে মাঠে।

কালোবউ বিন্দুমাত্র ব্যস্ত কি উৎকণ্ঠিত হ'ল না। সে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে, তারপব বললে—দাঁড়াও, অক্ত-টক্ত ধুয়ে ফেল আগে।

—ঘটির জলে যাবে না। হাসলে বনওয়ারী। অক্ত-ধুলো—চান করতে হবে।

বনওয়ারীর হাত ধ'রে সে বললে—চল তবে নদীতে। কাচের পারা জল, ধুয়ে মুছে চান করবা।

—চল। বনওয়ারী খুশি হয়ে উঠল। আজ কালোবউকে সব চেয়ে বেশি মনোরমা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কালোবউ ধুয়ে মুছে দিলে সকল ক্ষত এবং আঘাতের যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে। কালোবউয়ের কাঁধে হাত রেখে সে বললে—চল।

পাড়া আনন্দে তখন মাতোয়ারা। ঢোল বাজছে। মদে খাবারে মেতে উঠেছে সকলে। আটপৌরে পাড়াতেও চলছে। বনওয়ারী টলতে টলতে কালোবউকে নিয়ে কোপাইয়ের গর্ভে এসে নামল। আকাশে সবে চাঁদ উঠেছে। একপাশ-খাওয়া লাল-বরণ মস্ত চাঁদ। হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে, গাছের মাথায় মাথায় আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে, গাছের ডালগুলির পাতায় চিক চিক ক'রে নাচছে উঠতি চাঁদের লালচে আলোর ছটা। আলো নাচছে না, পাতাগুলিই নাচছে বাতাসে, কিন্তু মনে হচ্ছে—চাঁদের আলোই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে উড়ন্ত প্রজাপতির হিলহিলে পাখনার মত। বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গলা ডুবিয়ে বসল। জল পেয়ে ক্ষতগুলি জ্বলছে, কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে, শরীর জুড়িয়ে গেল। কালোবউ বসেছে নদীর বালিতে পা ছড়িয়ে। দেখতে দেখতে চাঁদেব আলো দুধবরণ হয়ে গাছপাল' বাঁশবন ঝলমল ক'রে তুলে নদীর বুকে নামল। কোপাইয়ের জলে গলানো রুপোর ছটা জেগে উঠল। কোপাইয়ের তরঙ্গরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন খিলখিল ক'রে হেসে ঢ'লে গড়িয়ে পড়ছে। ওই ছটায় কালোবউকে বড় সুন্দর লাগছে। তার উপর মনে ধরেছে রঙ, সে রঙের ছটাও গিয়ে পড়েছে কালোশশীর মুখে। বনওয়ারী বললে—মিহি সুরে এক পদ গায়েন কর কেনে?

হাসলে কালোবউ। কালোবউয়ের দাঁতগুলি ঝিকমিক ক'রে উঠল। সে বললে—গায়েন?

—হ্যাঁ। বেশ অরেন গায়েন।

—আজ যে দেখি নেশা খুব।

হাসলে বনওয়ারী। কালোবউ গান ধরলে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গান। সে যে

কে রচনা করেছে, কেউ তা জানে না। কালোবউ গাইলে—

আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—
সে জল পাতা নিলে না—
টলোমলো—টলোমলো—
হায় বঁধু হে প'ড়ে গেল—
ও হায়, চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।

হঠাৎ কোপাইয়ের পাড়ের উত্তর পারে দুটো 'টিটে' অর্থাৎ টিট্টিভ পাখি চীৎকার ক'রে উঠল, মাথার উপরে তালগাছটা থেকে একটা প্যাঁচা কর্কশ শব্দ ক'রে পাখা ঝটপট ক'রে উঠল। কালোবউ চমকে উঠল, বললে—মাগো। মর মর মুখপোড়ারা। বলতে বলতে সে পিছন ফিরে দেখতে চাইলে ওই অশুভক্ষণে পাখিটাকে। ফিরে তাকিয়েই সে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল।—ও কে? সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পরম। চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত। অন্ধকারে পরমের হাসা চোখ বুনো বিড়ালের চোখের মত জ্বলে। কিন্তু এমন জ্বলতে কেউ কখনও দেখে নি। সে টলছে। মুহূর্তে কালোশশী উঠে দাঁড়াল; বনওয়ারীকে ডাকলে। কিন্তু কই বনওয়ারী? কই? সমস্ত কোপাইয়ের জলস্রোতটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে। কিন্তু বনওয়ারী কই? ওদিকে পাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পরম। কালোবউ পরমকে জানে। তারই মুখে গল্প শুনেছে—মানুষের গলায় পা দিয়ে কেমন ক'রে অনায়াসে মানুষকে মারা যায় এবং কতজনকে সে মেরেছে। কালোবউ শিউরে উঠল, তার পরই সে ছুটল—কোপাইয়ের গর্ভে গর্ভে বালির উপর দিয়ে। পরমও ছুটল তার পিছনে। গোঙাচ্ছে পরম।

জলের তলে তলে বেশ খানিকটা দূরে ভেসে গিয়ে মাথা তুললে বনওয়ারী। জলে ডুবে নদীর স্রোতে সে ভেসে চলেছিল। মাথা তুলে সে ব্যাপার দেখে চমকে উঠল। উপরের দিকে অর্থাৎ স্রোতের উল্টোদিকে ছুটছে কালোবউ। পিছনে টলতে টলতে ছুটছে পরম। সে এবার জল থেকে উঠল তাড়াতাড়ি। ছুটতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেও টলছে। তার উপর বালি।

ওই কালোবউ ছুটছে। ওই।

ওই পরম।

সর্বনাশ! সামনে যে 'সায়েবডুবির দহ', কেউ বলে—'যখের দহ', কাহারপাড়ার লোক বলে—কত্তার দহ। কত্তা ওই দহে চান করেন। কালারুদ্র ওই দহে জলশয়ানে আছেন। কাহারেরা বছরে চারবার নামে ওইখানে। গাজনে কালারুদ্দের শিলারূপকে তুলে নিয়ে যায়, আবার জলশয়ানে রেখে আসে; আর ওখানে থাকেন কালারুদ্রের বেটী মা-মনসার 'বারি'। একবার নেমে সেই বারি নিয়ে যায়—একবার নেমে সেই বারি ডুবিয়ে দেয়। তা ছাড়া কেউ ওদিকে ঘেঁষে না। ওখানে পাহারা দেয় আদ্যিকালের এক বুড়া কুম্ভীর। মধ্যে মধ্যে বেড়াতে এদিকে ওদিকে যায় বটে, কিন্তু দহের বিঘ্ন হ'লে নিশ্চয় সে কোপাইয়ের জল

কেটে তীরের মত ছুটে আসবে। রক্ষা কর হে বাবাঠাকুর, রক্ষা কর।

ওই দহের কিনারা ধ'রে উপরে উঠছে কালোশশী। উঠতে পারলে নিশ্চিন্ত ; শিমূলবৃক্ষটি পার হ'লেই কোপাইয়ের জঙ্গল, জঙ্গলে ঢুকলে কালোশশীকে খুঁজে বার করা পরমের সাধ্যে কুলাবে না। কালোশশী শিমূলবৃক্ষটির শিকড় ধ'রে উঠে যাচ্ছে বুনো বিড়ালীর মত। দহের মাটি খুলে গিয়ে শিমূলবৃক্ষের শিকড় বেরিয়ে আছে—ঝুলে আছে, তাই ধ'রে আর তাতেই পা দিয়ে উঠছে। বাহা—বাহা। বাহারে কালোশশী।

হঠাৎ কালোবউয়ের ভয়ার্ত চীৎকারে কোপাইয়ের স্তব্ধ গর্ভভূমি যেন বুকের উপর খুনীর ঝকমকানি দেখে উঠল। ওটা কি ? শিকড়ের তলা থেকে আকাশের বিদ্যুতের মত এঁকে-বেঁকে মাথা তুলে দাঁড়াল, ওটা কি ? চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে কোপাইয়ের জল বালি। তীরের জঙ্গলের কোল পর্যন্ত ঘাস নড়ছে দেখা যাচ্ছে, বালির মধ্যে ঝিকমিক করছে বালুর কণা, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কালোবউকে দেখা যাচ্ছে না কেন ? সে কই ? কালোবউ কোথায় গেল ? বনওয়ারী চারিদিকে চেয়ে দেখে চাপা চীৎকারে ডাকলে—কালোশশী।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল পরম। পরম দহের কিনারা ধ'রে ফিরে এসে কোপাইয়ের জলে নামছে। কই কালোবউ ? এ কি হ'ল ? শুধু দহের জলটা দুলছে। সে ছুটে গেল দহের দিকে। দুলছে জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা যেটা শিমূলবৃক্ষের তলা থেকে বেরিয়ে কালোবউয়ের বুকের উপর মাথার উপর দুলে উঠেছিল, সেটা এখনও মুখ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে। সেও দেখছে দহের জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বনওয়ারী সভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর করজোড়ে প্রণাম ক'রে পিছু হঠতে লাগল। সাদা গোখুরো একটা।

পিছন থেকে পরম আবার হেসে উঠল। বনওয়ারী ফিরল। বুঝা-পড়ার শেষ হয়ে যাক। পরম কোপাইয়ের ও-তীরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বনওয়ারী কঠিন স্বরে ডাকলে—পরম।

পরম উত্তর দিলে না। তার আক্রোশ মিটে গিয়েছে। সে পালাচ্ছে।

বনওয়ারী বললে—মরদ হোস তো ফিরে আয়।

পরম দাঁত মেলে হাসলে। তারপর মিশিয়ে গেল কোপাইয়ের ওপারের তীরের জঙ্গলের মধ্যে। বনওয়ারীর কিন্তু কত্তার দহে নামতে সাহস হ'ল না।

বনওয়ারী থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। কত্তাবাবার ক্রোধ কি তার উপরেও পড়ল ? কালোবউকে জলের তলা থেকে কেউ কি টেনে নিলে ? মাথার উপর, বুকের উপর কালদণ্ড তুলে দাঁড়িয়ে উঠল কে ? বাবার বাহন। বাবার বাহন। সে চোখে অন্ধকার দেখলে, হয়তো প'ড়েও যেত। কিন্তু তাকে কে পিছন থেকে ধ'রে ফেললে। ধরেছে পাগল, সে ডাকলে—বনওয়ারী। বনওয়ারী। বনওয়ারী।

চতুর্থ পর্ব

এক

পাগল বনওয়ারীকে এনে বাড়িতে শুইয়ে দিল। বনওয়ারী বিহ্বল। পাড়ার লোক ভিড় ক'রে এল। কি হ'ল? কি ক'রে হ'ল?

পাগল বললে—জাঙলের ধারে প'ড়ে হাঁপাইছিল।

জাঙলের ধারে?

—হ্যাঁ। কথাটা ভেবেচিন্তেই বলেছে পাগল। শেষের প্রায় সবটাই সে দেখেছে কোপাইয়ের ধারে সে গিয়েছিল চাঁদের আলো দেখে মনের খেয়ালে। কালোবউ তখন গান গাইছিল। অপার কৌতুকে বনওয়ারীর প্রেমলীলা দেখবার জন্য একটা গাছে উঠে বসেছিল। তারপর এল পরম সমস্তটা ঘটে গেল চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে। গাছ থেকে সে যখন নামল, তখন পরম ও-পারে; কালীদহের জল দু'লছে, তীরে দাঁড়িয়ে বনওয়ারী কাঁপছে টলছে। সে ধরে ফেললে বনওয়ারীকে। দহে নামতে তারও সাহস হয় নাই। সে জানে, কালোবউয়ের দেহ কাল ভেসে উঠবে পুলিস আসবে। বনওয়ারী ওখানে ছিল বললে বনওয়ারীকে টানবে, তাকে ছাড়বে না। সেই বা ওখানে গিয়েছিল কেন? চাঁদের আলোয় সবাই ভোলে, দারোগাবাবু ভোলে না। তাই সে ভেবেচিন্তেই বনওয়ারীকে এবং নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বললে—জাঙলের ধারে ব'সে হাঁপাচ্ছিল বনওয়ারী। সে জানে পরম ফেরার হয়েছে। সন্দেহ যদি পরমের উপর পড়ে, তবে সে অন্যায় হবে না। কালোবউকে পরমই মেরেছে। যদি দহে ডুবে না মরত কালো শশী, তবে পরম তাকে নিশ্চয় মারত। মুহূর্তে গলা টিপে মেরে ফেলত এবং দহেই ফেলে দিত। জাঙলের ধার কোপাইয়ের দহ থেকে অনেক দূর। জাঙল গ্রাম, তারপর মাঠ, তারপর কাহারপাড়া, তারপর বাঁশবেড়ে, তারপর জঙ্গল—সেই জঙ্গলের বুক চিরে চ'লে গিয়েছে কোপাইবেটী—কোপাইয়ের দহে ভাসবে কালোবউ। দারোগাবাবু হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবেন না বনওয়ারীকে।

পাগল বললে পরমের কাণ্ড। বনওয়ারী মাতালশালায় বলেছিল—পরমের জাত নাই, জাত গেল, ডোমেদের সাথে মদ খেলে। পরম শুনেছিল। পথে ডাকলে বনওয়ারীকে। আমরা বুঝতে পারলাম না। তারপর এই কাণ্ড।

সকলেই বিশ্বাস করলে।

করালী উঠল।—কাঁহা সে পরম? কাঁহা?

অচেতনের মত বনওয়ারী তখন কাঁপছে। কম্প এসেছে। তার মধ্যেও সে বললে—না।

পাগল, বারণ কর। আটপৌরেদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'রে ফেলাবে ছোঁড়া। আর—

দাঁতে দাঁতে কসকস ক'রে উঠল সে। ওই—ওই ছোকরাই সব অনিষ্টের মূল। বাবাঠাকুরের বাহন মেরেছে। বাবাঠাকুরের শিমূলবৃক্ষে চড়েছে। করালীর দিকে সে তাকালে—বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে গেল। করালীর পরনে কোট পেন্টুলেন। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

গোপালীবালা তার হাত দিয়ে বনওয়ারীর চোখ ঢেকে বললে পাগলকে—ও দেওর, কি ক'রে তাকাইছে দেখ, এ যে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে গো। কি হচে গো।

পাগল নাড়ী দেখতে জানে। হাত ধ'রে সে বললে—জ্বর আসছে, জ্বর। কাঁথা দাও, কাঁথা দাও।

বনওয়ারী বললে—দূর কর, ছামনে থেকে দূর কর—

বলতে বলতে প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে কালোশশীর দেহ ভেসে উঠল কালীদহের মাঝখানে। এলোচুল ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচছে, কালোবউয়ের দেহটা ডুবছে আর উঠছে।

পরম নিরুদ্দেশ।

দুঃখ সবাই করলে। দুঃখ করলে না কেবল নয়ানের মা। বনওয়ারীর দুর্দশায় সে খুশি হয়েছে। কালোবউয়ের মৃত্যুতেও সে পুলকিত হয়েছে। কালোবউ যে বনওয়ারীর 'অঙের' মানুষ। সে স্নান করে এলোচুলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে এল। বাবাঠাকুরের মহিমাকীর্তন করতে লাগল।

বিস্মিত কিন্তু কেউ হ'ল না।

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে ঘেরা বাঁশবাঁদির ইতিহাস এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু যে বরাবরই সে ঘ'টে আসছে। সাপে কাটা, দাঁতালের দাঁতের আঘাতে মৃত্যু—এর তদন্ত নামমাত্র, তা ছাড়া জলে ডোবা. গাছ থেকে পড়াও প্রায় তাই, এর পর গলায় দড়ি আছে, বিষ খাওয়া আছে, নিজের গলায় বঁটি দিয়ে কাটার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় মেয়েদেরই বেশি। থানার খাতায় আছে—মেয়েরা চরিত্রহীনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতৃপ্ত বাসনা থেকে আত্মহত্যা করে। কখনও কখনও সন্দেহ ক'রে থাকে যে, আত্মহত্যা নয়—হত্যা. পুরুষেরাই হত্যা ক'রে থাকে। দু-চারজন চালানও গিয়েছে। সে সব আগের কালের কথা. একালে এসব বড় ঘটে না।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথা সব চেয়ে বেশি জানে সুচাঁদ। সে বলে—বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবার বাবা এক নোক তো। তা আমার কত্তাবাবা আমার পেথম কত্তামাকে শিলনোড়ার নোড়ায় মাথা ছেঁচে মেরেছেল বুকে ব'সে, নোড়া দিয়ে। বলতে বলতে সুচাঁদের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। চুপি চুপি বলে—আটপৌরেদের একজনাকে আমার কত্তাবাবা এতের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে দেখেছেল কিনা। বাস, মাথায় অক্ত উঠে গেল। ঘরের সামনে শিলনোড়া, সেই নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছিল পরিবারকে। তারপরে টেনে ফেলে দিল কোপাইয়ের গভ্যে ; বললে—প'ড়ে পাথরে মাথা ভেঙে গিয়েছে। তখন সায়েব মশায়দের আমল। সায়েবরা পুলিস ফিরিয়ে দিলে। কিন্তুক কত্তাবাবাকে চাবুক

দিয়ে সপাসপ মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছেল। তাদের বুদ্ধির কাছে তো ফাঁকি নাই বাবা।

রতনের পূর্বপুরুষ চড় মেরে মেরে ফেলেছিল তার বোনকে। তখন ওই দহতে ছিল বড় বড় কুমীর, সেই দহে ফেলে দিয়েছিল লাশ।

গুপীর পূর্বপুরুষ বিষ খাইয়েছিল তার স্ত্রীকে।

পরমের পূর্বপুরুষের বাহাদুরি সব থেকে বেশি। সে তার বৌয়ের হাতে পায়ে বেঁধে মুখে কাপড় বেঁধে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর হাত-পায়ের দড়ি, মুখের কাপড় বার ক'রে হৈ-চৈ করেছিল। কেউ সন্দেহ করতে পারে নাই।

একমাত্র ছেলে মারা যেতে ঘরভাঙাদের নয়ানের প্রথম ঠাকুরমা ওই দহে ঝাঁপ দিয়ে মরেছিল। তারপর নয়ানের ঠাকুরমাকে বিয়ে করে নয়ানের ঠাকুরদাদা।

অম্লশূলের বেদনা অসহ্য হওয়ায় পানুর কাকা গলায় দড়ি দিয়েছিল।

উপকথায় অনেক কাহিনী আছে। তারই সঙ্গে কালোবউয়ের কাহিনী যোগ হ'ল। পরম নিজে যেত জাঙলের এক পাড়ায়। সেখানে নফর দাসের বোনের বাড়িতে সন্ধ্যে কাটাত। কালোবউয়ের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। পরম ডাকাতির দায়ে জেলে থাকতে সে চন্দনপুরে বড়বাবুদের বাড়িতে ছোটজাতের ঝিয়ের 'পাট' করত। বাবুদের দরোয়ান ভূপসিং মহাশয়ের সঙ্গে লোক-জানাজানি ক'রেই ভালবাসা করেছিল। তা করে। কাহারপাড়ায় অনেকে করে এমন ভালবাসা—[illegible] সদগোপ মহাশয়ের সঙ্গে করে, চন্ননপুরে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে দু-চারদিনের ভালবাসার খেলাধুলো—সে তো কেউ ধরেই না। পরম মধ্যে মধ্যে মারধোর করত, তা সে আর এমন কি। কিন্তু এই বিয়েতে যাবার কদিন আগে থেকে সে কালোবউয়ের উপর খুব তর্জন-গর্জন করতে আরম্ভ করেছিল। আটপৌরে পাড়ার লোকেই বলল—কালোবউকে উঁচু গলায় বলতে শুনেছে—বেশ করেছি, তোর খুশি তু সনজে বেলা জাঙলে যেথা খুশি যাস, আমারও যা খুশি তাই আমি করি। চ'লে যাব আমি তোর বাড়ি থেকে। আমার ভাতের অভাব? লোকে বলেছে, কালোবউ সিংজীর কাছে যাবে ব'লেই শাসিয়েছিল। কাল রাত্রে পরম আর বনওয়ারী মিত্তির-বাড়ির বিয়ে থেকে ফেরার পথে কথা বলবার জন্য পিছিয়ে আসছিল। আটপৌরেরা বলে, তারা পাড়ায় এসে মদ খাচ্ছে, রাত্রি ক[illegible] তা খেয়াল ছিল না, তবে চাঁদ উঠেছিল তখন, সেই সময় পরমের উঠানে পরমের ক্রুদ্ধ হিংস্র কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। কালোবউকে সে ডাকছিল—কোথা গেলি? কই? যাবি কোথা? যম আমি তোর।—বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। দু-একজন এসেও ছিল, তখন কিন্তু পরম কি কালোবউ কেউ ছিল না, পরমের গলা শোনা যাচ্ছিল জাঙলের বাঁশবন থেকে। তারা তার গলা শুনে বুঝেছিল সে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু তারা জানে না। পরম আর ফেরে নাই। সকালে যারা নদীর ধারে গিয়েছিল, তারাই দেখতে পায় কালোবউ দহের জলে ভাসছে। তাদের অনুমান তারা ফিসফিস ক'রে বলে—পায়ে কাপড় জড়িয়ে দিয়ে পরমই তাকে দহের জলে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। কালোবউয়ের কাপড় পায়ের সঙ্গে জড়ানো ছিল। কিন্তু আসল কথা জানত প[illegible]লা কাহার। সে কিন্তু একটি কথাও বললে না। বনওয়ারীর জ্বর হয়েছে গেল রাত্রি থেকে। জ্বরে বেঁহুশ অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছে জাঙলের ধারে। কোপাইয়ের কালীদহ ওখান থেকে অনেক দূর।

সুচাঁদ আক্ষেপ ক'রে বলে—আঃ আঃ, কি যে দলমলে মেয়ে ছিল,—অ্যাই চুল, অ্যাই বুক, যেমন চোখ তেমন দাঁতগুলি—কে বলবে যে যোবতি মেয়ে লয়—বয়েস হয়েছে। আঃ—আঃ! পাগল শুধু ছড়া কেটে গান গাইলে—"অঙের খেলায় যাই বলিহারি। জেবন দিলেও দিতে পারি, তব তো ছাড়তে লারি মনের মানুষে", তারপর খেদ ক'রে বললে—আঃ—আঃ। হে ভগবান। তারপর ঝোলা-ঝম্প নিয়ে উঠল—চললাম, ঘুরে আসি দু-দিন। দ্যাশ-বিদ্যাশে নতুন গান শুনিয়ে আসি।

চ'লে গেল সে।

দিন পনেরো পর। অপরাহ্ণবেলা।

রোগ থেকে সদ্য সেরে উঠে দু হাতে মাথা ধ'রে ব'সে কালোবউয়ের বিবরণ শুনছিল বনওয়ারী। তাকে শোনাচ্ছিল সুচাঁদ। বনওয়ারী চুপ করে ব'সে ছিল মাটির দিকে চেয়ে। ফোঁটা ফোঁটা জল চোখ থেকে ঝ'রে পড়ছিল। বনওয়ারীর ইচ্ছে হচ্ছিল, চীৎকার ক'রে কাঁদে। সকলের কাছে চীৎকার ক'রে বলে—জান না, তোমরা জান না, দোষ আমার। আঃ। সে যদি পরমকে দেখে ভয়ে জলে না ডুবে জল থেকে উঠে পরমকে আটকাত, তা হ'লে কালোবউ ছুটত না এমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। দহের কিনারায় বাবাঠাকুরের শিমূলবৃক্ষের ওই শিকড় ধ'রে উঠতে যেত না। পরমের তাড়ায় সে ছুটেছিল, করালীর পাপে বাবাঠাকুরের বাহনের দংশনে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল দহের জলে। দোষ তারই। করালীকে সে শাসন করে নাই। দোষ তারই, সে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নাই। নিজের পরাণের ভয়ে, দুর্নামের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এসেছে। সে মরলেও তো পারত। দোষ তার নিজের।

মনে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে তার। এ পাপের তার আর খণ্ডন নাই। হে ভগবান, হে হরি, হে কালারুদ্দু, হে ধরম, হে বাবা কত্তাঠাকুর, তোমরা বনওয়ারীকে মার্জনা কর, রক্ষা কর।

তাকে ঘিরে পাড়ার প্রবীণ মেয়েরা সব বসেছে। সকালবেলা মরদেরা সকলেই কাজে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠে জল পড়েছে, ধানের ক্ষেতে চাষের সময় হয়েছে। বীজ পাড়তে, জমিতে চাষ দিতে হবে। বাতের চাষ। অর্থাৎ সময়ের চাষ। এ সময় একটা 'বাতের চাষ' বিঘেভুঁই দু-গাড়ি সারের সমান। এ কামাইয়ের সময় নয়। 'খানিক আদেক' শরীরের 'বেজুত' অর্থাৎ অসুস্থতা চাষের মুনিষে এ সময় গ্রাহ্যও করে না। তা ছাড়া মনিব আছে, মনিবে বলে—এত যারা 'সুকুমোরী' তাদের আবার চাষ করা কেন? কথা ঠিকই বলেন তাঁরা। 'মি নইলে মাড়ন হয় না', পাঁচন নইলে গরু হাঁটে না, সওয়ার নইলে ঘোড়া ছোটে না, তেমনি মনিব—ওই সদ্‌গোপ মহাশয়দের মত চাষী মনিব ছাড়া কৃষাণ-কাহার মুনিষ ঠিক ঠিক কাজ করে না। বাবুদের হ'ল অন্য কথা। তাঁদের ঠিক চাষে মন নাই। সদ্‌গোপ মনিবদের কাহার কৃষাণেরা কেউ বাড়ি নাই। বনওয়ারীকে ঘিরে আছে পাড়ার প্রবীণ মেয়েরা। শুধু নয়ানের মা বাদে।

মেয়েদের দলের মধ্যে বসনও এসে সেই সকাল থেকেই ব'সে আছে।

তার সমস্যা মেয়ে-জামাই নিয়ে। করালী পাখী কোঠাঘর তুলল। এই নিয়ে পাড়ার মেয়েরা যে গবেষণা করছে, তাতে তাকে আতঙ্কিত ক'তে তুলেছে। সে নিজেও ভেবে দেখেছে, কেউ কখনও করে নাই। করালী করছে—অনিষ্ট ঘটা বিচিত্র কি? কিন্তু করালী মানবে না। অন্য কোন মেয়ে হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে যেত। সুচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে করালী পাখীর। করালী সুচাঁদকে প্রায় দূর ক'রেই দিয়েছে। সুচাঁদ কাঁদছে, বাবাঠাকুরকে ডাকছে, করালী-পাখীকে এবার আর অভিসম্পাত দিচ্ছে না. তিরস্কার করছে এবং বাবাঠাকুরকে বলছে—মতি ফিরিয়ে দাও, সুমতি দাও। প্রথম দিন সে আনন্দে গৌরবে পাখীর বাপের জন্য, নিজের বাপের জন্য কেঁদেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছে বিপদ। সর্বাগ্রে সে-ই বুঝেছে। বারণ করতে গিয়েছিল। করালী তাকে দরজা দেখিয়ে বলেছে নিকালো অর্থাৎ বেরিয়ে যাও।

ও-পাশ থেকে নয়ানের মা ফোড়ন দিয়েই চলেছে। —হে বাবা, একবার যেমন নিয়েছ, আবার তেমনি ক'রে নিয়ো। তোমার বাহনের বিষ নিঃশ্বাসে 'ফুস ধা' ক'রে দিয়ো। সঙ্গে সঙ্গে এবার দ্যাল চাপা বাবা। কোঠাঘরের দ্যাল হুড়মুড় ক'রে।

নসু গাল দিচ্ছে ইঙ্গিতে—হাঁপাতে হাঁপাতে 'ফুস-ধা' হয়ে যাবে লো। অর্থাৎ নয়ান। যে মুখে পরের মন্দ চায় লোকে, সে মুখে লোকের পোকা পড়বে লো।

দু হাতের বুড়ো আঙুল নাড়ছে আর ঢেউয়ের মত দুলছে।

বাকি গোটা পাড়াটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কালবৈশাখীর অপরাহ্নের মত। বনওয়ারী ভাল হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছে। করালী ভীষণ হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সে বাবাঠাকুরের শিমলবৃক্ষের চেয়ে মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে। সত্যিই উঠেছে। আবার সেদিন শিমুলগাছের উপরে উঠেছিল। এবার আর ডালে উঠেই ক্ষান্ত হয় নাই, একেবারে ডগায় উঠে কাহারপাড়াকে হেঁকে বলেছিল দেখ।

করালীর অপরাধেই যত অঘটন ঘটছে, এই অপবাদের প্রতিবাদেই সে গাছটায় আবার উঠেছিল। এবার সে চমৎকার একটা টিয়াপাখীর ছানা পেড়ে এনেছে শিমুলবৃক্ষের কোটর থেকে। আগের থেকে অনেক গুণ তার বাড় বেড়েছে। কোট পেন্টুলেন প'রে বেড়াচ্ছে। বলে—যুদ্ধের পোশাক। যুদ্ধের চাকরি নিয়েছে করালী। হঠাৎ সেদিন ওই পোশাক প'রে এসে বললে—যুদ্ধের চাকরি নিলাম। এবার আর দিন-মজুরি নয়। মাসমাইনে। পায়ে জুতো। ফোস্কা পড়েছে, খুঁড়িয়ে চলছে, তবু জুতো ছাড়বে না। ছোঁড়ারা সব চুলবুলিয়ে উঠেছে। প্রবীণদের আশঙ্কার অবধি নাই। কিন্তু বসনের সমস্যা কোঠাঘর। সেই কোঠাঘরের কল্পনা সে কাজে পরিণত করতে শুরু করেছে। ঘর আরম্ভ করে দিয়েছে।

বিয়েবাড়ি থেকে ফিরেই হ'ল বনওয়ারীর অসুখ। বসন বিব্রত হয়ে ধরেছিল রতনকে, প্রহ্লাদকে। পাগল থাকলে ভাল হ'ত কিন্তু সে সেই দিনই সকালে চ'লে গিয়েছে, ব'লে গিয়েছে—দুদিন ঘুরে মন ভাল ক'রে আসি। পনেরো দিন হয়ে গেল, আজও ফেরে নাই।

রতন প্রহ্লাদ অবাক হয়ে বলেছিল—কোঠাঘর।

—হ্যাঁ। তোমরা বারণ কর। যা পিতিপুরুষে করে নাই, তা করতে নাই।

রতন এসে বললে—করালী?

—কি ? করালী বুঝতে পেরেছিল।

—কোঠাঘর করছিস তু ?

—হ্যাঁ।

—পিতিপুরুষে কখনও করে নাই—

—তা না করুক। আমার বাবা যুদ্ধের কাজও করে নাই।

রতন এগিয়ে এল এবার।—দেখ করালী, কথা শোন। ভাল, আমাদের কথা না শুনিস, বনওয়ারীর কথা শুনবি তো ?

—যদি না শুনি ?

প্রহ্লাদ এবার ধমক দিয়ে বললে—শুনতে হবে। সবাই শোনে, তুমি শুনবে না কি রকম ? সে সেরে উঠুক। তার সাথে শলা পরামশ্য ক'রে যা বলে করবি।

করালী বলেছিল—যাঃ কচু খেলে। এর আবার শলাই বা কিসের, পরামশ্যই বা কেনে ? যাও যাও। তোমাদের শলা পরামশ্য যদি লাগে তো মাতব্বরের জ্বর ছাড়ার লেগে ব'সে থাকো গা। আমার শলা পরামশ্য চাই না।

প্রহ্লাদ বলেছিল—ঘর করতে হ'লে নেয়ম হ'ল মাতব্বর এসে দড়ি ধরে।

—আমি নেয়ম মানি না।

—তোর বুঝি গায়ে জোর হলছে বেজায় ? ধরাকে সরা দেখছিস ?

—সরা নয় খুরি। যাও যাও, মেলা ফ্যাচর্‌ফ্যাচ ক'রো না।

রতন মাথলার বাবা, মাথলা করালীর সাকরেদ, রতন তাকে বলেছিল—দুদিন সবুরই কর্ না কেনে বাবা।

—উঁহু। বর্ষার আগে ঘর সারতে হবে অতনকাকা। সবুর করবার টায়েম কোথা ? আমার আবার যুদ্ধের চাকরি। যেখানে হুকুম করবে, যখন বলবে, তখুনি যেতে হবে।

রতন বলেছিল—কিন্তু ভাল কাজ হচ্ছে না করালী। কেউ কখনও করে নাই কোঠাঘর।

—না করুক। আমি করবই।

গুপী বলেছিল—যা কেউ করে নাই, তা করতে গেলে খ্যানত হয়। চৌধুরী মাশায়রা দালান করতে ইট পোড়ালে, লোকে বারণ করেছিল, সে আমলে চৌধুরী শোনে নাই, ইটের ভাঁটা পুড়ল—উদিকে চৌধুরী মাশায়ের ছোট বেটা ধড়ফড়িয়ে ম'রে গেল।

—আমার তো বেটা হয় নাই এখনও। হেসে জবাব দিয়েছিল করালী।

আপসোস হচ্ছে বসনের। এ জামাই নিয়ে কখনও সুখ পাবে না সে। এই সব কি কথাবার্তার ধরন, না ছিরি ! এই সব মাথার মাথার লোকের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা যখন করালী বলে, তখন বসন ভয়ে লজ্জায় সারা হয়ে যায়। নিমতেলে পানুকে তো সে মারতে বাকী রেখেছে। নিমতেলে পানু করালীর সামনেও আসে নাই। মুখোমুখি তাকে কোন কথা বলে নাই ; নিজের বাড়িতে ব'সে সে নয়ানের মাকে বলেছিল—এ কাল তাকাৎ তিন-তিনটে মোড়ল-মাতব্বরের গুষ্টি গুজুরে গেল—আটপৌরেদের পরমদের ঘর, ঘরভাঙাদের বাড়ি, কোশকেঁধেদের গুষ্টি, তারা কেউ কোঠাঘরে পরিবার নিয়ে শোয় নাই বাবা।

কথাটা করালীর কানে উঠতেই সে পানুর বাড়ি ব'য়ে গিয়ে তার সামনে উপু হয়ে

ব'সে বলেছে—হা শালো, মাতব্বরেরা কোঠায় শোয় নাই ব'লে আমি শুতে পাব না?

নিমতেলে পানু সেদিন সেই চড় খাওয়া অবধি করালীকে দুর্দান্ত ভয় করে। সে কোন জবাব দেয় নাই। করালী তবু ছাড়ে নাই, নিরুত্তর পানার মুখের সামনে ঠিক পানার মত ভঙ্গিতে ব'সে ভেঙিয়ে মৃদুস্বরে শ্লেষের সঙ্গে বলেছে—হা শালো, বনওয়ারী মাতব্বরের পরিবারের যে রঙ কালো, দেখতে সে যে কুচ্ছিৎ—তা ব'লে আমি ফরসা সোন্দর মেয়ে বিয়ে করতে পাব না? তোমার পরিবারের তো অঙ ফরসা, তা—তাকে তুমি ছাড়। শালো। বলি ওরে শালো। ব'সে ব'সেই খানিকটা এগিয়ে গেল পানুর দিকে।

পানু বেচারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সভয়ে সেও ব'সে ব'সেই পিছিয়ে স'রে যেতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল—ওই—ওই, উ সব কি কথা?

করালীও ব'সে ব'সে পানুর দিকে আরও এগিয়ে গিয়েছে আর বলেছে—ইটের বদলে পাটকেল্ল রে ছুঁচো।

তোর যা মন তাই করগা কেনে। আমার কি।

আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে ব'সে করালী প্রশ্ন করেছে—তাই তো শুধুইছি রে ছুঁচো, তোর কি? আমি কোঠাঘর করব, তাতে তু কথা বলবি কেনে? শালো ছুঁচো।

বসন্ত বার বার অনুরোধ ক'রেও করালীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নাই। মহিষের মত তার গোঁ। শেষ পর্যন্ত পাখী এসে তাকে ক্ষান্ত ক'রে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যেমন করালী, তেমনি পাখী। মেয়ের রঙ যেমন গোরো, তেমনি তেজ—

যেন আগুনের হলকা। ভয়-ডর নাই। করালীকে বললে—উঠে আয়।

করালী গ্রাহ্য করলে না

—শুনছিস?

—না।

মেয়ে এসে ধরলে তার হাত, ছাড়িয়ে নিলে করালী। পাখী ধরলে তার চুলের মুঠো, করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুল ছাড়িয়ে রেগে উঠল, হাঁক দিয়ে উঠল—আ-ই। সঙ্গে সঙ্গে পাখী নিজের কপালে পাগলের মত কিল চড় মারতে আরম্ভ করলে—এই লে—এই লে—এই লে।

করালী হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর গিয়ে তার হাত ধ'রে মিষ্টি কথায় আনুগত্য স্বীকার ক'রে বললে চ চ বাপু, চ। ঘর যেছি আমি। থাম বাপু, থাম্। আসবার সময় নয়ানের মাকে ব'লে এসেছি, মরাকে আমি কোন কথা বলি না। মরার গালেও আমার কিছু হবে না। দে তুই গাল, দে যত পারিস।

পাখী তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোঠাঘর তোলার সঙ্কল্প থেকে। কিন্তু পাখীও ক্ষেপেছে কোঠাঘরের জন্যে। যেমন এ কালের ছেলে, তেমনি এ কালের মেয়ে। পাখী বলে—চন্ননপুরের বাউরীরা কোঠাঘব করেছে—হারু বাউরী, শম্ভু বাউরী, কানাই বাউরী।

—সে তো চন্ননপুরে। আর তারা তো কাহার লয়।

—তা হোক কেনে।

তাই বসন্ত এসে ব'সে আছে বনওয়ারীর কাছে। সুযোগ পেলেই বনওয়ারীকে বলবে।

করালীকে এক সে-ই নিবৃত্ত করতে পারে। তা ছাড়া আর একটা আশঙ্কা আছে তার। করালী যাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তারা নিশ্চয় সাতখানা ক'রে বনওয়ারীর কাছে করালীর বিরুদ্ধে লাগাবে। বনওয়ারীকে বুঝিয়ে সে আগে থেকেই ঠাণ্ডা ক'রে রাখতে চায়। বনওয়ারী মাতব্বর বিরূপ হ'লে করালীর কি হবে, সে কথা ভেবে বসন্তের অনেক আশঙ্কা। কিন্তু এ মজলিসের মধ্যে বলবার সুযোগ পাচ্ছে না সে। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সুযোগ মিলল। হঠাৎ বনওয়ারী উঠল, গোপালীবালা বললে—এই, কোথা যাবা?

—বাবাঠাকুরের থানে। তার মুখ দেখে কেউ 'না' বলতে পারলে না।

বনওয়ারী উঠতেই বসন্ত বললে—চল, আমি যাই সাথে।

স্নেহভরে বনওয়ারী বললে—আসবি? আয়। লইলে বনওয়ারী একটা জ্বরে কাবু হয় না, এখনও তোর এক কোশ পথ গিয়ে ফিরে আসতে পারি, দুপুরের মধ্যে। একটু হাসলে সে।

যাবার পথে হেসে বলদ দুটি এবং গাই কয়টির কাছে দাঁড়িয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে। ডাইনের আটকেলে অর্থাৎ সাদার উপরে আটটি কালো দাগবিশিষ্ট বলদটা বনওয়ারীর বড় ন্যাওটা। ওটা তার ঘরেরই বাছুর—বলদটা তার হাত চেটে মাথা নেড়ে নানা ভঙ্গিতে আনন্দ প্রকাশ করলে। বনওয়ারী একটু প্রসন্নতার স্পর্শ পেলে ওদের কাছ থেকে। মনে মনে বললে—মা ভগবতী, তোমাদের সেবার তো কখনও ত্রুটি করি না মা, তোমাদের আশীর্বাদে আমার এই পাপটি খণ্ডে দাও।

পথে সেই আটপৌরে পাড়ার বটগাছের তলায় কালোবউয়ের সঙ্গে তার দেখা হ'ত। বনওয়ারী বললে—একটুকুন দাঁড়া বসন।

বসন ভাবলে, ক্লান্তি। বললে—না এলেই হ'ত। বললে—পরে আমি এসে কত্তার থানের মিত্তিকে নিয়ে যেতাম।

বনওয়ারী উত্তর দিলে না। সে ভাবছে। কালোবউয়ের কথা, তার অপরাধের কথা।

—বনওয়ারী হা? অথাৎ বনওয়ারী নাকি?

বনওয়ারী ফিরে তাকালে। আটপৌরে পাড়ার বুড়ো রমণ আটপৌরে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে। রমণ পরমের আত্মীয়—ভায়রাভাই, কালোশশীর বড় বোনকে সে বিয়ে করেছে। বনওয়ারী তার বাঁকা ভেঙে-পড়া মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। রমণ প্রবীণ লোক, সুচাঁদের বয়সী। তবে সুচাঁদ শক্ত আছে, রমণ ভেঙে দুমড়ে গিয়েছে। এক সময় রমণ শাহী লম্বা ছিল। লোকটাকে রোগেও ধরেছে। বনওয়ারী শঙ্কিত হ'ল। পরম-কালোশশীর আত্মীয় রমণ তাকে দায়ী করতে এল নাকি? বনওয়ারী জোর ক'রে হেসে বললে—হ্যাঁ গো। যাব একবার কত্তার থানে। তা যে বিকেলের ওদ, বারো-চোদ্দটা রোপবাস হ'ল, শরীরে বল নাই, তাই বসলাম একবার গাছতলায়।

বসন বিরক্ত হ'ল। কথাগুলি বলবার বড় সুন্দর সুযোগটি তার মিলেছিল।

রমণ বনওয়ারীর কাছে বসল। বললে—পরমদের বেপার তো সব শুনেছ? আঃ, কালোশশীর লেগে দুঃখ হয় আমার।

আবার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। কে জানে বুড়ো কি বলবে? আটপৌরে পাড়ার

কেউ কি জানে না, কেউ কি শোনে নাই, পরম যে কথা জেনেছিল পানার কাছে? পানা কি—

রমণ বললে— যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ মানেন না আপন বাপ। বুঝলে কিনা—পরমের পাপের ফল। কালোশশীরও বটে, নইলে অপঘাতে মিত্যু! অনেক মানা করেছি তাকে। ভূপসিং ব্রাহ্মণ, তার পরশে পাপ হয়—কতবার বলেছি

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রমণ বললে—আচ্ছা সেদিন এতে আসবার পথে কি কথা বলবার লেগে ডেকেছিল পরম? কি বলেছিল তোমাকে?

বনওয়ারীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

—বনওয়ারী।

বনওয়ারীর একটা কল্পিত কাহিনী চকিতে মাথার মধ্যে এসে গেল। সে বললে—বলেছিল চন্ননপুরের সিং মশায়ের কথা। বলে—ভাই, তু যদি আমার সাথে থাকিস, তবে ওই শালাকে একদিন ঠেঙাই। বলে—সাবাড় ক'রে শালোকে দহে ফেলে দোব গলার কলসীতে বালি ভ'রে। তা আমি অনেক বুঝালাম। শেষ চটাচটি হ'ল আমার সাথে। আমাকে বললে—আমার জাত গিয়েছে বললি কেনে মাতালশালায়? ব'লে আচমকা লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে। তা'পরে মারামারি। আমি কাবু হয়ে গেলাম। আমাকে ফেলে তখন হনহনিয়ে চ'লে এল। কি করব আমি, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, ধুলো বালি—পথে পুকুরে নামলাম। তখন শুনলাম, কালোবউকে গাল দিতে দিতে গেছে পরম। আমার তখন জ্বর এয়েছে—কাঁপছি। তা'পরেতে তো পাগল গেল—। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

রমণ বললে—যাক, তোমারও যে জ্বর। ডরিয়েছিল সকলে। বেঁচেছ এই কাহারপাড়ার ভাগ্যি। না মাথা, না হাতা। এক তুমিই আছ। আমরা এ পাড়ায় তাই বলি, অমনি মাতব্বর যদি আমাদের হ'ত। তা সেদিনে আমি বললাম পাড়াতে যে, আর আমাদের আলাদা হয়ে থেকে কাজ কি? এক হ'লেই হয়। করণ-কারণ কর, বিয়ে-সাদী হোক। আমাদের আটপৌরে আর ক'ঘর? বাঁশবাঁদি ছাড়া হুই হোথা—হেথাকার নীলকুঠি যেথা ছিল, সেখানে দু'ঘর চারঘর আছে। তাও আবার সব জাগায় নাই। তুমি বাবা, মাতব্বর হয়ে এইটি কর। নইলে আটপৌরে পাড়ার পিতুল নাই। আমি বিদ্ধ হলাম, এখনও আমার দাগী নাম ঘুচল না বাবা।

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

এ কি ভগবান হরি কালারুদ্দু কত্তাঠাকুরের লীলা! মনে মনে সে প্রণাম করলে দেবতাদের। এ কি দুঃখের মধ্যে সুখ, ভাঙনের মাঝে গড়ন!

সে বললে—একটুখানি সারি অমনদাদা। তা পরতে হবে সব কথা।

রমণ বললে— তোমার শরীলে বল হোক, একদিন নিয়ে যাবা আমাদিগে চন্ননপুরে বড়বাবুর কাছারি। পরম তো ফেরার। সে আর ফিরবেও না। তা সায়েবডাঙায় পরম যে জমি পাঁচ বিঘে নিয়েছিল, আমাদের আটপৌরেরা ভাগ ক'রে লোব। বাবুর একটা 'রনুমতি' তো চাই। তা আমাদের হয়ে সে কথা বলবার নোক নাই।

বনওয়ারী উঠল। রমণের কথাটা সে বুঝেছে।

*　　*　　*

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কত্তার থানে'র শোভাটি হয় মনোরম। বেলগাছগুলি অজস্র কচি পাতায় ভ'রে উঠেছে, কুলঝোপগুলিতেও কচি পাতার সমারোহ, বেলগাছের পাতায় সমৃদ্ধির মধ্যে পাকা বেল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গন্ধ উঠছে। কিন্তু কর্তা স্বয়ং যে গাছটিতে থাকেন, সে গাছটির আশ্চর্য মহিমা। সকল গাছে পুরনো পাতা ঝরতেই চৈত্রমাসের বিশ-পঁচিশ দিন চলে যায়, তারপর বেলগাছ কয়েকদিন ন্যাড়া হয়ে থাকে—শুধু বেলগুলো ঝুলতে থাকে, বৈশাখের আট-দশ দিন গেলে তবে কচি পাতা দেয়। কিন্তু কর্তার বাস যে গাছটিতে, সেটির পাতা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে ঝরে যাবেই, গাজনের আগে তাতে পাতা দেখা দেবেই। না দিলে চলবে না যে। জাঙলের বাবা কালারুদ্রের মাথায় গাজনের পুজোয় ঐ গাছের নতুন বেলপাতা প্রথমেই চড়াতে হয় যে। এমন চৈত্র মাসে পাতা-ধরা গাছ এ চাকলায় আর নাই। বাবার মহিমায় গাছটির আশেপাশে এই বিল্ববৃক্ষের দু-চারটি চারাপল্লবও হয়েছে। হবেই যে, যুগে যুগে এ মাহাত্ম্য বজায় থাকতে হবে তো। শ্যাওড়া গাছগুলিতেও নতুন পাতা ধরেছে। সোয়াকুলের ঝোপগুলিতেও নতুন পাতা। গাছগুলির মাথায় চারিপাশের কুলঝোপগুলির মাথা ছেয়ে আলোকলতা ছড়িয়ে পড়েছে ছাতার মত। মধ্যে মধ্যে ফুলে-ভরা ধুতরা ও আকন্দের গাছ; সবচেয়ে বাহার দিয়েছে একটা বাঁদরলাঠির গাছ। গাছটা ভ'রে অজস্র হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে—লম্বা ডাঁটায় অসংখ্য ফুল। ফুলের ভারে নুয়ে প'ড়ে দুলছে। ফুলঝুরি না বললে সে ফুল ফোটার সঠিক বর্ণনা হয় না। চারপাশে তালগাছের বেড়া। তাল ধরে হয়েছে কাঁদি কাঁদি। কর্তার থানটির আর একটি মহিমা—চারপাশে নজর চলে। পূবে ওই দূরে—পলেনের মাঠের কিনারায় দেখা যাচ্ছে বাঁশবাঁদি, তার পাশে সেই দহ, যে দহে ডুবেছে কালোবউ। উত্তরে তাকাও, দেখবে দেখা যাচ্ছে জাঙল গ্রাম। উত্তর-পূর্বে চন্নপুর ইস্টিশান একেবারে পরিস্কার দেখতে পাবে। পশ্চিমে তাকালে সায়েবডাঙা নজরে পড়বে। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে তাকাও, নজরে পড়বে কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁকের প্রথম খোঁচ। মোটা কথা, কর্তা এই বেলগাছটিতে ব'সে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেন, আর গোটা হাঁসুলী বাঁকে তাঁর দৃষ্টি দেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে মানুষের ঘরে সুখ শান্তি উথলে প'ড়ে, মাঠে ফসল লুটিয়ে পড়ে, পশ্চিম আকাশের ঝড় সসম্মানে হাঁসুলীর বাঁকের পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়, কোপাইয়ের বান দুকূল ভাসিয়ে আসতে আসতে এ কূল ছেড়ে ও কূল ভাসিয়ে চ'লে যায়। আবার কোপদৃষ্টি হানলে এর উল্টো হয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, ঝগড়াঝাঁটি, লাঠালাঠি, মনে মনে অসুখ, গাঁয়ে গাঁয়ে বিবাদ, আকাশে অনাবৃষ্টি, মাঠে অজন্মা, মাথার উপর ঝড়, কোপাইয়ের বান সেবার হাঁসুলী বাঁকের ওই প্রথম খোঁচই বল আর খাঁজই বল—ওইখানে যে বাঁধ আছে, সেই বাঁধ ভেঙে হাঁসুলীর বাঁক ভাসিয়ে চ'লে যায়।

উপুড় হয়ে পড়ল বনওয়ারী বেলগাছের সামনে। হে দয়াময়, হে প্রভু, হাঁসুলী বাঁকের মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক, হে বাবা ইহলোকের রক্ষাকর্তা, পরলোকের ত্রাণকর্তা, তুমি বনওয়ারীকে রক্ষা কর, ত্রাণ করবার ভরসা দাও। সকল পাপ তুমি ক্ষমা কর। পাপ

সে করেছে—একশো বার হাজার বার সে স্বীকার করছে তোমার চরণতলে। চোখ থেকে তার জল পড়ল। অনেক প্রার্থনা ক'রে সে উঠে বসল।

বসন অবাক হয়ে গেল তার চোখে জল দেখে। বনওয়ারীদাদা ভাল লোক, ধর্মিষ্ঠ তা সে জানে; কিন্তু এত বড় ধর্মাত্মা তা সে জানত না। মাথার উপর রোদ চড়ছে, বনওয়ারী দুর্বল শরীর, তাড়াতাড়ি ফেরাই উচিত, কিন্তু এর পর আর সে-কথা বলতে তার সাহস হ'ল না। গাছের ছায়া দেখে সেইখানেই বনওয়ারী বসল উবু হয়ে। এতক্ষণে তার মন খানিকটা শান্তি পেলে। বুকের ভিতরের উদ্বেগ অনেকটা উপশম হ'ল। কর্তাবাবার কৃপায় পাপের অবশ্যই খণ্ডন হবে। মনে মনে সে মানতও করেছে। তারপর রমণের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেও ভাল হয়েছে; পরমের সঙ্গে পথের বৃত্তান্তটাও খুব চমৎকার হয়েছে; এর পর আর কোন দোষ তার ঘাড়ে আসবে না। অপরাধ অবশ্য তার অল্পই। সে পরমকে ইচ্ছা করলে মেরেই ফেলতে পারত, কিন্তু মারে নাই। কালোবউকে নিজেও সে ডাকে নাই। সে তাকে দেখতে গিয়েছিল। বলতে গিয়েছিল পরমের আসবার কথা। কালোবউই নিজে থেকে তার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে। পরমই কালোবউকে খুন করতে গিয়েছিল। কালোবউ নিয়তির টানে গিয়ে পড়ল কর্তার দহে। বলতে গেলে কর্তাই তাকে সাজা দিয়েছেন। তার অপরাধ সে জলে ডুব মেরেছিল পরমকে দেখে, উঠে বাধা দেয় নাই, আর কালোবউকে তুলবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাই। ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল সে। ভাগ্যও ভাল যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নাই, নইলে সেও আর উঠত না। বাবার বাহন, বাবার বাহনই তাকে দহের বুকে ডুবিয়েছে। সে চোখে দেখেছে। করালীর পাপেই মরল কালোবউ।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পাপ আছে—পুণ্য আছে। পাপপুণ্যের চেয়ে, বিষয়বুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি বলাই ভাল। সংসারের বাঁশবন এবং জৈব কামনার আদিমকালের আপনি-জন্মানো, বট-অশথ-শিমুল-শিরীষ গাছের ঘন বনের ছায়ার তলায় জন্মানো পাপপুণ্যবুদ্ধির গাছগুলির চেহারা বিচিত্র—হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে এবং বটবনে সযত্নে পোঁতা আম কাঁঠালের চারার মত বিবর্ণ এবং হিলহিলে তাদের চেহারা, বট অশ্বত্থ এবং বাঁশবনের ওই ঘন ছায়ার মধ্যেও এরা আলোক ও উত্তাপের কিছু কিছু আস্বাদ পায় এবং আরও বেশি পেতেও গভীর কামনা তাদের আছে। কিন্তু কোনমতেই যেন পেরে উঠছে না—হাঁসুলী বাঁকের মাঠ যেন বটগাছ বাঁশগাছকেই বেশি রস দিচ্ছে। কাহারেরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে এই আম কাঁঠালের গাছগুলির দিকে। কবে বড় হয়ে ছাড়িয়ে উঠবে বাঁশবনের অন্ধকার। বটের পাশে ওরা মেলবে পল্লব। ধরে দেবে ফল। কিন্তু কোন ভরসাই পায় না। এই গাছগুলি মরছে অথবা বাঁচবার পথে বাড়ছে—সে কথায় কাহারপাড়ায় দ্বিমত রয়েছে। সুচাঁদের মত হ'ল, মরছে—নিশ্চয় মরছে। অধিকাংশ প্রবীণের মতই তাই। সুচাঁদ বলে—সেকালে লোকের ভক্তি কত ছিল। ঘর ঘর দিত মানসিকের পাঁটা। অ্যাই বড় বড় পাঁটা, অ্যাই লম্বা ডাড়ি। ড্যার বছর এক বয়েস না হ'লে বলিদানই দিত না। আতে চুরি করতে যেত মরদেরা—কত্তার ঠাঁইটিতে পেনাম ক'রে যেত। মেয়েরা কারুর সাথে অঙ করতে আগে কত্তার গাছতলায় একখান সিঁদুর দিয়ে তবে অঙ করতে নামত। কত্তা লোককে স্বপনে আদেশ দিত। গুপীর

কর্তাবাবা মাথা ঠুকলে কত্তাবাবার গাছের শেকড়ে—ই পরিবার নিয়ে আমি কি করি, তা বল বাবা তুমি ! গুপীর কত্তামায়ের অঙ হয়েছিল ওই পাড়ার একজনার সাথে। বাবা স্বপন দিলে—মেরে ফেলাও বিষ দিয়ে। স্বপনে বাবা ইয়েদের গরুমারা বিষ হাতে দিয়ে বললে—এই লে। সেই বিষে মরল গুপীর কত্তামা। তারপর সে বলে—সে আমও নাই, সে অযুধ্যেও নাই। মানুষের সে বেক্কম নাই—ভক্তি নাই, বাবাও নিজের মহিমে গুটিয়ে নিয়েছেন। যেমন কলি তেমনি চলি। কলিকালে ধম্মই নাই। তাই মানুষের হালচাল এমুনি। জাঙলের চৌধুরী মাশায় বলতেন--কলিকালে ধম্মের এক ঠ্যাঙ। তাও ক্ষ'য়ে আসছে।

ক্ষ'য়ে এলেও খানিকটা আছে, তাই এখনও কিছু কিছু আছে। বনওয়ারী তার উল্টো মত অবশ্য পোষণ করে না, কিন্তু তবু সে প্রত্যাশা করে—হাঁসুলী বাঁকের মধ্যে সে ধর্মের ওই একটি ঠ্যাঙকে আর ক্ষ'য়ে যেতে দেবে না। বনওয়ারী এসে গড়িয়ে পড়ল বাবার থানে। সান্ত্বনাও সে পেলে। মনে মনে বললে- ক্ষমা কর, বাবা, ক্ষমা কর। আমি তার জন্যে দায়ী নই, তবে করালীকে আমি সাজা দিই নাই, সে অপরাধ আমার বটে। কিন্তুক হে বাবাঠাকুর [illegible]র জন্যে তো আমার বুক খালি ক'রে কালোবউকে কেড়ে নিয়েছ। এইবার তোমার কোধ শান্ত কর।

যে যতই বলুক, বনওয়ারী জানে, কালোবউয়ের সঙ্গে তার 'অঙে'র খেলার অপরাধ বাবাঠাকুরের কাছে বড় পাপ নয়। অজ্ঞান কাহারদের এ অপরাধ ধরেন না বাবা। বাবাঠাকুর কাহারদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক—তিনি দেখেছেন যে কাহারদের 'অঙের' খেলা ছাড়া আর কোন মন-ভুলানো খেলা নাই। বাবাঠাকুরের কাছে প্রধান অপরাধ করেছে করালী। সে-ই বাহনটিকে পুড়িয়ে মেরেছে। তাঁর শিমুলবৃক্ষে বার বার উঠে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত করেছে। করালীই আবার কাহারপাড়াকে যুদ্ধে যেতে বলেছে। অসুখের মধ্যে এই সব ভাবনা ভাবতে গিয়ে বনওয়ারী একটি নতুন সত্য পেয়েছে। বাহনের শিসের মানে বুঝেছে। শিস দিয়ে দিয়ে সাবোধান ক'রে দিচ্ছিলেন হাঁসুলী বাঁকের কাহারকুলকে সাবোধান। হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে নিত্যি উড়বে উড়োজাহাজ। চন্ননপুরের জাতনাশা কারখানা বেড়ে এগিয়ে আসবে এই দিকে। পিথিমীতে যুদ্ধ লেগেছে—সাবোধান। করালীকে আড়াল করতে গিয়ে বাবাঠাকুরের হাতে মার খেলে বনওয়ারী, বনওয়ারীর বুকে আঘাত দেবার জন্যেই বাহন ছোবল দিলে কালোবউয়ের বুকে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে রইল বেলগাছটির তলায়। সামনেই পশ্চিমে সায়েবডাঙা; সেখানে কালো কালো মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে গরম বৈশাখী দমকা বইছে। আটপৌরে পাড়ার সেই বটগাছটায় সাড়া জাগছে নতুন কচি পাতায় পাতায়।

সায়েবডাঙায় কালো কালো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে--বাবুরা জমি কাটাচ্ছে। ওরা সাঁওতাল। বনওয়ারীর জমি আর এবার কাটানো হ'ল না। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়লে।

বসন পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বনওয়ারীর মুখের চেহারা দেখে তার কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। আর একবার যদি বনওয়ারীদাদা হাসে।

হঠাৎ বনওয়ারী উঠল। সুযোগ পেয়ে বসন্ত কথা বললে—চল, বেলা অনেক হয়েছে।

পথে সে সাহস ক'রে বললে—বনওয়ারীদাদা।

—হুঁ।

—তুমি বাবু করালীকে একবার বারণ করবে।

—কাকে? করালীকে?—চোখ দুটো তার জ্ব'লে উঠল। বসন ভয় পেলে।

বনওয়ারী বললে—শুনেছি কোঠাঘর করছে সে। হবে তার গোঝাপড়া। একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে আবার বললে—আমি কি কোঠাঘর একখানা করতে পারি না বসন?

শিউরে উঠল বসন্ত। মনে পড়ল—করালী বসন্তকে এই কথার উত্তর কি দিয়েছে। বসন্ত বনওয়ারীর মনও ঠিক বুঝতে পারছে না। করালী তো কম নয়। শেষে কি দুজনে—? কত কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ বনওয়ারী থমকে দাঁড়াল। বনওয়ারীর কিন্তু সবই অদ্ভুত। বসন বললে—কি হ'ল? বলতে বলতে পিছন থেকে ঘূর্ণি হাওয়া এসে দুজনকেই আবৃত ক'রে দিলে। ধুলোয় পাতায় সর্বাঙ্গ ভ'রে গেল—মুখে ধুলোবালি ঢুকল। বসন্ত এবার এটাকেই তামাশার ভূমিকা ক'রে নিয়ে অপরিমিত হাসতে লাগল--থু-থু, মা গো। পরক্ষণেই সে বিস্মিত হয়ে বনওয়ারীকে বললে—কি হ'ল বনওয়ারীদাদা? দাঁড়ালে?

বনওয়ারী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ঘূর্ণিটা তাদের অতিক্রম ক'রে সামনে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই আটপৌরে পাড়ার বটগাছটা। ঘূর্ণিটা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেমে গেল। গাছের পল্লবে পল্লবে চঞ্চলতা জেগে উঠল

বনওয়ারী কাঁপতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—বা-বাওড়? অর্থাৎ ভূত?

বনওয়ারী তার হাতটা ধ'রে বললে--পাশে পাশে আয় বসন্ত তার হাতটা ধ'রে দেখলে, বনওয়ারীর হাতটা ঘামছে থ'থর ক'রে কাঁপছে। বনওয়ারী তাকে সাহস দিতে চায়, না তার কাছ থেকে সাহস পেতে চায় বুঝতে পারলে না

সে ডাকলে ব্যানোদাদা।

বনওয়ারী উত্তর দিলে না। হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী মাতব্বর ঠিক চিনেছে, বসন চিনতে পারে নাই। কালোবউ। কালোশশী। আর কেউ নয়। কালোশশী হাসিখুশি। ঠিক তেমনি নেচে চ'লে গেল। সে ইশারা দিয়ে গেল—বঁধু, এই গাছেই আমি বাসা বেঁধেছি

হয়তো তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েও গেল। বনওয়ারী সাহস সঞ্চয় ক'রে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বাড়ি এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল বসন নিরুপায় হয়ে ফিরে গেল।

দুই

ওদিকে কোপাইয়ের ধারে খুব গোলমাল।

সুচাঁদ বাড়িতে বসে কাঁদছে--ওরে বাবা রে—কোথা গেলে রে দেখে যাও করালী মরল রে।

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বসন।—কি হ'ল? ওটে, সোরমার ক'রে চেঁচাস না, আগে বল কি হ'ল?

—ওরে আমার মাথা হ'ল রে। করালী মরল রে!

—তোর পায়ে পড়ি, বল্ কি হ'ল?

—অ্যাই আগাসায়েব লো বসন, অ্যাই লাঠি—ব'লেই কপালে চাপড় মেরে সে আবার চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে।

পাড়ায় একটা লোক নাই যে সে জিজ্ঞাসা করে। সবাই ছুটে গিয়েছে ওইখানে। ওখানে যেতে তার পা উঠছে না। পাড়ায় রয়েছে শুধু নয়ান। ব'সে হাঁপাচ্ছে, সাদা চোখগুলো যেন জ্বলছে। তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে বসনের জিভ যেন আটকে যাচ্ছে।

সে নিজেই ছুটে গেল। কোপাইয়ের ঘাটে গোটা কাহারপাড়া জ'মে গিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে করালীকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আগাসায়েবের পাগড়ি দেখতে পেলে বসন। আগাসায়েব, মানে কাবুলীওয়ালা। ভিড় ঠেলে ঢুকে বসন অবাক হয়ে গেল। করালী মরে নাই। আগাসায়েবের হাত ধ'রে বীরবিক্রমে তাকে শাসাচ্ছে—উ সমস্ত চলে গা নাই আর। হঁ। ঠেঙিয়ে দোরস্ত ক'রে দেগা। মেরে ফেলে দেগা দহমে—কুমীরে খেয়ে লেগা। সে আমল আর নেহি হ্যায়।

আগাসায়েব সবিস্ময়ে বললে—আরে, তুম চন্ননপুরসে হিঁয়া আয়া হ্যায়?

—হাঁ। হিঁয়া হামারা ঘর হ্যায়, বাড়ি হ্যায়। মনে পড়তা হ্যায় চন্ননপুরকে ঠেঙানি? হিঁয়া ওই হোগা।

আগা বললে—হামারা রুপেয়া তো দে দেও ভাই।

—কাহে? কাহে তুম হাত ধরা হ্যায়? কাহে? কাহে তুম মেয়েলোককে খারাপ বাত বোলা হ্যায়? কাহে? হামলোক সবাই মিলকে তুমকে মারকে ছাতু বানায় দেগা তো কেয়া করেগা তুম?

ব্যাপারটা ঘটেছে পাগলকে নিয়ে। দু বছর আগে পাগল একখানা র‍্যাপার কিনেছিল আগাসায়েবের কাছে। টাকা দেব্যর কথা পরের বছর। কিন্তু পাগল দেশ ছেড়েছে। টাকা আদায়ের সময় আগা এসে ওকে পায় নাই। ফিরে গিয়েছিল। এবার হঠাৎ নদীর ওপারে আজ আগার সঙ্গে পাগলের দেখা হয়ে গিয়েছে। পাগলের টাকা দেবার ইচ্ছা নাই এমন নয়, কিন্তু গতবারে যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই ব'লেই ভয়ে সে ছুটে নদী পার হয়ে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, আগাও ছুটেছে—এসে তাকে ধরেছে।—রুপিয়া ফেকো। দু-চার ঘা দিয়েছেও। পাগল চীৎকার করেছে। ঠিক সেই সময়েই কাজ সেরে চন্ননপুর থেকে করালী ফিরছিল। চীৎকার শুনে দল নিয়ে করালী ছুটে গিয়েছে এবং আগার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে।—খবরদার। মারে গা তো মাথা ভাঙ দেগা তুমারা।

আশ্চর্যের কথা, আগা থমকে গিয়েছে।

আগাসায়েব ভীষণ লোক—ভয়ঙ্কর লোক। আগারা এ দেশে ব্যবসা করেছে এতদিন লাঠির জোরে। এই জোয়ান, এই লাঠি। একজন আগা গাঁয়ে ঢুকলে গোটা গ্রাম ত্রস্ত হয়েছে। আগারা টাকার জন্য গালাগাল দিয়েছে, মেরেছে, এমন কি পুরুষদের না দেখে মেয়েদের অপমান করেছে। সেই আগার সামনে—হেই মা।

পাগল বললে—করালী, টাকা আমি দিচ্ছি ভাই, ছাড়ান দে।

—দাঁড়াও না কেনে। ছাড়ান দোব। ওর ভিরকুটি ভাঙব আমি। ব'লেই সে বললে—যাও, ভাগো। টাকা কাল দেগা—কাল, যাও—যাও—

আশ্চর্য, আগা আস্তে আস্তে চ'লে গেল—জরুর দেও, কাল রুপিয়া জরুর দেও। আচ্ছা।

—আচ্ছা, আচ্ছা। থোড়া হিং নিয়ে এস। আর এইসা জবরদস্তি মৎ করো। নেহি তো হামলোক মারে গা, হাঁ।

আগা সত্যিই চ'লে গেল। সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল।

কাহারপাড়ায় করালী যেন ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হ'লে কি হয়, রীতকরণ আলাদা—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।

নিজ চন্ননপুরের মুখুজ্জেবাবুদের এক ছেলে বিলাত থেকে সায়েব হয়ে এসেছেন। চন্ননপুরের মানুষদের মধ্যে তিনি আলাদা। । চন্ননপুরের কারখানা কাহারপাড়ার কাছে বিলাত; সেখান থেকে করালীও হয়েছে কাহারপাড়ার বিলাত-ফেরত। এবার আবার গিয়েছিল কাটোয়া, সেখান থেকে ফিরেছে করালী আর-এক মূর্তি নিয়ে।

করালী বাড়ি ফিরল পাগলকে নিয়ে। পাগল বললে—তোর এত সাহস ভাল নয় করালী, ওরা খুনের জাত।

—আমরাও খুন ক'রে খুনের জাত হব। সেদিন চন্ননপুরে ওকে ঠেলা বুঝিয়ে দিয়েছি। এ তো একা ছিল। সেথা ছিল তিনজনা, জন-দশেকে মিলে এস্যা মার দিয়েছি—লাঠি-ফাঠি ফেলে দে দৌড়। শেষে এসে লাইনমিস্ত্রীকে ধ'রে মিটমাট করে। পঁয়ত্রিশ টাকা পেত, পঁচিশ নিয়ে ফারখৎ। ও আমাকে চেনে। বুয়েচ?

পাগল বললে—না ভাই, ন্যায্য টাকা আমি দিয়ে দোব। পরকালে গিয়ে যে--না ভাই, সে হবে না।

করালী অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়লে—সে তুমি দাও গা। কিন্তু ও এসে খপ ক'রে হাত ধ'রে অপমান করবে, আমি থাকতে তা হবে না। টাকা তুমি দাও আমি ঠিক কাটব পাঁচ টাকা—দেখো তুমি। ও তোমার পবিবার তুলে গাল দিয়েছে কনে?

—আমার তো পরিবার নাই, তা নিয়ে হাঙ্গামা কেনে?

–আজ নাই, একদিন তো ছিল। ও তুমি যাই বল, আমি শুনব না। ব'লেই সে একটা গাছের গুঁড়িতে ব'সে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার ক'রে একটা দিলে পাগলকে, একটা নিলে নিজে, অন্য সকলকে দিলে বিড়ি। তারপর মজুরদের বললে—জোরসে ভাই কাম চালাও।

করালীর ঘর তৈরি হচ্ছে। আজ মাটি তৈরির দিন। কাল দেওয়ালে নতুন পাট চড়বে। প্রায় দু'হাত উঁচু দেওয়াল উঠে পড়েছে।

গোটা পাড়াটা তার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটা ক্ষুব্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এতখানি দম্ভ, এতখানি আস্ফালন তার। সহ্য করতে পারছে না। পানা আসেই নাই। সে আপন ঘরে বসে বিস্ফারিত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরব হয়ে ব'সে আছে। নয়ান হাঁপাচ্ছে, আর নখ দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে। নয়ানের মা আপন মনেই গালাগাল

দিচ্ছে : গালাগাল দিচ্ছে পানার উঠানের নিমগাছটাকে।—গাছটা অত্যন্ত উঁচু এবং বিস্তৃতপল্লব হয়েছে, কাক বসছে, হাড় ফেলছে, ময়লা ফেলছে, হনুমানের বসত হয়েছে ; গোদা হনুমানটা ওই গাছের মাথাতে এসে ব'সে খ্যাঁকার-খ্যাঁক্ খ্যাঁকের-খ্যাঁক শব্দে শাসায় কোপাইয়ের জঙ্গলবাসী সন্ন্যাসীর দলকে এবং মধ্যে মধ্যে কাহারপাড়ার ঘরগুলিতে নজর চালিয়ে দেখে—কার উঠানে, কার চালে, কোন গাছে ধরেছে বেগুন কি কলা কি কুমড়ো বা লাউ বা ঝিঙে। দেখতে পেলেই উ-প শব্দে লাফ মেরে নয়ানের মায়ের চালে পড়ে। সেখান থেকে দেবে লাফ—তারপর চালে গিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে নিয়ে আবার লাফ মেরে এসে বসবে এই গাছে। নয়ানের মা তাই গাছটাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

* * *

কালোবউ—বনওয়ারী বুঝেছে—কালোবউ ইশারা দিয়ে গেল—ওই গাছে সে বাসা বেঁধেছে। হয়তো নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়েও বনওয়ারী নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল। আশ্চর্যের কথা। কোশকেঁধে বনওয়ারী জ্বর ছাড়লে কখনও শুয়ে থাকে না। কাল জ্বর ছেড়েছে, কালই উঠে বসেছে, আজ সকালে কত্তার থান ঘুরে এসেছে। সেই মানুষ অন্নপথ্য ক'রেও শুয়ে রইল।

কালোবউয়ের কথা সে ভাবছে। আটপৌরে পাড়ার বটগাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ডালে দোল দিচ্ছে, হয়তো দোল খাচ্ছে। গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে সে নিশ্চয় এগিয়ে আসবে—বনওয়ারীর ঘরের দিকে। বাঁশবাঁদির বাঁশবন এবং গাছপালা'র ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার সাদা গুলছাপ গায়ে মেখে ঝরাপাতার উপর পা ফেলে শব্দ তুলে এসে দাঁড়াবে তার ঘরের পিছনে। টুপটাপ ক'রে ঢেলা ফেলে দেবে ইশারা। আরও গভীর রাত্রে বনওয়ারী উঠছে না দেখে গুনগুন ক'রে গান গাইবে, তারপর ভোরের আকাশে শুকতারা উঠলে সে ফিরে যাবে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, কোপাইয়ের ধারে ধারে কত্তার দহে গিয়ে নামবে ; সেখান থেকে উঠে আবার আসবে বটতলায়। বটতলা দিয়ে বনওয়ারী গেলে বটফল ছুঁড়ে মারবে কৌতুকভরে ; কোপাইয়ের ধারে গেলে নদীর জল অথবা বালি ছিটিয়ে দেবে গায়ে। কোনদিন হয়তো দেখা দেবে মনোহারিণী সাজে সেজে, কোপাইয়ের ধারের শিরীষ কাঞ্চন তুলে খোঁপায় প'রে, অথবা দহের জলে ভেজা চিকন চুলগুলি এলিয়ে, তাতে অজস্র জোনাকিপোকা প'রে, কালো মুখে সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে হাসবে। কোনদিন হয়তো বা দেখা দেবে ভয়ঙ্করীরূপে, মাথা ঠেকবে শিমূলগাছের মাথায়, চোখ দুটো জ্বলবে আগুনের মত, লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দেবে—হিমের মত ঠাণ্ডা হাত, বনওয়ারীর ঘরের দিকে। বুদ্ধ রোষে বাঁশবাঁদির অন্ধকার-চেরা চীৎকার করবে অথবা অতৃপ্ত বাসনায় কাঁদবে, অন্ধকার উঠবে গুমরে।

শিউরে উঠল বনওয়ারী। কোশকেঁধে বনওয়ারী, দুপুর রাত্রে চন্নপুর যায় ঘোষেদের জন্য ডাক্তার ডাকতে। অনাবৃষ্টির বৎসরে কোপাই নদী পেরিয়ে ঘোষপাড়ার বিলের ধারে ধারে নিঃশব্দে নির্ভয়ে হাঁটে বনওয়ারী—কোপাইয়ের জল কোথায় কারা বাঁধ দিয়ে আটকেছে তাই দেখতে। জাঙলে কোন গোলমাল হ'লে বনওয়ারীই ছোটে সর্বাগ্রে লাঠি নিয়ে, তা

সে যত রাত্রিই হোক। জাঙলে একবার ডাকাত পড়েছিল, বনওয়ারী গিয়েছিল পাড়ার লোক নিয়ে ছুটে, সে-ই দাঁড়িয়েছিল সকলের আগে ডাকাতদের মহড়া নিয়ে। সেই বনওয়ারী আজ এইভাবে শুয়ে আছে? কোন কিছুতে তার রাগ করবার মত মনের অবস্থা কোথায়? করালীর কোঠাঘর নিয়েই বা সে মাথা ঘামাবে কি ক'রে?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কালোবউয়ের প্রেতযোনি তো অলীক নয়। পিতিপুরুষের কথার মধ্যে ওরা আছে, তারা চোখে দেখেছে। ঘরের কোণে বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে—কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে ব'সে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়। এ ছাড়া আছে 'ভুলো', সে দিক-ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে—অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। আরও আছে 'নিশি'—রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে নিশি এসে তার রূপ ধ'রে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে। সেও নিয়ে যায় ওই অপঘাত মৃত্যুর পথে। এক এক পুরুষ শেষ হ'লে তবে তাদের সঙ্গে মায়ায় অথবা হিংসায় বাঁধা প্রেতাত্মাগুলি মুক্তি পায়; আবার নতুন পুরুষে নতুন মৃতদের আত্মা—মমতা বা হিংসা যে-কোন কিছুর বশে ঘুরে বেড়ায় বাঁশবাঁদির ছায়ায় ছায়ায় কোপাইয়ের কূলে কূলে, ঘনপল্লব গাছের আড়ালে আড়ালে, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে মাঠে। হাঁসুলী বাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহুবিস্তৃত আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত।

সুচাঁদ আজও বলে ঘরভাঙাদের পূব্বপুরুষ নয়ানের বাবার বাবার বাবা মরেছিল চুরি করতে গিয়ে গেরস্তের ছুঁড়ে দেওয়া থালা কপালে গেঁথে। গেরস্তরা থালা ভেঙে সাঁই সাঁই ক'রে ছোঁড়ে কানাভাঙা থালা; সে থালা ঘুরতে ঘুরতে আসে সুদর্শনচক্রের মত। নাগলে আর অক্ষে থাকে না। তাই নেগেছিল কপালে। তাইতে মরল বাড়ি এসে। তা'পরেতে তিনি তাই হলেন। মা, দিন-রাত ঘরের সাঙায়, না হয়তো বাড়ির পাঁদাড়ে, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটরস্ত। ভয় করত না কেবল তার পরিবার—নয়ানের কত্তাবাবার মা। ঘরে ছেলে শুয়ে থাকত—নয়ানের কত্তাবা। কচি ছেলে তখন। কাঁদত তো পরিবার বলত—পোড়ামুখো মানুষ, মরেও সুখ দিলি না, জ্বালাতে এলি? শুধু সাঙায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকলে হবে না, ছেলে কাঁদছে—চুপ করা। আশ্চয্যি মা, ছেলে উঠে যেত সাঙার ওপরে। দিব্যি ছেলে দোল খেত বাতাসে। তারপর চুপি চুপি বলে—একটি ছেলে নিয়ে মেয়েটি বিধবা হল—বয়স কম, তা বলে—সাঙা করিস না, তা হ'লে ঘাড় দুমড়ে দোব। তবে ভদ্রনোকের আশ্চয়ে থাক্, কিছু বলব না। তা তাই সে ছিল। এ অঞ্চলে একজন পশ্চিমে সাউ তামুকের কারবার করত। তার নজরে প'ড়ে তার আশ্চয়ে ছিল। সে আসত, যেত। তাতে কিছু বলত না। একদিন ঘরে জল নাই, এতো তেষ্টা পেয়েছে। বললে—এত এতে আমি জল আনব কি ক'রে? বলতে বলতে মা, এক কলসী জল—কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া জল এনে নামিয়ে দিলে। একবার হয়েছিল কি—সুচাঁদ মুখখানা গম্ভীর ক'রে বলে—তখন কাত্তিক মাস, ঠাকুরের আসপুন্নিমে, কাঁদির আজবাড়িতে খুব ধুম; ছেলেমেয়েদের সাধ হ'ল কাঁদির সন্দেশ খেতে, তারা বললে—ভাই,

কাঁদির 'আজবাড়িতে ভোজের মেঠাই-মণ্ডা খেতে সাধ হচ্ছে। সেই নয়ানের বাবার বাবার বাবা—তার নাম ছিল অমাই, তার নাম ক'রে বললে—তা অমাই যদি খাওয়াতে পারে, তবেই বুঝি অমাইয়ের ক্ষ্যামতা। খোনা খোনা গলায় বাঁশ-আদাড় থেকে তখুনি অমাই বললে—কাঁল সঁকালে আঁসিস। বললে না পেত্যয় যাবে মা—সকালে নোকে গিয়ে দেখে বাঁশ-আদাড়ের মধ্যে অ্যাই এক চ্যাঙাড়ি অয়েছে, তাতে লুচি-পুরি-মিষ্টি-মণ্ডা-মেঠাই—নানান দ্রব্য। নয়ানের কত্তাবাবার গলার রজ পর্যন্ত খোনা হয়েছিল সেই তার ছোঁয়া লেগে। তার লেগে লোকের কাছে নাম হয়—খোনা কাহার। ভূত বশে থাকার তরেই তো চৌধুরীরা কাজে নিলে ওকে।

এই হ'ল হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা। তবে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মত এতেও যেন পরিবর্তন ঘটেছে। ওই সুচাঁদই বলে সে কথা। দেবভক্তি ক'মে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ ক'রে বলে—এখন ভূত হ'লে চন্ননপুরের ছোকরাবাবুরা বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়ে পরীক্ষে করে দেখতে আসবে। জাঙলে মোড়ল মহাশয়দের খোকরারা ঠেঙা লাঠি নিয়ে আসবে। তাঁদের কি গরজ? কেনে তাঁরা এই সব ঝামেলায় থাকবেন? তার চেয়ে দূরে দূরান্তরে নদীর ধারে হাঁসুলীর মাঠে দিব্যি থাকেন, শ্মশানের হাড়গোড় নিয়ে বাদ্যি বাজান, সাধ গেলে নদীতে বিলে মাছ ধরেন, চিতের আগুন লুফে খেলা করেন, ই গাছের মাথা থেকে হুপ ক'রে ভেসে চলে যান উ গাছে।

ভয়ার্ত বনওয়ারী ঘরের দরজা, এমন কি দেওয়ালের মাথার দিকে যে দুটো ছোট গোল ঘুলঘুলি ছিল সে দুটোও বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকল।

বউ বললে—জষ্টি মাসের গরম, ভেপে যাবা যি।

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে ওঠে—ঠাণ্ডা লাগবে—ঠাণ্ডা লাগবে।

বউ বললে—তবে তুমি ঘরে শোও, আমি বাইরে শোব।

—না।

গভীর রাত্রে সে উঠে স্ত্রীর কাপড়ের সঙ্গে নিজের কাপড় বেঁধে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। ঘুম খানিকটা এল শেষরাত্রে। একটু ঘুমের পরই সে ভয় দেখে বু-বু শব্দ ক'রে উঠল। স্বপ্নে দেখলে—কালোবউ গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাতরাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে বাবার সেই বাহন, করালীর ঘর উড়িয়েছেন বাবার যে বাহন, বনওয়ারীর কালোবউকে ডুবিয়ে মারলেন যিনি—তিনি।

দিনের আলো ফুটল। বনওয়ারী আশ্বস্ত হ'ল। শুধু আশ্বস্ত নয়—একটা রাত্রি অতীত হতেই সে খানিকটা সুস্থও হ'ল। রাত্রেই সে ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে—বাকুলের জাগ্রত মা-শ্মশানকালীর রক্ষাকবচ ধারণ করবে, কত্তাবাবার পুষ্পও মাদুলীতে পুরে ধারণ করবে। তা হ'লেই নিশ্চিন্ত। ভূত প্রেত যত নিষ্ঠুর—দেবতা তত দয়াল। এই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই চলে হাঁসুলী বাঁকের দিন-রাত্রি। নিজেই যাবে সে। এ কথা তার প্রকাশের উপায় নাই। প্রকাশ হ'লে হয়তো ডাক আসবে থানা থেকে। আর পাড়াময় গ্রামময় চাকলাময় কেলেঙ্কারির একশেষ। মাতব্বর সে। লোকে তাকে দেখে হাসবে। আড়ালে নানান কথা বলবে। হয়তো লোকে তেমন মান্য করবে না ; সে এক কাল গিয়েছে, যে কালে মাতব্বর

যা করেছে তাই সেজেছে। এবার সেকাল নয়।

বউ এনে নামিয়ে দিলে মুড়ি।

বনওয়ারী বললে—না। মা-কালীর থানে যাব।

উঠে পড়ল সে। পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল করালীর নতুন ঘরের কাছে। করালী নাই, দেওয়াল দিচ্ছে চন্নপুরের পাকা 'দেওয়াল-বারুইয়ে', অর্থাৎ মাটির দেওয়ালের কারিগর ; মাটি কাটছে এখানকার কয়েকজন ছোকরা। তারাও মজুর খাটছে।

বনওয়ারীর কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। মনে প'ড়ে গেল, অসুখের মধ্যেই সে শুনেছে করালীর কোঠাঘরের কথা ; হারামজাদা শয়তান অশুভক্ষণে করালী ! গায়ে জোর হয়েছে, রেলের জাতনাশ কারখানায় যুদ্ধের চাকরিতে টাকা হয়েছে, তাই ধরাকে সে সরা দেখছে। বাবার বাহনকে পুড়িয়ে মেরেছে। বাবার শিমূলবৃক্ষে চেপেছে। তাঁর কোপে নতুন চাল উড়ে গেল, তবু হুঁশ নাই। অতি বাড় বেরো না ঝড়ে ভেঙে যাবে—পিতিপুরুষের কথা। যে গাছ অতি বাড়ে, ঝড়ে ভেঙেও সে গাছের হুঁশ হয় না। পিতিপুরুষের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কোঠাঘর করবে। ঘরকে আরও উঁচু করবে ! কাহারপাড়ার সকলকে ছাড়িয়ে উঠবার বাসনা ! কাল আগাসাহেবের বৃত্তান্তও শুনেছে। খুব বাড় বেড়েছে। রাগে দুর্বল শরীর মস্তিস্ক অধীর হয়ে উঠল। কোঠাঘরে পরিবার নিয়ে শয়ন করবে ! 'হ' অর্থাৎ হাওয়া খাবে। বড়লোকপনা দেখাবে ! লোকে পথ দিয়ে যাবে, করালী কোঠার 'বারজালা' অর্থাৎ জানালা থেকে হেসে বলবে—কোথা যাবে গো বনওয়ারী কাকা ?

বনওয়ারীকে দেখে 'দেওয়াল-বারুই' মজুর সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে তার দিকে তাকিয়েছিল। বনওয়ারী খাতিরের পাত্র। সে যখন দাঁড়িয়ে দেখছে মন দিয়ে, তখন মন্তব্য করবেই ; লোকও সে পাকা ; তার মন্তব্য শুনবার জন্যই তারা কাজ বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছিল। বারুই অর্থাৎ কারিগর একটু অপেক্ষা ক'রে প্রশ্ন করলে—দেওয়ালের ধরনডা কেমন হয়েছে মাতব্বর ? মাপ ক'রে করেছি তবু তোমার চোখে দেখ দিনি—এঁকাবেঁকা ছোটবড় হয়েছে কিনা ?

তার উত্তরে বনওয়ারী প্রশ্ন করলে—করালীবাবু মহাশয় কই ?

সকলে চমকে উঠল।

বনওয়ারী নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে—চন্ননপুরে বুঝি ?

তারপর গম্ভীরভাবে বললে—কাজ বন্ধ রাখ। তোমরা ঘর যাও।

সকলের হাত মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

বনওয়ারী বললে—করালী ফিরে আসুক, কথাবার্তা আছে। কোঠাঘর করা হবে না। সে ধমক দিয়ে উঠল গাঁয়ের যারা মজুর খাটছিল তাদের—অ্যাই, কথা কানে যায় না নাকি ? যা, উঠে যা। ফেল্ কোদাল। নামা জলের টিন। যা—যা—

কোঠাঘর, কোঠাঘর ! গাঁয়ে টেক্কা দেবে ছোকরা ! আরে টেক্কা দেওয়া কি সোজা কথা ? 'অঙের' খেলায় টেক্কার চেয়ে গোলাম বড়, নহলা বড়। কাহারপাড়ার মাতব্বর—অঙের খেলা নয়—এখানে টেক্কা বড়। তারপরে সায়েব। টেক্কা হলেন বাবাঠাকুর, সায়েব হ'ল মাতব্বর। এখানে গোলাম করালীর খেলা চলবে না। এই হ'ল বিধাতার নিয়ম ; বনওয়ারীকে

মাতব্বর করেছে বাবাঠাকুরের দয়া। আরে বাবা, বনওয়ারীর ঘরের দিকে চেয়ে দেখ। সে কি করতে পারত না একখানা কোঠা ? পিঁপড়ের পালক উঠেছে। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। মঙ্গল অমঙ্গল বুঝতে পারে না, ঝকমকে কিছু দেখলেই ফরফর ক'রে উড়ে যায় ; পুড়ে মরে, ধাক্কা খেয়ে মরে, দিশেহারা দেশহারা হয়ে মরে। হাঁসুলী বাঁকের সোনার মাঠ। এ মাঠ গ্রীষ্মে যত কঠিন, বর্ষায় চাষ খোঁড়ের পর তত নরম, তত মোলাম। এই মাঠের ধানে পানে, কলাইয়ে কাপড়ে. তরিতে তরকারীতে যার পেট ভরল না তার পেট দুনিয়ার কোথায় ভরবে ? এ মাটি চ'ষে খুঁড়ে যার পেট ভরে না, বুঝতে হবে তার অদৃষ্টের দোষ, পূর্বজন্মের কর্মফল, এ জন্মের কুটিল মনের, কুঁড়ে গতরের সাজা। এককাল গিয়েছে, সেকালে কাঁধে ঘাঁটা ফেলে বেহারাগিরি ক'রে বাঁচত কাহারেরা, তারপর কত্তাঠাকুরের দয়া হ'ল, তিনি মন্বন্তরের মাঝে কাহারদের দিকে ফিরে তাকালেন। চৌধুরী মহাশয়কে স্বপন দিয়ে ভিটে দেওয়ালেন, ভাগে কৃষাণিতে কাহারদের জমি দিতে বললেন। চৌধুরী মহাশয় মারফতে কর্তার সে আদেশ কাহারদের উপরে। তাঁর দয়াতেই তো গোটা হাঁসুলী মাঠের অর্ধেকের উপর তাদের করতলগত। জাঙলে ঘর কয়েক হাড়ী ডোম আছে, মুচি আছে, আগে তারাই করত জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়দের জমি। আজ তারা হ'টে গিয়েছে। এককালে যে কাহারেরা চাষকর্ম জানত না, আজ তাদের চেয়ে ভাল চাষী 'মুনিষ' এ চাকলায় নাই।

করালী হতভাগা—করালী বদমাশ। শুধু তাই বা কেন ? করালী অশুভক্ষণে ; অশুভক্ষণটিতে ওর জন্ম। ওই চন্ননপুর রেল-লাইনে ওর মায়ের কেলেঙ্কারি টেলিগেরাপের খুঁটিতে খুঁটিতে কান পাতলে আজও শুনতে পাওয়া যায়। গাড়ি চ'লে যায় লাইনের উপর দিয়ে, তারে যে শব্দ হয় তাতে শুনতে পাওয়া যায়। এখন ছেলেরা মেয়েরা বলে—গাড়িটা বলছে, কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল। আগে লোকে বলত—সিদু-জগা-পেবাতী, গেল কুল গেল জাতি—সিদু-জগা-পেবাতী। প্রভাতী ছিল করালীর মায়ের নাম। হতভাগা শুনতে পায় না সে ছড়া ওই শব্দের মধ্যে ? সেই চন্ননপুরের রেল-লাইনে চাকরি ক'রে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ? 'নিলেজো' অর্থাৎ নির্লজ্জ হতভাগা। আবার যুদ্ধ দেখায় সকলকে, যুদ্ধের পোশাক প'রে যুদ্ধের কাজের লোভ দেখায় কাহারপাড়াকে।

যুদ্ধ। যুদ্ধ ! যুদ্ধ তো হাঁসুলী বাঁকের কি ? যুদ্ধ কি বনওয়ারী জানে না ? না শোনে নাই ? কটা যুদ্ধের কথা তুই জানিস ? রাম-রাবণের যুদ্ধ গিয়েছে, কুরুক্ষেত্র গিয়েছে, বাণরাজার সঙ্গে ভগবান হরির যুদ্ধ গিয়েছে, রাবণ নির্বংশ হয়েছে, ধর্মপুত্তু রাজা হয়েছেন, রাজা দুর্যোধন মরেছে, বাণ-রাজার বেটির সঙ্গে হরির লাতির বিয়ে হয়েছে। কাহারদের কি হয়েছে ? কাহারেরা বাবা কালারুদ্দুর আর বাবাঠাকুরকে ভ'জে বেঁচে আছে। বর্গী হাঙ্গামা গিয়েছে, সাঁওতালেরা খেপেছিল, যুদ্ধ হয়েছিল, জানিস তুই ? এই তো বিশ বছর আগেও আর একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে হাঁসুলী বাঁকের কি হয়েছে ? ভাল হয় নাই। মন্দ হয়েছে। মন্দ হয়েছে। অভাব এসেছে, রোগ এসেছে, দুঃখ এসেছে, সুখের কাল ঘুচিয়ে দিয়েছে। আবার লেগেছে যুদ্ধ। লাগুক। আরও খানিকটা মন্দ হবে। তার বেশি কিছু হবে না। হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর উড়োজাহাজ উড়ছে, উড়ুক। কিন্তু যুদ্ধের

ঢেউ বাঁশবাঁদির বুকে আছাড় খাবে না। বাবাঠাকুর আছেন। পৃথিবীর ভালমন্দতে হাঁসুলী বাঁকের কি যায় আসে?

ঘর বন্ধ ক'রে দিয়ে সে কালীর থানে রওনা হ'ল।

*　　*　　*

কালীর থান থেকে মাদুলী নিয়ে সে ফিরল।

মা-কালী ও কত্তাঠাকুরের পুষ্প নিয়ে স্যাকরা-বাড়ি থেকে কিনে আনা দুটি রুপোর মাদুলীতে পুরে স্নান ক'রে শুদ্ধ কাচা কাপড় প'রে লাল সুতোয় বেঁধে ধারণ ক'রে সে নির্ভয় হ'ল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মনে এবং দেহে বেশ সুস্থ হয়ে করালী সম্পর্কে সংকল্প স্থির করলে সে। মনটা এখন শান্ত হয়েছে, মনে হ'ল, ভাগ্য ভাল যে তখন রাগের মাথায় কিছু ক'রে বসে নাই। করালীকে সামনে পেলে তখন হয়তো তাই হ'ত। সে হ'লে বড়ই লজ্জার কথা—বড়ই কেলেঙ্কারির ঘটনা হ'ত সেটা। কত্তা রক্ষা করেছেন তাকে, পিতি-পুরুষের আশীর্বাদে রক্ষা পেয়েছে বনওয়ারী। সে প্রবীণ মাতব্বর লোক, তার পক্ষে এমন রাগ—বিশেষ ক'রে ওই ছেলেছোকরার উপর রাগ কি শোভা পায়? [illegible] হয় সেটা? পাড়ার মঙ্গল, প্রতিটি লোকের মঙ্গল তাকে দেখতে হবে—প্রতিটি লোককে '[illegible]' অর্থাৎ স্নেহ ক'রে 'কোলগত' ক'রে রাখতে হবে—নইলে কিসের মাতব্বর। তা ছাড়া ছোকরার 'এলেম' অর্থাৎ কৃতিত্ব আছে। কাল আগাসায়েবকে শিক্ষা দিয়েছে, এটাকে সে ভালই বলবে। গায়ে ক্ষমতা ধরে, বুকের পাটা আছে। ভবিষ্যতে মরদের মত মরদ হবে। বনওয়ারীর ছেলেপুলে নাই, করালী যদি অনুগত হয়ে থাকে তবে তাকেই শেষ পর্যন্ত সে মাতব্বর ক'রে যাবে পাড়ার। তার জন্য ছোকরার মাথায় 'হিতবুদ্ধি' দিতে হবে। একদিন গোপনে ডেকে বলতে হবে ছোকরাকে খুলে, 'হিয়া-খানিকে খোলসা' ক'রে বলতে হবে।

আরাম ক'রে তামাক খেয়ে সে বাইরের দাওয়ায় গ[illegible]ল একটু। অটপৌরে পাড়ার বটগাছের মাথাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুলছে মাথাটা। যতই দুলিয়ে ইশারা দাও সখি, বনওয়ারী আর ভুলছে না; তোমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এখন বনওয়ারী। মা-কালীর কবচ, বাবা কত্তাঠাকুরের কবচ বনওয়ারীর হাতে। তবে দুঃখ তোমার জন্যে হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে গেল সায়েবডাঙায়। দিন যাচ্ছে, না জল যাচ্ছে। যে জল কোপাইয়ে বয়ে চ'লে যায়—সে জল আর ফেরে না। যে দিনটি গেল, সেটি আর ফিরবে না। সায়েবডাঙার জমিটা এবার আর তার হাসিল হ'ল না। তবু মনের টানে সে সায়েবডাঙায় গিয়ে উঠল।

সায়েবডাঙা থেকে বনওয়ারী গেল জাঙল গাঁয়ে। মনিববাড়িতে আজ পনেরো-বিশ দিন যাওয়া হয় নাই। মনিববাড়ি থেকে এসে খোঁজ ক'রে গিয়েছে। ব'লে গিয়েছে, ঘোষবাড়িতে কাজ আসছে। মাইতো ঘোষ আজ রাত্রে আসবেন, মাইতো ঘোষের ছেলের অন্নপ্রাশন হবে। ঘোষবাড়ির কাজে বনওয়ারীর কর্তব্য অনেক। কাঠ কাটা, বাড়ি পরিষ্কার করা, উনোন পাতা, হাট তরিতরকারি আনা-নেওয়া অর্থাৎ মজুরদের কাজের সব ভারই

বনওয়ারীকে নিতে হবে। পাড়াতে আবার সে কথাটাও বলতে হবে। মজুরি পাবে—সে কাজ বাইরের লোক পায় কেন? তা ছাড়া পাত পেড়ে প্রসাদের সঙ্গে বালতি-ভরতি বাড়তি ভাত-তরকারী-ডাল ছাঁদা সেও মিলবে। এঁটোপাতা পরিষ্কার করবে, সকড়ি বাসনগুলো মাজবে মেয়েরা—তার জন্য জনাহি এক পাই অর্থাৎ আধ সের চাল আর আঁচলে মুড়ি পাবে। অবিশ্যি কাজের এখনও দেরি আছে, মাসতিনেক। তবু করতে হবে তো। হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে প'ড়ে গেল করালীর কথা। করালী বলেছে—জাত যায় এঁটো খেলে। কাহারেরা সদ্‌গোপের এঁটো খায়।

ঘোষবাড়ি ঢুকতেই বড় ঘোষ বললেন—কি রে। শরীর আবার অসুখ করছে নাকি?

বনওয়ারী মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে—মাথার ভেতর দপদপ করছে। তা সেরে যাবে।

মাইতো-বউ বললেন—কি গো কাহার দেওর, এই সময় অসুখ করলে? ঘরে কাজ।

বনওয়ারী বড় ঘোষের চেয়ে অনেক বড়, তবু 'জাতে ছোট' ব'লে বউয়েরা ওকে 'কাহার-দেওর' বলে। বনওয়ারী হেসে বললে—সেরে উঠেছি বউঠাকরুণ, আর ভাবনা কি? আর দু-চার দিনে যে-কে সেই হয়ে যাব। হুকুম করেন কি করতে হবে।

বড় বউ বললে—তোমাকে আজ কিছু করতে হবে না। তুমি মান্দের ছোঁড়াকে ব'লে যাও, কাটা কাঠের উপর যেন তালপাতা ঢেকে দেয়। মেঘ চমকাচ্ছে, আকাশে ছটাও বাজছে। জল হ'লে শুকনো কাঠ ভিজবে।

বড়গিন্নী খুব হুঁশিয়ার গিন্নী। বটে, আকাশ থেকে থেকে যেন চমকে উঠছে। সূর্য ঢাকা পড়ছে পশ্চিমে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে থেকে কাঠ ঢাকা দেওয়ালে। শেষে নিজেও এক-আধবার হাত লাগালে।

ফিরবার সময় আঁচলে মুড়ি নাড়ু নিয়ে ফিরল সে। আরও কয়েকটি জিনিস সংগ্রহ করেছে সে—খাটের এক টুকরো ছত্রির ভাঙা ডাণ্ডা, চমৎকার টামনার বাঁট হবে। আর পেয়েছে একটা হাত-পা-ভাঙা কাচের পুতুল—মাটির মধ্যে চাপা পড়ে ছিল সেটা। ঘরের তাকে দিব্যি সাজানো থাকবে। আরও পেয়েছে খানিকটা সুতো আর একফালি প্যাকিং পেপার। সুতোটায় কাজ হবে, কিন্তু কাগজটায় কি হবে তার কিছু ঠিক নাই। দুটি ঝকমকে ধাতুর বোতামও পেয়েছিল, সে দুটি বউঠাকরুণকে দিয়ে এসেছে; কে জানে সোনাদানা কি বটে!

ফেরবার পথে কালারুদ্রতলায় 'কর্তার থানে' সে আবার প্রণাম করলে। বিপদে রক্ষা করো প্রভু, মাঠে ফসল দিয়ো, আর যেন কুমতি না ঘটে, কাহারপাড়ার মঙ্গল ক'রো। কর্তার থানে প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে হ'ল। মনে পড়ল আটপৌরে পাড়ার 'অঙ্গনে'র কথাগুলি। সে মানত করলে কর্তার কাছে—যদি আটপৌরে পাড়ার কাজটি হয়, কাহারেরা যদি আটপৌরেদের সঙ্গে এক 'থাকে' অর্থাৎ স্তরে ওঠে, তা হলে সে বাবার বেল-'বিক্ষ'-তলাটি বাঁধিয়ে দেবে, যেমন ঘোষেরা দিয়েছে ষষ্টিতলা বাঁধিয়ে। কালারুদ্রতলা এখন ফেটেছে, এককালে চৌধুরীরা ওই কালারুদ্রতলা বাঁধিয়েছিল।

প্রণাম সেরে উঠেই বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে তার

দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চ'লে যাচ্ছে—মেয়েটি চলছে যেন হেলেদুলে।

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল—কে মেয়েটি ? মেয়েটির মধ্যে যেন কালোশশীর ঢঙ আছে। অবিকল কালোশশীর মতই দেখতে।

মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল সেই বটগাছতলায়। বনওয়ারী একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। তার বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কালোবউ কি মোহিনী রূপ ধ'রে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে? সে মাদুলী ঠেকালে কপালে।

—কে ? বনওয়ারী ?

—কে ? বনওয়ারী চমকে ফিরে তাকালে। বুড়ো রমণ আটপৌরে আসছে জাঙল থেকে।

রমণ বললে - কথাটা ভেবে দেখেছ ? আজ যাব 'এতে' তোমার পাড়ায়।

—বেশ। এসো। বনওয়ারী অন্যমনস্ক ভাবেই বললে। সে আবার তাকিয়ে দেখলে গাছতলার দিকে। না, কালোবউ মোহিনী সেজে আসে নাই। তাহ'লে রমণকে দেখে সে নিশ্চয় অদৃশ্য হয়ে যেত। তবে ও কে ?

মেয়েটি এবার কথা কইলে। চেঁচিয়ে ডাকলে—এস কেনে গো মেসো। দাঁড়িয়ে থাকব কত ?

ও রমণকে 'মেসো' বলছে। তবে কালোবউয়ের বোনঝি। তাই তার মত দেখতে। সে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার প্রণাম করলে বাবাঠাকুরকে।

সবে প্রণামটি সেরে উঠেছে বনওয়ারী, অমনি কোথায় একটা গোল উঠল। দিকনির্ণয়ের জন্য অন্য কোন দিকে তাকালে না, তাকালে কাহারপাড়ার দিকে।

করালী—করালী—করালী। আর কে ? একা করালীই কাহারপাড়ায় হাজার গোলমাল তৈরি করছে। বনওয়ারী এসে দাঁড়াল করালীর উঠানে। চারিদিকে লোক জ'মে রয়েছে, মাঝখানে করালী অন্য একজনের হাত চেপে ধ'রে হাতি ফুলিয়ে বুনো জানোয়ারের মত চীৎকার করছে, ফুলছে। লোকটা কে ? চৌধুরী-বাড়ির মাস্টার, আটপৌরে পাড়ার নবীন। ব্যাপার কি ? হ'ল কি ? কেউ বলে না। লোকের দুঃখে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে। বসন্ত বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। করালী চীৎকার করছে—মানি না আমি। কারু হুকুমে যাই না আমি। আইন আছে, আদালত আছে, পারে তো আমাকে উঠিয়ে দিতে বলিস। জোর করতে এলে আমারও জোর আছে।

সুচাঁদ তারস্বরে কাঁদছে।

কিন্তু হ'ল কি ? নীলের বাঁধ সম্পর্কে কাহারেরা চৌধুরী-বাড়ির বাঁধের পাড়ের চাকরাণ প্রজা। বরাবর নিয়ম, ঘর ভেঙে ঘর করতে হ'লে চৌধুরীদের হুকুম নিতে হয়। মুখে বললেই হুকুম হয়ে যায়—এক টাকা নজর দিতে হয়। নজর এক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে করালী বসন্তকে দিয়ে। কিন্তু আজ চৌধুরী-বাড়ির লোক এসেছে করালীকে নিয়ে যাবার জন্য—এক টাকা নজর দিয়ে কোঠাঘর করার কথা নয়। আর কোঠাঘরের শর্তও নাই কাহারদের সঙ্গে। আগেকার বিক্রম থাকলে চৌধুরীদের পাইক এসে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। একালে সর্বস্ব গিয়ে চৌধুরীরা বিষহীন সাপ, তাঁরা পাইকের বদলে

আটপৌরে পাড়ার নবীন মাহিন্দারকে পাঠিয়েছে করালীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। নবীন করালীকে ঠিক ওজন করতে পারে নাই। চৌধুরী-বাড়ির ভাঙা দালানের নোনা-ধরা ইঁটের দাওয়া থেকে হুকুম নিয়ে আটপৌরে পূর্বপুরুষদের ঘুণ-ধরা বাঁশের লাঠি হাতে এসে করালীর হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে বলেছিল—এই চল্। হুকুম আছে ধ'রে নিয়ে যেতে।

—হুকুম? কার হুকুম?

—চৌধুরী মাশায়ের।

করালীর মেজাজ খারাপ হয়েই ছিল। লাইনের কাজ থেকে ফিরেই সে বনওয়ারীর দেওয়াল বন্ধ করার খবর শুনেছিল। এক কথাতেই মাথা গরম হয়ে গেল তার। আটপৌরে ছোঁড়ার লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে এবং নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছোঁড়াটার হাতটা খপ করে চেপে ধরল। রীতিমত হাতখানা মুচড়ে ধরে চীৎকার করতে লাগল। অসম্বদ্ধ প্রলাপ নয়—রীতিমত আইনের কথা। শিখেছে ওই চন্ননপুরের ইস্টিশানে। সেটেলমেন্ট হয়ে গিয়েছে—পরচা আছে তার। তাতে লেখা আছে, বাস্তুভিটা তার। সেখানে যে যেমন ইচ্ছা ঘর করতে পারে; এমন কি যে এক টাকা ভালমানুষের মত দিয়েছে তা দেওয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না, খাজনার দরুণ একটি বেগার তাকে দিতে হবে—সেও সে ইচ্ছে করলে গতরে খেটে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে একজন মজুরের মাইনে ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিয়েই খালাস।

চৌধুরীরা সেটেলমেন্টের সময় পাল্কী-বহনের দাবির বদলে মজুরি বেগারই চেয়েছিলেন। বারান্দার ছাদ ধ্বসে প'ড়ে পাল্কী তাঁদের ভেঙে গিয়েছে। বেহারার চেয়ে বেগারই তাঁদের বেশি উপকারে লাগবে—এই হিসাবই তাঁরা করেছিলেন। সে কথা যাক, পাড়ার লোকেরা—করালীর ঔদ্ধত্য দেখে নয়, তার এই আইনের ব্যাখ্যার অভিনবত্ব এবং দখলের জোর দেখে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেল।

বনওয়ারী এগিয়ে এসে নবীন এবং করালীর মাঝখানে প'ড়ে বললে—ছাড়্।

করালী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যে! তাই বলি, মাতব্বর কই? তোমার সাথেও আছে যে একচোট। বলি তুমিই বা আমার ঘর বন্ধ করেছ কেনে?

বনওয়ারীর মাথায় আগুন জ্বলে গেল। সে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে অকস্মাৎ একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—বাজ ডেকে উঠল যেন।

তারপর যে কাণ্ড ঘটল, সে কাণ্ড উপকথায় খাপ খায়, একালের কথায় শোভন হয় না। কিন্তু তবু হাঁসুলী বাঁকে ঘটে।

করালীও সেটা কল্পনা করতে পারে নাই। প্রহ্লাদ রতন গুপী পানা প্রভৃতি প্রবীণেরা এল কোদাল নিয়ে। জনকয়েক চেপে ধরলে করালীকে। বাকি কয়জন চালাতে লাগল কোদাল। তার কোঠাঘরের বনিয়াদ তছনছ ক'রে দিলে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে রইল স্থিরভাবে। মধ্যে মধ্যে আঙুল দেখিয়ে হুকুম দিলে—ওইখানটা 'অইল', ফেল কেটে।

হেঁই-য়ো, হেঁই-হো; হুম-হুহ; হাঃ-হাঁ—বিভিন্ন মুনিষে বিভিন্ন শব্দ ক'রে কোদালে কোপ মারছে। পানার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি। সে কাটছে—হেঁই-হেঁই। হঠাৎ কে চীৎকার ক'রে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়—স'রে যাও, স'রে যাও। অবাক হয়ে গেল সকলে। টলতে

টলতে আসছে একটা কঙ্কালসার মানুষ। তারও হাতে কোদাল। সে হেঁপো-রোগী নয়ান।

—স'রে যাও, স'রে যাও। আমি কাটব। তার পাঁজরার নিচে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠছে, যেন জ্বলছে।

করালী আর চঞ্চল নয়, তার সর্বাঙ্গে ধুলো, সেও অদূরে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে দেখছে। পাখীও স্থির হয়ে দেখছে, তাব দৃষ্টি একটি লোকের উপর নিবদ্ধ—সে ওই হেঁপো-রোগী নয়ান। সে দৃষ্টি যেন বিষদৃষ্টি।

করালী হঠাৎ পাখীর হাত ধ'রে বললে—আয়, চ'লে আয় চন্ননপুর।

গটগট ক'রে সে চ'লে গেল। নয়ানের তাতেও আনন্দ।

তারপর বসল মজলিস।

বনওয়ারী বসল থমথমে মুখ নিয়ে। বনওয়ারীর এমন চেহারা অনেকদিন কেউ দেখে নাই। বনওয়ারী কথা বলতে লাগল আস্তে আস্তে। বনওয়ারীর এমন কণ্ঠস্বর অনেকদিন কেউ শোনে নাই। শুধু তাই নয়, গোটা পাড়াটার ভাবভঙ্গি যেন আর একরকম হয়ে গিয়েছে। এমন থমথমে অন্ধকারও যেন অনেকদিন নামে নাই। সেই সেকালের হাঁসুলী বাঁকের রাত্রি যেন ফিরে এল।

বনওয়ারী বললে—চন্ননপুরের লাইনে যে খাটতে যাবে, তার ঠাঁই কাহারপাড়ায় হবে না। পিতিপুরুষে যা করে নাই, তা করতে নাই। ছত্তিশ জাতের কাণ্ড পয়সা বেশির দিকে তাকালে হবে না। সে পয়সা থাকবে না। স্বভাব মন্দ হবে। এত বড় হাঁসুলীর মাঠে যার পেট ভরবে না, তার পেট অভর। পিথিমীর কোথাও সে পেট ভরবে না। এই মাঠে বুক দিয়ে খাট- দু হাতে খাও। মনে কর—ভগবান এই কম্ম করতেই হাঁসুলীর বাঁকে জনম দিয়েছেন। ওই অ্যাল-লাইনের ধারে তো কেউ জন্মায় নাই। যে যাবে তার সব্বনাশ হবে। এ আমার কথা নয়, কত্তাঠাকুরের কথা। আজই সনজেতে এই করালীর ঘরে গোল ওঠবার আগে—আমি পেনাম করছি, কথাটি আমার মনে হ'ল কত্তা আমার মনে পড়িয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময় আটপৌরে পাড়ার রমণ এসে দাঁড়াল। সঙ্গে আটপৌরেরা।

—বনওয়ারী।

—কে?

—আমি অমন, সেই কথাটার তরে এলাম।

—এস, এস, এস। ব'স, ব'স, ব'স।

মজলিসে কথা পাড়লে।

এক অদ্ভুত রাত্রি। কাহারপাড়াব সায়েব মশায়দের আমলে দু ভাগ হয়েছিল তারা। পরমেরা লাঠি নিয়ে আটপৌরে হয়েছিল, বনওয়ারীরা পাল্কী কাঁধে নিয়ে কাহার হয়েছিল, অনেকদিন দু পাড়ারই সে আমল ঘুচে গিয়েছে; চাষই ক'রে আসছে দু দলে, কালেকস্মিনে এরা পাল্কী বয়, ওরা রায়বেশে নাচে। তবু এতদিন ওরা সেই ভিন্নই ছিল। আজ সেই ভেদ ঘুচল। পরমের জমিটা ব'লে ক'য়ে আটপৌরেদের ক'রে দেবে বনওয়ারী। আর যাবে

থানায়, বলবে—হলফ ক'রে বলবে—আটপৌরেরা আর চুরিতে নাই, ডাকাতিতে নাই, পাপের ছায়া মাড়ায় না। তা ছাড়া পরম বিদেয় হয়েছে, পাপের জড় মরেছে, খালাস দেন হুজুর। তাতে হুজুরদের সম্মান আটপৌরেরা করবে। মুরগী, খাসি, দুধ—তা ছাড়া পান খেতে কিছু, তাও দেবে। অবিশ্যি একদিনে এ কাজ হয় না, এক বছর দু বছর লাগবে। লাগুক। বনওয়ারী নিজে জামিন থাকবে। তবে আটপৌরে পাড়াকে তার 'রূপদেশ' মেনে চলতে হবে।

বনওয়ারী বললে—আজী থাক তো দেখ।

রাজী না হয়ে আটপৌরেদের আর উপায় নাই। আটপৌরেদের অবস্থা যে মারাত্মক রকমে খারাপ হয়ে পড়েছে। সংখ্যায় তারা চিরদিনই কাহারদের চেয়ে কম, তার উপর লাঠি ধরার কাজ ক'রে কুলীন হওযার অহঙ্কারে আজও পর্যন্ত তারা গোঁফে তা দিয়ে আর মুখে হুঙ্কার দিয়ে কাল কাটিয়ে এসেছে। চাষ করলেও আটপৌরেরা কোন কালেই চাষের কাজ ভাল করে না। ওতে তাদের মনই নাই। চুরি-ডাকাতিতে তাদের নাম আগে হয়। আগে এ নাম ছিল গৌরবের, এখনও অবশ্য তারা খুব অগৌরবের মনে করে না, কিন্তু এখন ও নামটা আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে পুলিসের চাপে, পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, মার খেয়ে সহ্য করার ক্ষমতা ক'মে যাওয়ায়। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। সেকালে ডাকাতদের রক্ষাকর্তা মাল-সামালদার বড় বড় বাড়ির মোটা মোটা কর্তারা যে আজ আর নাই, মাতব্বর পর্যন্ত নাই। নামে মাতব্বর পরম, সেও পালিয়েছে, কোনও সন্ধান নাই তার। সন্ধান পেলেও তার রক্ষা নাই, এবার পুলিস তাকে কালোবউকে খুন করার অপরাধে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে। এদিকে দিন দিন অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। বিলাতে যুদ্ধ লেগেছে। ধান-চালের দর বাড়ছে, নুন তেল কাপড়ের দরে আগুন লেগেছে। অনেক দ্রব্য বাজারেই নাই। আটপৌরেদের বাঁচতে হবে। এ কাজ বনওয়ারী পারে—এ ভরসা তাদের আছে। সে জামিন হ'লে আটপৌরেরা জাঙলে সদগোপ মহাশয়দের বাড়িতে কৃষাণি পাবে। বনওয়ারী থানায় গেলে দারোগা তার কথা বিশ্বাস করুক আর না করুক, অন্তত কানে শুনবে। কানে দু-দশ বার যেতে যেতেই বিশ্বাস জন্মাবে। হরি বলতে বলতে চোর সাধু হয়, সাধুকে দশে চোর বললে সে চোরই হয় দশের কাছে। তা ছাড়া একটা প্রলোভনের সামগ্রী ওই সায়েবডাঙার জমি। পরম যে জমিটা নিয়েছিল সেই জমিটা। পরম ফেরার, কালোবউ মরেছে, ওয়রিশ কেউ নাই। এখন ওই জমিটার উপর দৃষ্টি পড়েছে আটপৌরেদের। মালিক চন্ননপুরের বড়বাবু। তাঁর হুকুম চাই। আটপৌরেদের চাষী হিসেবে সুনাম নাই আর বড়বাবুর 'ছামুতে' গিয়ে দাঁড়াতে তাদের সাহসও নাই। সাহস ক'রে দাঁড়াতে পারত পরম, আর পারে বনওয়ারী। আজ সেই কারণে বনওয়ারীকে তাদের মাথায় নিতেই হবে।

আটপৌরে পাড়ার সকলেই বললে—'আজী'। হ্যাঁ, আজী।

রমণ জোর গলায় সায় দিলে—নিশ্চয় আজী।

নিমতেলে পানা শয়তানের বুদ্ধি মন্দ, কিন্তু ভারি হিসেব তার। পানা বললে—আপনার গরজে ধান ভানে মরদে। বনওয়ারী কাকাকে মাতব্বর তো করলে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে

চলবে তো? আর ঘোড়াগোত্ত ব'লে পেথক হয়ে থাকবে না তো? তা বল। নইলে বনওয়ারী কাকার মাতব্বরির লোভ থাকলেও আমরা হতে দোব না। হুঁ-হুঁ।

কথাটায় আটপৌরেরা চুপ ক'রে গেল। এদিকে কাহারদের সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে উঠল—ঠিক বলেছে, পানা ঠিক বলেছে। কিসের দায় আমাদের?

পানা বললে—ব্যানোকাকা নিজেই লিতে পারে পরমের জমি। আমাদিগে ক'রে দিতে পারে।

রমণ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস'। জাত বেজাতের কম্ম ক'রে যাওয়ার চেয়ে কাহারদের সঙ্গে চলা ঢের ভাল। আটপৌরেরা কাহারেরা—এক হাতের দুটো আঙুল, এক বংশের দুই গোত্ত। তোমরাও যা, আমরাও তাই। খেতে-দেতে মানা নাই। করণ-কারণ বিয়ে-সাদীটাই হয় না। তা তোমরাও পাল্কী বহনটি ছাড়, আমরাও তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাই। কি বল সব?

আটপৌরেরা সায় দিলে এবার। ছাড়, পাল্কী বহন ছাড়।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়লে—উঁহু সে হয় না। বেবাহ আর জ্ঞানগঙ্গা এ দুটিতে ডাকলে যেতেই হবে। লক্ষ্মী আর নারায়ণের দুই হাত এক হয়, তাদের বহন করতেই হবে। জ্ঞানগঙ্গা যায় পুণ্যাত্মা—লক্ষ্মীমান, পুণ্যবলে সশরীরে স্বগ্গোযাত্রা। তাকে কাঁধে বহন করলে পরলোকে গতি হয়। ও দুটিতে ডাকলে যেতেই হবে। সে 'না' বলতে পারব না। তাতে তোমরা আলাদা থাকতে চাও থাক। খুশি তোমাদের।

রমণ একটু ভেবে বললে—তাই—তাই।

পানা বললে—হরি হরি বল ভাই। বল—জয় বাবা কত্তাঠাকুর।

সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল কাহার এবং আটপৌরেদের দুই দলেই।

ধ্বনি থামতে পানা বললে—বেশ, তবে আজই মজলিসে একটা করণের কথা ক'য়ে ফেল। হয়ে যাক সব কথার স্যায ব্যাশ।

—করণ? ঢোক গিলতে হ'ল আটপৌরেদের।

পানু বললে—হাঁ, করণ। আমি বলছি। এগিয়ে এসে মজলিসের মাঝখানে সে চেপে বসল। পানু আজ ভারি খুশি—করালী দূর হয়েছে গ্রাম থেকে। সে আবার বনওয়ারীর কাছ ঘেঁষে বসবার সুবিধে পেয়েছে। সে বললে—তোমার যে শালীর বিধবা কন্যেটি এসেছে অমন কাকা, তার সঙ্গে বনওয়ারীকাকার সাঙা হোক। কাকার ছেলেপিলি হ'ল না, পাড়ার মাতব্বর বংশ লোপ পাবে—তা হবে না। কি বল গো সব? পানা চতুর, সে ঠিক লক্ষ্য করেছে যে মেয়েটির মধ্যে কালোশশীর ঢঙ রয়েছে। বনওয়ারী আজ করালীকে তাড়িয়েছে, সে বনওয়ারীকে আজ খুশি করতে চায়।

রমণের স্ত্রীর বোনঝি—কালোবউয়ের বোনঝি—বনওয়ারী তাকে আজই দেখেছে বিকালবেলায়। কালোবউয়ের ঢঙ তার সর্বাঙ্গে। মেয়েটি যুবতী। কালোশশীর রঙ ছিল কালো—এ মেয়েটির রঙ মাজা। মেয়েটি বিধবা হয়েছিল একটি সন্তান নিয়ে। সন্তানটিও মারা গিয়েছে। মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। মায়ের ইচ্ছা ছিল, সাঙা দেবে। কিন্তু তার আগেই মা গেল ম'রে। মেয়েটি এসে রমণের ঘাড়ে পড়েছে।

রমণ ভাবছিল জালের বন্ধনে তাকেই প্রথম পড়তে হবে—একথা সে ভাবে নাই। তবে ভরসার মধ্যে, সুবাসী তার শালীর কন্যে, নিজের বোনও নয়, বেটিও নয়, ভাইঝিও না, বোনঝিও না, ওর দায়ে তার জাত যাবে না।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে ছিল। সে ভাবছিল কালোবউয়ের কথা। ভাবছিল মেয়েটিতে তার কালোশশীর অভাব মিটবে। ভাবছিল এমন ভাবে যেচে উঁচু কুলের মেয়ে যখন আসছে, তখন তাকে ঠেলা আর উচিত নয়। আর এমন ক্ষেত্রে আটপৌরে ঘরের মেয়ে সর্বপ্রথম তারই ঘরে আসা উচিত। তার ছাড়া পানা এ কথাও খুব ঠিক বলেছে—তার মত মাতব্বরের বংশটা লোপ পেতে দেওয়া কখনও ঠিক নয়। বাবা সদয় তার উপর। আজ দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখ দিলেন তিনি, গোটা আটপৌরে পাড়াকে এনে দিলেন তার অধীনে। যা আজ এতদিন ধ'রে হয় নাই, তাই হ'ল বনওয়ারীর ভাগ্যে। জয় কর্তাঠাকুর। জয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সূক্ষ্ম বিচার তোমার। ওই করালী তোমার বাহনকে মেরেছিল, তাকে সে সাজা দেয় নাই, তাই তুমি বনওয়ারীকে সাজা দিয়েছিলে, কালোশশীকে কেড়ে নিয়েছিলে। আজ করালীকে সে সাজা দিয়েছে, তুমি খুশি হয়েছ—বনওয়ারীকে পুরস্কার দিলে আটপৌরে পাড়ার মাতব্বরী; ফিরে দিলে তার কালোশশীকে—তোমার আদ্যিকালের বেলগাছটাকে যেমন বোশেখ মাসে নতুন পাতায় সাজিয়ে নতুন ক'রে তোলো, তেমনি মোহিনী যুবতী ক'রে কালোশশীকে ফিরে দিলে। কত্তাঠাকুরের কোপদৃষ্টিতে কাঁচা জীবন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মুখের গ্রাস যায় উড়ে, ভরা নৌকা যায় ডুবে; আবার কত্তাঠাকুর তুষ্ট হয়ে মিষ্টি হাসি হেসে 'পেসন্ন দৃষ্টিতে' চাইলে—মরলে 'জীয়োয়', হারালে পায়, নিরুদ্দেশ ঘরে ফেরে, একগুণ হয় দশগুণ। উপকথায় বনওয়ারী যা শুনে'ছল, তাই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

রমণ রাজী হ'ল। পানা তাকে বুঝিয়ে দিলে গোপনে ডেকে করণও হবে, তোমারও কুলভাঙার পাপ অর্শাবে না। শালীর কন্যে আর পালতে-দেওয়া গাইয়ের বাছুর—ও দুই-ই সমান। ভদ্রলোকে গাই-গরু কিনে কাহারদের পালন করতে দেয়, কাহারেরা গাইটিকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে, গাই বাচ্চা প্রসব করে, কাহারেরা দুধ পায় আর পায় ওই বাছুরটির অর্ধেক স্বত্ব। ভদ্রলোকে দু টাকা চার টাকা কাহারদের দিয়ে বাছুরটাকে কিনে নেয়। না নিলে পাইকার ডেকে বাছুরটিকে বেচে টাকাটা ভাগ ক'রে নেয় ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্ত্রীর বোনের কন্যে ঘাড়ে এসে পড়েছে, বনওয়ারীর হাতে দিয়ে দাও, ঘাড় থেকে বোঝা নামবে, আটপৌরে-কাহারদের মিলনে করণও হবে। পরমের জমিটা যখন বনওয়ারী বাবুর হুকুম নিয়ে আটপৌরেদের মধ্যে বেঁটে দেবে, তখন কি আর ভাগের বাছুরের আধাদামের পাওনার মত কিছু বেশি পাবে না তুমি? ছোকরা পানু কথাটা ব'লে একেবারে ইয়ার বন্ধুর মত রমণকে কাতুকুতু দিয়ে দিলে। রমণও হাসলে এবং সানন্দেই রাজী হয়ে গেল।

কথাটা স্থির হয়ে গেল।

রতন, গুপী সবাই খুব খুশি হ'ল ব'লেই মনে হ'ল। সবাই বললে—খুশি, আমরা খুব খুশি।

অল্পবয়সী মেয়েরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। সুচাঁদের ইচ্ছা হচ্ছিল, ছুটে এসে বলে—খুব

ভাল হ'ল বাবা, খুব ভাল হ'ল। কিন্তু আজই বনওয়ারী করালী এবং পাখীর ঘর ভেঙে দিয়েছে, তাদের কাহারপাড়া থেকে দূর ক'রে দিয়েছে। কোন মনে যাবে সে? কেমন ক'রে বলবে ভাল কথা?

পাগল এই সময়টিতে মজলিসে এসে হাজির হ'ল। কোথায় গিয়েছিল সে আজ সারাদিন সে-ই জানে। এসে ব'সে বললে—কি বেপার?

পানা মদ ঢেলে পাগলকে দিয়ে বললে -খাও। জমিয়ে ব'স, শোন।

শুনতে শুনতে পাগল গুনগুন ক'রে গান ভাঁজতে লাগল। সুচাঁদ বলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পাগল বাঁধে হাঁসুলী বাঁকের ছড়া পাঁচালী।

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই বলিহারি,
বাঁধিল নতুন ঘর দখিনদুয়ারী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরি রে মরি।

বনওয়ারী হেসে ধমক দিয়ে বললে—থাম বলছি।

পাগল ঘাড় নেড়ে গানের নতুন কলি গাইবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় বুক চাপড়ে কেঁদে ছুটে এল নয়ানের মা।

ওগো, আমার নয়ান কি করছে -দেখে যাও গো। ওগো। ওগো। ওগো।

সে কি- এই যে সন্ধ্যার মুখে কঙ্কালসার দেহে হাতীর বলের মতন নিয়ে করালীর ঘর ভেঙে এল নয়ান।

অন্ধকার দাওয়ায় প'ড়ে ছিল নয়ান সর্বাঙ্গে ঘাম। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে পাগল হাত দেখতে বসল সে নাড়ী দেখতে জানে বনওয়ারী চেহারা দেখে বুঝতে পারে অনেকটা। সে চেঁচিয়ে বললে--আলো কই? আলো?

আলো নাই। কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজার। পানা তার বাড়ি থেকে নিয়ে এল নিজের ডিবেটা সেটা সে নিভিয়েই : একটু তেল এখনও আছে তার মধ্যে। বনওয়ারী দেখলে। হরি—হরি—হরি।

নয়ান সেজেছে। ওই কোদাল চালিয়ে এসে শুয়েছিল, তারপর ক্রমশ এই অবস্থা। নয়ান কিন্তু এর মধ্যেও হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে—শালোর ঘর ভেঙে মরছি, এতেও আমার সুখ সেই সুখ নিয়ে সে চলবার পথে সেজেছে।

কাহারপাড়া নয়ানকে ঘিরে ব'সে রইল। এ-ই নিয়ম। বনওয়ারী দূরে দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা করলে কাঠের বাঁশের নয়ানের মা কাঁদলে, নয়ানের আপনার জনেরা কাঁদলে। সকলের শেষে এল সুচাঁদ এবং বসন্ত। তারাও কাঁদতে বসল। অল্পবয়সী মেয়েরা নীরবে চোখের জল মার্জনা করছে; করালীর বাড়ি থেকে এল কেবল নসুবালা। করালী পাখী নাই, তারা চন্ননপুরে। নসুবালাও কাঁদলে। তার আক্ষেপের কথাগুলির মধ্যে অকৃত্রিম আক্ষেপ—কত কথা সে বলছে। নয়ানের বাল্য কৈশোর যৌবনের কথা; তারই সমবয়সী ছিল, একসঙ্গে খেলেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে, তারই স্মৃতির কথা; তার মধ্যে নয়ানের দোষের কথা একটিও নাই, সব গুণের কথা।

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। তেল নাই আর। অন্ধকারের মধ্যেই সকলে ব'সে রইল। নয়ানের বুকে হাত দিয়ে তার মা ব'সে কাঁদছে। তাতেই বুঝতে পারবে। বুক থামলেই জানাবে চীৎকার ক'রে। আলো হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু আর সে কথা মনে হচ্ছে না তাদের। আলোর প্রাচুর্য কাহারদের চিরদিনই কম। অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়। পাগল ছড়া কেটে বলে—কি হবে আলো?

অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে।
অন্ধকারেই পরাণপাখী সেই দ্যাশেতে যায় রে।
চন্দ সূয্য লম্ফ পিদীম তাই রে নাই রে নাই রে।
না থাক, আছে একজনা ভাই,
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়
দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাই রে
আলোর তরে ভাবনা কেনে হায় রে।

বনওয়ারী সৎকারের লোক ঠিক করেছিল। লোকের আজ অভাব নাই। আজ আটপৌরেরাও যাবে।

হাঁসুলী বাঁকে এমন রাত্রে কেউ একা নয়। আটপৌরে পাড়াতেও এমন ক্ষেত্রে কাহারপাড়ার সকলে যায়। কাহারপাড়ায় আসে আটপৌরেরা। আজ আবার তার উপর নতুন বাঁধন পড়েছে দুই পাড়ায়। আজ আটপৌরেরা শ্মশানেও যাবে। বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলে দুই পাড়ায় চলনের ক্ষণে নয়ান প্রথম যাত্রী। সে-ই প্রথম যাবে দুই পাড়ার কাঁধে চেপে আজ পুরনো মাতব্বর বংশ নির্বংশ হ'ল।

কত মাতব্বর কাহারদের নির্বংশ হয়েছে কে জানে তা, কে তার হিসেব রাখে? কাহারপাড়ার উপকথার কি আদি আছে, না অন্ত আছে? পিথিমী 'ছিষ্টি' হ'ল, কাহার ছিষ্টি করলেন বিধেতা, কাহারদের মাতব্বরও ছিষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গে। বাবা কালারুদ্রের গাজনের পাটা ঘুরছে বনবন শব্দে, সেই পাটায় ঘুরে দিন রাত্রি মাস বছর এক এক ক'রে চলে যাচ্ছে। বছর যাচ্ছে, যুগ যাচ্ছে। তার সঙ্গে কত যাচ্ছে—মাতব্বর যাচ্ছে, মাতব্বরের ঘর যাচ্ছে, ঘরভাঙাদেরও ঘরের শেষ হল এতদিনে নয়ানের সঙ্গে। বাবার পাটা ঘুরছে, সেই পাটায় বছর ঘুরছে। সেই ঘুরনের পাকে এবার প্রথম গেল নয়ান। আর কে যাবে কে জানে? নতুন বছরের কাছে কালোশশীও মরেছে, কিন্তু সে আটপৌরে পাড়ার। তখনও দুই পাড়ায় এক হয় নাই।

কথাগুলি শ্মশানযাত্রীদের মধ্যেই আলোচনা হচ্ছিল। বনওয়ারীও চলেছে সঙ্গে। হাজার হোক পুরনো মাতব্বর বংশ। তার খাতির করতে হবে বইকি। আর নয়ান বলতে গেলে নিঃস্ব। তার সব খরচও দেবে বনওয়ারী। নিয়ম। পাগল ধ'রে নিয়ে গেল নয়ানের মাকে। নয়ানের মায়ের সব অভিসম্পাত আজ নীরব হয়ে গিয়েছে। নিভে গিয়েছে তার সব তেজের আগুন।

বনওয়ারী অন্ধকারের মধ্যে ভারী পা ফেলে চলছে আর ভাবছে—বছরটি ভালয় ভালয় গেলে হয়। বাবাঠাকুরের রোষ যে ভয়ানক। ভাবতেও শিউরে ওঠে বনওয়ারী। আঃ,

কবে বাজবে আবার গাজনের ঢাক, কালারুদ্দের চড়ক চক্রপাক খেয়ে এক পলক থামবে। বলবে—চন্দ্র থাম, সূয্য থাম, এক লহমার জন্যে আমার সঙ্গে থাম। বছর শেষ হোক। কতজনে সেদিন কাঁদবে হারানো পরাণধনের জন্যে কে জানে। বাবাঠাকুরের কাছে অপরাধ হয়েছে—এ বছরটা গোটা বনওয়ারীর ভাবতে ভাবতেই যাবে। সৌভাগ্য সত্ত্বেও ভাবনা তার যাচ্ছে না।

পঞ্চম পর্ব

এক

ড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাব্যাড্যাং –ড্যাড্যাং

আবার বাজল গাজনের ঢাক। চড়কের পাটায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে বনওয়ারী কালারুদ্দকে প্রণাম করলে। যাক। বছর শেষ, বছর শেষ, পরমদয়াল ক্ষ্যাপা বাবার দৌলতে ভালয় ভালয় কেটে গিয়েছে কাহারদের বছর। বনওয়ারী যা আশঙ্কা করেছিল তা ঘটে নাই। কাহারপাড়ায় যুবা প্রবীণ মাতব্বরেরা সকলেই বেঁচে রয়েছে। 'মিত্যু' অর্থাৎ মৃত্যু আর হয় নাই। হয়েছে, যেমন হয় যেমন নিয়ম, তেমনি হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। অঘটন ঘটেছে একটি, তাও আটপৌরে পাড়ায়—ওই কালোবউ মরেছে। আর নয়ানও মরেছে হঠাৎ। তা ছাড়া, দু-চারটে ছেলে মরেছে 'ম্যালিরিয়া' জ্বরে, বুড়ো-বুড়ী মরেছে চারজন—গুপীর মাসী, রতনের মা, প্রাণকেষ্টর কাকা গোবর্ধন—সে লোকটাই ছিল হাবা, আর মরেছে গোপালের পিসে। গোপালের পিসে বাইরের গেরামের লোক, এসে গোপালের ঘাড়ে ভর করেছিল, তাকে ঠিক ধরা যায় না হিসেবের মধ্যে। 'কচিকাঁচা' অর্থাৎ আঁতুড়ের ছেলের মরার হিসেব কেউ কখনও কোন খেয়াল করে না, • চৌকিদারে জন্মমৃত্যুর খাতায় লিখে নিয়ে যায়, 'থানায় দাখিল করে, থানায় তার হিসে থাকে। সে হিসেবও বাজে হিসেব—কাহারপাড়ায় চৌকিদার কালে-কস্মিনে আসে, তাও দিনের বেলা, ওই হিসেবের জন্যই আসে। ছেলে মরার হিসেব কেউ মনেও রাখে না, বলতেও ভুল করে। চৌকিদারও সেই ভুল হিসেব মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে জাঙলে গিয়ে সদগোপ মহাশয়দের কোন ছেলেকে ধ'রে লিখিয়ে থানায় ইউনিয়ন-বোর্ডে দাখিল করে।

এবার গাজনে পাগল হাজির আছে। সে ভাল সঙ দিয়েছে। নিজে সেজেছে মহাদেব, দু-পাশে দুটো ছেলেকে সাজিয়েছে দুর্গা আর গঙ্গা। একজন বয়সালো মেয়ে আর একজন যোবতী। বড়কী আর ছুটকী। বনওয়ারী ঠাট্টা করেছে। তা কর ভাই পাগল, তা কর। বনওয়ারীরও বেশ ভালই লাগছে।

বনওয়ারী সেদিনের সেই মজলিসের কথামত কালোশশীর বোনঝিকে সাঙা করেছে। তার ঘরেও এখন দু-বউ। বড়কী আর ছুটকী—গোপালীবালা আর সুবাসী। বছর ফিরে গেল, বিয়ের বছর পুরতেও দেরি নাই, তবুও মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা। পাগল

মিতের গান যেন কানে বাজছে। মনে হচ্ছে, এই তো করলে গান। আঃ পাগল মিতে 'উদোমাদা' মানুষ, গুণী লোক, যেমন গলা তেমন গান। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে সুচাঁদ পিসি। হাঁসুলী বাঁকের কথা নিয়ে পাঁচালী তৈরি করে পাগল মিতে। বিয়েতে সাদিতে গান বাঁধে, ভাঁজোতে গান বাঁধে, ঘেঁটুতে গান বাঁধে, গাজনে গান গেয়ে সঙ সেজে নাচে। এবারে দুর্গা আর গঙ্গায় কোন্দল, অর্থাৎ সুবাসী আর গোপালীবালার ঝগড়া, মাঝখানে বুড়োশিব অর্থাৎ বনওয়ারী—খায় এর হাতে ঠোনা, ওর হাতে ঝাঁটা।

* * *

হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। আকাশের রঙেই তার রঙ। আকাশে সয্যি উঠলে কালো জল ঝকমক করে, তার সঙ্গে বাতাস উঠলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে গলানো রূপোর মত 'টলমলিয়ে' ওঠে, রাত্রে চাঁদ থাকলে নীলের বাঁধের ছায়ামাখানো কালো জলে চাঁদ ওঠে, চাঁদের সঙ্গে তারাও ফুটে ওঠে. আকাশে মেঘ নামলে নীলের বাঁধের জল হয় 'গহিন' কালো, মনে হয় আকাশ কাঁদছে, তারই দুঃখে নীলের বাঁধের জলও কাঁদছে। তা হবে না কেন? আকাশ থেকেই ঝ'রে পড়ছে নীলের বাঁধের জল—ও তো ওরই এক কন্যে। পাগল কাহারই বলে কথাটা। নইলে এমন সাজিয়ে কে বলতে পারে 'অমৃতির' মত বাক্যি। বনওয়ারী হেসে বলে- পাগল মিতের মনটিও নীলের বাঁধের জলের মত। কাহারপাড়া তার কাছে আকাশ। কাহারপাড়া হাসলে সে হাসে, কাঁদলে সে কাঁদে। হাসিও না, কান্নাও না—এমন অবস্থায় কাহারপাড়া ঝিমিয়ে থাকলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসের কুয়াশায় ঢাকা নীল বাঁধের জলের মত চেহারা নেয়, পাগলের মনের চেহারাও ঠিক তাই হয়; সে উদাস হয়ে থাকে।

নয়ানের 'মরণশয্যের' পাশে ব'সে পাগল ছড়া কেটেছিল—

ভাই রে। অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে।
অন্ধকারেই পরাণ-পাখী সেই দ্যাশেতে যায় রে।

তার মাসখানেক পরে বনওয়ারীর সাঙা হ'ল আটপৌরে-কন্যে সুবাসীর সঙ্গে। পাগল তখন রসের গানে ছড়ায় পাঁচালীতে মাতিয়ে তুললে কাহারপাড়া। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত এক নসুবালা; কিন্তু নসুবালা বললে—শরীর খারাপ। শরীর খারাপ নয়, আসল কথা সবাই বুঝেছে। যে বনওয়ারী তার করালী-দাদা পাখী-বউকে গাঁ-ছাড়া করেছে, তার বিয়েতে নাচতে গাইতে মন তার উঠবে না। নসু বলে—কাহারকুলে জন্মেছি, কাহারপাড়ায় বাস করি, বনওয়ারী কাহারপাড়ার মাতব্বর, দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তার হুকুম যেন মানতে হবে বাইরে; কিন্তু মন তো কারুর দাসী বাঁদী নয়, সে কাহারও নয়, আটপৌরেও নয়, সে-ই হ'ল শুধু মানুষ—সে রাজারও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়, সে মানবে কেনে বুন? তা না নাচুক নসুবালা, পাগল একাই একশো। সে যত্ন ক'রে মদ তৈরি করলে। সে মদের 'তার' কি। তার 'ঘোর' অর্থাৎ নেশা কত। নামকরা মদ-খাইয়েরা টলতে লাগল। পাগল কিন্তু ঠিক রইল। সে-ই করলে রান্না। ঘুরলে ফিরলে 'ঢুকঢাক' মদ ঢেলে খেলে, হাঁড়ি নামালে, কড়ায় হাতা দিলে, উনোনে কাঠ দিলে আর সারাক্ষণ গাইলে গান—

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি—
বাঁধিল নতুন ঘর দখিন-দুয়ারী।
সে ঘর বাঁধিতে এল (যত সব) অষ্টপহরী।
অষ্টপহরী পাড়ার সুবাসী-লতা
কাহারপাড়ায় আজ হ'ল পোঁতা।
বুড়া মালী বনওয়ারী (গতনে) সাজায় কেয়ারী।

প্রহ্লাদ রতন গুপী এরা খুব বাহবা দিলে। এ বিয়েতে বুড়োদেরই হয়েছিল বেশি মাতন। পাগল গেয়েই চলেছিল—

সুবাসী-লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে
ও পথে যাস না তোরা বারণ করি—
(বুড়' আসবে তেড়ে,
খেঁটে হাতে বুড়া আসবে তেড়ে)

এই সময় বনওয়ারী তার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল—শোন পাগল।

-কি? মুখ এমন কেনে?

—বলব ব'লেই ডাকছি। পেল্লাদ অতন গুপীকে ডাক।

বনওয়ারীর প্রথম স্ত্রী গোপালীবালা কেঁদেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বনওয়ারী তাই এসেছিল—কি করি এখন বল দি-নি?

গোপালীবালা কাঁদছে? চমকে উঠেছিল পাগল। এ কথাটা তো সে ভাবে নাই। কাহারপাড়ায় এ কথা কেউ কোন কালে ভাবে না। কাহারপাড়ার স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চ'লে যায়—অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার-মেয়েরা করে না। স্বামী যদি তেমন পয়সাওয়ালা বা তেমন 'বেক্কমশালী' অর্থাৎ বিক্রমশীল মোড়ল মাতব্বর হয়, সে যদি কোন মেয়েলোককে ঘরে আনে, বিয়ে না ক'রে এমনি রাখে তাতে বরং কাহার-মেয়েরা আপত্তি করে না, কিন্তু বিয়ে করলে সহ্য করে না। কাহারপাড়ার মেয়েরা ফেলনা নয়, স্বামীকে তাদের ভাত দিতে হয় না, নিজেরাই তারা খেটে খায়, রূপযৌবন ছাড়া 'গতরের' অর্থাৎ পরিশ্রমের ক্ষমতার একটা কদর আছে, সেই দরে কানা খোঁড়া বুড়ো কতজনের ঘরে ষোল আনা গিন্নীর 'পিঁড়ি' তাদের আদর ক'রে ডাকে, তারাও গিয়ে সে পিঁড়ে দখল করে বসে। ঘরের পাটকাম করে, অক্ষম পুরুষকে রাঁধা ভাত দেয়, খেটেখুটে রোজকারও করে। গোপালীবালা যদি চ'লে যায়, তবে সে হবে তার অপমান। তা ছাড়া গোপালীবালা লোকটি বড় ভাল। গোপালীবালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই, মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হ'ল নীলের বাঁধের জল—না আছে সাড়া, না আছে ধারা, চুপচাপ ঠাণ্ডা 'শেতল'; বুক ডুবিয়ে ব'সে থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে তোমার চারিপাশে। নীলের বাঁধের মতই

বনওয়ারী ওকে ভালবাসে ; কিন্তু কোপাইয়ের মতন মাতন নাই ব'লে ওর উপর নেশা কোন কালে জমে নাই। সেইজন্যই বিবেচনা ক'রেও বনওয়ারী নিজের মনকে মানাতে পারে নাই। কোপাইয়ের মত ছিল কালোবউ, সুবাসী ঠিক কালোবউয়ের মতই। যে যেন কোপাইয়ের বুকে নতুন বছরেব বান হয়ে ফিরে এসেছে। তা ছাড়া সুবাসী হ'ল আটপৌরে-ঘরের মেয়ে। আটপৌরেরা কাহারদের সঙ্গে চলতে রাজী হয়েছে বনওয়ারীর মাতব্বরির গুণে, সেই চলনের প্রথম করণ আটপৌরের কন্যে ঘরে আনবার 'গৈরব' সে আর কাউকে দিতে পারবে না। তাই সে গোপালীবালার কথা ভেবেও সাঙা করতে সম্মত হয়েছে। গোপালীবালাকে একদিন সে বুঝিয়ে বলেছিল, প্রহ্লাদ রতন এরাও বলেছিল, তখন গোপালীবালা নিজেই বলেছিল- তা কর, সাঙা কর, আমি যাব না। তবে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তোমার বেটা-ছেলে হোক, আমি মানুষ করব। তোমরা দু'জনায় 'রামোদ-রাল্লাদ করবা। আমি দেখব, হাসব। বিয়ের দিন কিন্তু গোপালীবালা কাঁদতে লেগেছে।

পাগল বনওয়ারীব মুখেব দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বনওয়ারী বলেছিল—কি করি বল এখন ?

অনেকক্ষণ ভেবে পাগল উত্তর দিয়েছিল—গোপালী যদি আজী থাকে, তবে আমিও ওকে মাথায় ক'রে আখব। বুল্লি—বলগা তাকে।

বনওয়ারীর মুখটা থমথমে হয়ে উঠেছিল।

পাগল বুঝে বলেছিল--আগ করিস না। লতুন করণ আটপৌরেদের সাথে, সেটাও হবে—তোরও ছেলেপুলে ঘর-সংসার হবে, সাধ মিটবে, গোপালী-বউকেও সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে না।

গোপালী-বউ কিন্তু আশ্চর্য। সে তাতেও বলেছিল -না।

প্রাণকেষ্ট. উপকার করেছিল, সে বনওয়ারীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে হদিস বাতলে দিয়েছিল—এক কাজ কর কাকা। দশটা টাকা কাকীর হাতে দাও। বল—ঘর কর, সংসার কর, পাড়ায় ধার দাও মহাজনী কর। তুমিই ঘরের আসল গিন্নি ; যেমন ছিলে তেমনি রইলে, আটপৌরের মেয়ে ঘরে আসছে, ছেলেপুলে হবে, খাটবে-খুটবে খাবে। বুঝলে ?

বনওয়ারীর কথাটা মনে ধরে। পানার বুদ্ধির সে তারিফ না ক'রে পারে নাই। টাকা তার আছে, কিন্তু কথাটা তার মনে হয় নাই। টাকাতে মন ভোলে বই কি। কতজন কাহার-মরদ পরিবারের দাবি ছাড়তে দাঙ্গা করে, হাঙ্গামা করে, শেষে টাকাতে রক্ষা হয়। টাকাতে আরও কত হয়, সে বনওয়ারীর অজানা নয়। ছেলের হাতে 'অঙচঙে' খেলনা, মিষ্টি নাড়ু দিলে তার কান্না থামে ; বড় মানুষের হাতে টাকা দাও আঁজলা ভ'রে, বড় মানুষ ভুলে যাবে সব দুঃখ।

পানা বলেছিল—টাকাতে বলে পুত্তুশোক ভোলে, তা এ তো—। ব'লে সে একটা পিচ কেটেছিল।

বনওয়ারী দশটার বদলে এক কুড়ি টাকা নিয়ে গোপালীবালার দুই হাতের আঁজলা টেনে তার উপর ভ'রে ঢেলে দিয়েছিল।

গোপালীবালা চমকে উঠে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টি বনওয়ারী গাজনের পাটায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও যেন দেখতে পাচ্ছে।

বনওয়ারী হেসে বলেছিল—সব তোমাকে দিলাম। গয়না গড়িয়ো তুমি। না হয় যা-খুশি ক'রো।

গোপালীবালার মন ভুলেছিল। আঁজলা-ভরা ঝকঝকে টাকা! স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে বলেছিল—আর দুটি সোনার কানফুল গড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।

বনওয়ারী বলেছিল—দোব, নিচ্চয় দোব। সোনা একটুকু সস্তা হোক, যুদ্ধুতে দর চড়েছে বিষম, একটুকুন নামুক দর, দোব।

পানা বলেছিল- একটি ঢোক মাল খাও খুড়ী এইবার। নাচতে হবে তোমাকে।

সত্যিই পানা গোপালীবালাকে মদ খাইয়েছিল। পানার উপর এর পর বনওয়ারী খুশি না হয়ে পারে নাই।

—চল, এইবার আটপৌরে পাড়ায় যাবার আয়োজন কর।

কাহারদের আজ আটপৌরে পাড়ায় যাওয়া যেমন-তেমন যাওয়া নয়, এমন যাওয়া কখনো যায় নাই আজ পর্যন্ত। প্রহ্লাদ রতন গুপী পানু—সকল কাহার মাথায় বেঁধেছিল ক্ষারে-কাচা গামছা, গায়ে দিয়েছিল বহুকালের সযত্ন-রক্ষিত ফতুয়া, হাতে নিয়েছিল লাঠি; গোঁফে চাড়া দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে সকলে গিয়েছিল। ঢোল বেজেছিল, সানাই বেজেছিল, কাঁসি বেজেছিল। বনওয়ারী গায়ে দিয়েছিল একখানা নতুন চাদর। যুদ্ধের বাজারে অগ্নিমূল্য দিতে হয়েছিল। সেই চাদরখানি গায়ে দিয়ে সে খুঁজেছিল পাগলকে।

—পাগল! পাগল।

সকলকে সামলে নিয়ে যেতে হবে। শুভকর্মে ব্যাঘাত না ঘটে। কাহারেরা মদ খেয়েছে, আটপৌরে পাড়ার মেয়ে আনতে চলেছে—সেই গরম নেশার সঙ্গে মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরছে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কখনও ঘটে নাই, আজ রাত্রে তাই ঘটবে। তার মধ্যে অঘটন ঘটিয়ে না বসে কাহারেরা। পাগল হুঁশিয়ার মানুষ, তাকে ভার দিতে হবে।

—পাগল! পাগল!

পাগলকে পাওয়া যায় নাই। গোটা গাঁয়ের মধ্যে না।

পানা হাসতে হাসতে বলেছিল, আঁ, কত সাধ ক'রে কথাটা বললে—শেষে লাজে হয়তো পালাল্ছে।

ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল।

কে যেন বলেছিল—মেঘ চিকুরছে, চল চল।

ওঃ সে কি মেঘ! বর্ষার মেঘ। বিয়ের রাত্রে নেমেছিল বর্ষা, কাড়ান।

কাড়ানের মেঘ ঘন কালো। বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ডাকে হাঁসুলী বাঁকের বাঁকে বাঁকে, বাঁশবাঁদির বাঁশের বনে যেন ডঙ্কা বাজিয়ে দেয়। ঝিরঝির ক'রে মৃদুমন্দ বাতাস বয়। নীলের বাঁধের স্থির জলে কাঁপন লাগে। বাঁশবনের কোন পাতাঢাকা গর্ত থেকে মোটা গম্ভীর গলায় 'গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাও—গ্যাও' শব্দ ক'রে ওঠে হেঁড়ে-ব্যাঙ মহাশয়। ছোটখাটো হাঁড়ির মত চেহারা—এমনি বড় আকারের ব্যাঙ,

তাই ওদের নাম হেঁড়েব্যাঙ। গাছের ডাল থেকে অপেক্ষাকৃত মিহি গলায় সাড়া দেয় গেছোব্যাঙ—অ্যা—ও ! অ্যা—ও ! পুকুরডোবার কোণ থেকে সোনাব্যাঙগুলো কলরব জুড়ে দেয়। কর্‌র্‌—কর্‌র্‌—কর্‌র্‌ শব্দে হাঁসুলী বাঁকে যেন হাজার ব্যাঙ-টুনটুনির বাজনা বেজে ওঠে। মাথার উপরে কিচির-কিচ-কিচির শব্দ ওঠে। ফটিকজল পাখিগুলো রাত্রেও ডাকতে শুরু করে মেঘরাজার হাঁক শুনে। তেমনি মেঘ উঠেছিল সেদিন।

বরযাত্রী কাহারেরাও হাঁক দিয়ে উঠেছিল সে মেঘের ডাক শুনে। এ কি ডাক ! অ্যাঁ ! জয় জয় বাবাঠাকুর ! আষাঢ়ের প্রথম—অম্বুবাচীর দু দিন বাকি, এরই মধ্যে মেঘের হাঁকে বর্ষার থমথমে আওয়াজ বেজে উঠল যে ! হাঁসুলী বাঁকের চষা-খোঁড়া মাটি 'শির-শির' করছে অর্থাৎ শিউরে উঠছে বোধ হয়।

রতন গুপী আহ্লাদে লাফ দিয়ে ঢুলীকে বলেছিল—বাজা রে ভাই বাজা, গুরগুরিয়ে বাজা। গুর-গুর-গুর-গুর, তাক-তাক-তাক-তাক—

পানু বলেছিল—বনওয়ারীকাকার নতুন বউয়ের পয়।

—নিচ্চয়। মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে, আটপৌরের সাথে কাহারদের চলনে দু পাড়ারই মঙ্গল হবে। 'আষিড়ে কাড়ান' পায় কে ? অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত পর্যাপ্ত বর্ষণ পায় কে ?

বনওয়ারী প্রথমটা ভয় পেয়েছিল ; আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিল—হে বাবা, তোমার বাহন যেন সেদিনের মত কোড়ল পাকিয়ে লকলকিয়ে জিভ মেলে ফুঁসিয়ে না ওঠে ! বনওয়ারীর মন আশ্বস্ত হয়েও হচ্ছিল না। জষ্ঠি মাসের শেষে তো বর্ষা দেখা দেয় না, আষাঢ় মাসেই বর্ষা দুর্লভ। তবে ? এই অকালে ঠিক তার বিয়ের লগ্নে মাথার উপরে অকাল বর্ষা হাঁক মেরে উঠল কেনে ? বাবার বাহন সেদিন কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে ফুঁসিয়ে উঠেছিল। সেই বিচিত্র বরণ ফুটে উঠেছিল সাদা-কালো মেঘে মেঘে। আজও আবার— ?

বনওয়ারী ! ব্যানো ! ব্যানো !

বনওয়ারী সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল রতনের ডাকে। আর আশ্বাস পেয়েছিল মেঘ দেখে চিনে, বাবার বাহনকে সে মেঘের মধ্যে দেখতে পায় নি। একটানা ঘনশ্যাম মেঘ উঠছে আকাশ ভ'রে। ইনি বর্ষার মেঘ। বনওয়ারী বলেছিল—চল।

* * *

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ওই রাত্রি থেকেই বেজে উঠেছিল চাষের বাজনা ; এবারের বর্ষা—ভাগ্যের বর্ষা গিয়েছে। "আষাঢ়ের বর্ষা। আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে ? শাঙনে কাড়ান ধানকে। ভাদুরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিসকে ?" আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত ভাসান জল কোন্ ভাগ্যবান পায় ? কালেকস্মিনে কখন-সখনও হয়। এবার পেয়েছে কাহারেরা।

গুরু গুরু শব্দে গম্ভীর গলায় মেঘের সে ধ্বনি কি ! কোপাইয়ের জল হয় ঘোলা ; তার কূলে কূলে মেঘের ডাক যেন ডঙ্কার মত শোনায়। বাঁশবনের নতুন বাঁশগুলির 'খুঙি'

অর্থাৎ আবরণ খসে পড়ে, ফিকে সবুজ রঙের পাতা দেখা দেয়, পুরানো বাঁশের পাতার সবুজে কালচে আমেজ ধরে। শিমুল-শিরীষ-বট-অশ্বত্থ-পাতাগুলিতেও কালো রঙের ঘোর ধরে, পাতাগুলি পুরু হয়। বাঁশবনের তলায় ভিজে পাতা চাপ বেঁধে সপসপ করছে, পা দিলে 'বুড়বুড়ি' কেটে লালচে রঙের জল ওঠে। কত নতুন নতুন চারা গজায়। কোপাইয়ের কূলে শরবন, কাশবন, বেনাবনে লম্বা কচি পাতা গজিয়ে উঠে ঝাড়বন্দী হয়ে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে নাচতে থাকে। সবচেয়ে বাহার হয় কোপাইয়ের ঘাটের উপরের ছাতিম গাছটির। চোখ জুড়ানো সবুজ বরণ টোপরটির মত চেহারা হয়। গাছের মধ্যে ও হয় নটবর। ঘাসে ঘাসে ভ'রে যায় চারিদিক। কাহারপাড়ার উঠানগুলির চারিপাশে, ঘরগুলির 'পোঁতায়' অর্থাৎ ভিত পর্যন্ত কেউ যেন সবুজ রঙের পাড় বুনে দেয়। মাঠ জলে থৈ-থৈ করে, আলে আসে ঘাস। কাহারেরা তারই মধ্যে কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কেউ চালায় হাল, মাটির উপর হালের মুঠো ধ'রে চলে পিঠ বেঁকিয়ে ঘাড় নামিয়ে অসুরের মত। কেউ জমির কাদায় জলে হাঁটু গেড়ে বীজচারা তোলে, কাদানো জমিতে ঘাস আগাছা তুলে দুমড়ে মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়। রাত্রি এক প্রহর থাকতে মাঠে ছোটে, বাড়ি ফেরে রাত্রি এক প্রহর পার হলে তবে।

'আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে ?' এবার পাওয়া গিয়েছিল, কাহারেরা তার চরম সদ্ব্যবহার করেছে। চাষ এবার তাদের ভাল গিয়েছে। ক্ষেতভরা ধান হয়েছিল, মুনিবেরা পেয়েছেন প্রচুর, তারাও যে যেমন সে তেমন পেয়েছে। পিথিমীতে যুদ্ধ লেগেছে—আক্রা-গণ্ডার সীমা-পরিসীমা নাই। কাহারদের সম্বল এক ধান। ধানের দর ছিল আঠারো আনা—এখন বেড়ে হয়েছে পাঁচ টাকা। আষাঢ়ে কাড়ানে ফসল বেশি ফলেছে, এবার বেঁচেছে কাহারেরা।

বনওয়ারী এবার অনেক ধান পেয়েছে। ভাগের চাষে বেশি ফলেছে, তাতে আর কত বেশি পেয়েছে। এবার সায়েবডাঙার জমির ধান যে তার ঘরে উঠেছে। পাঁচ বিঘে ডাঙার কাটানো হয়েছে দু বিঘে, তার থেকে ধান পেয়েছে চার বিশ দু আড়ি অর্থাৎ সাড়ে দশ মণ, কাউকে ভাগ দিতে হয় নাই, খাজনা লাগে নাই। এই সাড়ে দশ মণ তার কাছে হাজার মণের সমান। আজ বিক্রি করলেই পঞ্চাশ টাকার করকরে নতুন 'লোট' গুনে দেবে মহাজনেরা। দেশে টাকা নাই, সব 'লোট' সব 'লোট' ; নইলে কিছুখানি বিক্রি করত বনওয়ারী, কিন্তু লোট তো মাটিতে পুঁতে রাখা যায না! আরও একটা কথা আছে, ছুটকী অর্থাৎ নতুন বউ সুবাসীর মতিগতি না বুঝে টাকাকড়ি পুঁতে রাখা ঠিক নয়।

বাবু মহাশয়দের সায়েবডাঙার জমিতেও প্রচুর ধান হয়েছে। ওঁরা জমি কাটিয়ে জমিতে পুকুরের পাঁক দিয়েছিলেন, সার দিয়েছিলেন, বনওয়ারী তো তা পারে নাই। তবে সে এবং গোপালীবালা পথেঘাটে যেখানে যত গোবর দেখেছে, কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। গোপালী আর এক কাজ করেছে, সে কথা বনওয়ারী ছাড়া কেউ জানে না ; মাঠে লোকজন না থাকলে সে বাবুদের জমিতে নেমে পাঁকের ঢেলা তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে বনওয়ারীর জমিতে। গোপালীবালা তার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সুবাসীর রূপ যৌবন বনওয়ারীকে নেশায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বটে, কিন্তু সে এই নেশার মধ্যেও বুঝতে পারে, এ নেশায় সংসারের কল্যাণ নাই। মেয়েটা অবিকল কালোশশী—তেমনি

বিলাসিনী, তেমনি ঢঙ, তেমনি হাসি, তেমনি ঢ'লে-পড়া, মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর মন খাপ্পা হয়ে ওঠে।

আবার নবান্নর সময় একটা কাণ্ড ঘটেছিল। সেই কাণ্ডেই বুঝতে পেরেছে এ মেয়ের হাতে লক্ষ্মী নাই। নবান্নে এবার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদিতে খুব ধুম গিয়েছে। নবান্নে তাদের ধুম চিরকালের। সদ্‌জাতের অনেক ধুমধাম, এক পুজোর পর আর এক পুজো। তাতে কাহারেরা আনন্দ করে, পূজাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের নিজের ঘরে সে ধুমে দেবতার চরণের ছাপ পড়ে না। ওদের ধুম গাজন, ধরম পুজো, আমৃতি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা-বিষহরির পুজো, ভাদ্র মাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। মোটামুটি সাতটা পরব। এছাড়া ষষ্ঠী আছে, মঙ্গলচণ্ডী আছে,—সে শুধু মেয়েদের 'বেরতো', তাও তাদের করতে হয় ওই সদ্‌জাতদের মা-লক্ষ্মীদের বেরতো-স্থানের 'পাট আঙনে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনের এক প্রান্তে ব'সে। নবান্নই ওদের বড় পরব। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে, কালারুদ্দু বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের 'পাঁচ দব্য পস্তুত' করে আনন্দ করে খাওয়ায়! আর কালারুদ্দুর কাছে বলা—বাবা!—

'ল' লড়লাম—'ল' চাড়লাম
'ল' পুরনোয় ঘর বাঁধলাম
লতুনে বাখার বাঁধি পুরানো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্তু পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

'ল' অর্থাৎ 'ন' ; 'ন'-কে ওরা 'ল' হিসাবে উচ্চারণ করে, 'ন' অর্থাৎ নতুন। খাওয়া-দাওয়ার খুব ধুম। সবার বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ। খেয়েদেয়ে বিকেলবেলা হয় ড্যাং-গুলি অর্থাৎ ডাণ্ডাগুলির পাল্লা। জোয়ান ছেলেরা সায়েবডাঙায় গিয়ে দেড় হাত লম্বা ডাং এবং বিঘৎপ্রমাণ মোটা গুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে, সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলে হজম ক'রে বাড়ি ফেরে। এক এক ডাণ্ডা মেরে গুলিকে পাঠিয়ে দেয় হুই—লম্বাপার, দেখিয়ে দেয় সাত ভুবন। বারি দুরি তেরি চাল চম্পা ঢেক লঙ্কা—মাপতে মাপতে সাত মাপে গজ দিয়ে পিটিয়ে দেয় 'গজা' অর্থাৎ এক দানের হার। আবার যারা খাটুনি দেয়, তারাও কম যায় না, ওই বোঁ-বোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুই হাতে খপ ক'রে লুফে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলে—খেয়ে নিয়েছি অর্থাৎ গেল খেলনদারের হাত। সে এক মাতন। বুড়োরাও মধ্যে মধ্যে লোভ সামলাতে পারে না, তারাও দু-এক দান খেলে নেয়। ছেলেরা বার হয় তীরধনুক নিয়ে—বাঁখারির ধনুক, নতুন শরকাঠির তীর তৈরি ক'রে তারা হৈ-হৈ ক'রে বেড়ায় মাঠময়, তাড়িয়ে বেড়ায় ধান খেতে নামে যেসব পাখির ঝাঁক—কাক, শালিক, চড়াই, টিয়া তাদের।

সন্ধ্যেবেলা মদের পর্ব। ঢোলক বাদ্যি, গান, নাচ। এবার বনওয়ারী গোটা আটপৌরে পাড়াকে নিমন্ত্রণ করেছিল। নতুন মিলন হয়েছে ওদের সঙ্গে, কুটুম্বিতাও হয়েছে। বনওয়ারীরও এবার বাড়-বাড়ন্তের বছর, এ তার কর্তব্য। দিনের বেলা চুকে গেল সব, সন্ধ্যেতে মদের আসর বসল—জমলও খুব, পাগল বাহারের গান ধরলে—

ও লবানের লতুন ধানের পিঠে—
আজ কাজ কি মাছের ঝোলে !

অমনি নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। পাগলের গান চলল—

লতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে—
আঙা লতুন ছাওয়াল লিয়ে কোলে !

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। হিসেব কর, কার কার ছাওয়াল হবে। লতুন ছাওয়াল কোলে কে কে লবান্ন করলে। বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। বাবাঠাকুর কবে তাকে বংশ দেবেন তিনিই জানেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়ল, সুবাসী যেন নাই মনে হচ্ছে। ভাল ক'রে দেখতে দেখলে, হাঁ বটে, সে নাই। কোথায় গেল ? অজুহাত তুলে বাড়ি এসে সেখানেও পেল না তাকে। কোথায় গেল ? বেরিয়ে পড়ল মাঠে। চারিদিক খুঁজতে লাগল। করালীকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ। কারণ মনে হ'ল, যেন সে বাতাসে সিগারেটের ক্ষীণ গন্ধ পাচ্ছে। সে পাগল হয়ে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, কে যাচ্ছে দূরে দূরে—আটপৌরে পাড়ার কোলটাতে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—কে ? ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কেউ মানুষ নয়, একটা মরা স্যাওড়াগাছের বাকল-উঠে-যাওয়া গুঁড়ি, একটা ঝোপের সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে, সেটাকে ঠিক মনে হচ্ছে মানুষ। সেখান থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ সে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে দাঁড়াল। কালোশশীর ভাঙা ঘরের উঠানে এসে পড়েছে সে, এবং ভাঙা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কার সাদা মূর্তি। বাক্যহারা হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল তার মনে নাই। চেতনা হ'ল তার সাদা মূর্তিটির কথা শুনে। অতি মৃদু খোনাসুরে বলল—পাঁলাও—তুমি পাঁলাও—আমার লোঁভ লাঁগছে তোমার ওঁপর—

মুহূর্তে বনওয়ারীর ভয় ভেঙে গেল। চেতনা ফিরে এল। লাফ দিয়ে সে ধরলে তাকে। সে সুবাসী।

—হারামজাদী—

আশ্চর্য সুবাসী, সে খিলখিল করে হেসে উঠল। উন্মত্ত ক্রোধে বনওয়ারী তার গলা টিপে ধরে বললে—বল্ কি করছিলি এখানে ? বল্ আর কে ছিল ?

সুবাসী বহু কষ্টেই বললে—সন্দেশ !

—সন্দেশ ?

—সন্দেশ খেছিলাম লুকিয়ে। এই দেখ। সে কাপড়ের ভিতর থেকে বার করলে সন্দেশের বাটি।

গলা ছেড়ে দিলে বনওয়ারী।—সন্দেশ খেছিলি লুকিয়ে ?

—হ্যাঁ। নতমুখে সে বললে—দিদি মোটে দুটি দিয়েছিল, তাই—

এবার হেসে ফেললে বনওয়ারী।—তাই লুকিয়ে এখানে খেতে আইছিলি ! তা ঘরে খেলেই তো পারতিস ?

—কেউ যদি দেখে ফেলত !

—তাই ব'লে এই ভাঙা ঘরে—সাপ, না খোপ—

—ভালই হ'ত মরতাম। তুমি আজলক্ষ্মী গোপালী বুড়ীকে নিয়ে ঘর করতা।

হাসলে বনওয়ারী। বললে—চল, কত সন্দেশ তু খেতে পারিস দেখব? এখুনি সন্দেশ আনাব।

—না। এবার কাঁদতে লাগল সুবাসী।

—কাঁদিস না, চল্।

অনেক কষ্টেই সুবাসীর মান ভাঙিয়েছিল সে। কিন্তু এমন যে মেয়ে—যে লোভের বশে, দেবতার কথা না ভেবে, স্বামীকে বঞ্চিত ক'রে, চুরি ক'রে ভূতুড়ে ঘরে ব'সে পেটপূরণ করে, সে তো ভাল মেয়ে নয়। ওই মিষ্টি পরের দিন দেবতাকে দেওয়ার কথা ছিল। বনওয়ারী মুখে তোলে নাই তখনও পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বছর চড়কের পাটায় শুয়ে বনওয়ারী ওই সব কথাই ভাবছিল। গত বছরের কথা। ও বছরের কথা বছর পার হয়ে এ বছরে কাহিনী হয়ে গেল। বাজনা থামল, পাটা নামছে, উপরে শিমূলবৃক্ষের ডগার ডালটি ঝুলছে; বাবাঠাকুরের দহের ধারে পাটা নামছে। বাবা জলশয়ানে যাবেন বছরের মত। এক বছর গেল, নতুন বছর শুরু হ'ল।

পাটা নামতেই বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

এক লালমুখ সায়েব আর তার পাশে করালী। দুজন সিগারেট খাচ্ছে। জাঙলের সদগোপ মহাশয়েরা মায় মাইতো ঘোষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। করালীর ভ্রূক্ষেপও নাই। সায়েবটা কড়োমড়ো ক'রে কি বলছে। মাইতো ঘোষ ইংরেজীতে জবাব দিচ্ছেন। বনওয়ারীর ইচ্ছে হল, লাফিয়ে উঠে ছোঁড়ার বুকে প্রচণ্ড এক কিল মারে। ভেঙে দেয় ওর বুকের পাটা, চুরমার ক'রে দেয়। কিন্তু সে শুয়ে আছে চড়কপাটায়, এবং সায়েবটা রয়েছে করালীর পাশে।

অবাক। করালী বললে—হ্যালো ম্যান? ব'লেই ঘাড়টা উল্টে দিল। এ ইশারার মানে—চল। তাই বটে। সায়েবটা চলে গেল করালীর সঙ্গে।

* * *

করালী পাপ, করালী সাক্ষাৎ 'দানো' অর্থাৎ দানব। কাহারকুলের অনেক পাপে হাঁসুলী বাঁকে ওর আবির্ভাব হয়েছে। বনওয়ারীর বয়স প্রায় তিন কুড়ি হ'ল, সুচাঁদ পিসীর চার কুড়ি হবে, চোখে তো দুজনের একজনও দেখে নাই এমন 'দানোর' আবির্ভাব।

সুচাঁদ পিসীর জানা হাঁসুলী বাঁকের যে উপকথা, সে উপকথার মধ্যেও নাই। বজ্জাত দুষ্ট চিরকাল আছে, থাকবেও চিরকাল, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ দানো। আদ্যিকালের কথায় দত্যি-দানোর কথা শোনা যায়, পৃথিবীতে তারা জন্ম নিত মনুষ্য হয়ে, পাড়া-গেরামদেশ লণ্ডভণ্ড ক'রে দিত, নিজে পাপ করত, পরকে দিত পাপমতি, মানুষ পরিত্রাহি ডাক ছাড়ত মনে মনে। মা ধরণীর বুক উঠত টাটিয়ে, তিনিও কাঁদতেন। তখন দেবতা আসতেন, এসে বধ করতেন মনুষ্যবেশী দানোকে। মানুষের সাধ্য নাই দানোকে বধ করতে। বনওয়ারী অত্যন্ত সাবধান হয়েছে। মনে মনে বেশ বুঝেছে। একটি ব্যাপারেই চোখ খুলে গিয়েছে।

করালীর সেই কোঠাঘর করা নিয়েই ব্যাপার। গোটা কাহারপাড়ার বারণ মানলে না,

মাতব্বরের শাসন নিলে না। বসনের মত শাশুড়ী, তার কথা রাখলে না। সুচাঁদের মত আদ্যিকালের প্রবীণ মানুষের হিতবাক্য কানে তুললে না। সেই কোঠাঘর বানালে সে। গোটা কাহারপাড়ার ক্ষমতা তাকে আটক করতেও পারলে না।

আজ কাহারপাড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখ, করালীর কোঠাঘর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোঠাখানা কাহারপাড়ায় জোর ক'রে পোঁতা করালীর জিদের ধ্বজার মত উঠে রয়েছে—সন্ধ্যেবেলা এসে ওরা আলো জেলে ঢোল বাজিয়ে 'জানান' দিয়ে যায়। জিদের ধ্বজাই নয় শুধু, অধর্মের—কলিকালের ধ্বজা। হতভাগা জানে না, উঁচু মাথায় বিপদ কত ! তালগাছে বজ্রাঘাত হয়, লাঠি পড়লে উঁচু মাথাতেই পড়ে, ঝড়ে উঁচু ঘর ওড়ে, উঁচু ঘরে আগুন লাগলে সে আর নিবানো যায় না। চোর ডাকাতের নজর উঁচু ঘরের মাথা দেখে ফেরে, হিংসুটে লোক উঁচু ঘর দেখেই বিষমন্তর আওড়ায়। ভূত বল, প্রেত বল—আকাশে আকাশে যাঁরা ফেরেন, তাঁদের পথে যে ঘরের মাথা উঁচু সেই ঘরের মাথাতেই তাঁরা বসে পড়েন, বাধা পড়লে সে ঘরে মন্দ দৃষ্টি দিয়ে যান। পিতৃপুরুষে যা করে নাই, তাই করলে অশুভক্ষণে, তার ফল ওকে পেতেই হবে।

চড়কপাটায় শুয়ে বনওয়ারী স্মরণ করলে ওই ঘর করার বৃত্তান্ত।

সেদিন করালীর ঘরের তৈরী বনিয়াদ কাহারপাড়ার সবাই জুটে হৈ-হৈ ক'রে কেটে সমান ক'রে দিলে মাটির সঙ্গে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় করালী চ'লে গেল পাখীকে নিয়ে চন্ননপুর। রাত্রে নয়ান মারা গেল, ভোরে শ্মশান থেকে বনওয়ারীরা ফিরতেই গোপালী বললে—বেপদ হইছে। করালী পুলিস নিয়ে আইছিল। জমাদার ব'লে যেয়েছে—তোমাকে থানাতে যেতে।

—থানায় যেতে। বুকটা গুর-গুর ক'রে উঠল বনওয়ারীর।

অনেক ভেবে সে সাহস সঞ্চয় করলে। চুরিও করে নাই সে, ডাকাতিও না, খুনও না, কিসের ভয় তবে ? সরকারের একটা আইন আছে, পাড়াঘরে জাতধর্মের একটা নিয়ম আছে। সে মাতব্বর হয়ে অনিয়ম করতে দেবে কি ক'রে—থানাওয়ালা আইন দিয়ে তাই হিসাব করুক, বিচার হোক। সে সঙ্গে নিলে প্রহ্লাদ এবং রতনকে, আরও নিলে চৌধুরী মহাশয়ের পাইক নবীনকে। জমিটা চৌধুরী মহাশয়ের, ঘর ক'রে আছে ব'লে জায়গা করালীর বাপের নয়, সুতরাং তাদের বিনা হুকুমে করালী ঘর করে কি ক'রে ? আর নবীনকে করালী গাল দিয়েছে, মেরেছে। এ বুদ্ধিটা দিলেন ঘোষেরা। মাইতো ঘোষ ব'লে দিলেন—বলবি চৌধুরী মহাশয়ের হুকুমে কেটে দিয়েছি বনেদ।

কিন্তু দারোগাবাবু বললেন—উঁহু, ওসব কথা চলবে না। বুঝলে ! ঘর ওর ছিল ওখানে, সেই ঘর ভেঙে নতুন করছে, জমি চৌধুরীদের হোক আর যারই হোক, তারা খাজনার মালিক, খাজনা পাবে ; ঘর করতে বাধা দিতে কেউ পারবে না। আর পাড়া-নিয়মের কথাও চলবে না। কোঠাই করুক আর গম্বুজই করুক, ওকে করতে দিতে হবে।

বনওয়ারী হাতজোড় ক'রে শেষ চেষ্টা ক'রে বলেছিল—আজ্ঞে, খ্যানত হয়, কিছু হয়—

করালীই ওপাশ থেকে জবাব দিয়েছিল—হয় আমার হবে।

দারোগা হেসেছিলেন। বনওয়ারী ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে করালীর দিকে তাকিয়েছিল, কথা বলতে

পারে নাই। অবশেষে তাই স্বীকার ক'রে ফিরে এসেছিল। দারোগাবাবুকে একটা খাসিও দিতে হয়েছে। অন্যথায় করালীকে ক্ষতিপূরণ দেবার হুকুম দিতেন দারোগাবাবু। করালী উঠে গেলে জমাদার বনওয়ারীকে ডেকে বলেছিলেন—ক্ষতিপূরণের কি করবি ?

ক্ষতিপূরণ ! লজ্জায় ক্ষোভে বনওয়ারীর চোখে জল এসেছিল। করালীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'লে তার মাথাটা যে কাটা যাবে ! তার চেয়ে তার 'মিত্যু' ভাল।

শেষ জমাদারবাবুই মান রক্ষে করেছিলেন, বলেছিলেন—যাক, সে অপমান তোর হতে দোব না। আমি তো তোকে জানি। দারোগাবাবু না-হয় নতুন লোক। ব'লে দোব ওঁকে আমি। তা নতুন বাবুকে একটা খাসি দিস। উনিও খাবেন, আমরাও খাব।

সেই দিনই বিকেলবেলা করালী এসে করেছিল ওর ঘরের পত্তন। সেই মরা গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে হুকুম দিয়েছিল—লাগাও।

সঙ্গে সঙ্গে হো-হো ক'রে হাসি।

লোকজন সব এনেছিল চন্ননপুব থেকে। তারা কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে। কাহারপাড়ার লোক দূরে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে দেখলে। সুচাঁদ যে সুচাঁদ, সেও নির্বাক হয়ে রইল। তার বাবাকে স্মরণ ক'রে আনন্দেও কাঁদতে পারলে না, ভবিষ্যতের অমঙ্গল কল্পনা ক'রে আশঙ্কাতেও কাঁদতে পারলে না দারোগার ভয়ে।

শুধু মাথলা নটবর এরা এসেছিল। ওরা দু-তিনজন প্রকাশ্যেই করালীর দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। খাসির কথা ওরাই বললে করালীকে। খুব কৌতুকের সঙ্গেই বললে। বললে—আচ্ছা দাঁড় হইছে। খুব হাসলে।

করালী কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে—দিলে কেনে ?

—না দিলে ?

—না দিলে কি ?

—তোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত। তাতে যে অপমান হ'ত।

—আমি তো ক্ষতিপূরণ চাই নাই।

—তু না চাইলে কি হবে ? আইন—

করালী মুখ ভেঙিয়ে ব'লে উঠল—আইন ! ভাগ শালো বেকুব কোথাকার ! ঠকিয়ে নিয়েছে: মাতব্বরকে ঠকিয়ে নিয়েছে। বলিস—রাজী থাকে তো আমি নিয়ে যাব স্বদেশীবাবুদের কাছে। খাসি পেট থেকে বার করব দারোগার।

কথাটা বনওয়ারী শুনেছিল। কিন্তু সে করালীকেও বলে নাই, কারও কাছেই যায় নাই। ছি ! শুধু তাই নয়, করালীর ঘরের দিকেই আর সে তাকায় না। ওদিক দিয়ে সাধ্যমত হাঁটে না, ওদিকে যেতে হ'লে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ঘর যখন পাড়া ছাড়িয়ে মাথা তুলে উঠেছে, তখন অবশ্য না দেখে উপায় নাই, তবে সাধ্যমত তাকায় না। কিন্তু করালী আশ্চর্য—ঘর তৈরী ক'রে ঘরখানার ভিতর মেরামত আর করলে না। করবে কেন ? ঘর করাটা তো তার জেদ। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর তোলা হ'ল, চিরকালের নিয়ম-আচারে লাথি মারা হ'ল, হয়ে গেল কাজ। সে বাস করছে চন্ননপুরের সেই পাকা খুপরি কোয়ার্টারে। যুদ্ধের কাজ, তাকে থাকতেই হবে। আরও একটা কারণ

আছে। সেটা বনওয়ারী বুঝতে পারে। তারও বয়স অনেক হ'ল। করালী এখানে বাস করতে ভয় করে। করালীর ঘরে এখন বাস করছে নসু। সে থাকে, সাঁজ-পিদীম জ্বল মাড়ুলী দেয়, সকালবেলায় চ'লে যায় চন্নপুর, ফেরে সন্ধ্যায়। বিকেলে যেদিন ফেরে, সেদিন করালী-পাখীও আসে। সন্ধ্যের আগেই আবার চ'লে যায়।

ড্যারাড্যাং--ড্যা—ড্যারাডাং—ড্যাং।

* * *

ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং।

কালারুদ্দের শিলারূপ জলশয়ানে গেলেন। গত বছরের কথাগুলি স্মরণ করা বন্ধ ক'রে বনওয়ারী চড়কচক্রের পাটা থেকে নামল। ভয়ের বছর শেষ হ'ল। নির্ভয়ে কেটে গেল। জয় বাবা কালারুদ্র। আটচল্লিশ সাল শেষ হলেন, উনপঞ্চাশ সাল এলেন। সুচাঁদ বলে—ক'কুড়ি ক'বছর তাই বল। তারপর ঘস ঘস ক'রে মাথা চুলকে বাঁ হাতের আঙুলে টিপে উকুন বার করবার চেষ্টা করতে করতে আবার বলে—বিধেতের তো চুলও পাকে না, দাঁতও ভাঙে না। তার কি? বছর পার করলেই খালাস। সেই আদ্যিকাল থেকে--। ব'লে সে পিছনের দিকে ডান হাতের তর্জনীটি বাড়িয়ে দেয়, চোখে ফুটে ওঠে এক বিচিত্র বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি; কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে থাকে, গোটা কাহারপাড়াও তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে। সুচাঁদ আবার বলে—কত বছর হ'ল কে জানে। মাথার চুলের সংখ্যে হয় তার আর সংখ্যে নাই। ব'লে সে ঘাড় নাড়তে থাকে

দুই

উনপঞ্চাশ সাল এলেন ঝড় বাতাস নিয়ে। পয়লা বোশেখ শুভদিনে একটা কালবৈশাখী হয়ে গেল। দোসরাও একটা ঝাপটা দিলে। তেসরা চৌঠা বাদ দিয়ে পাঁচুই আবার ঝড় এল বেশ সেজেগুজে হাঁকডাক ক'রে। দু'দিন চারদিন অন্তর একটা ক'রে ঝাপটা প্রায় নিত্যিই চলতে লাগল উনপঞ্চাশ সালে পাগলও ফিরেছে।

সায়েবডাঙার জমির বাকিটা এবার আবার কাটতে আরম্ভ করলে বনওয়ারী। সন্ধ্যের পর চাঁদ যতক্ষণ ততক্ষণ কোদাল চলতে লাগল কাহারদের, এবার কাহারদের সঙ্গে আটপৌরেরাও যোগ দিয়েছে। পরমের জমি আট ঘর আটপৌরে ভাগ ক'রে নিয়েছে, কেবল রমণ নেয় নি, সে বুড়োমানুষ, সন্তান নাই; সে-ই এখন আটপৌরেদের মাতব্বর হয়েছে; বনওয়ারীর নীচে অবশ্য। রমণ এখন একরকম ব'সেই খাচ্ছে। যোগাচ্ছে বনওয়ারী। সুবাসীর মেসো, বনওয়ারীর মেসো। রমণ বনওয়ারীর গরু-বাছুর চাষবাস দেখে—এটা ওটা যা হয় করে। বনওয়ারী কাহারদের জন্যও জমির চেষ্টা করছে, চন্ননপুরের বাবু মহাশয়ের কাছেও গিয়েছিল। বাবু আশা দিয়েছেন।

সায়েবডাঙার জমি কাটতে কাটতেই ওই সত্যটা আবিষ্কার করলে বনওয়ারীরা।

উনপঞ্চাশ সাল বাতাস নিয়ে 'আইছেন লাগছেন' অর্থাৎ এসেছে মনে হচ্ছে।

পাগল জমির ধারে ব'সে ব'সে তামাক খায়, আর সকলকে খাওয়ায়। ও কোদাল ধরে না। মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ে বাউল-ফকিরের মত বেশ ধ'রে। দুদিন পাঁচদিন ঘুরে ঝোলার পেটটি মোটা ক'রে ফেরে, ব'সে পাঁচ-সাতদিন খায়। বলে—এতেই চ'লে যাবে দিন কটা। ও কোদাল ধরবে কেন? বনওয়ারীও বলে না কোদাল ধরতে। পাগল গুণী মানুষ। গবেষণাটা শুনে পাগল বললে—তা আসবে না কেনে হে। উনপঞ্চাশ যে পবনের বছর। বুয়েচ। তারপর বললে—এবার হনুমানেরও উপদ্রব হবে, দেখো। উনিই তো পবননন্দন। পাগলের কথাটা সত্য। পবনের নন্দন ব'লে নয়, ঝড় হ'লে গাছের ডালে বসে ভিজে হনুমানগুলির যত শীত ধরে, তত বেশি লাফালাফি ক'রে ফেরে। ঝড়জল থামলেই উন্মত্তের মত লাফ দিয়ে বেড়াতে শুরু ক'রে দেয়।

উনপঞ্চশের পবনে আর পবননন্দনদের 'বিক্যমে' অর্থাৎ বিক্রমে কাহারপাড়ার এবার আর দুর্দশার সীমা রইল না। চালের খড় তছনছ হয়ে গেল। ঝড়ের সময় শেষ হ'লে তালপাতা কেটে চালে চাপালেও আর হবে না। চালে খড়ই আর নাই। থাকবার মধ্যে আছে বনওয়ারী। কাহারপাড়ার সকলেই করে কৃষাণি। কৃষাণদের ভাগে খড় প্রাপ্য নয়, তিন ভাগের এক ভাগ ধান পাওয়াই সেই আদ্যিকালের নির্দিষ্ট নিয়ম। খড় দু-চার গণ্ডা মনিবের কাছে চেয়ে নেয়। আর মাঠ থেকে সরানো ধানগুলি থেকে কিছু খড় হয়। খড় এবার কেনাও দুঃসাধ্য। খড়ের দরে আগুন লেগেছে। কাহন বিশ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ। কাল যুদ্ধ রে।

চন্ননপুরে যাও, বুঝতে পারবে কি রকম যুদ্ধ লেগেছে পৃথিবীতে। কারখানাটা বেড়ে যেন ভীমের বেটা ঘটোৎকচ হয়ে উঠেছে। আর সে কি গর্জন। লোহার যন্ত্রপাতিগুলো ঘড়-ঘড় ঘং-ঘং-ঘটাং-ঘং, ঘটা-ঘটা ঘং—ধড়াম-ধুম শব্দ ক'রে যেন মহামারণ লাগিয়ে দিয়েছে। মধ্যে মধ্যে আবার উঁ—উঁ—উঁ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে। শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিরসির করে। সেখানে দাঁড়ালে কানে তালা ধ'রে যায় শব্দে। ভিতরে ঢুকলে নাকি গরমে সিদ্ধ হয়ে যায় মানুষ। দুটো চারটে লোক প্রতিদিনই জখম হচ্ছে। দু-দশ দিন অন্তর মরছেও একটা দুটো। কাউকে টেনে নিচ্ছে কলের চাকায়, কারও মাথায় খসে পড়ছে লোহার টুকরো, কেউ মরছে উপর থেকে মুখথুবড়ে পড়ে। মরলে নাকি ক্ষতিপূরণ দেয়। সে নাকি অনেক টাকা। হোক অনেক টাকা, জীবনের চেয়ে তার দাম বেশি?

করালী সেই কারখানার ভিতর কুলি-সর্দার হয়েছে। কোট পরেছে, পেন্টুল পরেছে, জুতো পায়ে টুপি মাথায় দিয়ে হুকুম চালায়। বনওয়ারী আশ্চর্য হয়ে যায়, করালী আজও শাস্তি পেলে না কেনে? বাবাঠাকুরের বিচার ন্যায়বিচার, যমদণ্ডের আঘাতে সাজা। সে সাজা কি করালীব আজও পাওয়া হয় নাই? হবে হয়তো। আজও হয়তো সময় হয় নাই হতভাগার পাপের ভারা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এবারে ঝড়ে সকলের ঘর উড়ল, কিন্তু করালীর ঘর প্রায় ঠিকই আছে। অবশ্য লোহার তার দিয়ে চালকে বেঁধেছে মাটির সঙ্গে, চালের উপর আবার দড়ির জাল দিয়ে খড়ের ছাউনিকে ঢেকে বেঁধেছে, কিন্তু বাবাঠাকুরের কোপ তালগাছের মাথা ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে দেয়, পাকা রেলের পুলকে

ভাসিয়ে দেয়, তার কাছে ও বাঁধন কি? ওর পাপের ভারা পূর্ণ হয় নাই—এই কথাই ঠিক।

করালীর দঙ্গলে কতকগুলো ছোঁড়াও ভিড়েছে। ভিড়ুক। ওদেরও সাজা হবে। বাবাঠাকুর আছেন।

হঠাৎ এসে দাঁড়াল ঘোষ-বাড়ির চাকর।—বড়কর্তা ডেকেছেন বনওয়ারীকে।

—বড়কত্তা। এত এতে? কাল সকালে—

—না না। আজই রাত্রে যেতে হবে। তা নইলে এই সায়েবডাঙায় আসব কেনে?

—কি, বেপার কি?

—বাড়িতে খাওনদাওন, জান তো?

—হ্যাঁ। তার তো সব যোগাড় হয়েই যেয়েছে।

—তুমি যেয়ো, সেখানেই শুনবে সব।

চাকরটা চ'লে গেল।

ঘোষ-বাড়িতে প্রতি বৈশাখী-সংক্রান্তিতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে পুণ্য কর্মটির রেওয়াজ ক'রে গিয়েছেন স্বয়ং ঘোষ মহাশয়দের মা-ঠাকরুন। ব'লে গিয়েছেন—নেহাত মন্দ অবস্থা না হ'লে এটি বন্ধ ক'রো না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ মহাশয়েরা ভোজন করেন। কাহারেবা প্রসাদ পায়, এঁটোকাঁটা সাফ করে, পাতায় প'ড়ে থাকা খাবার গামছায় বেঁধে বাড়ি আনে, আনন্দ ক'রে খায় পরের দিন।

পাগল বললে—তা হ'লে ওঠো আজকের মত। উদিকে আকাশের গতিকও মন্দ হে। পচিময় চিকুরছে, বাতাস থম ধরেছে। আজ চার-পাঁচ দিন দেবতা হাঁকাড় দেন নাই। আজ বোধ হয় এতে আসবেন বা।

পাগল ব'সে ব'সে ঠিক দেখেছে। পশ্চিমে মেঘ উঠেছে মধ্য-আকাশে চাঁদ আছে ব'লে এখনও আলো রয়েছে।

বড় ঘোষ মহাশয় থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয় পেলে বনওয়ারী। চন্নপুরের বাবুদের কাছে জমি নিয়ে ঘোষ মহাশয়দের জমির কাজে কিছু অবহেলা তার হচ্ছে, এজন্য বড়কর্তা একদিন রোষ করবেন—এ অনুমান বনওয়ারী কিছুদিন ধ'রেই ক'রে আসছে। আজ বুঝলে, খাওয়ান-দাওয়ানের কোন কর্মের খুঁত ক'রে সেইটা আজ মাথায় পড়ছে। সে সভয়ে সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে?

বড়কর্তা ফেটে পড়লেন—তোমাদের কাহারদের আমি সোজা ক'রে দোব।

—আজ্ঞে?

—কেরোসিনের জন্য খবরদার আসবে না তুমি। চিনির জন্যে না। কাপড়ের জন্যে না। কুইনিনের জন্যে না। খবরদার। দোব না আমি।

বড়কর্তা ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর। কাহারপাড়া জাঙলের হুকুমচিঠির ভার ওঁর উপরে। যুদ্ধের জন্য 'কেরাচিনি', চিনি, কাপড় 'কন্টোল' না কি হয়েছে। বাজারে গিয়ে পয়সা

দিয়ে মেলে না। হুকুমচিঠি পেলে, সেইটি দেখালে, তবে পাওয়া যায়। কাহারেরা 'কেরাচিনি' পায়, চিনি বড় একটা পায় না। সাত দিনে এক ছটাক বরাদ্দ। তাও বন্ধ ক'রে দেবেন বলছেন। চিনি গেলে ক্ষতি নাই। চিনি ওরা খায় না, ওদের চিনিটা নিয়ে থাকেন ওদের মনিব মহাশয়েরা। কিন্তু 'কেরাচিনি' খানিক আদেক না হ'লে চলবে কি ক'রে ? 'কুনিয়াল পিল' ইউনিয়ন-বোর্ড দেন মেম্বরের হাতে, ম্যালেরিয়ার সময় ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক—তখন কুনিয়াল না হ'লে মরণ ! কিন্তু অপরাধটা কি হ'ল ?

বড়কর্তা বললেন—গলায় তোরা পৈতে নে, বুঝলি ? তোদের মেয়েরা চন্নপুরে গিয়ে—

বড়কর্তা একেবারে কাহার মেয়েদের যত কেলেঙ্কারি প্রকাশ ক'রে দিলেন। বড়কর্তা রেগে গিয়ে কাহারদের কথা প্রকাশ ক'রে বললেন—কাহাবেরা আর কাহার নাই, বামুন। তা পৈতে নিক কাহারেরা। শেষে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বললেন—এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন চাই ' জুতো না খেয়ে সব মাথায় উঠেছে !

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল—সে কি ? এ সব কথা কে বললে আপনাকে ?

বড়কর্তা উঠে এলেন। বললেন—তোদের ওই করালী বলেছে। হারামজাদাকে আমি একদিন জুতোব। শালাব ভয়ানক বাড় হয়েছে। চন্নপুর ইস্টিশানে ছোটকা অর্থাৎ ছোট ভাই আজ বাজার ক'রে নেমেছিল। তোদের সিধু ছিল সেখানে। সিধু জিজ্ঞেস করেছে অন্নপ্রাশনের কথা। বলেছে—আমাদিকে পেসাদ দেবেন তো ? ছোটকা বলেছে—নিশ্চয়ই পাবি। যাবি তোরা। তুই করালী পাখী যাবি, কাহারপাড়ার সবাই আসবে। করালী দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। সে বেটা বলেছে—করালী কারও এঁটোকাঁটার পেসাদ খায় না। কাহারপাড়ার ছেলেছোকরারাও বলছে—তারাও যাবে না। সিধুকে বলেছে—তু যদি যাস তো তোর সঙ্গেও আমরা খাব না।

অবাক হয়ে গেল বনওয়ারী। এমন স্পর্ধা সে কল্পনাও করতে পারে না।

বড়কর্তা বললেন—যে শালা কাহার না আসবে, তাকে দেখব আমি। আবার পাড়াতে মজলিস জুড়েছে।

* * *

কথাটা সত্য। সেই রাত্রেই করালীর বাড়িতে কাহারছোকরাদের মজলিস চলছিল। করালী তাদের সেই কথা বলছে।—ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। যে কাহার পরের এঁটো খাবে, সে পতিত। তার জাত নাই।

করালীর আপসোস—বুড়ো কাহারেরা এই সহজ কথাটা বুঝছে না। আপসোস—তারা চন্নপুরের কারখানায় গিয়ে একবার পরখ ক'রে দেখছে না, সেখানে সুখ কি দুখ ' সেখানে মানুষের ভাল হয় কি মন্দ হয় !

মজলিসটা জ'মেই উঠেছিল। বনওয়ারী এসে হাজিরও হ'ত। কিন্তু জাঙল থেকে পথে ফিরতে ফিরতেই এল ঝড়। হাঁকডাক ক'রে এল। গোঁ-গোঁ—সোঁ-সোঁ ! এ বছর এমন জোরে আসেন নাই ঠাকুর, আজ নিশ্চয় আসছেন করালীর তালগাছটার মাথা ভাঙতে। নিশ্চয়। সে আকাশের দিকে চাইলে। মেঘের নীচে চাঁদ এখনও দেখা যাচ্ছে। মেঘ কুণ্ডলী

পাকাচ্ছে, সাদা কালো। চমকে উঠল বনওয়ারী। সেই বরণ, সেই চিত্রবিচিত্র! তেমনি এঁকেবেঁকে পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে। জিভের মত লকলকিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। হে বাবাঠাকুর, রক্ষা কর। হে বাবাঠাকুর! গাছ ভাঙছে, বাঁশে বাঁশে কটকট শব্দ উঠছে, কড়কড় ক'রে মেঘ ডাকছে; সঙ্গে সঙ্গে নয়ানের মায়ের গলায় আজ আবার অনেকদিন পরে সাড়া জেগেছে।

ওদিকে নয়ানের মা তীব্রস্বরে ব'লে যাচ্ছে, সুচাঁদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলছে—হে বাবাঠাকুর, তুমি ধ্বংস কর বাবা, যে তোমার বাহনকে মারলে, যে পরের ঘর ভাঙলে, গাঁয়ের বিধান না মেনে যে উঁচু ঘর বাঁধলে, একবার ফুঁসিয়ে তার ঘর উড়িয়েছ, আবার ভেঙে দাও। মড়মড় ক'রে ভেঙে দাও। মাথায় তাদের দংশন কর। হে বাবা! যে-যে নোক তোমার বাহনকে মারার অপরাধকে ক্ষমা করেছে, তাদের কামুড়ে মেরে ফেল। চোখ ফেটে যাক অক্তের ডেলা হয়ে; গায়ে অক্তমুখী চাগড়া চাগড়া দাগ ফুটে উঠুক। কাহারপাড়ায় যার যত অপরাধ, বিচার কর। শ্যাষ ক'রে দাও, শ্যাষ ক'রে দাও, শ্যাষ ক'রে দাও। আমার নয়ানের সঙ্গী কর সবাইকে। আমাকে যেন বাঁচিয়ে একো। আমি নি-মনিষ্যি কাহারপাড়ার ঘরে ঘরে নেচে বেড়াব—কেঁদে বেড়াব পেত্নীর মত।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে রইল মেঘের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে শব্দ উঠল।

পড়ল? করালীর ঘর পড়ল? উঠে দাঁড়াল বনওয়ারী। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর নীরব হয়েছে।

ঝড় থামতেই সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়—কার ঘর পড়ল?

—নয়ানের ঘর গো।

—নয়ানের ঘর? স্তম্ভিত হয়ে গেল বনওয়ারী।

—বনওয়ারী? ব্যানো?

—কে? বিরক্ত হ'ল বনওয়ারী;—পিছনে ডাকে কে?

—আমি, পাগল।

—কি?

—খ্যানত হয়ে গেল ভাই। সর্বনাশ হয়েছে।

—কি তাই বল?

—করালী চন্ননপুর যাবার পথে হেঁকে ব'লে গেল—বাবাঠাকুরের মুড়ো বিল্ববিক্ষটি প'ড়ে গিয়েছেন।

হে ভগবান! বাবা গো! তুমি কি করলে গো! শেষে কি তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে? কলিকাল! অধর্মের পুরী! কাহারপাড়ায় পাপ পরিপূর্ণ ক'রে তুললে করালী। সেই পাপ সইতে না পেরে চ'লে গেলে তুমি!

জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গোটা কাহারপাড়া দেখলে। মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ আবার উঠেছে আকাশে। ফুটফুট করছে চাঁদের আলো। বনওয়ারীর হাতে লণ্ঠনও ছিল একটা। বাবাঠাকুরের বৃক্ষটি কাত হয়ে গিয়েছে।

বনওয়ারী বললে—চান কর সব।

—চান ?

—হ্যাঁ, চান কর। চল, ঠেলে বিক্ষটি তুলব। ছোট বিক্ষ, গোটা কাহারপাড়ার কাঁধ, দিব্যি উঠে যাবে। তা'পরেতে ওকে বাঁচিয়ে দোব। ভয় নাই, পাশের বিক্ষটি ঠিক আছে।

গোটা কাহারপাড়া কাঁধ দিলে।

জল বাবাঠাকুর ! জয় কালারুদ্দু ! বলো—শিবো—ধম্মরঞ্জো – ! উঠেছে, উঠেছে। আবার বলো ভাই। আবার। হয়েছে। হয়েছে। দাও মাটি চারিদিকে—বেঁধে দাও। শক্ত ক'রে বেঁধে দাও।

হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠল কেউ। শিশুকণ্ঠ। চমকে উঠল সবাই। বুক ধড়ফড় ক'রে উঠল। বাবাঠাকুরের থানে কার কি হ'ল ?

—কি ? কি হ'ল ?

—সাপ ! ও বাবা, সাপ !

—সাপ ! কার ছেলে রে ? কে ? কি সাপ ? বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল পানা—নিমতেলে পানা।—ওগো—সেই গো, সেই। ঠিক সেই তিনি গো !

একটা ঝোপের মধ্যে একটা চন্দ্রবোড়া ঢুকছিল তাদের স্বভাবমন্থর গতিতে।

কাহারপাড়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। পানার ছেলেটা ম'রে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, ঠিক যেমন ভাবে মরেছিল করালীর কুকুরটা, তেমনি ভাবেই চোখ ফেটে রক্ত পড়ল, শরীরে চাকা চাকা রক্তমুখী দাগ বার হ'ল। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াল। সুচাঁদ চীৎকার করে উঠল—ওরে আমি তখুনি বলেছিলাম রে ! বছর পেরুলে কি হবে রে ? বাবাঠাকুরের কাছে বছর নাই রে ! ওরে বাবা !

নয়ানের মা ভাঙা ঘরের দাওয়া থেকে উত্তর দিল—আঃ, কে করলে বেহ্মহত্যে, কার পরাণ গেল রে ? পানা তো খুঁতো পাঁটার বদলে ভাল পাঁটা দিয়েছিল রে ! যে ডাকাবুকো বাবার বাহনকে মেলে রে, তার কিছু হলো না কেনে রে ? অর্থাৎ করালীর কিছু হ'ল না কেন ? তার নিজের ঘর ভাঙায় কোন দুঃখ নাই, দুঃখ থাকলেও সেজন্য সে আক্ষেপ করলে না। তার আক্ষেপ—পাপীর দণ্ড হ'ল না।

পানা এবং পানার স্ত্রী ভয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এ সাজা বাবাঠাকুরের দেওয়া সাজা। এতে কথা বলবার নাই।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার বিধাতাপুরুষ কাহারপাড়ার লোকের 'নেকনে' অর্থাৎ লিখনে ষষ্ঠীপুজোর দিনে তার ভাগ্যফল 'নিকে' দেন। গতজন্মের যেমন কাজ তেমনি ভাগ্যফল দেন। নইলে চন্দ্রবোড়া সাপ এখানে বিরল নয়। যথেষ্ট আছে। তার বিষে মরছেও অনেক। কিন্তু পানার ছেলের এই মরণ, এই বাবাঠাকুরের থানে, বাবাঠাকুরের গাছ পড়ল যেদিন, সেই দিনেই এই মরণ—এর কার্যকারণ সব তো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। পানার ঘরের কুকুরে-ধরা উচ্ছিষ্ট পাঁঠা জরিমানা স্বরূপ আদায় ক'রে চৌধুরীবাবুরা বাবার থানে বলি দিয়েছে, শাস্তি যাবে কোথা ? এ নিশ্চয় বাবাঠাকুরের দণ্ড ; ভুল নাই তাতে, কোন ভুল নাই। এ মিত্যু বাপের পাপে বেটার মিত্যু।

বনওয়ারী মাথায় হাত দিয়ে বসল। বছর পার হয়েছে, তাতে দণ্ডকাল ফুরায় নাই।

জন্মান্তরে শাস্তি হয়, যুগ পার ক'রে শাস্তি হয়, আদিকাল থেকে হাঁসুলী বাঁকের কর্মফলে কোন শাস্তি কবে আসবে কে জানে। তবে আসবে নিশ্চয়।

তিন

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মানুষেরা—অন্ধকার রাত্রে বটতলায় আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষের দল। এ রাত্রি আদ্যিকালে আরম্ভ হয়েছে, শেষ কবে হবে জানে না। তবে শেষ যেদিন হবে, সেদিন হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হবে। কাহার-জীবন যতদিন, এ রাত্রি ততদিন, হাঁসুলী বাঁকও ততদিন। তারপর হয়তো দহে পরিণত হবে কোপাইয়ের কোপে, নয়তো কিছু হবে, কি হবে কে জানে। রাত্রে আকাশে তারা খসে, বাদল নামে, কাহারেরা ফলভোগ করে, এর শেষ কি হয়? বনওয়ারী ভুল করেছিল, বছর শেষ হওয়ায় ভেবেছিল, বিপদ কেটে গেল। তাই কি হয়? বিপদ কাটে না। দু দণ্ড জ্যোৎস্না দেখে যে ভাবে, বাদল আর হবে না, আকাশে তারা আর খসবে না, কিছুই জানে না। বনওয়ারী জানে, জেনেও ভুল করেছিল। কাহারপাড়ার আরও অনেকে ভুল করেছিল। এই ঘটনাটিতে ভুল সকলের ভাঙল। তাতে একটি সুফল হ'ল কিন্তু।

পাঁচ জন ছাড়া করালীর দল সকলেই ছাড়ল। শেষাশেষি বহুজনই গোপনে গোপনে করালীর দিকে ঝুঁকে ছিল। বনওয়ারী সকলকে বার বার সাবধান ক'রেও মানাতে পারে নাই; এবার সব ধমকে গেল। ফিরল।

রতন প্রহ্লাদ সকলেই ঘাড় নাড়লে। পাগল গান গাইলে—পুরনো গান—

মন চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না—
কেলি-কদমতলায়, বৃন্দে গো।
মানিক পেলে তুমিই লিয়ো—আমি চাইব না—
কালোমানিক কালায়, [illegible]ন্দ গো।

ঠিক কথা। পাগল নইলে এ সকল কথা শোনায় কে, আর বাবাঠাকুরের শাসন ভিন্ন ভালর পথ ধরায় কিসে? পানার ছেলের এই সর্পাঘাত—বাবাঠাকুরের বাহন যে সাপটি, সেই বংশের সাপের দণ্ডাঘাতের দণ্ডে কাহারপাড়া থমকে গেল। করালীর হাসি, বেপরোয়া কথা, সাজসজ্জা—সবেরই রঙের উপর ভয়ের কালো রঙ মাখিয়ে দিলে। মাথার উপরের উড়োজাহাজের লাল নীল আলো বাবাঠাকুরের এক ফুঁয়ে নিবে যাবে একদিন—এই সত্য উপলব্ধি ক'রে সেই পুরানো কালের উদাস দৃষ্টি তাদের চোখে আবার ফিরে এল। ফলও হ'ল। ঘোষ-বাড়িতে বনওয়ারীর মুখ থাকল।

ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে সকলেই গেল শ্রদ্ধার সঙ্গে। কৌলিক কাহ বধর্ম, সে কি ছাড়া যায়। শুধু করালীরা ক'জন গেল না।

সে বললে—যা যাঃ। তোরা পতিত। কাহারপাড়াকে পতিত করলাম আমি। আরও ব'লে দিলে—ঘোষকর্তা যদি কারুরও কেরাচিনি বন্ধ করে, চিনি বন্ধ করে, তবে আমিও

দেখব। সদরে দরখাস্ত দোব আমি। ম্যানকে নিয়ে চ'লে যাব ম্যাজিস্টর সাহেবের কাছে।

'ম্যান' মানে রাঙামুখো যুদ্ধের সাহেব, যে করালীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কাহারপাড়ায় আসে।

বনওয়ারী শুনে হাসে। পতঙ্গের পাখা উঠলে সে মাতঙ্গ হয় না বাবা। মাতঙ্গ দূরের কথা, পক্ষীও হয় না। বাবাঠাকুরের গাছতলাটি বাঁধানো হচ্ছে—বনওয়ারীই বাঁধিয়ে দিচ্ছে, সেইখানে ব'সে তদারক করতে করতে করালীর মাতঙ্গপনা দুবেলা সে দেখে। হেলেদুলে যায়, মধ্যে মধ্যে 'ম্যান' সাহেবটাকে সঙ্গে নিয়ে চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। লোকটা গলায় ঝুলানো একটা বাক্স নিয়ে কিলিক কিলিক ক'রে ছবি তোলে—'ফটোক' অর্থাৎ ফোটো।

সেদিন বনওয়ারী মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল।

গোটা জ্যৈষ্ঠ কাঠফাটা রৌদ্র গেল। বৈশাখের সঙ্গে সঙ্গে পবনদেব ক্ষান্ত হয়েছেন। যোগাড়যন্ত্র ক'রে বাবাঠাকুরের গাছটিকে খাড়া ক'রে থানটি বাঁধাবার কাজ শেষ হয়েও হচ্ছে না। বিলাতী মাটির জন্যে চৌদ্দভুবন দেখলে বনওয়ারী। বিলাতী মাটি কন্টোল' হয়েছে। 'রবশ্যাষে' অর্থাৎ অবশেষে তিনগুণ দাম দিয়ে দু বস্তা মাটি সে পেয়েছে। আষাঢ় এসেছে। আকাশ যেন কেমন করছে। চারিদিকটা মধ্যে মধ্যে থমথমিয়ে উঠছে, আবার ক্ষান্ত হচ্ছে। এইবার নামবারই কথা।

"চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর
জষ্টিতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।"

হবার সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আর দুটি দিন, বাবাঠাকুর, আর দুটি দিন—দু দিন হ'লেই ঠাঁইটি বাঁধানোর কাজ শেষ হবে। বিলাতী মাটি দেওয়া হচ্ছে আজ। কাল হ'লেই শুকিয়ে যাবে। বিলাতী মাটির ওই আশ্চর্য গুণ।

করালী এসে দাঁড়াল।

—কি ?

—একটা কথা বলতে এলাম।

—তোমার সঙ্গে আমাব কোন কথা না।

—তোমার নাই, আমার আছে। গোটা পাড়ার আছে।

—গোটা পাড়ার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ?

—তোমার যা সম্বন্ধ, আমারও তাই।

—না।

—'না' বললে আমি শুনব কেনে ?

—ভাল। কি বলছ বল ?

—বলচি, পাড়ার লোকের ঘরে ধান নাই, মনিবে ধান বন্ধ করেছে। তুমি হয় ব্যবস্থা কর, নইলে বল—ওরা কারখানাতে চলুক।

বনওয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল। করালী হাসলে, বললে—ই সব ভয় আমাকে দেখিও না। যা বলবার বললাম। যা করবার ক'রো।

গটগট ক'রে চলে গেল করালী। বনওয়ারী আক্রোশভরে চেয়ে রইল তার দিকে।

কাল যুদ্ধ! যুদ্ধের গতিকে দু মাসের মধ্যে ধান পাঁচ টাকা থেকে দশ-বারোতে উঠেছে। সদ্‌গোপেরা হুড়হুড় ক'রে ধান বেচে টাকা করছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জল না হওয়ার ছুতো ধ'রে ধান বন্ধ করেছে। পাড়ার লোকের অভাব হয়েছে সত্যি। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

হঠাৎ চোখ ধেঁধে গেল। গুড়গুড় ক'রে ডেকে উঠল মেঘ। বনওয়ারী আশ্বস্ত হ'ল। বুকটা ফুলে উঠল। মেঘের এ ডাক বর্ষার মেঘের ডাক। বৈশাখে পবনদেবের মেঘ ডাকে—কড়-কড়-কড় শব্দে!

বর্ষার মেঘ ইন্দ্ররাজার মেঘ। এ মেঘ ডাকে গুড়-গুড়-গুড়-গুড় শব্দে। পশ্চিম থেকে দেয় মৃদু মৃদু বাতাস। ঝরঝর ঝরঝর ধারায় মেঘ যেন ভেঙে নেমে আসে মা-পৃথিবীর বুকে।

* * *

উনপঞ্চাশে আবার নামল আষাঢ় কাড়ান। জয় বাবাঠাকুর! কাহারেরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হাঁসুলী বাঁকের মাঠে। হাল গরু নিয়ে ছুটল। পাগল পালাল গ্রাম ছেড়ে। কি করবে সে এখন আর গ্রামে থেকে? কাহারেরা পড়েছে চাষ নিয়ে, সে গাঁয়ে একলা কাকে নিয়ে দিন কাটাবে? গোটা কাহারপাড়া মাঠে—গরু-মানুষ-মেয়ে-পুরুষ সব।

যে জমিতে হাল চলেছে, তার চারিপাশে ঝাঁকবন্দী বক নেমেছে, লম্বা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লম্বা গলা বাড়িয়ে লম্বা ঠোঁটে জমির ঘোলা জলে ঠোকর মেরে ব্যাঙ পোকা কেঁচো কাঁকড়া ধ'রে খাচ্ছে, লাঙলের ফালে জমির মাটির তলার পোকামাকড় ভেসে উঠছে। মাথার উপর উড়ছে ফিঙে কাকের দল। তারাও ছোঁ মারছে। কাকে আর ফিঙেতে চিরকেলে ঝগড়া; খাবার লোভে তাও ভুলেছে ওরা। বনওয়ারী বলে—উদর এমনি বটে! উদরের দায় বড় দায়!

কাহারদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জমির আলের গর্তের ভিতর কাঁকড়া ধ'রে বেড়াচ্ছে। কাহার-মেয়েরা ঘরের পাট-কাম সেরে, গাই-গরুর দুধ দুইয়ে চন্নপুরে যারা দুধের যোগান দিতে যায় তাদের দিয়ে, মরদদের জন্যে জলখাবার নিয়ে মাঠে আসবে। সঙ্গে আছে ঝুড়ি কাস্তে, পুরুষদের জলখাবার খাইয়ে আলে আলে ঘাস কাটবে। বোঝা বোঝা ঘাস। কতক খাওয়াবে নিজেদের গরুকে, কতক পাঠাবে চন্ননপুরে বিক্রির জন্যে।

চন্ননপুরে যাবার আলপথটি ঘাসে প্রায় ভরে গিয়েছে। ওই পথটার দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে খুশি হয় বনওয়ারী। ওপথে করালীর দল ছাড়া কাহারপাড়ার লোকেরা বড় কেউ হাঁটে না।

দুধ ঘাস ঘুঁটে যোগান দিতে যাওয়া ছাড়া ওপথে নিত্য কেউ হাঁটে না। তাও সে চন্ননপুরের কলের কারখানার এলাকায় নয়। ভদ্রলোকের বাবু-মহাশয়দের পাড়াতে যায় তারা। মেয়েরাই যায়। পুরুষদের মধ্যে যার যেদিন মাঠের কাজ কম থাকে, সে যায় বিকেলবেলা আবগারীর পচুই মদের দোকানে। বড় একটা জালায় আনে রশি মদ, ধেনো পচাইয়ের সবচেয়ে তেজস্কর অংশটা। সেটা তারা জল মিশিয়ে পরিমাণে বাড়িয়ে যার

যেমন পয়সার সামর্থ্য সে তেমনি ভাগ নিয়ে যায়। করালী চন্নপুর যাওয়া-আসার একটা নতুন আলপথ তৈরী করেছে। পথটা একেবারে মাঠের বুক চিরে সোজা চ'লে গিয়েছে।

করালীর পিছনে পিছনে মাথলা নটবর, তাদের পিছনে পিছনে আরও কজন ওই পথে যাওয়া-আসা করে। পিতিপুরুষের আমলের জাঙল-ঘেঁষা পথকে বাঁয়ে রেখে নতুন পথ ফেলেছে তারা। সে পথ কিন্তু আজও ঠিক হয়ে ওঠে নাই। মাথলা নটবর গোপাল ছাড়া আর সকলে সায়েস্তা হয়ে গিয়েছে, তারা আবার মাঠের কাজে লেগেছে। কাজ জুটিয়ে দিয়েছে বনওয়ারীই। কাজের ভাবনা কি ? নতুন মাঠ হচ্ছে সায়েবডাঙায়। বাবুদের অঢেল পয়সা, জমি কাটিয়ে ফেলেছে অনেক, তাতে ঢেলেছে মরা পুকুরের পাঁক মাটি। চাষ চালিয়েছে জোর। কিন্তু বাবুরা তো নিজে হাতে চাষ করে না, চাষ করে কাহারেরা, আর করে কাহারদের মতই হাতেনাতে চাষ করতে যাদের নীচু কুলে জন্ম তারাই। এ হ'ল ভগবানের বিধান, বাবাঠাকুরের হুকুম। খাট, খাও। বুক পেড়ে দু হাতে খাট, সোনার লক্ষ্মীতে ভ'রে উঠুক হাঁসুলীর মাঠ ; বাবু-মহাশয়ের, সদ্‌গোপ মহাশয়দের ভাগ্য আর তোমাদের হাতযশ। মনিবের খামারে ধান তুলে দাও, মনিবান শাঁখ বাজিয়ে জলধারা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরে তুলুক। তুমি আঁচলে খামার ঝেড়ে তুলে নিয়ে এস মা। লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। তাই তোমার ঢের, তার চেয়ে আর বেশি কি চাও ? 'যেমন বিয়ে তেমনি বাজনা'। কাহারকুলে জন্ম যখন হয়েছে, তখন এ জনমের এই বিধান। চুরি কর, ডাকাতি কর, এর চেয়ে বেশি কিছুতেই হবে না। চুরি-ডাকাতি ক'রেও তো দেখেছে কাহারেরা। এই তো পরম—সেদিন পর্যন্ত ডাকাতি করেছে। কি হয়েছে ? তাতেও এই। চুরি-ডাকাতি ক'রে মাল তুলে দাও সামালদার মহাশয়ের ঘরে, চুরির লক্ষ্মী তার ঘরে তুলে দিয়ে নিয়ে এস শুধু সেই লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। আর নিয়ে এস অধর্মের বোঝা। তার চেয়ে বহু ভাগ্যে চাষের পথ খুলে দিয়েছেন কর্তাঠাকুর, সেই পথে হাঁট, ধর্মকে মাথায় রাখ। সকাল সন্ধ্যে দেবতাকে প্রণাম ক'রে বল—এ জন্মে এই হ'ল, আসছে জন্মে যেন উঁচু কুলে জনম দিয়ো দয়াময় হরি হে !

গোপালীবালা এসে দাঁড়াল মাঠের আলের উপর। জলখাবার নিয়ে এসেছে। বনওয়ারী ঘোষেদের ভাগের জমির একটা কোণ 'চৌরস' অর্থাৎ সমান করছে, হাঁস-হাঁস শব্দে কোদাল চালাচ্ছে। সদ্‌গোপ মহাশয়দের গরুগুলি এই পথে নদীর ধারে চরতে যায়। জমিখানার একটি কোণকে খানিকটা যেন দুমড়ে দিয়ে গোপথটা চ'লে গিয়েছে। চারটি কোণ সমান একখানি 'দেখনসারি' অর্থাৎ দেখতে সুন্দর জমিতে পরিণত করবার জন্য বনওয়ারী প্রতি বৎসরই খানিকটা কেটে জমির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে থাকে অন্যের অগোচরে। জাঙলের সদ্‌গোপ মশায়দের গোচরে এলে তুমুল কাণ্ড করবে তারা। ঘোষ মশায়দের কানে উঠলেও তাঁরা বলবেন—কতবার তোমাকে বারণ করেছি বনওয়ারী। কি দরকার আমার খানিকটা জমি বাড়িয়ে নিয়ে ? মেজ ঘোষ বলবে—আশ্চর্য ! জমিটা যদি তোমার হ'ত তো বুঝতাম। এতে তোমার লাভ কি বল তো ? বনওয়ারী এ সবের জবাব দিতে পারে না, মাথা চুলকোয়, কিন্তু চাষের সময় এলে খানিকটা বাড়িয়ে না নিয়েও তার মন পরিতুষ্ট হয় না।

গোপালীবালা বসল। বনওয়ারীর এখন কোন দিকে তাকাবার অবসর নাই। এই সময়টায়

এদিকে কেউ নাই; কাহারেরাও না। এই উপযুক্ত সময়। কাহারেরা তার অনুগত বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বাস নাই। নিজেরা কিছু বলবে না, কিন্তু ফুস ফুস ক'রে সদ্‌গোপ মনিবের কানে তুলে দেবে। দশ-পনরো হাত লম্বা আলটার কোথাও আধ হাত, কোথাও তিন পোয়া জমি কেটে কুপিয়ে ছেঁটে জমিটার চষাখোঁড়া মাটির সঙ্গে মিলিয়ে বনওয়ারী উঠে মাথা ঝাড়লে। ঝাঁকড়া চুল থেকে জল ঝ'রে পড়ল—ঝ'রে পড়ল কালো বনওয়ারীর চুল থেকে মুক্তোবরণ টোপা টোপা জলের ফোঁটা। কোমরটা টাটিয়ে উঠেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। বেঁকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইলে বনওয়ারী। জলখাবারের বেলা হয়েছে। আকাশে ঘন ঘোর মেঘ আজ। বেলা বুঝবার উপায় নাই। কাল রাত্রি থেকে জোর বর্ষা নেমেছে। বাঁশবাঁদির বাঁশবন বট পাকুড় শিরীষ গাছের মাথায় ছাইরঙের মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক যাচ্ছে, এক আসছে—কেউ ফুলছে, কেউ ফাঁপছে—ক্রমশ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, কেউ বা ছুটে চ'লে যাচ্ছে শন্‌শন্ ক'রে কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে, কে জানে। কাহারপাড়ার চালে চালে বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে বাঁশবনের ঘনপল্লবে কাহারবাড়ির উনোনের ধোঁয়া হাল্‌কা কুণ্ডলী পাকিয়ে জমে রয়েছে, যেন পেঁজা শিমূল-তুলোর রাশি জড়িয়ে দিয়েছে কেউ। মেঘে মেঘে এমন ঘোরালো হয়ে আছে চারিদিক যে, বেলা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কেবল পেটে ক্ষিধে লেগেছে আর গরুবাছুরের ডাক শুনে মনে হচ্ছে যে, হাঁ, জলখাবারের বেলা হয়েছে। কিন্তু গোপালীবালাকে দেখে খুব খুশি হ'ল না বনওয়ারী। সুবাসী এল না কেন? সে এলে যে তাকে দু দণ্ড দেখতে পেত, দুটো হাসি-খুশর কথা হ'ত; পেট ভরার সঙ্গে মন-মেজাজ ভ'রে উঠত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী। সে কথা বলাই বা যায় কি ক'রে গোপালীবালাকে? তবে গোপালীবালা লোকটি বড় ভাল। সেই যে কুড়িটি টাকা নিয়ে বলেছিল, কোন আপত্তি অশান্তি করবে না—সে কথা সে রেখেছে, কোন আপত্তি অশান্তি করে না। ঘরদুয়ার গরু বাছুর হাঁস মুরগী নিয়ে আছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, গোবর কুড়িয়ে আনছে, ধান ভেনে চাল করছে। সুবাসী শুধু ঘর নিকোয়, বাসন মাজে, ভাত রাঁধে, আর নিজের তরিবৎ সাজসজ্জে নিয়েই আছে। চুল বাঁধছে, খুলছে, আবার বাঁধছে। রাত্রিবেলা দেখতে পায় না বনওয়ারী, ভোরবেলা যখন ওঠে, তখন নজরে পড়ে—সুবাসীর হাতে আলতার রঙের দাগ লেগে আছে, বনওয়ারীর নিজের অঙ্গেও তার দাগ লেগে থাকে প্রত্যহ। লজ্জার কথা। পাড়ার ছেলেছোকরা মেয়েরা মুখ টিপে হাসে, রতন প্রহ্লাদ গুপী দেখতে পেলে আর বাকি রাখে না। ঘোষবাড়ির বউঠাকুরুন্ সেদিন দেখে যে ঠাট্টাটা তাকে করেছেন, তাতে বড়ই লজ্জা পেয়েছে বনওয়ারী; তবু তো পাগল নাই। সে যে সেই কাড়ান লাগতেই গেরাম ছেড়ে পালিয়েছে, আর ফেরে নাই। সে থাকলে গান বাঁধত।

বনওয়ারী মাঠের ঘোলা জলেই হাত মুখ ধুয়ে আলের উপর বসল। গোপালী তার সামনে খুলে দিলে মস্ত একটা খোরায় রাশীকৃত মুড়ি, খানিকটা গুড়, দুটো লঙ্কা, দুটো পেঁয়াজ। একটা বড় ঘটি থেকে ঢেলে দিলে জল। ভিজিয়ে মোটা মোটা গ্রাসে খেতে লাগল বনওয়ারী।

—হ্-হ্-হ্। অই-অই! বারণ করলে শোনে না। চলল দেখ, পরের ভুঁয়ের পানে, চলল

দেখ! মেরে তোমার পস্তা উড়িয়ে দোব, পম্বা নড়িয়ে দোব।

বনওয়ারী শাসন করছিল গরু দুটোকে। সে দুটো জোয়ানেজোতা অবস্থাতেই অন্য বীজধানের জমির দিকে যাবার উদ্যোগ করছিল।

গোপালীবালা উঠল, গরু দুটোর জোয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বনওয়ারী কিছুটা মুড়ি ফেলে রেখেই উঠল। এই নিয়ম। ওই কটি খাবে পরিবার। গোপালীবালা বনওয়ারীর দিকে পিছন ফিরে ব'সে খেতে লাগল। বনওয়ারী বললে—মুনিববাড়ি হয়ে যেয়ো। কদিন যাই নাই আমি। পাট কাম থাকে তো ক'রে দিয়ে যাবা।

গোপালী ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই হবে।

গোপালী কেমন হয়ে গিয়েছে, সে কথা কয় না তেমন ভাল ক'রে। বনওয়ারী আবার বললে—একটা কথা বলছিলাম। যে টাকাটা দিয়েছি তাতে ধান কিনে আখ কেনে। যুদ্ধর বাজারে ধানের দর হু-হু ক'রে বাড়বে বলছে সবাই। তোমার ধান তুমিই 'আখবা', আমি তাতে হাত দোব না। লাভ যা হবে তুমিই নেবে।

গোপালী আবার ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই হবে।

বনওয়ারী রসিকতা ক'রে আবার বললে—তবে যদি অভাব অনটন পড়ে, লোব তোমার কাছে চেয়ে। তুমিই তো ঘরের গিন্নী, তুমিই তো নক্ষী আমার, তোমার দৌলতেই তো সব। আমি তো ভিখিরী, খাটি, খাই।

গোপালী এবার কথা বললে—তা লিয়ো।

বনওয়ারী বললে—ছুটকীকে ঘরে এনেছি আটপৌরের মেয়ে ব'লে, বুয়েচ?

গোপালী ঘাড় ঘুরিয়ে এবার মুখ মুচকে হেসে বললে—আর কালোশশীর বুনঝি, কালোশশীর মতন দেখতে শুনতে ব'লে!

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল। গোপালী এ কথা জানল কি ক'রে?

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে সে বললে—ইসব কি যা-তা বলছ তুমি?

—যা-তা লয়, ঠিক বলছি আমি। আমি শুনেছি।

—শুনেছ? কে—কে বললে?

গোপালী বনওয়ারীর দিকে চেয়ে ভয় পেলে খানিকটা, সে বললে—ই-উ-সি (এ-ও-সে) পাঁচজনায় বলে। আর কালোশশী আমাকে দেখে হাসত যে মুখ টিপে টিপে। আর মেয়েলোক ঠিক বুঝতে পারে, বুয়েচ!

কালোশশী হাসত, নিশ্চয় হাসত, এবং গোপালী যত বোকা হোক সে হাসির মানে নিশ্চয় বুঝত। সে সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে নাই। পাঁচজনটা কে?

হঠাৎ কানে এসে পৌঁছুল একটা কান্নার শব্দ। মড়াকান্না। কে কাঁদছে? নয়ানের মা? চাষের সময় কাহারদের জোয়ান ছেলেরা চাষে খাটে, এ সময় জোয়ান ছেলের কথা মনে পড়ার কথা বটে। নিত্যই মনে পড়বে। কিন্তু—কিন্তু কান্নাটা তো তেমন পুরোনো কান্না নয়। তেমন সুর ক'রে গানের মত বিনিয়ে বিনিয়ে তো কাঁদছে না!—ওরে আমার সোনা মানিক বাবাধন রে, কোথা গেলি রে? তোর জলভরা ভুঁই প'ড়ে বাবা, তু কোথা গেলি রে?—সে সব কথার তো কিছুই শোনা যাচ্ছে না? এ যে আছাড়িপিছাড়ি কান্না, যেন

এখনই কারও কিছু হয়েছে। ওরে বাবা রে ! ওরে মা রে ! ও বাবা রে ! ও ধন রে ! বলে যেন বুক চাপড়ে কাঁদছে।

গোপালীবালা কান পেতে শুনে বললে—হেই মা !

—কার কি হ'ল বল দি-নি ?

—মাথলাদের বাড়িতে গো।

—মাথলাদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, মাথলার বউয়ের গলা।

—কি হ'ল ?

—তা তো জানি না।

—তুমি যাও দি-নি। একটা খবর দিয়ো।

মাথলার বাড়িতে কি হ'ল ? মাথলার বাড়িতে তিনটি মানুষ—বউ, বেটা, নিজে। মাথলা চন্ননপুরে। বউ কাঁদছে। তবে কি ছেলেটা— ? কি সর্বনাশ ! রোগ নাই, বালাই নাই, কি হ'ল হঠাৎ ? কিছু হওয়ার মানে বাবাঠাকুরের রোষ। তবে কি করালীর ওপর বাবার রোষ পড়ল এইবার ? মাথলা করালীর সঙ্গে চন্ননপুরের কারখানায় গিয়েছে—কলির পাপপুরীতে। তবে কি-

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে যেন কে ঢেঁকি কুটতে আরম্ভ ক'রে দিল। হে বাবা ! হে বাবাঠাকুর।

ছুটতে ছুটতে এল একটি ছেলে। পেল্লাদের ছোটটা। মাথলার ছেলেকে কিসে কামড়েছে। মাঠে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল আলের গর্তের মধ্যে হাত পুরে, কিসে কামড়ে দিয়েছে। ছেলেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

বনওয়ারী ছুটল।

পাড়ার মাতব্বর গুণী লোক সে। সাপের কামড়ে ওষুধও দু-চারটে জানে সে। জানতে হয়। আর জানত পাগল। সে বড় ওস্তাদ।

বর্ষার সময় কাহারপাড়ায়—হাঁসুলী বাঁকে—দু-চারটে এমন হয়। নিয়তি। 'সাপের লেখা বাঘের দেখা'। কপালের লিখনে না থাকলে সর্পাঘাত হয় না, আর বাঘ লিখন মানে না—দেখা হ'লেই খায়। তাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বাঘ সম্বন্ধে যত সাবধান হয়, সাপ সম্বন্ধে সাবধান তত নয়। সাবধান হয় বইকি, কিন্তু ওটাকে তারা লিখন ব'লেই মানে। চিরকালই তো বর্ষার সময় কাঁকড়া ধরে কাহারেরা, মধ্যে মাঝে এমন হয় একটা আধটা। কিন্তু সবাই তো মরে না। তা হ'লে হয় 'নিয়ৎ' অর্থাৎ নিয়তি, নয় দেবরোষ কি ব্রহ্মরোষ। রোজই তো সবাই আঁচল-ভর্তি কাঁকড়া নিয়ে ঘরে ফিরছে। লঙ্কা নুন দিয়ে চমৎকার হয় কাঁকড়ার ঝাল। শুধু ওই দিয়েই ভাত চ'লে যায়। হঠাৎ বনওয়ারী দাঁড়াল। একটা ওষুধ নজরে পড়েছে তার। ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে ব'লে সে শিকড় তুলতে বসল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ডাকল ছেলেটাকে। আর একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে।—যা তো রে ঘোষ মাশায়দের বাড়ি—আমার মনিববাড়ি। বড় ঘোষ মাশায়কে বলবি, মুরুব্বি পাঠালে সেই মিহিজামের ওষুধ—সপ্যাঘাতের ওষুধ, 'নিউনাইন-বোর্ডের' ওষুধ যদি থাকে

তো দ্যান।

ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর বড় ঘোষ মহাশয়ের হাতে বোর্ডের লোকেরা মিহিজামের সাপের ওষুধ দিয়েছে। এই কঠিন মাটির দেশে সাপের উপদ্রব বেশি, তার মধ্যেও প্রকোপ বেশি হাঁসুলী বাঁকে। বাঁশবাঁদির ছায়ার মধ্যে শীতলতার আরামে এখানে আদিম কালের আবহাওয়া ভোরের ঘুমের মত এখনও বেঁচে রয়েছে। তার মধ্যে থাকতে ভালবাসে সাপ, বিছে, পোকামাকড়। মাছি মশাও এখানে ওই বাঁশপাতা-পচা ভাপানির মধ্যে ভন ভন করে। মানুষের দেহে সঞ্চারিত ক'রে দেয় নানা বিষ। কাহারপাড়ায় মানুষের দেহে যখন ছিল ভীমের মত বল, তখন সে সব বিষ তারা হজম করত। এখন শ্রাবণ মাস না আসতেই কাঁপন-লাগানো 'মালোয়ারী'তে পড়ে। তখন 'কুনিয়ানের' বড়িও পাওয়া যায় 'নিউনাইন-বোর্ডের' মেম্বর ঘোষ মশায়ের কাছ থেকে। বনওয়ারী সুপারিশ ক'রে দেয়। কিন্তু এ বছর নাকি দুটোর একটাও আর দেবে না 'নিউনাইন-বোর্ড'। যুদ্ধ লেগেছে। আক্রাগণ্ডার জন্য বোর্ডের খরচ চলাই দায় হয়েছে—সাপের ওষুধ, কুনিয়ানের বড়ি দেবে কোথা থেকে। তবু বনওয়ারী ছেলেটাকে পাঠালে—যদি পুরানো শিশিতে 'খানিক আদেক' পড়ে থাকে।

বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে কাছায় হাত দিলে। কাছাটা ঠিকই আছে। খুলে গেলে শিকড়ের ওষুধে কাজ হ'ত না। এ সব হ'ল ওস্তাদি তুক। আহা-হা। একটা তুক করতে ভুল হয়ে গেল। যে ছোঁড়াটা খবর নিয়ে এসেছিল, ওকে মেরে তাড়িয়ে দিতে হ'ত। যে খবর দিতে আসে, সে যদি ছুটে পালায়, তবে রোগীর বিষও ঘরে নামতে আরম্ভ করে। এঃ, বড়ই ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কি সাপ? বাবাঠাকুরের রোষ হ'লে নিশ্চয় সেই বাহনের দাঁতের দংশন। হবেই যে। পানার ছেলেটাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এবার। না, মঙ্গল নাই। মঙ্গল নাই। মঙ্গল নাই।

চার

মঙ্গল নাই, মঙ্গল নাই।—ঘাড় নেড়ে বললে বনওয়ারী। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কাহারপাড়া ঘাড় নাড়লে, ঠিক বনওয়ারীর মত ক'রে। মঙ্গল নাই আর।

মাথলার ছেলেটা মরল। মুখে গ্যাঁজলা ভেঙে কালো ছেলেটাও কেমন কালচে হয়ে গিয়েছে; হাতের তালু কালচে, ঠোঁট কালচে, নখগুলো পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। বাবাঠাকুরের বাহনের জাতের দংশন নয়, এ সম্ভবত খরিস অর্থাৎ গোখুর বা কালকেউটের দংশন। কালকেউটে হওয়াই সম্ভব।

রতনের ছোট ছেলে টেবা খুব 'টাটোয়ার' অর্থাৎ চতুর বুদ্ধিমান, দিগম্বর ছেলেটা নিজের ঘুনসী টানতে টানতে বললে—হেঁ গো। কালোপারা নিস্কেলে এই এতু বড়ি। সে দুই হাত মেলে দেখালে মধ্যম আকারের, এবং নিস্কেলে অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণ তার রঙ।

রতন বুক চাপড়ে কাঁদল। নাতিটির জন্য তার গভীর স্নেহ ছিল। ছেলে অর্থাৎ মাথলা তার সঙ্গে পৃথক হ'লেও ছেলেটা তার কাছেই প্রায় থাকত।

টেবা বললে—যেই গত্তের ভেতরে হাত ভরাল্ছে, অমনি কামুড়ে ধরেছে। ভাইপো বললে—কাকা রে, মোটা কাঁকুড়ি। খুব কামড়াল্ছে, তা কামড়াক ; আমিও ছাড়ব না শালোকে। ব'লে বেশ জুৎ ক'রে ধরে টেনে বার ক'রে নিয়ে এল তো সাপ ! হাতে ঝরঝর ক'রে অক্ত পড়ছে। ছেড়ে দিলে ছাড়ে না শালা। তা'পরেতে জলে প'ড়ে শুঁষিয়ে চ'লে যেল সোঁ ক'রে।

না হোক বাবাঠাকুরের বাহনের জাত। তবু সর্পাঘাত। ওই মাথলার ছেলেকে সর্পাঘাত—সাবধান ক'রে দিয়ে গেল। প্রথমে পানার ছেলে, তারপর মাথলার ছেলে। যার চোখ আছে সে দেখুক, যার জ্ঞান আছে সে বুঝুক। যার কান আছে সে শুনুক, বাবাঠাকুর বলছেন—সাবধান ! সাবধান।

নইলে সাপের ভয় হাঁসুলী বাঁকে বড় ভয় নয়। এখানে সাপ প্রচুর। মনসার কথায় আছে 'লাগে-লরে' অর্থাৎ নাগে-নরে একত্রে বাস করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকে সম্ভবপর।

আদাড়ে সাপ, পাঁদাড়ে সাপ, ঘরে সাপ, মাঠে সাপ, গাছের ডালে সাপ—সাপ নাই কোথা, সাপ নাই কবে ? সুচাঁদ বলে—হাঁসুলী বাঁকের পিতিপুরুষ ব'লে গিয়েছে, উনি সব্বত্র আছেন—মা-বসুমতীকে ধরে অয়েছেন মাথায় ক'রে।

সুচাঁদ পিসী বলে—ছেরকাল, ছেরকাল আছেন ওরা। মা-মনসার পল্লব ছড়িয়ে আছেন পিথিমীময়। বনে বাদাড়ে, ঘরে পাঁদাড়ে, ঘাটে মাঠে ঝোপে ঝাড়ে, জলে স্থলে সব্বত্ত। লাগ আর লর—ইনি ওকে এড়িয়ে চলেন, উনি ওকে এড়িয়ে চলেন। মাঝে মাঝে ছামু-ছামু প'ড়ে এ বলে—গেলাম, ও বলে—গেলাম। সেই সময় 'ধয্য' ধ'রো বাবা। হাতে তালি দিয়ে ব'লো—চ'লে যা, চ'লে যা। আর পেনাম ক'রো। ওঁরা সামান্যিতে অনিষ্ট করেন না ; মাথায় পা, লেজে পা দিলে তবে ওঁরা চন্দ সূয্যিকে সাক্ষী এখে ছোবল মারবেন। আর মারেন কালের হুকুমে—বাবার হুকুমে, নইলে ওঁরা মন্দ লন। মানুষের উপকার করেন ইঁদুর ধ'রে। বাস্তু হয়ে কল্যাণ করেন ভিটের।

খুব মিথ্যে কথা বলে না পিসী। নইলে মানুষ যত সাপ মারে, সাপে কি তত মানুষ মারে ? মারে না। এই সেদিন নয়ানের মা ঘাস কাটতে গিয়ে ঘাসের সঙ্গে একটা কালো সাপের বাচ্ছার মুন্ডু কেটে নিয়েছে। একেই বলে—'নেকন'। ঘাসের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, নয়ানের মা ঘাসের সঙ্গে মুঠো ক'রে ঠিক ধরেছে মাথাটি। চারিদিকে ঘাস, মধ্যখানে ছিল মাথাটি—তাই কামড়াতে পারে নাই। তারপর ঘ্যাস ক'রে কাস্তে দিয়ে কেটে ঝুড়িতে ফেলেছে। তখন বেরিয়ে পড়ে কাটা মুখটা ; তখনও সেটা কামড়াবার জন্য হাঁ করছিল ; ওদিকে মুন্ডু-কাটা ধড়টা এঁকেবেঁকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল। হতভাগী ব'লেই সে বেঁচেছে, নইলে মরলে যে খালাস পেত ; কিন্তু তা হবে কেন ?

বনওয়ারীর নিজের বাড়িতে তো একটা বুড়ো খরিস প্রায় কুটুম্বিতে পাতিয়েছেন। প্রায়ই দেখা দেন। আসেন যান, ইঁদুর ধরেন, ব্যাঙ খান, পেট ফুলিয়ে মাঝ-উঠানে পড়ে থাকেন। বনওয়ারী তাঁকে মারে না, মারবেও না। আবার নিজেও একটু সতর্ক হয়ে থাকে, গোপালী এবং সুবাসীকেও সতর্ক ক'রে দিয়েছে, হাতে তালি না দিয়ে যেন ঘরে না ঢোকে, বাইরে

না বের হয়। হাতে তালি দাও তুমি, উনি স'রে যাবেন, যদি 'এগে' থাকেন তবে গুঙিয়ে সাড়া দেবেন, বলবেন—সাবোধান, আমি এগেছি। কাহারদের এ শিক্ষা আছে। ধৈর্য তাদের অপরিসীম। বনওয়ারীর ছেলেবেলায়, পরম আটপৌরের বাবার ধৈর্যের গল্প এ চাকলায় সবাই জানে। বর্ষার সময়, কোপাইয়ে হয়েছিল বড় বান, চারিদিক 'জলাম্পয়' অর্থাৎ জলময় ; পরমের বাপ শুয়ে ছিল ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল কিসের ঠাণ্ডা পরশে। কিন্তু নড়ল না সে। প্রথমটা বুঝে নিলে—কার পরশের ঠাণ্ডা এটা। যাঁরা ম'রে গিয়ে 'বা-বাওড়' অর্থাৎ ভূত হয়েছেন, তাঁদের কেউ ঠাণ্ডা হাত দিয়ে তাকে ডাকছে, না 'লতা-টতা' কিছু? রাত্রে সাপের নাম করতে নাই, বলতে হয় লতা। ততক্ষণে ঠাণ্ডা হিম একগাছা মোটা রশি তার কোমরের উপরে পেটের উপর দিয়ে কাঁধের কাছ বরাবর চলেছে। কাঠ হয়ে প'ড়ে রইল পরমের বাপ। আস্তে আস্তে তিনি চ'লে গেলেন পরমের বাপকে পার হয়ে। একবার পরমের বাপের একটা নিশ্বাস জোরে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ; তারপর যেই বুঝলেন, পরমের বাপ তাঁর অনিষ্ট করতে চাইছে না—তখন আবার চলে গেলেন সরসর শব্দে পার হয়ে। বনওয়ারী নিজেই একবার বাড়ির দোরে 'মাঝলা' অর্থাৎ মাঝারি আকারের খরিসের ঠিক মাথার উপর পা দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল পায়ে। সে কী পাকের 'কষণ' অর্থাৎ পেষণ। তবু বনওয়ারী মাথার উপর পায়ের চাপ আলগা করে নাই। আলগা করলেই কামড়াত। শেষে কাস্তে দিয়ে সাপটাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সাপকে ভয় নাই, ভয় বাবাঠাকুরের রোষকে আর কালের আদেশকে। ও দুটো মাথায় নিয়ে যখন সাপ বার হয়, তখন তাকে কেউ আটকাতে পারে না।

বাবার রোষ এবার ওঁরা যেন পেয়েছেন মনে হচ্ছে। ঢালাও হুকুম দিলেন নাকি বাবা? একটা অমঙ্গলের আঁচ যেন সকলের মনেই লেগেছে।

•

কাহারপাড়ায় একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সাপের ভয় কাহারেরা করে না। কিন্তু এ যে বাবার কোপ ব'লে মনে হচ্ছে। বাবার কোপ কোন সময়ের বাঁধ মানে না। বলছ, বছর ঘুরেছে? কিন্তু তোমার বছর আর বাবার বছর তো এক নয়।

প্রহ্লাদ রতন গুপী বললে—বনওয়ারী, রুপায় তোমাকেই করতে হবে। তোমার মুনিব নিউনাইন বোডের হাকিম ; তুমি ধ'রে পেড়ে এক লম্প ক'রে কেরাচিনির ব্যবস্থা কর। আতবিরেতে—মাথার গোড়ায় নিবানো অইল, জেসলাই অইল। সন্দ হ'লেই ফস ক'রে জ্বেলে ফেললাম।

যুদ্ধের জন্য কেরোসিনের তেল পাওয়া যাচ্ছে না। বাবুদের পর্যন্ত টিকিট হয়েছে। যে যেমন ট্যাক্স দেয় 'নিউনিয়ন-বোডে'—সে তেমন 'কেরাচিনি' পায়। কাহারপাড়ায় 'নিউনাইন-বোডে'র কাজও নাই কর্মও নাই, রাস্তাঘাটও নাই, কাহারেরাও নগদ ট্যাক্স দেয় না, একদিন গতরে খেটে বেগার ট্যাক্স দেয় অন্য গেরামের পথ ঘাট মেরামত ক'রে। তাদের জন্য টিকিটও নাই। লুকিয়েচুরিয়ে তেল পাওয়া যায়, কিন্তু সে দাম পাঁচগুণ। চোরাই বিক্রি। করালী বলে—ওর নাম হ'ল 'বেলাক মারকাটি'। কে জানে কি নাম। ও

নাম তাদের জেনেও কাজ নাই, ও দাম দিয়ে তেল কিনবার তাদের ক্ষমতাও নাই। করালী দু-একজনকে তেল দিচ্ছে। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে, 'ধরমকে' বেচেছে, কুলকর্মকে ছেড়েছে, সে তেল পাচ্ছে। তেল পায়, চিনি পায়, আটা পায়, ঘি পায়, কাপড় পায়—পায় জলের দামে—বাজারে চালের দর ষোল টাকা উঠেছে—করালী পায় পাঁচ টাকায়। পায়, পেতে দাও। আর কেউ পাবার জন্য হাত পেতো না, মনে মনে আশও ক'রো না। সাবোধান। সাবোধান। তবে বনওয়ারীর কর্তব্য বনওয়ারী করবে। যাবে সে বড় ঘোষের কাছে। কাহারপাড়াকে বাঁচাতে হবে, বাবাঠাকুরের বাহনের রোষ থেকে বাঁচাতে হবে—মনে মনে তিন সন্ধ্যে তাঁকে ডাক, মাথার গোড়ায় 'লম্পও' রাখ। তার উপর পড়েছে বর্ষা—আরম্ভ হবে 'মালোয়ারী', 'কুনিয়ান' চাই, সাবু চাই, চিনি চাই। সাবু-চিনিও বাজারে পাওয়া যায় না। পেলেও ওই আগুনের দর ; যুদ্ধুর বাজার যে। এ বাজারে 'নিউনাইন-বোর্ডের' হাকিমের হুকুমে কাজ হবে।

বিকেলবেলায় মাঠের কাজ ফেলেই সে গেল ঘোষ মশায়ের কাছে। সন্ধ্যের পর, কি রাত্রে মদ খেয়ে এসব কথা ঠিক গুছিয়ে বলা হয় না।

বড়কর্তা শুনে একটু হাসলেন—বললেন—কেরোসিন। পেলে আমি নিই।

বনওয়ারী কাতরকণ্ঠে বললে—আজ্ঞে, তা হ'লে আমরা কি করব? সপ্যভয়, আর কিছু নয়। সাধারণ সপ্যভয় হ'লেও হ'ত আজ্ঞে, এ হ'ল দেবকোপ।

—দেবকোপ? বড়কর্তা একটু হেসেই প্রশ্ন করলেন। কাহারকুলের কৌতুকজনক কুসংস্কারের কথা শুনে আনন্দ আছে।

—আজ্ঞে বড়বাবু, বাবাঠাকুর দণ্ড দেবেন ব'লে মনে হচ্ছে। করালী মারলে বাবার বাহনকে, পানার কারণে খুঁতো পাঁঠা বলি হ'ল ওঁর কাছে, করালী বাবার শিমুলগাছে চ'ড়ে নিদ্যেভঙ্গ করল বাবার—

খুব সহৃদয় এবং গভীর উপলব্ধির ভান ক'রে বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়লেন—হুঁ, তা বটে, কথাটা তুমি বাজে বল নি বনওয়ারীচরণ—

বনওয়ারীর চোখে জল এল তাঁর সহানুভূতিতে। চোখ মুছে বললে—বড়বাবু, চরম খ্যানত হয়ে গেল বাবার বিল্ববিক্ষটি প'ড়ে গিয়ে। অ্যানেক কষ্টে তুললাম, গোড়া বাঁধিয়ে খাড়াও এরেছি, কিন্তু বাবা তো ইশারা দিলেন যে, বিমুখ হয়েছি আমি। চললাম আমি তোমাদের থান থেকে।

বনওয়ারীর সঙ্গে কৌতুক বড়কর্তার বেশিক্ষণ ভাল লাগার কথা নয়, তার উপর বনওয়ারী চোখ মুছতে শুরু করেছে, এর পর যদি হাউহাউ ক'রে কাঁদে তখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠবে। সময়ে সাবধান হয়ে তিনি গম্ভীর হলেন, বললেন—হ্যাঁ। তা একটু সাবধানে থাকবে তোমরা।

আবার এক ঝলক রসিকতা ঠেলে যেন বেরিয়ে এল, বললেন—এবার আর মাঠ থেকে ধানপান চুরি ক'রো-ট'রো না যেন। বুঝেছ?

—আজ্ঞে না। এবার বাবাঠাকুরের থানে হলপ করাব সব্বাইকে।

—ভাল। খুব ভাল। এখন বাড়ি যাও।

—আজ্ঞে, কেরাচিনি ?

—কেরোচিনি তো নাই বনওয়ারী। গভীর দরদের সঙ্গে বড়কর্তা বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়তে তেল পাচ্ছে না। এবার বুঝলে, চন্নপুরের বড়বাবু মাথা ঠুকে দু টিন কেরোসিন পেলেন না, শেষে বহুকষ্টে এক টিন। তা বুঝেছ, কোথায় পাব আমি বল ?

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। তা হ'লে আর কি হবে? যুদ্ধের ঢেউ এমন ভাবে কখনও বোধও হয় হাঁসুলী বাঁকে আছাড় খেয়ে পড়ে নাই।

বড়কর্তা বললেন—আর আলো জ্বেলেই বা কি করবে বনওয়ারী ? বলছ বাবাঠাকুরের কোপ। তাই, হ্যাঁ, যা শুনলাম তাতে তা-ই বটে। তা হ'লে আলোই বল আর অন্ধকারই বল, সে কোপ কি এড়ানো যায় ? একটু আধ্যাত্মিক হাসি হাসলেন বড়কর্তা, কপালে হাত দিয়ে বললেন—সব এই, বনওয়ারী, সব এই। লোহার বাসর-ঘরে লখাইকে কালনাগিনী দংশন করেছিল। দেবকোপ, ও কিছুতেই আটকায় না।

ঠিক কথা বলেছেন বড়কর্তা। বনওয়ারী ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই উঠে এল। পথে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে। তবু আলো—একটু আলো না হ'লে কি ভাবে চলবে ? দেবকোপ বটে। কিন্তু মরণের আগে একটুখানি জল মুখে দেওয়া, একবার শেষ নজরের দেখা—আলো না হ'লে সেটুকু কি ক'রে হবে ?

সে বাবাঠাকুরের থানে এসে দাঁড়াল।—হে বাবাঠাকুর! বহুক্ষণ সে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার সে তন্ময়তা হঠাৎ এক সময়ে একটা লালচে আভায় ঢেকে গেল। চোখে লাগল লাল ছটা। মাঠ ঘাট আকাশ সব লাল হয়ে উঠেছে—হুই দূরে দেখা যাচ্ছে কোপাইয়ের বাঁকের জলে লালচে ছটা ঢেউয়ের মাথার স্রোতের টানে যেন নাচছে।

প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, একে বলে—'ঝিকিমিকি বেলা'। মেঘ কেটে গিয়ে লাল আলোয় ভ'রে গেল আকাশ। 'চাকি' অর্থাৎ অস্তোন্মুখ সূর্য এখনও ডোবে নাই ; পাটে ব'সে লালবরণ রূপ নিয়ে হিলহিল ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরছে। আকাশের মেঘে লাল রঙ ধরেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী একটু চিন্তিত হ'ল। কাল আবার জল নামবে। সকালবেলায় পশ্চিম দিকে 'কাঁড়' অর্থাৎ রামধনু উঠেছিল, সন্ধ্যাবেলা রক্তসন্ধ্যা। জল নির্ঘাত নামবে। এর উপরে জল হ'লে কিন্তু চাষের ক্ষতি হবে।

পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ তুলে সে ভাবছিল। পিছন থেকে কে তাকে ডাকলে।—বান্যোমামা।

কে ডাকে ? 'মামা' ব'লে কে ডাকে ? গাঁয়ের কন্যের কোন ছেলে তো নাই গেরামে। সে ভ্রূভঙ্গি ক'রে মুখ ফেরাল। হ্যাঁ, সেই করালীই বটে। গাঁয়ের কন্যে বসনের কন্যে পাখীর সম্বন্ধ ধ'রে হারামজাদা বনওয়ারীকে মামা বলে আজকাল। ডাক শোনবামাত্র এই সন্দেহই তার হয়েছিল। সে কোন উত্তর দিলে না, গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

করালী হেঁকে বললে—পাড়ায় গিয়েছিলাম আমি, ব'লে এলাম সকলকে। আজকালের মধ্যে খুব জোর বিষ্টি হবে। পবল বিষ্টি। চন্নপুরে তারে খবর এসেছে।

বনওয়ারীর হাসি পেল। তারে খবর এসেছে বৃষ্টি নামবে! চন্ননপুর থেকে করালীচরণ বিষ্টি বলছেন আজকাল! বল, বাবাধন বল। তারে খবর এসেছে! বনওয়ারীর তারের খবরে প্রয়োজন নাই বাবা কাহারকুলের পেল্লাদ। বনওয়ারীর কাছে বাবাঠাকুর আকাশময় খবর ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঝড়, বাদল—এর খবর কাহারেরা পিতিপুরুষ থেকে পেয়ে আসছে আকাশের কাছ থেকে, পিঁপড়ের কাছ থেকে, কাক-পক্ষীর কাছ থেকে, রামধনুর কাছ থেকে, বাতাসের গতিক থেকে; তুমি কাহারকুলের জাত হারিয়ে মেলেচ্ছ হয়েছ; তুমি চন্ননপুরে টেলিগেরাপের খুঁটিতে কান লাগিয়ে শোন গিয়ে এসব খবর।

করালী প্রশ্ন করলে—শুনছ?

বনওয়ারী তাচ্ছিল্যভরে বললে—সে আমি জানি হে, সে আমি জানি।

করালী ঠোঁটটা ওল্টালে, ভুরু কোঁচকালে, তারপর ফিরল। কিন্তু আবার ফিরে বললে—মাথলার ছেলেটা সাপে খেয়ে মরল। যদি কেউ কোলে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যেতো!

বনওয়ারী কি বলবে এ বেহায়াকে! মাথলার ছেলেটা মরল! আরে, মরল তো তোরই পাপে, তোরই শয়তানির কারণে।

করালী বললে—এবার যদি এমন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো মিলিটারি হাসপাতালে। সাপের বিষের ইনজেশন আছে।

এবার বিরক্তিভরে বনওয়ারী বললে—ওরে, তু যা যেখানে যেছিস যা, বুঝেছিস? যা, আপন পথে সোজা চ'লে যা।

—যাব, যাব! কেরাসিনের কি হ'ল সেই কথাটা শুনে যাই। কি বললে তোমার বড়কর্তা? চোরের একশেষ উটি।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল বনওয়ারী—করালী!

করালী গ্রাহ্য করলে না। হনহন ক'রে চ'লে গেল। যাবার সময় বললে—পাও নাই তা আমি জানি।

জল নামল। বনওয়ারীর পাওয়া খবরও সত্যি, তারের খবরও সত্যি। মিলে গেল। সকালবেলা থেকেই নামল—রিমি-ঝিমি রিমি-ঝিমি। মেঘ যেন নেমে এল বাবার শিমূলগাছের মাথার গায়ে। মেঘের পর মেঘ, হু-হু ক'রে চ'লে যাচ্ছে। পাতলা কালচে কুণ্ডলী-পাকানো মেঘ। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ত্রিভুবন।

বনওয়ারী হালের মুঠো চেপে ধ'রে বলদ দুটোকে থামালে। ব্যাপার তো ভাল নয়। এ যেন প্রলয়ের মেঘ। দূরে হাল বইছিল প্রহ্লাদ, সে তাকে হাঁকল।

প্রহ্লাদ থমকে দাঁড়িয়েছে। সে বললে—হুঁ।

—নামবে নাকি? পেল্লাদ?

প্রহ্লাদ একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। নামবার লক্ষণ যেন মিলে যাচ্ছে। নামবে হাতী। আকাশ থেকে হাতী নেমে থাকে। দু-দশ বছর অন্তর নেমে থাকেন দেবরাজের হাতী। কাল সন্ধ্যাতে যেন তার লক্ষণ ছিল। বনওয়ারীর বুঝতে পারা উচিত ছিল।

সন্ধ্যেকালের সেই লাল ছটামাখা আকাশভরা মেঘের মধ্যে সিঁদুরের মত লাল গোল মেঘখানি বার বার ঠেলা দিয়ে উঠছিল। সে তো মেঘ নয়। দেবহস্তীর সিঁদুর-মাখানো গোল মাথা সেটি। দেবরাজও তবে এবার ক্ষেপলেন। ক্ষেপবেনই তো। বাবাঠাকুরের কোপ হয়েছে, উনপঞ্চাশ সালে পবন মেতেছেন, দেবরাজার কি না ক্ষেপে, না মেতে উপায় আছে? হাতী নামবে। নামবে কি? নামল। ওই—ওই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, সায়েবডাঙার মাঠের ওপারে বরমপালির খোয়াইয়ের পারে আকাশ থেকে নেমেছে—দেবহস্তীর প্রবল শুঁড়। মেঘ থেকে দশটা তালবৃক্ষের মত—মোটা গোল একটা থাম সোঁ-সোঁ ক'রে নামছে—মাটির দিকে। থাম নয়, হাতী। হাতীর শুঁড়। মাঠের মধ্যে রব উঠল—পালা—পালা—পালা।

—গরু খুলে দে, হাল থেকে গরু খুলে দে। গোবধ হবে।

খোলা পেতেই ভয়ার্ত গরুগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে লেজ তুলে ছুটল. ডাকছে—হাম্বা—হাম্বা।

গাই ডাকছে বাছুরকে। বাছুর ডাকছে গাইকে। ছাগলগুলো চেঁচাচ্ছে। ভেড়াগুলো নীরবে ছুটছে। হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক শব্দ ক'রে জল থেকে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকছে। চকিত হয়ে ভয়ার্ত পাখীগুলো একসঙ্গে কলরব ক'রে ডাকছে। গাছেব শাখায় হনুমানগুলো ডাল আঁকড়ে ধ'রে ভয়ে কাঁপছে।

পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখে বনওয়ারীর বুকের ভিতরটাও গুর-গুর করে উঠল। চারিদিক জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা কালো প্রলয়স্তম্ভের মত বিরাট এবং গোল—দেবহস্তীর সে শুঁড় ঘুরপাক খেতে খেতে এক ভীষণ সোঁ-সোঁ-সোঁ ডাক ছেড়ে চ'লে আসছে।—পালাও পালাও। ওর মধ্যে পড়লে রক্ষে নাই। আছড়ে পড়বে মাটিতে, দম বন্ধ ক'রে মেরে মাটিকে কাদার মত ঘেঁটে তার মধ্যে আধ-পোঁতা ক'রে দিয়ে যাবে। মাঠসুদ্ধ লোক ছুটে পালিয়ে গেল উত্তর মুখে; বনওয়ারীও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জাঙলের আমবনের আশ্রয়ে।

দেবলোকের হাতী ইন্দ্ররাজার বাহন। জল দেন ইন্দ্ররাজ। হাতীতে চ'ড়ে মহারাজ মেঘের সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ান, তার বাহন মেঘের সাত সমুদ্র থেকে শুঁড়ে জল টেনে নিয়ে ছিটিয়ে দেয় চারিধারে—ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো। মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজা হাতের 'ডণ্ড'—তার নাম 'বজ্জদণ্ড' অর্থাৎ বজ্রদণ্ড, সেই 'ডণ্ড' দিয়ে মেঘের সমুদ্রে আঘাত করেন। তা থেকে ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি। কড়-কড়-কড়-কড় শব্দে বাজ ডেকে ওঠে। কখনও কখনও পাপী-তাপীর উপর এসে পড়ে সেই বাজ। পাপী শুধু মানুষই নয়, গাছপালা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—সবার মধ্যেই পাপী আছে। কখনও কখনও ইন্দ্ররাজার ভাই পবনদেবও তাঁর সঙ্গে বার হন—এই ছিল নিয়ম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজার হাতীটা ক্ষেপে উঠে পিলখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘের সাত সমুদ্রে। তখন মেঘ কালো হয়ে তোলপাড় করতে থাকে। মনে হয়, দিন বুঝি রাত হয়ে গেল। তখন সেই ক্ষ্যাপা হাতী নামিয়ে দেয় তার লম্বা শুঁড় মাটি পর্যন্ত, দোলাতে দোলাতে চলতে থাকে। যেদিকে যায়, সেদিকে এমন জল দিয়ে যায় যে, মাঠ-ঘাট ভেসে সে এক প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়। ধুয়ে মুছে ধান উপড়ে আল ভেঙে তাণ্ডব ক'রে তোলে। মাইতো ঘোষ

বলেন—জলস্তম্ভ। হে বাবাঠাকুর, হে কালরুদ্র, মাইতো ঘোষের অপরাধ নিয়ো না।

হঠাৎ প্রহ্লাদ তার হাত ধ'রে টানলে। সে প্রহ্লাদের দিকে তাকাতেই প্রহ্লাদ বললে—কি হ'ল কি তোমার ? আসছে যে !

এসে পড়েছে সেই প্রলয় জলস্তম্ভ। গোঁ-গোঁ গর্জন ক'রে আসছে। সমস্ত লোক মাটিতে শুয়ে প্রণিপাত জানাচ্ছে। বনওয়ারীর খেয়াল হ'ল, সে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম জানালে—নমো নমো নমো, হে দেবতার বাহন ! তুমি কি এসেছ প্রভু বাবাঠাকুরের বাহনের মৃত্যুর শোধ নিতে ? আগুন জ্বালিয়ে তাকে মেরেছে—তুমি জল ঢেলে তার শোধ নিতে এলে ? সে ধীরে ধীরে শুধু মাথাটি তুললে।

হাতীটা আসছিল পশ্চিম দিক থেকে পূব মুখে। আকাশ আর মাটিতে একাকার ক'রে শুঁড় দুলিয়ে দেবতার ক্ষ্যাপা হাতী মাঠে ভুঁইয়ে জল ঢেলে ঠেসে মেরে চ'লে গেল জাঙলের কোল ঘেঁষে—বাবাঠাকুরের 'থান'টিকে বাঁয়ে রেখে, সোজা পূবমুখে হুই চ'লে গেল নদীর ধারে। ওঃ, মহাশব্দ ধ্বসিয়ে দিলে খানিকটা পাড় ! ওই ওপারে গিয়ে ঘুরছে—ঘুরছে। ওই গিয়ে পড়ল মহিষডহরীর ডোমপাড়ার ধারে। ডোমপাড়ার শেষ প্রান্তে রামকালী ডোমের ওই ঘর। ক্ষ্যাপা হাতীর ক্ষেপামির কথা কে বলতে পারে। রামকালীর অপরাধের কথাই বা কে জানে ? রামকালী ডোমের ঘরের উপর পড়ল আক্রোশ। চাপালে সেই ঘরের উপর তার 'পেল্লায়' শুঁড়। হুড়-হুড় ক'রে ঢাললে জল, দুড়দুড় ক'রে ভেঙে পড়ল ঘরখানা, ঘরের লাগোয়া ছিল একটা তালের গাছ, গাছটার গোড়া খুলে উপড়ে ফেলে দিলে সেটাকে। তার পর ওই চলল, ওই। কি হ'ল ? থামল ? হ্যাঁ, হাতীকে থামতে হয়েছে, শুঁড় গুটাচ্ছে। বোধ হয় ক্ষ্যাপা হাতীর সন্ধানে বেরিয়ে 'ইন্দ্ররাজা' ধরেছেন তার নাগাল ; মাথায় মেরেছেন 'ডাঙশ'। ওই যে—কড় কড় ক'রে বাজ ডেকে উঠল। হাতী শুঁড় গুটিয়ে ওই চ'লে গেল স্বস্থানে।

যাক। বনওয়ারী এর মধ্যে একটা ভরসা পেলে। বাঁশবাঁদির কোন অনিষ্ট হয় নি। বাবাঠাকুর আছেন। যান নি। 'যাব' বললেই যেতে দেবে কে ? কাহারপাড়া বিল্ববৃক্ষটিকে যেমন আঁকড়ে ধ'রে টেনে তুলেছে, তেমনি ভাবে আঁকড়ে ধরবে। বনওয়ারী কেঁদে ফেললে।

—হে বাবা, তুমিই ভরসা কাহারপাড়ার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যদিই নামে আবার ক্ষ্যাপা হাতী, তবে রক্ষে ক'রো তুমি। আঙুল দেখিয়ে ব'লো—ইধার নেহি, উধার যাও। ব'লে দিয়ো, দেখিয়ে দিয়ো—ওই চন্ননপুরের কারখানাকে। আর ওই আকাশে উড়ে যাচ্ছে—দিন নাই, রাত নাই, বর্ষাবাদল নাই, ঝড়ঝাপটা নাই, ওই উড়োজাহাজগুলোকে। মাথার উপর দিয়ে গোঁ-গোঁ ক'রে আসছে যাচ্ছে, ওইগুলোকে শুঁড়ে ধরে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলতে হুকুম দিয়ো।

ওঃ, হ-হ-হ-হ ! কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে মেঘের ভেতরে ভেতরে যাচ্ছে—বুঝবার উপায় নাই ; কেবল গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

আঃ, ছি-ছি-ছি ! কাহারপাড়ায় আবার 'ল্যাই' অর্থাৎ কলহ লাগালে কারা ? তার তীব্রস্বর এরোপ্লেনের গোঙানিকেও ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁছল বনওয়ারীর। মেঘের দিকে চেয়ে উড়োজাহাজটিকে দেখা আর তার হ'ল না। পাড়ায় ছুটতে হ'ল।

পাড়াতেও তার যাওয়া হল না। বড় ঘোষের ডাক নিয়ে চাকরের সঙ্গে দেখা মাঝপথে।—এক্ষুনি। বড়কর্তা রাগে কাঁপছে।

সত্যিই রাগে কাঁপছেন বড়কর্তা। বড়কর্তার রাগই স্বভাব। ওই অমনি কেঁপেই থাকেন। সামান্য কারণেই ক্ষেপে যান।

চীৎকার ক'রে উঠলেন বড়কর্তা।—আমার উপরে নালিশ!

—নালিশ! আপনার উপরে? আমি?

—হ্যাঁ। কিছু জান না তুমি? করালীকে দিয়ে নালিশ করাও নি?

—আজ্ঞে? আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি কিছু জানি না। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে মাথায়। অঙ্গ খ'সে যাবে।

করালী চন্ননপুরে ইউনিয়ন-বোর্ডের আপিসে নালিশ করেছে, দরখাস্ত করেছে—কাহারদের কেরোসিন দেওয়া হয় না কেন? যদি হয়, তবে সে তেল নেয় কে? তার খোঁজ করা হোক। এবং তাদের বরাদ্দ তেল দেওয়ার হুকুমনামা এই খোদ আপিস থেকে দেওয়া হোক।

বনওয়ারী মাথায় হাত দিলে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে উঠল। বললে—এর পিতিবিধান আমি করব। চরণে হাত দিয়ে ব'লে গেলাম আপনাকে।

ফিরল সে পাড়ায়। ঝগড়া তখনও চলছে—তুমুল ঝগড়া।

আজ ঝগড়া বেধেছে সুচাঁদ এবং নয়ানের মায়ের মধ্যে। সর্বনাশ!

সুচাঁদ ধেই-ধেই ক'রে লাফিয়ে নাচছে, আর মোটা গলায় চীৎকার করছে—বেটার মাথা খেয়েছিস, এইবার চোখের মাথা খাবি। ভাতে হাত দিলে ছাইয়ের গাদায় হাত দিবি। ভূত হয় নাই বলছিস? দেখবি লো, দেখবি। সে ওই মাগীর ঘাড় ভাঙবে, ওই মিনসের ঘাড় ভাঙবে, তা'পরে তোর ঘাড়ে চাপবে। তু ঘাড় নাড়বি, চুল দোলাবি, আর বলবি—আমি কাঁলোশশী। কথার শেষে সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দুই হাত নাড়া দেয় বার কয়েক।

ওদিকে নয়ানের মা তীব্র স্বরে ব'লে যাচ্ছে—সুচাঁদের বলার সঙ্গেই ব'লে যাচ্ছে—হে বাবাঠাকুর, তুমি ধ্বংস করো বাবা, যে তোমার বাহনকে মারলে, যে পরের ঘর ভাঙলে, গাঁয়ের বিধান না মেনে যে উঁচু ঘর বাঁধলে, তাকে ধ্বংস ক'রো—তাকে ধ্বংস ক'রো। যেমন ক'রে উড়োজাহাজ পেড়ে ফেললে আজ, তেমনি ক'রে পেড়ে ফেলো।

চমকে উঠল বনওয়ারী। উড়োজাহাজ পেড়ে ফেললে কি?

নসুবালা সংবাদ এনেছে—সাঁইথিয়ার ময়ূরাক্ষীর ধারে একখানা উড়োজাহাজ আজ মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। নীচে নামছিল, হাতীর শুঁড়ে জড়িয়ে তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলেছে। করালী গেল সাঁইথিয়া সেই 'ম্যান'দের সঙ্গে। বসনকে খবর দিয়েই সে বিলাপ করতে করতে ফিরেছে চন্ননপুর।

জয় বাবাঠাকুর! জয় দেবরাজার হস্তী! জয় ধর্মের! বনওয়ারীর অন্তর অপরূপ শান্তিতে ভ'রে উঠল। বুকে বল পেলে।

সদর্পেই সে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল তাকে। ওদিকেও ঝগড়া বেধেছে যেন। গোপালীবালার গলা মনে হচ্ছে। আর একটা সুবাসীর। পানাও নিজের ঘরে ব'সে

গাল দিচ্ছে। কি হ'ল?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ঝগড়ার কারণ যত জটিল, তত বিচিত্র। আজ দুটো ঝগড়া একসঙ্গে পাকিয়েছে। একদিকে নসু খবর এনেছে উড়োজাহাজ ভেঙেছে। নয়ানের মা সেই শুনে উল্লাসে নাচছে। ওদিকে আজ বিকালে অর্থাৎ বনওয়ারী যখন মুনিব-বাড়িতে ছিল, তখন আর-এক কাণ্ড ঘ'টে গিয়েছে রমণ আটপৌরের ঘরে; রমণের স্ত্রী—সুবাসীর মাসী, কালোশশীর বোন—হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান অবশ্য হয়েছে, কিন্তু এখন সে ঘোরের মধ্যেই প'ড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় নাই লোকের। এলোচুলে লঙ্কা নুন পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত খেতে বসেছিল সে আজই ভরা দুপুরবেলায়, সেই সময়—। আজ শনিবার অমাবস্যে। ক্ষণের মুখে এই লোভনীয় খাদ্য খেতে বসায় এঁটো হাতের সুযোগে এবং এলোচুলের অপরাধে তাকে পেয়েছে কোন অশান্ত প্রেতলোকবাসী। এবং সে প্রেতলোকবাসী যে কে, বাবাঠাকুরের কৃপায়, হাঁসুলী বাঁকের উপকথার শিক্ষায় তাও কাহারদের জানতে বাকি নাই, সে আর কেউ নয়, সে হ'ল কালোশশীর প্রেতাত্মা। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার, 'অঙে'র খেলার সাধ মেটে নাই তার, অঙের খেলায় লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়ে নিজের স্পর্শে 'বাস্তন'-তুল্য ছত্রি জাতের ভূপসিং মহাশয়ের জাতিপাত করার পা[illegible] নিয়ে সে মরেছে, সে ওই দশা পাবে বইকি!

পানা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—সে আজও পুত্রশোক ভুলতে পারে নাই। সে যোগ দিচ্ছে—বাবার থানের ধূপ-পিদীম অপবিত্ত করে দিয়েছে। হবে না! আমি সাজা পেয়েছি, আরও কত জনকে পেতে হবে।

ওদিকে মৃত কালোশশীর সম্বন্ধে এই সকল তথ্যের প্রতিবাদ করছে তার বোনঝি সুবাসী। সে ঘরে এসে কাঁদতে বসেছিল। কান্নার মধ্যে সে মাসীর প্রেতাত্মাকে ডেকে বলেছিল—তুমি যদি তাই হয়ে থাক, তবে লাও—লাও; শত্তুদিকে লাও।

এই কান্নার প্রতিবাদ করেছিল বনওয়ারীর বড়বউ। বলেছিল—ভরাভর্তি বেলায় এমন ক'রে কেঁদো না তুমি।

এই প্রতিবাদে সুবাসী কেঁদে বলেছিল মৃত মাসীকে উদ্দেশ ক'রে -ওগো, কত ভালবাসতে গো আমাকে তুমি, আমার রূপকার কর। লাও—লাও, আমার শত্তুকে লাও, তোমার শত্তুকে লাও। আমার কাঁটা তুলে দাও।

'কাঁটা' মানে সতীন-কাঁটা। সতীন মানেও শত্রু। সতীনের চেয়ে বড় শত্রু কে? এই লেগেছে ঝগড়া গোপালীবালা এবং সুবাসীর মধ্যে। পাড়ার সকলেই গিয়েছে দেখতে। এর মধ্যে সুবাসীর সঙ্গে পাখীর ভাব আছে ব'লে এবং কালোশশী বনওয়ারীর প্রিয়তমা ব'লে নয়ানের মা গোপালীর পক্ষ নিয়েছে। ঠিক সেই কারণেই সুচাঁদ নিয়েছে সুবাসীর পক্ষ। করালী এবং পাখীর উপর আর সুচাঁদের রাগ নাই। করালী তাকে পাকি মদ খাইয়েছে, কাপড় দিয়েছে, পায়ে ধরেছে, কোলে ক'রে নেচেছে। নয়ানের মা সুবাসীকে বলেছে—মরলে যদি ভূত হয়, আর ভূত যদি কথা শুনত, তবে স্বামী-পুত্তু শ্বশুর-শাশুড়ী একঘর ভূত থাকত আমার। আর যার ঘাড় ভাঙতে বলতাম, তারই ঘাড় ভাঙত। মরণ!

তার প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে করেছে সুচাঁদ—মরলে ভূত হয় না? তোর ঘাড়ে যখন চাপবে

তখন বুঝবি।

এই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সুবাসী প্রতিবাদ করতে গিয়েছে তার মাসী কালোশশীর প্রেতত্ব বা পেত্নীত্ব প্রাপ্তির। কিন্তু তারই পক্ষ নিয়ে সুচাঁদ তীব্র প্রতিবাদে প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছে—কালোশশী নিশ্চয় পেত্নী হয়েছে এবং সুবাসীর শত্রুদের সে নিপাত করবে।

বনওয়ারীর নিজের বাড়ি অবশ্য এখন স্তব্ধ। গোপালীবালা, সুবাসী—দু'জনেই চুপচাপ শুয়ে আছে আপন আপন ঘরের দাওয়ায়। ভাত পর্যন্ত হয় নাই। বনওয়ারীর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল নিজের স্ত্রীদের উপর, সুবাসীর উপরেই রাগটা বেশি হ'ল। আজ সে জানতে পারলে, সুবাসীর সঙ্গে পাখীর ভাব আছে ; তার উপর কালোশশীর প্রেতাত্মাকে ডেকেছে। একটা লাঠি টেনে নিয়ে তার চুলের মুঠো ধ'রে সে তাকে ঠেঙাতে আরম্ভ করলে। তাকে ঠেঙিয়ে সে ঠেঙালে গোপালীবালাকে। তাকেও দিলে অল্প কয়েক ঘা। তারপর সে লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল সুচাঁদ এবং নয়ানের মায়ের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে সুচাঁদ পিছু হঠতে লাগল। কয়েক পা পিছু হঠে সে হনহন ক'রে চলে গেল মাঠের দিকে। সেখানে কোথাও বসে সে গাল দেবে, পরিশেষে সে কাঁদবে মৃত বাপকে স্মরণ ক'রে, কারণ বনওয়ারী ভাইপো হয়ে তাকে লাঠি দেখিয়েছে। নয়ানের মা কিন্তু পালাল না। সে বিড়ালীর মত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পানার উদ্দেশ নাই। সে ঘরে খিল দিয়েছে। তার বউ বললে—জ্বর হয়েছে, শুয়েছে।

—দাদা ! ঠিক এই সময় কে পিছন থেকে ডাকল।

—কে ?

—আমি বসন।

হ্যাঁ, বসন। বসনের কোন অপরাধ নাই ; তবুও করালী-পাখীর কারণে তাকে দেখে বনওয়ারী প্রসন্ন হতে পারলে না। গম্ভীর মুখে বনওয়ারী বললে—কি ?

একখানা কাগজ তার হাতে দিয়ে বসন বললে—তোমার কাড।

—কাড ?

—হ্যাঁ। কেরাচিনি চিনি—এই সবের ছাড়। নেওনাইন-বোড থেকে দিয়েছে, নসু দিয়ে গেল আমাকে। সেকেটারি করালীকে দিয়েছিল। জাঙলের হেদো মণ্ডলের ছেলে আইছিল, সে সবারই দেখে সবাইকে দিয়েছে, এইটি তোমার।

কার্ডখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে বনওয়ারী। তারপর সে বার হ'ল পাড়ায়। নিউনাইন-বোডে এমন কথা বলতে করালীকে কোন্ কাহার বলেছে ?

কেউ বলে নাই।

সকলে চুপ ক'রে রইল।

—ফেলে দাও কাড।

প্রহ্লাদ বললে—ব্যানোভাই !

—না।

—না লয়। একটু শক্ত হয়েই সে বললে—সে ভাই অন্যায় হবে। ভেবে দেখ তুমি।

কাড দিয়েছে নিউনাইন-বোড। আমরা বেগার দি। আমাদের কাড কেনে ফেলে দোব?

—হুঁ। কিন্তু যদি কেউ শুধায়, ঘোষ মশায় তোমাদের কেরাচিনি মেরে দিত কিনা?

—তা কেন বলব? সে বলব কেন?

—করালীকেও বলতে তোমরা বল নাই?

—না, কেউ বলে নাই। মুখ থাকতে নাকে ভাত কেউ খায় নাকি? বললে তোমাকে বলতাম আমরা।

—বাস্। বাস্। প্রহ্লাদ বনওয়ারীর ছেঁড়া কার্ডখানি এনে জুড়তে বসল।

বনওয়ারী বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে মনে মনে বাবাঠাকুরকে ডাকতে লাগল।

ঝম ঝম ক'রে জল নেমেছে আকাশ ভেঙে। আবার হাতী নামবে নাকি?

কে ডাকছে এর মধ্যে! কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! সুবাসী দরজা খুলতে গেল, কিন্তু ধমক দিয়ে বনওয়ারী বললে—অ্যা-ই!

কে জানে কে! মানুষ কিনা তাই বা কে জানে! কালোশশী নয়, কে বলবে! আজ আবার কালোশশী সাড়া দিয়েছে।

—কে—কে তুমি?

—কাঙাল, কাঙাল আমি। অমনকাকার বউ মারা গেল, খবর দিতে এসেছি।

মারণো তবে কালোশশী! বনওয়ারী বাবার নাম ক'রে বেরিয়ে এল।

পাঁচ

জয় বাবাঠাকুর! শাঙন পার হ'ল। চাষ ভাল। ভালয় ভালয় কেটে যাচ্ছে, বিপদ আসছে, কাটছে। এর চেয়ে আর ভাল কি হবে? ভাদ্র এল। ভাদুরে রোদে চাষী বিবাগী হয়। প্রচণ্ড রোদে জম-জমাট ধান-ক্ষেতের মধ্যে সারা অঙ্গ ডুবিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আগাছা নিড়িয়ে বেড়াতে হয়; ধানের চারার করকরে পাতার ঘর্ষণে সারা দেহ মেজে যায়, ফুলে ওঠে, ধানচারার ভিতরে ওই রোদের ভাপসানিতে শরীরে গলগল ক'রে ঘাম ঝরে। তখন মনে হয়, বাড়ি-ঘর কাজ-কর্ম ছেড়ে বিবাগী হয়ে চ'লে যায় কোন দিকে!

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় 'পিথিমীর' সব জায়গার মতই আষাঢ় যায়, শাঙন যায়, ভাদ্র আসে। আষাঢ় শাঙন যে কেমন ক'রে কোন্ দিক দিয়ে যায় তা কাহারেরা জানতে পারে না। কাদায় জলে হাঁসুলী বাঁকের ক্ষেতে বুক পেড়ে প'ড়ে থাকে, মাথার উপরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, গুরু-গুরু শব্দে মেঘ ডাকে। শাঙন শেষ হ'লে খেয়াল হয়, ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হ'ল। রোয়া শেষ হ'লে বাবাঠাকুরকে প্রণাম করে, আর আয়োজন করে বাবাঠাকুর-তলায় ইঁদপুজোর। ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষায় জল দিলেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন 'ভোমণ্ডলে' অর্থাৎ ভূমণ্ডলে। ইঁদপুজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটেখুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়, মাতব্বরি করেন জাঙলের

জোতদার মণ্ডল মহাশয়েরা। জমিদার দেন পাঁঠা, বাতাসা, মণ্ডা, মুড়কি, দক্ষিণে দু আনা ; মণ্ডল মহাশয়েরা পাঁঠার 'চরণ' অর্থাৎ ঠ্যাঙ বৃত্তি পান, বাতাসা-মণ্ডার প্রসাদ পান, কাহারেরা শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকে। ইঁদরাজার পুজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানটিতে বেদী বাঁধে, জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পুজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পুজোতে কাহারপাড়ায় 'অঙখেলার' চব্বিশ প্রহর হয়ে থাকে, সে মাতনের হিসেবনিকেশ নাই। ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী ক'রে লতায় পাতায় ফুলে সাজিয়ে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে মেয়েপুরুষে মিলে গান করো নাচো। রাত্রে ঘুমোতে নাই, নাচতে হয়, গাইতে হয়,—জাগরণ হ'ল বিধি। পিতিপুরুষের কাল থেকে দেবতার হুকুম 'অঙে'র গান—'অঙে'র খেলা যার যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, কানে শুনলে দেখতে যাবে না। ওই দিনের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলবে।

হারামজাদা করালী এবার জাঁক ক'রে চন্ননপুর থেকে এসে নিজের উঠানে কাহারপাড়ার পুরানো ভাঁজোর সঙ্গে আলাদা ক'রে ভাঁজো পাতলে। হেঁকে বললে—ঘর ভাঙ্গলে থানাতে নালিশ করেছিলাম, ভাঁজো ভাঙ্গলে মিলিটারি কোর্টে নালিশ করব। দুজনা লালমুখো সাহেব—সেই ওর 'ম্যান'রা এল করালীর সঙ্গে। ফটোক তুললে। তারাও ঠ্যাং ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচলে! তারা চ'লে গেল। চোলাই মদও খেয়ে গেল বোধ হয়। সায়েবে ঘেন্না ধ'রে গেল বনওয়ারীর। করালী সাহেব দেখালে বটে!

ওরে বেটা, বনওয়ারী ওসব দেখে ভয় পায় না। সাহেব! থুঃ!

বনওয়ারীও হুকুম দিলে—লাগাও জোর ধুমধাম ভাঁজোতে। এবার মাঠে প্রচুর ধান হয়েছে। কোন রকমে আশ্বিনে একটা মোট বর্ষণ হলেই আর ভাবনা নাই। যুদ্ধের বাজারে ধানের দর চড়ছে, বিশেষ ক'রে শাওন মাসে। চন্ননপুরে, দেশ-দেশান্তরে স্বদেশীবাবুরা 'অ্যাল-লাইন' তোলাতুলির পর থেকে বাজার আরও লাফিয়ে চড়ছে। তা চড়ুক, তাতে কাহারেরা ভয় পায় না। নুন ভাত খাওয়া অভ্যেস আছে। তাই বা খাবে কেন? মাঠে মাছ হয়েছে এখন, মাছ আর ভাত, শাক-পাতেরও অভাব নাই। মাঠের জল শুকালে পুকুরে বিলে মা-কোপাইয়ের গর্ভে আছে শামুক-গুগলি কাছিম-ঝিনুক। ছেঁড়া কাপড় পরাও অভ্যেস আছে, সুতরাং যুদ্ধের আক্রাগণ্ডায় হাঁসুলী বাঁকের ভাবনা নাই। বরং ধান এবার বেশি হবে—কাহারেরা ভাগেও বেশি পাবে, দর চড়লে লাভ হবে তাদের। সুতরাং করালীর সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগে যাও বুক ঠুকে। আগে পাল্লা হ'ত আটপৌরে পাড়ার সঙ্গে, এখন হবে করালীর সঙ্গে। বাবাঠাকুর বোধ হয় সদয়। হাসছেন বেশি, রোষ করলে সে ভুরুতোলা রোষ। ভাদরের মেঘ—রোদের খেলার মত। এইবার কাটবে মেঘ। কালারুদ্দুর গাজনে এবারও বনওয়ারী হয়েছিল ভক্ত, লোহার কাঁটা-মারা চড়কপাটায় চেপেছিল, বাবার মাথায় আগুনের ফুল চড়িয়েছিল ; সে-সব কি বৃথাই যাবে?

বাবা পুজো হাসিমুখেই নিয়েছেন। তারই ফলে কাহারপাড়ার এবার সময় ভাল।

মোট কথা, ওদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে বনওয়ারী। হাতী নেমে বাঁশবাঁদির ক্ষতি করে নাই, উড়োজাহাজ ভেঙে পড়েছে। এই দুটি কারণে ওদিক দিয়ে তার ভয় কেটেছে। তবে আছে একটা ভয়—সেই কালোশশীর ভয়। ও ভয়ও ভুলেছিল বনওয়ারী,

কিন্তু রমণের বউকে মেরে যে আবার ভয় ধরালে নতুন ক'রে। তাও হাতে আছে মা-কালী বাবা 'কালারুদ্দু' কর্তাঠাকুরের মাদুলী। ভয় কাটার সঙ্গে এবারের এই মাঠভরা ধানের ভরসা তাকে সাহস দিয়েছে অনেক। এ কথাও তার মনে উঁকিঝুঁকি মারছে যে, মন্দ তার এখন হতেই পারে না; এইটাই তার চরম ভালর সময়, কপাল তার ফিরছে। সাহেবডাঙার 'আচোট' মাটির জমিতে এবার সবুজ ধান দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যাকে বলে—'চৌকস' ধান, তাই হয়েছে। ঘোষেদের ভাগের জমিতেও ধান খুব ভাল। এরই মধ্যে একবার ধানের পাতা কাটাতে হয়েছে। ধানের গোছা হয়েছে মহিষের পায়ের গোছার মত। বনওয়ারীকে এবার খামার বাড়াতে হবে। খামার বাড়বে, একটা মরাইও করবে শক্ত ক'রে। আর চাই 'পুত্তু'সন্তান, ওইটি হলেই তার বাসনা পূর্ণ হয়। বাঁচতে হবে অনেক দিন। ছেলেকে ডাগর ক'রে, মাতব্বরির গদিতে বসিয়ে তবে বনওয়ারী নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারবে। এদিক দিয়ে ভয় তার করালীকে। এই যুদ্ধের বাজারে কলে 'ওজগার' করছে দু হাতে, আর গায়েও ক্ষমতা আছে, বুকেও আছে দুর্দান্ত সাহস। সে যদি ছেলেকে ছোট রেখে মরে, তবে করালী জোর ক'রে চেপে বসবে মজলিসের মাতব্বরির পাথরে। হয়তো মেরেও ফেলতে পারে কলে-কৌশলে: ওই কারখানার কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে দেবে কলের মুখে ঠেলে। তাকে অনেক দিন বাঁচতে হবে। কাহারপাড়ার মঙ্গল করতে হবে, দুঃখে-কষ্টে বুক দিয়ে পড়তে হবে, পর্বে-পার্বণে প্রচুর আনন্দ দিতে হবে। প্রচুর আনন্দ।

বড়লোক মহাশয়েরা, জাঙলের সদ্‌গোপেরা বাউরী হাড়ি ডোম এদের বলেন—ছোটলোকের জাত। সদাশয়েরা বলেন—গরিব দুঃখী, দুঃখ মেহনত করে খায়। দুটো কথাই সত্যি। গরিব দুঃখীরা আনন্দ ভালবাসে—আনন্দ পেলেই ছুটে যায়। আবার ছোট মনেরও পরিচয় দেয়, চিরকাল যেখানে আনন্দ ক'রে আসছে, সেখানের চেয়ে আজ অন্যখানে নতুন ক'রে বেশি আনন্দের ব্যবস্থা হ'লে—চিরকালের স্থান ছেড়ে সেইখানে ছুটবে! করালী আজ তাই করতে চাইছে। রোজকারের গরমে ভাঁজো পেতেছে নিজের 'আঙনেতে' অর্থাৎ আঙিনায়। আলো আনবে ভাড়া ক'রে; বেহালাদার আনবে, 'হারমণি' আনবে; চন্ননপুরের যত জাত-খোয়ানো মেয়েদের আনবে, তারা নাচবে নসুবালার সঙ্গে। সিধু আসবে, পাখী তো আসবেই। আরও কতজন আসবে।

আসুক। বনওয়ারীও আলো ভাড়া করেছে। খুব ভাল ঢোল-সানাই-কাঁসি ভাড়া করেছে। হুকুম দিয়েছে—বেবাক 'যোবতী' অর্থাৎ যুবতী কাহার-কন্যে-বউকে নাচতে হবে। সবুজ লাল হলদে রঙ এনে দিয়েছে, কাপড় ছুপিয়ে রঙিয়ে নাও। সুবাসীও নাচবে। সুবাসীকে একখানা রঙিন শাড়িই কিনে দিয়েছে সে। গোপালীবালাও নাচবে। তাকেও কাপড় কিনে দিয়েছে সে। ছোকরাদের হুকুম দিয়েছে—তুলে আন বেবাক পুকুরের পদ্ম আর শালুক ফুল। সাজাও ভাঁজোর বেদী। ঐ সমস্তের ভার দিয়েছে পাগল কাহারকে। সেই চাষের সময় পালিয়েছিল, হঠাৎ কাল—ভাঁজোর আগের দিন সে ঠিক এসেছে। ভর্তি-দুপুরে মাথায় আট-দশটা ডাঁটিসুদ্ধ শালুক ফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কাশফুল গুঁজে বুড়ো-ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলী বাঁকে ফিরেছে—

কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকাল্ছ কোন্ ফাঁকে!
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
তোমার আ-ঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে!

পাগল-সাঙাতের বলিহারি আছে।

কুড়ুতাং-কুড়ুতাং-তাক্-তাক্-তাক্-তাক্ শব্দে ভাঁজো পরবের ঢোল বেজে উঠল। মাঠের কাজ নাই আজ, মনিববাড়ি নাই আজ, কাহারেরা কেউ আজ 'আজা'রও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়; কোপাইয়ের পুলের উপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময়সঙ্কেতের দিকেও কেউ কান দেবে না; উঠানে সূর্যঠাকুরের রোদ কোন্ সীমানা পার হচ্ছে, সেদিকেও কেউ তাকাবে না। দুধোল গাইগরুর বাছুরগুলিকে আগেকার কালে এই দিনটিতে বাঁধাই হ'ত না; ওরা পেট ভ'রে দুধ খেত। আজকাল ভোররাত্রে দুধ দুইয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওদের ছেড়ে দাও হাঁসুলী বাঁকের ধারে—চরভূমিতে। ইচ্ছামত চ'রে খাক। তাতে দু-চারখানা জমির ধান খেয়ে নেয়—নিতে দাও। হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ 'রসিয়ে' উঠেছে ভাদুরে গরমে—ঢাকনি খুলতেই বাতাসে গন্ধ বেরিয়েছে। কাহারপাড়ার মাথার উপরে ওই গন্ধে কাকের দল কলরব করছে, মাটির দিকে চেয়ে দেখ—পচা ভাতের কুটির জন্য পিঁপড়েরা সার ধরেছে, কুকুরগুলো ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাগল ঢোলের বাজনার বোলকে নিজের মনের মত ক'রে পাল্টে নিয়ে বলছে—'কাজকাম্' 'পাটকাম্' থাক্ থাক্ থাক্ থাক্! নাচ্ না কেনে মেয়েরা, নাচ্ না কেনে গো! চল্, কোপাইয়ের ঘাট থেকে ঘট ভ'রে আনি, নে 'পাঁচ আঁকুড়ি'র সূরা মাথায় নে। 'পাঁচ আঁকড়ি' অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুর।

বনওয়ারী নিজে মদ ছাঁকতে বসেছে। 'ম্যাতা' অর্থাৎ পচুই-ছাঁকা পচা ভাতগুলো ফেলে দিচ্ছে কুকুরগুলোকে; ডাব বেঁধে কতক দিচ্ছে ছেলেদের হাতে—দিয়ে আয় গরুগুলোর মুখের কাছে, বলদ গাই বাছুর—সবাইকে দিবি। খাক, আজকের দিনে সবাই খাবে। ভেড়া হাঁস মুরগী—ওদিকেও দে।

এইবার আয় তোরা, ব'সে যা। লে ঢকাঢক, লে ঢকাঢক। মেয়েরা, লে গো, তোদের ভাগ তোরা লিয়ে যা। লে ঢকাঢক। বায়েনরা লাও ভাই। বাজাও, বেশ মধুর ক'রে বাজাও! সানাইদার, দেখব তোমার এলেম—করালী হারামজাদা বেহালা হারমনি এনেছে, কানা ক'রে দিতে হবে। লে ঢকাঢক।

"ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আল্তার অঙের ছোপ মাটিতে দিব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা।"

এইটুকু গান হ'ল—মন্তরের মত। সব দলকেই গাইতে হবে এটুকু। ওদিকে নসুবালার দল বার হয়েছে। করালী নিজে বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে। কাপড়-চোপড়ের ঘটা খুব ওদের। সব 'লতুন' কাপড়। চন্ননপুরের পাপের পয়সা যে, হবে না কেন? কিন্তু তবু রঙের ছটা কাহারপাড়ার মেয়েদের কাপড়েই বেশি। নতুন ক'রে রঙ-করা পুরানো কাপড়গুলি রঙের গাঢ়তায় ঝকমক করছে।

কোপাইয়ের ঘাটে একদফা গালাগালি হয়ে গেল দুই দলে। গানে গানে গালাগালি। চিরকাল হয়ে আসছিল কাহারপাড়ায়-আটপৌরে পাড়ায়। এবার হচ্ছে কাহারপাড়ায় আর করালীর দলের মধ্যে। এক দিকে পাগল, অন্য দিকে নসুবালা। এই ভাঁজোর দিনে নসু পাগলের কথায় ক্ষ্যাপে না, ভয় করে না। সমান মাতনে মাতে। মুখে মুখে গান বেঁধে গায় গালাগালি—যে কোন গালাগালি। তবে তার মধ্যে শাপশাপান্ত নাই। 'অঙে'র গাল—'অসে'র গাল।

তারপর ঘাট থেকে ফিরে আরম্ভ হ'ল আপন আপন এলাকায় নাচ আর গান। প্রথমেই নিয়ম—চিরকালের নিয়ম—বয়সওয়ালা মেয়েরা নাচতে আরম্ভ করবে। চিরকাল এ নাচ আরম্ভ করে সুচাঁদ। এবার সুচাঁদ গিয়েছে করালীর দলে। এখানে কে নাচবে?

পাগল ছুটে গিয়ে ধ'রে নিয়ে এল গোপালীবালাকে। গোপালীবালার নেশা ধরেছে, তবুও লাজুক মানুষ, বলছে—না না। তার উপর পাগলের তাকে সাঙা করতে চাওয়ার কথা মনে করে সে বেশি লজ্জা পাচ্ছে। মুখে 'অঙ' ধরেছে লজ্জাতে। সকলে খুব হেসে উঠল।—বলিহারি ভাই—বলিহারি ভাই।

বনওয়ারীর মন কিন্তু উদাস হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ছে কালোশশীকে। তবু সে হাসছে, না হাসলে চলবে কেন? হঠাৎ তার নজরে পড়ল ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে নয়ানের মা। বড় মায়া হ'ল তার উপর। আহা, সব হারিয়ে নিরানন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে প'ড়ে গেল সব কথা। সে এগিয়ে গিয়ে ধরলে তার হাত। বললে—এস, তুমি আমি আগে নাচব।

'ভাঁজোর পরব' সুখের দিন। মদের নেশায় মাথা ছমছম করছে, আকাশে মেঘ কেটেছে, নীলবরণ আকাশের তলায় ঝাঁকবন্দী সাদা দুধবরণ বক উড়ে চলেছে, নীলের বাঁকে 'গোরা-কান্দার' মাঠে পদ্ম-শালুক ফুটেছে, পদ্মপাতার উপর জলের ফোঁটা টলমল ক'রে রোদের ছটায় ঝলছে যেন মানিক-মুক্তোর মত; শিউলি ফুল ফুটে টুপটাপ ক'রে ঝরে পড়ছে। স্থলপদ্ম গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে কাহারপাড়া আলো ক'রে, কোপাইয়ের বুকের বান নেমে গিয়েছে, ঘোলা জল সাদা হয়ে এসেছে; তবু নয়ানের মায়ের সুখ কোথায়? আউশধানে থোড় হয়েছে, দশ মাসের পোয়াতীর মত থমথম করছে আউশের মাঠ; পুকুরে পুকুরে শোলমাছেরা ঝাঁকবন্দী বাচ্চা নিয়ে বেড়াচ্ছে; ডালে ডালে পাখিরা কচি বাচ্চাদের ছাড়ান দিচ্ছে—যাও, তোমরা উড়ে বেড়িয়ে চ'রে খাও গিয়ে; জাঙলে চন্ননপুরে মা-দুর্গার কাঠামোয় মাটি পড়েছে; কাল গিয়েছে জিতেষষ্ঠী। আজ কি নয়ানের মা নয়ানকে ভুলতে পারে? নয়ান যেদিন করালীর হাতে মার খেয়ে হাঁপাচ্ছিল, সেদিনও তার মনে পড়েছিল পুরানো কথা। সেদিনও যে বনওয়ারীর হাত ধ'রে টেনেছিল বাঁশবনের আঁধার রাজ্যের দিকে।

কিন্তু আর না—আর না। সে বনওয়ারীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চ'লে গেল নিজের ঘরের দিকে। তারপরে প্রথমে সে ডাকলে নয়ানকে।—ফিরে আয়, সবাই নাচছে, তুই নাই শুধু। ফিরে আয়। তারপর আরম্ভ করলে সে গোটা কাহারপাড়াকে অভিসম্পাত দিতে।

বনওয়ারী স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি হ'ল!

পাগল তার হাত ধ'রে টেনে বললে—কিছু নয়। ওদিকে কান দিস না। নাচ্। সে টেনে নিয়ে এল সুবাসীকে। মদের নেশায় সুবাসী টলমল করছে পদ্মপাতায় জলের টোপার মত। চোখে আধখানা চাঁদ নেমেছে; গায়ে যেন জ্বরের মতন তাপ।

বাঁশের বাঁশি কে বাজায় রে? কে?

বনওয়ারী দেখলে, করালী কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ভাঁজোতলায়, তার আর সুবাসীর নাচ দেখে হাসছে, গানের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছে। ইয়া টেরি, পোশাকের বাহার কত, গায়ে খোসবয় উঠছে।

বনওয়ারী বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু পাগল ধরলে তাকে।—খবরদার। তু কত বড় মানুষ মনে আকিস। পিতিপুরুষের বাক্যি মনে কর্। আজ অঙের দিন—চোখ থাকতে দেখো না, কান থাকতে শুনো না, পরাণ যা চায় তা অমান্যি ক'রো না। লে লে, বাজা বাঁশি, করালী, বাজা বাঁশি।

করালী সুবাসীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পাগল তাকে দিলে খোঁচা।—বাজা না কেনে? দেখিস কি? সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। পানা হাসছে সবচেয়ে বেশি। কাঁসার বাসনের আওয়াজের মত তার খনখনে আওয়াজের হাসি। সুবাসীও হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাচের চুড়িগুলোও ঝুনঝুন ক'রে বাজল।

বনওয়ারীর সারা অঙ্গ নিসপিস করছে। গায়ে তাপ বেরুচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই, পিতিপুরুষের বারণ। তবে সেও যাবে নাকি করালীর ভাঁজোতলায়? পাখীও তো নাচছে সেখানে। ছি-ছি-ছি! হে বাবাঠাকুর! হে ধরম রাখার মালিক, তুমি রক্ষা কর।

যার সঙ্গে ভাব নাই তার সঙ্গে কাহারেরা হাসে না, কিন্তু করালী চন্ননপুরের কারখানায় গিয়ে অন্য রকম হয়েছে। চন্ননপুরের বাবুরা ভাব না থাকলেও হাসেন। মুখুজ্জেবাবুরা এবং চাটুজ্জেবাবুরা চিরকাল মামলা-মকদ্দমা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক'রে আসছেন, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে বুঝবার জো নেই। এ বাবুরা ও বাবুর বাড়ি যাচ্ছেন সকালে, বিকালে ও বাবুরা এ বাবুদের বাড়ি আসছেন, হাসিখুশি রঙ-তামাশা গালগল্প গান-বাজনা করছেন। দেখে অবাক হয়ে যায় বনওয়ারী। করালীও দেখা যাচ্ছে তাই শিখেছে। বনওয়ারীকে বললে ও—একবার আমার ভাঁজোর থানে এস মামা। পাকি মদ—

বনওয়ারী রূঢ়ভাবে মধ্যপথেই বললে—না।

করালী হাসতে হাসতেই চ'লে গেল। সে হাসি দেখে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল বনওয়ারীর। হারামজাদা চ'লে গেল কত রঙ্গ ক'রে, শিস দিতে দিতে, সারা ভাঁজোতলায় একটা সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে। বাবুদের মত 'আতর খোসবাই' মেখেছে!

পানা ছড়া কেটে উঠল।—"ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে 'রবশ্যাষে'—অজাতে পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে!"

বনওয়ারী রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে পানার দিকে, পানা আজ কিন্তু ভয় পেলে না। আসরটাই আজ ভয় পাবার আসর নয়, ভাঁজো সুন্দরীর আসর, 'অঙের' আসর, আনন্দের আসর, আজ ছোট-বড় নাই ; তার উপর পেটে মদ পড়েছে প্রচুর। পা টলছে, মন চনচন করেছে। সাহস বেড়েছে। পানা বনওয়ারীর রূঢ়দৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই বললে—আমার দিকে তাকালে কি হবে বল ? জাত আর থাকবে না, অজাত ঢুকেছে ঘরে। বানের জল ঘরে ঢোকালে—ঘরের জলও তার সাথে মিলে বেরিয়ে যায়। দেখ গা করালীর আসরে বেবাক ছেলেছোকরারা জুটে যেয়েছে।

বনওয়ারী স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে ব'সে থেকে সে উঠল ; উঠে গিয়ে মদের জালার কাছে ব'সে একটা ভাঁড় নিয়ে গলগল ক'রে গলায় মদ ঢালতে লাগল। দেখতে দেখতে পিথিমী যেন ঘুরতে লাগল—নাচতে লাগল তার চোখের সম্মুখে। মনে মনে সে ডাকতে লাগল বাবাঠাকুরকে। সুবাসী নাচছে, গোপালী নাচছে, প্রহ্লাদের মেয়ে, গুপীর বেটার বউ নাচছে, পাগল গান গাইছে। বনওয়ারী কিন্তু তা দেখছেও না। তার দৃষ্টি বাবাঠাকুরের থানের দিকে। শুক্লানবমীর চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গিয়েছে, বাবাঠাকুরতলায় অন্ধকার থমথম করছে। কিন্তু বনওয়ারী দেখতে পাচ্ছে, বাবাঠাকুর বেলগাছটির ডালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাবা, শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না। একবার হাঁক মেরে বল—সাবোধান—সাবোধান। নইলে ইশারা দাও। জানান দাও। চমকিয়ে দিয়ে সকলকে সাবোধান ক'রে দাও। চিরকাল দিয়ে এসেছ বাবা, আজ এই সঙ্কটের সময় তুমি চুপ ক'রে থেকো না। হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় অনেক নজীর আছে। সুচাঁদ বলে—আটপৌরে পাড়ার দল যে-বারে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সে-বারে সাবোধান ক'রে দিয়েছিলেন।

--আনার ঘুরঘুট্টি আত, শাওন মাস, আকাশে অল্প ছিলছেলানি ম্যাঘ। আটপৌরেরা ডাকাতি করতে বার হ'ল। অ্যাই অ্যাই জোয়ান। লাটি ঘোরাচ্ছে যেন বন-বন, বন-বন। তার আগুতে বাবাঠাকুরের হুকুম হয়েছে—চুরি ছাড়, চাষ কর। কাহারেরা চাষ ধরলে ; আটপৌরেরা অক্তের ত্যাজে, মাথার গরমে মানলে না। এক ' ডাকাতি, দুবার ডাকাতি, তিনবার—চারবার ক্ষমা করলেন, পাঁচবারের বার শাওন মাসে যেই ফের বার হবে—এই দুখানা মাঠ পেরালছে, অমুনি কড় কড় ক'রে বাজ পড়ল বাবার দহের ধারে শিমূলগাছের পাশে তালগাছের মাথায়। তবু মানলে না, না মেনেই যেই যাওয়া অমুনি পিতিফল হাতে হাতে। তিনজনা আটপৌরে ধরা প'ড়ে গেল।

চৌধুরী মহাশয়দের যেবারে জাঙল বাঁশবাঁদি মহল নীলাম হয়, সেবারে চৌধুরীদের নাচগানের আসরে আটচালার চালে আগুন জ্বলে উঠেছিল তোমার ইশারায় ; যে আলো চিরকাল আসরে জ্বলত—পঞ্চাশবাতি আলো, সেই আলোই জ্বলছিল, সেই আলোর শিস গিয়ে লাগল দড়িতে, দড়ি বেয়ে আগুন লাগল চালে, পঞ্চাশবাতি আছাড় খেয়ে পড়ল। 'কেরাচিনির' তেল ছড়িয়ে পড়ল, জ্বলতে লাগল। বাবা ইশারা দিয়েছিলেন—সাবোধন ! মা-লক্ষ্মী চঞ্চল হয়েছেন—নাচ গান মদ-মাতালির সময় নয় এখন। কিন্তু কাকে বলছ ? কে শুনছে ? চৌধুরীরা শোনে না—ছ মাসের মধ্যে নীলাম হয়ে গেল সব।

তেমনি ক'রে সাবধান ক'রে দাও। জ্বলে উঠুক করালীর ঘরের চাল, নইলে যারা গিয়ে জুটেছে ওই জাতনাশার আসরে—তাদের চালে। আমাদের ভাঁজোর আসরে আজই সাবধান ক'রে দাও বাবা সকলকে। না না বাবা, গাঁয়ের ভেতরে আগুন জ্বেলো না বাবা। তাতে কাজ নাই। গরিবের সর্বনাশ হবে বাবা। গাঁয়ের ধারে তালগাছের মাথায় ওই পর্‌মার ঘরের কানাচে ওই সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায় বাজ ফেলে দাও। না হয় পর্‌মার ঘরখানা পতিত পড়েছে,—পর্‌মা ফেরার, কালোবউ মরেছে—ওই ঘরটায় আগুন জ্বলে তো জ্বলুক। হ্যাঁ বাবা, তাই জ্বলুক।

পাগল বললে—আর মদ খাস না বনওয়ারী। উঠে আয়। গোপালীবউকে ঘর নিয়ে যা, বে-এক্তার হয়েছে।

নাচতে নাচতে মাতাল হয়ে গোপালীবালা মাটিতে শুয়ে পড়েছে, বমি করছে।

বনওয়ারী উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠেছে, মদ খেয়ে চোখ অবশ্য সকলেরই লাল হয়েছে, কিন্তু বনওয়ারীর চোখে যেন লালের সঙ্গে ভর চেপেছে।

পাগল ভয় পেলে, ভয়ের সঙ্গেই ডাকলে—বনওয়ারী!

বনওয়ারী চোখের ইঙ্গিত ক'রে একটা আঙুলে নির্দেশ দিয়ে কি দেখালে, বললে—কত্তাবাবা, বাবাঠাকুর!

—কি? কি বলছিস?

—সাবোধান!—বাবা বলছে। বনওয়ারী টলতে টলতে চ'লে গেল বাবাঠাকুরের 'থানের' দিকে। সুবাসী নাচতে নাচতে থেমে গেল। বনওয়ারীর পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরল, কিন্তু ভাঁজোতলার দিকে নয়। ওদিকে ভাঁজোতলার সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। পাগল বললে—ভাগ্‌ শালো, বেজায় মদ খেয়েছে! লে—লে, সব গান কর্‌। আমি গোপালীবউকে বাড়িতে শুইয়ে দিয়ে আসি। উঁহু, ও পেল্লাদের বউ, তুমি যাও ভাই, গোপালীবউকে তুমিই ধ'রে নিয়ে যাও।

পেল্লাদের বউ মুচকে হাসল।—কেনে হে? ভয় নাগছে নাকি? অঙের ভয়?

পাগলও হাসল, সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলে—

যে অঙ আমার ভেসে গেল,
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ যেয়ে লেগেছে সই
লালশালুকের ফুলে হে!
(কোপাই নদীর জলে হে!)
সেই শালুকে মন মানালাম
সকল দুখো পাসরিলাম
তোমার মনের অঙের মলা
তুমিও দিয়ো ফেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)

নিত্য নতুন ফোটে শালুক
বাসি ঝ'রে গেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে।)

গান চলতে লাগল। মেয়েরা নাচছে। গোপালীবউ যেমন প'ড়ে ছিল, প'ড়েই রইল। ঘরে ধ'রে নিয়ে যাবার কথা সকলে ভুলে গেল মুহূর্তে।

ওদিকে করালীর আসর খুব জমেছে। ওদের গান হালফ্যাশানের গান। কলের গানের 'র‍্যাবড়ের গান। বাঁশের বাঁশি—বাঁশেরো বাঁ-শি, বাঁশেরো বাঁ-শি—খুব গাইছে মেয়েগুলো নসুবালার সঙ্গে। কিন্তু করালীর বাঁশি শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ করালী চীৎকার করতে করতে ফিরে এল—সাবোধান। সাবোধান। ওই দেখ ওই দেখ।

বাঁশবাঁদির চারিপাশে রাত্রির অন্ধকার ঘন ঘুটঘুটি হয়ে রয়েছে, তারই মধ্যে এক জায়গায় জ্বলজ্বল ক'রে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। ভাদ্র মাসের ভিজে খড়-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ। আগুন। আগুন। বনওয়ারী ধড়াস ক'রে প'ড়ে গেল ভূতগ্রস্তের মত। গোপালী উঠে বসল হঠাৎ। সে মদের নেশায় রাঙা চোখে বিভ্রান্তের মত চেয়ে রইল বনওয়ারীর দিকে।

পুরুষেরা সকলেই ছুটে গিয়ে পড়ল আগুনের ধারে। আটপৌরে পাড়ায়—পরমের ঘরে নয়, রমণের ঘরে। রমনের ঘরও শূন্য প'ড়ে আছে, সে থাকে বনওয়ারীব বাড়িতে। বউ মরার পর থেকেই সে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিয়েছে বনওয়ারীর দাওয়ায়।

আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবে গেল। ছোট ঘরের চালে অল্প কিছু খড় তাও ভিজে, তাতেই আগুন লেগেছে, এদিকে কাহারপাড়া ও আটপৌরে পাড়ার মরদের দল অনেক। আগুন নিবিয়ে আবার সব ফিরল ভাঁজোতলায়।

নয়ানের মা তীব্রস্বরে গাল দিচ্ছে—হে বাবা, সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দাও, যে আগুনে তোমার বাহনকে পুড়িয়েছে, সেই আগুনে সব শ্যাষম্যাস ক'রে দাও।

পাখী বললে—সে কই? সে? মানে করালী।

নসু বললে—তাই তো। সে আবার গেল কমনে?

করালী ফিরল আরও কিছুক্ষণ পরে। কারও কোন প্রশ্নের জবাব দিলে না, নাচতে লাগল, সে কি নাচ। পাখীকে টেনে নিলে সঙ্গে।

বনওয়ারীর চেতনা হ'ল সকালবেলায়। মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা আর একটা আতঙ্ক। গোপালীবালা কেশবেশ এলিয়ে অগাধ ঘুমে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে ঘরের দাওয়ায়। সকালবেলায় ভাঁজো ভাসিয়ে স্নান ক'রে ঢুকল সুবাসী। যুবতী মেয়ে, শক্ত শরীর, মদ খেয়েও সে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ে নাই। বনওয়ারী তার দিকে একবার তাকালে, কিন্তু কোন কথাই বললে না। তার মাথাব মধ্যে ঘুমুচ্ছে যেন একটা ভয়।

সুবাসী তার দিকে তাকিয়ে হাসলে একটু।

স্নান করে এলেও সুবাসীর অঙ্গ থেকে একটা মৃদু সুবাস উঠছে যেন। কিন্তু বনওয়ারীর নাকের কাছে ভনভন ক'রে মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে—মদের গন্ধ উঠছে তার সর্বাঙ্গ থেকে।

ছয়

সমস্ত সকালটাই সে কেমন 'থম্ব' অর্থাৎ অসাড় হয়ে ব'সে রইল। সমস্ত পাড়াটা এখনও নিঝুম। বাসি ভাঁজো অর্থাৎ ভাঁজোর পরদিন এমন নিঝুম কোন কালে হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে ওই রমণের ঘরের ভিজে চালে আগুন লাগায় পাড়ার লোক ভয়ে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে। মদের নেশাকে যতক্ষণ আমোদের মাতন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় ততক্ষণ আমোদে বেশ মেতে থাকে কাহারেরা, কিন্তু মাতন বন্ধ হ'লেই অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মদ খেয়ে পাল্কী কাঁধে চলে দশ ক্রোশ—পাল্কী কাঁধ থেকে নামিয়ে গামছা পেতে শুলেই আসে মরণ-ঘুম।

পাড়ার সকলেই প্রায় সেই কাণ্ডের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। বনওয়ারীর চোখের উপর এখনও স্বপ্নের মত ভাসছে—অন্ধকারে রাত্রির মধ্যে রমণের চালের রক্তরাঙা দগদগে আগুন। আর কানের পাশে বাজছে নিজের কণ্ঠস্বর—সাবোধান—সাবোধান।

তারপর মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল বাবাঠাকুরের থানের দিকে—সেই গভীর রাত্রে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, কে যেন তাকে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

বাবাঠাকুর বললেন—সাবোধান।

বনওয়ারী বলেছিল বাবাকে—ভরা কলি বাবা, একালে মানুষকে মানুষ মানে না। তুমি নিজে মাহাত্ম্য দেখাও বাবা। হাঁক মারো বাবা। বাঁচিয়ে তোল তোমার বাহনকে, তাকে বল বাবা, আকাশে তুলুক ফণা—করালীর, এই পাপ করালীর কোঠাঘরের মাথা নিশ্বেসে জ্বালিয়ে দিক বাবা, আর জ্বালিয়ে দাও পরমের ঘর, ওই ঘরে আছে সর্বনাশী কালোবউয়ের প্রেতাত্মা।

বাবাঠাকুর বলেছেন—হবে হবে। একে একে হবে।

কিন্তু পরমের ঘর না জ্বালিয়ে রমনের ঘর জ্বালালে কেন বাবাঠাকুর?

গরুগুলি ডাকতে শুরু করেছে। মায়েরা ডাকছে, ছায়েরা সাড়া দিচ্ছে, মায়ের স্তনে দুধ জ'মে উঠেছে, বাঁটগুলি টনটন করছে, মায়েরা তাই ডাকছে। অথবা বাচ্চাগুলির ক্ষিদে পেয়েছে—তারা ডাকছে, মায়েরা সাড়া দিচ্ছে। বনওয়ারী এই ডাকে সচেতন হয়ে উঠল। টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল।

মাতব্বরের দায় অনেক। পাড়াকে জাগাতে হবে। ভাঁজো সুন্দরী শালুক ফুলের মালা গলায়, সিঁদুরের টিপ প'রে পায়ে মল বাজিয়ে কোপাইয়ের জলের তলা দিয়ে স্বস্থানে গেলেন, কাহারপাড়ার লোকের আর তো শুয়ে থাকলে চলবে না, উঠতে হবে। ঘর আছে, দোর আছে, গরু বাছুর ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী আছে, ঘরদোর নিকুতে হবে, গরুর দুধ দুইতে হবে, ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী ঘর থেকে ছেড়ে দিতে হবে। দুধের যোগান দিয়ে আসতে হবে চন্নপুরে বাবু মহাশয়দের বাড়িতে। মাঠে সবুজবরণ ধান ডাক দিচ্ছে—আমার আশেপাশে আগাছা জমেছে, তুলে দাও, নিড়িয়ে দাও। জাঙলের সদ্গোপ মনিব মহাশয়েরা রাগে দাঁত কিস-কিস করছেন। ভাদ্রমাসে এই ভাঁজো পরবের উপর তাঁদের ভয়ানক রাগ; চাষের সময় ঢোল বাজিয়ে মদ খেয়ে ধেই ধেই ক'রে নেচে গোটা একটা দিন কামাই

তাঁরা কোনমতেই সইতে পারেন না। একদিন গোটা কামাই গিয়েছে, আবার আজ কামাই হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। মারধোর গালমন্দকে তত ভয় করে না কাহারেরা, ভয় হ'ল পেটের, মনিব যদি ধান 'বাড়ি' অর্থাৎ ধার দেওয়া বন্ধ করেন, তবে সর্বনাশ হবে।

সে প্রথমেই ডাকল গোপালীকে।—বড়কী, ওঠ ওঠ। বড়কী।

গোপালীর তবু কোন সাড়া নাই। একেবারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। কি বিপদ। গাই দুইতে হবে, গরু ছাড়তে হবে। তার নিজের অনেক কাজ, সায়েবডাঙার জমিতে গিয়ে এবার পড়তেই হবে, নইলে আর নিড়ান দেওয়া হবে না। একে ভাঙা মাঠ, তার উপর নতুন জমি, জল শুকুচ্ছে হু-হু ক'রে। আকাশের মেঘ এবার ধরবে। ভাদ্র মাসে ইন্দ্ররাজা পনেরো দিন দেন চাষীকে অর্থাৎ রিমঝিমি জল দেন আর পনেরো দিন দেন চর্মকারকে অর্থাৎ পনেরো দিন দেন কাঠ-ফাটা রোদ, সেই রোদে তারা বর্ষাকালে সংগ্রহ করা চামড়া শুকিয়ে নেয়। রোদ উঠলে দিন পনেরো কুড়ি ভীষণ রোদ হবে। সায়েবডাঙার জল আগে শুকুবে, তখন আর আগাছা টেনে তুলবার উপায় থাকবে না। বনওয়ারীকে সায়েবডাঙায় যেতেই হবে।

বনওয়ারী এবার এগিয়ে এসে গোপালীর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—বড়কী।

গায়ে হাত দিয়ে সে চমক উঠল—ইস, গা পুড়ে যাচ্ছে যে। এত উত্তাপ যে মনে হয়, গায়ে ধান পড়লে ফুটে খই হয়ে যাবে।

বনওয়ারী ডাকলে—বড়কী। গোপালী।

গোপালী রক্তরাঙা চোখ মেললে—অ্যাঁ। তারপর সে হঠাৎ ব'লে উঠল—সাবোধান। শুনে চমকে উঠল বনওয়ারী। সে বললে—কি বলছ? গোপালী ফ্যালফ্যা'ল ক'রে চেয়ে রইল তার দিকে।

বনওয়ারী আবার বললে—জ্বর হলছে। উঠে ঘরে শো। সুবাসী। সুবাসী।

সুবাসী ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কাপড় ছেড়ে।—কি?

—ধর, গোপালীর বেজায় জ্বর।

—জ্বর। সুবাসী মুখ বেঁকিয়ে বললে—হবে না, যে খাওয়ার ধুম। পাগলা-পিরীত—এমুনি বটে।

বনওয়ারী ধমক দিল তাকে।—যা বলছি তাই শোন। ধর—ঘরে শোয়ায়ে দিয়ে দুধ আজ তুই দুয়ে ফেল। অমনকাকাকে বল—গরু মাঠে নিয়ে যাক।

—উঁ—উঁ। তোর গায়ে বাস উঠছে কিসের? অাঁ? গোপালীকে শুইয়ে দিয়েই বনওয়ারী জিজ্ঞাসা করলে।

সুবাসী বললে—গন্ধ কিসের উঠবে। মরণ। মদের গন্ধ উঠছে নিজের শরীর থেকে।

—না, মদের গন্ধ লয়। সুবাস উঠছে।

—তুমি ক্ষেপেছ?

—না।

—হ্যাঁ, তুমি ক্ষেপেছ। কাল এতে কি করেছ মনে আছে? না ক্ষেপলে ওই করে লোকে, না এমুনি বলে—সুবাস উঠছে তোর গা থেকে।

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বনওয়ারী সুবাসীর মুখের দিকে।

সুবাসী বললে—কাল এতে তুমি অমনকাকার ঘর পুড়িয়ে দিলে?

চমকে উঠলে বনওয়ারী।

—জয় বাবাঠাকুর—জয় বাবাঠাকুর—কালোবউ, অপরাধ নিয়ো না, বাবাঠাকুরের হুকুম। —ব'লে বিড় বিড় ক'রে বকছিলে, সব শুনেছি।

বনওয়ারীর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠল। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে সুবাসীর দিকে, মনে হচ্ছিল, চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

সুবাসী ভয়ে পিছিয়ে গেল।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়তে লাগল—না না না।

ঘরের মধ্যে কাতরাচ্ছিল গোপালী—বিড় বিড় ক'রে বকছে জ্বরের ঘোরে।

সুবাসী বললে—যাও, যেখানে যাবে যাও। ভয় নাই। হাসতে হাসতে সে সতীনের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বনওয়ারীর মনে হ'ল, আবার যেন বাবাঠাকুর তার ঘাড়ে 'ভর' করতে চাচ্ছেন। হাত পা কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে, চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে—সাবোধান, সাবোধান। বনওয়ারী ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিলে, তারপর চলল পাড়ার ভিতর। কিন্তু সুবাসটা কিসের?

ভাঁজোতলায় পাগল একলা ব'সে বায়েন ভাইয়ের ঢোলখানা নিয়ে কাঠির বদলে আঙুলের টোকা দিয়ে বাজিয়ে গুনগুন ক'রে গান করছে। বায়েনটা গাছতলায় পড়ে আছে। এখানে ওখানে শুয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে কাহারপুরুষেরা। মেয়েরা ঘুমাচ্ছে ঘরের দাওয়ায়। মেয়েদের মধ্যে নয়ানের মা জেগে ব'সে রয়েছে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। এখনও সে সমানে গাল দিয়েই চলেছে—হে বাবাঠাকুর! তোমার বাহনকে মারলে যারা, তাদের বাড়বাড়ন্ত কেন বাবা? এ কি তোমার বিচার। একবার ক্ষেপে ওঠ বাবা! গাঁয়ের মধ্যে কোঠাঘরের মটকায় আগুন জ্বালো বাবা।

মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর ইচ্ছে হয়, এই মেয়েটার টুঁটি দুই হাতে টিপে ধ'রে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। শুধু এই মেয়েটি সম্পর্কেই নয়, ঝগড়াটে মেয়েদের সম্বন্ধেই তার এই ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ সে ইচ্ছে হ'ল না। করালীকে অভিসম্পাত করছে করুক। ওই জন্যই তাকে সে ক্ষমা করলে।

*   *   *

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কিছু হঠাৎ ঘটে, তাই দৈব। দেবতার রোষ বিনা অপরাধে হয় না—এই কথা শাস্ত্রে আছে, সেই কথাই তারা বিশ্বাস করে। দেবতাদের রোষ হ'লে জানতে হবে, অপরাধ হয়েছে, সে তুমি জেনেই ক'রে থাক আর অজানতেই ক'রে থাক। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বিশ্বাস করে—'কে করলে ব্রহ্মহত্যে, কার প্রাণ যায়।'

গোপালীবালা ওই অসুখে হঠাৎ তিন দিনের দিন মারা গেল। ওই কথাগুলির সবগুলিই বললে লোকে। সকলকেই বললে—হঠাৎ মৃত্যু আর এমন 'সাবোধান সাবোধান' ক'রে চেঁচাতে

চেঁচাতে মিত্যু যখন, তখন দেবরোষ ! দেবরোষের সাক্ষাৎ প্রমাণ—অভদ্রা বর্ষাকালে ভাঁজোর রাত্রে যে ঘরে মানুষ নাই, সেই ঘরের চাল জ্বলে ওঠা। বাবাঠাকুরের ক্রোধ হয়েছে। কিন্তু সে ক্রোধ গোপালীর উপর পড়ল কেন ? কেউ বললে—যখন পড়েছে, তখন নিশ্চয় অপরাধ আছে বৈকি ! কেউ বললে—বনওয়ারীর অপরাধ কেউ দিতে পারবে না। অপরাধ আর কারুর।

নয়ানের মা শুধু কাকে যেন বলছে—নয়ানের ঘর ভেঙে পাখীর সঙ্গে করালীর বিয়ে দেওয়া অধর্ম লয়, অপরাধ লয় ? একশোবার, হাজারবার অপরাধ। তাই দিলেন বাবাঠাকুর ওরও পাতানো ঘর ভেঙে। এ নিচ্চয়, এ নিচ্চয়।

কিন্তু ঘর ভাঙল কই ? গোপালী গেল, সুবাসী আছে। বনওয়ারীর দুঃখ অল্পস্বল্প হবে, কিন্তু দুই সতীনের হাঙ্গামা থেকে তো বাঁচল। অনেক ভেবেচিন্তে তারা বললে—সুবাসীর কপাল, তার চৌকস সুখের কপাল।

নয়ানের মা তার উত্তরে বলেছে—ও সব আমি মানি না। আমি যা বলছি তাই ঠিক। রাবণের মা নেকষার মত ব'সে আছি আমি বেটার মাথা খেয়ে, আমি যে দেখতে পেছি সব। এই তো কলির পেথম সন্‌জে। এই তো আরম্ভ। গোপালী বউ ছিল ভাগ্যবতী, তাই সে আগেভাগে ড্যাঙডেঙিয়ে চ'লে গেল। সাবোধান সাবোধান ক'রে সে শেষকাল পর্যন্ত চেঁচিয়ে গেল কেনে তবে ? বাবার বাহনকে মেরেছে যে তার সাজা হবে না ? পাড়ার মাতব্বর তাকে সাজা দিলে না, মাতব্বরের সাজা হবে না ?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় সবচেয়ে বুড়ী হ'ল সুচাঁদ। করালী আর পাখীর জন্য বসন-সুচাঁদের এখন বনওয়ারীর সঙ্গে ঝগড়া নয় ; বনওয়ারী পাড়ার মাতব্বর, তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাহারপাড়ায় কে বাস করতে পারে ? করালী যে করালী, যে নাকি এখন পল্টনী পোশাক প'রে জুতো পায়ে খটমট ক'রে বেড়ায় মাথায় বেঁকিয়ে টুপি প'রে, পকেটভরা যার রোজগার, সে পারলে বাস করতে এখানে ? ঘরখানা আছে, মাঝে মাঝে আসে, দু দণ্ড থাকে, পরবে পার্বণে এক আধদিন এসে থেকে যায়, তাকে কি বাস করা বলে ? বাস করে না বনওয়ারীর ভয়ে। সুতরাং বনওয়ারীর সঙ্গে রা ঝগড়া বসন-সুচাঁদের নাই। বনওয়ারীও তা করে না, মাতব্বরেরও একটা ধর্ম আছে, সে তা লঙ্ঘন করে না। তবুও মনের মিল নাই। আর প্রতি কাজে বনওয়ারী সুচাঁদের পরামর্শ নেয় না। সুচাঁদও আসে না আগেকার মত হাঁকডাক ছেড়ে প্রতিটি কাজে। বলে না—তু তো কালকের ছোঁড়া রে, আমার বুকে দুধ ছিল তাই পরাণে বেঁচেছিস। আজ কিন্তু সুচাঁদ বসন দূরে থাকতে পারলে না, সুচাঁদই সর্বাগ্রে ছুটে এল বুক চাপড়ে কাঁদবার জন্য। সে কাঁদলে বুক ভাসিয়ে, বলল—কিসের পাপ, কিসের অপরাধ ! কিসের শাপ, কিসের শাপান্ত রে ! পুণ্যবতী ভাগ্যবতী সিঁথের সিঁদুর নিয়ে ভরাভর্তি ভাদর মাসে ড্যাঙড্যাঙিয়ে চ'লে গেল রে ! হাসতে হাসতে চ'লে গেল রে ! ছ মাস সতীন-কাঁটার দুখ ভোগ করলে না রে ! আর আমি প'ড়ে অইলাম রে !

বনওয়ারী চুপ ক'রে শুনছিল। কারুর কোন কথাই সে অবিশ্বাস করতে পারছিল না। সবই মেনেই নিচ্ছে। নয়ানের মায়ের কথা গভীরভাবেই তার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল।

সত্যই তো, অপরাধ যদি না থাকবে, তবে এমনভাবে মরল কেন গোপালীবউ? ভাদ্র আশ্বিন মাসে পিত্তি পড়ে, অম্বল হয়, জ্বরে পড়ে কাহারপাড়ার লোকেরা। বৈদ্যরা বলে—পুরাতন জ্বর ; ডাক্তারে বলে—'ম্যালোয়ারী'। কম্প দিয়ে জ্বর আসে, গলগল ক'রে পিত্তি বমি করে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। 'কুনিয়ান' খায়, পাঁচ দিন সাত দিন পর পথ্য পায়, বিছানা ছেড়ে ওঠে, আবার পনেরো-বিশ দিন পর পড়ে। এ কিন্তু তা নয়। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিকার। বিকার নয়, বাবাঠাকুরের আদেশ—'সাবোধান সাবোধান' ব'লে চীৎকার করলে শেষ পর্যন্ত। বনওয়ারীর মনে পড়ে, ভাঁজোর রাত্রের সেই কথা 'মন্দ স্বপনের' কথার মত। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে পড়ে সুবাসীর কথা। রাগে সর্বাঙ্গে রি-রি করে। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারে না।

আবার সুচাঁদ যখন কেঁদে বলে—পুণ্যবতী ভাগ্যবতী! তখন তাও সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ; সত্যই তো, ড্যাঙড্যাঙ ক'রে চলে গেল। কপালে এককপাল সিঁদুর, পায়ে আল্‌তা দিলে, তার সবচেয়ে ভালো কাপড়খানি প'রে চ'লে যাচ্ছে গোপালীবউ ; চারিদিকে ভরাভর্তি ভাদ্রের শেষ আকাশে রোদ ঝলমল করছে, গোটা হাঁসুলীবাঁকের মাঠে সবুজবরণ ধান দলমল করছে, বাঁশবনের পাতায় গাছপালার ডালে পল্লবে সবুজ থমথম করছে, রোদের ছটায় ঝলক মারছে, পুকুরগুলিতে পদ্মপাতা ফুটেছে, আঙিনাতে স্থলপদ্ম ফুটেছে, শিউলিফুল ঝরছে শিউলিতলায়, কোপাইয়ের জলের রঙ ফিরছে—লাল জল কাঁচবরণ হয়ে এসেছে। হাঁসুলীর বাঁক সবুজ হয়েছে, তাই সোনার হাঁসুলী রূপোর বরণ নিচ্ছে শোভার জন্যে। নদীর কূলে কূলে কাশ 'ফুলিয়েছে' অর্থাৎ ফুল ফুটেছে। জাঙলে চন্ননপুরে বোধনের ঢাক বেজেছে। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ সিংহ অসুর সঙ্গে নিয়ে মা-দুর্গা আসছেন। পুজোর উয্যুগ চলেছে, খামার পরিষ্কার হচ্ছে ; সঙ্গে সঙ্গে আউশ ধান উঠবে—আউশের সবুজ রঙ ফিকে হয়ে 'লালি' অর্থাৎ লালচে আভা ধরেছে। এই ভরাভর্তি হাঁসুলী বাঁকে স্বামীকে রেখে সতীনকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। লোকে ধন্য ধন্য করবে বইকি।

পাগল প্রহ্লাদ রতন—এরাই সকলে শ্মশানে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলে। বসন এগিয়ে এসে আলতা পরিয়ে দিলে। বললে—তুমি ভাগ্যিমানী। আঃ, আমার পেরমায় নিয়ে যদি তুমি বাঁচতে আর আমি যেতাম!

বনওয়ারীর ভারী ভাল লাগল বসনের এ কথাগুলি। বসন বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু করালীর জন্য বসন পর হয়ে গেল।

নসুবালাও এসেছিল। সেও মেয়েদের দলে মিশে কাঁদছে ; —আঃ—আঃ—হায় হায় গো! গোপালীকাকী আমার মাটির মানুষ, সোনার পিতিমে গো! মুখে ঝরত অমিত্তি, কথা শুনে পরাণ জুড়াত, হাতে ছিল কোপাইয়ের ঠাণ্ডা পরশ, বুলিয়ে দিলে রঙ্গ জুড়িয়ে যেত। আঃ, কোথা গেলি মা গো—পাড়ার লক্ষ্মী মা রে!

সুবাসী এক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ নসুবালাই বললে—আঃ সুবাসী, তোর বাছা করণ দেখে শরীলটা রি-রি করছে আমার। বলি—দে, সিঁদুর ঢেলে দে—সতীনের মাথায় সিঁদুর দে, বল্—সোয়ামীর দাবী ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি সিঁদুর দিলাম, আমার সিঁদুর তুমি বজায় একো।

পাগল ডাকলে—বনওয়ারী !

—কি ?

—একখানা নতুন কাপড় চাই যে। শ্মশানে লাগবে। তা বাজারে তো মিলল না। বলে—কাপড় নাই।

বসন বললে—একটা কথা বলব বনোয়ারীদাদা ? করালীর কাছে লোক পাঠাও, সে ঠিক বার করবে কাপড়। কোম্পানীর দোকান আছে কিনা—

—না। বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে বললে—কাপড় দরকার নাই। জাঙলে গিয়ে তাঁতীদের থেকে গামছা কিনে আন।

'যেমন কলি তেমনি চলি'। উপায় কি ? কাল যুদ্ধ লেগেছে। বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। গতবার যুদ্ধ লেগেছিল, কাপড়ের দাম চড়েছিল—পাঁচ টাকা সাত টাকা জোড়া দাম হয়েছিল। এবার যুদ্ধে কাপড়ই নাই, মিলছেই না। গামছা প'রেই যাক গোপালী। তাই যাক। কি করবে বনওয়ারী ! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না।

দাহ শেষ করে ফিরবার পথে সাতবার সাত জায়গায় কাঁটা দিতে হয়। প্রেতাত্মা পিছনে আসে যে ! ঘর-সংসারের মমতা মরলেই কি ছাড়া যায় ? বনওয়ারী বড় বড় বাবলা-কাঁটা দিলে পথে। মনে মনে বললে—গোপালীবউ, তুমি তো পাপ কিছু কর নাই, স্বগ্গে তোমার ঠাঁই হবে ! ঘরের লোভ তুমি ছাড়। তোমার জন্যে আমার অনেক দুঃখ। কিন্তু আমার এখন অনেক কাজ। কাহারপাড়া-আটপৌরেপাড়ার মাতব্বরি আমার ঘাড়ে। আমার—

মাথার উপর গোঙাতে গোঙাতে উড়ে আসছিল একঝাঁক উড়োজাহাজ। চলল বোধ হয় নতুন উড়োজাহাজের আস্তাবলে চন্নপুরের কারখানার পাশে—করালী হারামজাদার এলাকায় ! হ-হ-হ-হ। বুকের ভিতরটা গুরগুর করছে।

গ্রামে ঢুকবার পথে বাবাঠাকুরের থানে সে উপুড় হয়ে শুয়ে মনে মনে বললে—গোপালীর দৃষ্টি থেকে অক্ষে কর বাবা। আমার এখন অনেক কাজ। কিন্তু ওটা কে ? পাখী নয় ? হ্যাঁ, সেই তো ! গ্রামের বাইরে সেই কালোবউয়ের সঙ্গে দেখা-হওয় বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব কথাবার্তা বলছে। খুব হাত-পা নাড়ছে। কি কথা এত ?

যাক, মরুক, যা বলবে বলুক, বনওয়ারীর এখন ওদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা নয়।

একা বনওয়ারীর নয়, শববাহক দলের সকলেরই দৃষ্টি পড়েছিল। পাগল বললে—আঃ, পাখী দেখি কলকলিয়ে বুলি বলছে !

পানা বললে—হাঁ, করালী পড়িয়েছে ভাল, সেই বুলি বলছে ! ভাঁজোর আত্তিরে চন্নপুরে কাজের কথা বলেছে করালী। ছোঁড়ারা চুলবুল করছে সেই দিন থেকে। সেই সব কথা হচ্ছে। নিজে আসে নাই, পাখীকে পাঠিয়েছে।

বনওয়ারী কোন কথা বললে না। যত সে বাড়ির কাছে আসছে, ততই মনে পড়ছে গোপালীবউকে। গোপালীবউ যে তার জীবনটা জুড়ে বাস করত, তাই গোটা জীবনটাই

আজ খালি ব'লে মনে হচ্ছে। যে যা করবে করুক, আজ আর কোন কথা বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না।

বাড়িতে ঢোকবার মুখেই কিন্তু সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। করালী ব'সে রয়েছে তার বাড়ির উঠানে। বনওয়ারী চমকে উঠল। দূর থেকেই সে বেশ দেখতে পাচ্ছে—শরৎকালের শেষবেলার রোদ পশ্চিম মাঠের ঘন সবুজ ধানের উপর প'ড়ে দ্বিগুণ ছটা নিয়ে পড়েছে তার আঙিনার দাওয়ার উপর—খানিকটা গিয়ে পড়েছে খোলা দরজার মুখে ঘরের মধ্যে। সেইখানে ব'সে আছে সুবাসী। বড়ই চতুর সে। 'সান কেড়ে' অর্থাৎ ঘোমটা দিয়ে বসেছে বিনা কারণে। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে করালীর দিকে। করালী বনওয়ারীর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, সে তার দিকে তাকাচ্ছে কি না দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝেছে, সেও সুবাসীর দিকে তাকাচ্ছে। ছোকরা খুব আসর জমিয়ে রেখেছে। চন্ননপুরের শোনা গাল-গল্প জুড়ে দিয়েছে। সায়েব লোকে যুদ্ধ লাগিয়েছে—ইংরাজ আর জার্মানিতে। কামান বন্দুক বোমা, জার্মানি জিতছে, ইংরেজরা হারছে। উড়োজাহাজের লম্বা-চওড়াই গল্প করছে। তার কলকারখানা, ডানা, লেজ—হরেক রকম কথা।

ওরে হারামজাদা! যুদ্ধ জানে বনওয়ারী। ঘোষেদের বাড়িতে সেও শুনেছে। আরও একবার যুদ্ধ লেগেছিল বাংলা একুশ সালে—সেকাল দেখেছে। যুদ্ধ লেগেছে তো তোর বাবার কি? হাঁসুলী বাঁকে তার কিসের গাল-গল্প? ধানচাল আক্রা হবে, কাপড়ের দর চড়বে। হয় হবে, চড়ে চড়বে। 'খানিক-আদেক' দুঃখকষ্ট হবে। মাথায় ধর্মকে রেখে পিতিপুরুষের 'গোনে গোনে' অর্থাৎ পথে পথে সাবধানে বারো মাসে এক এক পাক খেয়ে যে ক'বছর যুদ্ধ চলে কাটিয়ে দেবে। কত্তাঠাকুর রক্ষা করবেন। তাঁর আশীর্বাদে কেটে যাবে কাল সুখে-দুঃখে। হাঁসুলী বাঁকের মাঠে মা লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো নিলেই সকল অভাব ঘুচে যাবে।

বনওয়ারী ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে বললে—করালীচরণ মহাশয় নাকি?

করালী বললে—হ্যাঁ মামা। মামীর মিত্যুর খবর শুনলাম। তা ছুটি না হ'লে তো আসতে পেলাম না। এই এলাম খবর করতে।

—তা বেশ করেছ। তাতে মানা নাই, এসব তো করবার কথাই; করতে হয়। কিন্তু বাপু যুদ্ধ-মুদ্ধ এখানে কেনে? কোথা কোন্ দ্যাশে যুদ্ধ লেগেছে তা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশ-আদাড়ের ভেতরে কাহারপাড়ার কাহারদের কি? উ সব গল্পে তাক লাগিয়ে মেয়েছেলের মনে অঙ ধরানো যায়, কিন্তু উ সব এখানে চলবে না বাপু।

করালী ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললে—তার মানে? এ সব কি বলছ তুমি?

—বলছি ঠিক, তুমি বুঝছ ঠিক। তোমার পরিবার আসছে, ছেলেছোকরার কানে মন্তর দিচ্ছে—পিতিপুরুষের কুলকম্ম ছেড়ে জাতনাশা কারখানায় চল মজুর খাটতে। তুমি আসছ মেয়েদের মনে—

করালী চেঁচিয়ে উঠল—ভাল হবে না বলছি ব্যানোমামা।

বনওয়ারী বললে—জাতনাশা! বেজাত কোথাকার! তোর লজ্জা নাই, তোর মা ওই নাইনে কাজ করতে গিয়ে চ'লে গেল কুল ভাসিয়ে দেশ ছেড়ে, আর তুই ওই নাইনে

কাজ করছিস ? আবার পাড়ার ছোকরাদের মাথা খারাপ করতে এসেছিস ? পয়সার গরমে কোট পেণ্টুল প'রে মেয়েদের কাছে দেখাতে এসেছিস—কত বড় মরদ তু।

করালী উঠে দাঁড়াল, বললে—জাত কার আছে ? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে ? ওই সুচাঁদ বুড়ী ব'সে রয়েছে, বলুক, ওই বলুক, শুনি। জাত ! লজ্জাও নাই তোমাদের ! সদ্জাতের—ভদ্দলোকের পা চেটে প'ড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ ক'রে মুখ বুজে সহ্য কর। লজ্জা ! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা। জাত ! কুলকম্ম ! কুলকম্ম তো জাঙলের চাষীদের মান্দেরি কৃষাণি রাখালি ? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা ! পেটে ভাত জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না। কুলকম্ম ! কুলকম্ম ! তোমার কি ? তুমি মাতব্বর, গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ। লজ্জা ! বুড়ে বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই ? মাতব্বর ! লোকে গতরে খেটে পেট ভ'রে খাবার মত পরবার মত রোজকার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও ! কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে ? কেনে মানবে ? আমি হাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি—যে যাবে কারখানায় খাটতে, আমি কাজ ক'রে দোব। দিন পাঁচ সিকে মজুরি। কোম্পানি দেবে সস্তা চাল, সস্তা ডাল, সস্তা কাপড। যার খুশি চ'লে আয়। ওই বুড়োর কথা মানিস না।

—খবরদার ! হাঁক মেরে উঠল বনওয়ারী। বনওয়ারী লাফ দিয়ে পড়ল এবার, অনেকক্ষণ সে হতভম্ব হয়ে শুনছিল করালীর কথা, করালীব যুক্তি। এমন ধারা মুখের উপর কথা কেউ কখনও বলে নাই, আর এমন অন্যায় অথচ এমন আশ্চর্য যুক্তির কথাও সে কখনও শোনে নাই, তাই সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। 'ওই বুড়োর কথা মানিস না' বলতেই সে সচেতন হয়ে রাগে ফেটে পড়বার মত হয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—খবরদার ! সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে করালীর সামনে এসে খপ ক'রে চেপে ধরলে তার লম্বা চুলের মুঠো। চুলের মুঠো ধরে সে তার মাথাটা টানতে লাগল মাটির দিকে। টেনে মাটিতে তার মাথাটা ঠেকিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেবে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে কপালে চোখ তুলে কাহারপাড়ার বনওয়ারী মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলার আইন নাই। বললে মাথা এমনি ভাবে মাটিতে ঠেকে যায়। নিষ্ঠুর আকর্ষণে টানতে লাগল বনওয়ারী। কিন্তু করালী চন্ননপুরের কারখানায় কাজ করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা ভুলে গিয়ে সোজা মাথায় সেলাম করা অভ্যাস করেছে, তার উপর সেও লম্বা-চওড়া জোয়ান, গাঁইতি-হাঁতুড়ি পিটে শরীর হয়েছে পাথরের মত শক্ত ; যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও করালী ঘাড় শক্ত ক'রে মাথা সোজা ক'রে রাখলে, কিছুতেই নোয়াবে না সে তার মাথা।

দাঁতে দাঁতে টিপে টানলে বনওয়ারী, করালী তবু নোয়াবে না মাথা, ঘাড় যেন লোহার মত কঠিন হয়ে উঠেছে। সে বললে—ছেড়ে দাও মাতব্বর। ছেড়ে দাও বলছি।

বনওয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল—না।

বসন চীৎকার ক'রে উঠল—ব্যানোদাদা ! দাদা !

সুচাঁদ হাউমাউ করতে আরম্ভ করলে ; নসুবালা বুক চাপড়ে 'হায় হায়' করতে লাগল—হায় হায় গো, কি অমানুষের পুরী ! ছাড়িয়ে দাও গো, ছাড়িয়ে দাও ! ওগো, তোমরা ছাড়িয়ে

দাও।

সুবাসীর মাথা থেকে ঘোমটা খ'সে পড়েছে, সে বিস্ফারিত চোখে দেখছে। ঠিক এই মুহূর্তে ছুটে এল পাখী। সে প্রায় পাগলের মত বনওয়ারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর আক্রোশে কামড়ে ধরলে বনওয়ারীর বাহুমূল।

লোকে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। সবিস্ময়ে তারা দেখছে বনওয়ারীর আক্রোশ, করালীর শক্তির পরিচয়। অবাক হয়ে গিয়েছে তারা। পাগল কোথায় ছিল, সে এল এতক্ষণে। সে এল, এসেই ছুটে গিয়ে বনওয়ারীর হাত ধ'রে বললে—বনওয়ারী ! ছি ! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। তোর বাড়িতে তত্ত্ব করতে এসেছে, তোকে জোড়হাত করতে হয়। করছিস কি ? বনওয়ারী !

বনওয়ারীর হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল। করালীর চুল ছেড়ে দিয়ে বলল—যা। ফিরেবারে আর জানে রাখব না তোকে।

করালীর ঘাড় সোজাই ছিল, সে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে মাথার লম্বা চুলগুলোকে পিছনের দিকে ফেলে দিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে—ফিরেবারে তোমাকেও আর খাতির করব না আমি। আজ আমি স'য়েই গেলাম। তুমি মাতব্বর, তোমাকে আমার এই শেষ খাতির। তাও করতাম না। কি বলব, আজ তুমি শোকাতাপা হয়ে রয়েছ। আয় পাখী।

পাখীর দাঁতে ঠোঁটে রক্তের দাগ লেগেছে। বনওয়ারীর হাত কেটে তার দাঁত ব'সে গিয়েছিল। পাখীর হাত ধ'রে যাবার সময় সে আবার হেঁকে ব'লে গেল—চন্ননপুর কারখানায় যারা কাজ করবি, তারা আসিস। আমি ব'লে গেলাম।

সাত

বাবাঠাকুর কর্তাবাবা ! তুমি কি বিরূপ হ'লে বাবা ? বিরূপ হবার কথা বটে, তোমার বাহনকে যে মেরেছে তাকে সে ক্ষমা করেছে। কিন্তু তোমার বাহনকে যে মারলে, তার চেয়েও কি তার বেশি অপরাধ ?

বনওয়ারীর মনে কথাটা প্রায়ই উঁকি মারছে। কাহারপাড়ার ছোঁড়ারা তাকে অমান্য করার লক্ষণ দেখাচ্ছে। তাকে অগ্রাহ্য ক'রে করালী জেদ ক'রে নিত্য সন্ধ্যায় এসে নিজের বাড়িতে আড্ডা জমাচ্ছে। সেখানে গিয়ে জমছে তারা।

আর বনওয়ারীর ঘরে ঢুকেছে কালসাপিনী। সুবাসী কালসাপিনী। তার মতিগতি দেখে বনওয়ারীর সন্দেহ হয়—ও-ই হয়তো কোন্ দিন তার বুকে মারবে ছোবল !

সুচাঁদ পিসী রূপকথা বলত—এক আজার কন্যেকে যে বিয়ে করত সে-ই মরত। কন্যের নাক দিয়ে আত্তিরে সুতোর মতো সরু হয়ে বের হ'ত এক সাপ, বের হয়ে সে ফুলত, কেমে কেমে ফুলে সে হ'ত রজগর। তারপর সে ডংশাত আজকন্যের স্বামীকে।

বনওয়ারী ভাবে, মেয়েটাকে দূর ক'রে দেবে। কিন্তু ভয়ে পারে না। ভয় কালোশশীর প্রেতাত্মার ভয়, ভয় গোপালীবালার প্রেতাত্মার ভয়। তাদের হাত থেকে বাঁচাতে

পারে—সুবাসী। মেয়ের প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচাতে পারে মেয়ের ভাগ্যি—মেয়ের এয়োত। সুবাসীকে বিদায় করলে আবার তাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু এ বয়সে আবার বিয়ে। সে লজ্জা করে তার। তা ছাড়া কাহারদের মেয়ের রীতচরিত সবই প্রায় এক রকম। গোপালীবালার মত আর কজনে হয়? তার উপর তার বয়স হয়েছে; আড়াই কুড়ি হ'ল বোধ হয়। তাকে বিয়ে ক'রে যুবতী কাহার-মেয়ের উড়ুক্কু স্বভাব আরও খানিকটা উড়ুক্কু হবেই। তাই সে সুবাসীকে বিদায় করে না। তা ছাড়া সুবাসীকে ছাড়ব মনে করলেও মনটা কেমন করে। সুবাসী তাকে বোধ হয় গুণ কি বশীকরণ করেছে। সুবাসীর ছলা-কলা অদ্ভুত। তাই, সুবাসীই বুকে তার ছোবল মারবে--সন্দেহ ক'রেও সুবাসীকে কড়া নজরে রেখেছে, ছাড়ে নাই। করালী যখন সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা জমায়, তখন বনওয়ারী সুবাসীকে সামনে নিয়ে ঘরে ব'সে থাকে। প্রহ্লাদ রতন গুপী প্রভৃতি প্রবীণেরা আসে, পানাও আসে- মজলিস হয়। কিন্তু পাগলের অভাবে মজলিস জমে না। কে গান গাইবে, ছড়া বাঁধবে। পাগল আবার চ'লে গিয়েছে 'গেরাম' ছেড়ে। গিয়েছে গোপালীবালার শ্রাদ্ধের পরের দিনই। পাগলের জন্য দুঃখ হয় বনওয়ারীর। পাগলের অভাবে মজলিসে হয় শুধু কাজের কথা। সুবাসীর রমণকাকা তামাক সাজে। কেরোসিন নাই, বিনা আলোতে মজলিস, শুধু ... একটা ধুনি। আঙারের শিখার লালচে ছাপ পড়ে সকলের মুখের উপর। নানা কথার মধ্যে চাষবাসের কথা এসে পড়ে।

চাষের কথা এলে বনওয়ারীর সংশয়, মনের ছমছমানি খানিকটা ঘুচে যায়। এবার দেবতা 'পিথিমী'র ওপর সদয়। হাঁসুলী বাঁকের বাবাঠাকুরও নিশ্চয় সদয়, নইলে পিথিমীতে এত ধান কেন? পিথিমীর মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে আবার সবচেয়ে বেশি ধান। বাবাঠাকুর সদয় না হ'লে এমন হয় কখনও? মাঠভরা সবুজ ধানে কালো মেঘের ঘোর লেগেছে। এক-একটি ধানের ঝাড় দু হাতের মুঠোতে ধরা যায় না।

সকলেই বলে—হ্যাঁ, এবারে বছরের মতন একটা বছর বটে।

পানা বলে-ব্যানোকাকার ভাগ্যের কথা বল একবার। সা বডাঙার জমিতে এবারেই কোদাল ঠেকালে, এবারেই দেখ কি ধানটা পায়।

বনওয়ারী মনে মনে কথাটা স্বীকার করে, কিন্তু মুখে বলে—ভাগ্যি আমার লয়, ভাগ্যি বাবু মাশায়দের, যুদ্ধের বাজারে লাখো লাখো টাকা ঘরে ঢুকেছে আমি শুনেছি। তাদের জমির পাশে আমার জমি, তাতেই—লইলে দেখতিস অন্য রকম হ'ত।

রতন বলে উটি বললে শুনব না ভাই। সায়েবডাঙায় তোমার ধানই সবচেয়ে জোর। তারপর স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে বলে—হ্যাঁ, জবর ধান হয়েছে, গোছা কি।

পানা হেসে বলে-কাকী, এবার কিন্তু নবানে আমাদিগে খাওয়াতে হবে। কথাটা বলে সুবাসীকে। হারামজাদা পানা কম নয়; ছোকরা হয়েও মাতব্বর সাজলে কি হবে, বয়সের বদমায়েশি যাবে কোথায়? কোনমতে সুবাসী সঙ্গে দুটো বাক্য বলবার ফাঁক পেলে হয়। সুবাসীকে উত্তর দেবার সুযোগ দেয় না বনওয়ারী, তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে—আচ্ছা আচ্ছা, পিঠে এবার খাওয়াব।

সুবাসী হাসে, সে বুঝতে পারে বনওয়ারীর মনের কথা। হাসতে হাসতে উঠে যায়,

মৃদুস্বরে ব'লে যায়—মরণ! কাকে যে বলে, সে কথা ঠিক বুঝতে পারে না কেউ।

রাত্রিবেলা জিজ্ঞাসা করে বনওয়ারী—কাকে বললি সে কথাটা?

—কোন্ কথা?

—সেই যি বললি 'মরণ'?

—নিজেকে, আবার কাকে?

—না!

—তবে তোমাকে।

—কেনে?

—কেনে? সুবাসী তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে—তা তুমি বুঝতে পার না? এমনি বোকা তুমি লও। ওই মর্কট পানার সঙ্গে কথা বললে আমি ক্ষয়ে যেতাম নাকি?

বনওয়ারী একটু চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে—পানা যদি মর্কট না হ'ত, করালীর মত অমনি লম্বাচওড়া ফেশানদুরস্ত হ'ত, তবে?

সুবাসী বনওয়ারীর মুখের দিকে সাপের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঠিক সাপের মত। চোখ দুটোই শুধু চকচক করে, মুখের মধ্যে কোন ভাব ফোটে না।

বনওয়ারী প্রশ্ন করে—রা কাড়িস না যে?

সুবাসী কথা না ব'লে উঠে চলে যায় বিছানা থেকে। দাওয়ায় গিয়ে ব'সে থাকে। বনওয়ারীও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকে উঠে গিয়ে সুবাসীকে তোষামোদ ক'রে ফিরিয়ে আনে। একলা ঘরের মধ্যে ভয় অনুভব করে সে। গোপালীবালা, কালোশশী। বেশি ভয় গোপালীকে। প্রথম পক্ষের পরিবার মরলে বিয়ের 'কুম্ কলসী' অর্থাৎ জলভরা ঘট কাঁখে নিয়ে ফেরে। স্বামীর মৃত্যু না হ'লে সে কলসী ফেলতে পায় না। ঠিক মৃত্যুর কিছুকাল আগে সেই কলসী সে ফেলে দেয়। শব্দ ওঠে। কোথাও কিছু পড়ে না, অথচ একটা শব্দ শোনা যায়। পাড়ায় এখন কারও বাড়িতে বাসন পড়ার কোন শব্দ উঠলেই বনওয়ারী চমকে ওঠে, কৌশল ক'রে খোঁজ নিয়ে আশ্বস্ত হয়। সুবাসীকে ছুঁয়ে শুয়ে থাকে। সুবাসী বড় চতুর। বনওয়ারীর মনের কথাটি ঠিক বুঝতে পারে। বলে—ভয় নাই, বড়কী কোণে দাঁড়িয়ে নাই, ঘুমোও। টুঁটি টিপে মারবে না তোমাকে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে, ঘুম আসে না তার। অকালে সে মরবে কেন? তাকে বাঁচতে হবে। ভরাভর্তি সুখের সময় তার এখন। সে এখন পাঁচ পাঁচ বিঘা জমির মালিক। সে জমিতে প্রথম বছরেই প্রচুর ফসল হয়েছে। নতুন বিয়ে করেছে।

সে উঠে বসে। সুবাসীর নাকের কাছে হাতের তালু রেখে নিশ্বাস অনুভব করে। সুতোর মত কিছু বের হচ্ছে কি না পরীক্ষা করে।

অন্ধকার কাটলে সকালে আলো ফুটলে বনওয়ারী হয় বীর বনওয়ারী। ছুটে চলে সে মাঠের দিকে।

* * *

কত কাজ, কত কাজ !

বর্ষা কেটেছে, আকাশ হয়েছে নীলবরণ। মা-দুর্গার চালচিত্তিরের ছবির ফাঁকে নীল রঙের মত ঘোরালো নীল হয়ে উঠেছে। কার্তিকের বাহন ময়ূরের গলার মত ঝকমক করছে। হাঁসুলী বাঁকের মাঠে হাতীঠেলা ধান বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে, সূর্যঠাকুরের রোদ যেন দুধে ধোওয়া। কাহারপাড়ার মরদেরা ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতে ক্ষেতে। দেড় হাত দু হাত উঁচু ধানের জমির মধ্যে ডুব দিয়েছে, হাঁটু গেড়ে ব'সে বুনো দাঁতালের মত চ'লে বেড়াচ্ছে. আগাছা তুলে ভেঙে মুচড়ে পুঁতে দিচ্ছে মাটিতে, প'চে সার হবে।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে আজকাল ব্যাঘাত ঘটছে কাজে ; মাথার উপর দিয়ে বড় বড় ভীমরুলের ঝাঁকের মত গোঁ-গোঁ শব্দ ক'রে উড়োজাহাজের দল চ'লে যায় ; তখন হাতের কাজ ফেলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দেখে। বনওয়ারী পর্যন্ত দেখে।

ওঃ, কাল যুদ্ধ রে বাবা। ওদিকে চন্নপুরে আর সব বাবু মহাশয়দের 'গেরামে' শহরে লেগেছে গান্ধীরাজার কাণ্ডকারখানা। লাইন তুলছে, সরকারী ঘরদোর জ্বালাচ্ছে ; পুলিস-মিলিটারিতে গুলি করছে, গুলি খেয়ে মরছে, তবু ভয়-ডর নাই।

চাল-ধানের দর হু-হু ক'রে বাড়ছে। বলছে—আরও বাড়বে। ধানের দর বাড়লে ভাবনা নাই। এবার ধান প্রচুর হবে। শুধু আশ্বিন মাসটা পার করতে পারলেই হয়। এক 'আচাল' অর্থাৎ এক পশলা বেশ জোরালো জল হ'লেই বাস, আর চাই কি। আধ হাতের চেয়েও লম্বা শীষ বেরিয়ে দিনে দিনে পরিপুষ্ট হ'য়ে পেকে মাটিতে আপনার ভারে শুয়ে পড়বে। এবার মনিবদের দেনাপত্র মিটিয়ে ধান ঘরে আনবে কাহারেরা। বনওয়ারীর ইচ্ছে আছে, করালীকে ডেকে দেখাবে, বলবে—দেখ্ ! কাহারপাড়ার আদি মা-লক্ষ্মীকে দেখে যা। আশা আছে, ছোঁড়ারা যতই চুলবুল করুক এবার হাঁসুলী বাঁকের মা-লক্ষ্মী মাটিকে সেবা করার রস বুঝিয়ে দেবেন তাদের। তবু খটকা লাগছে।

যুদ্ধ তো শুধু ধানের বাজারে আগুন ধরায় নাই। সব কিছুর বাজারে আগুন ধরিয়েছে। কাপড় মিলছে না,—কাপড়ের কথা মনে করতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী। গোপালীবালার শেষ কাজে সে কাপড় দিতে পারে নাই। কাহারপাড়ার মেয়েগুলি চিরদিনের বিলাসিনী, তারা ফুলপাড় কাপড় পরতে ভালবাসে। কিন্তু তারা ময়লা কাপড় প'রে বেড়াচ্ছে।

কেরোসিন নাই। চিনি তারা খায় না, তবু অসুখ-বিসুখে পুজো-পার্বণে দরকার হয়। 'নিউনাইন-বোডে'র কার্ডেও আর পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যায়, দেশেই নাই। এদিকে 'মালোয়ারী' আরম্ভ হয়েছে বেশ জোরের সঙ্গে, কিন্তু 'কুনিয়ন' পাওয়া যাচ্ছে না। শিউলিপাতার রস সম্বল। আশ্বিনের এই কটা দিন যেতে না যেতে পাড়ার শিউলিগাছের পাতা অর্ধেক শেষ হয়ে এল। এখন থেকে জ্বরের আরম্ভ ;—পড়বে উঠবে, আবার পড়বে, দু'একজন মরবে বিকার হয়ে। বেশি মরবে শীতকালে। বুড়ো-ঠারাই মরবে বেশি। চিরকালই এই হয়ে আসছে। এবার ভয়—'কুনিয়ান' নাই। এরই মধ্যে পড়েছে পুজোর কাজ—পুজোর ভাবনা। মা-দশভূজা আসবেন বেটা-বেটী-বাহন নিয়ে, সিংহীর উপর চড়া মা-জননী, তার সমারোহ কত। দেশ করবে কলকল কলকল, ঢাক বাজবে, ঢোল বাজবে, সানাই বাজবে, কাঁসি বাজবে ; নাচবে গাইবে, খাবে পরবে। সে মায়ের ঘরের ওই দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে

লুটিয়ে প'ড়ে বলবে—অক্ষে কর মা, বিপদে আপদে, অণে বনে, জলে মাটিতে অক্ষে কর। ধম্মে মতি দাও, লোভের হাত থেকে বাঁচাও ; আমরা ক্ষুদ্দু মানুষ, আমরা দুই হাতে পূজা করছি, দূর থেকে তুমি পেসন্ন দৃষ্টিতে দেখ, তোমার দশ হাতে আমাদিগে দিয়ে যাও। আমাদের পাপ তাপ সব খণ্ডন কর মা।

দশহাতওয়ালা মেয়ে, সে কি কম। তার পুজো। ঘরদোর নিকুতে হবে। নতুন কাপড় চাই। টাকাপয়সার টানাটানি। গেরস্তাবাড়িতে পুরানো ধান ফুরিয়ে এল, নতুন ধানের দেরি আছে ; এই সময়ে খরচের পালা। এবার এই যুদ্ধের জন্যে বিপদ হয়েছে বেশি। মনিব মহাশয়েরা বেশি ধান দিতে চাচ্ছেন না। ধান বেঁধে রাখছেন। খোরাকির উপর বেশি ধান চিরকাল মনিবেরা এ সময়ে দিয়ে থাকেন। এবার বলছেন—না।

করালীর কথা এক এক সময় সত্যি ব'লে মনে হয়। নিজের গরজ ছাড়া ওরা কিছু বুঝবে না। ধান চালের দর দিন দিন বাড়ছে, সুতরাং কৃষাণদের ধান দেবে না। একেবারে বন্ধ করলে তারাও চাষ বন্ধ করবে—কাজেই পেটে খাবার মত দাও। কাপড় কিনতে হবে, পুজো আসছে—সে বিবেচনা করবে না। রতন কালই বলেছে—বনওয়ারী, আর বুঝি জাত রাখতে পারলাম না। মনিব তো ধানের কথায় তেড়ে মারতে এল। বলে, কাপড় ? কাপড় হ'ল কি না হ'ল দেখবার ভার আমার নয়। তারপর গালাগালের চরম। শ্যাষে গদাগদ মার।

রতনের মনিব হেদো মণ্ডল এমনিই গোঁয়ার। পানার মনিব পাকু মণ্ডল হাতে মারে না, কথায় মারে। ফুরুৎ-ফুরুৎ ক'রে হুঁকো টানে আর বলে—হুঁ ; হুঁ ; হুঁ। 'হুঁ'ই পুড়ে যায়, শেষকালে বার করে হিসেবের খাতা। বলে—বাকিতে তো পাহাড় হয়েছে। এব ওপর বেশি ধান ? তা খাবার মত দিতে হবেই, দোব। বেশি দিতে ব'লো না বাবা, পারব না।

পানা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ছেলেছোকরাবা বনওয়ারীকে বলছে-তোমার কথায় আমরা চাষে লেগেছি। এর উপায় কর তুমি।

আড়ালে গজগজ করছে—এর চেয়ে কারখানায় কাজ করলে বেঁচে যেতাম আমরা।

বনওয়ারী চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জাঙল আর চন্ননপুর যাচ্ছে। জাঙলে যাচ্ছে চাষী মহাশয়দের কাছে, বেশি ধান কিছু দিতেই হবে, আর দিতে হবে সারের দাদন। জমির জন্য সার দেবে কাহারেরা। টাকার দরের চেয়ে এক গাড়ি হিসেবে বেশিই দেবে। নিমরাজী হয়েছেন তাঁরা। আর চন্ননপুরে যাচ্ছে দোকানদারদের কাছে, পুজোর সময় কাপড়ের দাম কিছু কিছু বাকি রাখতে হবে। ধান উঠলেই পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবে কাহারেরা। আমি দায়ী থাকছি।

দত্ত মহাশয় রাজী হয়েছেন। ধানের কারবারের সঙ্গে তাঁর কাপড়ের কারবারও আছে। বাকিটা টাকায় নেবেন না, নেবেন ধানে, পৌষ মাসে। তবে বলেছেন—এই বাজারদরে ধান দিতে হবে।

বনওয়ারী প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। দত্ত মহাশয় কি ক্ষেপে গেলেন। আশ্বিন মাসে ধানের দর বছরের মধ্যে চড়া থাকে, নতুন ধান উঠলেই ধানের দর নেমে যায়। সুতরাং—। হঠাৎ চড়াৎ ক'রে কথাটা মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছে তার ; ধানের দর চ'ড়ে

চলেছে—চ'ড়েই চলেছে, তা হ'লে নতুন ধান উঠলেও ধানের দর নামবে না।

চার টাকা সাড়ে চার টাকারও উপরে উঠবে ধানের দর? এ তো ভূ-ভারতে কেউ কখনও শোনে নাই। ন টাকা চালের মণ। হে বাবাঠাকুর, কালে কালে এ কি খেলা খেলছ বাবা। ওঃ। তার পাঁচ বিঘে জমির ধানে এবার খামার ভ'রে যাবে। বিঘেতে তিন বিশ ক'রে ফলন হ'লে পনেরো বিশ ধান। ভাগের জমিতে ধান হবে তার চেয়ে বেশি, অবশ্য ভাগ হবে মনিবের সঙ্গে; আঠারো-বাইশ ভাগ। চল্লিশ ভাগ করে মনিব পাবেন বাইশ ভাগ, বনওয়ারী পাবে আঠারো ভাগ। তাতেও মনিবের দেনা শোধ দিয়েও ফিরে পাবে সে পাঁচ সাত বিশ। এক এক বিশে দু মণ দশ সের ধান। হিসেব করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায় বনওয়ারীর। বুড়ো রমণকে ডেকে বলে—অমনখুড়ো, হেসেবটা কর দিনি।

বুড়ো দিনরাত ব'সে তামাকই খাচ্ছে—ফুড়ুৎ ফুড়ৎ। কাজের মধ্যে গরুগুলিকে নিয়ে মাঠে যাওয়া। বাস, তারপর কুটোটি ভেঙে উপকার করবে না। ভাত খায় এককাঁড়ি।

বুড়ো বলে—হেসাব? তবেই তো মুশকিলে ফেলালে। আটপৌরে পাড়ার লোকে ধান-চালের কারবার কখনও করেছে? বস্তায় ভ'রে ধান চুরি ক'রে এনেছি, সামালদারের ঘরে ফেলেছি ঠাউকো দাম দিয়েছে। সুবাসীকে বল বরং, উ পারবে, চাষী মাশায়দের বাড়িতে তিন-চার বছর ধান-ভানানী ছিল।

সুবাসী হিসাব মন্দ করে না। পনেরো বিশ, বিশে দু মণ--তা হ'লে দু পনেরো মণ আর পনেরো দশ সের। আঙুল গুনে হিসেব করে। হিসেব শেষ ক'রে হঠাৎ পা ছড়িয়ে ব'সে হাসতে হাসতে বলে—এইবার আমি কাঁদব। হ্যাঁ।

ভারি ভাল লাগে বনওয়ারীর। হেসে বলে—কেনে খুকুমণি, কাঁদবা কেনে? কি চাই?

—এবার পুজোতে আমি ভাল কাপড় লোব—খুব ভাল।

বনওয়ারীও রসিকতা করে-না খুকু, কেঁদো না। আমি নিশ্চয় কিনে দোব, নিশ্চয় দোব।

সুবাসী হিসাব করে আঙুল গুনে—আর পুজোতে আছে রাম-দুই-তিন-চার—

* * *

সে দিনগুলিও ফুরিয়ে এল।

নয়ানের মা আর সুচাঁদের কান্না শুনে বুঝতে পারা যায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার এই হ'ল নিয়ম। পিতিপুরুষেরা ব'লে গিয়েছেন পুজোতে পরবে, বিয়েতে-সাদীতে সুখের দিনে সুখের কথা মনে করতে হয়; যারা ছিল নাকি তোমার আপনজন, যারা তোমাকে ভালবাসত, তুমি যাদের ভালবাসতে, যারা আজ নাই, তাদের মনে ক'রে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলো। টাটকা যারা যায় তাদের কথা আপনিই মনে পড়ে সে শুধু হাঁসুলী বাঁকে নয়—চন্নপুর পর্যন্ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকেরই মনে পড়ে—বুক-ফাটানো কত কথা কান্নার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে, চোখ ফেটে আপনি জল ঝ'রে বুক ভাসিয়ে দেয়। নয়ানের জন্য তার মায়ের কান্না সেই কান্না, গোটা কাহারপাড়াটির পুজোর আনন্দ তাতে লজ্জা পাচ্ছে।

নয়ানকে মনে ক'রে চোখের জলে তার জিভের বিষ আজ ধুয়ে গিয়েছে। কাঁদছে এই পুজো উপলক্ষ্য ক'রে, যে দিন থেকে সে নয়ানকে ডাকছে, সেই দিন থেকে আর কাউকে শাপশাপান্ত করে নাই সে।

সুচাঁদ কাঁদে সেই নিয়মের কান্না। উপকথার হাঁসুলী বাঁকের সে-ই যে আদ্যিকালের বুড়ী। সে তার বাপের জন্যে কাঁদে, ভাইয়ের জন্যে কাঁদে, স্বামীর জন্যে কাঁদে, জামাইয়ের জন্যে কাঁদে, তারপর একে একে কাহারপাড়ার যত মরা লোকের নাম ধ'রে কাঁদে আর পায়ের হাড়ে হাত বুলোয়, পায়ে তার বাতের 'বেথা' 'কনকন' করছে। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করে, আঃ, আমি মরলে আর কাহারপাড়ার এ নিয়ম কেউ মানবে না। কালে কালে 'দ্যাশঘাট' বদলে গেল, তার সঙ্গে গেল মানুষও অনাচারী অধর্মপবায়ণ হয়ে। কথার শেষে আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে বলে—আঃ! আঃ! হায় হায় রে!

আরও বলে—বনওয়ারী আমার পাখীকে করালীকে তাড়ালে—ধরমনাশা কুলনাশা ব'লে। তা চোখ তো আছে, তাকিয়ে দেখুক—ধরমকে কে একেছে, কুলকে কে একেছে। তবে হ্যাঁ, করালীর একটি ঘাট হয়েছে। একশো বার বলব, হাজার বার বলব—ঘাট হয়েছে বাবার বাহনটিকে পুড়িয়ে মারা। বার বার সে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করে সেই মৃত সাপটিকে। প্রণাম করতে করতে হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ ক'রে স্মরণ করে—'চিত্তবিচিত্ত' অর্থাৎ চিত্রবিচিত্র রূপ নিয়ে বাবা পুজোর দিনে ফিরে এস রে! বাঁশবনে শিস দিয়ে ঘুরে বেড়াও মনের সাধে, ব্যাঙ খাও ইঁদুর খাও বাবা রে! গাঁয়ের মঙ্গল কর রে!

বনওয়ারী বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—জ্বালালে রে বাবা! বুড়ী মরেও না!

রতন বললে—উ অমুনি বটে।

—অমুনি বটে—অমুনি বটে! বলতে বলতে রতনের হাত থেকে হুঁকোটা কেড়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করে।

প্রহ্লাদ বলে—তা হ'লে চল একদিন উ-পারের মোষডহরী মউটোয়।

হঠাৎ মাঠের জলের অভাব ঘটে। আশ্বিনের প্রথম থেকেই বৃষ্টি ধরেছে, ক্ষেতের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। অথচ আশ্বিন মাসে ধানের গেটে 'খোড়' হয়েছে, এখন কানায় কানায় ভরা জল চাই। পিতিপুরুষে ব'লে গিয়েছেন—একটি ধানের ঝাড় দিনে পাঁচ ঘড়া জল টানে; মাঠে এবার হাতী-ঠেলা ধান। এ ধান নষ্ট হ'লে কাহারেরা বুক ফেটে ম'রে যাবে। ষোল বছরের পুত্রসন্তান মরলেও এত দুঃখ হয় না। তাই কথা হচ্ছে কোপাইয়ের বাঁধ বাঁধবার। কোপাইয়ের বুকে বাঁধ দিয়ে, কোপাইয়ের জলে মাঠ ভাসিয়ে দিতে হবে। জাঙলের মনিবেরা হুকুম দিয়েছেন। সেই বাঁধের কথা হচ্ছে।

বনওয়ারী অনেক কথা ভাবছে। বাঁধ বাঁধতে গেলেই দু-চারজন যাবে! বাঁধ বাঁধতে জলের ধাক্কায় যাবে, তার উপর আছে দাঙ্গা। বাঁধ বাঁধতে গেলেই নদীর নীচে লোকেরা ফৌজদারি করতে আসবে। আসবে শেখেদের দল। এ সব ছাড়া, করালী নাকি বলেছে—মিলিটারিতে বাঁধ বাঁধতে দেবে না। তারা উড়োজাহাজের আস্তানা করেছে, চন্দনপুরে ঘাটের খানিকটা তফাতে—সেখানে 'পাম্পু' বসিয়ে জল তুলছে। চান করে, উড়োজাহাজ ধোওয়া-মোছা হয়, রান্নাবান্নার বেবাক জল ওই কোপাই থেকে ওঠে। তারা নাকি বাঁধ

বাঁধতে দেবে না।

বনওয়ারীর ধারণা—করালীই লাগান-ভজান ক'রে এইটি করিয়েছে। মনিবেরা বলেছেন—নাঃ, ও-বেটার সাধ্যি কি! তাঁরা গালাগাল দিচ্ছেন যুদ্ধকে আর সায়েব মহাশয়দিগে। তাঁরা বলছেন তাঁরা সায়েবদের কাছে যাবেন। কাহারদের উয্যুগ করতে বলেছেন। আর বলেছেন—পুজোটাও দেখ, মা এবার গজে আসছেন।

বনওয়ারী বললে—আমি বলি অতন, পুজোটা যাক। গজে আসবেন মা। দু-এক আচাল ছিটোবে না গজে? তা'পরে ধর—মোষ পাঁঠা খাবেন মা, মুখ ধুতেও তো হবে।

ষষ্ঠীর দিন উৎফুল্ল হয়ে উঠল কাহারেরা। এসেছে—এসেছে। মেঘ এসেছে।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। 'আউলি-বাউলি' অর্থাৎ এলোমেলো বাতাস বইছে। মধ্যে মধ্যে ফিনফিন্ ক'রে বৃষ্টি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেসে আসছে।

বনওয়ারী উৎসাহভরে কাহারদের বললে—চল্, কাপড় আনিগা চল। আকাশে মেঘ উঠেছে, দত্ত মশায় নির্ভাবনায় কাপড় দেবে।

নসুবালা নতুন শাড়ি প'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হা-হা ক'রে হাসছে। বলছে—আমাদের কি মাঠের পয়সা? আমাদের পয়সা কলির কারখানার। ঝম্-ঝম্-ঝম্—নগদ নগদ। আমাদের কাপড় সম সম কালে নয়, আগে-ভাগে।

যাবার আগে সুবাসী বললে—আমি কিন্তু পাখীর মত কাপড় লোব।

বনওয়ারীর মাথায় যেন রক্ত চ'ড়ে গেল।—কার মতন?

—পাখীর মতন।

—কেনে, কেনে, কেনে? পাখীর মতন কেনে?

অবাক হয়ে গেল সুবাসী। কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। বনওয়ারী দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে—গোসা-ঘরে খিল দিলেন মানিনী। তিন লাথিতে দোব গতর ভেঙে। ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে সে চ'লে গেল। থাক, বন্ধ হয়েই থাক।

দোকানে গিয়ে কিন্তু সবচেয়ে ভাল শাড়িখানি কিনলে। তাতে কিছু বেশি ধার হয়ে গেল দোকানে। দত্ত মশায় পর্যন্ত রসিকতা করলেন। রতন প্রহ্লাদ হাসতে লাগল। ছেলে-ছোকরারা গোপনে পরস্পরের গা টিপে হাসলে। তা হাসুক। মনে মনে একটু লজ্জা হ'ল। দোকান থেকে বেরিয়ে আবার ফিরতে হ'ল। কত্তাবাবার পুজো আছে দশমীর দিন। বিজয়া দশমীর দিন বলি হবে, পুজো হবে। তার কাপড় কিনতে হবে। মনে মনে আসসোস হ'ল—বাবার কাপড় কিনতে ভুল হয়েছিল তার। ছি! ছি! ছি!

এমন কাপড়ও কিন্তু সুবাসী হাসিমুখে নিলে না। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে তার মান ভাঙিয়ে বনওয়ারীকে শেষ স্বীকার করতে হ'ল—কাল সকালে উঠেই সে চন্ননপুরে গিয়ে উড়োজাহাজ-পেড়ে 'অঙিন' কাপড় এনে দেবে পাখীর মতন।

হায় রে কপাল. কাপড়ের পাড়েও এল উড়োজাহাজ।

এবার সুবাসী আড়চোখে চেয়ে হেসে বললে—হুঁ, কাপড়খানা প'রে ফুরুৎ করে উড়ে

যাব।

বনওয়ারী হাসলে। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। সুবাসী এসে তার গলা জড়িয়ে ধরলে এবার। খিলখিল ক'রে হেসে বললে—একা যাব না, তোমাকে সমেত নিয়ে যাব পরীর মতন পিঠে ক'রে।

ভোরবেলায় সুবাসীই তাকে ঠেলে তুলে দিলে। পুজোর ঘট ভরতে যাবার আগেই তার কাপড় চাই। কিন্তু—এ কি ?

আকাশে ঘোর ঘনঘটা। বাতাস বইছে মাতালের মত। শব্দ করছে বুনো দাঁতালের মত। এঃ, দুর্যোগ হবে—বাদলা নামবে। আশ্বিনের শেষ, ধানের মুখে মুখে শিষ। যদি ঝড় হয়। মাথাভারি ধানগাছগুলিকে যদি ঝাপটায় মাঝখানে ভেঙে শুইয়ে জলে ডুবিয়ে দেয়, তবে সর্বনাশ হয়ে যাবে। হে বাবাঠাকুর। যদি আশ্বিনের সেই সর্বনাশা ঝড়ই হয়, তবে বাবাঠাকুর, একবার তুমি আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াও, বাঁশবাঁদির বাঁশের বেড়ে পিঠ দাও, বড় বড় বট পাকুড় শিমূল শিরীষের গাছগুলিকে ঠেলে ধর হাত দিয়ে। মিষ্টি হাসি হেসে অভয় দিয়ে কাহারদের বল—ভয় নাই, আমি ধরেছি শক্ত ক'রে গাছপালার আড়াল, ঝড় উড়ে যাক মাথার উপর দিয়ে, রক্ষা হোক কাহারপাড়ার মনিষ্যিকুল, রক্ষা পাক গরু বাছুর ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী কীটপতঙ্গ, সোজা দাঁড়িয়ে থাক মাঠের গলগলে-থোড়ভরা ধান—কাহারদের লক্ষ্মী। হে বাবাঠাকুর। শুধু বনওয়ারী নয়, গোটা কাহারপাড়া দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল—'দয়' বাবাঠাকুর। অর্থাৎ দোহাই বাবাঠাকুর।

ঝড় বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গাছের মাথা যেন আছাড় খাচ্ছে, বাঁশের ঝাড়ে বাঁশ উপড়ে পড়ছে, কোপাইয়ের জলে তুফান উঠছে, মধ্যে মধ্যে দুটো একটা পাখী ঝাপটায় আছাড় খেয়ে এসে পড়ছে উঠানে দাওয়ায়। যে পিথিমীর বুকে সদাই বাজে পঞ্চশব্দের বাদ্য, সে পৃথিবীতে ঝড়ের গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। দশপূজার পূজা, চারিদিকে উঠবার আগে ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি কাঁসর ঘন্টা শাঁখের শব্দ, তার জায়গায় শুধু শব্দ হচ্ছে—গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, ঝড় গোঙাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে মড়-মড়-মড়-মড়, তারপরই উঠছে প্রকাণ্ড একটা শব্দ। গাছ ভেঙে পড়ছে।

হে বাবাঠাকুর।

এর মধ্যে কে যেন চীৎকার ক'রে বলছে। কে কি বলছে ? কার কি হ'ল ? সুবাসী ঝপ ক'রে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল। বনওয়ারী এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ভাবছিল, সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—নামিস না, নামিস না।

সুবাসী বললে—সেই ডাকাবুকো। লইলে আর এত সাহস কার হবে ?

—কে ?

—ওই যে, নাম করলে তুমি আগ করবা। এই ঝড়ের মধ্যেও সুবাসী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল। বনওয়ারী কঠিন বিরক্তিতে নেমে এল দাওয়া থেকে।

—ঝড় এসেছে। পে—ল—য় ঝড় আসছে, 'সাইকোলন' 'সাইকোলন'—কলকাতা থেকে চন্ননপুরের ইস্টিশানে তার এসেছে। ঘর থেকে কেউ বেরিয়ো না। খবরদার। গায়ে একটা তেরপলের লম্বা জামা আর মাথায় টুপি প'রে হেঁকে বেড়াচ্ছে করালী।

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল—হে বাবা, কত্তাবাবা।

করালী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল—বাবাঠাকুরের ডিঙে উল্টালছে। বেলগাছ উপড়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে—দেখ গা। চেঁচাস না বেশি। ঘরে যা।

বনওয়ারী আতঙ্কে চমকে উঠল।

সুবাসী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। সুচাঁদ ঝড়ের বেগে পা পিছলে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গিয়েছে।

বনওয়ারী তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে। সুবাসী তখন আরও হাসতে লাগল। বনওয়ারী ছুটল সেই ঝড়ের মধ্যেই বাবাঠাকুরের থানের দিকে।

বেলগাছটা সত্যিই আবার উপড়ে পড়ে গিয়েছে। গাঁথুনিটা দু ভাগ হয়ে ফেটে গিয়েছে। বনওয়ারীর সর্বশরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাবাঠাকুরের গাছ উপড়ে পড়ল। নিশ্চয় আর বাবাঠাকুর নাই ; হাঁসুলী বাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতাপুরুষ চ'লে গিয়েছেন। তবে আর কি রইল তাদের ? দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আর দাঁড়াতে পারলে না বনওয়ারী, ব'সে পড়ল ; কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে বাড়ির দিকে।

নয়ানের মা এই ঝড়ের মধ্যে ছেলের জন্যে কান্না ভুলে গিয়েছে, গায়ে কাপড় জড়িয়ে ঝড়-বাদলের আরামে—অলসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে পরমানন্দে বলছে—আরও জোরে বাবা, আরও জোরে। ভেঙেচুরে উপড়ে সব সমান করে দাও। হে বাবা।

ঝড়- ঝড়—ঝড। গোঁ—গোঁ—গোঁ। দেওয়াল পড়ছে, গাছ পড়ছে, বাঁশ পড়ছে। জলের ঝাপটায় সব ঝাপসা। হুড়-হুড় শব্দে জলের স্রোত ব'য়ে চলেছে, কোপাই ফুলে ফুলে উঠছে, নীলবাঁধের মোহনা ভেঙেছে, গোটা হাঁসুলী বাঁকের মাঠ ঘোলা জলে থৈ-থৈ করছে এবারে সেই হাতী-ঠেলা সবুজ-বরণ মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো প্রাণ-মাতানো মাঠ-ভরা ধান জলে ডুবে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে জলের উপরে সবুজ পাতা ভেসে উঠছে, যেন হাত বাড়িয়ে ডাকছে ডুববার আগে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু মা-লক্ষ্মীকে কে তুলবে হাতে ধ'রে ? বাবাঠাকুর নাই, কে তুলবে দেবকন্যেকে ?

আট

তিন দিনের দিন প্রলয় ঝড় শেষ হ'ল। তবু কাহারেরা বাঁচল। চিরকাল বাঁচে। দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা ঝড় কতবার হয়েছে, কাহারেরা মরতে মরতেও বেঁচেছে। এবারও ঝড়ে কয়েকজন মরেছে, ঘায়েল হয়েছে কয়েকজন ; সুচাঁদপিসী পা ভেঙে প'ড়ে আছে হাসপাতালে—করালী তাকে হাসপাতালে দিয়েছে। নয়ানের মায়ের হয়েছিল কঠিন অসুখ। কোন রকমে সেরে উঠেছে। বনওয়ারীই তা - এক মুঠো ক'রে ভাত দিচ্ছে। ঘরদোর গিয়েছে, মাঠভরা ফসল বরবাদ হয়েছে, ফসলের শিষে ধান নাই, তুষ হয়েছে শুধু, শাঁস নাই—খোসা, শুধু খোসা, শুধু খোসা ধরেছে। গাছপালা ডাল ভেঙে ন্যাড়া হয়েছে। বাঁশগুলো শুয়ে পড়েছে। গরু বাছুর ছাগল মরেছে। হাঁস ভেসে গিয়েছে জলের স্রোতে। এর পরেও

যারা বেঁচে রয়েছে, তারা ভাবছে—তাদের বাঁচাবে কে? বাবাঠাকুর নাই, কে তাদের রক্ষা করবে?

বনওয়ারী চেষ্টা করছে। উল্টে পড়া গাছটিকে আবার খাড়া ক'রে গোড়াটা নতুন পাকা মসলা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে। খুব একটা বড় পুজোও দিলে। ফিরে এস বাবা, ফিরে এস।

ওদিকে হাঁ-হাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে পেটের ভাবনা। মাঠের ধান তুষ হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া সে-তুষ গরু-বাছুরেও খেতে পারবে না। ধানেব দর হয়েছে চার টাকা থেকে আট টাকা—চালের মণ ষোল টাকা। ভূ-ভারতে কেউ কখনও শোনে নাই এ কথা, মুনি ঋষিতে ভাবে নাই, পুরাণেও 'নেকা' নাই। যুদ্ধে নাকি খেয়ে নিচ্ছে সব ; মনিবেরা লাফাচ্ছেন, ধান বিক্রি ক'রে টাকা করবেন। কৃষাণদের ধান দেবেন ব'লে মনে লাগছে না। শুধু তাগাদা দিচ্ছেন—তুষ হোক আর যাই হোক, ধান কেটে ফেল।

বুঝতে পারে বনওয়ারী তাঁদের 'রবিপ্রায়টি' অর্থাৎ অভিপ্রায়টি। ধান কাটলে খড় ঘরে উঠবে। খড়ের দরও চরমে উঠেছে ধানের মতই। চল্লিশ টাকা কাহন বিক্রি হচ্ছে, শেষতক একশো টাকা পর্যন্ত উঠবে। বড় ষোল আনাই পাবেন মনিবেরা। কাহারদের শুধু তুষের ভাগ নিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। যুদ্ধে তুষ খায় না?—রতন প্রহ্লাদ এরা সেই প্রশ্ন করে। বনওয়ারীর কিছু প্রত্যাশা আছে। সায়েবডাঙার পাঁচ বিঘে নতুন বন্দোবস্ত নেওয়া জমির খড়টা পাবে। ভাগের জমিরও খড় কিছু পাবে। সায়েবডাঙা উঁচু মাঠের জমি, ওখানকার ধানও সমতল নীচু মাঠের মত জলে ডোবে নাই, ওখানে কিছু ধান পাবে সে। কিছু কেন, ভালই পাবে। কিন্তু অন্য কাহারেরা কি করবে?

পাশাপাশি জমিতে ধান কাটতে কাটতে রতন বনওয়ারীকে প্রশ্ন করলে। তখন কার্তিক শেষ হয়েছে, অগ্রহায়ণের প্রথম। এবার ওই জল-ঝড়ের জন্য শীত এরই মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে, তারপর ক্ষেতে ক্ষেতে এখনও সেই জলস্রোত বয়ে চলেছে : গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবে যাচ্ছে। মাথা কনকন করছে, নাকে টস-টস জল ঝরছে।

—কি হবে বল্ দিনি বনওয়ারী? খাব কি?

বনওয়ারী প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলে না। নিত্যই এই প্রশ্ন তার কাছে করছে পাড়ার লোক। কিন্তু বনওয়ারী তার কি উত্তর দেবে? আশ্বিনের প্রলয় ঝড়ে সব তছনছ ক'রে দিয়ে গেল।

হঠাৎ ছুটে এল প্রহ্লাদের সেই দিগম্বর ছেলেটা—ওগো মাতব্বর গো, এ-ই মেলা সায়েব গো। মটর-গাড়ি গো।

—মেলা সায়েব?

—হ্যাঁ গো, সাথে করালী রইছে।

—কোথা রে?

—জাঙলে। কালারুদ্দুতলায়।

—কালারুদ্দুতলায়?

—হ্যাঁ। কালারুদ্দুর পাট-আগনেতে তাঁবু ফেলছে। আপিস হবে।

—আপিস হবে? হে ভগবান।

—যাবা নাকি ? বানো ?—রতন প্রশ্ন করলে।

—যাব বইকি। চল, দেখি। কি নতুন ঢেউ এল ?

কালারুদ্রের বাঁধানো অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। দশ বারো জন সাহেব। এরা ঠিক করালীর 'ম্যান' নয়। করালী বার বার সেলাম করছে তাদের।

বড় ঘোষও দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁরই বাড়িতে সায়েবেরা গিয়ে বসলেন। বনওয়ারী চুপি চুপি বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রশ্ন করলে বড় গিন্নীকে—কি বেপার ঠাকরুণ ?

—কালারুদ্দুতলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু পড়ছে দেওর।

—কালারুদ্দুতলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু ?

—যুদ্ধের আপিসের নয়। ঠিকাদারের তাঁবু, বাঁশ কিনবে, কাঠ কিনবে—

—বাঁশ, কাঠ ? যুদ্ধে বাঁশ কাঠ লাগে ?

মাইতো-গিন্নী হেসে বললেন—দেওর, তোমার চটকদার দ্বিতীয় পক্ষটিকে সাবধান ক'রো হে। গাছ কাটতে এসে লতা ধ'রে না টান মারে।

বনওয়াবী চমকে উঠল। গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই বাড়ি ফিরিল। সত্যই সুবাসীকে সাবধান। কাল যুদ্ধ ! কাল যুদ্ধ !

আবও দিনচারেক পর। মাঠে ধান কাটতে কাটতে যুদ্ধের কথাই বলছিল সে রতনকে প্রহ্লাদকে।

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক উড়োজাহাজ যাচ্ছিল—সেই দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী কথা বলছিল। পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধে, কতবার বেধেছে, শহরে দাঙ্গা হয়েছে, হৈ-চৈ কলরব হয়েছে, তাতে হাঁসুলী বাঁকের কিছু আসে যায় নাই। শোনা যায়, বড় বড় ভূমিকম্পে শহর ভেঙেছে, হাঁসুলী বাঁকের ছোটখাটো ঘরগুলির তাতেও কিছু হয় নাই। ছোট বাচ্চার মত মায়ের বুক দু'হাতে আঁকড়ে, পৃথিবীর দোলনের সঙ্গে খানিকটা দুলে দিব্যি বেঁচেছে। যুদ্ধ এবার কালারুদ্রের শাসন ভেঙে বাঁশবাঁদিতে ঢুকল। ঘরে ঘরে টান দিচ্ছে। ঢুকিয়েছে করালী। পাপ করালীর কর্ম্মদোষে দেবতারা বিমুখ হয়েছেন। সে তাদের ক্ষমারও একটা সীমা আছে। বাবা কালারুদ্দুও এইবার অন্তর্ধান হবেন। কালারুদ্দুর মন্দিরও ভেঙে এসেছে, তার উপর উঠানে পড়ল যুদ্ধের ঠিকাদারবাবুদের তাঁবু। চন্ননপুর থেকে বাঁশবাঁদির মুখ পর্যন্ত পাকা রাস্তা হচ্ছে, মোটর আসবে। আর বাকি কি রইল ? পাকা রাস্তা ধ'রে মোটর চ'ড়ে যুদ্ধ আসছেন হাঁসুলী বাঁকে। কাঠ—বাঁশ—সব চাই তাঁর ! হে ভগবান হরি ! যুদ্ধে কি না খায় ? বাঁশ-কাঠও খায় ? শোনা যাচ্ছে গরু ছাগল ভেড়া ডিম এ সবও নাকি চালান যাবে। ওই যে চন্ননপুরের পাশে উড়োজাহাজের আস্তানা, ওখানে দৈনিক একপাল গরু ছাগল ভেড়া মুরগী হাঁস লাগবে, ডিম লাগবে ঝুড়ি ঝুড়ি। তাতে অবশ্য কাহারদের কিছু লাভ হবে। ছাগল ভেড়া ডিমের দাম এরই মধ্যে অনেক বেড়েছে, আরও বাড়বে, দু পয়সা ঘরে আসবে। গরু তারা কখনও বেচে না কসাইকে, বেচবেও না। বনওয়ারী তা বেচতে দেবে না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, রাখতে কি পারবে ? কি হবে ?

রতন আবার প্রশ্ন করে—বনওয়ারী ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী বললে—কি বলব অতন ? অদেষ্টের হাল-হদিস কি

আছে, তা বল্ ? নেকনে যা আছে তাই হবে।

—তোমাকে ভাই একটা কথা বলি নাই, তিন ছোঁড়া বউ নিয়ে পালাল্ছে—। লারদ, নোঁদা আর তোমার গিয়ে বেঁকা।

—পালাল্ছে ? কোথায় ?

—কে জানে ভাই, জিনিসপত্ত নিয়ে ভোর এতে পালাল্ছে কাল সনজেবেলায় এসে বলছিল—মনিবের ধান মনিব কেটে লিক, আমি ধানও কাটব না, ভাগও লোব না।

—তা বললে হবে কেনে ? ই যে মহা অল্যায় কথা। আমরাই পারিস এর জন্যে।

—অল্যায় তো বটে। কিন্তু আমরা কি বলব বল ?

—তোমরা বারণ করলে না ?

—বারণ ? বারণ করলে শুনছে কে বল ? তুমি তো বারণ করেছ। শুনলে ?

খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল বনওয়ারী—শুনছে না। যে শুনছে না, সে চ'লে যাক। কিন্তু তোমরা কাল সনজেতে যখন জেনেছিলে তখন আমাকে বল নাই কেনে দেখি ?

--চ'লে যাবে বলছিল সব, তা হাতাআতিই চ'লে যাবে, সে কি ক'রে জানব বল ? তা ছাড়া আত তখন অ্যানেক। তুমি শুয়েছ। এতে ডাকলে তুমি আগ কর।

কথাটার মধ্যে একটু রসিকতা আছে। রাত্রে ডাকলে বনওয়ারী রাগ করে--এ কথার পিছনে তরুণী সুবাসীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। কথাটা কিন্তু অর্ধসত্য। সুবাসীর উপর বনওয়ারীর সেই অবধি প্রখর দৃষ্টি, এবং তরুণী স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কথা মিথ্যা নয় ; কিন্তু আরও খানিকটা আছে, কালোবউ আর বড়বউয়ের প্রেতাত্মার শঙ্কায় রাত্রে সে উঠতে চায় না। কেউ ডাকলে কি বাইরে শব্দ হ'লে সে চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করে—কে ? কে ?

বনওয়ারী ক্রুদ্ধ হয়েই জবাব দিল—কবে ? কবে ? কবে আগ করেছি রে শালো ? কবে ?

গাল খেয়ে রতন বিস্মিত হ'ল। বনওয়ারী তাকে গাল দিলে ?

বনওয়ারী ঘসঘস ক'রে ধান কেটে যেতে লাগল। এ ধরনের ব্যাপারটার সাড়া সে আবছা আবছা পেয়েছিল, কিন্তু এতটা বুঝতে পারে নাই। অভাবের কথা উঠলে সকলেই মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে চন্ননপুরের কারখানার টিনের ছাউনিগুলির দিকে, মা-কোপাইয়ের পুল বন্ধনের দিকে, লাইনের উপর পোঁতা সিগনালের হাতার দিকে, রাত্রে চেয়ে দেখে লাল নীল আলোর দিকে, এ কথা সে জানে। কিন্তু এমন হবে সে ভাবে নাই। মানুষ সব বেচে খায়, ধরম বেচে কেউ খায় না। বনওয়ারী সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল। গোপনে যে এমন ফাটল দেখা দিয়েছে তা বুঝতে পারে নাই। ফাটল ধরেছে, এইবার ধ্বস ছাড়বে। করালী ! করালীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করতে হয়েছে। হয় সে-ই থাকবে, নয় বনওয়ারী থাকবে হাঁসুলী বাঁকে। বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় ঝাঁকি দিলে বারকয়েক। তারপর নীরবেই আবার হেঁট হয়ে ঘস-ঘস ক'রে ধান কেটে চলল।

রতনও দাঁড়িয়েই রইল, সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গতকাল রতনের মনিব হেদো মণ্ডল রতনকে খুব প্রহার করেছেন—অন্যায় ক'রে প্রহার করেছেন। রতনের একটা বাঁশঝাড়কে অন্যায় ভাবে নিজের ব'লে দাবি করায় রতন তার প্রতিবাদ করেছিল, সেইজন্য প্রহার করেছেন। মুখ বুজে প্রহার আর সহ্য হচ্ছে না রতনের। অনেক ঋণও রয়েছে তাঁর কাছে।

ধানের ভাগও সে নেবে না, ঋণও সে শোধ করতে পারবে না। চ'লে যাবে চন্ননপুরে। সে বনওয়ারীকে বললে—তু আমাকে গাল দিলি কেনে?

বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—গাল কি তোকে দিলাম? দিলাম তোর করণকে। তা তুও আমাকে দে কেনে গাল! আমি একবার বলেছি, তু তিনবার বল্—শালো—শালো—শালো!

বনওয়ারী ধান কাটা বন্ধ ক'রে তামাক সাজতে বসল। বাঁশের চোঙার মধ্যে থেকে তামাক, খড়ের নুটি, চকমকি, শোলা বার করলে। বললে—আয়, বস। তামাক খাই।

আলের উপর ব'সে রৌদ্রে ভিজে পা শুকিয়ে বেশ খানিকটা আরাম বোধ করলে। রতন বললে—আঃ! গায়ে সান হ'ল এতক্ষণে।

—লে, খা। হুঁকাটি এগিয়ে দিলে বনওয়ারী। তারপর বললে—আগ কি সাধে হয় অতন! অনেক দুঃখেই হয়। 'সব বেচে সবাই খায়, ধম্ম বেচে কেউ খায় না'। 'ধম্মপথে থাকলে শাক এতে ভাত'। তা কলিকালে কেউ বুঝবে না—সব অধম্মের জন্যে, বুল্লি, সব পাপের জন্যে। কলিকালটাই অধম্মের কাল।

রতন হঠাৎ এক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ক'রে বসল—আচ্ছা, জাঙলের মণ্ডল মাশায়রা বলাবলি করছিল, কলিকালের নাকি শ্যায—এইবারেই শ্যায?

বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে বললে—সেইতো ঘোষ এই এনেছে একটা 'চেতামুনি'।

—কি মুনি?

—চেতামুনি! মুনি বলছেন—এইবারেই কলির শ্যায।

—কি হবে? সব একেবারে লণ্ডভণ্ড ওলোট-পালোট তছনছ হেঁট-ওপর পুড়ে-ঝুড়ে হেজে-মেজে শ্যায নাকি?

—তাও হতে পারে। আবার ধর, আকাশ একেবারে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে সব চেপটিয়ে দেবে—চুরমার ক'রে দেবে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় প্রলয়ের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে পুরানো—আদিম কালের কল্পনা। এবং এইটির চেয়ে কোনটিকেই আজ কলিশেষের উপযুক্ত সংঘটন এবং মহত্তর আধ্যাত্মিক ব'লে মনে হচ্ছে না। বনওয়ারীর মুখে এমনই কিছু শুনতে চেয়েছিল রতন।

বনওয়ারী বললে—লক্ষণ তো সবই দেখা দিয়েছে। এই কি কার্তিক মাসের হাঁসুলী বাঁক? কোথাও কোন চেহ্ন আছে?

কথা সত্য। কার্তিক-অগ্রহায়ণে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পলেনের মাঠের রঙ হয়ে সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস; পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে। গোবিন্দভোগ বাদশাভোগ কনকচুর রামশাল সিঁদুরমুখী নয়ানকল্মা—কত রকম ধানের বাস! এক-এক ধানের এক-এক সুবাস, সকল সুবাসে মিলে এক সুমধুর বাস। সোনার বরণ ধান-ভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাচ-বরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল—কোপাই নদীর বাঁক। কূলে পাকা কাশগুলির ডাঁটায় পাতায় সোনালী রঙের একটি পাড়। পুকুরে পুকুরে পদ্ম -গুলি শুকাতে শুরু করলেও পুরো ঝরে না, অল্পস্বল্প গন্ধও থাকে। খালে নালায় ঝিরঝিরে

ধারা জল বয়, রুপার কুচির মত ছোট ছোট মাছ ঝাঁক বেঁধে নেমে চলে নদীর সন্ধানে। আউশের মাঠে আউশ-ধান উঠে গিয়ে রবি ফসলের সবুজে ভ'রে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, সরষে, মসনে, তিষির অঙ্কুর-রোমাঞ্চ দেখা যায়। হিলহিলে বাঁশবনের মাথা উত্তরে বাতাসে দুলতে থাকে, ক্যাঁ-ক্যাঁ—কট-কট শব্দে, কখনও বা বাঁশীর মত সুর তুলে। আকাশে উড়ে নেচে বেড়ায় নতুন পাখীর দল। বালিহাঁসেরা উড়ে আসে উত্তর থেকে, সবুজবরণ টিয়াপাখীর ঝাঁক আসে পশ্চিম থেকে, কল-কল কলরবে আকাশ যেন নাচনে-মেতে-ওঠা ছেলেমেয়েভরা পূজাতলার আঙিনা হয়ে ওঠে। পাখীর দল রাত্রিবেলা মাঠে নেমে ধান খায়, দিনের বেলা আকাশে ওড়ে, গাছে বসে, কলকল ক'রে বেড়ায়। দুপুরে রোদ চনচন করে, রাত্তিবেলা গা সিরসির করে।

এবার মাঠ এখনও জলে ভরা, শীত এরই মধ্যে কনকনে হয়ে পড়েছে। রোদের তেজ নাই। পাখিরা এসেছে, কিন্তু কেউ থাকছে না, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে চলে যাচ্ছে। ধান নাই, থাকবে কেন? ছেলের দলের মত মাঠলক্ষ্মীর দরবারে প্রসাদ পেতে আসে,—লক্ষ্মী নাই, প্রসাদ নাই, কাজেই চ'লে যাচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে। আউশের মাঠ এখনও জবজব করছে, পা দিলে পা ব'সে যায়, কাজেই মাঠে রবি ফসলের নাম নাই, মাঠ খাঁ-খাঁ করছে, কেমন এক কালচে বর্ণ ধরেছে। বাঁশবন—সেই আদ্যিকালের বাঁশবন, দুলবে কি, শুয়ে পড়েছে উপুড় হয়ে। 'নালাখালায়' এখনও ভরাভর্তি ঘোলাটে জল বইছে হুড়হুড় ক'রে, পুকুরে পদ্ম নির্মূল, সেই প্রলয় জলে পুকুর ভ'রে ডুবে হেজে প'চে গিয়েছে। কাশ বলতে একটি নাই। ঝড়ে বানে শেষ হয়ে গিয়েছে। সকল দুঃখের সেরা দুঃখ, বলতেও গলা ভেরে যায়, চোখ ভ'রে জল আসে, মাঠ-ভরা ধান খড় হয়ে গিয়েছে, সোনার অঙ্গ ঘোলাটে জলের ছোপ লেগে ধুলোকাদামাখা ভিখারিণীর মত নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন। চেতামুনি বলেছে—কলির শেষ। তা মুনি-ঋষির কথা কি মিথ্যা হয়? লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অতন্, তা যদি না হবেন, তাবে বাবাঠাকুর চ'লে যাবেন কেনে?

রতন চাইলে আকাশের পানে। কোথায় কি শব্দ হচ্ছে!

কাহারপাড়ার আকাশময় ডুগডুগ শব্দ উঠছে।

চমকে উঠল রতন বনওয়ারী দুজনেই। ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ শব্দে ঢেঁড়া পড়ছে। কি ব্যাপার? কাহারপাড়াতেই যেন ঢেঁড়া পড়ছে! যেন কেন—নির্ভুল, কাহারপাড়াতেই। কিসের ঢেঁড়া? গ্রামের দিকে তারা ছুটে গেল।

ঢেঁড়া দিচ্ছেন চন্ননপুরের বড়বাবুরা।

সায়েবডাঙার জমি যারা ভেঙেছিল, তারা যেন এবার ধান কেটে বাবুদের খামারে তোলে। খাজনা নেবেন না বাবুরা, ধানের ভাগ নেবেন। সেলামী দিয়ে যারা জমি নিয়েছে, তাদের কথা বাদ। তার মানে জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়েরা, তাঁরা সেলামী দিয়ে পাকা দলিল ক'রে জমি নিয়েছিলেন। কথাটা বনওয়ারী আর আটপৌরেদের নিয়ে।

রতন শুনে বললে—দূরো! আমি বলি, কি বেপার রে বাবা! পিলুই চমকে উঠেছিল। সায়েবডাঙার জমির সঙ্গে তো তার কোন সম্বন্ধ নাই। সেই কারণে ব্যাপারটার গুরুত্ব

নাই তার কাছে। কিন্তু জমি তার মনিব হেদো মণ্ডল নিয়েছেন, সে তাঁর পাকা বন্দোবস্ত। সুতরাং তার এই সময়টাই মাটি। সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরল মাঠে। বনওয়ারী কিন্তু নিজের বাড়ির দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়ে বসল। তার পায়ে আর বল নাই।

কত সাধের সায়েবডাঙার জমি। কি পরিশ্রম ক'রে পাড়ার লোকের শ্রদ্ধার খাটুনি নিয়ে সে যে এই জমি তৈরি করেছে, সে বাবুরা জানেন না ; জানে সে, জানতেন বাবাঠাকুর ; জানেন ভগবান হরি। উঁচু মাঠ ব'লে এবার ওখানে দু'মুঠো হয়েছে। বনওয়ারীর সব ভরসা যে এইবার ওইখানেই।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবু মহাশয়ের হুকুম জারি হয়ে গেল। সে চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে উঠল। কই, সুবাসী গেল কোথায়? ওই এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে সে—নাচুনীর মত স্বভাব মেয়েটার। চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ফড়িং প্রজাপতির মত ফুরফুর ক'রে উড়ে বেড়ায়। এটা যত ভালও লাগে বনওয়ারীর, তত আবার মনের সন্দেহকেও উগ্র ক'রে তোলে। সন্দেহ হয় করালীকে নিয়ে। সে জানে—সে জানে—করালী তার মর্যাদা ইজ্জৎ নষ্ট করতে চায়। ধর্মনাশা করালী। কোন বিশ্বাস নাই তাকে—কোন বিশ্বাস নাই। ক্রমশ তার বিশ্বাস হচ্ছে, তাকে ধ্বংস করাবার জন্যই করালী জন্ম নিয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের সর্বনাশ করতে জন্ম নিয়েছে।

ছোকরা যেমন ফ্যাশানী, তেমনি জোয়ান। সুবাসীকে সে চন্ননপুরের পথে হাঁটতে দেয় না ; কিন্তু করালী সন্ধ্যাবেলা আসে। সে সুবাসীকে ঠায় চোখের সামনে রেখে ব'সে থাকে, তবু সন্দেহ হয়। করালী এসে যখন পাড়া মাতিয়ে হাসে, তোলপাড় ক'রে হল্লা করে, সুবাসী তখন চমকে চমকে ওঠে। সেটুকু বেশ লক্ষ্য করেছে বনওয়ারী। করালীর এই কাহারপাড়া আসাটা বন্ধ করতে পারলে না বনওয়ারী—ওই মহা আপসোস র'য়ে গেল জীবনে। এইটা তার হার—পরাজয়।

সে জেদ ক'রে রোজ সন্ধ্যাতে আসে। প্রহরখানেক থাকে, ছেলে-ছোকরার কাছে ফুসমন্তর দেয়, হল্লা ক'রে চ'লে যায় ; আবার দিনের বেলাতেও কখনও কখনও আসতে কেউ কেউ দেখেছে। বলেছে মিলিটারির কাজে এসেছি। হায় ভগবান, এত লোক ঝড়ে মরল, করালী মরল না।

কিন্তু সুবাসী গেল কোথায়? বুড়ো রমণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে তামাক খাচ্ছিল, সে বললে—কে জানে?

বুড়ো খাচ্ছে দাচ্ছে, বেশ আছে। কোন কাজ করবে না। তার উপর করছে চুরি। ওই তো বেশ দেখা যাচ্ছে, তাঁর ছেঁড়া কাপড়ের তলায় এক মুঠো ধানের শিষ।

এই সময় সুবাসীকে দেখা গেল, নদীর দিকের শুয়ে-পড়া বাঁশবনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল—কাঁখে একটা কলসী, মাথার কাপড় খোলা, খোঁপায় এক থোপা ফুল গুঁজেছে। ছাতিম ফুল।

সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল বনওয়ারীর। এ লক্ষণ তো ভাল নয়।

সুবাসী ঘরে আসতেই ফুলের থোবাটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। পিঠে গোটা দুই কিল বসিয়ে দিয়ে বললে—ফুল গুঁজেছে! খুন ক'রে দোব একদিন। দে, মুড়ি দে।

সুবাসী মেয়েটা আশ্চর্য। সে মার খেয়েও হাসতে লাগল। বললে—নাগরে দিয়েছিল, ফুলের থোবাটা ফেলে দিলা?

—এই দ্যা-খ! আবার? দোব কিল ধমাধম।

—গতরে বেথা করছে। দিলে আরাম পাব।

—খুন হবি তু কোন্‌দিন আমার হাতে।

সুবাসী বললে—তার আগে ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তোমাকেও মেরে দোব আমি। একথা ব'লেও হাসতে লাগল সুবাসী।

আতঙ্কিত হয়ে বনওয়ারী মুড়ির গ্রাস চিবানো বন্ধ করলে। সুবাসী এবার জোরে খিলখিল ক'রে হেসে বললে—মুড়িতে বিষ নাই। মুড়ি খাও। তারপর বললে—তুমি খানিক ক্ষ্যাপা পাগলও বটে। মাতব্বর ব'লে লোকে! মরণ! ব'লে সে গিয়ে আবার ছাতিম ফুলের গুচ্ছটা তুলে নিয়ে মাথায় গুঁজলে।

বনওয়ারী আর কোন কথা না ব'লে খেয়ে চন্ননপুর রওনা হ'ল। জানে কিছু হবে না, হাকিম ফেরে তবু হুকুম রদ হয় না। তবু গেল। এই বছরটার মত বাবুরা ক্ষমা করুন। আসছে বছর থেকে ভাগেই সে করবে।

কাঁধ বেঁকিয়ে ভারী পা ফেলে সে চলল।

জাঙল পার হয়ে খানিকটা এগিয়েই সে শুনতে পেলে—চন্ননপুরে কল-কল শব্দ। এত শব্দ আগে ছিল না। রেল-লাইন হওয়ার সময় থেকে চন্ননপুরের কলকলানি বেড়েছে। এবার আবার ভীষণ কাণ্ড! দোসরা লাইন পাতছে। উড়োজাহাজের আস্তাবলে শব্দ উঠছেই—উঠছেই। ওঃ, বড় ভীমরুলের চাকে ঢেলা মারলে যেমন গজগজ গোঙানি ওঠে, তেমনি শব্দ! মধ্যে মাঝে ফ্যাঁস-ফোঁস রেল-ইঞ্জিনের ফোঁসানি--ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ বাঁশী কান ফাটিয়ে বেজে উঠছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। আলপথের উপর সদ্যভাঙা কয়েকটা পাতা পড়ে ছিল, সেই দিকে সে চেয়ে রইল। ছাতিমপাতা। পিছনেও আরও যেন—একটা দুটো ছাতিমপাতা ফেলে এসেছে। এখানে অনেকগুলি প'ড়ে রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে দাঁড়াবার কথা নয় এতে। কিন্তু বনওয়ারীর মনে প'ড়ে গেল, সুবাসীর চুলে ছাতিম ফুল। তারপরই তার মনে হ'ল, ছাতিম গাছ আছে মা-কোপাইয়ের কূলে। জাঙলে নাই। আর কোথায় আছে? আর? মনে পড়ল না। তা হ'লে সুবাসীর সঙ্গে আরও কেউ ছাতিমতলায় ছিল। হয় সে-ই ছাতিমফুল ভেঙে সুবাসীকে একটা দিয়ে নিজে একটা ডাল নিয়ে এই পথেই গিয়েছে, নয় সুবাসীই ফুল ভেঙে নিয়ে নিজে খোঁপায় গুঁজে অন্য ডালটা যার হাতে দিয়েছে, সে-ই এই পথে গিয়েছে।

কোশকেঁধে বনওয়ারী কাহারের 'হাঁটন' হাঁটতে শুরু করলে। কাঁধে ভার না চাপলে সে কদমে হাঁটা ঠিক হয় না, তবু মনের আবেগে হাঁটলে।

সমস্ত পথে কেউ নজরে পড়ল না। চন্ননপুরে ইস্টিশানে লোকজন অনেক। সেখানে চারিদিক চেয়ে দেখে সে কোন হদিস পেলে না, চিন্তিত মনেই সে বাবুদের কাছারির পথ ধরলে। হঠাৎ দাঁড়াল। কাঁকর-পাথরের পথ। কয়েকটা কাঁকর পাথর তুলে নিয়ে গুনতে

গুনতে চলল। বিজোড় যদি হয়, তবে ছাতিম পাতার সঙ্গে সুবাসীর মাথায় গোঁজা ছাতিম ফুলের কোন সম্বন্ধ নাই—জোড় হ'লে আছে। এক দুই তিন, সাত আট নয়—বিজোড়। আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথের ধারে একটা মোটা পাথর দেখে সে আবার দাঁড়াল। হাতের একটা পাথর নিয়ে ছুঁড়লে। ওই পাথরটায় লাগলে সুবাসীর দোষ নাই। না লাগলে নিশ্চয়ই দোষ আছে। লাগল ঠিক। আবার ছুঁড়লে। এবারেও লাগল। আবার ছুঁড়লে। বার বার—তিনবার। এবার লাগলে বনওয়ারীর আর কোন সন্দেহ থাকবে না। এবার ঠিক লাগল না। তবে খুব কাছেই গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী এগিয়ে এসে ঝুঁকে দেখলে। নাঃ, ঠিক লেগেছে। ঠুই ক'রে না লাগুক, আস্তে 'সন্তুপ্পনে' লেগেছে। যাক, বনওয়ারীর আর সন্দেহ নাই। সুবাসী আপনমনে খুশিতে ছাতিম ফুল ভেঙে চুলে পরেছে, আর-একজন কেউও আপন মনে খুশিতে তুলে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার আর একটা পরীক্ষার কথা মনে হ'ল। সে মনে মনে ঠিক করলে বাবু যদি এবার ধান ছেড়ে দেন, তবে নিশ্চয় সুবাসীর দোষ নাই, ঘরে ধর্ম না থাকলে লক্ষ্মী আসেন না। লক্ষ্মী যদি ঘরে আসেন, তবে নিশ্চয় ধর্ম আছে। আর না হ'লে নিশ্চয় তাই, বনওয়ারী যা ভেবেছে তাই।

* * *

নিশ্চিন্ত হ'ল বনওয়ারী। আঃ। বাঁচল বনওয়ারী।

বাবু বনওয়ারীকে এবারের ধান ছেড়ে দিলেন ; শুধু বনওয়ারীকেই নয়, বনওয়ারীর দরবারের ফলে আটপৌরেদেরও সকলকেই ছেড়ে দিলেন। তবে আগামী বার থেকে ভাগচাষের শর্ত হয়েছে। ডেমিতে কবুলতি লিখে টিপ-ছাপ নিয়েছেন।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়—দলিল নাই, দস্তাবেজ নাই, রেজিস্ট্রী নাই, পাওনার তামাদি নাই। মুখের বাক্যিতে কারবার চ'লে আসছে আদ্যিকাল থেকে, পঞ্চজন সাক্ষী রেখে টাকা দেওয়া-নেওয়া চলে, কেনা-বেচা চলে। তকরার হ'লে কর্তার থানে বেলগাছের শিকড়ে হাত দিয়ে শপথ ক'রে বলতে হয়। কিন্তু বাবুদের দলিল দস্তাবেজ আছে, খাতাপত্র আছে, তাঁদের কারবার উপকথার কারবার নয় ; সন, মাস, তারিখ, দলিলদাতার নাম, তস্য পিতার নাম, পেশা, নিবাস, বিক্রয়ের কারণ, স্বত্ব, শর্ত, নামূল মামূল চৌহদ্দী সকল বিবরণ লিখতে হয়—মায় শরীর সুস্থ, অন্তর খোলসা, এ কথাটিও থাকবে সে দলিলে।

বনওয়ারী বুড়ো আঙুলের তেল-কালি মাথার চুলে মুছে বেরিয়ে এল। জয় ভগবান হরি, জয় ধরমদেব। বনওয়ারীর ধন মান বাঁচালে বাবা। বড় আশার ধন তার। তা ছাড়া সুবাসী যে অন্যায় কিছু করে নাই, তাতে আর তার সন্দেহ রইল না। কোন সন্দেহ নাই। মনে হ'ল, কাল বোধ হয় বাবাঠাকুরের বেলগাছটিতে নতুন পাতার অঙ্কুরও দেখতে পাবে সে। বাবাঠাকুর ফিরবেন। কাছারি থেকে বেরিয়ে দেখলে, বেলা প'ড়ে এসেছে। আসবারই কথা। ও-বেলা জল খেয়ে বেরিয়ে, পথে ঢেলা গুনে, ঢেলা ছুঁড়ে যখন কাছারি এসে পৌঁছেছিল, তখন বারোটা পার হয়ে গিয়েছিল। তিনটের পর কাছারি বসেছে, ততক্ষণ বনওয়ারী খানিকটা শুয়েছে, খানিকটা বসেছে, বার কয়েক আরও কয়েক রকম পরীক্ষা করেছে—ছাতিম ফুলের সমস্যা নিয়ে। বাবুর দরবারে কাজ সেরে খুশি হয়ে বেরিয়ে বেলা

পড়েছে দেখে সে গেল পচুইয়ের দোকানে।

সাহা মহাশয়দের দোকান গাঁয়ের বাইরে পুকুরপাড়ে। পচুই মদের গন্ধে মোহ-মোহ করছে। বাবুরা নাকে কাপড় দেয়, কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ গন্ধ প্রাণমাতানো গন্ধ—নাকে ঢুকলেই জিভে জল সরে, খাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। দলে দলে বসেছে সব। চন্ননপুরের জেলেরা ছোট ছোট দলে বসেছে মাছ-পোড়া নিয়ে। সাঁওতালেরা এসেছে গোসাপ-ইঁদুর-পাখি মেরে নিয়ে, আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে নিচ্ছে। চামড়ার পাইকারেরা গোসাপের চামড়া কিনছে। চারিদিকেই হাঁক উঠছে। ডাক উঠছে। যুদ্ধের বাজারে চামড়ার দর দেখে মনে হয় নিজের অঙ্গের চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করি। মাতন লেগে গিয়েছে অনেকের, গান চলছে—তকরার চলছে, মধ্যে মধ্যে 'ল্যাই'ও অর্থাৎ কলহও লাগছে টুকরো টুকরো। হাঁসুলী বাঁকের লোকেরাও এখানে দল বেঁধে বসত। তাদের জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে। পয়সা নাই, হাঁসুলী বাঁকের লোকেরা মদ খাবে কোথা থেকে? হে ভগবান হরি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী বসল। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের বিক্রম কত এখানে! কতদিন কত দলের সঙ্গে মারপিট ক'রে বাড়ি ফিরেছে। আজ এখানে বসতে ইচ্ছে হ'ল না। এক ভাঁড় মদ কিনে নিয়ে সে ফিরল। পথে খাবে। বাড়ি নিয়ে যাবে না, কাহারপাড়ার মাতব্বর সে, কোন্ মুখে এক ভাঁড় নিয়ে ঢুকবে সেখানে? কাউকে না দিয়ে ঘরের কোণে একা বসে মদ খাবে সে? সুবাসীই যদি এক ঢোক চায়, তবে? পথেই খাবে।

পথ চলতে চলতেই সে মধ্যে দাঁড়িয়ে খানিকটা ক'রে খেতে লাগল। অবশেষে পথের ধারে বড় ডাঙাটার মধ্যে সেই ঝাঁকড়া গাছতলাটা দেখে তার তলায় সে মদটুকু খেতে বসল। মনে পড়ল, এই গাছতলায় কত কাণ্ড করেছে সে! কালোশশী চন্ননপুরে বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, তখন এইটিই ছিল তাদের মিলবার ঠাঁই। এইখানে কতদিন তারা পাল্কী ব'য়ে এসে পাওনা ভাগ করেছে। আগেকার কালে নাকি এই গাছতলাতেই কাহারেরা চুরি করবার আগে জমায়েৎ হ'ত। শেষ কাণ্ড হয়েছে—এইখানেই হয়েছিল তার সঙ্গে পরমের যুদ্ধ।

আঃ, সে সব দিন কোথায় গেল! বাবাঠাকুর চ'লে যাওয়াতেই সব গেল। বাবাঠাকুর-থানের পাতা-ঝরে-যাওয়া বেলগাছটি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। তলাটা সে বাঁধিয়ে দিলে কি হবে, প্রতিদিন গাছটি শুকিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও সে আশা করেছিল, লক্ষ্মী যখন আসবেন তখন ধর্ম আছে, আর ধর্ম যে কালে আছে সে কালে বাবাঠাকুর বোধ হয় ফিরবেন। কাল নিশ্চয়ই সবুজ সূচের ডগার মত অঙ্কুর সে দেখতে পাবে। কিন্তু মদ খেয়ে তার মনে হচ্ছে—না না, আর হবে না। চন্ননপুরে ওই অধর্মের ছটা ঝলমল করছে যে!

আবার সে এক ঢোক মদ খেলে। মদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, খানিকটা আছে মাত্র। দু ঢোক হবে, সেটাতে চুমুক দিতে গিয়ে সে ভাঁড়টা নামালে মুখ থেকে। ভাবতে লাগল, সুবাসীর জন্য এক ঢোক রাখবে নাকি? উঁহু। সুবাসী তো একা নয়, তার কাকা 'অমন' বুড়ো আছে। নয়ানের মা আছে। 'অমন' বুড়োর লম্বা লম্বা কথা। কাজের মধ্যে কাজ—গরু চরায়। আজকাল আবার বুড়ো চোর হয়েছে। বনওয়ারীর ধানের শিষ কেটে নিয়ে দোকানে

দিয়ে বেগুনি ফুলুরি খেয়ে আসে। ওর চেয়েও বেশি চোর হয়েছে নয়ানের মা। লোকের বাড়ি চুরি ক'রে হেঁসেল থেকে তরকারি অম্বল খেয়ে বেড়াচ্ছে। ও দু'জনেই এই সামনের শীতে যাবে। দায় বনওয়ারীর। হায় রে মাতব্বর। সুচাঁদপিসীও যাবে নির্ঘাৎ। সে এখন হাসপাতালে। পা জোড়া দেবে ব'লে রেখেছে, কিন্তু ওই পা কি জোড়া লাগে? কাটবে, কেটে মারবে ওকে। এই একেই বলে—সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। করালী হারামজাদা—মন্দমতি, তার পাল্লায় প'ড়ে অবশেষে গ্যাঙ কেটে ইংরিজী ওষুধ খেয়ে জীবনটা যাবে। সাধে কি বনওয়ারী বলে—ওপথে হেঁটো না।

হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বর কানে এল।

কে? কারা? কারা আবার ঝগড়া লাগালে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাত্রিবেলা? একটি মেয়ের গলা, একটি পুরুষের গলা। 'অঙের খেলা'। হাসলে বনওয়ারী। মেয়েটি রেগেছে, মান করেছে। কে? কার গলা? সোজা হয়ে বসল বনওয়ারী। পাখীর গলা। পাখী বলছে--না না না। তোর সব মিছে কথা। সব মিছে কথা। আমি সব বুঝেছি।

—কি, বুঝেছিস কি? করালী বলছে। ওরা ফিরছে কাহারপাড়া থেকে, সন্ধ্যেবেলার আসর সেরে রোজ যেমন ফেরে।

—আমি সুবাসীর খোঁপায় ছাতিম ফুল দেখেছি।

--ছাতিম ফুল কোপাইয়ের ধারে আছে, পরেছে।

—পরেছে। দিয়েছে কে? তু সকালবেলা 'কাজ আছে' ব'লে চলে গেলি। দুপুরেবেলা ফিরে এলি ছাতিম ফুল নিয়ে। আমার তখুনি সন্দ হয়েছিল, তু নিশ্চয় কাহারপাড়া গিয়েছিলি। আমাকে বললি—নদীর পুলের ধার থেকে এনেছি। কিন্তু তু পুলের ধারেই যাস নাই—আমাকে বলেছে নদীর ধারের গ্যাঙের লোকেরা। তবে তু কোথা পেলি ছাতিম ফুল? সুবাসীই বা আমার মাথায় ছাতিম ফুল দেখে কেন হাসলে, কেনে বললে—তোমাকে ছাতিম ফুল কে দিলে হে? কেনে বললে' সুবাসীর ঘরের উঠানে কেন ছাতিম ফুল পড়ে আছে? কে দিলে তাকে? বুঝি না কিছু, লয়?

—বুঝেছিস বুঝেছিস। জানিস, পোষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশি হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।

পাখী চীৎকার ক'রে উঠল—কি বললি?

সঙ্গে সঙ্গে গাছের অন্ধকার তলাটাই যেন গর্জে উঠল। মনে হ'ল বাঘের মত কোন ভয়ানক জানোয়ার চীৎকার ক'রে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। সে চীৎকারে করালী পাখী ভয়ে চমকে উঠল। অন্ধকার গাছটার ভিতরটায় ঘুমন্ত পাখীরা ভয়ে চমকে উঠে পাখা ঝটপট করতে লাগল। শনশন শব্দ তুলে কয়েকটা বাদুড় উড়েও গেল। করালী চমকে উঠেও চকিতে ঘুরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, হাঁক দিল—কে?

গাঁ-গাঁ শব্দে জানোয়ারের মত গর্জন ক'রে লাফ দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল বনওয়ারী। আকাশ ঘুরছে, মাটি দুলছে, বনওয়ারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুনের শিখা ছুটে বেড়াচ্ছে, আঙুলগুলো হয়েছে লোহার শিকের মত, নখ হয়েছে শড়কির ডগার মত। দাঁতে দাঁতে

ঘষছে, কটকট শব্দ উঠছে। লাফিয়ে প'ড়েই সে খপ ক'রে চেপে ধরলে করালীর টুঁটিটা—ছিঁড়ে ফেলবে, সে ছিঁড়ে ফেলবে। চোখ জ্বলছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে গোঙানি। ক্রুদ্ধ গর্জন।

করালী' মনে হ'ল, তার চোখের সামনে সব বুঝি মুছে গেল। তবু তাকে বাঁচতে হবে। শুধু বাঁচতে হবে নয়, এতদিনের অপমানের শোধ নিতে হবে, কাহারপাড়ার মাতব্বরি ঘুচিয়ে দিতে হবে। তার এতদিনের চাপা রাগ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সহ্য সে করবে না। বনওয়ারীর পেটে সে মারলে এক লাথি। এবার বনওয়ারীকে ছাড়তে হ'ল করালীর টুঁটি।

কয়েক মুহূর্ত দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনের দিকে চেয়ে। বনওয়ারী যন্ত্রণায় কাতর। করালীরও অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা সামলে নিচ্ছে দুজনে। তারপর পরস্পরের দিকে ছুটে এলো বুনো শূয়ারের মত। প্রথমে ছুটল বনওয়ারী, সঙ্গে সঙ্গে করালী। দুই বীর হনুমানের মত পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণে জড়িয়ে ধ'রে পড়ল মাটিতে ; ডুবে গেল গাছতলার সেই অন্ধকারের মধ্যে। আঁচড়, কামড়, কিল, চড়, ঘুষি। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় একদিন যুদ্ধটা শুরু হয়েও শেষ হয় নাই। আজ শেষ না ক'রে ছাড়বে না বনওয়ারী। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের অন্ধকার আকাশপথে ভেসে এসে ওই ঝাঁকড়া গাছটার শাখাপল্লব বেয়ে প্রতি মুহূর্তে তলায় নামছে, ওদের দুজনকে ঘিরে গভীর হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর প্রহারের শব্দ, হিংস্র গর্জন, কাতর মৃদু স্বর শোনা যাচ্ছে শুধু। পাখী মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। নড়তে পারছে না, চীৎকার করতে পারছে না। মাথার উপরে বাদুড় উড়ছে পাক দিয়ে। এদিকে ওদিকে টিক-টিক—টক-টক—কট-কট শব্দে নানা রকমের সরীসৃপ ডাকছে। কিন্তু পাখীর কানে কিছুই যাচ্ছে না, বা দেখতেও পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে।

কতক্ষণ কে জানে। তবে অনেকক্ষণ পর অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। একজন প'ড়ে রইল অসাড় ভাবে।

এতক্ষণে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল পাখী।

যে জিতে উঠে এল সে কে? বনওয়ারী—হাঁসুলী বাঁকের মাতব্বর, কোশকেঁধের ছেলে? সে-ই হওয়াই তো সম্ভব। আজ তো তা হ'লে পাখীর নিস্তার নাই। করালীর প্রিয়া সে। তাকে আজ এই মুহূর্তে সে কখনই রেহাই দেবে না। ধর্ম সমাজ কিছু মানবে না। ছুটে পালাবার মতও শক্তি তার নেই, পা-দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। তবু সে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় ক'রে ব'লে উঠল—তোমার পায়ে পড়ি, বাবাঠাকুরের দিব্যি—

হা-হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠল করালী।—বাবাঠাকুর, না কচু।

—তুমি? আশ্চর্য হয়ে গেল পাখী।

—হ্যাঁ—ব'লেই করালী আবার ফিরল, একটা লাথি মারল বনওয়ারীর মাথায়। তারপর ফিরে এসে বললে—চল।

গায়ে হাত দিয়ে পাখী চমকে উঠল—অক্ত নাকি?

—হ্যাঁ।

সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। ক্ষতবিক্ষত-দেহ বিজয়ী বীর টলতে টলতে চ'লে গেল।

*   *   *

অন্যজনও উঠল, দীর্ঘক্ষণ পরে।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারের প্রাণ অনাহারে, প্রহারে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে, ঝড়ে, বন্যায় সহজে যায় না। সমস্ত জীবনই কাটে অর্ধাহারে। দুর্ভিক্ষে—ফ্যান উচ্ছিষ্ট কুখাদ্য অখাদ্য খেয়েও বাঁচে; দাঙ্গায় মাথা ফাটে, কোদালের কোপে পায়ের খানিকটা কেটে পড়ে, গাছের ডাল ভেঙে ঘাড়ে পড়ে। শয্যাশায়ী হয়ে প'ড়ে থাকে, দীর্ঘদিন ভোগে, লতাপাতা বেটে লাগায়—ধীরে ধীরে সেরে ওঠে; হয়তো অঙ্গের খানিকটা পঙ্গু হয়ে যায়, কিন্তু জীবন সহজে যায় না। বনওয়ারীও উঠল।

কাহারপাড়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোশকেঁধে বনওয়ারী বাবাঠাকুরের পরিত্যক্ত স্থানটিতে টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ে হা হা ক'রে কাঁদতে লাগল। বুক চাপড়াতে লাগল আহত আরণ্য বানরের মতো।

রাত্রি কত, তার ঠিক ছিল না। তবে কৃষ্ণপক্ষ, আকাশে চাঁদ উঠেছে—আধখানা চাঁদ, পোয়া আকাশ পার হয় হয়। বনওয়ারী খানিকটা ব'সে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এসেছে। এসে কত্তার থানে ঢুকেছে। কত্তার বাঁধানো থানটি চাঁদের আলোয় তকতক করছে। বনওয়ারী মাথা ঠুকতে লাগল সেই বেদীর উপর। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল: হা-হা-হা-হা। বুক তার ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ মাথা তুলে চমকে উঠল। সামনেই শেয়ালের মত একটা কি যেন দাঁড়িয়ে। শেয়ালটা হাঁ করতেই তার মুখে দপ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল। আবার জ্বলে উঠল। দপ-দপ-দপ। জ্বলছে আর নিবছে। বনওয়ারীর মাথার ভিতরেও ঠিক এই ভাবে আগুন জ্বলতে লাগল: উঠে দাঁড়াল সে। শেয়ালটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাল। শেয়াল নয় ওটা কখনও নয়। বাবাঠাকুর চর পাঠিয়েছেন। দপদপ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল, ইশারা পেয়েছে সে, বাবার আদেশ। নিঃশব্দে চকমকির চোঙাটা নিতে হবে, সেটা বাইরেই দেওয়ালে ঝুলানো আছে। তারপর উঠতে হবে করালীর কোঠায়। অ-মেরামতি কোঠার উপরে কেউ থাকে না, নিচে থাকে নসুবালা। উপরে উঠে খড়ের নুটিতে আগুন ধরিয়ে—। কোঠাঘর জ্বলবে—চন্ননপুর থেকেও দেখা যাবে। বাবাঠাকুরের আদেশ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। কে? কারা?

—হুঁ হুঁ হুঁ।

—হুঁম্। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

মৃদুস্বরে কারা কথা কইছে ওই শিরীষগাছের তলায়—বাঁশবনের ধারে? কে? কারা? ওরা কারা? বাঁশবনের ধারে তার বাড়ির কোণে? হুঁ। তাকে ঘায়েল ক'রে সে এসেছে সুবাসীর কাছে। আসবারই তো কথা।

সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বনওয়ারী। কুড়িয়ে নিলে একটা পাথর। লোহার অস্ত্র হ'লে ভাল হ'ত। কিন্তু সে ধৈর্যও নাই তার, অবসরও নাই। এই পাথরেই হবে—পাথরই যথেষ্ট।

রেলের পুলের ধার থেকে কুড়িয়ে এনে এটা করালীই তাকে দিয়েছিল অনেকদিন আগে। সেই পাথর। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনে পাথর দিয়ে মাথা ছেঁচার অনেক উপকথা আছে। সুচাঁদ বলে—বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবার বাবা এক লোক তো। সে হ'ল আমার কত্তাবাবা। তা সেই কত্তাবাবা আমার পেথম কত্তামায়ের—মানে, তার পেথম পরিবারের ঘর থেকে আটপৌরেদের একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখে শিল নোড়ার নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছিল। পরিবারের বুকে বসে নোড়া দিয়ে--

শুধু পরিবার সুবাসীর নয়—একটা নয় দুটো ছেঁচতে হবে। করালীর মাথা সমেত ছেঁচবে সে। আগে করালীর। তারপর সুবাসী। আকাশে আধখানা চাঁদ সত্ত্বেও, বহু পুরাতন বটপাকুড়-শিরীষের নিবিড় পল্লবের ঘন ছায়া—পাশের বাঁশবনের ছায়ার সঙ্গে মিশে সে যেন অমাবস্যার অন্ধকার। হাঁসুলী বাঁকের আদ্যিকালের অন্ধকার আদিকাল থেকে এখানে থমথম করছে। এখানে শুক্লপক্ষ নাই। পূর্ণিমা নাই। চিরদিনের অমাবস্যা এখানে। অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে নোড়াটা হাতে এগিয়ে চলল বনওয়ারী। শিরীষ গাছের অদূরে দাঁড়াল—কই ? কোথায় ? খুব আস্তে হুঁ হুঁ শব্দে কথা তো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একসময়ে উৎকণ্ঠিত বনওয়ারীর মদের নেশার ঘোরে অর্ধ আচ্ছন্ন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট যেন বেরিয়ে এল দুটি ছায়াছবি। স্পষ্ট দেখলে। বনওয়ারীর বুকটা লাফিয়ে উঠল। ওই—ওই চলেছে করালী আর সুবাসী। চলল সে পিছনে পিছনে। ওই চলেছে। ওই চলেছে -ওই। এইক্ষণে তার চিত্তলোকে প্রস্তরযুগের আবেগ-বিশ্বাস-উচ্ছ্বাস বাসা গেড়ে বসেছে। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে পীড়িত-হৃদয়াবেগ-প্রভাবিত কল্পনার দুটি মূর্তি স্পষ্ট এগিয়ে চলেছে। চলছে চলুক ; কতদূর যাবে। বাঁশবন শেষ হয়ে এল। এবার দাঁড়াল সে। কই তারা, কই ? হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে দুটো বড় পাখী হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দ ক'রে পাখা বিস্তার ক'রে উড়ে গেল তার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে। সে চমকে উঠল। ঠিক মনে হ'ল, মূর্তি দুটিই যেন অকস্মাৎ চন্দ্রালোকিত শূন্যলোকের শুভ্র স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে ভেসে চ'লে গেল। ক্রমশ উঁচুতে উঠে তারা সামনের কোপাইয়ের ধারে—দহের উপরে সেই শিমূল গাছটার ডালে গিয়ে বসল।

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল বনওয়ারী। শূন্যে ভেসে গেল। তবে—তবে তো করালী সুবাসী নয়! কে ? ওরা কে ?

ও দুটো নিশাচর পাখি। এ দেশে বলে হুমহুমে পাখি। ওরা রাত্রে এমন মুখোমুখি ক'রে ব'সে—'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুম হুঁ্যা-হুঁম' শব্দ করে যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা কয়। বনওয়ারী একথা জানে। কিন্তু আজ বনওয়ারীর মনে পক্ষবিস্তার ক'রে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ—সে আকাশের নীচে আদিমযুগের পৃথিবীতে বিচরণ করছে সে। তাই পাখী দুটো উড়ে গিয়ে শিমূলগাছে বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মত অন্য কল্পনা খেলে গেল। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কল্পনা। সম্মুখে জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে কোপাইয়ের চরভূমি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—কেউ কোথাও নাই। কিন্তু সে তো অন্ধকারের মধ্যে দুটি মূর্তি স্পষ্ট দেখেছে। স্পষ্ট কথা তাদের কইতে শুনেছে। অথচ আর কেউ নাই। কৃষ্ণমূর্তি দুটি অশরীরী হয়ে উড়ে গেল। রহস্যময় পক্ষ বিস্তার ক'রে ওই শিমূলগাছের ডালে গিয়ে বসল। ওই দহে মরেছে কালোশশী। ওইখানে পুড়িয়েছে গোপালীকে—। তবে কে, কে ওরা ? তবে কি— ?

আবার কেঁপে উঠল বনওয়ারী। কালোশশী? গোপালীবালা? তারাই কি দু'জনে তাকে আজ নিতে এসেছে? দেখাচ্ছে ওই শিমূলতলার শ্মশানভূমি? আতঙ্কের মধ্যে তার অন্ধবিশ্বাসী মন স্মরণ করলে তার হাতে বাঁধা মা-কালীর বাবাঠাকুরের মাদুলী দুটিকে। সে ডান হাতের কনুইটা নিজের বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। কই, মাদুলী কই? নাই তো! নাই তো! করালীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যে মাদুলী ছিঁড়ে প'ড়ে গিয়েছে। কি হবে? কে আজ রক্ষা করবে? বাবাঠাকুর নাই। বেলগাছ শুকিয়ে গিয়েছে। কাকে ডাকবে সে? আকাশ বেয়ে বিরাট সর্পবাহনে চ'ড়ে বাবাঠাকুর চ'লে গিয়েছেন। কে বাঁচাবে? অসহায় বনওয়ারীর চোখের সামনে শিমূলগাছের ডালে ব'সে গোপালী ও কালোশশী কথা বলছে—হুম—হুম্—হুম্—

হুঁ—হুঁ—হুম্—হা-হা—হা। উচ্চ শব্দে একটা পাখী ডেকে উঠল এবার। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চীৎকার ক'রে বনওয়ারী প'ড়ে গেল সেইখানে। জ্ঞান হারিয়ে গেল। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনের ওদিকে বসতির মধ্যে কাহারেরা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছে। এদিকে হেমন্তের শেষরাত্রে কোপাইয়ের জলের বুকে শরতের হালকা সাদা মেঘের মত কুয়াসা জেগে উঠেছে; চরভূমিতেও সেই সাইক্লোনের প্রচণ্ড বর্ষণসিক্ত গলিত পত্রজঞ্জাল ভরা মাটিতেও জেগে উঠছে অনুরূপ কুয়াসার এক-একটা পুঞ্জ, সে পুঞ্জ আশ্রয় করছে ঝোপঝাড়গুলিকে। তেমনি একটি কুয়াসার আস্তরণ হাঁসুলী বাঁকের বীর কোশকেঁধে বনওয়ারীর বিশাল দেহখানিকে ঘিরে ক্রমশ জেগে উঠতে লাগল।

শেষ পর্ব

সুদীর্ঘ ষাট দিন, অর্থাৎ দু মাস পর।

হাঁসুলী বাঁকের চারিপাশে কোপাই নদীর বাঁকে বাঁকে বি[illegible] শব্দ উঠছে খট-খট-খট-খট। সে শব্দ ছুটে চ'লে যাচ্ছে নদীর গর্ভের মধ্য দিয়ে; ছুটে গিয়ে ওদিকের বাঁকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার এদিকে ফিরে আসছে। অকস্মাৎ শান্ত হাঁসুলী বাঁক শব্দমুখর হয়ে উঠেছে।

রোগশয্যার উপর বনওয়ারী আজ উঠে বসল। ষাট দিন শয্যাশায়ী ছিল; তার মধ্যে পঞ্চাশটা দিন কেটেছে চৈতন্যহীন অবস্থায়। চামড়া-ঢাকা মো[illegible] হাড়ের কাঠামোখানা শুধু নিয়ে কোনোমতে সে উঠে বসল আজ।

ষাট দিন আগে কোপাইয়ের কূল থেকে জ্বরে অচেতন অবস্থায় কাহারেরা তুলে ঘরে এনেছিল। কারণ কেউ জানে না। বনওয়ারী কিছু বলবার অবস্থা ছি[illegible] না। তবে প্রলাপের মধ্যে শুধু চীৎকার করেছে—বাবাঠাকুর, অক্ষা কর। আর চীৎকার করেছে—ওই কালোশশী, ওই গোপালী! আঃ—আঃ—ওরে আমি যে উড়তে পারি না!

চিকিৎসা! সে না-চিকিৎসা। জাঙলের সদ্‌গোপ কবিরাজের ওষুধ। কবিরাজ ষাট দিনের

মধ্যে পাঁচ দিন ঘাড় নেড়ে বলেছেন—রাত পার হবে না বাপু।

তবু বনওয়ারী বেঁচে উঠে বসল। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে সবল জীবনীশক্তি-আহরণ-করা কাহার-মাতব্বরের জীবন, এত সহজে যাবার নয় ব'লেই বাঁচল। কিন্তু না বেঁচে এর চেয়ে মরলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। বনওয়ারী আজ নিজেই বললে এ কথা।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার বেঁচে লাভ কি? কেন বাঁচালি আমাকে?—ব'লে বার বার সে গভীর হতাশায় ঘাড় নাড়লে। চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ল হাঁসুলী বাঁকের মাটির বুকে।

কথাটা বনওয়ারী সত্যই বলেছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। চিরকালের মত শেষ হয়েছে কিনা, সে কথা বলা অবশ্য যায় না; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, শেষ হয়েছে বা হবে-হবে করছে।

পাপের ফলে দেবতা চ'লে গেলেন। বাবাঠাকুর চ'লে গিয়েছেন, কালারুদ্রের মন্দিরে যুদ্ধের আপিস বসেছে। কালারুদ্রও চ'লে গিয়েছেন। যুদ্ধ—কাল যুদ্ধ।

বনওয়ারীই বললে। মৃদু স্বরে গভীর দুঃখের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলে, বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। বললে-যুদ্ধ লেগেই হাঁসুলী বাঁককে সেরে দিয়ে গেল। হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে। মর্মান্তিক আক্ষেপ যেন ঘাড় নেড়ে সমস্ত হাঁসুলী বাঁকে ছড়িয়ে দিতে চাইলে সে।

পঞ্চাশ দিনে জ্বর ছেড়েছে, কদিন থেকেই অল্পস্বল্প চেতনা হচ্ছিল তার। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় ক্ষীণ দুর্বল। চোখ মেলে চেয়ে দেখেও যেন কিছু বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার চোখের পাতা কিছুর ভারে যেন নেমে পড়ে সে ঘুমিয়ে পড়ছিল। ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে চেতনা স্পষ্ট হয়ে এল।

তার বিছানা—বিছানা একখানা ছেঁড়া কাঁথা—সেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নসুবালা। হ্যাঁ তো, নসুবালাই। চেতনা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সে শুধু তাকেই দেখছে। সে গোঁফ-কামানো মুখ, মেয়েদের মত ভঙ্গিতে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরা, মাথায় খোঁপা বাঁধা, হাতে চুড়ি নোয়া শাঁখা পরা নসুবালা তার বিছানার পাশে অহরহ রয়েছে। সুবাসীকে দেখতে পাচ্ছে না। প্রথম কয়েকদিন মনে কোনও প্রশ্ন জাগে নাই, শুধু অতিপরিচিত কাউকে যেন পাচ্ছে না ব'লে মনে হয়েছিল। আর-একজনকে মধ্যে মধ্যে আবছা চিনতে পারছিল--পাগলকে। পাগল? মিতে?

প্রথম দিন সে চোখ মেলে চাইতেই নসুবালা তার মুখের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল--সোর হয়েছেন? চিনতে পারছ আমাকে?

--না। ঘাড় নেড়েছিল বনওয়ারী। তারপর পাগল এসে পাশে বসেছিল। ব্যানো। ব'লে পরম স্নেহে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। বনওয়ারী তবুও তাকে চিনতে পারে নাই।

দ্বিতীয় দিন সে পাগলকে চিনেছিল। নসুবালাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল--সুবাসী? নসু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে নসুকে চিনেছিল, বলেছিল--নসুবালা?

নসু একমুখ হেসে বলেছিল—চিনতে পেরেছ আমাকে? আঃ, বাঁচলাম। পরাণটা আমার উদ্‌ব্যাগে খলবল করছিল। আঃ, সেই শূরবীর মানুষ গো।

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে খুঁজে না পেয়ে বনওয়ারী জিজ্ঞাসা করেছিল—সে কই?

কথাটা শুনেই পাগল উঠে চ'লে গিয়েছিল। নসু প্রশ্ন করেছিল—কে?

—সুবাসী।

—সে আছে। আসছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নসুবালা বলেছিল—গিয়েছে কোথা। আসবে।

কিন্তু সুবাসী এল না। সমস্ত দিন চ'লে গেল—তবু এল না। বনওয়ারী বুঝতে পারলে এবার। আর জিজ্ঞাসা করলে না সে। কাহারপাড়ার উপকথার ধারা তো সে জানে। শুধু কাঁদলে খানিকটা। নসু বললে—কেঁদো না। চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটু জল দিলে তার মুখে, বললে- জল খাও এক ঢোক। তারপর ছড়া কাটলে—'বেঁচে থাকুক চূড়োবাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী'। ঝাঁটা মারি তার মুখে।

বনওয়ারী আর কোন প্রশ্ন করে নাই। তার মনেও পড়েছে সব, দশ দিনে তার বুদ্ধি এবং অনুমানশক্তির মধ্যে সজীবতা এসেছে। সুবাসী কোথায় সে কথা সে কল্পনা করতে পারে। চুপ করে শুয়ে শুধু ভাবলে—আপনার যত পুরানো কথা। এই যে অবস্থা তার হয়েছে—এমন গ হবে, এ কোনও দিন সে মনে ভাবে নাই। আজকের এই দিনে নসু ছাড়া আর তার কেউ নেই। তার এই দিনগুলির জন্যেই কি বাবাঠাকুর দয়া ক'রে নসুকে নারীর স্বভাব দিয়ে গড়েছিলেন? গ'ড়ে বলেছিলেন—আমি যখন চ'লে যাব হাঁসুলী বাঁক ছেড়ে, বনওয়ারী যখন কুটোর মত তুচ্ছ লোক হবে, তখন তার ভার নেবার জন্যেই তোকে গড়লাম?

খট-খট-খট-খট। খটাং, খটাং, খটাং। শব্দ ছুটে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। আজ মনে হ'ল—খট-খট-খট-খট ক'রে কিসের একটা শব্দ উঠছে। শব্দটা বোধ হয় চেতনা হওয়ার পর থেকেই শুনছে, কিন্তু ওদিকে শব্দটা খুব স্পষ্ট ছিল না, কানে সে শুনতে পেত না; মনটাও ওদিকে যেত না। মন শুধু এ কদিন খুঁজে ফিরত পুরানো কথা। আজ সে পুরানো কথা খুঁজে পেয়েছে। সব মনে পড়েছে। কানেও আজ শুনতে পাচ্ছে। শব্দটা আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। অনবরতই শব্দ উঠছে। নিঝুম তেপান্তরের মাঠে কে যেন কাঠের উপর কিছু ঠুকেই চলেছে—খট-খট-খট-খট।

কোপাইয়ের বাঁক থেকে শব্দটা ঘুরে আসছে—খট-খট-খট-খট—খটাং, খটাং, খটাং। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—খটাং, খটাং, খটাং।

সে একলা শুয়ে ছিল ঘরে। শব্দটা শুনে শুনে তার মনে প্রশ্ন জাগল।

সে ডাকল—নসু। পাগল।

কেউ উত্তর দিলে না। ধীরে ধীরে সে চোখ বন্ধ করলে।

কি রকম যেন। কোথাও মানুষের কোন সাড়াশব্দ নাই, কেউ চীৎকার ক'রে কাউকে ডাকছে না, কেউ কাঁদছে না, কেউ হাসছে না, কেউ ঝগড়া করছে না, গাই বাছুরকে

ডাকছে না, বাছুর মাকে ডাকছে না। ছেলেছোকরারাও কি গান ভুলে গেল?

কেবলই শব্দ উঠছে—খট-খট-খট-খট—খটাং—খটাং—খটাং—

শুধু খট-খট খটাং-খটাং নয়। গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ। উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে বোধ হয়। শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ল বনওয়ারী। এর পরের দিন বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বললে—দরজাটা ভাল ক'রে খুলে দে দেখি। দিনমণিকে একবার দেখি, ওঠ দেখি। তারপর সে প্রশ্ন করলে—পুলের ওপর গাড়ি যেছে, লয়। এরই কিছুক্ষণ পর আবাব সেই শব্দ উঠতে লাগল—খট-খট খট-খট খটাং-খটাং। ভুরু কুঁচকে সে নসুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কি নসু? শব্দ?

—বাঁশ কাটছে।

বাঁশ কাটছে? সকাল থেকে সনজে পর্যন্ত প্রতিদিনই বাঁশ কাটছে? হবে। জাঙলের ঘোষ মহাশয়েরা মালিক, ঘরদোর ছাওয়ানোর সময়। হবে।

কিছুক্ষণ পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খাবার সময় নসু তাকে ডাকলে—সাবুটুকুন খাও।

শব্দ উঠছে—খটাং-খটাং।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। ভাবতে লাগল সুবাসীর কথা, তার দশার কথা, কবালীর কাছে তার সেদিনের নিষ্ঠুর পরাজয়ের কথা। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। লুকাবার জন্য সে বিছানায় নিস্পন্দের মতো প'ড়ে রইল।

বিকালে পাগল ডাকলে—ওঠ ভাই, দুটো কথা বল।

বনওয়ারীকে সে-ই ধরে উঠিয়ে বসিয়ে দিলে। এইবার তার কানে এল—খটাং-খটাং খটাং-খটাং। শব্দ ছুটছে হাঁসুলী বাঁকের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।

পরের দিন আবার শব্দ উঠতে লাগল। খট-খট-খটাং—

সে আজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আজও বাঁশ কাটছে, নসুবালা? এত বাঁশ কে কাটছে? নির্মুল করলে বাঁশগুলান।

পাগল বললে—যুদ্ধুর ঠিকেদারেরা তামাম বাঁশ কিনেছে ভাই, জাঙলের সদগোপেরা বেচেছেন। টাকায় দুটি বাঁশ। তারাই কাটছে বাঁশ।

টাকায় দুটি বাঁশ? টাকায় আটটা বাঁশ দুটি দরে বিক্রি হচ্ছে? যুদ্ধুর ঠিকেদারে সব বাঁশ কাটছে? হে ভগবান। এ কি হ'ল? আগুন লেগে গেল দেশে? কিন্তু কেন?

আকাশের দিকে মুখ তুলে পাগল বললে—পিথিমীতে ভীষণ যুদ্ধ লেগেছে, এমন যুদ্ধ ভূভারতে কখনও হয় নাই। জাপানীরা খুব যুদ্ধ চালিয়েছে। কলকাতায় বোমা মেরে ভেঙে চুরমার করছে। সেখানকার লোকে কুকুর বিড়ালের মত পালিয়ে এসেছে। চন্নপুরের কুঁড়ের ভাড়া পাঁচ গণ্ডা টাকা। চন্নপুরে ঘর না পেয়ে জাঙলে সদগোপদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে দশ-বারো ঘর কলকাতার লোক। চালের মণ চল্লিশ টাকা, ধানের মণ চব্বিশ টাকা। আরও নাকি নানান দেশ থেকে লোকেরা পালিয়ে আসবে। যাবে শুনেছি চন্নপুরের রেললাইনের পাশের পাকা সড়ক দিয়ে। কাটোয়া দুমকা হয়ে চ'লে যাবে পশ্চিম দেশে। তারা পথে চন্নপুরে থাকবে; জিরোবে দুদিন, তার জন্য বাঁশের ঘর তৈরি হচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাগল আবার বললে—সে-ই ভাই, সে সন্ধান দিলে—বাঁশবাঁদির বাঁশের, হাঁসুলী বাঁকের কাঠের। সেই করালী। সব্বনেশে করালী।

হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, সেই তো দেবে। তার ধরমই তো এই। কেউ গড়ে, কেউ ভাঙে। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—চন্ননপুরে তাহ'লে খুব জমজমাট।

—খুব।

হাত পা নেড়ে ভঙ্গি ক'রে নসুবালা বললে—সে একখানা বড় গেরাম, বুল্লে কিনা। তার মধ্যে দশ-দশটা কাহারপাড়া ঢুকে যায়। বাবা রে, বাবা রে, বাবা রে, সে কত কাণ্ড গো। তার জন্যে ইঁদারা হয়েছে, ডাক্তার বসেছে, পাঁচশো মণ চিঁড়ে তৈরি ক'রে রেখেছে, জালায় জালায় মণ মণ গুড় এসেছে। সেই সব ঘরের জন্যে বাঁশ কাটছে। তা'পরেতে উত্তরে যে এললাইন বসেছে, যেখানে উড়োজাহাজের আস্তাবল হয়েছে, সেখানে সব কি হচ্ছে, তাতে বাঁশ লাগবে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে—বাঁশ দিতে হবে, দাম যা চাও লাও। বড় বড় গাছ কেটে কাঠ ক'রে রাখছে আন্নাবান্নার জন্য।

অবাক্‌বিস্ময়ে ভাবতে লাগল বনওয়ারী। বুঝতে পারলে না। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ কখনও ঘটে নাই। বান এসেছে, ঝড় এসেছে, গাঁয়ে আগুনও লেগেছে, মড়কও হয়েছে, পৃথিবীও কেঁপেছে—তাও আছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়। দাঙ্গা আছে, ডাকাতি আছে, কালোবউ বড়বউয়ের প্রেতাত্মা আছে, কিন্তু যুদ্ধ নাই। যে যুদ্ধে হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রা নষ্ট হয়, উপকথায় ছেদ পড়ে, এখনকার মানুষের জীবনস্রোত পৃথিবীর জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিশে যায়, সে যুদ্ধ উপকথার কল্পনায় নাই। বাবাঠাকুর কখনও বলেন নাই, স্বপ্ন দেন নাই। কালারুদ্দুও কখনও জানান নাই। কি ক'রে জানবে তারা? স্থূল-মস্তিষ্ক হাঁসুলী বাঁকের মানুষ বিরাটদেহ বনওয়ারী, যে কাঁধ বেঁকিয়ে চলে, ধপধপ শব্দ ওঠে যার অতিকায় পায়ের সবল পদক্ষেপে, তার মস্তিষ্কে এ কিছুতেই ঢুকল না।

পরদিন আবার শব্দ উঠতে লাগল। বনওয়ারী বললে—আমাকে একবার বাইরে নিয়ে যাবি নসু?

—বাইরে যাবা?

—হ্যাঁ। একবার মা-জনুনীকে দেখি।

—মা-জনুনী?

—হ্যাঁ রে। আমার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি মা-জনুনীকে একবার দেখি, কি দশা করলে তার? আঃ-আঃ। বুক ফেটে আক্ষেপ বেরিয়ে এল তার।

—যেতে পারবা?

—ধর, খুব পারব আমি। সে নিজেই উঠে বসল। উঠে দাঁড়াল। মটমট শব্দ ক'রে উঠল দীর্ঘদিন-শুয়ে-থেকে জাম-ধরা মোটা হাড়গুলি।

খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক, খাঁ-খাঁ করছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির বাঁশবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে। শুধু বাঁশবন নয়, বড় বড় বটগাছ অশ্বত্থগাছ পর্যন্ত নাই। ঘর থেকে বার হতেই তীব্র আলো চোখে এসে লাগল। আকাশের কোলে এতটুকু সবুজ নাই। এখানে ওখানে

রয়েছে শুধু দুটো চারটে শীর্ণকায় পল্লবহীন শিরিষ-শ্যাওড়া বেলগাছ। কোথাও কোন ছায়া নাই, চোখে এসে লাগে ছটা, চারিদিকে খটখট করছে মাঘের রৌদ্র। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে নদীর কিনারা পর্যন্ত হাঁসুলী বাঁকের বেড়। নদী পার হয়ে ওপারে দেখা যাচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তর। পথ চ'লে গিয়েছে কোন্ দেশ দিয়ে। সে হাঁসুলী বাঁকের কোন চিহ্নই আর নেই যেন। গাঁয়ে ঢুকে ছায়ার নেশায় একটা কেমন ঢুলুনির ঘোর লাগত। ছায়ায় ছায়ায় চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবনা ভাবতে ভাল লাগত। বাঁশবনের আর বট-অশ্বত্থের ঘন ছায়া মুছে যাওয়ার সঙ্গে সে সব ঘুচে গেল। আর গাছতলায় ব'সে চোখে তন্দ্রা নামবার অবকাশ হবে না, ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাসুলী বাঁকের উপকথার স্বপ্ন রচনার ঠাঁই রইল না।

ফিরে তাকালে সে বাবাঠাকুরের থানের দিকে। বাবাঠাকুরের থান, আর তার মধ্যে ছিল আটপৌরে পাড়ার সেই বটগাছটি, যার তলায় আলো নিবিয়ে দিয়েছিল কালোশশী, যার তলায় সুবাসীকে দেখে তার কালোশশী ব'লে ভ্রম হয়েছিল। কই সে গাছ? বাবাঠাকুরের থানই বা কোন দিকে? ওটা কোন জায়গা? এত মোটরগাড়ি কিসের? কাদের? চন্নপুরের কারখানাটা এগিয়ে এল? গোঁ-গোঁ শব্দ করছে কখানা গাড়ি। কি বিশ্রী ধোঁয়ার গন্ধ। এখান পর্যন্ত এসে বনওয়ারীর নাকে ঢুকছে।

সে অসহায় আর্তের মত পাগলের দিকে চেয়ে বললে—পাগল, এ যে আমি কিছু ঠাওর পেছি না ভাই। বাবাঠাকুরের থান কোথা গেল? ওটা কোন জায়গা? এত গাড়ি? পাগল?

—ওই তো ভাই। বাবাঠাকুরের থান তো আর নাই। যুদ্ধুর মটরগাড়ির আড্ডা হয়েছে।

চিহ্ন নাই বাবাঠাকুরের স্থানের। বেলগাছ নাই, বাঁদরলাঠির গাছটি নাই, কুলগাছের ঝোপগুলি নাই, আলোকলতা নাই, তালগাছের বেড় নাই। লাল কাঁকর বিছানো চত্বর চারিপাশের সাদা রঙ-মাখানো ইটের ঘেরার মধ্যে ঝকঝক করছে। মোটর গাড়ি যাচ্ছে আসছে গোঙাচ্ছে।

পাগল বললে—বাবার থানকে কেটেকুটে সমান ক'রে মটরগাড়ি আস্তানা করছে বনওয়ারী ভাই। কলির শেষ, আমাদেরও শেষ। ওইখান থেকে বাঁশ কাঠ বোঝাই ক'রে নিয়ে যায় চন্নপুর। চন্নপুর থেকে হাঁসুলী বাঁক পর্যন্ত পাকা আস্তা করেছে। কিছু আর আখলে না।

ওই সেই রাস্তা। পাকা শাহী চওড়া রাস্তা। লাল কাঁকরে মোড়া সোজা চ'লে গিয়েছে হাঁসুলী বাঁক থেকে জাঙল হয়ে চন্নপুর; তীরের মত সোজা রাস্তা। রাস্তার গাঁটছড়াটা চন্নপুরের সঙ্গে হাঁসুলী বাঁককে বেঁধে দিয়েছে। ধানের জমি মেরেছে, খাল পুরিয়েছে, নালা বেঁধে সাঁকো তুলেছে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ ক'রে ওই পথে গাড়ি যাচ্ছে আর আসছে।

পাগল বললে—কোপাইয়ের ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে পথ। এইবার কোপাই পেরিয়ে ওপারে উঠবে। ওপারের গাছও সব কাটবে কিনা।

বনওয়ারী আর্তনাদ ক'রে উঠল এবার—কেনে বাঁচালি আমাকে পাগল? ওরে নসুবালা, এ তোরা কি দেখাতে বাঁচালি? আঃ হায় রে, কেনে বাঁচলাম আমি?

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি তুলেই সে আবার কাহারপাড়ার

দিকে তাকালে।

এতক্ষণে আর একটা জিনিস তার চোখে লাগল, মনে ধরা পড়ল।

খাঁ-খাঁ চারিপাশের দিকদিগন্তরই করছে না। হাঁসুলী বাঁকের বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার পুরী বাঁশবাঁদি গ্রাম—সেও যেন খাঁ-খাঁ করছে। ঘরগুলি রয়েছে, কিন্তু কলরব নাই, গরু নাই, বাছুর নাই, ছাগল নাই, ভেড়া নাই, মেয়েরা কলহ করছে না, বাঁধের জলে হাঁস চরছে না, ছেলেরা খেলা করছে না, এ কি হ'ল? এমন কি কাহারপাড়ার কুকুরগুলোও দেখা যায় না। হাঁসুলী বাঁকের বুকের মধ্যে উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা-ভোমরীর মত কালো কাহারদের মেয়ে-পুরুষেরা কোথায় গেল?

পাগল হাসলে, বললে—তারা আছে, সুখেই আছে। করালী তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছে। চন্ননপুরে কারখানায় মজুরি খাটছে—খাচ্ছে। কেউ কেউ সন্ধ্যেতে আসবে। কতক বা আসবে না। বেশির ভাগই আসে না। সুখেই আছে হে তারা।

বনওয়ারী আর কোনও আক্ষেপ প্রকাশ করলে না। থাক, তারা সুখেই থাক -নসু বললে, কতক মরেছে, কেউ বা পালালছে।

নসুবালা হিসেব দিলে। ব'লে গেল একে একে এক-একজনের কথা। তার মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে--সেই অমণ বুড়ো গো। সবচেয়ে আগে পালালছে সেই অমণকাকা তোমার। তোমাকে যেদিন অসুখ হয়ে ঘরে নিয়ে এল, ঠিক তার দু'দিন বাদেই।

বুড়ো রমণ তার দুদিন পরেই গরু চরাতে গিয়ে সেখানেই বনওয়ারীর একটা ভাল গাই পাইকারদের বিক্রি ক'রে দিয়ে মাঠের পথ ধ'রে পালিয়েছে। শোনা যায়, সে আছে কাটোয়ায়, লাঠি হাতে কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে। বলে—শেষ দশা, তাই এলাম মা-গঙ্গার ধারে। হাড় কখানা গঙ্গায় পড়লে আসছে জন্মে উঁচুকুলে জনম-টনম হবে।

নয়ানের মা মরেছে। সে মরণ তার ভীষণ। অন্তত নসু তাই বললে—নবান্নের দিন, অগ্রহায়ণের শেষ মাসে গিয়েছে নবান্ন। নয়ানের মা জাঙলে সদগোপ মহাশয়দের চার বাড়িতে আকণ্ঠ এঁটোকাঁটার প্রসাদ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে হাঁস-ফাঁস ক'রে মারা গিয়েছে। নড়তে পারে নাই, কথা বলতে পারে নাই, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মরেছে।

নসুবালা হঠাৎ কেঁদে ফেললে—তার মনে প'ড়ে গেল সে কথা। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল নয়ানের মায়ের সেই মরণকালের ছবি। শিউরে উঠল সে। চোখ জলে ভ'রে উঠল। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে সে বললে—এই দেখ, ওইখানে ওই গাছতলাটিতে মরেছেল নয়ানের মা। একা প'ড়ে অইল, কেউ দেখলে না। তুমি অসুখে প'ড়ে, মাতব্বর নাই, মুরুব্বি নাই, অনাথাকে দেখবার গরজ কার, বল? তবে তোমাকে নিয়েও খুব হৈ-চৈ তখন, নোকে ভাবছে—কি হয়, কি হয়? নয়ানের মাকে কে দেখবে বল? আমি দেখে কাছে বসলাম। ভাবলাম—আহা, ভাতার যেয়েছে, যুগ্যি পুত যেয়েছে—অনাথা। মনে হ'ল কি জান? আমারও হয়তো শেষে ই দশাই হবে। আমারও তো কেউ নাই। আমাকেও এমনি ক'রে মরতে হবে। মুখে জল দেলাম তো খেলে, আবার হাঁ করলে। আবার খেলে। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললাম—কি হয়েছে নয়ানের মা? তা মুখে কিছু বলতে লারলে, শুধু অনেক কষ্টে হাতটি তুলে কপালে আখলো। বুঝ্লে কিনা,

বললে—কপাল—নেকন। তা'পরেতে কোঁতাতে লাগল। সে কি কোঁতানি, মনে হ'ল জীউটা বেরিয়ে গেলে খালাস পায়। তা কি সে সহজে যায়? অ্যানেক এতে আঁধারের মধ্যে কখন যে জীউটা বেরিয়ে গেল, তা বুঝতে লারলাম।

—আটপৌরেদের একজন মরেছে—ওই যে গো—বেশ নামটি। কিন্তু কিছুতেই মনে থাকে না।

পাগল বললে—বিশ্বামিত্ত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিশ্বামিত্ত।

'বিশ্বামিত্র' নামটা নসুর মনে থাকে না।

বিশ্বামিত্রের বাবা যাত্রায় পালাগান দেখে ওই নাম রেখেছিল ছেলের। বিশ্বামিত্র মরেছে জ্বরে। তারপর এর ওর ছেলে মরেছে, কচিকাচা মরেছে—সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নসু বললে—পায়ের হাতের আঙুলে গোনা যায় না ব্যানোকাকা, হিসেব দোব কি? একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল—আর তোমার নিমতেলে পানার হয়েছে জেল। আহা। পানকেষ্ট কদমতলায় বিহার করতে যেয়ে গেল জেলখানাতে।

—জেল?

—হ্যাঁ, জেল। নসু খুব রঙ দিয়েই বললে—যেমন জেলাপীর পাক বুদ্ধি, তেমনি ফল। মনিবের সঙ্গে হিসেব নিয়ে ঝগড়া হ'ল। পানু আমার পানকেষ্ট; মনিবের শোধ নিতে—মনিবের উপো-বাঁধানো হুঁকো চুরি করেছিল। পানার মনিবকে তো জান। পেকো মোড়ল নাম। কাজেও পেকো মোড়ল।

পাগল বললে—ধরা পড়ত না ছোঁড়া। ধরা পড়ল পরিবারের টানে। ধরিয়ে দিলে করালী। পুলিসে খবর দিয়েছিল পেকো মণ্ডল। পানু তখন লুকিয়ে পড়েছে। কোথা যে লুকিয়ে থাকত কেউ জানত না। রাত্তে এসে ঘরে চারটি ক'রে খেয়ে যেত। তুমি তখন শয্যাশায়ী অজ্ঞান, করালী বুক ফুলিয়ে আসে যায়; ছোঁড়া এখন পানার পরিবারকে নানা রকম লোভ দেখাতে লাগল। বলে—চন্নপুরে চল খাটবি খাবি। ভাল কাজ ক'রে দোব আমি। সেই লোভে মেয়েটা স্বীকার করলে রাত্রে পানা এসে খেয়ে যায় বাড়িতে। করালী শুনে রাত্রে তক্কে তক্কে ছিল—ধরলে একদিন চেপে। দিয়ে দিলে পুলিসে। পানা ব'লে গেল কি জান, বললে—যাক, কিছুদিন এখন নিশ্চিন্দ।

নসু বললে—পানার বউ এখন চন্নপুরে আঙামুখো সাহেবের উড়োজাহাজের আস্তানায় খাটে। খাটুনি না মাথা। ওজকার খুব; ফেশান কি।

বনওয়ারী উদাস হয়ে চেয়ে রইল। চোখ গিয়ে পড়ল তার চন্নপুরের রাঙা পাকা পথের উপর। রাস্তাটা ঝকঝক তকতক করছে। ওই পথে সব ছুটে যায় চন্নপুরে খাটুনি খাটতে। পাঁচসিকে দেড় টাকা মজুরি। যারা আবার রেলের তেরপল ঢাকা মালগাড়িতে লাইনের কাজে সেইখানেই দিনরাত্রি থাকে, তারা পায় বেশি। কয়লা পায়, রেলের লোকেরা কম দামে চাল ডাল দেয়।

হঠাৎ বনওয়ারী পাগলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—পাগল, কুলকম্ম সবাই ছাড়লে? অতন, গুপী, পেল্লাদ—সবাই?

কথার উপরেই কথা দিয়ে জবাব দিলে নসুবালা—সবাই—সবাই—সবাই। কেউ বাকি নাই। মেয়েপুরুষ সব চন্নপুরে ছুটছে ভোর না হতে। সময় নাই। রবকাশ নাই। কি করবে বল? প্যাটের দায়।

পাগল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ওদর, প্যাট—বনওয়ারী, উনিই সব।

নসুবালা বললে—ম'রে যাই। শুধু ওদর? লোভ পাপ, বুয়েচ ব্যানোকাকা, পাপ। পিথিমীতে পাপের ভারা ভরতে আর বাকি নাই। একটি নোক দেখলাম না যে ধম্মের মুখ তাকায়। ঘোষেরা—তোমার এতকালের মনিব, ভাগের জমি ছাড়িয়ে নিলে। সায়েবডাঙায় জমি, তুমি উইকে এক পিট ভুঁইকে এক পিঠ দিয়ে ভাঙলে। চন্নপুরের বাবু তা সব কেড়ে নিলে। পাগলমামা যেয়েছিল একবার বাবুদের ঠেনে, তা—

বনওয়ারী পাগলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—পাগল।

পাগল মাটি খুটিতে খুঁটিতে বললে—যেয়েছে, সে সব যেয়েছে, ভাই। বাবুরা এক ছটাক ভাগ দিলে না।

বনওয়ারীর কাছে পিতিপুরুষের আমল থেকে যে জমি ভাগ দিয়েছিল, ঘোষেরাও তা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

বনওয়ারী হাসলে। যাক, সর্বস্বান্ত হয়েছে তা হ'লে। নিশ্চিন্ত।

অনেকক্ষণ পর বনওয়ারী বললে, নিজের কথা বাদ দিয়ে কাহারদের কথাই বললে—তা লোকে কারখানায় গিয়ে ভালই করেছে। দোষ দেবার কিছু নাই।

নসুবালা ব'লে গেল—দুর্দশার দিনে করালী ওদের ডাকলে। নিয়ে গেল চন্নপুরের রেলের কারবারে কারখানায়। কাজ দিলে। সব সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল। তোমার এত বড় ব্যামো গেল, কেউ খোঁজও করলে না।

বনওয়ারী হাসলে—তা না করুক।

নসু বললে—না এলে দুঃখ হয় বইকি। দুঃখ হয় না?

পাগল হেসে বললে—দুঃখ ক'রেই বা কি করবে বুন?

বনওয়ারীর হাতপায়েব ডগাগুলি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

নসু বললে—আমি শুধু যাই নাই। ব্যানোকাকা, ওই মুখপোড়া করালীর উপর ঘেন্নায় লজ্জায় যাই নাই। যত ভালবাসতাম তাকে, তত বিষ হয়েছে তার ওপর। ছি-ছি-ছি। লজ্জায় মরে যাই। সে আবার সেপাইদের মতন পোশাক প'রে আজকাল বলে—মেলেটারি। জুতো পরে, টুপি মাথায় দেয়।

নসুবালা ব'লে যায় করালীর লজ্জাকর ঘৃণার্হ কীর্তিকলাপের কথা। বনওয়ারী কয়েকদিন তখন শয্যাশায়ী, এখন-তখন অবস্থা, সেই সময় একদিন সকালে দেখা গেল, সুবাসী নাই। সুবাসী তার আগের দিন বনওয়ারীর চিকিৎসার খরচের অজুহাতে গরু-বাছুরগুলি বিক্রি করেছিল। সেও টাকাকড়ি সব নিয়ে বনওয়ারীকে ফেলে গভীর রাত্রে অদৃশ্য হ'ল। দুপুর নাগাদ খবর এল, সুবাসী চন্নপুরে—করালীর বাসায়। বনওয়ারীকে 'মামা' বলত করালী। সম্পর্ক বাছলে না—ছি-ছি-ছি। রোগা মানুষ বনওয়ারী, মেয়েটা চ'লে গেলে তার

কি হবে, সে কথাও একবার ভাবলে না। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ঘৃণার্হ করালী। শুধু গায়ের জোরে, রক্তের তেজে, আর রোজগারের গরমে ধর্মকে পায়ে মাড়িয়ে গেল, রীতি-ব্যবহারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে, থুথু দিলে। ছি। ছি!

বনওয়ারী মাটির দিকে চেয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে। না বললেও সে এ কথা মনে মনে বুঝেছিল। তার অন্তর ব'লে দিয়েছিল—সুবাসী যখন পাশে নাই, ঘরে নাই, তখন করালী তাকে নিয়ে গিয়েছে। হাসতে হাসতে কালোবউয়ের মত রঙ্গ ক'রে করালীর সঙ্গে গিয়েছে, সে তা জানে। যাবেই—এই নিয়ম। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এই কথাটি পুরানো কথা। পাগল হাসলে, ঘাড় নাড়লে, সেও জানে—হাঁসুলী বাঁকে এই নিয়ম। নসু চোখ মুছছিল, চোখ মুছে সে আবার বললে—বলব কি ব্যানোকাকা, পাখীর মত মেয়ে, তার মুখের দিকেও চাইলে না সে। পাখী—আঃ—কি বলব ব্যানোকাকা—'চোখ গেল' পাখী যেমন 'চোখ গেল' ব'লে ডেকে সারা হয়, তেমনি ক'রে কাঁদলে, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদলে।

আবার কাঁদতে লাগল নসুবালা। চোখ মুছতে লাগল। বললে—আঃ আঃ, পাখীর কথা মনে হ'লে আমার হিয়েটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আবার চোখ মুছে বললে—আমি আর লারলাম কাকা। আমি করালীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে গাল দিয়ে চ'লে এলাম—গাঁয়ে চ'লে এলাম। ব'লে এলাম—জনমের মত হ'ল তোর সঙ্গে। গাঁয়ে এলাম। এসেই মনে পড়ল তোমার কথা। আঃ, তোমাকে কে দেখছে? ঘরে তো আর দ্বিতীয় জন নাই। সুবাসী পালিয়েছে, অমন পালিয়েছে, কে দেখবে? রোগা মানুষ, প্রলয় জ্বর, অচেতন অবস্থা—কি হবে মানুষটির? সম্বলহীন অবস্থা; যথাসবৃস্ব নিয়ে পালিয়েছে সুবাসী। সংসার নিয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত, মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের মত ছুটে বেড়াচ্ছে যারা, তাদেরই বা অবসর কোথায়। মেয়েরা দু-একজন আসছিল, যাচ্ছিল, দেখছিল; কিন্তু ঘরে তো আর স্ত্রীলোক ছিল না। শূরবীরের মত বিকারগ্রস্ত পুরুষ বনওয়ারী, পরের ঘরের স্ত্রীলোকেরা তাকে সামলায় কি ক'রে? তবে কি মানুষটা এতবড় শূরবীর, এতবড় মান্যের 'নোকটি' —বিনা সেবায় মরবে? রাত্রে জলের জন্য হাঁ ক'রে জল পাবে না, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ছাতি ফেটে মরে যাবে? আমার মন বললে—তবে তু কি করতে আছিস? ভগবান যে তোকে পুরুষ গ'ড়েও মেয়ের মন দিয়েছে, মেয়ের মতন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কেনে দিয়েছে? আর এক দণ্ডের জন্য ভাবলাম না। চ'লে এলাম, শিয়রে এসে বসলাম।

ভগবানকে প্রণাম করে নসু বললে—তা তাঁর চরণে পেনাম, তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি।

বনওয়ারী আবার বললে—কেনে বাঁচালি নসু?

—তোমার পেরমাই আর আমার হাত ধন্যি।

পাগল হেসে বললে—মরলেই তো ফুরুল বনওয়ারী। বহুভাগ্যের মনিষ্যি-জন্ম নয়ন ভ'রে সাধ মিটিয়ে দেখে লে। মরণ আছেই। হঠাৎ সে গান ধ'রে দেয়—

হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।

ওদিকে বাঁশ কাটা, গাছ কাটা চলছেই। খট-খট-খট-খট! খটাং-খটাং। মড়-মড় শব্দে আছাড় খেয়ে পড়ছে গাছ, বাঁশ শুয়ে পড়ছে অল্প শব্দ ক'রে—মার-খাওয়া গরিব মানুষের

মত। গাছ পড়ছে হাঁসুলী বাঁক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

খট—খট—খট—খট—খটাং—খটাং শব্দ ছুটে চলেছে চারিদিকে। হাঁসুলী বাঁকের বেড়ের কূলে কূলে ছড়িয়ে যাচ্ছে ; দূরে দূরান্তরে, কোপাইয়ের পুলে ঘা খেয়ে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। হয়তো হাঁসুলী বাঁকের ভাবীকালে দেশদেশান্তরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘোষণা ক'রেও তার তৃপ্তি হচ্ছে না—প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে ফিরে এসে অতীতকালের কল্পে কল্পে যেন আঘাত হেনে চলেছে।

নসুর কথা ফুরাবার নয়। সে আবার আরম্ভ করলে—দুঃখ আমার পাখীর জন্যে। আঃ, সোনার বরণ 'হলুদমণি' 'বেনেবউ' পাখী গো—সেই পাখী মনে পড়ে আমার পাখীর কথা মনে হ'ল। হ্যাঁ, মেয়ে বটে। বুঝলে, যেমনি সুবাসীকে নিয়ে গেল করালী, পাখী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। পাখীর কান্না দেখে আমি তো গালিগালাজ ক'রে পালিয়ে এলাম। সেই দিন সনজে বেলায় এই খানিক আত হয়েছে, এমুনি সময় পাখীও পালিয়ে এল গাঁয়ে মায়ের কাছে। কাপড় অস্তুতে আঙা হয়ে যেয়েছে। পাখীর চোখ জ্বলছে।

জ্বলবে বই কি। কাহার-মেয়ে ক্ষেপে উঠেছিল যে। সে যে তখন দু-কূল-ভাঙা কোপাইয়ের মত ভয়ঙ্করী।

সন্ধ্যাবেলা কান্না শেষ ক'রে পাখী ঝগড়া আরম্ভ করেছিল করালীর সঙ্গে। তারপর একখানা কাটারি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে গিয়ে হঠাৎ সে ব'লে উঠল—একা মরব কেন ? করালী চেষ্টা করেছিল তার হাত ধরতে, তবু পাখী কাটারি বসিয়ে দিল করালীর মাথায়। শুধু করালীর মত পুরুষ আর তার হাত ধ'রে ফেলেছিল ব'লেই বেঁচেছে করালী, নইলে তাকে বাঁচতে হ'ত না। তবু খানিকটা চোট লেগেছিল করালীর মাথায়। সেই রক্ত মেখে পাখী এখানে পালিয়ে এল পাগলিনীর মত। পরদিন সকালে করালী এল কাহারপাড়ায় মাথায় ডাক্তারখানার ফেটা বেঁধে। তখন পাখী সাধের খাঁচায় ম'রে প'ড়ে আছে। তার সাধের কোঠাঘরের সাঙায় দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে : তবে হ্যাঁ, করালীর কপালে পাখী চিরস্থায়ী দাগ এঁকে দিয়ে গিয়েছে। পাখীকে ভুলবার পথ রেখে নাই পাখী।

বসন—পাখীর মা চিরকালের ভাল মানুষ। আব চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে প্রেমের কথা তো সবাই জানে। কাহারপাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত। ওই চৌধুরীর ছেলেকে সে যে ভালবেসেছিল, তারপর সে আর কারও দিকে ফিরে তাকায় নাই। কাহারপাড়ার নীল বাঁকে শালুকের বনের মধ্যে পদ্মকলি যেমন উদয়াস্ত সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকে, তেমনি ওই একজনের দিকেই ছিল তার মন প্রাণ চোখ সব। চৌধুরীদের ছেলের মৃত্যুর পর সে থাকত সৎজাতের গৃহস্থঘরের বিধবার মত। শান্ত মৃদুভাষী বসন্ত মেয়ের মৃত্যুর পর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওই ভাঙা চৌধুরী-বাড়িতে। সেইখানেই ঠাকুরের প্রসাদ খায়, আর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প'ড়ে থাকে।

বসন্তের মা সুচাঁদ চন্নপুরে আছে। রেলের হাসপাতালের আশ্চর্য চিকিৎসা। পা কাটতে হয় নাই। বুড়ী বেঁচেছে। লাঠি ধ'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ায় ভিক্ষে ক'রে। চন্নপুরের ভদ্রলোকদের বাড়ি গিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে, ইস্টিশানের গাছতলায় ব'সে বলে। কেউ থাকলেও বলে, না থাকলেও বলে, ব'লেই যায়, বলেই যায়—বাঁশবনে-ঘেরা তন্দ্রা-

মাখা স্বপ্নসুলভ ছায়াচ্ছন্ন হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ফুলে ভরা, বিষে ভরা, রঙে স্নিগ্ধ, বেরঙে উগ্র, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বসন্ত তার সাদা রঙের তুলির দাগ, পাখী তার রক্তলেখা। এই কথা সে নিজের ভাষায় বলে। সম্ভবত হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে নিজে হ'ল আদ্যিকালের বুড়ী ; করালী হ'ল দৈত্য কিংবা শয়তান—কিংবা সে-ই হ'ল রাজপুত্র, নতুন কালের মাতব্বর। যুদ্ধকে ওই ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশি ক'রে ঢোকালে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়। সে-ই ঠিকাদারদের খবর দিলে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে আদ্যিকালের বুড়োবট রয়েছে। কেটে ফেললে সেই বটগাছটা। প্রথমে এসেই তারা কাটলে সেই বটগাছ। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার হাড়-পাঁজরা-মেরুদণ্ড কাটিয়ে এনে তৈরি করছে যুদ্ধের হুকুমমত ইতিহাসের ছাদে ঘরবাড়ি।

মড়-মড়—দুম ! প্রচণ্ড উচ্চ শব্দে চকিত হয়ে উঠল হাঁসুলী বাঁক। এক ঝাঁক পাখী কলরব ক'রে উঠল। অল্প এক ঝাঁক। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য পাখীর দলের বাসা ঘুচে গিয়েছে হাঁসুলী বাঁক থেকে। দাঁতালের দুটো একটাও এ শব্দে ছুটে বার হ'ল না। উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ভয়ার্ত গরু ছুটে এল না, ছাগলও না। ছেলেরা ছুটে বেরিয়ে গেল না দেখতে, এত কিসের শব্দ ! ছেলেদের নিয়েই যে খাটতে যায় কাহারেরা চন্ননপুরে। তা ছাড়া থাকলেও হয়তো তারা এ শব্দে বিস্মিত হ'ত না ; চন্ননপুরের ধ্বনির উচ্চতা এবং বৈচিত্র্য এর চেয়ে যে অনেক বেশী সমৃদ্ধ।

ছাগল গরু নাই-ই আর কাহারপাড়ায়। যুদ্ধ লেগেছে। চালান যাচ্ছে। দু টাকার ছাগল দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দশ টাকার গাইয়ের দাম তিরিশ টাকা। পঁচিশ টাকার বলদ একশো টাকা। দুধের দাম নয়, হেলের শক্তির দাম নয়, মাংসের দাম। যুদ্ধ কাহারদের গোসেবা দুধ বিক্রি ভুলিয়ে দিলে, ও ব্যবসাটাই ঘুচিয়ে দিলে।

নসু উঠে দেখলে, ব্যাপার কি ? গালে হাত দিয়ে শিউরে উঠল সে। - মা গো, দহের ধারে সেই শিমূলবৃক্ষটিকে কাটলে গো। মড়মড় শব্দে প্রচণ্ডবেগে পড়ছে আদিকালের বনস্পতি। তার পড়ার বেগের ঝটকা তখনও বাতাসে ব'য়ে চলেছে। বোধ হয় শুধু বেগের মধ্যে দিয়ে ব'লে যাচ্ছে—আমি যাচ্ছি।

খট-খট-খট—খট-খট-খট। বাঁশ কাটছেই। আজ একটা পাশ একেবারে সাফ হয়ে হাঁসুলী বাঁক মিলে গেল—দূর দেশান্তরের সঙ্গে ! হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় শেষকালে শুধু গাছকাটার শব্দ। মানুষেরা চন্ননপুরে চ'লে গিয়ে শহরে বাজারে রাজপথে চলমান দ্রুতধাবমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়েছে। স্থাণু স্থাবর বনস্পতি, যারা সর্বপ্রথম গড়েছিল হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ছায়াচ্ছন্ন শান্ত-তন্দ্রালু গ্রামখানি, তারাই যাচ্ছে এবার, তারা হচ্ছে বিগত। তারই মধ্যে ব'সে আছে সে যুগের শেষ মানুষ বনওয়ারী, স্থাবরের মত।

খুঁটি ধ'রে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারিদিকে এবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। কিছুই নাই—কিছুই নাই—হাঁসুলী বাঁকের সে কাহারপাড়ার আর কিছুই নাই। বাঁশবনের বেড় নাই, আদ্যিকালের বৃক্ষ নাই, মানুষ নাই, জন নাই ; পশু নাই, পক্ষীরা পর্যন্তও নাই। পক্ষীর মধ্যে আছে কাকেরা, তারা উচ্ছিন্ন বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল থেকে গৃহহীন পতঙ্গগুলিকে ধ'রে খাচ্ছে। চারিদিকে শুধু শক্ত বাঁধানো লাল কাঁকড়ের পথ। আছে শুধু কোপাইয়ের বেড়, হাঁসুলী

বাঁকের মাটি, আর পুরানো আমলের পড়-পড় জনহীন ঘরগুলি। ওগুলির দিকে তাকিয়ে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালে—শূন্য বাঁশঝাড়ের দিকে। একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ও ঘরগুলিও থাকবে না।

সন্ধ্যার সময় সে পাগলকে বললে—দেহ এইবার আখি, কি বলিস?

—দেহ রাখবি? পাগল চমকে উঠল।

—আর বাঁচব না। বেঁচেও লাভ নাই। দেখার লোভ তোর আছে, তু দেখ, নয়ন ভ'রে দেখ।

পাগল তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে—মন খারাপ করিস না ভাই।

—মন খারাপ নয় পাগল, মন আমার পাষাণ হয়ে যেয়েছে। কথা তা নয়। আমার ডাক এসেছে। বুয়েছিস—বেশ বুঝতে পারছি। একলা থাকলেই অন্তর আমাকে বলছে—চল।

—ও তোর মনের ভুল।

- উঁহু। ঘাড় নাড়লে বনওয়ারী।

আজ আবার খানিক জ্বর হয়েছে। বনওয়ারীর কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল পাগল

বনওয়ারী বললে—আমার একটি সাধ ছিল পাগল, অ্যানেক দিনের সাধ। কতজনকে জ্ঞান গঙ্গা নিয়ে গিয়েছি। মনে আছে তোর, কাঁদরা যেয়েছিলাম বিয়েতে, অষ্টমঙ্গলায় বরকনে পৌঁছিয়ে দিয়ে খালি পাল্কি কাঁধে ফিরে আসছি—গাছতলায় এক বুড়ো বাবাজীর সাথে দেখা হয়েছিল?

—মনে আছে বইকি। মহাপুরুষ। মনে থাকবে না! দুপুরে ওদে গাছতলায় ঠেস দিয়ে ব'সে ছিলেন, গলা দিয়ে রজ বেরোয় না। তু জল দিলি। জোড়হাত ক'রে বললি—নীচ জাত, জল দিয়েছি মুখে, আমার অপরাধ লেবেন না বাবা। বাবা বললেন—আমার নিজেরই জাত নাই বাবা, আমি জাতহারা বোষ্টম, বৈরাগী। মানে আছে বইকি।

—আমি শুধালাম—এই দেহ নিয়ে কেন বেরিয়েছেন বাবা? বাবা বললেন—বাবা, দেহখানা আর বইছে না ব'লেই ওকে রাখতে চলেছি। মনে আছে? বললেন—অনেক দিন ও আমাকে বয়েছে বাবা, আমিও ওকে অনেক ভালবেসেছি। কত সাজিয়েছি, কত মজ্জন করেছি, ও গরবে কত গরব করেছি, তাই যেখানে সেখানে ওকে ফেলে যেতে আমার মন সরছে না। চলেছি মা-গঙ্গার কূলে, জলে শোব, মাথাটি রাখব কূলে—প্রভুকে ডাকতে ডাকতে চ'লে যাব, ওকে মা-গঙ্গার জলে দিয়ে যাব। মনে আছে? আমরা তখন ধরলাম—বাবা চলুন, এই পাল্কীতে আপনাকে বহন ক'রে নিয়ে যাব। বাবা হাসলেন।—চল, নিয়ে চল।

একটু চুপ করে থেকে বনওয়ারী আবার বললে—জানিস, গঙ্গাতীরে বাবাকে আমি শুধিয়েছিলাম, তোরা ছিলি না কাছে, একা পেয়ে শুধালাম—বাবা, আপনার তো ওগ কিছু নাই, তা কি ক'রে বুঝছেন? বাবা বললেন—বাবা, মন বলছে আমার। এই রাতদুপুরে—হ্যাঁ। তারপর হেসে বললেন—বাবা, মন বাইরের মায়ায় ভুলে থাকে ব'লে ভিতরের খবর পায় না। মোটা কথা ধর না বাবা, চাষে যখন মেতে থাক, তখন ক্ষিধে বুঝতে পার না। খেতে মনে থাকে না। মন যদি বাইরের থেকে চোখ ফিরিয়ে আপনার ভিতরের মনের সঙ্গে কথা বলে, সে ঠিক বলবে—ভাই, এইবার আমি যাব। তা আমার

বাইরের নেশা ছুটেছে ভাই। আমি ভিতরের জনের কথা শুনতে পেছি যে। বলছে—আমি যাব।

পাগলের চোখ দিয়ে দরদরধারায় জল পড়ছিল। বনওয়ারী বললে—কাঁদিস না মিতে। জ্ঞানগঙ্গা কাহারের ভাগ্যে হবার নয়। তবে আমার মা-কোপাই তো অয়েছেন, আমি যখন বলব রে, তখন যেন কোপাইয়ের কূলে আমাকে তোরা দুজনে ধ'রে নিয়ে যাস। বুয়েছিস ?

সে পাগলের হাত দুটি চেপে ধরলে।

পাগল বললে—যাব।

—আর কাহারদিগে একবার খবর দিবি। যদি আসে তো একবার দেখে যাব নয়ন ভ'রে।

সে হাসলে।

পাগল অনেকক্ষণ পর বললে—নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল, হাঁসুলী বাঁকের কথা শেষ হয়ে গেল। হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হয়ে গেল।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়লে—না।

না। বাকী আছে। কত্তা বলেছেন, কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান, বান না এলে শেষ হবে না হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। প্রলয়ঙ্কর বান। কোপাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ক্ষ্যাপা কাহার-মেয়ের মত ; কোপাই ক্ষেপে উঠে হাঁসুলী বাঁককে শেষ ক'রে দিয়ে যাবে।

* * *

এল বান। তেমনি ক্ষ্যাপা বান। হুড় হুড়—দুড় দুড়—কল কল—খল খল শব্দে ভেসে উঠল কোপাইয়ের দু কূল। সেই বাবাঠাকুর যেবার খড়ম পায়ে দিয়ে বন্যার জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বড় বান। প্রলয় বান। এবার কিন্তু কাহারেরা ডুবে মরল না। গাছেও চড়ল না। এবার তারা ছিল চন্ননপুরে। হাঁসুলী বাঁক বন্যায় ডুবে গেল। বাঁশবনের বেড় নির্মূল হওয়ায় কোপাইয়ের বান এবার শতগুণ বেগ নিয়ে ব'য়ে গেল কাহারপাড়ার উপর দিয়ে। ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে গেল গোটা কাহারপাড়া। একখানি ঘরও রইল না দাঁড়িয়ে। নীল বাঁধ পুরে গেল বালিতে। সায়েবডাঙার জমিগুলি পলিতে সোনা হয়ে উঠল। সায়েবদের কুঠি শেষ হয়ে গেল, চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

বন্যার কথা উপকথা নয়, ইতিহাসের কথা। ১৩৫০—ইংরিজি ১৯৪৩ সালের বন্যা। তেরশো পঞ্চাশের যে বন্যায় রেল-লাইন ভেসে গেল, সেই বন্যা। ইতিহাসে আছে তার কথা। দামোদরের অজয়ের ময়ূরাক্ষীর কোপাইয়ের বন্যায় শুধু রেল-লাইন ভাসে নি, হাঁসুলী বাঁকের মত অগণিত স্থানের উপকথার পটভূমি ভেসে গিয়েছে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ইতিহাস অবশ্য কর্তার বাণী, কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান মানে না। সে বলে—আকস্মিক, কাকতালীয়। বলুক—সত্য যাই হোক, কাহারেরা একে সত্য বলেই মানে।

পাগল বলে—বনওয়ারী জানত। সে হেসেছিল কাটা বাঁশবেড়ের দিকে চেয়ে। তার সে হাসি আমি চোখে দেখতে পেছি।

বনওয়ারী প্রবল বন্যার আগেই দেহ রেখেছে। ঠিক যেমনটি তার সাধ ছিল, তেমনটি

ক'রেই রেখেছে। মৃত্যুর তিন দিন আগে—কোপাইয়ের গর্ভে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে শয্যা পেতেছিল। গোটা কাহারপাড়াকে ডেকে, তাদের নয়ন ভ'রে দেখে, হাসতে হাসতে দেহ রেখেছে সে। শুধু দেখা হয় নাই করালীর সঙ্গে। করালী—ডাকাবুকো করালী, সে-ই শুধু আসে নাই। এল তার মৃত্যুর পর। বনওয়ারী আরও বলেছিল—ওই দহের ধারে আমাকে দাহ করিস। যেখানে কালোবউ দহের জ্বলে পড়েছিল, যেখানে তার বড়বউকে দাহ করা হয়েছিল—সেইখানে। তাই হয়েছিল। সেই দাহের সময় সে এসে দাঁড়াল। নিয়ে এসেছিল পাকা শাল কাঠ আর ঘি। তাতেই চিতা সাজিয়ে বনওয়ারীকে চাপিয়ে তার পায়ের পরশ নিলে মাথায়। বললে—যাও, চ'লে যাও সগ্‌গে।

উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।

কাহারেরা এখন নতুন মানুষ। পোশাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্ননপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়িচাপা প'ড়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবাঠাকুরকে ডাকে না। ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে বাতাস দেখার যন্ত্রটার দিকে।

তবু চন্ননপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে। কিন্তু কি ক'রে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?

হাঁসুলী বাঁক বসতহীন হয়ে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। বন্ধ্যা মেয়ের মত নতুন সন্তান-সন্ততির জন্য তপস্যা করছে। বন্যায় চাপানো বালির রাশি—হাঁসুলী বাঁকের সোনার মাটির উপর চেপে ধু-ধু করছে, সেখানে শুধু নসুবালাই যায়। নিত্যই যায়। তার না গেলে চলে না। সে যায় ওই বাঁকে গোবর কুড়াতে, কাঁকড়া মাছ ধরতে, কাঠ ভাঙতে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে আর পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদে—মা হাঁসুলী গো।

পাগল গান গায় গাঁয়ে গাঁয়ে, দোরে দোরে—ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে—

হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।

পাগল গান গায়, ঢোলক বাজায়, তার সঙ্গে নসুবালা কাঁচা-পাকা চুলের বেণীতে লাল ফিতে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে নূপুর পায়ে নাচে। ঘুঙুর পছন্দ করে না নসু।

পাগল আর ক্ষ্যাপায় না নসুকে। নসুও ক্ষ্যাপে না। হাসে। দুজনে মিলেছে সেই বনওয়ারীর ঘর থেকে।

পাগল গায়—

যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশের হয় বাঁশি
বাঁশবাঁদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভালোবাসি।

নসু নাচতে নাচতেই গান ধরে।

বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার-কুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা

পরাণ-ভ্রমরে সে থাকত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহন ক'রে মারল করালী।
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার-কুলের পরাণ-ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ের ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
কাহারেরা, হায় রে বিধি, হ'ল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়।

পাগল গান ধরে—

জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়ার খেলা দেখে যা রে ভাই।

পাগল গানের মধ্যেই কাহারপাড়ার আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত সুচাঁদের হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে গান গেয়ে ব'লে যায়। সর্বাগ্রে বলে—সৃষ্টিতত্ত্ব ; শেষে বলে সেই শেষ কথা—দুঃখই বা কিসের, চোখের জলই বা ফেলছ কেনে ? ভাঙা গড়া—হ'ল বিধাতা বুড়োর খেলা। একটা ভাঙে একটা গড়ে—এই চলছে আদিকাল থেকে। ছেলেরা যেমন বালি দিয়ে ঘর গড়ে আবার ভাঙে, মুখে বলে—হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম, ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি।

সুচাঁদ গাছতলায় বসে ব'লে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। শ্রোতারা কেউ শোনে গোড়াটা, কেউ মাঝখানটা, কেউ বা শেষটা। অর্থাৎ খানিকটা শোনে, তারপর উঠে চ'লে যায়। বুড়ী আপনমনেই ব'লে যায়। গল্প শেষ ক'রে বলে—বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে ; তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত। তা তো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই এ উপকথার শেষ। তবে পার তো নিকে রেখো। আঃ—হাঁসুলী বাঁকও শেষ-আমিও শেষ, কথাও শেষ। আঃ—আঃ।

কিন্তু—। বলতে বলতে থেমে যায় সুচাঁদ। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে। ভাবে, শেষ কি হয় ? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে ? চন্দ সূয্যি যত কাল, তার পরেও তো শেষ নাই ; তার পরে আছেন মহাকাল। বাবা কালারুদ্দের চড়ক পাটার ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নাই। আলো নাই, অন্ধকার নাই, তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই। সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয়, কখনও সৃষ্টি। আঁধারে সৃষ্টি ডোবে, আবার আলোতে ওঠে। তবে শেষ কি ক'রে হবে ? সে ভাবে।

হঠাৎ একদিন ছুটে এল নসুবালা। প্রায় বছর দুয়েক পর। বললে—ওলো দিদি, দিদি লো। আমার নূপুর জোড়াটা দে লো। আমি নাচব।

দিদি তখন কথা শেষ ক'রে বলছে—সব শেষ লো—সব শেষ।

নসু হেসে ঢলে প'ড়ে ব'লে উঠল উচ্চ কণ্ঠে—না লো দিদি, শোন। আমি কি দেখে

এলাম শোন্। দেখে এলাম, বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কি কচি কচি ঘাস। আর দেখে এলাম সেই ডাকাবুকোকে।

—বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ।

—আর সেই ডাকাবুকোকে দেখে এলি? করালীকে?

—হ্যাঁ লো পিসী। লুকিয়ে একা গিয়েছে—গাঁইতি হাতে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে আর কি খুঁজছে। খানিক খুঁজছে। আবার উঠছে, আবার খুঁড়ছে। শুধালাম—কি খুঁজিস? বললে—মাটি। ঘর করব আবার। নতুন কাহারপাড়া হবে। নতুন বাঁধ দেবে।

সুচাঁদ দু'হাত তুলে সানন্দে বলে—আবার নতুন বাঁশের বেড়া উঠবে—

নসু বললে—না, বাঁশের বেড় দেবে না। এবার বালি মাটি স্তুপ্যুইমান ক'রে বাঁধ দেবে। দিয়ে তার গায়ে শরবন লাগাবে। বাঁশের বেড়ে আঁধার হয়। সে আমাকে অনেক কথা বললে পিসী -অনেক কথা। এক ঘর কথা।

পাগল ঘাড় নাড়তে লাগল। তার মনে গান এসেছে। নতুন গান—

যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে :—
ভাঙা গড়ার কারখানাতে, তোরা, দেখে আয় রে উঁকি মেরে।

নসু সঙ্গে সঙ্গে পায়ে নূপুর বেঁধে নাচতে লেগে গেল—

তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী,
ননদিনীর শাসনে, চরণের নপুর থামিতে চায় না।
তাই ঘুনাঘুন— তাই ঘুনাঘুন।

হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।

জলসাঘর

ভোর তিনটার সময় নিয়মিত শয্যাত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর রায় ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। পুরাতন খানসামা অনন্ত গালিচার আসন ও তাকিয়া পাতিয়া, ফরসি ও তামাক আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর চাহিয়া একবার দেখিলেন, কিন্তু বসিলেন না। নতশিরে যেমন পদচারণা করিতেছিলেন, তেমনই করিতে থাকিলেন। অদূরে রায়বাড়ির কালী-মন্দিরের তলদেশে শুভ্র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা ক্ষীণধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধবধব করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং-ঢং-ঢ করিয়া গাঙ্গুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল পূর্বে দুই শত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুদের বাড়িতে, এখন আর বাজে না এখন বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভাঙে অভ্যাসের বশে আর পারাবতের গুঞ্জনে। শুকতারা আকাশে দেখা দিলেই উহাদের কলরব শুরু হয়। ভোরের বাতাসের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়িতে আর আসে না। তাহার পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়েদের শেষ নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ—মুচকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখাপ্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ। সত্য সত্যই কয়টা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গহ্বরও দেখা দিয়াছে। সেই জীর্ণ শাখার প্রান্তে বসন্ত দেখা দেয়, না গাছগুলিই বসন্তকে ধরিবার চেষ্টা করে, কে জানে।

আস্তাবল হইতে একটা ঘোড়া ডাকিয়া উঠিল।

ফরসির মাথায় কলিকা বসাইয়া নলটি হাতে ধরিয়া অনন্ত খানসামা ডাকিল, হুজুর।

বিশ্বম্ভরবাবুর চমক ভাঙিল, বলিলেন, হুঁ।

ধীরে ধীরে গালিচায় বসিতেই অনন্ত নলটি তাঁহার হাতে আগাইয়া দিল। নীচে ঘোড়াটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

নলে দুই-একটা মৃদু টান দিয়া বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, মুচকুন্দ ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়েছে শরবতের সঙ্গে দিবি আজ থেকে।

মাথা চুলকাইয়া অনন্ত বলিল, আজ্ঞে পাকে নি এখনও পাপড়িগুলো।

ওদিকে আস্তাবলে ঘোড়াটা অসহিষ্ণুভাবে ডাকিয়া উঠিতেছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রায় ঈষৎ বিরক্তিভরেই বলিলেন, নিতে বেটার কি বুড়ো বয়সে ঘুম বাড়ছে নাকি? যা দেখি নিতেকে ডেকে দে। তুফান ছটফট করছে। ডাকছে শুনছিস না?

তুফান ওই ঘোড়াটার নাম। রায়বাড়ির নয়টি আস্তাবলের মধ্যে এই একটা ঘোড়া অবশিষ্ট আছে। বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্বের অসমসাহসী জোয়ান বিশ্বম্ভর রায়ের

দুর্দান্ত বাহন। সেকালে—সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশ-দেশান্তরের পথচারী বাদশাহী-সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি?

লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি—বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে উড়িতেছে শুধু ধুলার একটা কুণ্ডলী, একটা প্রক্ষিপ্ত ঘূর্ণি যেন পাক দিতে দিতে দিগন্তে মিশিবার জন্য ছুটিয়াছে।

নিত্যনিয়মিত দুর্দান্ত তুফান বিশ্বম্ভর রায়কে লইয়া ভোরে বাহির হইত। দুই বৎসব পূর্বে যেদিন মহাজন গাঙ্গুলীরা সমারোহ করিয়া গ্রামে ঢোল-শোহরত দ্বারা দখল-ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে দেখা গেল—তুফানের পিঠ সওয়ার-শূন্য, নিতাই সহিস মুখের লাগাম ধরিয়া তুফানকে টহল দিয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে।

নায়েব তারাপ্রসন্ন একদিন বলিয়াছিল, আপনার এতদিনের অভ্যেস ছাড়লে শরীর—

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি দেখিযা তারাপ্রসন্ন কথা শেষ কবিতে পারে নাই।

রায় উত্তর দিয়াছিলেন দুটি কথায়, ছি তারাপ্রসন্ন।

অনন্ত নীচে যাইতেছিল। বিশ্বম্ভর আবার ডাকিলেন, শোন।

অনন্ত ফিবিল।

রায় বলিলেন, নিতাই কাল বলছিল তুফান দানা নাকি পুবো পাচ্ছে না।

অনন্ত বলিল, ছোলা এবার ভাল হয় নি, তাই নায়েববাবু বললেন—

হুঁ

আবাব ফরসিতে গোটাকয় টান মারিয়া বলিলেন, তুফান কি খুব রোগা হয়ে গেছে?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, না। তেমন কই—

হুঁ।

কিছুক্ষণ পর আবাব বলিলেন, দানা পুরোই দিবি, বুঝলি? নায়েবকে আমাব নাম ক'রে বলবি। যা তুই, নিতাইকে ডেকে দে।

অনন্ত চলিয়া গেল। তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া উর্ধ্বমুখে বিশ্বম্ভরবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নলটা পাশে পড়িয়া আছে। আকাশের তারাগুলি একের পর এক নিবিয়া আসিতেছিল। বিশ্বম্ভর অন্যমনস্কভাবে বোধ করি আপনার প্রশস্ত বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন—এক—দুই—। প্রথম দিন তুফানের পিঠে সওয়ার হইতে গেলে এই পাঁজরখানাতেই ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেদিনের সে কি রূপ তুফানের। সে কি দুর্দান্তপনা। শান্ত হইত সে শুধু বাজনার শব্দে। বাজনা বাজিলে সে কখনও বেতালা পা ফেলে নাই। ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে কি নৃত্য তাহার।

বিশ্বম্ভরবাবু উঠিয়া পড়িলেন। অতীত স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্যাদার ভাস্কর-প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল। স্মৃতির উজ্জ্বলতম তারকা—তুফান, সেই আকাশে সর্বাগ্রে

জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আজ-দুই বৎসর তিনি নীচে নামেন নাই। দুই বৎসর পরে তুফানকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। খড়ম জোড়টা পায়ে দিয়া রায় দোতলায় নামিলেন। চকমিলানো বাড়ির সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা রায়ের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় সারি সারি গোল থামের মাথায় খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলা চামচিকা ফরফর করিয়া উড়িয়া গেল। এপাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলার ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই বিছানারঘর। তুলার টুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাশঘর। জাজিম, শতরঞ্জি গালিচা থাকে ঘরটায়। বোধ হয় কিছু পচিয়া থাকিবে। পরের ঘরটায় চামচিকার পক্ষতাড়নের শব্দের সঙ্গে ঝুনঝান শব্দ উঠিতেছে। বাতিঘর এটা। বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমগুলি বোধ হয় দুলিতেছে। ইহার পরই এপাশের কোণের ঘরটা ছিল ফরাশ-বরদারের। এই সমস্ত জিনিসের ভার ছিল তাহার উপর। ঘরখানা শূন্য পড়িয়া আছে।

পূর্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনিদার মহল এটা। রায়দের দপ্তরের বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনিদার ছিল। পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা খাজনা রাখিত, এমন পত্তনিদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথমখানির ছবি নাই, কাঁচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয়খানার কাঁচ নাই। তৃতীয়খানার স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথায় পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নীচে আসিয়া নামিলেন। দুই বৎসর পর আজ আবার তিনি নীচে নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায়বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে।

সাত রায়ের ইতিহাস। বিশ্বম্ভর রায় জমিদার রায়বংশের সপ্তম পুরুষ। অন্ধকারের মধ্যে রায় ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রায়বংশের আদিমপুরুষের কথা। তিনি নাকি বলিতেন, মা-লক্ষ্মীকে বাঁধতে হ'লে মা-সরস্বতীর দয়া চাই। কাগজের ওপর কালির গুটির শেকল—ও বড় কঠিন শেকল। হিসেবনিকেশের শেকল ঠিক রেখো—চঞ্চলার আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না। তিনি ছিলেন নবাব-দরবারের কানুনগো।

কাগজ, কলম, কালি—সবই ছিল, কিন্তু মা-লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা কুকুর কোথায় অন্ধকারে শুইয়া ছিল, সেটা ঘেউ ঘেউ শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। রায় গ্রাহ্য করিলেন না, অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থামিয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া বার বার ঘুরিযা ঘুরিয়া রায়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। কুকুরটা শখ করিয়া কেহ পোষে নাই। রায়বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের সন্ততি কেহ

কাছারির দেউড়ি পার হইয়া দক্ষিণে গোশালা, বামে আস্তাবল।

তাহার ওদিকে দেবতাদের মন্দির।

রায় ডাকিলেন, নিতাই।

সসম্ভ্রম কণ্ঠের জবাব আসিল, হুজুর!

তুফানের উচ্চ হ্রেষারবে সে জবাব ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিক হইতে একটা হাতীর গর্জন শোনা গেল।

রায় অগ্রসর হইয়া তুফানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরভাবে পা ঠুকিয়া ডাক দিয়া বৃদ্ধ তুফান শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, বেটা!

তুফান মাথাটা মনিবের হাতে ঘষিতে লাগিল। ওদিকে হাতীটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত রহমৎ প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতীর নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে অতি মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল, হুজুর, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে।

হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী। বিশ্বম্ভরবাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল মতি। কিন্তু কর্তা ধনেশ্বর রায় শিকার করিয়া ফিরিয়া মতি বলিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। মতি একটা চিতাবাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। মতির প্রতি যত্নের আধিক্য দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মা তাহার নাম দিয়াছিলেন, সতীন। কর্তা বলিয়াছিলেন, সেই ভাল রায়-গিন্নী, ওর নামও থাকুক—গিন্নী।

বিশ্বম্ভরবাবুর মা বলিয়াছিলেন, শুধু গিন্নী নয়,—ছোটগিন্নী, ও তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

রহমতের কথায় বিশ্বম্ভরবাবু তুফানকে ছাড়িয়া ছোটগিন্নীর সম্মুখে গেলেন। পিছনে তুফানের অসন্তুষ্ট হ্রেষারব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায় ছোটগিন্নীকে বলিলেন, কি গো মা-লক্ষ্মী? ছোটগিন্নী আপনার শুঁড়খানি বাঁকাইয়া রায়ের সম্মুখে ধরিল। এটুকু তাঁহাকে সওয়ার হইবার জন্য অনুরোধ; রায় হাতীতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া।

রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, এখন নয় মা।

ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মী মেয়েটির মতই শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় কহিলেন, নিতাই, তুফানকে ঘুরিয়া নিয়ে আয়।

একান্ত সঙ্কোচভরে নিতাই বলিল, তুফান আর যাবে না আজ হুজুর। আপনাকে দেখেছে, আপনি সওয়ার না হ'লে—

রায় এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। ছোটগিন্নীর শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে!

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ প্রত্যূষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সচকিত রায় ছোটগিন্নীর শুঁড়খানি নামাইয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাণ্ড বাজে কোথায় রে?

নিতাই মৃদুস্বরে জবাব দিল, গাঙ্গুলীবাড়িতে বাবুর ছেলের ভাত।

অভ্যাসমত রায় বলিলেন, হুঁ।

তুফান তখন ঘাড় বাঁকাইয়া তালে তালে নাচিতে শুরু করিয়াছে। রায় মৃদু হাসিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে ছোটগিন্নীর পায়ের শিকলও তালে তালে নূপুরের মত বাজিতেছিল, ঝুম—ঝুম—ঝুম।

রায় দেউড়ি পার হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এককালে ভোরের নহবতের সঙ্গে এমনই করিয়া নিত্য নাচিত—এক দিকে তুফান, অন্য দিকে ছোটগিন্নী।

দোতলার উঠিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত।

হুজুর।

নায়েবকে ডেকে দে।

রায় ছাদে গিয়া বসিলেন। প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্নপ্রাশন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিমন্ত্রণপত্র করেছে বোধ হয়?

কুণ্ঠিতভাবে তারাপ্রসন্ন বলিল, হ্যাঁ।

একখানা গিনী আর থালা—একখানা কাঁসার থালাই পাঠিয়ে দেবে।

তারাপ্রসন্ন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাটাও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

রায় বলিলেন, মোহর একখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

নায়েব চলিয়া গেল। রায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত আসিয়া কলিকা পাল্টাইয়া দিয়া নলটি ধরিয়া বলিল, হুজুর।

রায় অভ্যাসমত হাতটি বাড়াইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠের গদি, জাজিম, ঘন্টা বের ক'রে দিবি। নায়েব যাবেন গাঙ্গুলীবাড়ি লৌকুতো দিতে।

তিনপুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্রই নয়। রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশ ও হইয়া গেল। জেলায় জজকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারের নির্দেশমত রায়বংশের লক্ষ্মী তখন ঝাঁপি হাতে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষা মাত্র প্রিভি কাউন্সিলের আদেশের।

পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসবে রায়বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল। দানভোজন বিলাসভোজন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। তারপরই পড়িল ভাটা। ভাটার টানে রায়বংশের সমস্ত প্রবাহটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। সাত দিনের দিন বিলাস হইয়া উঠিল বিষ। বাড়িতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাত দিনের মিধ্যে রায়গিন্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয়—সব শেষ হইয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুল বলা হইল। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সেই দিন হইতে করিয়াছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু নতশির সেদিনও তিনি হন নাই। নতশির হইলেন আরও দুই বৎসর পরে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় যেদিন বাহির হইল, সেই দিন। নতুবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরও

এ বাড়িতে জলসাঘরে বাতি জ্বলিয়াছে, সেতার সারেঙ্গ ঘুঙুর বাজিয়াছে। বিপুল হাস্যধ্বনিতে নিশীথরাত্রি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগিন্নীর পিঠে শিকারের হাওদা চড়িয়াছে। তুফান সেদিনও রোষে ক্ষোভে দড়াদড়ি ছিঁড়িয়াছে।

যাক, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি সব চলিয়া গেল। রহিল বাড়িঘর ও লাখেরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু। রায়বংশের আদিপুরুষ এইটুকু কাগজের উপর কালির শিকলে এমন করিয়া বাঁধিয়াছিলেন যে, সেইটুকুতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। ওই বন্দোবস্তেই দেবসেবা চলে, ছোটগিন্নীর বরাদ্দ চাল আসে, রহমতের বেতন হয়। মোট কথা, এখনও যেটুকু আছে, সে সেই বন্দোবস্তেরই কল্যাণে। এখন মাসের প্রথমেই চাল আসে—মাস বরাদ্দ বাঁদশাভোগ চাল, নিত্য প্রাতে লাখেরাজ বিল বন্দোবস্তের দরুন আসে মাছ, ওই বিল হইতেই জলচর পাখীর বন্দোবস্তের ফলে আসে—পাখী। এ সমস্ত অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ীর নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।

সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।

মহিম গাঙ্গুলী ভাবে, মরা পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।

ছোটগিন্নীর পিঠে ঘন্টা উঠিতেই, সে গরবিনীর মত গা দোলাইতে আরম্ভ করিল। ঘন্টা বাজিতে লাগিল, ঢং—ঢং—ঢং—

নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভরবাবু বসিয়াছিলেন অন্দরের হল-ঘরে। এখন এই একখানি ঘরই তিনি ব্যবহার করেন। দেওয়ালে রায়বংশের কর্তা-গিন্নীদের ছবি টাঙানো। সকলেরই প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি। সকলেরই গায়ে কালী-নামাবলী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপমালা। বিশ্বম্ভরবাবু সেই ছবির দিকে চাহিয়া ছিলেন। নায়েবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, অনন্ত, হাত-বাক্সটা দে তো।

হাত-বাক্স হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। সিন্দুকের উপরের থাকে রায়বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি শোভা পাইতেছিল। নীচের থাকে দুই-তিনটি বাক্স। রায় টানিয়া বাহির করিলেন একটি অতি সুদৃশ্য বাক্স। এটি তাঁহার মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স। রায় বাক্স খুলিলেন। বাক্সটির গর্ভ প্রায় শূন্য। অলঙ্কারেরমধ্যে একটি সিঁথি রহিয়াছে এই সিঁথিটি সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী। ওইটি ছাড়া সব গিয়াছে। পাশের একটি খোপে কয়খানি মোহর।

এগুলির কয়েকখানি রায়-গিন্নীর আশীর্বাদের মোহর, কয়খানা যুবক বিশ্বম্ভরের পত্নীকে প্রথম উপহার। বিবাহের বৎসরই প্রথম তিনি মহালে যান। নজরানার মোহর হইতে কয়খানা তিনি পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহারই একখানা লইয়া নায়েবের হাতে নিঃশব্দে তিনি তুলিয়া দিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরই ছোটগিন্নীর ঘন্টার শব্দ সুউচ্চ হইয়া উঠিল। রায় আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ছোটগিন্নীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে—ললাটের তৈলসিক্ত অংশটুকু ঘিরিয়া সিন্দুরের রেখা আঁকা। ছোটগিন্নী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

অপরাহ্ণে গাঙ্গুলীদের ঝকঝকে মোটরখানা আসিয়া লাগিল রায়বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে। গাড়ি হইতে নামিলেন মহিম গাঙ্গুলী নিজে। নায়েব তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন, আসুন।

অনন্তও দোতলা হইতে ঘটনাটা দেখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া রায়বাড়ির খাস বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায়—দেখা করব যে!

গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিমের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে—হুজুর। তারাপ্রসন্ন মহিমের কথার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখে মিষ্টভাবেই বলিল, হুজুর এখনও ওঠেন নি। খেয়ে শুয়েছেন।

মহিম বলিল, ডেকে তুলতে ব'লে দিন।

তারাপ্রসন্ন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, সে সাহস আমাদের কারও নেই। আপনি বরং ব'লে যান আমাকে কি বলতে হবে, আমি বলব।

অসহিষ্ণুভাবে মহিম বলিল, না, আমাকে দেখা করতেই হবে।

অনন্ত আসিয়া রূপার গ্লাসে গাঙ্গুলীর সম্মুখে শরবত ধরিল।

গ্লাসটি লইয়া মহিম অনন্তকে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদা উঠেছেন রে?

উঠেছেন। আপনার খবর দিয়েছি। ডাকছেন আপনাকে তিনি।

শরবত পান করিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার গন্ধটুকু তো! কিসের শরবত রে?

অনন্ত মিথ্যা কথা বলিল, আজ্ঞে, কাশীর মসলা, আমি জানি না ঠিক।

দোতলার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল, কই ঠাকুরদা, আপনি যে খেতে গেলেন না?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন এস, এস, ব'স ভাই।

মহিম বলিল, আমার ভারি দুঃখ হয়েছে ঠাকুরদা।

তেমনই হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদাদা ব'লে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব, কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর ফরসি টানার ভানে নীরব রহিলেন।

মহিম বলিয়া গেল, শখ ক'রে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আনিয়েছি। তাদের গানে কদর আপনি ভিন্ন আমরা বুঝব না।

কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টানিয়া নলটি রায় রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড়

কাতর করে আমাকে।

মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তা হ'লে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তাঁরা সব আসবেন কিনা।

বিশ্বম্ভর শুধু বলিলেন, দুঃখ ক'রো না ভাই।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একবার দাঁড়াইয়া সহসা বলিয়া উঠিল, বাড়িটা ক'রে রেখেছেন কি ঠাকুরদা, মেরামত করানো দরকার যে।

সে কথার কেহ জবাব দিল না।

অনন্ত শুধু বলিল, আসুন হুজুর।

গাঙ্গুলীবাড়িতে নীচের আসর আলোর ঐশ্বর্যে ঝকমক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙ্গুলীদের নিজেদের 'ডায়নামো'। ইলেকট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খুঁটিগুলি গাছের পাতা ও ফুল দিয়া সাজানো। রঙিনকাগজের মালা চারিপাশ বেড়িয়া ঝুলিতেছে। নীচে শতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া আসর পড়িয়াছে। এক দিকে সারি সারি চেয়ার, অন্য দিকে ঢালা বিছানায় সাধারণ শ্রোতাদের বসিবার স্থান। খানিক দূরে মেয়েদের আসর!

রাত্রি আটটার মধ্যেই আসর ভরিয়া গেল। তবলচী, সারঙ্গী আপন আপন যন্ত্রের সুর বাঁধিতেছিল। দুইজন পশ্চিমা নর্তকী পেশোয়াজ-ওড়নায়-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসরে আসিয়া বসিল। আসরে কোলাহল মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। হাঁ, রূপ বটে!

গান আরম্ভ হইল। ওদিকে চেয়ারে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মহিম গাঙ্গুলী বসিয়া।

দুইজন নর্তকীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া গান ধরিয়াছিল। দীর্ঘ সুরে রাগিণীর আলাপে আসরখানা যেন ঝিমাইয়া আসিল। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা শুরু হইয়া গেল। বিশিষ্ট শ্রোতামহলে কি একটা হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। গাঙ্গুলীবাড়ীর চাপরাসীর দল সাধারণ শ্রোতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিল, চুপ—চুপ।

গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া উঠিল, বাঃ,—বাঃ! নর্তকীর নৃত্যগতি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কি কয়টা কথা বলিয়া তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল।

দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপলগতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটা পাহাড়ী ঝরনা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট বখশিশ আসিল।

তারপর আবার—আবার—আবার। আর আসর অলসমন্থর হয় নাই। আসর ভাঙিলে মহিম ডাকিয়া বলিল, সকলে খুব খুশী হয়েছেন।

সেলাম করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, আপনাদের মেহেরবানি।

সত্যই মহিমের মেহেরবানির অন্ত ছিল না। তিন দিন বায়নার স্থলে পাঁচ দিন গাওনা হইয়া তবে শেষ হইল।

বিদায়ের দিন আরও মেহেরবানি সে করিল। বিদায় করিয়া বলিয়া দিল, এখানে আমাদের রাজবাড়ি আছে, একবার ঘুরে যেয়ো। বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়তো হতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠা সম্ভ্রমভরে কহিল, ওঁর কথা আমরা শুনেছি হুজুর। জরুর যাব রাজাবাহাদুরের দরবারে। সে মতলব আমার প্রথম থেকেই আছে।

তারাপ্রসন্ন মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ ওই কুটিল মহিম গাঙ্গুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে। সে গম্ভীরভাবে বলিল, বাবুর তবিয়ত আচ্ছা নেই—নাচগান এখন হবে না।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজীটি বলিল, মেহেরবানি করকে—

বাধা দিয়া তারাপ্রসন্ন বলিল, সে হয় না।

বাইজী দুঃখিতভাবে বলিল, মেরে নসিব।

তাহারা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এমন সময় দোতলা হইতে হাঁক আসিল, তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্ন আসিতেই বিশ্বম্ভর বলিলেন, কে ওরা?

নতমুখে তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি ওরাই এসেছিল মুজরো করতে।

হুঁ।—তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, শুধু ফিরিয়ে দিলে?

সেলাম পৌঁছে হুজুরকো পাশ।— মুসলমানী কায়দায় আভূমিনত অভিবাদন করিয়া বাইজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাছারি-ঘর হইতে এদিকের বারান্দা ও ঘরের খানিকটা দেখা যায়। বিশ্বম্ভরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাইজী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

এত্তালা না দিয়া উপরে উঠিয়া আসার জন্য বিশ্বম্ভর রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে রাগ রহিল না। বাইজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।

বাইজী আবার অভিবাদন করিয়া বলিল, কসুর মাপ করতে হুকুম হয় মেহেরবান; এত্তালা না দিয়ে এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর দেখিতেছিলেন বাইজীর রূপ। দাড়িমের মত রঙ সুর্মা আঁকা টানা দুইটি চোখ—মাদকতা-ভরা চাহনি, গোলাপের পাপড়ির মত দুই ঠোঁট, ঈষৎ দীর্ঘ দেহখানি, ক্ষীণ কটি, নৃত্য আলস্যভরে দেহখানিতে বিরাম লইয়াছে। এ চঞ্চল হইলেই সে মুখর হইয়া উঠিবে।

বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, বৈঠিয়ে।

অদূরবর্তী গালিচার উপর বাইজী সসম্ভ্রমে বসিয়া বলিল, হুজুর বাহাদুরের দরবারে বাঁদী গান শোনাবার জন্য হাজির।

বিশ্বম্ভর বলিতে গেলেন, তাঁহার তবিয়ৎ খারাপ। কিন্তু কেমন লজ্জা হইল, একটা তওয়াইফের সম্মুখে মিথ্যা বলিতে বুঝি ঘৃণা হইল।

বাইজী বলিল, সবার মুখে শুনেছি, এখানকার বড় ভারি সমঝদার হুজুর বাহাদুর।

গাঙ্গুলীবাবুও বললেন—আমীর, এখানকার রাজা আপনি।

রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হবে মজলিস সন্ধ্যের সময়। তারপর ডাকিলেন, অনন্ত।

অনন্ত বাহিরেই ছিল। সম্মুখে আসিতেই বলিলেন, এঁদের বাসা দিয়ে দে। নীচে তালুকদারের ঘর একখানা খুলে দে।

অনন্ত বলিল, আসুন।

বাংলা বলিতে না পারিলেও বাংলা বুঝিতে বাইজীর কষ্ট হইল না। উঠিয়া অভিবাদন করিয়া সে কহিল, বহুৎ নসীব মেরে—বহুৎ মেহেরবানি হুজুরকো।

অনন্তকে অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া ছিল—নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে কহিল, গাঙ্গুলীদের বাড়ি এক শো টাকা ক'রে রাত্রি নিয়েছে ওরা।

হুঁ।

কয়বার নলে টান দিয়া রায় বলিলেন, তোমার তহবিলে কি—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি আবার নলে টান দিতে আরম্ভ করিলেন। তারাপ্রসন্ন বলিল, দেবোত্তরের তহবিলে শুধু শ-দেড়েক টাকা আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রায় উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিলেন সেই বাক্সটি। বাক্সের মধ্য হইতে রায়-বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিখানি তুলিয়া তারাপ্রসন্নের হাতে দিয়া বলিলেন, দেবোত্তরের খাতায় খরচ লেখ—আনন্দময়ীর জন্য জড়োয়া সিঁথি খরিদ, দাম ওই দেড় শো টাকা।

আনন্দময়ী রায়-বংশের ইষ্টদেবী—পাষাণময়ী কালী।

বহুদিন পর নিস্তব্ধ রায়বাড়ি তালা খোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জলসাঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া গেল। বাতিঘরের তালা খুলিল। ফরাসঘরে আলোক প্রবেশ করিল।

অনন্ত ঘর-দুয়ার ঝাড়িতেছিল। সাহায্য করিতেছিল নিতাই ও রহমৎ। ঠাকুরবাড়ির পুরানো ঝি মাজিতেছিল—আসাসোঁটা গড়গড়া, বড় বড় পরাত, গোলাপ-পাশ, আতরদান। নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া সমস্ত দিকের তদারক করিতেছিল।

অনন্ত বলিল সদরে লোক পাঠাতে হবে নায়েববাবু।

নায়েব বলিল, ফর্দ করেছি আমি। শোন দেখি, কিছু ভুল হল কি না।

ফর্দ শুনিয়া অনন্ত কহিল, সবই হয়েছে, বাদ পড়েছে দুটো জিনিস। ভরি দুই আতর আর বিলিতি বোতল কটা।

নায়েব বলিল, ছিল তো একটা।

তাতে আর খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু এক-এক দিন খান তো। কিন্তু আজ যদি চান, তবে একটা বোতলে হবে না নায়েববাবু।

নায়েব বলিলেন, কিন্তু পাঠাই কাকে? পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের আগে কি ফিরবে?

অনন্ত দ্বিধাভরে বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাই-ই নয় যাক।

নিতাই বলিল, হুজুর হুকুম না করলে—

নায়েব বলিল, আচ্ছা, আমি বলে আসছি।

বিশ্বম্ভরবাবু শুইয়া ছিলেন। নায়েব গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। একবার গাঙ্গুলীবাড়িতে যাও, মহিমকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসো। আর গ্রামে ভদ্রলোক বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করতে হবে। গাঙ্গুলীবাড়ি যাও তুমি নিজে।

নায়েব বলিল, তাই যাব।

রায় বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠে গদি দিতে বল।

নায়েব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাইকে পাঠানো দরকার সদরে।

হুঁ।

কিছুক্ষণ পর রায় বলিলেন, তাই যাক।

আরও কিছুক্ষণ পর তুফানের হ্রেষা শুনিয়া রায় সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। বাড়ির পিছন দিয়া দেবদারুছায়াচ্ছন্ন রায়েদের নিজস্ব পথখানি পরিস্কার দেখা যায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সে পথ বাজিয়া উঠিল। রায় দেখিলেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দীপ্ত পদক্ষেপে তুফান দুর্দান্তপনা করিতে করিতে চলিয়াছে। তেমনই বাঁকানো ঘাড়, তেমনই পদক্ষেপ।

আরও কিছুক্ষণ পর ছোটগিন্নীর পিঠের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রায় উঠিয়া বসিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, গরবিনী ছোটগিন্নী চলিয়াছে। রায় বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর পদচারণা আরম্ভ করিলেন। দেহ-মন কেমন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে

সমারোহ। রায়বাড়িতে বহুদিন পর সমারোহ।

ওদিকের জলসাঘর হইতেই বোধ করি শব্দ আসিতেছিল—ঠুং—ঠাং—ঠুং—ঠাং। বেলোয়ারী ঝাড়ের শব্দ। রায় ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনন্ত ঝাড়দেওয়ালগিরি ঠুকে ঠুকে টাঙাইতেছিল পদশব্দে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়। তিনি চাহিয়া আছেন—দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকের প্রাচীরবিলম্বিত রায়বংশের মালিকদের যুবাবয়সের প্রতিকৃতি। আদিপুরুষ ভুবনেশ্বর রায় হইতে তাঁহার নিজের পর্যন্ত—সকলেরই বিলাস ও ব্যসন মত্ত প্রতিকৃতি। প্রপিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার-করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কি বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসিয়া আছে গদির উপর, পাশে বসিয়া ছোটগিন্নী। যুবক বিশ্বম্ভর তুফানের উপর আরূঢ়।

রায়বংশ এই ঘরে ঝাড়ের খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। রায়ের মনে পড়িল কত কথা। দুর্দান্ত রাবণেশ্বর এ বংশের প্রথম ভোগী পুরুষ। তিনিই এই জলসাঘর তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। প্রথম যেদিন এই জলসাঘরে তিনি মজলিস করিয়াছিলেন, সেই দিনই রাবণেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র সব শেষ হইয়াছিলেন। বাতিদানের বাতি অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই নিবিয়াছিল। তাহার পর আর তিনি সাহস করিয়া জলসাঘরের দুয়ার খোলেন নাই।

সেই দিন রায়বংশের শেষ হইলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু রাবণেশ্বর রায়বংশের মমতায়

পুনরায় আপনার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এ তাঁহার আনন্দময়ীর আদেশ। তাঁহারই পুত্র তারকেশ্বর এই জলসাঘরের দুয়ার খুলিয়া আবার বাতি জ্বালিয়াছিলেন। তিনি এক রাত্রে এই ঘরে এক আমীর বন্ধুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাঁচ শত মোহর এক বাইজীকে বকশিশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িল—চন্দ্রা, চন্দ্রাবাঈ। আসর ভাঙার পর বন্ধুদের লুকাইয়া চন্দ্রার সহিত আলাপ বুকের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ফুলের স্তবকের মত চন্দ্রা।

অনন্তের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত আর সরিতেছিল না। রায়ের মুখখানা থমথমে রাঙা—যেন কোন রুদ্ধমুখ শিরা খুলিয়া আবদ্ধ রক্তধারা সে মুখে উৎসের মত আজ উথলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে অনন্ত পরাতের উপর রূপার গ্লাসে শরবত বসাইয়া রায়ের সম্মুখে নিঃশব্দে ধরিয়া দিল। রায় চাহিয়া দেখিলেন, অনন্তের অঙ্গে জরিদার চোপদারের উর্দি, কোমরে পেটি, মাথায় পাগড়ি, বুকে রায়বাড়ির তকমা। তিনি নিঃশব্দে গ্লাসটি উঠাইয়া লইলেন। অনন্ত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে কোঁচানো ধুতি, শুভ্র ফিনফিনে মিহি মুসলমানী ঢঙের পাঞ্জাবি, রেশমের চাদর নামাইয়া রাখিল। রায় চিনিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদে জমিদার-বন্ধুর বাড়ি যাইবার সময় এই পোশাক তৈয়ারি হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিলেন, সব ঠিক আছে?

মৃদুস্বরে অনন্ত বলিল, বাতি জ্বালা হচ্ছে।

লোকজন?

অনন্ত বলিল, নাখরাজদার ভাণ্ডারীরা বাপ-বেটায় এসেছে। দেবোত্তরে নাখরাজদার পাইক এসেছে চারজন, তারা দেউড়িতে আছে।

নীচে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল।

অনন্ত ত্রস্তপদে নীচে চলিয়া গেল। মহিম গাঙ্গুলী আসিয়াছে। সিঁড়ির বুকে চলা-ফেরার শব্দ শোনা যায়। নীচের তলায় অতিথি-অভ্যর্থনার সাদর সম্ভাষণ, পরস্পরের সহিত আলাপের গুঞ্জন উঠিতেছে। ক্রমে জলসাঘরে তারের যন্ত্রের মৃদু সুর জাগিয়া উঠিল। তবলার ধ্বনিও শোনা গেল। সুর বাঁধা হইতেছে।

অনন্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, হুজুর।

বিশ্বম্ভর বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিলেন। উত্তর দিলেন, হুঁ।

আসর বসতে পারছে না।

হুঁ।

কয়েক মুহূর্তে পরে তিনি বলিলেন, জুতো দে।

অনন্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নীরবে কোণের টেবিলের দেরাজ খুলিয়া বোতল ও গ্লাস বাহির করিল। দেরাজের উপরে সেগুলি নামাইয়া দিয়া সে জুতা বাহির করিয়া ঝাড়িতে বসিল। রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারি শুরু করিলেন। নীচে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

অনন্ত ডাকিল, হুজুর।

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

আবার কয়বার তিনি ঘুরিলেন। সে গতি যেন ঈষৎ দ্রুত। অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে রায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সোডা।

প্রকাণ্ড বড় হলটার তিন দিকে লম্বা ফালির মত গদি পাতিয়া তাহার উপর জাজিম বিছাইয়া শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পিছনে সারি সারি তাকিয়া। হলের ছাদে পাশাপাশি তিনটি বেলোয়ারী ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে দেওয়ালগিরিতে বাতির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলি শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্বল্পমান ছায়ারেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিতেছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।

আসর বসিয়াছে—কিন্তু গতি এখনও অতি মৃদু। যন্ত্রবাদ্যের ঝঙ্কার অঙ্কুরের মত সবে দেখা দিয়াছে। চারিপাশের আসরে বসিয়া ত্রিশ-চল্লিশজন ভদ্রলোক মৃদু গুঞ্জনে আলাপ করিতেছেন। চার-পাঁচটা গড়গড়া-ফরসিতে তামাক চলিতেছে। তওয়াইফ দুইজন নীরবে বসিয়া আছে মাঝে মাঝে কেবল মহিম গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সিগারেট টান দিয়া সে নিবন্ত বাতিগুলোর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কটাবাতি নিবে গেল যে হে। কেহ এ কথার জবাব দিল না। সে ডাকিল, নায়েববাবু। তারাপ্রসন্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে বলিল, দেখুন, আলো বেশ খোলে নি। আমার ড্রাইভারকে ব'লে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। বয়োজ্যেষ্ঠা নর্তকীটি কেবল উর্দুতে বলিল—যেন স্বগতোক্তি করিল, এ ঘরে সে আলো মানায় কি?

বাহিরে ভারী পায়ের জুতার আওয়াজে নায়েব পিছনে চাহিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত পরেই অনন্তের পিছনে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিশ্বম্ভর রায়। বাইজী দুইজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মজলিসের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মহিমও আপনার অজ্ঞাতসারে অর্ধোত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার বসিয়া পড়িল।

রায় স্বল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া মহিম সেটাকে সরাইয়া দিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাকিয়াটাকে কয়বার ঝাড়িয়া লইয়া বিস্ময়ভরে সে বলিল, বাপ রে বাপ, কি ধুলো। তারাপ্রসন্ন আতর বিলি করিয়া গেল। সমস্ত গড়গড়া-ফরসির কলিকা বদল করিয়া রায়ের সম্মুখে তাঁহার নিজের ফরসি নামাইয়া অনন্ত হাতে নল তুলিয়া দিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজী কুর্নিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ মন্থর গতিতে রাগিণীর আলাপ। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল। আসর আজ নিস্তব্ধ। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘ মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের

তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ওই সঙ্গে তবলচীর চর্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা ময়ূরীর মত নৃত্যভঙ্গী। গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে, দুই হাতে পেশোয়াজের দুই প্রান্ত আবদ্ধ, পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঃ।

সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যমুখর চরণচাপল্য স্থির হইয়া গেল ? ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত।

মহিম সরিয়া আসিয়া রায়ের কানে কানে বলিল, ঠাকুরদা, আসর যে জমছে না, গলা শুকিয়ে এল। কৃষ্ণাবাই সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলে যে।

কৃষ্ণবাই ঈষৎ হাসিল, বোধ করি সে বুঝিল। অনন্ত শরবৎ আনিয়া মহিমের সম্মুখে ধরিয়াছিল। মহিম কহিল, থাক, থাক, কদিন রাত্রি জেগে সর্দি ক'রে আছে আমার।

রায় ঈষৎ হাসিয়া অনন্তকে ইঙ্গিত করিলেন।

অনন্ত ফিরিয়া গিয়া বড় একটা পরাতের উপর হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পানীয় প্রস্তুত করিয়া অনন্ত মহিমকে দিয়া দ্বিতীয় গ্লাস তুলিয়া আসরের দিকে চাহিল। সকলে নতশির হইয়া বসিয়া ছিল। সে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে পানীয় অগ্রসর করিয়া ধরিল। নীরবে রায় গ্লাসটি ধরিলেন। মহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণী বাইজীকে লক্ষ্য করিতেছিল, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তুমি একবার আগুন ছড়িয়ে দাও দেখি।

পিয়ারী গান ধরিল। জলদ গতি। রায় চোখ মুদিয়া ছিলেন, একবার কেবল ফাঁকের ঘরে বলিলেন, জেরা ধীরসে।

কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে, চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুৎ আচ্ছা।

রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু তবু তিনি দুলিতেছিলেন সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত। দেহের মধ্যে শোণিতের ধারা—রায়বংশের শোণিতের অভ্যস্ত উগ্রতায় বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত। পিয়ারীকে দেখিয়া মনে পড়ে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার কথা। কৃষ্ণার সঙ্গে সাদৃশ্য দিল্লীওয়ালী চন্দ্রাবাইয়ের। চন্দ্রাবাই তাঁহার জীবনের একটা অধ্যায়। পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বকশিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর। চকিত হইয়া রায় সম্মুখে পাশে চাহিলেন। নাই—সম্মুখে রূপার পরাত নাই—আধারও তাই, আধেয়ও নাই। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাবাই তখন গান ধরিয়াছে। আসরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তবঙ্গের

মত তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফিরিতেছিল। তাহার গতিতাড়িত বায়ুতরঙ্গ শ্রোতাদের বুকে আঘাত করিতেছে। সে গাহিতেছিল—কানাইয়ার বাঁশী বাজিয়াছে ; উচ্ছ্বসিত যমুনা উজানে ফিরিল ; তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙিয়া কানাইয়াকে সে বুকে টানিয়া লইতে চায়। সে সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্ছ্বাস অপূর্ব। রায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গত শেষ হইল। রায় বলিয়া উঠিলেন, বহুৎ আচ্ছা চন্দ্রা।

কৃষ্ণা সেলাম করিয়া কহিল, বাঁদীকে নাম কৃষ্ণাবাই।

ওদিক হইতে মহিম ডাকিল, কৃষ্ণাবাই, থোড়া ইনাম ইধার।

রায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ধীর পদক্ষেপে মজলিস অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দার বুকে পাদুকাশূন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

মহিম বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তোমার আর একখানা।

কৃষ্ণা বলিল, হুজুর-বাহাদুরকে আনে দিজিয়ে।

মহিম বলিল, আসছেন তিনি, তার আর কি। ওই—ওই বোধ হয় আসছেন তিনি

রায় নয়-প্রবেশ করিল নায়েব তারাপ্রসন্ন। একটি রূপার রেকাবি আসরে সে নামাইয়া দিল। রেকাবের উপর দুইখানি মোহর।

নায়েব বলিল, বাবু ইনাম দিলেন।

মহিম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তিনি কই ?

তাঁর বুকে ব্যথা ধরেছে। তিনি আজ আসতে পারবেন না। আপনারা গান শুনুন তিনি মাফ চেয়েছেন সকলের কাছে।

মজলিসের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠিল।

মহিম উঠিয়া শৈথিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল, উঠ তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

তারাপ্রসন্ন আপত্তি করিল না। অপর সকলেও উঠিয়া পড়িল মজলিস ভাঙিয়া গেল

ঘরের মেঝের উপর রায়-গিন্নীর হাতবাক্সটা খোলা পড়িয়া ছিল গর্ভ তাহার শূন্য রায় নিজে প্রক্ষেপহীনভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে উন্নত শিরে রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই উত্তেজনায়, সুরার উগ্রতায় দেহের রক্ত যেন ফুটিতেছিল। স্থান কাল আজ সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। জলসাঘরের আলোকের দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়বংশধরগণ। বিশ্বম্ভর খোলা জানালার দিকে চাহিলেন। জোৎস্নায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাসের সর্বাঙ্গ মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। কোথায় কোন্ গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলিয়া ডাকিতেছে, পিউ-কাঁ-হাঁ—পিউ-কাঁ-হাঁ। রায়ের মনের মধ্যে সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বহুদিনকার ভুলিয়া যাওয়া চন্দ্রার মুখের বোল—শুনু যা শুনু যা পিয়া— । মাথার উপরে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ মধ্যগগনে। পদশব্দে পিছন ফিরিলেন। অনন্ত বাতি নিবাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, থাক।

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। রায় ডাকিলেন, এস্রাজটা এনে দে আমার।

অনন্ত এস্রাজ লইয়া আসিল। জানালার সম্মুখে এস্রাজ-কোলে রায় বসিয়া বলিলেন, ঢাল্‌!

পরাতের উপর খোলা বোতল পড়িয়া ছিল—রায় ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পানীয় দিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

এস্রাজের তারের বুকে ছড়ির টান পড়িল। নিস্তব্ধ পুরীর মধ্যে সুর জাগিয়া উঠিল। বিভোর হইয়া রায় এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছেন। এস্রাজ কি কথা কহিয়া উঠিল ? মৃদু ভাষা যে স্পষ্ট শোনা যায়।

গানের কথাগুলি রায়ের কানে বাজিতেছিল—নিশীথরাত্রে হতভাগিনী বন্দিনী, দুয়ারের পাশে প্রহরায় জাগিয়া বিষাক্ত ননদিনী ! নয়নে আমার নিদ্রা আসে না, নিদ্রার ভানে আমি তোমারই রূপ ধ্যান করি ; হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে ?

রায় এস্রাজ ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ?

মৃদুস্বরে তিনি ডাকিলেন—চন্দ্রা—চন্দ্রা !

তাঁহার চন্দ্রা ! এ গানও যে চন্দ্রার ! বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল, জনাব !

রায় ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন,—চন্দ্রা,—চন্দ্রা, আও, ইধর আও। দোস্ত্‌ লোক চলা গিয়া চন্দ্রা !

কৃষ্ণা স্মিত সলজ্জ মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিয়া যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলেন, তাহার শেষ চরণ গাহিল—হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে ? হাসিয়া রায় তাঁহার মোটা গলা যথাসম্ভব চাপিয়া গান ধরিলেন—ওগো প্রিয়া, এমন রাত্রি, বুকে আমার বিজয়োল্লাস, একা কি আজ থাকা যায় ?

রায় বোতলের ছিপি খুলিতেছিলেন। হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণাবাই বলিল, জনাবকে হুকুম হোয়ে তো বাঁদী দে সক্‌তে হেঁ। মৃদু হাসিয়া রায় বোতল ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণা বোতল খুলিয়া দিল। মদ ঢালিয়া গ্লাস রায়-বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

আবার এস্রাজের সুর উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মৃদুস্বরে গান ধরিল। কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল। সে গাহিল—হে প্রিয়, ঝরা ফুলের মালা আমি গাঁথি না ; উচ্চ শাখায় ওই যে ফুলের স্তবক, ওই আমায় দাও ; আমায় তুমি তুলিয়া ধর, আমি নিজে চয়ন করিব তোমার জন্যে। উর্দ্ধ মুখে হাত দুইটি বাড়াইয়া সে নাচিতেছিল। রায় এস্রাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠাতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্চে তুলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন। গান শেষ হইল। কৃষ্ণা পড়িয়া যাইবার ভানে চিৎকার করিয়া উঠিল। পর-মুহূর্তে সে নামিয়া পড়িল। সুরামত্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী !

গানের পর গান চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। একটা বোতল শেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বোতলটাও শেষ হয়-হয়। একটু পরেই বাইজীর অবশ দেহ এলাইয়া পড়িল—ফরাসের উপর। বিশ্বম্ভর তখনও বসিয়া—মত্ত নীলকণ্ঠের মত। বাইজীর অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। একটা তাকিয়া সযত্নে তাহার মাথায় দিয়া ভাল করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া

দিলেন। তারপর এস্রাজ টানিয়া লইয়া আবার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হইতে চলিল। কিন্তু, রাত্রি শেষ হইল না। এমন সময় গাঙ্গুলীবাড়ির তিনটার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, ঢং—ঢং—ঢং।

রায়বাড়ির খিলানে খিলানে পারাবতের গুঞ্জন উঠিল। রায়ের চমক ভাঙিল। নিত্য এই শব্দে নিদ্রা ভাঙে—তিনি উঠিয়া পড়িলেন। একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী। তারপর বারান্দার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত।

অনন্ত গিয়াছিল ছাদে প্রভুর জন্য তাকিয়া গালিচা পাতিতে। নীচে নামিয়া আসিতেই রায় তাহাকে বলিলেন, পাগড়ির চাদর, সওয়ারের পোশাক দে। নিতাইকে ব'লে দে তুফানের পিঠে জিন দিতে—জলদি।

সবিস্ময়ে অনন্ত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, রায় গোঁফে চাড়া দিতেছেন। এ মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়, কিন্তু বহুদিন দেখে নাই। সে মৃদুস্বরে বলিল, মুখে হাতে জল দিন।

কিছুক্ষণ পরই তুফানের হর্ষপূর্ণ হ্রেষায় শেষরাত্রির বুক ভরিয়া উঠিল। তারাপ্রসন্নের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। জানালা হইতে সে দেখিল—তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত পায়জামা, গায়ে আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদারি নাগরা, হাতে চামর দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধুলার ঘূর্ণি উড়াইয়া তুফান তুফানের বেগে ছুটিয়াছিল। শেষরাত্রির শীতল বায়ু হু-হু করিয়া রায়ের ... স্পর্শ করিতেছিল। সুরার উগ্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম। গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি। পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ি চলিয়াছে। আরোহী তাহাতে দুই জন। বোধ হয় তাহারা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল, গাঙ্গুলীবাবুরা কিনে থেকে—

রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিরোধ করিলেন।

তখনও গাড়ির আরোহী বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।

তুফানের পিঠের উপর। কোথায়।—এ তিনি কোথায়। ক্রমে চিনিলেন, হারানো লাট কীর্তিহাট সম্মুখে। মুহূর্তে সোজা হইয়া, লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিলেন। আবার কশাঘাত। তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া রায় চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, পূর্বদিকে আলোর রেশ ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায় নাই।

রায় ডাকিলেন, নিতাই।

তিনি হাঁপাইতেছিলেন। অনুভব করিলেন, তুফানও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত

মুখটা রক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতেছিল। রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, বেটা—বেটা!

তুফান মুখ তুলিতে পারিল না। সুরার মোহ বোধ করি তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ্—ওঠ্।

নিতাই পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, বড় হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডা হ'লেই উঠবে।

চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রায় দেখিলেন, নিতাই। নিতাইয়ের হাতে তুফানকে দিয়া ত্বরিতপদে রায় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনও খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাড়-দেওয়ালগিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। এখনও আলো জ্বলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ। কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।

দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত।

অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরে দরজা বন্ধ কর্—জলসাঘরের—

আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

দুই পুরুষ

পরম কল্যাণীয়
শ্রীমান শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমান সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

'দুই পুরুষ' আমার দ্বিতীয় নাটক। আমার প্রথম নাটক 'কালিন্দী'। কিন্তু 'কালিন্দী' মূলত উপন্যাস। এই হিসাবে 'দুই পুরুষ'কে আমার প্রথম নাটক বলিলেও ভুল হইবে না। 'দুই পুরুষ' রচনাকালে নাম দিয়াছিলাম "পিতা-পুত্র" এবং ওই নামেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে বইখানি ছাপাও আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গালয় "নাট্যভারতী"র কর্তৃপক্ষ বইখানি শুনিয়া মঞ্চস্থ কবিবার অভিপ্রায়ে 'দুই পুরুষ' নামে বইখানিকে গ্রহণ করেন। রীতেন কোম্পানির পরিচালক শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার ধন্যবাদের পাত্র। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সতু সেনের ঋণ আমি অপরিসীম প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক ও গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহাদের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় আজ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে গেলেই বন্ধুস্তুতি দাঁড়াইবে। তবে কয়েকটি কথা না বলিলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণত বাহির হইতে অসৌজন্য এবং নাটকবিচার ও নাটকের অংশ পরিবর্তন-পরিবর্জন লইয়া স্বেচ্ছাচারিতার অপবাদ শোনা যায় ; কিন্তু শ্রীযুক্ত মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত সেন সে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সুযোগে বার বার তাঁহাদের আমি প্রীতিসিক্ত নমস্কার জানাইতেছি। 'দুই পুরুষে'র অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মহাশয়ও আমার পুরাতন বন্ধু ; তাঁহাকেও এই সঙ্গে নমস্কার জানাইতেছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "দেশ-দেশ নন্দিত করি" গানখানি দিয়া নাটকের যবনিকা অপসারণে সমগ্র নাটকখানি মুহূর্তে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে ; গানখানির জন্য নাটকখানি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গানখানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এজন্য বিশেষভাবে তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

অপর গান কয়খানি বাংলার প্রতিভাশালী কবি-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা। তাঁহার নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা অনেক।

ঋণ স্বীকার করা ছাড়াও ভূমিকায় অনেক কথা, বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবন, বাংলার নাটক এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চ লইয়া বক্তব্য আমার কিছু ছিল। কিন্তু নাটক প্রকাশের মুখেই রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় সে ইচ্ছা আমার বর্তমানে অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল। বারান্তরে সুযোগ ঘটিলে সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

শখের নাট্যসম্প্রদায়কে একটি কথা নিবেদন করি। রিভলভিং স্টেজ (Revolving Stage)-এর সুবিধায় আসবাবপত্র দিয়া প্রতিটি স্টেজ সাজাইবার যে সুযোগ সাধারণ রঙ্গালয়ের আছে, তাহা তাঁহাদের নাই এবং গুটানো পট দিয়াই তাঁহাদের কাজ চালাইতে

হয়। অথচ আসবাব দিয়া দৃশ্য সাজাইবার প্রলোভন তাঁহারা সংবরণ করিতে পারেন না। ফলে প্রতি দৃশ্যের পর পর্দা ফেলিয়া আসবাব সরাইতে হয় ও নূতন করিয়া সাজাইতে হয়। তাহাতে অযথা সময়ক্ষেপে নাটকের অভিনয়ের গতি ব্যাহত হয়। সুতরাং তাঁহারা ওই প্রলোভন সম্বরণ করিয়া একটি প্রকাশ্য দৃশ্য (discover scene) এবং পরবর্তী দৃশ্যটি পট দিয়া আবৃত করিয়া অভিনয় করিবেন—এই অনুরোধ।

লাভপুর, বীরভূম

১লা আষাঢ়, ১৩৪৯ *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়*

অভিনয়ের সময়সংক্ষেপের জন্য এবং গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য নাটকের কতক কতক অংশ বাদ দেওয়া হয়। সেই অংশ গুলি [ ] বন্ধনীবেষ্টনের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল।

নাট্যভারতীতে

প্রথম অভিনয় : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

প্রথম রজনীর ব্যবস্থাপক ও অভিনেতৃগণ

প্রযোজক— শিশির মল্লিক

পরিচালনায়— নরেশ মিত্র, সতু সেন

সুরশিল্পী— দুর্গা সেন

নৃত্য-পরিকল্পয়িতা— হেমেন্দ্রকুমার রায়

ব্যবস্থাপক—বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নটুবিহারী	ছবি বিশ্বাস	কালী বাগদী	শান্তি দাশগুপ্ত
বরুণ	ফিরোজাবালা	মোড়ল	কুমার মিত্র
মহাভারত	রবি রায়	রাজেন	বিজয়কার্তিক দাস
কমলাপদ	তুলসী চক্রবর্তী	বিপিন	বিপিন বসু
শিবনারায়ণ	যোগেশ চৌধুরী	পুলিস	সুধীর গুপ্ত
ভৃত্য	জগবন্ধু চক্রবর্তী	ইন্স্পেক্টার	দ্বিজেন ঘোষ
গোপীনাথ	নরেশ মিত্র	জজ	ভোলানাথ শীল
চাপরাসী	আকাশচন্দ্র দে		সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবনারায়ণ	কালী সরকার (অ্যাঃ)		গোপীনাথ দে
সুশোভন	জহর গাঙ্গুলী		সুশীল রায়
ভগবান	শান্তি চক্রবর্তী	জুরীগণ	মোহনলাল যাজ্ঞিস
মুটে	বেচু দত্ত		বেচু দত্ত
অরুণ	মিহির ভট্টাচার্য		গিরীন ঘোষ
গ্রামবাসীদ্বয়	গিরীন ঘোষ		আকাশচন্দ্র দে
	উমাপদ দাস	দারোয়ান	জগবন্ধু চক্রবর্তী
পেশকার	উমাপদ দাস	ডাক্তার	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভৃত্যদ্বয়	গোপাল নন্দী	উকিল	শান্তি চক্রবর্তী
	প্রভাস বঙ্গ	সঙ্গত	বিশ্বনাথ কুণ্ডু
বৃদ্ধ	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	খেমটাওয়ালী	প্রতিভাবালা
বিমলা	প্রভা	বাইজী	হরিমতী
সাতু	রাজলক্ষ্মী		প্রতিভা, বন্দনা,
কল্যাণী	অঞ্জলি রায়		নির্মলা, সন্ধ্যারাণী,
শ্যামা	শান্তিলতা ও ছায়া দেবী	ছাত্রীগণ	মহামায়া, গীতা (১),
মমতা	গীতা ও পূর্ণিমা দেবী		গীতা (২), বীণাপাণি,
জমিদার-গৃহিণী	রেণুবালা		সত্যবালা, আশালতা

পরিচয়

নুটবিহারী	.....	আদর্শবাদী	দেশসেবক
অরুণ	.....	ঐ	পুত্র
বরুণ	.....	ঐ	পুত্র
মহাভারত	.....	ঐ	আশ্রিত চাষী
কমলাপদ	.....	ঐ	বন্ধু (মুনসেফ)
সুশোভন	.....	ঐ	ছাত্র, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পুত্র
বিপিন	.....	ঐ	মুহুরী
শিবনারায়ণ	.....	কঙ্কণার জমিদার	
দেবনারায়ণ	.....	ঐ	পুত্র
গোপীনাথ	.....	ঐ	গোমস্তা
কালী বাগদী	.....	জমিদারের	একান্ত অনুগত প্রজা
মণ্ডল	.....	ঐ	ঐ
রাজেন	.....		উকিল
বৃদ্ধ	.....		অবসরপ্রাপ্ত উকিল

জজ, জুরী, চাপরাসী, চাকর, প্রতিবেশীগণ, টাউট, কোর্ট-পুলিস, দারোয়ান

বিমলা	.....	নুটবিহারীর	স্ত্রী
শ্যামা	.....	ঐ	কন্যা
সাতু	.....	ঐ	দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা ভগ্নী
কল্যাণী	.....	ঐ	ছাত্রী, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কন্যা
মমতা	.....	কল্যাণীর	কন্যা
জমিদার-গৃহিণী	.....	শিবনারায়ণের	স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নুটবিহারীর আশ্রম। কাল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্যুষ
আকাশে সূর্যোদয় হইতেছে,

(বাগানের মধ্যে একখানি মেটে বাংলো-ধরনের ঘর। বাগানের মধ্যে ছোট ছোট সবজিক্ষেত দেখা যায়। দুই পাশে কয়েকটি বড় গাছ। মেটে বাংলোটির সম্মুখে একটি অনাবৃত চত্বর বা রোয়াক। সেই রোয়াকের উপর নুটবিহারী দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের দিকে। চারিদিকে পাখির কলরব। নুটবিহারী স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি যুবা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। মুখে বহু ক্লেশের চিহ্ন। কিন্তু সে চিহ্ন যুদ্ধজয়ীর ললাট-ক্ষতের মত তাহার রূপকে দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। পরনে খদ্দর। তাহার সম্মুখেই দুটি ছোট ছেলেমেয়ে—বরুণ ও শ্যামা জোড়হাতে গান গাহিতেছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব হইতেই তাহারা গাহিতেছিল)

(গান)

"যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয় অর্জিল জয় সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ওই
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন-ঘাতে।
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
দেশ-দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

(গান শেষ হইলে নুটু সস্নেহে ছেলে ও মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল)

নুট। যাও, এইবার পড়তে ব'স গিয়ে।

বরুণ। আজ কখন ছুটি দেবেন বাবা? আজ যে জগদ্ধাত্রী-পুজো।

শ্যামা। এক্ষুনি ঘট ভরতে যাবে বাবা, খানিক পরেই বলিদান হবে। কাল থেকে থিয়েটার হবে; ম্যারাপ বাঁধছে। একটু পরেই কিন্তু ছুটি দেবেন আমাদের।

নুট। একটু পরেই ছুটি দিতে হবে ?

বরুণ। আশ্রমের ছেলেদের তো আজ সমস্ত দিন ছুটি দিয়েছেন। বড়দার বড় ইস্কুলেরও আজ ছুটি। আমাদের—

নুট। আচ্ছা, তোমাদেরও যদি আজ সমস্ত দিন ছুটি দেওয়া হয় ?

(প্রবেশ করিল বিমলা—নুটবিহারীর স্ত্রী। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। দুঃখ-ক্লেশে শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু মুখে বিরক্তি। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর)

নুট। এস। কি সংবাদ ? চাল নেই, না, নুন নেই ? ওই দুটো না থাকলেই ভাবনা। বাকি সমস্তগুলোকেই বিলাসের পর্যায়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।

বিমলা। (ছেলেমেয়ের প্রতি) যা, পড়তে ব'স্‌গে যা।

নুট। ওদের আজ ছুটি। জগদ্ধাত্রী-পুজো। জগদ্ধাত্রীর গল্প শুনেই ওরা পুজো দেখতে যাবে।

বিমলা। যাবার সময় দুজনে দুটো লাউয়ের খোলা হাতে ক'রে যাস—বুঝলি ?

নুট। বরুণ, শ্যামা, তোমরা এখন পুজো দেখে এস। গল্প ও-বেলায় বলব।

(বরুণ ও শ্যামার প্রস্থান)

বিমলা। ওদের তাড়িয়ে দিলে যে ?

নুট। ওদের সামনে যে কথাটা তুমি বলবে, সেটা বলা খুব শোভন হবে না বিমলা।

বিমলা। আমি কি বলব তুমি জানতে পেরেছ ?

নুট। জানা কথা যে। আদিকাল থেকে গৃহিণীরা আমাদের মত স্বামীকে ওই একই কথা ব'লে আসছেন—

"অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধ'রে এ কি ছেলেখেলা
ভারতীরে ছেড়ে ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।"

'ভারতী কথাটা পালটে 'ভারত' বলতে পা'র। 'স্বদেশ' বললে আরও পরিষ্কার হবে।

বিমলা। (তিক্ত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিল) না। লক্ষ্মীর উপাসনা করতে বলতে আসি নি। বলতে এসেছি, লক্ষ্মীর উপাসনা যখন বর্জনই করেছ, তখন লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা, তাদের সঙ্গেই বা সম্বন্ধ রাখবে কেন ? রাখতে হয় তুমি রাখ, আমি রাখতে পারব না ; বাবুদের বাড়ির পুজোয় যজ্ঞির নেমন্তন্নে আমি যাব না, যেতে পারব না।

নুট। (গম্ভীরভাবে) কিন্তু আমি যে নিমন্ত্রণ নিয়েছি বিমলা।

বিমলা। তুমি নিয়েছ, তুমি যাও, তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও, আমি যাব না। আমায় যেতে ব'লো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যেতে ব'লো না।

নুট। তোমার যে অভিযোগ, সেটা তোমার মনের ভ্রম হতে পারে। দারিদ্র্যের জন্যে যাদের ক্ষোভ থাকে, ঐশ্বর্যের জন্যে গোপন আকাঙ্ক্ষা তাদের অনিবার্য ; তারাই কথায় কথায় সংসারে অপমান বোধ করে। এটা তাদের দুর্বল স্বভাবের ধর্ম।

দোতলার বারান্দায় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের বসবার জন্যে তোমাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল—এটা সত্যি নাও হতে পারে। হয়তো জায়গার অকুলান হচ্ছিল, তাই তোমাকে ব'লে থাকবেন—

বিমলা। হ্যাঁ, তাই সকলকে বাদ দিয়ে বেছে বেছে আমাকেই ব'লে থাকবেন—তুমি আবার এখানে কেন বাপু? তুমি নীচে গিয়ে ব'স। শুধু জায়গার অকুলান কেন? খাবার সামগ্রীরও অকুলান হয়েছিল, তাই খাওয়ার ব্যবস্থাও দুই রকম হয়েছিল। পাতার অকুলান পড়েছিল, তাই ছেঁড়া পাতায় খেয়েছি। সবই আমার মনের ভ্রম, ঐশ্বর্যের জন্যে ক্ষোভ, সম্পদের ওপর লোভ।

(নুট গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল)

ওই খোঁটাই তুমি চিরদিন আমাকে দিলে। দারিদ্র্যের জন্যেই আমার দুঃখের অন্ত নেই, টাকা পয়সা ছাড়া আমার আর কিছু কামনা নেই, তুমি গরিব ব'লে

নুট। (হাসিয়া) সে কি মিথ্যে বিমলা? সে কামনা কি তোমার নেই? সেটা কি তুমি অস্বীকার কর?

বিমলা। না, অস্বীকার করি না, স্বীকার করি। টাকা-পয়সা আমি চাই, সম্পদ আমি চাই। কেন চাইব না? আমার ছেলেমেয়েদের আমি সাধ মিটিয়ে খেতে পরতে দিতে চাই, আমার স্বামীকে—

নুট। আমার কথা বাদ দাও বিমলা

বিমলা কেন?

নুট। কারণ, এই আমার সবচেয়ে বড় সুখ। সংসারে কারও ঈর্ষার পাত্র নই আমি, কাউকে আমি বঞ্চনা করি নি। থাক, সে কথা তুমি বোঝ নি, বুঝবে না।

বিমলা আমি মুর্খ, সে কথা আমি জানি সেইজন্যেই তুমি আমায় ঘৃণা কর?

নুট। না, ঘৃণা তোমায় আমি করি না; তবে শিক্ষার গুণ আছে বইকি বিমলা

বিমলা হ্যাঁ। আছে বইকি। সেই গুণের আগুনেই তো তুমি পুড়ছ সে কি আর আমি জানি না। জানি। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে যে তোমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ধনীর ছেলের গলায় মালা দিলে, সে অপরাধ কি আমার? যার জন্যে একবিন্দু ভালবাসা তুমি আমায় দিলে না, দিতে পারলে না।

নুট। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বিমলার দিকে চাহিয়া থাকিল, তারপর বলিল) এও তোমার মনের ভ্রম বিমলা।

বিমলা। এও আমার ভ্রম? ভ্রম ক'রেই কি বিধাতা সংসারে আমাকে পাঠিয়েছিলেন? ভ্রম ছাড়া কি জীবনে আমার কিছু নেই?

নুট। তুমি উত্তেজিত হয়েছ বিমলা, ওসব কথা এখন থাক।

বিমলা। উত্তেজিত হয়েছি। তেজ থাকলে উত্তেজনা আসে মানুষের। আমার তেজ অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। উত্তেজিত আমি হই নি,

কেবল দুঃখের কথাই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।

(প্রস্থানোদ্যত)

নুট। শোন।

বিমলা। বল।

নুট। আমার অনুরোধ, তুমি খেতে যাও।

(বিমলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

তুমি যা বলেছ, সে কথা সত্যি কি না, আমি আবার একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই।

(বিমলা স্থির দৃষ্টিতেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

আমার অনুরোধ বিমলা, আমার—

নেপথ্যে মহাভারত মোড়ল। দাদাঠাকুর।

নুট। কে? মহাভারত?

[মহাভারত প্রবেশ করিয়া নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল]

মহা। দেখ দাদাঠাকুর, এই দেখ।

নুট। এ কি মহাভারত, তোমার বুকের ওপর জুতোর ছাপ।

মহা। জুতো সুদ্ধু লাথি মারলে বুকের ওপর।

নুট। কে?

মহা। ছোট তরফের ওই মাতাল ছেলেটা। বাবুদের থিয়েটার হবে, তাই বেগার দেবার কথা। কিন্তু ওদিকে আমার আলুর জমিতে খুঁড়বার, মাটি দেবার বাত হয়েছে, তাই গিয়ে জোড়হাত ক'রে বললাম—আজকে আমাকে রেহাই দ্যান। তা জুতো সুদ্ধু বসিয়ে দিলে বুকে লাথি।

নুট। (মহাভারতের মুখের দিকে স্তব্ধভাবে আরও শুনিবার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল) তার পর?

মহা। বড়বাবুর কাছে গেলাম, তা বাবু কথাটা উড়িয়েই দিলেন ; বললেন—উঃ, তুই বেটার তো মহা ভাগ্যি রে বেটা চাষা ; একে ব্রাহ্মণ, তায় জমিদার—রাজা।

বিমলা। তায় শুধু-পা নয়, জুতো সুদ্ধু লাথি।

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ মা। সেই কথাই বললেন, বলে—ভগবান ভৃগুমুনির লাথি খেয়েছিলেন, পায়ের দাগ নাকি বুকে আঁকা আছে।

নুট। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে পারবে মহাভারত?

বিমলা। কথাটা তুমি ভুল বললে।

নুট। কেন?

বিমলা। জলে বাস করলেই কুমীরে খায় ; বাদ করলেও খায় না, করলেও খায়।

মহা। ঠিক বলেছ-মা, ঠিক বলেছ। চিরকাল বেগার দিয়ে এলাম, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, দেবতাদের সঙ্গে বাবুদিগে দিয়ে এলাম। দাদাঠাকুর, মেয়ের বিয়েতে দেড় শো টাকা ধার নিয়েছিলাম বড়বাবুর কাছে, সুদ দিয়েছি

দু শো পঁচাত্তর টাকা দশ আনা। চক্রবৃদ্ধি সুদ। খাজনার সুদ টাকায় সিকি, তার ওপরে মামুলী চাঁদা—এবার আবার হাসপাতালের চাঁদা টাকায় এক আনা।

নুট। হাসপাতালের চাঁদা ?

মহা। বাবুরা হাসপাতাল দেবে।

বিমলা। সে তো ভালই হবে, বেতের ঘায়ে চামড়া ফেলে গেলে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দেবে।

মহা। মাজিষ্টর সাহেব বলেছে, দিতে হবে।

নুট। (হাসিল) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দীর্ঘজীবী হোন, কল্যাণ হোক তাঁর।

মহা। মাজিষ্টর সাহেবের কাছে তুমি একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

নুট। দরখাস্ত নয় মহাভারত, বুকের এই দাগ দেখিয়ে তুমি ফৌজদারী একটা নালিশ ক'রে দিয়ে এস। পাববে ?

মহা। পাবব।

নুট। খরচ আছে ?

মহা। খরচ !

নুট। হাঁ খরচ লাগবে তো।

(বিমলা ভিতবে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল)

যেয়ো না বিমলা, দাঁড়াও।

বিমলা। না।

নুট। না নয়, শোন।

বিমলা। না না না। আমার সম্বলের মধ্যে দুগাছা শাঁখা-বাঁধা, আর মরা খুকীর দুগাছা বালা। সে আমাব কাছে চেয়ো না, আমি পারব না—সে দিতে আমি পারব না। (চলিয়া গেল)

নুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ও আত্মসংবরণ করিয়া) মার এক মোক্তার বন্ধুকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি মহাভারত, তুমি তার কাছে যাও। আমরা দুজনে একসঙ্গে মোক্তারি পাস করেছিলাম। তার পসারও ভাল। আমার বিশ্বাস, সে আমাব কথা রাখবে।

(ঘর হইতে লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল)

মহা। তুমি যদি মোক্তারি করতে দাদাঠাকুর, তবে কেমন হ'ত বল দেখি ? ছেলেপিলে ঘর-সংসাবেব এই দুঃখ, মোক্তারি পাস ক'রে এসে তুমি গরিবগুলোর ছেলে নিয়ে কি পাঠশালা করছ. এতে যে কি হবে তুমিই জান। ওকালতি প'ড়ে পাস দিলে না। মোক্তারি পাস ক'রে পাঠশালা করছ। মা-ঠাকরুনের রাগের দোষ কি বল ? দাদাঠাকুর, তুমি আবার মোক্তারি আরম্ভ কর না কেন ?

নুট। (চিঠি শেষ করিয়া) এই চিঠি নিয়ে তুমি যাও। মোক্তার হরেন্দ্রনাথ বসু। হরেনবাবু মোক্তারকে সবাই চেনে ; বড় মোক্তার তিনি। এখনই চ'লে যাও তুমি। এই তো তিন মাইল রাস্তা—রামপুর। তবে আর একবার ভেবে দেখ।

যে আগুন জ্বালতে চাচ্ছ, তার আঁচ তোমাকেও লাগবে, হয়তো তাতে তোমাকে পুড়তেও হতে পারে।

মহা। চিতের কড়ি বেঁচে যাবে দাদাঠাকুর, আমার চিতের কড়ি বেঁচে যাবে। দাও চিঠি দাও। (চিঠি লইয়া প্রস্থান)

নুট। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনেই আবৃত্তি করিল)

"হে, মোর দুর্ভাগ্য দেশ যাদের করেছ অপমান—
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে—"

(ঠিক এই মুহূর্তেই বিমলা আসিয়া দুইগাছি শিশুর বালা ও নিজের দুইগাছি শাঁখা-বাঁধা নুটুর সম্মুখে ফেলিয়া দিল)

বিমলা। এই নাও।

নুট। (আবৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল) নিয়ে যাও, আর দরকার নেই। মহাভারত চলে গেছে।

বিমলা। না, দরকার আছে। মহাভারতকে ডাক।

নুট। না। আমি আমার এক মোক্তার বন্ধুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে বিনা পয়সাতেই কাজ ক'রে দেবে। আদালত-খরচা পরে নেবে। আমার অনুরোধ সে নিশ্চয় রাখবে।

বিমলা। না, ক'রে দেবে না। এ তোমার অন্যায় অনুরোধ। বিনা পয়সায় কেন সে ক'রে দেবে ?

নুট। সংসারে পয়সাটাই সকলের কাছে বড় জিনিস নয় বিমলা।

বিমলা। (কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) আমার কাছেই পয়সাটা সকলের চেয়ে বড় জিনিস, না ?

(নুট কোনও উত্তর দিল না)

(প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় তেমনই ভাবেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত অভিমানে প্রশ্ন করিল) কেন ? কেন ? কেন তুমি আমাকে এমন ভাবে অপমান কর ?

নুট। না। তোমায় অপমান আমি করি নি। এও তোমার মনের ভ্রম।

বিমলা। এও আমার ভ্রম। (দৃঢ়স্বরে) না, এ আমার ভ্রম নয়। শুধু আজ ব'লে নয়, সমস্ত জীবনটাই তুমি আমায় অপমান ক'রে এসেছ।

নুট। বিমলা, তুমি কি বলছ ?

বিমলা। আমি ঠিক বলছি। বিয়ে ক'রে স্বামী যদি স্ত্রীকে ভালবাসতে না পারে, তাকে যদি ঘৃণা করে, আর দয়া ক'রে যদি সেই ঘৃণা মনে চেপে রাখে, তবে সে অপমান নয় তো কি ? তার চেয়ে বড় অপমান মেয়েদের আর কি আছে ? তুমি যদি শিক্ষিতা ধনীর মেয়ে কল্যাণীকেই ভালবাসতে, তবে কেন তাকেই তুমি—

নুট। (দৃঢ় কঠিন স্বরে) বিমলা।

বিমলা। না, আমি আজ চুপ করব না।, কেন তুমি তাকেই বিয়ে করলে না?

নুট। বিমলা।

(বিমলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে চলিয়া যাইতেছিল)

যেয়ো না। শুনে যাও, আমার উত্তর শুনে যাও। হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি এককালে ভালবাসতাম। কিন্তু আজ তাকে আমি ঘৃণা করি। অর্থ এবং আভিজাত্যের পায়ে সে প্রেমকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। তাকে আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা করি।

বিমলা। আমাকে তুমি কেন ঘৃণা করবে? কেন? আমার কি অপরাধ?

নুট। টাকার ওপর লোভ, সোনার ওপর লোভ, সম্পদের ওপর লোভ—তোমার অপরাধ। বিমলা, লক্ষ্মীদেবীকে সকলে পূজো করে কিন্তু লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা সংসারে চিরদিনই ঘৃণ্য জীব।

(বিমলা আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

আর একটা কথা। (বিমলা দাঁড়াইল)

কল্যাণী এখন পরস্ত্রী। সে আমার ভগ্নীর তুল্য। তার বাপ ছিলেন পণ্ডিত, দেশসেবক। তার নাম নিয়ে এমন আলোচনা আর তুমি ক'রো না। এ শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। (নুটু বলিয়াই আবেগবশে চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত-পরে আবার ফিরিয়া আসিল) আরও একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। বিয়ের সময় তুমি নিতান্ত ছোট ছিলে না। তোমার মনে থাকার কথা, মনে থাকা উচিত। তোমার বাবা আমার অবস্থা জানতেন। তা ছাড়া, তোমার বাবাকে আমি বলেছিলাম—দেশের সেবা আমার ব্রত, যে-দেশের লোকের দৈনিক গড় আয় দশ পয়সা। দারিদ্র্য আমার চিরসঙ্গী। সুতরাং দশ পয়সার বেশি তুমি আমার কাছে প্রত্যাশা করতে পার না।

বিমলা। (হাসিয়া) আমি তো দশ পয়সাও খাই না। তুমি, তোমার দুই ছেলে অরুণ-বরুণ, তোমার মেয়ে শ্যামা—চারজনে চল্লিশ পয়সার খাও। আমি খাই তার অবশেষ—উচ্ছিষ্ট। (নেপথ্যে সাতু-ঠাকরুন—নুটবিহারীর সম্বন্ধীয় ভগ্নী—ঠিক এই সময়েই উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল)

সাতু। বউ। অ বউ। বলি ওলো, অ নুটুর বউ।

নুট। বউ এখানে রয়েছে সাতুদিদি। কি বলছ?

(সাতুর প্রবেশ। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। বেশ আঁটসাঁট চেহারা, পরনে থান, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখের ভিতরের পান গালের উপর আবের মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে)

সাতু। বলছি, বাবুদের বাড়ি খেতে যাবে কখন? আমাদের বউরা সব কাপড়-চোপড় প'রে তোর বউয়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

নুট। এই যাচ্ছে দিদি। যাও বিমলা, সকলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সাতু। মুখের সামনেই একটা কথা আমি বলি—তুই বারণ কর্ তোর বউকে, বড়লোকের মেয়েদের গায়ে গা দিয়ে যেন তাদের সঙ্গে বসতে না যায়। গত বছর পাঁচবার বারণ করলাম—বউ, খানিকটে না হয় দেরিই হবে, ওপরে বসতে যাস নি। যেমন যাওয়া দিলে উঠিয়ে। অপমানটা কি যেচে না নিলেই হত না। কই, আয় বউ, আয়।

(অগ্রসর হইল, বিমলাও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অনুসরণে উদ্যত হইল)

নুটু। (ডাকিল) যেয়ো না বিমলা, তোমার যাওয়া হবে না।

সাতু। সে কি রে! খেতে যাবে না কি?

নুটু। না সাতুদিদি, যাবে না।

সাতু। ভক্ষ্যে পুজ্যে উঠিয়ে দিবি?

নুটু। দোব নয়, দিলাম।

সাতু। নুটু, আর পাগলামি করিস নি। একেই তো শুনি, পুলিস লেগে আছে তোর পেছনে। তার ওপর বাবুদের সঙ্গে বিবাদ করিস নি। পায়ে মাথায় সমান করতে নেই।

নুটু। সেইজন্যেই তো মাথার বাড়িতে পা যাবে না সাতুদি।

(সাতু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

বউদের নিয়ে তুমি যাও সাতুদি, ও যাবে না।

সাতু। যা ভাল বোঝ, তাই কর ভাই। কারুর কথা তো তুমি নেবে না।

(প্রস্থান)

(নুটু আপন মনেই উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিল)

বিমলা। (হাসিয়া) বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছ নাকি?

নুটু। না, মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

বিমলা। তা হ'লে বল, নিজেকেই প্রণাম জানাচ্ছ! লোকে তো তোমাকেই বলে—কলির দুর্বাসা।

নুটু। তারা ভুল বলে। আমার সে ক্ষমতা থাকলে লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে তাকে আবার একবার সাগরতলে নির্বাসনে পাঠাতাম।

নেপথ্যে কে ডাকিল। এইটে কি নুটবিহারীবাবুর বাড়ি?—নুটবিহারী মুখুজ্জে?

নুটু। হ্যাঁ। নুটবিহারী মুখুজ্জের বাড়ি। কে? কোথা থেকে আসছেন?

নেপথ্যে। আমি কমলাপদ—কমলাপদ ঘোষ।

নুটু। কমলাপদ, কমল! আরে, এস এস এস। (অগ্রসর হইয়া গেল, যাইবার সময় বিমলাকে বলিল) বিমলা, কমল আমার কলেজের বন্ধু—এখন মুন্সেফ। যা হয় তার খাবার আয়োজন কর।

(নুটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাহিরে গেল। বিমলা ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নুটু পর-মুহূর্তেই বন্ধুকে লইয়া প্রবেশ করিল। কমলাপদর বেশভূষা অভিজাতজনোচিত। ঈষৎ স্থূলকায়, মাথায় টাক পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

নটুরই সমবয়সী)

নটু। এস, এস ভাই। উঃ, কতদিন পরে বল তো?

কমল। এ কি চেহারা হয়েছে, তোমার নটু—রুক্ষ কঠোর?

নটু। (হাসিয়া) Don't forget Aristotle old boy! Beauty of different ages different. To full men, strength of body fit for the wars, and countenance sweet with a mixture of terror. এস এস, ভিতরে এস।

(ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণাবাবুদের বাড়ি, বড়বাবুর খাসকামরা

স্থূলকায় বড়বাবু—শিনারায়ণবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্ধশায়িত, মুখে গড়গড়ার নল। চাকর পায়ে হাত বুলাইতেছে। বয়স পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষ। পরনে চুনট করিয়া কোঁচানো থান-ধুতি। গায়ে বেনিয়ান। একখানা শাল শরীর হইতে খসিয়া কোমরে পড়িয়া আছে। সম্মুখে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল মামলা-সেরেস্তার কর্মচারী—গোপীনাথ। লোকটি বৈষ্ণব। কপালে-তিলক, গলায় কণ্ঠী, গায়ে ছিটের গলা-বন্ধ কোট, পরনে আধ-ময়লা থান ধুতি। কাঁধে জামার উপর একখানি চাদর সযত্নে ফেলা আছে। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। মধ্যস্থলে একটি টিকি। আসিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া সবিনয়ে পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল, জিভে ঠেকাইল, বুকে বুলাইল।

শিব। অঃ, কে, গুপী? এস। কি সংবাদ?

গোপী। আজ্ঞে, সংবাদ গুরুতর।

শিব। গুরুতর?

গোপী। আজ্ঞে, ছোটখোকাবাবু আজ মহাভারত মণ্ডলেরে একটা লাথি মেরেছিলেন।

শিব। হ্যাঁ হ্যাঁ। এক বেটা চাষা তখন এসেছিল বটে আমার কাছে।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, লোকটা গেছে ফৌজদারিতে নালিশ করতে।

শিব। (চোখ মুদিয়া নল টানিতে টানিতে নিস্পৃহভাবেই বলিলেন) বল কি? লাথি মারার জন্যে বেটা চাষা নালিশ করতে গেছে।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ছিলাম কোর্টে—কমলপুরের স্বর্গীয় মহেশ্বর গাঙ্গুলীর বন্ধকী তমসুদের জন্যে তদীয় পুত্র হরিহর গাঙ্গুলী দিগরের নামে যে নালিশ দায়ের হয়েছে, তারই তদ্বিরের জন্যে।

শিব। (চাকরকে) জোরে—জোরে। ওরে বেটা, আরও জোরে টেপ্। আখ-মাড়াই কলে যেমন আখ পেষে, তেমনই জোরে টেপ্। পায়ের ওপর থাপ্পড় মারবি,

ক্রোশখানেক তার শব্দ যাবে, তবে তো ! হ্যাঁ, তারপর গুপী ? বেটা চাষার নাম কি বললে হে ?

গোপী। আজ্ঞে, মহাভারত মণ্ডল।

শিব। হ্যাঁ। বেটার বাবার নাম কি হে ? রামায়ণ ?

গোপী। আজ্ঞে না। চণ্ডী হ'ল ওর বাপের নাম। চণ্ডীচরণ মণ্ডল। পিতামহের নাম হরিশ মণ্ডল।

শিব। হরিশ মণ্ডল ! হরিশ মণ্ডল ! হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি। হরিশ মণ্ডল। (এইবার চোখ খুলিয়া, তাকিয়াটা টানিয়া লইলেন) বাবার আমলে যে-প্রজা-ধর্মঘট হয়, সে ধর্মঘটে হরিশ ছিল একজন মাতব্বর।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ১২৮৫ সালের ধর্মঘটে হরিশ মণ্ডল একজন মাতব্বর ছিল। ডাঙাপাড়ার গৌরহরি ঘোষ, ধর্মরাজের দেবাংশী হরিবোলা পাল—

শিব। হরিশের নাতি মহাভারত। তখনই বাবা ও পাপ সমলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, আমি দয়া করেছিলাম। সমস্ত উচ্ছেদ ক'রেও সামান্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই সামান্য আজ অষ্টাদশপর্ব মহাভারতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলের নামে ফৌজদারিতে নালিশ করতে গেছে। চাপরাসী কে রয়েছে বাইরে ?

(চাপরাসীর প্রবেশ)

চাপ। (সেলাম করিয়া) হুজুর !

শিব। মহাভারত মোড়ল, যাকে আজ ছোটখোকাবাবু লাথি মেরেছিল, তার দোরে গিয়ে হাজির থাক। বাড়িতে আসবামাত্র তাকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবি এখানে। এত বড় সাহস !

.(চাপরাসী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল)

গোপী। আজ্ঞে, যা বুঝলাম, সাহসের পেছনে লোক আছে।

শিব। লোক ?

গোপী। আজ্ঞে, নুটু মুখুজ্জে।

শিব। (সোজা হইয়া বসিয়া) নুটু মুখুজ্জে ! শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতি ? কুনো কালীর বেটা ? স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছে, সেই ছোকরা ?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরেন্দ্র মোক্তারের কাছে তার লেখা চিঠি আমি নিজে দেখেছি। বিনা পয়সায়, খরচা দিয়ে, মামলা দায়ের ক'রে নিতে অনুরোধ করেছিল নুটুবাবু। তা আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপে ইশারা ক'রে দিলাম। হরেনবাবুকে আমি মোক্তারনামাও দিয়ে এসেছি।

শিব। বেশ করেছ। তুমি চাপরাসীকে বারণ কর। বল মহাভারতকে আনবার দরকার নেই এখন। (গোপীর ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান)

নেপথ্যে দেবনারায়ণ। বাবা ! বাবা রয়েছ ?

(ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

শিব। কি ব্যাপার ? বড়বাবু, এত ব্যস্ত কেন ?

দেব। ন্যায়রত্নের বাড়ির মেয়েরা খেতে আসে নি।

শিব। কার বাড়ির ?

দেব। শিবু ন্যায়রত্নের, মানে নুটু মুখুজ্জের স্ত্রী খেতে আসে নি।

শিব। খেতে আসে নি ?

দেব। না। নুটুর জ্ঞাতি-ভগ্নী সাতু-ঠাকরুণ বললে, গতবারে নুটুর স্ত্রী দোতলায়—মানে আমাদের বাড়িঘর, তা ছাড়া নবীন-উকিলের বাড়ি—এইসব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সে বসেছিল। তাতে সাধারণের আপত্তি হতে পারে ব'লে তাকে নীচে বসতে পাঠানো হয়েছিল। সেইজন্যে আসে নি।

শিব। হুঁ।

দেব। কর্তব্যের খাতিরে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিই। তাতে আসে ভাল, না আসে—

শিব। আসবে না।

দেব। না আসে, তার ব্যবস্থা হবে। আর আসবে না কি ক'রে বলছ।

শিব। নুটুকে তোমরা চেন না। সে আরও কি করেছে জান ? ছোটখোকা আজ হরিশ মোড়লের নাতিকে একটা লাথি মেরেছে—

দেব। জানি।

শিব। নুটু তাকে উত্তেজিত ক'রে ফৌজদারিতে নালিশ করতে পাঠিয়েছে।

দেব। কি বলছ তুমি বাবা ?

শিব। গুপী এখুনি মহকুমা থেকে ফিরে এল, সে-ই খবর নিয়ে এসেছে। কি, বিশ্বাস করতে পারছ না ?

দেব। অবিশ্যি লোকে ওদের বংশটাকেই বলে—বিছুটির ঝাড়। তবু ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের পেছনে লাগবে, ওর এত সাহস হবে ? আর নুটু তো লোক খারাপ নয়।

শিব। ওর পিতামহ শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন আমাকে সভার মধ্যে কি বলেছিল জান ? আমার পিতামহের শ্রাদ্ধের বিচার-সভায় আমি গীতার "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি" শ্লোকটি আউড়েছিলাম। আমায় সেই সভার মাঝেই বলেছিল—জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি তোমার ; দেবভাষার অপমান করা হয় ও-রকম উচ্চারণে—যদার য বর্গীয় জ নয়, অন্তস্থ য। সে উচ্চারণ আজও করতে পারি না। ও-বংশের সন্তানের পক্ষে সবই সম্ভব।

দেব। তা হ'লে ?

শিব। তা হ'লে আমাদের নিজেদের কাউকে যেতে হবে। সামাজিকতাটা অন্তত লোকধর্মের খাতিরেও রাখতে হবে। যাও, ডেকে আন,—দামী আসত পেতে, রূপোর থালায় খেতে দাও নুটুর স্ত্রীকে। অপমান করতে হয় সম্মানের খোলস পরিয়ে কর। যেখানে চামড়ার জুতো না চলে, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়।

দেব। বেশ, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই করি।

শিব। মোক্তারিতে পসার হ'ল না ব'লে ছোকরা যখন চাষাভুষোর ছেলেদের জন্যে পাঠশালা খুলে বসল, তখন আমি হাজার বার বলেছিলাম—উঠিয়ে দাও, ওটা উঠিয়ে দাও। তখন তুমিই বলেছিলে, একটু আধটু লেখাপড়া শিখবে বই তো নয়। ওরে বাবা, সৎমাকে ঘরে ঢুকতে দিলে নিজের মা কখনও স্থির থাকতে পারেন না। কঙ্কণায় মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, সেখানে সরস্বতীর আসন? নইলে কি কঙ্কণার বাবুরা একটা ইস্কুল দিতে পারেন না? (হা-হা করিয়া হাসিয়া) খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকেই এবার সে কথা ব'লে দিলাম—হুজুর যখন ধরেছেন, তখন হাসপাতাল দোব আমরা, ইস্কুলের কথা বলবেন না।

দেব। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে আমি যাই।

শিব। যাও। কিন্তু ভুলে যেয়ো না বাবা, নুটু মুখুজ্জের নটে-গাছটি মুড়োতে হবে, আর মহাভারতের অষ্টাদশপর্বের শেষ পর্বটি পর্যন্ত আখের কলে মাড়াই ক'রে ছিবড়ে ক'রে ফেলে দিতে হবে।

(দেবনারায়ণের প্রস্থান)

[(চাকরকে) আঃ। শরীর ম্যাজম্যাজ ক'রে উঠল যে। জোরে—জোরে—বেশ গোটাকতক কিল মার্ তো পিঠে, দেখি।

(নেপথ্যে ঘড়িতে তিনটা বাজিল)

(সচকিতভাবে) হরি, হরি, হরি। তাই তো বলি, শরীর এমন করে কেন? তিনটে বেজে গেল। আফিং রে বেটা, আফিং।]

তৃতীয় দৃশ্য

নুটবিহারীর আশ্রম। প্রথম দৃশ্যের দৃশ্য

কেবল বারান্দার উপর দুই-তিনটি মোড়া। মোড়ার উপর উপবিষ্ট নুটু ও কমলাপদ

নুটু। কল্যাণীর নাম আমার কাছে ক'রো না কমল। Her father drove me away.

কমল। Drove you away? বল কি নুটু? এ যে আশ্চর্যের কথা!

নুটু। Truth is stranger than fiction কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলেছিলেন, তুমি আর এসো না আমার বাড়ি; আমি কল্যাণীর বিবাহ অন্যত্র স্থির করেছি; তোমার সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব।

কমল। অসম্ভব!

নুটু। অসম্ভব বইকি। [হাইকোর্টের উকিল—roaring practice; সুরেন্দ্রনাথের সহকারী দেশসেবক, ধনী হয়ে মত পালটে করলেন সরকারের সহযোগিতা। সরকার রাজসম্মানে সম্মানিত করলেন। সে অবস্থায়] আমার মত দরিদ্র, পুলিসের সন্দেহভাজনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অসম্ভব বইকি।

কমল। তোমার দারিদ্র্য তিনি জানতেন, জেনেশুনেই he picked you up! আমরা বলতাম, কলেজ-সমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি নুটুরত্নকে আহরণ করেছেন।

নুট। তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছিলেন অন্য মানুষ। নির্যাতিত দেশসেবক, প্র্যাকটিসের তখন প্রারম্ভ। তখন ধনের চেয়ে গুণ ছিল তাঁর কাছে বড়। [এন্ট্রান্সে পনরো টাকা স্কলারশিপ পেয়ে কলেজে গেলাম, প্রফেসার সেনগুপ্ত আমাকে তাঁর ছোট ছেলে সুশোভনকে পড়াবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে তিনি আকৃষ্ট হলেন। এফ. এ.-তে ফার্স্ট হলাম, তিনি কল্যাণীকেও পড়াবার ভার দিলেন।]

কমল। আমি তো সব জানি নুটু। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কল্যাণী আমায় 'দাদা' বলত, তুমি তো জান। কল্যাণীর মা কতদিন তোমার সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের কথা আমায় বলেছেন।

নুট। তবুও তুমি সব জান না কমল। জানবার কথাও নয়। কল্যাণীকে আমি পড়াতাম, কিন্তু কখনও এ অসম্ভব আশা মনে আমি স্থান দিই নি। বি. এ-তে ফার্স্ট হলাম, তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে কল্যাণীকে আমার হাতে সমর্পণের সংকল্প নিজে আমাকে জানালেন, তবে আমি নিজেকে কল্যাণীর দিকে আকৃষ্ট হতে দিয়েছিলাম। কল্যাণীও আমার সে আকর্ষণকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর চাকা ঘুরে গেল। আলিপুর বোমার মামলার পর পুলিস বার বার আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই সময় বাবাও মারা গেলেন। এম. এ.-র রেজাল্ট অত্যন্ত খারাপ হ'ল, অর্ডিনারী সেকেণ্ড ক্লাস; সুতরাং সরকারী উপাধিধারী ধনী মৃত্যুঞ্জয়বাবু drove me away! তাঁর ব্যবহারে আমি আঘাত পাই নি কমল, আঘাত পেয়েছিলাম কল্যাণীর ব্যবহারে। "So sweet was ne'er so fatal"।

কমল। তাই তো নুটু, বড় সমস্যায় ফেললে আমাকে।

নুট। (উঠিয়া পড়িল। পদচারণা করিতে করিতে, তীক্ষ্ণ সি হাসিতে হাসিতে) কোন সমস্যা নেই কমল। অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

কমল। (নুটুর মুখের দিকে চাহিয়া) নুটু, আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করেছ। কল্যাণীকে তুমি ভুল বুঝেছ।

নুট। (হাসিল) ভুল বুঝেছি? হবে।

কমল। কল্যাণী বিধবা হয়েছে জান?

নুট। বিধবা! কল্যাণী বিধবা হয়েছে?

(বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

কমল। হ্যাঁ। বছরখানেক আগে সে বিধবা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন নিরাশ্রয়, গায়ের কখানা গহনা ছাড়া নিঃসম্বল।

নুট। কি বলছ কমল? কল্যাণীর শ্বশুর তো লক্ষপতি ছিলেন। জমিদারি, ব্যবসা—

কমল। হ্যাঁ, সে সবই আছে; কিন্তু কল্যাণীর তাতে কোন অধিকার নেই। আমিই

বিচারকের আসনে ব'সে সেই রায় দিয়েছি। কল্যাণীর স্বামী লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু অমিতাচার ছাড়তে পারেন নি। লিভার অ্যাবসেস্, সঙ্গে সঙ্গে আরও সাতখানা রোগে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বাপ তখন বেঁচে। মাস দুই পরে তিনিও মারা গেলেন। আইন অনুসারে কল্যাণী আর তার মেয়ে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল। আইন অনুসারে বিচার ক'রে আমিই সে বিধান দিয়েছি। কল্যাণী এখন নিরাশ্রয়, প্রায় নিঃসম্বল।

নুট। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) মৃত্যুঞ্জয়বাবু তো মারা গেছেন। কল্যাণী তবে এখন ভাইদের আশ্রয়ে ?

কমল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ছেলেদের খবর কিছু জান ?

নুট। এখনকার খবর কিছু জানি না। বড় ছেলে বিলেতে গিয়েছিল, ছোটটি ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে পড়ছিল—সেই পর্যন্তই জানি।

কমল। বড় ছেলে বিলেত থেকে মেম বিয়ে ক'রে এসেছেন। তিনি এখন খাজা সাহেব। ছোট ছেলে, তোমার ছাত্রটি, সঙ্গীতবিদ ; পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি ক'রে সঙ্গীতের সাধনায় ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছেন কস্তুরী-মৃগের মত। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল—কোন কুলেই এখন আর কল্যাণীর আশ্রয় নেই। একটি মেয়েকে বুকে নিয়ে সে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে—অকূল সমুদ্রে বললে ভুল হবে না। আমি তোমার কাছে এসেছি, নুটু, কল্যাণীর আশ্রয়ের জন্যে।

নুট। আমার কাছে ?

কমল। হ্যাঁ, তোমার কাছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভুল করেছিলেন, তুমি ভুল করেছ, কিন্তু কল্যাণীর ভুল স্বেচ্ছাকৃত নয়। তোমাদের ভুলের বোঝা তার মাথায় তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ। নদীর বুকের ভেলা যখন ভার হয়ে ভেলার আরোহীর বুকে চাপে, তখন নিরুপায় হয়ে তাকে ডুবতেই হয়। অসহায় ষোল-সতেরো বছরের কিশোরী মেয়ে নিরুপায় হয়ে আত্মবলি দিয়েছে। সে আমায় কি বললে জান ?

(নুটু কমলের মুখের দিকে চাহিল)

তাদের মকদ্দমা আমার কোর্টেই চলছিল। যতদিন মকদ্দমা চলেছে, ততদিন সে ঘুণাক্ষরে তার অস্তিত্ব আমাকে জানতে দেয় নি। আমি অবশ্য পরিচয় জানতাম। কিন্তু আইনের বিধানের বিপক্ষে আমি নিরুপায় ; তাকে পথে দাঁড় করাতে আমাকে রায় দিতে হ'ল। তারপর সে আমার বাড়িতে এল। আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম। সে আমায় বললে—বিচারক হিসেবে কর্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করেছেন ব'লেই ভরসা ক'রে আপনার কাছে এসেছি। দাদা হিসেবে এইবার কর্তব্য করুন। আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি বললাম—বোন, চিরদিন তুমি আমার সংসারে দিদি হয়ে থাক। কল্যাণী বললে—না, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, আপনি কায়স্থ। তা ছাড়া আপনি পদস্থ সরকারী কর্মচারী। আপনার বাড়িতে আমার মেয়ে গরিব হয়ে মানুষ হতে পারবে না। যেখানে আমার মেয়ে সেই খাঁটি শিক্ষা পাবে, যেখানে আমি সত্যি সত্যি কুলীন বামুনের

বিধবা বোন হয়ে থাকতে পারব, সেইখানে আপনি আমায় পৌঁছে দিন। আমি নুটুদাদার কাছে যেতে চাই।]

নুট। (দৃঢ়স্বরে) সে হয় না কমল। কল্যাণীকে আমি আশ্রয় দিতে পারব না।

কমল। (নুটুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) আমি যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি নুটু।

নুট। সঙ্গে নিয়ে এসেছ? সে কি? কোথায় কল্যাণী?

কমল। স্টেশন থেকে তারা গরুর গাড়িতে আসছে। আমার আরদালী তাদের সঙ্গে আছে। আমি তাড়াতাড়ি আগেই এসেছি তোমায় খবর দিতে।

নুট। তুমি অন্যায় করেছ কমল। এ হয় না, হতে পারে না।

কমল। তুমি এ কথা বলবে—এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কল্যাণী বললে, নুটুদাদাকে খবর দেবার দরকার নেই। তার কথা আমিও অন্তরে অন্তরে সমর্থন করেছিলাম।

নুট। কল্যাণীর, কল্যাণীর সন্তানের দেহে ধনীর রক্ত, অস্থিমজ্জায় তার সম্পদের আকাঙ্ক্ষা ; দারিদ্র্যের শিক্ষা সহ্য করবার শক্তি সে রক্তের নেই। তুমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

(নুটুর পিছন দিকে ইতিমধ্যে কল্যাণী তাহার মেয়ের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নুটুর সমস্ত কথাই শুনিল)

কল্যাণী। (ম্লান হাসিমুখে) কিন্তু আমি তো ফিরে যাব ব'লে আসি নি নুটুদা।

নুট। (সচকিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কে? কল্যাণী?

কল্যাণী। হ্যাঁ, আমি। (মেয়ের প্রতি) মমতা, প্রণাম কর, তোমার মামা। (মমতা প্রণাম করিল ; নুটু নীরবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল) আমাদের ফিরিয়ে দেবে নুটুদা?

নুট। (আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ, ফিরেই তোমাদের যেতে হবে কল্যাণী। এ কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারবে না। এ হয় না।

কল্যাণী। মেয়েটাকে নিয়ে আমি ভেসে যাব দাদা? (নুটু নিরুত্তর)

কমল। নুটু! (নুটু নিরুত্তর)

চল কল্যাণী, ফিরে চল। এস।

(ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল বিমলা,—বরাবরই তাহার শাড়ির আঁচল দেখা যাইতেছিল)

বিমলা। যেয়ো না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও। (নুটুর প্রতি) আমাকে দুঃখ দেবার জন্যে তুমি ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছ, তা আমি জানি। কিন্তু তবু বলব, তুমি পাষাণ। ছি! ছি! ছি!

(সকলে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বিমলা অগ্রসর হইয়া কল্যাণীর হাত ধরিল)

কল্যাণী। আপনি বউদি?

বিমলা। হ্যাঁ। ছি, পরের মেয়ে ব'লে এত অবহেলাই কি করে ভাই? দেখা না ক'রেই

চ'লে যাচ্ছ? এস, ঘরে এস। কোথায় যাবে? কেন যাবে? সত্যি 'ভাই' ব'লে যদি দাবি কর, তবে এ ঘরেও তোমার অখণ্ড অধিকার। সে অধিকার উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা ভাইয়েরও নেই, ভাজেরও নেই। এস (মমতার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে) খুকী, চিরকাল তোমরা মামীদের দুর্নাম ক'রে এসেছ। এবার থেকে মামাদেরও দুর্নাম ক'রো, সব সময়ে মামীদেরই দোষ থাকে না।

নেপথ্যে দেবনারায়ণ, নুটু, বাড়ি রয়েছ? নুটু!

নুট। কে?

দেব। আমি দেবনারায়ণ।

নুট। বাড়ির ভেতর যাও তোমরা বিমলা।

বিমলা। (উত্তেজিত হইয়া) আমি কিন্তু খেতে যাব না; তুমি যেন কথা দিয়ো না। যে বাড়িতে গয়না-কাপড়ের আদর, সে বাড়িতে আমি গরিব—খেতে যাব না, যেতে পারব না। এস ঠাকুরঝি, বাড়ির ভেতর এস। (কল্যাণী কমলাপদ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল)

কল্যাণী। কি হয়েছে বউদি?

নুট। কিছু হয় নি বোন। তোমরা বাড়ির ভেতর যাও। কমল, তুমি ব'স গিয়ে, আমি আসছি।

(বাহিরের দিকে প্রস্থান। কমল, বিমলা, কল্যাণী ও মমতা বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। দেবনারায়ণ ও নুটুর কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ)

নুট। আমার স্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, কিন্তু রাখা না-রাখা তাঁর হাতে। আমি তাঁকে বাধ্য করতে পারব না।

দেব। গতবার যা হয়ে গেছে, তার জন্যে নিজে আমি মাফ চাইতে এসেছি।

নুট। তাতে আপনাদের মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে দেবনারায়ণবাবু। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল না। বরং সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার প্রথার সংস্কার করাই উচিত। কারণ সমাজ এখন মনুর বিধানে চলে না, সমাজ চলে লক্ষ্মীর বিধানে। সে বিধানে আপনারা আমরা পৃথক জাতি, পৃথক বর্ণ।

দেব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ নুটু?

নুট। আপনি কি মাফ চাইবার ছলে আমাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছেন দেবনারায়ণবাবু?

দেব। বাড়িতে পেয়ে তুমি আমাকে অপমান করছ নুটু?

নুট। ঠিক—ঠিক। আমাকে আপনি মাফ করবেন দেবনারায়ণবাবু; আমার মনে ছিল না, আপনি আমার অতিথি। বরুণ! বরুণ! তোমার মাকে বল, দেবনারায়ণবাবু নিজে খেতে ডাকতে এসেছেন।

(বাড়ির ভিতর হইতে ঘোমটা টানিয়া কল্যাণী দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল)

কল্যাণী। বউদিদি খেতে চ'লে গেছেন দাদা।

নুট। (সবিস্ময়ে) চ'লে গেছেন ?

কল্যাণী। হ্যাঁ। এইমাত্র গেলেন। আপনার সাতুদিদি এসেছিলেন, তিনি ডেকে নিয়ে গেলেন। (সে ভিতরে চলিয়া গেল)

দেব। খেতে গেছেন ? বেশ, বেশ। (হাসিয়া চলিয়া গেল)

নুট। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ !

নেপথ্যে মহাভারত। দাদাঠাকুর !

নুট। (ব্যস্তভাবে) মহাভারত ? কি হ'ল মহাভারত ?

(ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় মহাভারতের প্রবেশ)

মহাভারত। হ'ল না দাদাঠাকুর। চিঠি ফিরিয়ে দিলে তোমার।

নুট। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) দাঁড়াও মহাভারত, একটু দাঁড়াও। একটু—(ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ডাকিল) কল্যাণী। কল্যাণী।

নেপথ্যে কল্যাণী। আমায় ডাকছেন ? আসছি দাদা।

নুট। (আপন মনেই বলিল) "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God" :

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। আমায় ডাকছিলেন নুটুদা ?

নুট। ডাকছিলাম। কয়েকটা কথা বলবার আছে।

কল্যাণী। বলুন।

নুট। তুমি আমার ব্রতের কথা জান, এককালে তোমার সঙ্গেই কত কল্পনা করেছি।

কল্যাণী। জানি, সে কথা ভুলি নি নুটুদা। মেয়েকে নিয়ে আপনার ব্রতে দীক্ষা নেবার জন্যেই তো এসেছি দাদা।

নুট। মনে আছে কল্যাণী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ?—

"বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার"

কল্যাণী। মনে আছে—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।"

নুট। (মহাভারতকে দেখাইয়া) এদের মূঢ় ম্লান মুখে সেই চাওয়ার কথা ফোটাবার জন্যে আমি শিক্ষাব্রত নিয়ে পাঠাশালা করেছি। এরা যা দেয়, তা থেকেই আমার সংসার চলে। আমার দীক্ষা নিতে হ'লে সেই পাঠশালার ভার নিতে হবে তোমাকে।

কল্যাণী। বেশ, আমাকে আপনার সহকারী ক'রে নিন।

নুট। সহকারী নয় বোন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমায় পাঠশালার ভার নিতে হবে। (আমায় অন্য কাজ নিতে হবে। শিক্ষার ব্যবস্থার আগে অত্যাচার অবিচার

থেকে এদের বাঁচাতে হবে।)

কল্যাণী। (নুটুকে প্রণাম করিয়া) আপনি ভার দিচ্ছেন, আমি মাথা পেতে সে ভার নিচ্ছি দাদা।

নুট। আঃ, বোন, আমায় বাঁচালে তুমি। তোমাকে আশীর্বাদ করি—

কল্যাণী। আশীর্বাদ করুন দাদা, মরণ যেন এসে সকল ভার আমার লাঘব ক'রে দেয়।

(বলিয়াই দ্রুত চলিয়া গেল)

(নুটু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল)

মহা। আমি তা হ'লে বাড়ি যাই দাদাঠাকুর। তুমি আর কি করবে বল? শুনলাম, এখন টাকা দিলেও কোন উকিল-মোক্তারে আমার কাজ নেবে না। বাবুরা নাকি তামাম উকিলমোক্তারকে ফী দিয়ে—

নুট। (এই কথায় চকিতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল) অপেক্ষা কর মহাভারত, অপেক্ষা কর, আমি আসছি, আমি আসছি।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল]

বুকের দাগটা, জুতোর ছাপটা যেন মুছো না,—আমি আসছি।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

বাবুদের বাড়ির সুসজ্জিত কক্ষ

ঘরের মেঝেতে দামী আসন পাতা, সম্মুখে রূপার গ্লাসে জল, রূপার থালা-বাটিতে খাবার। একজন ঝি পাখা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। গিন্নী বসিয়া আছেন। স্বয়ং বড়বাবু শিবনারায়ণও দাঁড়াইয়া আছেন। এক পাশে অবগুণ্ঠনাবৃতা বিমলা দাঁড়াইয়া, তাহার সর্বাঙ্গ একখানা চাদরে ঢাকা

শিব। দেখ দেখি, তুমি শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নাতবউ—নুটুর স্ত্রী, নুটুই কি আমাদের সোজা লোক! সাধুপুরুষ—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই তো বললাম মা, বাড়ির মেয়েদের। ওরা বলে, সন্ন্যাসী কিসের? আরে বাপু, দাড়ি রাখলেই যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল মুসলমানই সন্ন্যাসী। চুল রাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো সকল স্ত্রীলোকই সন্ন্যাসী। ফল খেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে তো বনের সকল বাঁদরই সন্ন্যাসী।

গিন্নী। তুমি আর ব'কো না বাপু। তুমি বরং যাও এখান থেকে। ওগো নুটুর বউ, তুমি খেতে ব'স বাছা। এই দেখ যথাসাধ্যি খাতির আমরা করেছি। আর যেন ব'লো না—গয়না নেই ব'লে আমরা অপমান করেছি।

শিব। দেখ দেখি। কি বল গিন্নী, তার ঠিক নেই। গয়না মানে—অলঙ্কার। পণ্ডিত লোকের কথায় কথায় অলঙ্কারের ঘটা, তার ছটা কি? সোনা-রূপোর ছটা

সেখানে মণের কাছে ছটাক। (হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) ব'স মা, ব'স, খেতে ব'স। আমি যাই।

বিমলা। না, আপনাকে যেতে হবে না। আপনি আমার বাপের চেয়েও বড়। আপনার সামনে আমার লজ্জা নেই।

(সে গায়ের চাদরখানি খুলিয়া রাখিল। দেখা গেল, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। বিমলা আসনে বসিল)

ত্যাগী পণ্ডিত লোক কুশাসনে বসে বাবা, পাতায় খায়, মাটির ভাঁড় তাদের সম্বল। আপনারা এই দামী আসনে, রূপোর বাসনে খেতে দিয়েছেন, আমি কি তার অপমান করতে পারি? তাই দুখানা গয়না প'রে এসেছি। গিলটি নয় বাবা, খাঁটি সোনার। (ঝির হাত হইতে পাখাখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। বিমলাও উঠিয়া পড়িল)

আচ্ছা বাবা, এইবার আমি উঠিলাম। এই আমার যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে। আসি বাবা।

(সে চলিয়া গেল। কাহারও মুখে কথা সরিল না)

গিন্নী। (কয়েক মুহূর্ত পরে) হ'ল তো? হ'ল তো? নাকে ঝামা ঘ'ষে দিয়ে গেল তো?

শিব। (গম্ভীর ক্রুদ্ধস্বরে) দেবনারায়ণ! দেবনারায়ণ!

(দেবনারায়ণের প্রবেশ)

দেব। বাবা!

শিব। পিঁপড়ে নয়, কাঁকড়া-বিছে। না, কেউটে সাপ। যদি বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর।

দেব। সাপ!

শিব। হ্যাঁ, নুটু মুখুজ্জে কেউটে সাপ। বাঁচতে চাও তো ধ্বংস কর ওকে। এস, সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

নুটুর আশ্রম

মহাভারত দাঁড়াইয়া আছে। নেপথ্য হইতে সাতু-ঠাকরুন বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল

সাতু। হ'ল তো? বলি, হ'ল তো? পই পই ক'রে বারণ করলাম—ওরে নুটু, মান করিস নে, মানের গোড়ায় ছাই দে, মান বাড়বে। মানে মানে বউকে পাঠিয়ে দে। এখন হ'ল তো? খেলে তো চাঁদির জুতো? তোর বউকে রূপোর বাসনে খেতে দেওয়ার মান্যির মানেটা কে না বুঝবে? কই, নুটু কই? গেলি কোথায়?

বলি, নুকুলি নাকি ঘরে খিল এঁটে? বলি, ওরে অ নুটু!

নেপথ্যে নুট। আসছি সাতুদি।

সাতু। আসতে হবে না রে, আসতে হবে না। বলছি—যা, এইবার কিংখাবের পালকি পাঠিয়ে বউকে নিয়ে আয়। মুরদ বুঝি। বলি, অ নুটু!] (মহাভারতকে দেখিয়া) অ মরণ, তুই কে রে? অ, বলি, তুই মহাভারত?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিঠাকরুন।

সাতু। বলি, হ্যাঁ রে, তোর নাকি পাখনা গজিয়েছে?

মহা। ওই! দিদিঠাকরুন কি বলছেন গো!

সাতু। বলি, পিঁপড়ের পাখা গজায় দেখেছিস তো—ফরফর ক'রে উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরে? তোর নাকি তেমনই পাখনা গজিয়েছে? বাবুদের ছোটখোকা তোকে নাথি মেরেছে ব'লে তুই নাকি আদালতে গেছলি নালিশ করতে? পরামর্শদাতা বুঝি নুটু?

মহা। তিনি পরামর্শ দেবে কেন দিদিঠাকরুন? আমরা কি মানুষ নই?

সাতু। মানুষ! চাষার খেঁটে আবার মানুষ হ'ল কবে রে? অ্যাঁ, কালে কালে কতই দেখব! তা তোর পরামর্শদাতাকে বলিস, তার বউকে বাবুরা ধ'রে জুতো দিয়ে মেরেছে—অবিশ্যি রূপোর জুতো। (প্রস্থান)

মহা। (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর।

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। উনি আসছেন। তোমায় বললেন, একটু জল খেয়ে নিতে। এস, বাড়ির ভেতরে এস।

মহা। দাদাঠাকুর কই? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।

(কল্যাণীর সঙ্গে মহাভারত ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক দিক হইতে মোক্তারের পোশাক পরিয়া নুটুর ও অপর দিকে হইতে অলঙ্কারভূষিতা বিমলার প্রবেশ। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল)

নুট। (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বিস্ময়ে ক্রোধে বলিয়া উঠিল) তুমি শেষে ভিক্ষে নিয়ে এলে বিমলা? সাতু-ঠাকরুন ব'লে গেল, বাবুরা তোমায় চাঁদির জুতো মেরেছে। সে কথা তবে সত্যি? কিন্তু ভিক্ষের গহনাগুলো গায়ে প'রে এলে যে? চাঁদির জুতোটা মাথায় ক'রে আনলে না যে বড়?

বিমলা। রূপো কেন? আমাকে হীরে-মানিক বসানো সোনার জুতো মারতেও কারও ক্ষমতা নেই, সাহস নেই। তুমিই আমাকে মার কথার জুতো।

নুট। এ গহনা কার? তুমি কোথায় পেলে?

বিমলা। এ গহনা আমার ব্যাটার বউয়ের। ব্যাটার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে গহনা আমি আগাম নিয়েছি।

নুট। কি বলছ তুমি বিমলা?

বিমলা। কল্যাণী ঠাকুরঝির মেয়ে মমতার সঙ্গে আমার অরুণের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি।

এ গহনা মমতার—আমার ভাবী পুত্রবধূর।

(কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া নুটুকে প্রণাম করিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নুটবিহারীর শহরের বাসা

নুটবিহারী এখন মোক্তার। অফিস-ঘরে একদিকে একটি তক্তাপোশে বসিবার জায়গা, তক্তাপোশের উপর একটি ডেস্ক। আশেপাশে কতকগুলি ফাইল, দোয়াত ও কলমদান। ইহা ছাড়া কয়েকখানি চেয়ার, একখানি বেঞ্চ। দেওয়ালে দরজার মাথায় একটি বড় ফ্রেমে একখানি কার্পেটের সূচীশিল্প ; কার্পেটে বুনিয়া লেখা—"It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God"। ইহা ছাড়া একটি পুরনো আলমারিতে বই—অ্যাসিস্টটল, শেকস্‌পীয়ার ইত্যাদি। বাংলা বই—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি

(কোর্টের পোশাকে নুটু ও জমিদারের কর্মচারী গোপীনাথ আসিয়া প্রবেশ করিল। গোপীনাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া কথা আরম্ভ করিল। নুটু চাপকান খুলিয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজে মন দিল)

গোপী। আপনি হলেন প্রাচীন পণ্ডিত-বংশের সন্তান, বিবেচনা করুন, তার ওপর ব্রাহ্মণ ; তাই ধরুন আমার বলা ; ও ছেঁড়া কাঁথার আগুনে জল ঢেলে নিবিয়ে ফেলুন নুটুবাবু, একটা মিটমাট ক'রে নিন।

নুট। (কাজ করিতে করিতেই) ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে মিটমাট কি আছে বলুন ?

গোপী। অ্যাই দেখুন, মিটমাট নেই ? বিবেচনা করুন, আপনি আর প্রজাদের পক্ষ নিয়ে বাবুদের সঙ্গে লাগবেন না। আর বাবুরাও তাঁদের যা কিছু কাজকর্ম এখানকার আদালতে আপনাকেই দেবেন। বছরে বাঁধা মাইনে একটা পাবেন ; তা ছাড়া মামলা মকদ্দমা যখন চলবে, তখন অদ্ধেক ফীও পাবেন।

নুট। আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু ?

গোপী। এটা হয়েছে। কিন্তু আপনি যা বলবেন, তার উত্তর বাকি আছে।

নুট। আমি কিছু বলব না।

গোপী। তা হ'লে বিবেচনা করুন, বক্তব্য আমার আরও আছে। ধরুন, এই এক বছর এমনই ক'রে বিরোধ ক'রে লাভ কি করলেন আপনি ? নামডাক হয়েছে, কিন্তু পয়সা কই হ'ল আপনার ?

নুট। এইবার আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে গোপীনাথবাবু ?

গোপী। সদরের নবকান্তবাবু উকিলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়—মস্ত উকিল। বিবেচনা করুন, ফৌজদারিতে অমন বাঘা উকিল আর জন্মাল না। হাকিমকেই শুনিয়ে দিত কড়া কথা। ১৯১৫ সালে ১২ই জুলাই কোর্টে বহশ করতে করতেই বিবেচনা করুন, মারা গেলেন। তিনিও প্রথমে আপনার মত বিনা পয়সায় কেস নিয়ে নাম করেছিলেন। বাস, যেই নাম হ'ল, অমনই সেই যে আট টাকা ফী ক'রে চেপে বসলেন, বিনা পয়সায় আর ন'ড়ে বসতেন না। ১২ই জুলাই নবকান্তবাবু মারা গেলেন, ১৩ই তারিখে ছেলেরা হিসেব করলে—কোম্পানির কাগজে, তেজারতী বন্ধকী কারবারে, ব্যাঙ্কে মজুত আপনার এক লক্ষ পঁয়ষটি হাজার দু শো পঁচাত্তর টাকা। জমিদারির আয় আপনার চোদ্দ হাজার সাত শো টাকা। আবাদী জমি এগারো শো বিঘে। তারপর বিবেচনা করুন, বড় বড় কোম্পানিতে শেয়ার। এইবার আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন। (ঘন ঘন পা দোলাইতে লাগিল) কি বলছেন বলুন তা হ'লে ?

নুট। আপনি তা হ'লে আসুন গোপীনাথবাবু।

গোপী। আসব ?

নুট। হ্যাঁ। তা হ'লে আপনি আসুন।

গোপী। আর একটু বক্তব্য আছে নুটুবাবু।

নুট। বলুন।

গোপী। আপনি তা হ'লে সাবধান। নমস্কার।

নুট। নমস্কার। (প্রস্থান)

(গোপীনাথের পুনবার্য প্রবেশ, নুটু রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল)

গোপী। বিবেচনা করুন, আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। এই এক বছরে তেতাল্লিশটা মামলা আপনি বাবুদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কটাতে আপনি জিতেছেন, হিসেব রাখেন আপনি ? আপনার হিসেব না থাকে, আমার কাছে শুনুন—সাতটি কেসে কেবল জরিমানা হয়েছে, তাও চাপরাসীর। আর চৌত্রিশটা কেস ডিসমিস। তার পনেরোটাতে খরচা শুদ্ধু দিতে হয়েছে আপনার পক্ষকে। মহাভারতকে রক্ষা করতে বাকি খাজনা দিয়েছেন দু শো পনরো টাকা দশ আনা তিন পাই। মকদ্দমা-খরচের হিসেব নেই। ভাল। বিবেচনা করুন, করুন রক্ষে তাকে। কিন্তু আপনি সাবধান। (প্রস্থান)

(নুটু আপন মনেই হাসিল, তারপর চোখ মুদিয়া পিছনের বালিশে হেলান দিয়া আবৃত্তি করিল)

নুট। "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—"

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। এই যে দাদা। না খেয়েই আজ আপনি কোর্টে চ'লে গিয়েছিলেন দাদা ? বউদি

বললেন—

নুট। এস বোন, এস। কখন এলে কঙ্কণা থেকে? কেমন আছ?

কল্যাণী। এই আসছি, আছিও ভাল। কিন্তু আপনি উঠুন দেখি, আসুন, খাবেন—

নুট। মমতা কেমন আছে? তাকে সঙ্গে আন নি?

কল্যাণী। সেও এসেছে। শ্যামার সঙ্গে সে গল্প করছে। আসুন, উঠে আসুন।

নুট। তোমার পাঠশালার খবর কি?

কল্যাণী। মন্দের ভাল। বাবুরা যে পাঠশালা করেছেন, তার মাইনে উঠিয়ে দিয়েছেন। তবুও আমাদের পাঠশালায় পনেরোটি ছেলে রয়েছে। আসুন, উঠে আসুন। আপনি খাবেন, আপনাকে আমি খবর বলব।

নুট। ফার্স্ট আওয়ারেই কাজ ছিল কল্যাণী, কাজ সেরে উঠে খাওয়ার সময় হয় নি। কালও কাজ রয়েছে অনেক, সেগুলো আজ না সেরে রাখলেই নয়। কাজ না সেরে আজ আমি উঠব না। কাজ বড় বেশি বাকি প'ড়ে গেছে ভাই।

কল্যাণী। এত বেশি কাজ আপনি নেন কেন?

নুট। বেগারের কাজ কিছু বেশিই হয় বোন।

কল্যাণী। কিন্তু শরীর বাঁচিয়ে তে কাজ করতে হবে?

নুট। শরীর। (হাসিল) I see a man's life is a tidious one. I have tired myself। কল্যাণী, এক এক সময় ইচ্ছে হয়, মৃত্যুই আমার ভাল। (কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল) বিমলা আমায় শান্তি দিলে না কোনদিন। একটা গান শোনাবে বোন, অনেক দিন তোমার গান শুনি নি!

(খাবারের থালা হাতে বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। দিনরাত্রি খাওয়া খাওয়া ক'রে তোমার কাজে অশান্তি ক'রে দিই, না? (হাসিল) ভাত না খাও, এই অল্প একটু খেয়ে নাও দেখি। অশান্তি করতেই এসেছি আবার। ওগো বেয়ানঠাকরুন!

কল্যাণী। না বউদি, 'বেয়ান বলবেন না ভাই।

বিমলা। কেন ভাই? সম্বন্ধটা কেমন একটু টক-মেশানো মিষ্টি মিষ্টি ক'রে দিয়েছি বল তো? আর মমতার সঙ্গে যখন অরুণের বিয়ে দোব—

কল্যাণী। তবুও আমি আপনার গরিব ঠাকুরঝি হয়েই থাকব বউদি।

বিমলা। কি জানি ভাই! আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কিসে কি দোষ হয় বুঝি না। বেশ। তুমি একটা গান গাও দেখি, তোমার দাদা গান শুনতে শুনতে খাবার খেয়ে ফেলুন।

নুট। খাবারের থালাটা আমায় দাও বিমলা। গান এখন ভাল লাগবে না। আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে

বিমলা। (হাসিয়া) সুরের মধ্যে বেসুর এলেই গান আর ভাল লাগে না, নয়? এখুনি তুমি কল্যাণী ঠাকুরঝিকে গান গাইতে বলছিলে, আমি আসবামাত্র সে গানে

তোমার অরুচি ধ'রে গেল ?

কল্যাণী। আমি এখন যাই দাদা। শ্যামার সঙ্গে এখনও দেখা করি নি, সে রাগ করবে। অরুণ বরুণ কোথায় বউদি ?

নুট। বিমলা, খাবারটা দাও।

বিমলা। কল্যাণী-ঠাকুরঝি গান না গাইলে আমি দোব না।

নুট। বিমলা।

[বিমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া খাবারের থালাটা আগাইয়া দিল, নুটুও হাত বাড়াইল ; কিন্তু নুটু ধরিবার আগেই বিমলা থালা ছাড়িয়া দিল, থালাটা পড়িয়া গেল]

কল্যাণী। আহা, পড়ে গেল। (তাড়াতাড়ি কুড়াইতে গেল)

বিমলা। কুড়িও না ঠাকুরঝি। ওগুলো ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হবে।

নুট। না না। কুড়িয়ে নেবে বইকি। গরীব-দুঃখী কাউকে দিয়ে দেবে।

বিমলা। না। ও জিনিস কাউকে দেবার নয়. যা তোমাকে দিয়েছি, সে জিনিস—

নুট। আঃ, কি বলছ বিমলা ?

বিমলা। বলছি, সমস্ত জীবনটাই তো এমনই ক'বে আমি বাড়িয়ে ধরলাম তোমার দিকে, এমনই ক'রেই তুমি ধরলে না। সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। ধুলোয় মিশিয়ে সে মাটিই হয়ে যাবে। সে কি তুলে অন্য কাউকে দেওয়া যায় ?

(প্রস্থান)

নুট। (একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কল্যাণী।

কল্যাণী। দাদা।

নুট। আমায় তুমি মাপ কর বোন। বিমলার কথায়—

কল্যাণী। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো ? আমাদের সংসারে ননদ-ভাজে কত ঝগড়া হয়। আর বউদি তো আমায় কিছু বলেন নি।

(বিমলার পুনরায় খাবার লইয়া প্রবেশ)

বিমলা। (খাবারের থালা সযত্নে নামাইয়া দিয়া) নাও, খাও।

কল্যাণী। গান গাইব বউদি ?

বিমলা। না-গাইলে বুঝব, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

নেপথ্যে কমলাপদ। নুটু।

নুট। কমলাপদ ? এস এস। কলকাতা থেকে কখন ফিরলে ?

(কমলাপদর প্রবেশ)

কমল। এই যে বউদি। আপনার কাছেই এসেছি আমি। শিগগির খাবার নিয়ে আসুন। আপনাদের বরাদ্দমত দশ পয়সার হিসেব আজ চলবে না। আপনার অরুণ আই. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। বরুণও ম্যাট্রিকে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে।

বিমলা। দাবিটা শুধু আমারই ওপর চালাবেন ঠাকুরপো ? অরুণের শাশুড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে রেহাই দিচ্ছেন বুঝি বোন ব'লে ?

কল্যাণী। রেহাই দিলেই বা আমি নোব কেন বউদি? কিন্তু অরুণ বরুণ কোথায় বউদি?

বিমলা। তারা মহাপুরুষের ছেলে, ভাবী মহাপুরুষ। আজ রবিবার, সেই ভোরবেলায় দুই ভাই সেবক-সমিতির মুঠির চাল আদায় করতে বেরিয়েছে। এস ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোর জন্যে খাবার তৈরি করতে হবে। আপনি কিন্তু পালাবেন না ঠাকুরপো। (কল্যাণী ও বিমলার প্রস্থান)

কমল। তোমায় কিন্তু একটা কথা বলব নুটু' কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে ব্যাপারটা এইবার মিটিয়ে ফেল।

নুট। কি বলছ তুমি?

কমল। ভালই বলছি। আজ তিন বছর ধ'রে বিরোধ ক'রে আসছ। এখানকার ফৌজদারী আদালতে তুমি মামলা চালাচ্ছ, ওঁরা জজকোর্টে হাইকোর্টে যাচ্ছেন, সেখানে তোমাকে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে গরিব মক্কেলের জন্যে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে— কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

নুট। বিরোধ আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গেই। ওই দেবতাটির অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি ধুলোয় নামিয়ে দোব।

কমল' ছি ছি' তুমি কি যে বল নুটু'

নুট। বলি আমি ঠিক কথাই। কিন্তু তোমার ভাল লাগছে না। না-লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে তোমার মাথার ওপর চেপেছে। পায়ের পথ তো সংকীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গেছে। মাথার টাকটি যে প্রশস্ত থেকে প্রশস্তত‌র হয়ে উঠছে।

কমল। (সশব্দে হাসিয়া উঠিল) কথাটা বড় ভাল বলেছ' উঃ, বড্ড বলেছ'

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। ওগো, মহাভারত এসে অঝোরঝরে কাঁদছে।

নুট। কাঁদছে? মহাভারত কাঁদছে? তাকে পাঠিয়ে দাও এখানে।

(বিমলার প্রস্থান)

কমল, তোমার বোধ হয় এখানে আর থাকা উচিত হবে না।

(মহাভারত আসিয়া নুটুর পা দুইটা চাপিয়া ধরিল)

কমল। আচ্ছা, আমি চলছি। বউদিকে ব'লো, ও-বেলায় আসব আমি। (প্রস্থান)

নুট। ওঠ মহাভারত, ওঠ। আগে কি হয়েছে বল, তারপর কাঁদবে।

(মহাভারতের কান্না বাড়িয়া গেল)

মহাভারত' (মহাভারত তবু উঠিল না)

মহাভারত' (মহাভারত তবু উঠিল না)

(রূঢ়স্বরে হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া) মহাভারত।

(মহাভারত উঠিল)

চোখের জল মোছ, চোখের জল মোছ। খাড়া সোজা হয়ে ব'স। খটখটে শুকনো গলায় বল, কি হয়েছে?

মহা। (করুণস্বরে) আজ্ঞে, আমার পুকুরের সমস্ত মাছ, এই হালি পোনা—আধ পো, তিন ছটাক—

নুট। ছটাক সের নয়, পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল, তাই বল?

মহা। বাবুরা জোর ক'রে ধরিয়ে নিলে।

নুট। আর?

মহা। আমার গরু বাছুর সমস্ত জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

নুট। হুঁ। আবার নতুন কি হ'ল?

মহা। বাবুদের হুকুম হয়েছে, তোমার জমি কেউ চষতে পারবে না। কারও ছেলে তোমার পাঠশালায় পড়তে পাবে না। আমি বলেছি, সে আমি পারব না, তাই—

নুট। তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও মহাভারত। আমার সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট জড়িও না। তুমি পারবে না।

মহা। এতদিন পরে তুমি আমাকে এই কথা বললে দাদাঠাকুর? আজ তিন পুরুষ আমরা তোমাদের জমি ক'রে আসছি, আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগ তোমরা নিয়ে আসছ। আজ তুমি আমাকে এই কথা বললে?

নুট। বললাম, বলবার কারণ ঘটেছে। আজ তুমি কেঁদেছ। মহাভারত, দুঃখের চাপে যারা হার মানে, হার মানবার আগে তারা কাঁদে।

মহা। (ভাল করিয়া চোখের জল মুছিয়া) বেশ, এই চোখের জল মুছলাম। আর যদি কোনদিন চোখের জল দেখতে পাও, সেদিন থেকে মুখদর্শন ক'রো না।

নুট। বিমলা।

(বিমলার প্রবেশ)

মহাভারতকে জল খেতে দাও। জল খেয়ে একটু সুস্থ হও মহাভারত, আমি স্নান ক'রে দুটো মুখ দিয়ে নিই। তারপর তোমায় এস. ডি. ও-র কাছে নিয়ে যাব।

মহা। আগুনে জল দিতে বলছ দাদাঠাকুর? তুমি চান ক'রে খেয়ে নাও, আমার মুখে এর পিতিকার না ক'রে জল রুচবে না, আমাকে ব'লো না।

নুট। কোনদিন কখনও যদি আবার এমনই ভুল হয় মহাভারত, তবে এমনই ক'রেই তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও। এস। বিমলা, ফিরতে আমাদের দেরি হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ি। বড়বাবুর খাসকামরা। শিবনারায়ণবাবু ও গোপীনাথ। শিবনারায়ণ সেই পূর্ব্ববৎ তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্ধশায়িত, চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু তামাক টানিতেছেন)

শিব। (ব্যঙ্গশ্লেষপূর্ণ ভঙ্গীতে) বল কি গোপীনাথ? অ্যাঁ। ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল। টুলো শিব পণ্ডিতের নাতির মুখে চোস্ত ইংরিজী বোল। নুটু মোক্তার ইংরিজীতে সওয়াল করলে।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ফরফর ক'রে ইংরিজীতে সওয়াল করলে। একেবারে তপ্ত খোলায় যেন খই ফুটিয়ে দিলে।

শিব। খই।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, তপ্ত খোলায় নুটু মুখুজ্জে খই ফুটিয়ে দিলে।

শিব। ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে গোপী, ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা আছে। কিছু ভয় নেই। গরম খই তোমার চুপসে গ'লে যাবে। (হা হা করিয়া হাসিলেন) কে রয়েছিস? বড়বাবুকে ডাক। ওরে, চা নিয়ে আয়। অ বাপ ভগবান, দয়া কর বাপধন। ভগবান। ওরে ভগবেনে, হারামজাদা শূয়ারকি বাচ্চা।

নেপথ্যে ভগবান। আজ্ঞে, যাই হুজুর।

(দেবনারায়ণের প্রবেশ)

দেব। আমায় ডাকছ বাবা?

শিব। জি হুজুর।

দেব। বল।

শিব। আরে জনাবালি, বৈঠিয়ে, পহেলে তসলীম তো রাখিয়ে।

(দেবনারায়ণ বসিল)

গোপীনাথ।

গোপী। আজ্ঞে?

শিব। একবার পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দাও তো। ভগবানকে দেখ তো বাবা। চা আনতে বলেছি কখন। চিত্ত-ঘোড়া যে চাঁ-হা চাঁ-হা ক'রে অস্থির হয়ে উঠল হে।

গোপী। ভগবান। ভগবান। (প্রস্থান)

শিব। (এইবার উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন) সব কথা সবার সামনে বলা যায় না দেবু। ব্যাটা ভেকধারী সোজা পাত্র নয়। ঘর থেকে যেতে বললে বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনবে। (বারকয়েক নল টানিয়া ফেলিয়া দিয়া) এস. ডি. ও. সায়েব টাউন-হলের চাঁদা ধরেছিলেন, দিয়েছ সেটা?

দেব। হ্যাঁ। পাঠিয়ে দিয়েছি আড়াই শো টাকা।

শিব। আরও আড়াই শো টাকা আজই এখুনি তুমি গিয়ে দিয়ে এস। [illegible], বাবা শুনে রাগ করলেন, বললেন—আড়াই শো টাকা দেওয়া মানে হুজুরের অসম্মান

করা ; আমাদের চাঁদা পাঁচ শো টাকা লেখা হোক।

দেব। কেন আবার আড়াই শো টাকা দেবে বাবা? সায়েব তো খুশি হয়েই—

শিব। কথার প্রতিবাদ ক'রো না দেবু। যা বলি, তাই শোন। গোপীর কাছে যা শুনেছি, তাতে হরশে চাষার নাতিটা, কি নাম যেন—

দেব। মহাভারত।

শিব। হ্যাঁ, মহাভারতের মাছ ধরা, গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার মামলার অবস্থা ভাল নয়। নুটু নাকি ভাল তদ্বির করেছে। সওয়ালও করেছে খুব জোর। জরিমানা হয় তাকে পারা যায়, আমাদের গোমস্তা চাপরাসীর জেল হ'লে—সে বড় লজ্জার কথা, অপমানের কথা।

দেব। বেশ, তাই করছি। এই সঙ্গে কিন্তু একটা কথা তোমাকে না জানালে আর চলছে না। ছোটখোকাকে শাসন করা দরকার হয়েছে। তাকে একটু শাসন কর তুমি।

শিব। কেন? আমির-উল-উমরা ছোটে নবাব আমার কি করলেন আবার? (হাসিয়া) পয়সাকড়ি বেশি চাচ্ছে বুঝি? তা দিও হে, দিও। আমি বরং লিভার বাঁচিয়ে মদ খেতে ব'লে দোব।

দেব। না। নুটুর পাঠশালার চারিদিকে আজকাল ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে, ওখানে যে মেয়েটি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে—

শিব। (সশব্দে উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন) তার ওপর নজর দিয়েছে। বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হোয় তো থোড়া থোড়া।

দেব। না বাবা, হাসির কথা নয়। কোন কিছু যদি ঘটে, নুটু ছাড়বে না। আর আমাদের বাড়ির ছেলে এ রকম মামলায় আসামী হ'লে দেশে আর বাস করা চলবে না।

শিব। তা আমি সাবধান ক'রে দোব ছোটে নবাবকে। তবে দশ-বিশ টাকা চাইলে যেন দিও বাপু। কি রকম, বড়বাবুর মুখ যে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। ওহে, আমি বড় হ'লে বাবা আমার বাগানবাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) এক কাজ কর, ছোটে নবাবকে শহরের গদিতে বসিয়ে দাও। সেখানে মামলা-সেরেস্তার কাজ দেখুক, সায়েব-সুবোর সঙ্গে মেলামেশা করুক। লোকাল-বোর্ড ডিস্ট্রিক-বোর্ডের মেম্বার করে দাও। পার তো ধ'রে-প'ড়ে অনারারি হাকিম ক'রে দাও। বুঝলে?

(গোপীনাথ ও ভগবান প্রবেশ করিল, ভগবানের হাতে চা)

দেব। তা হ'লে আমি এক্ষুনি চ'লে যাই?

শিব। হ্যাঁ। আর একটা কথা। এবার অজন্মার বছর। চাষীদের ধান টাকা দিতে কার্পণ্য ক'রো না যেন। সকলকেই কিছু কিছু দিও। আদায় হবে কি হবে না, সেই বিবেচনাটাকেই যেন বড় ক'রে দেখো না এবার, বুঝলে?

(দেবনারায়ণের প্রস্থান)

গোপী। দেশকাল বড়ই খারাপ পড়েছে হুজুর। অজন্মা লেগেই আছে। এই বিবেচনা করুন, ১৩২৩ সালে একবার, ১৩২৬ সালে একবার, ১৩৩০ সালে তো, বিবেচনা করুন, মাঠে কাস্তে যায় নাই। ফের বিবেচনা করুন, ১৩৩৪ সালে, আবার ধরুন এই ১৩৩৬ সালে। আর সে আমলে আপনার ১৩১৩ সালে আকাড়া গিয়েছে, তার আগে বিবেচনা করুন, ১৩০০ সালের মধ্যে আর নেই, ১২৯৪ সালে—

শিব। ১২৯৪ সালে! বটে। (চায়ে চুমুক দিয়া) ওরে ভগবান, গোপীনাথকে চা এনে দে। গলা শুকিয়ে গেল বেচারীর।

গোপী। (জোড়হাত করিয়া) আজ্ঞে, হুজুর, চা আমি খাই না। বিবেচনা করুন, চা তো আর ডাল-ভাত নয় যে, না হ'লে মানুষ বাঁচে না। জীবনে হুজুর চা খেয়েছি তিনবার। একবার আপনার ১৩০৫ সালে—সেবার ভীষণ বর্ষা, তারিখ আপনার ১২ই আষাঢ়।

শিব। কি বার?

গোপী। আজ্ঞে, বৃহস্পতিবার।

শিব। (হাসিয়া) তিথি-নক্ষত্র মনে আছে বাবা—তিথি-নক্ষত্র?

গোপী। আজ্ঞে, অমাবস্যে তিথি—উপবাস করেছিলাম কিনা। তবে নক্ষত্রটা মনে নেই হুজুর।

শিব। বটে!

গোপী। হুজুরদের সঙ্গে শ্রীরামপুরের চৌধুরীদের মকদ্দমা; চল্লিশ হাজার টাকা তমসুকের নালিশ, সুদে আসলে এক লক্ষ পাঁচ হাজার দু শো তিন টাকা সাত আনা দাবি। এই মামলায় গিয়েছি মুর্শিদাবাদ। বর্ষা আপনার ভীষণ, তার ওপর গায়ে ছিল বিলিতী কম্বল, বিবেচনা করুন, একেবারে গাড়োল ভেড়ার মত অবস্থা। গলা পর্যন্ত ধ'রে গেল। তা সেই দিন উকিল হরিমোহনবাবু বললেন—গোপীনাথ, চা খাও, উপকার হবে। খেয়েছিলাম তা, বিবেচনা করুন, উপকার হয়েছিল হুজুর। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

শিব। না না, খাও না যখন, তখন দরকার কি?

গোপী। আজ্ঞে, চা যেমন ডাল-ভাত নয়, তেমনই, বিবেচনা করুন, বিষও নয়। তার ওপর আপনি মুনিব যখন বললেন, তখন না খেলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন। তা দাও হে ভগবান, এক কাপ চা দাও।

(দেবনারায়ণের পুনঃপ্রবেশ)

দেব। মামলায় রায় হয়ে গেছে বাবা। আমাদের চাপরাসী দুজনের ছ'মাস ক'রে জেল হয়েছে, গোমস্তার এক বছর। আমি পথ থেকেই খবর শুনে ফিরে এলাম।

গোপী। ভগবান, শিগগির চা আন। আপীল করতে যেতে হবে। আপীল সব উল্টে যাবে হুজুর। রুদ্রপদবাবু পাকা ঘাগী ফৌজদারী উকিল, টেবিলে চাপড় মেরেই সব—

শিব। (রুষ্টস্বরে) গোপীনাথ ! (গোপী মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল)

দেব। সওয়ালে নুটু মুখুজ্জে আমাদের অপমানের বাকি রাখে নি। বলেছে—দেশে ধনী জমিদার অনেক আছেন, তাঁদের অন্যায় নেই এমন নয়, আছে ; কিন্তু তবু তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বারো মাসে তেরো পার্বণের ব্যবস্থা তাঁরাই ক'রে এসেছেন, দেশের গুণীদের বহুকাল পর্যন্ত তাঁরাই সসম্মানে প্রতিপালন করে এসেছেন ; কিন্তু কঙ্কণার বাবুরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তাঁরা—

শিব। থাক্। তুমি গোপীনাথকে সঙ্গে নিয়ে সদরে যাও। আপীল মঞ্জুর করিয়ে জামিনে ওদের খালাস ক'রে আন। ফৌজদারী বড় উকিল যে কজন আছে, তাদের ওকালত-নামা দাও। এখনই, দেরি ক'রো না।

দেব। টাউন-হলের চাঁদা আরও আড়াই শো টাকা, আমি বলছিলাম, আর দিয়ে দরকার নেই।

শিব। দেবে না ? ওইখানেই তো বড়বাবু, তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না। বেশ, সায়েবকে না দাও, দিও না ; কিন্তু টাকাটা আর ঘরে ঢুকিও না। মাঠে একটা বড় সিচের পুকুর ছিল, সেটা বোধ হয় এতদিনে ম'জে এসেছে। ওই টাকায় পুকুরটার পঙ্কোদ্ধার করিয়ে দাও—চিরঞ্জীব দীঘি।

দেব। চিরঞ্জীব দীঘি !

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে বিবেচনা করুন, চেঁচুরে দীঘি। খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত ২৫০৩ নং পলট। পরিমাণ ৪ একর ২৫ ডেসিমিল। উত্তরে রামহরি ঘোষ--

দেব। আচ্ছা, তাই হবে। এস গোপীনাথ। (প্রস্থান)

গোপী। (যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে) ভগবান, এখনও— (প্রস্থান)

শিব। কে আছিস ? কালী বাগদীকে পাঠিয়ে দে তো (উঠিয়া পায়চারি আরম্ভ করিলেন)

(কালীর প্রবেশ)

কি রে ব্যাটা, বেঁচে আছিস ? (কালী প্রণাম করিল)

হুকুম করলে কাজ তামিল করতে পারিস এখনও ?

(কালী সবিনয়ে মৃদু হাসিল)

নাঃ, আজ নয়, আপীল-কেস হয়ে যাক, তারপর। ভগবান, তামাক নিয়ে আয়।

(কালী ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল)

নেপথ্যে কালী। ভগবান ! ভগবান ! দাসজী !

তৃতীয় দৃশ্য

কঙ্কণায় নুটুর আশ্রম। পূর্বদৃশ্য—প্রথম অঙ্কের অনুরূপ।
আট-দশটি ছেলেমেয়ে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া গান করিতেছে।

গান

শোণিতে ভাসাল ধরণী যাহারা
তারা নয় তারা নয়,
মোরা পথ চাই নূতন বীরের
গাহি তাহাদেরই জয়।

ছেলে— দিগ্বিজয়ীর উদ্ধত অসি
মেয়ে— যুগে যুগে কত উঠিল ঝলসি,
ছেলে— বীর তারা নয়, ধরণী মাগিছে
নূতন অভ্যুদয়।
মেয়ে— বিধাতার খেদ ঘুচাবে যাহারা
মানুষের যত ভেদ,
ছেলে - ভাই ব'লে যারা ভায়েরে চেনাবে
রচিবে নূতন বেদ
মেয়ে - মুক্ত যাদের দীপ্ত কৃপাণ
ছেলে— মিথ্যারে শুধু করে খানখান
উভয়ে— মিতালির ডোরে বিশ্ব বাঁধিতে
যাদের দিগ্বিজয়।

(গানের মধ্যেই কমলাপদ প্রবেশ করিল)

কল্যাণী। (ছেলেমেয়েদের প্রতি) তোমরা যাও, আপনার আপনার জায়গায় গিয়ে পড়তে ব'স। (ছেলেমেয়েদের প্রস্থান)

কমল। দুটো কথা বলবার জন্যে এসেছি কল্যাণী। একটা নুটুর কথা, একটা আমার নিজের।

কল্যাণী। বলুন।

কমল। নুটুর কথাই আগে বলি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এড বন্ধ করেছে। সে এড পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

কল্যাণী। বন্ধ করলে তার ওপর আর জোর কি বলুন?

কমল। নুটু অবশ্য খুব লড়ছে। খবরের কাগজেও সে লিখেছে, কিন্তু কোন ফল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। বাবুরা যখন ফ্রী প্রাইমারি স্কুল করেছেন, তখন এ স্কুলের জন্যে এড ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড দেবে না।

কল্যাণী। না দেয়, সে কষ্ট আমি স্বীকার ক'রে নেব কমলদা।

কমল। কষ্টস্বীকারের একটা মাত্রা আছে কল্যাণী। এই আট-দশটি ছেলে, মাইনে বোধ

হয় চার আনা হিসাবে দু টাকা আড়াই টাকা। নুটুদের পনেরো টাকা। কিন্তু পাঠশালার খরচও আছে। বাদ দিয়ে যা থাকে, তাতে তোমার মমতার চলা অসম্ভব।

কল্যাণী। বাগানে তরি তরকারি হয়, দুটি গরু পুষেছি—দুধও ঘরে হয়, চাষীদের ছেলে-মেয়েদের জামা তৈরি ক'রে দিই, তাতেও কিছু হয়। চ'লে কোন রকমে যাবেই কমলদা।

কমল। চ'লে যাবে, কিন্তু এ ভাবে চলা উচিত নয় কল্যাণী। এ কৃচ্ছ্রসাধনের তোমার প্রয়োজন কি? নুটু নিজেও এ চায় না। সে যখন বলছে পাঠশালা তুলে দিয়ে তার বাড়িতে থাকবে, তখন এ কষ্ট কেন?

কল্যাণী। না, সে হয় না কমলদা।

কমল। নুটুর স্ত্রী অত্যন্ত মুখরা, সন্দিগ্ধচিত্ত—নুটু সে কথা আমায় গোপন করে নি।

কল্যাণী। না। ও-কথা বলবেন না। তিনি আমার সহোদরার মত স্নেহ করেন। কিন্তু তবু আপনি যা বলছেন, সে অসম্ভব।

কমল। বেশ, ভিন্ন বাসা ক'রে তুমি থাক। নুটুর বাসার কাছেই বাড়ি খালি রয়েছে—

কল্যাণী। না, সেও হয় না কমলদা।

কমল। কেন? একটু স্পষ্ট ক'রে বল কল্যাণী।

কল্যাণী। স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে কমলদা?

কমল। বুঝে যে উঠতে পারছি না বোন।

কল্যাণী। এ সংসারে ভগবান আমাকে স্নেহ মমতা আশ্রয়—সমস্ত কিছুর কাঙাল করেছেন। সে কাঙালপনা আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি। কিন্তু এক জায়গায় তাঁর বিধানকে আমি মানতে পারি নি কমলদা, সে আমি মানতে পারব না। অর্থ-সাহায্য—না কমলদা, সে আমি পারব না। আমার পিতৃকুলের, আমার স্বামীকুলের সমস্ত মর্যাদাই আমার ভেসে গেছে; বহুকষ্টে অবশেষে রেখেছি ওইটুকু, ওইটুকু যদি চ'লে যায়, তবে আমার কি থাকবে কমলদা?

কমল। তোমার সে মর্যাদা অটুট থাক্, বোন, ও-কথা তোমায় আর বলব না। কিন্তু তোমার তো গহনা রয়েছে, তাই থেকে—

কল্যাণী। সে গহনা মমতার বিয়ের জন্যে রেখেছি, ওইটুকু তার পিতৃধন। ওতে কি আমি হাত দিতে পারি কমলদা?

কমল। নুটু কখনও তার ছেলের বিয়েতে গহনা দাবি করতে পারে না।

কল্যাণী। আমার মেয়ে যে শুধু-হাতে-পায়ে স্বামীর ঘরে যেতে পারে না কমলদা।

কমল। শোন কল্যাণী, নুটুই আমায় পাঠিয়েছে, তার বিশেষ অনুরোধ—

কল্যাণী। ও-অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

কমল। এখানে থাকায় বিপদও আছে। বাবুদের সঙ্গে নুটুর বিরোধ দিন দিন যে রকম তীব্রতর হয়ে উঠছে—

কল্যাণী। বাবুদের থিয়েটার-পাগলা ছোট ছেলেটা কয়েকদিন আশেপাশে গান গেয়ে ঘুরে

গেছে।

কমল। বলছ কি কল্যাণী?

কল্যাণী। ভয় পাবেন না কমলদা, আমার কাছে পাঠশালার বেত আছে।

কমল। (চিন্তা করিয়া) তুমি দেখছি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার কিন্তু এ ভাল মনে হচ্ছে না বোন। যাক, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমাকে রক্ষা করুন—এই কামনাই তাঁর কাছে জানাচ্ছি। তবে অনুরোধ রইল, বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'লে পত্র লিখে জানাতে আমায় দ্বিধা ক'রো না। আমি যেখানেই থাকব, সংবাদ নেব তোমার।

কল্যাণী। কোথায় যাবেন কমলদা?

কমল। আমার ট্রান্সফারের হুকুম হয়েছে বোন।

(মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। দিদিঠাকরুন!

কল্যাণী। এস মহাভারত।

মহা। এই যে বাবু! পেনাম। একটি ভদ্দনোক এসেছেন দিদিঠাকরুন। আপনাকে খুঁজছেন।

কল্যাণী। ভদ্রলোক! আমাকে খুঁজছেন!

মহা। ইস্টিশান থেকে আসছেন গরুর গাড়িতে। এই লম্বা পাজামা পরনে, মাথায় বাবরী চুল। খুব হিন্দী বাত বলছেন। রাজ্যের জিনিস গাড়িতে—

কল্যাণী। নাম কি বললেন?

মহা। (মাথা চুলকাইয়া) তা তো জিজ্ঞাসা করি নাই দিদিঠাকরুন। এ-হে-হে, একেই মুরুক্ষুর বুদ্ধি বলে।

কমল। আচ্ছা, আমি দেখছি। (প্রস্থান)

কল্যাণী। মহাভারত!

মহা। দিদিঠাকরুন!

কল্যাণী। আমি যদি এখান থেকে চ'লে যাই মহাভারত, তবে কি তোমাদের কষ্ট হবে?

মহা। আপনি চ'লে যাবেন দিদিঠাকরুন? কেন, আমরা কি অপরাধ করলাম?

কল্যাণী। অপরাধ! (হাসিল) না, অপরাধ নয় মহাভারত, কিন্তু থাকতে যে আর সাহস হচ্ছে না, ভাই। বাবুরা শুনছি নাকি—

মহা। আপনি শুনছেন দিদিঠাকরুন, আমরা চোখে দেখছি।

কল্যাণী। তবে?

মহা। তবে দিদিঠাকরুন? (হাসিল) বিষয় নিয়ে মামলা করছে, আমাদের অপমান করছে, সে আমরা সইছি। কিন্তু আমাদের মা-বোনের ওপর অত্যাচার করলে তাও আমরা সইব, এমনই অমানুষ কি আমাদের মনে কর?

কল্যাণী। নুটুদাও এখানে থাকতে বারণ করছেন।

মহা। বারণ করছে! দাদাঠাকুর তা হ'লে ভয় খেয়েছে দিদিঠাকরুন। আমাকে

বলে—চোখের জল মোছ। চোখের জলেরও তাপ আছে, চোখের জল গরম। দাদাঠাকুর মোক্তার হয়ে ঘরে খিল আঁটতে চাইছে। তোমার কোনও ভয় নাই দিদিঠাকরুন, মহাভারতের জান থাকতে তোমার গায়ে কোনও আঁচ লাগবে না।

কল্যাণী। আঃ, আমায় বাঁচালে ভাই।

(কল্যাণীর সঙ্গীতবিদ্ ছোড়দা সুশোভনের প্রবেশ। পরনে পায়জামা, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগড়া, মাথায় বব-ছাঁটা চুল, তাহার উপর টুপি। পাঞ্জাবির পকেটে একটা বাঁশী। মোটা একটা লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রবেশ। দেখিলেই বোঝা যায়, সে রুগ্ন। সঙ্গে কমলাপদ, পিছনে একটা লোকের কাঁধে দুইটা বাদ্যযন্ত্র—একটা সেতার, একটা এস্রাজ ; দুইটাই খেরুয়া কাপড়ের খোলে ঢাকা। লোকটার এক হাতে একটা বেহালার বাক্স, অপর হাতে একটা সুটকেস)

কল্যাণী। (সবিস্ময়ে) ছোড়দা।

সুশোভন। জরুর। উসমে চুক না হৈ। অধীন তোমার ছোড়দাই বটেন। বাঃ, সাদা থান কাপড়ে তোকে বড় ভাল মানিয়েছে রে। চমৎকার। একেবারে খানদানী বেহাগ।

কমল। আঃ, সুশোভন।

[কল্যাণী এই মন্তব্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহাভারত অবাক হইয়া গেল]

সুশোভন। কি ব্যাপার ? অন্যায় বললাম নাকি কিছু ? না না, আই ডিড নট মীন এনিথিং রং—

কমল। ব'স সুশোভন, ব'স। ও-কথা যেতে দাও।

[কল্যাণী ঘর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিল, সুশোভন বসিল]

কল্যাণী। এত হাঁপাচ্ছ কেন ছোড়দা ? ব'স, ব'স।

সুশোভন। হাঁপাচ্ছি ? রোগে বড় কায়দা ক'রে ফেলেছে রে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মোটাসোটা দেখছিস, ওটা অ্যালকহলিক ফ্যাট। ভেতরে ভেতরে বাত, হাঁপানি, যকৃতানন্দ—মানে লিভারের দোষ, তা ছাড়া অনেক কিছু। সেবা-শুশ্রূষা করতে হ'লে ক্রমেই জানতে পারবি। এখন একটু চা খাওয়া দেখি।

কল্যাণী। মহাভারত, দোকান থেকে একটা ছোট টিন চা এনে দাও তো। এস, পয়সা নিয়ে যাও।

সুশোভন। লিপ্টন ইয়েলো ব্যাণ্ড, কিংবা ব্রুক্ বণ্ড গ্রীন লেবেল, বাজে কিছু আনিস না যেন। যা-তা বাজে চা আমি আবার খেতে পারি নে।

(কল্যাণী ও মহাভারতের ভিতরে প্রস্থান)

কমলদা, ডোন্ট্-মাইণ্ড্ প্লীজ, একটা ইন্ফরমেশন দাও দেখি।

কমল। বল।

সুশোভন। এখানে ভড্কা-শপটা কোথায় বল.তো ?

কমল। কি ? কি শপ ?

সুশোভন। ভডকা, ভডকা-শপ—নট রাশিয়ান অফ কোর্স, ইন্ডিয়ান ভডকা—ধেনো, ধেনো ; ধেনো মদের দোকান কোথায় বল তো ? ওটা না হলে তো আমি বাঁচব না।

কমল। তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে সুশোভন ?

সুশোভন। পতন চিরকাল অধোলোকেই হয় কমলদা। উর্ধ্বলোকে কেউ কখনও পড়ে না। হ্যাঁ, আছাড় আমি বড্ড বেশি খাই। তবে ভরসার কথা, আছাড় খেয়ে খেয়ে পতন-প্রুফ হয়ে গেছি এখন। লক্ষ্ণৌতে এক বাইজীর বাড়ির দোতলার ছাত থেকে একতলার বারান্দায় পড়েছিলাম, তাতেও কাবু হই নি। এখন আমার কথার উত্তর দাও দেখি।

কমল। শোন সুশোভন, ইউ মাস্ট লীভ দি প্লেস অ্যাট ওয়ান্স, তুমি এখানে থাকলে কল্যাণীরও এখানে থাকা চলবে না। নুটু কখনও এ সহ্য করবে না। তোমার অর্থ আছে—

সুশো। খট খট লবডঙ্কা। অল গন কমলদা, অল গন, চিচিং ফাঁক।

কমল। বল কি ?

সুশোভন। নইলে খুঁজে খুঁজে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে আসব কেন, বল ? দাদার ওখানে গিয়েছিলাম, দাদা তাড়িয়ে দিলে।

(কল্যাণীর মুড়ি চা লইয়া প্রবেশ)

কল্যাণী। খাও ছোড়দা।

সুশোভন। আরে বাপ রে ! এ যে মুড়ি ! মুড়ি তো আমি খেতে পারি না কল্যাণী। ওটা থাক। আমি শুধু চা খাই। (চায়ে চুমুক দিয়া) আঃ ! তারপর শোন্ কল্যাণী, আমি তোর কাছে থাকব ব'লে এসেছি। আমার এই রুগ্ন শরীর, বেশি দিন বাঁচব না।

কল্যাণী। ও-কথা ব'লো না ছোড়দা। আমি তোমাকে সেবা ক'রে ভাল ক'রে তুলব।

সুশোভন। আমার কিন্তু টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে। তাছাড় আমি মদ খাই ; অবিশ্যি খরচ বেশি নয়, আনা ছয়েকের ধেনো। ধেনোতেই চ'লে যাবে আমার।

কল্যাণী। তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই, তোমাকে কি আমি ফেলতে পারি ছোড়দা ?

সুশোভন। কমলদা বলছে, এটা নুটুদার বাড়ি। নুটুদা নাকি আমার জন্যে তোকে সুদ্ধু তাড়িয়ে দেবে ?

কল্যাণী। না না, নুটুদা কখনও এমন হৃদয়হীন হতে পারেন ? না না।

কমল। নুটুর আদর্শ সকলের ওপরে কল্যাণী।

কল্যাণী। আমার আদর্শও যে আমার কাছে সকলের ওপরে কমলদা। ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই, আমি বোন—

সুশোভন। কিছু ভয় করিস না কল্যাণী, নুটুদা এককালে তোকে ভালবাসত—

(কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেল)

কমল। ইডিয়ট কোথাকার। (কমলাপদও অন্য দিকে চলিয়া গেল)

সুশোভন। মানে ? বোকার মত বেফাঁস কিছু ব'লে ফেললাম নাকি ? কি হ'ল ? দুজনেই চ'লে গেল যে। কল্যাণী, ওরে অ কল্যাণী। (হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া) ইয়েস, ইয়েস, ও ইয়েস, আই অ্যাম অ্যান ইডিয়ট।

(লাঠি ধরিয়া অগ্রসর হইল)

চতুর্থ দৃশ্য

নুটুর শহরের বাসা

(নুটু বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত আইনের বই পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে নোট করিতেছে। কমলাপদও বসিয়া আছে)

কমল। আজই তো আপীল কেসের রায় বেরুবে ? আরগুমেন্ট কেমন হ'ল ? কি রকম বুঝছ ?

নুট। (বই রাখিয়া) হ'ল একরকম। তবে—। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) জান কমলাপদ, সংসারে মানুষকে ছোট ভাবার তুল্য অন্যায় আর হয় না। সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তারই সাজে, যে সত্যকার সুপিরিয়র ; উকিলবাবুটি গলাবাজি করতে পারেন ভালই, কিন্তু শূন্যগর্ভ কুম্ভের মত। আমি পবিশ্রম ক'রে পয়েন্টস সংগ্রহ ক'রে চোখের সামনে ধরেছি, কিন্তু তা নেবেন না, কারণ আমি মোক্তার, তিনি উকিল।

কমল। সবই তোমার ভুলের মাশুল বন্ধু। ভুল তো তোমার একটা নয় ; প্রিলিমিনারি ইন্টারমিডিয়েট দিয়েও ল ফাইনালটা দিলে না ; মোক্তারি পরীক্ষা দিলে। একটু ভুলের জন্যে—

নুট। ও-কথা বাদ দাও কমল। (হাসিল)

কমল। একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা ক'রো আজ। সন্ধ্যের ট্রেনেই রওনা হব।

নুট। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু ছিলে, তুমিও চ'লে যাচ্ছ।

(সুশোভনের প্রবেশ—মুখে সিগারেট)

সুশোভন। From harmony, from heavenly harmony this frame of universe began। গুড মর্নিং নুটুদা। আরে, কমলদা যে। গুড মর্নিং।

নুট। এস। কেমন আছ ?

সুশোভন। ভাল, অনেক ভাল। কল্যাণী ইজ ওয়ার্দি অফ হার নেম, খাড়া ক'রে তুলেছে আমাকে। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া কমলাপদর সামনে ধরিল) আসুন কমলদা।

কমল। নো, থ্যাঙ্কস, আমি ও ছেড়ে দিয়েছি সুশোভন।

সুশোভন। ছেড়ে দিয়েছেন ? বলেন কি ? আরে, আমি যে প্রথম প্রথম আপনার পকেট থেকেই চুরি ক'রে সিগারেট খেতে শিখেছিলা।

কমল। শিষ্যবিদ্যা চিরকালই গরীয়সী সুশোভন।

সুশোভন। আপনি যে ভয়ানক সিগারেট খেতেন! মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম তো নয়। ফার্স্ট ক্লাস ভার্জিনিয়া স্টাফ, আমার অবশ্য এক পয়সায় দশটা। তা হ'লে আপনি তো অনেক টাকা জমিয়েছেন কমলদা!

কমল। (হাসিয়া) তুমি পাগল সুশোভন।

সুশোভন। কেন?

কমল। সিগারেট ছাড়লেই টাকা জমানো যায়?

সুশোভন। যায় না? জমাতে পারেন নি আপনি?

কমল। (হাসিয়া) না।

সুশোভন। তবে আসুন, ফের শুরু করুন। টাকাই যখন জমল না, তখন ছাড়বেন কেন?

কমল। না, নুটুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নুটু। সুশোভন, এইবার তুমিও ওগুলো ছাড়। সিগারেট মদ—

সুশোভন। (বিলাতী ধরনে শ্রাগ করিয়া) ওরে বাবা! বাঁচব কি খেয়ে নুটুদা? আই হোপ্, ইউ আর জোকিং—

নুটু। না। সুশোভন, কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে তোমার মায়া হয় না?

সুশোভন। হয় না, তা বলতে পারি না। তবে তুমি মায়া করছ, কমলদা মায়া করছে, তার মাঝখানে আমি আবার মায়া করতে যাই কেন, বল?

কমল। আমি উঠলাম নুটু। ও বেলায় একটু সকাল সকাল ফিরো।

সুশোভন। কমলদা, আমি তোমার ওখানে যেতাম। পাঁচটা টাকা আমাকে ধার দাও। অবশ্য প্রেএবল হোয়েন এব্‌ল্—আই মীন, হোয়েন আই শ্যাল বি এব্‌ল্।

কমল। আজই আমি ট্রান্স্‌ফার হয়ে চ'লে যাচ্ছি সুশোভন। (প্রস্থান)

সুশোভন। মাইরি বলছি, মানি অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেব। মাইরি বলছি কমলদা— (অনুসরণোদ্যত)

নুটু। টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

সুশোভন। একটা বিউটিফুল ফিল্‌ম এসেছে। মিউজিক—কেবল মিউজিক, মরিশ শিভেলিয়র গান গেয়েছে। (ইংরেজী গানের সুর ভাঁজিতে লাগিল)

নুটু। সুশোভন!

সুশোভন। কমলদা চ'লে যাচ্ছে, আই মাস্ট্‌ ক্যাচ হিম। কমলদা—

(অল্প খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান)

নুটু। স্কাউন্ড্রেল! কি বলব, কল্যাণী দুঃখ পাবে—

(বিমলার প্রবেশ)

এস। (সঙ্গে সঙ্গে হাতবাক্স খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিয়া) এই নাও।

বিমলা। (পিছাইয়া গিয়া) কি?

নুটু। টাকা—খরচের টাকা।

বিমলা। (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অথচ করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া) উঃ, খুব চাঁদির

জুতোটা তুমি আমায় মারছ যা হোক!

নুট। আমায় মার্জনা কর বিমলা, আজ মহাভারতের আপীল-কেসের রায় বের হবে। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে আছে।

(বিমলা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

শোন, কি বলছ সংক্ষেপে বল।

বিমলা। বলছি—। না, থাক।

নুট। বিমলা, কি বলছ ব'লে যাও।

বিমলা। দুটো কথা। একটা জিজ্ঞাসা করব, একটা অনুরোধ করব।

নুট। বল।

বিমলা। আমার অরুণ যদি সুশোভন হ'ত, তবে কি তাকে তুমি সহ্য করতে?

নুট। এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। তোমার দ্বিতীয় কথা—তোমার অনুরোধ?

বিমলা। সেকালের সেই দুঃখকষ্ট ভরা জীবন আমায় ফিরিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, তোমার উপার্জন আমি চাই না। ওগো, এর চেয়ে যে সেকালে আমার অনেক শান্তি ছিল।

নুট। বাড়ির ভেতর যাও বিমলা। জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে; কিন্তু পেছনে ফিরে যাওয়া যায় না।

বিমলা। যদি না যায়, তবে আমায় মুক্তি দাও, এমন ক'রে টেনে হিঁচড়ে আমায় নিয়ে যেয়ো না। আমি আর পারছি না। (প্রস্থান)

(নুটু নীরবে বারকয়েক পায়চারি করিয়া আবার বই লইয়া বসিল। আবার উঠিয়া আর একখানা বই বাহির করিল। কয়েকটা নোট করিল। সে নোট করিতেছে, এমন সময় নুটুর পিছন দিকে প্রবেশ করিল কল্যাণী, তাহার হাতে একখানা বই)

নুট। আবার যখন এসেছ বিমলা, তখন তোমার সকল জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর শুনে যাও।

(কল্যাণী এদিকে ওদিক চাহিয়া বিমলাকে খুঁজিল)

হ্যাঁ, কল্যাণীকে আমি ভালবাসি, কিন্তু–

(কল্যাণীর হাত হইতে বইখানা সশব্দে পড়িয়া গেল। নুটু সেই শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে কাছে আসিল এবং বইখানি ও একটি ফাউন্টেন পেন টেবিলের উপর নামাইয়া দিল)

কল্যাণী। ছোড়দা এগুলো—বোধ হয়—চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

[নুটু চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল]

কল্যাণী। আমায় মাফ করুন নুটুদা।

নুট। মাফ? না না, মাফ চাইবার কোনও প্রয়োজন তো নেই কল্যাণী।

কল্যাণী। এ লজ্জা রাখবার যে আমার জায়গা নেই নুটুদা।

নুট। লজ্জা তোমার একার নয়, কল্যাণী, লজ্জা আমারও। সুশোভন শুধু তোমার ভাই নয়, সে আমার ছাত্র, আমি তার মাস্টার। (বইয়ের পাতা উল্টাতেই লাগিল) আর কিছু বলবে ?

কল্যাণী। আমি বিদায় চাইছি দাদা, আমায় আপনি—(ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল)

নুট। কেন কল্যাণী ?

কল্যাণী। না। (প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

নুট। তা হ'লে দাঁড়াও কল্যাণী। বিমলা মনে ক'রে যে কথাটা বলেছিলাম তার অর্ধেকটা তুমি শুনেছ, বাকিটা শুনে যাও—যদি যাওই, তবে শুনেই যাওয়া উচিত। আমি তোমায় ভালবাসি, সহোদরা ভগ্নীর মতই ভালবাসি। তাই আমি তোমায় বিদায় দিতে পারি না। আমার বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।

[কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

যদি কোনদিন মাটিতে প'ড়ে আঘাত পাও, গায়ে তোমার ধুলোর মালিন্য লাগে, তবে সেদিন জেনো, নুটুদা তোমার আদর্শচ্যুত হয়েছে, সে মরেছে।

[বিমলার প্রবেশ—সে এখন শান্ত]

বিমলা। সাড়ে এগারোটা যে বেজে গেল। খাবার হয়েছে, স্নান কর

নুট। সে কি ? সাড়ে এগারোটা বেজে গেল ? তা হ'লে রায় বোধ হয় এতক্ষণ বেরিয়ে গেল। আমি কোর্টে চললাম। মহাভারত—মহাভারত কই ?

বিমলা। সে তো পাগলের মত হয়ে রয়েছে, অনেকক্ষণ আগেই সে বেরিয়ে গেছে।

নুট। বেরিয়ে গেছে ?

বিমলা। ভয় নেই, অরুণ তার সঙ্গে গেছে।

নুট। আমি চললাম বিমলা। (ব্যস্তভাবে প্রস্থান)

বিমলা। এস ভাই ঠাকুরঝি, একটু জল মুখে দেবে এস

[কল্যাণী। দাদা ফিরে আসুন বউদি। এই তো কোর্ট, তি মিনিটের পথ।

বিমলা। তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবার জন্যে আমাকে এনেছ ভাই। আমি তো রয়েছি অপেক্ষা ক'রে, আবার তুমি কেন কষ্ট করবে ? এস, খাবে এস।] (কল্যাণীর হাত ধরিয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল, এমন সময়ে বাহিরে ঢাক ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল)

বিমলা। এ কি ? ঢাকা কিসের ? এই যে অরুণ। অরুণ—

(অরুণ ও মহাভারতের প্রবেশ, মহাভারত উদভ্রান্তের মত)

অরুণ। মামলায় আমাদের হার হয়েছে মা।

মহা। তাই গোপী মিত্তির ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে মা, ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে।

বিমলা। ঢাক শিঙে বাজাচ্ছে।

মহা। (চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া) একগাছা লাঠি, একটা দা—ঘরে কি তোমাদের কিছুই নাই খুড়োঠাকুর ?

অরুণ। (মহাভারতকে ধরিয়া) না, ছি মহাভারতকাকা!

বিমলা। কল্যাণী-ঠাকুরঝি, তুমি ভাই মহাভারতকে ভেতরে নিয়ে যাও।

কল্যাণী। (মহাভারতের হাত ধরিয়া) এস মহাভারত, এস ভাই, ভেতরে এস।

মহা। ঢাক বাজাচ্ছে দিদিঠাকরুন—

কল্যাণী। বাজাক। এস, ভেতরে এস। (উভয়ের প্রস্থান)

বিমলা। এইবার তুই যা অরুণ, ওদের বারণ ক'রে আয়।

অরুণ। বারণ করলেও শুনবে না মা।

বিমলা। ঢাক বাজাচ্ছে, শিঙে বাজাচ্ছে, ধেই ধেই ক'রে নাচছে। বারণ করলে শুনবে না ব'লে তুই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবি?

অরুণ। ওতে আমাদের অপমান হয় নি মা। নিজেদের অপমান ওরা নিজেরা ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা করছে, জানিয়ে দিচ্ছে—ওরা কত বড় অত্যাচারী।

বিমলা। তোর দেহে কি রক্ত নেই অরুণ?

অরুণ। অন্যায়ের প্রতিরোধ অন্যায় দিয়ে করা যায় না মা।

বিমলা। খুব শিক্ষা পেয়েছিস যা হোক বাপের কাছে। কথায় কথায় কবিতা আওড়াবি, ইংরিজী আওড়াবি, আর পাথরের মত সহ্য করবি। আচ্ছা। (নিজেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁচু গলায় বলিল) কারা ঢাক বাজাচ্ছ তোমরা? কারা? শোন। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—

(গোপী মিত্তিরের প্রবেশ)

গোপী। আজ্ঞে মা, পেনাম। (ব্যঙ্গভরা ভঙ্গিতে হেঁট হইয়া নমস্কার করিল)

বিমলা। তুমি গোপী মিত্তির?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আপনাদের চরণের দাস।

বিমলা। এমন ক'রে আমার বাসার সামনে ঢাক বাজাচ্ছ কেন?

গোপী। আজ্ঞে মা, মামলায় আমরা জিতেছি কিনা, তাই বিবেচনা করুন, ঢাক শিঙে বাজিয়ে আপনাদের পেনাম করতে এসেছি। বিবেচনা করুন, আপনারা হলেন কঙ্কণার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বংশ, আপনাদের পেনাম ক'রে আশীর্বাদ—

বিমলা। আশীর্বাদ?

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বিবেচনা করুন, আশীর্বাদ।

বিমলা। আশীর্বাদ নিতে পারবে?

গোপী। দেখুন দেখি, বিবেচনা করুন, সেইজন্যেই তো এসেছি মা।

বিমলা। রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের শেষদিনে, ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ ক'রে রাজাকে ফল দিয়েছিল। সেই ফল থেকে বেরিয়েছিল তক্ষক সাপ। আমার আশীর্বাদ থেকে যদি তেমনই তক্ষক সাপ বের হয় গোপী মিত্তির, তবে সে আশীর্বাদ নিতে পারবে? মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারবে তোমার বাবুর কাছে?

গোপী। (ভয়ে বিবর্ণ হইয়া) আজ্ঞে, মা, বিবেচনা করুন—। ওরে—ওরে—ওরে, থামা রে! ওরে—

[দ্রুত প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে বাজনা থামিয়া গেল। পিছন দিক হইতে একটা দা হাতে মহাভারতের প্রবেশ]

বিমলা। এ কি, দা হাতে কোথায় যাবে মহাভারত?

মহা। আসছি মা, আসছি।

[বিপরীত দিক হইতে নুটুর প্রবেশ]

নুট। এ কি মহাভারত? [মহাভারতকে ধরিয়া ফেলিল]

মহা। ছাড়া দাদাঠাকুর, ছাড়। ছেড়ে দাও। ওই ব্যাটা গোপে মিত্তিরকে আমি খুন করব। ছাড়।

নুট। ছি মহাভারত!

মহা। তুমি শোন নাই দাদাঠাকুর, ওরা ঢাক বাজাচ্ছিল, শিঙা বাজাচ্ছিল—

নুট। ডাকাতে মশাল জ্বেলে রোশনাই ক'রে ডাকাতি করে, মানুষ অসহায় জীবকে বাজনা বাজিয়ে কাটে, কেটে নাচে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হবে মহাভারত। দা-খানা ফেলে দাও।

মহা। কবে? কবে? কবে? আমি ম'রে গেলে তবে হবে?

নট। অপেক্ষা কর মহাভারত, কিছুদিন অপেক্ষা কর। সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তবে কবে, তা জানি না। কিন্তু তোমার ওপর অত্যাচারের প্রতিকার—তার দেরি নেই। (দাখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিল) বিমলা, আমার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দাও দেখি।

বিমলা। সে কি, কোথায় যাবে?

নুট। অজ্ঞাতবাস বিমলা, অজ্ঞাতবাস।

মহা। আমার জন্যে তুমি দেশান্তরী হবে দাদাঠাকুর? না না। তার চেয়ে আমিই ভিন গাঁয়ে চ'লে যাচ্ছি।

নুট। না, শুধু তোমার জন্যে নয়। তোমার মত হাজার হাজার মহাভারত আজ দেশে এমনই অন্যায়ভাবেই ধনীর চক্রান্তে সর্বস্বান্ত হ , মরছে। আজও তোমার হার হ'ত না মহাভারত, যদি নিজে আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়াল জবাব করতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমার তকমা নেই। তকমা আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। ওকালতি পড়তে যাচ্ছি আমি। অন্যায়ের অত্যাচারের প্রতিকার করতে সর্বক্ষেত্রে দাঁড়াবার অধিকার আমার চাই—চাই—চাই।

(নুটু ও বিমলার ভিতরে প্রস্থান)

[অরুণ। (সহসা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) O Lord, how long shall the wicked triumph? Lift thyself up-thou judge of the earth-lift up!

মহা! ভগবান! ভগবান!]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্ধকার রাত্রির মধ্যে মহাভারত পালের বাড়ি পুড়িতেছে। আগুন নিবিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও মাটির উপর পোড়া কাঠ ও খড় হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে—কোথাও কোথাও আগুনের শিখা দেখা যাইতেছে। চারিপাশে ক্ষুদ্র জনতা। মহাভারত কালী বাগদীর বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব হইতেই জনতার ব্যস্ত কথাবার্তা শোনা যাইতেছিল।

১ম। আর ভয় নাই, আগুন নিবে এসেছে।

২য়। এইখানে—এইখানে আগুন রয়েছে এখনও। এইখানে জল দাও।

৩য়। ওহে, মহাভারতকে ছাড়াও হে, কালী বাগদী ম'রে যাবে।

(যবনিকা অপসারিত হইল)

১ম ব্যক্তি। ছেড়ে দাও মহাভারত, ছেড়ে দাও। ম'রে যাবে। ছেড়ে দাও।

২য়। মহাভারত। মহাভারত।

মহা। (চিৎকার করিয়া উঠিল) এ—ও।

১ম। ম'রে যাবে, মহাভারত, ম'রে যাবে। ছাড়।

মহা। ছাড়ব, ছাড়ব। যে চিতে ব্যাটা নিজের হাতে জ্বেলেছে, সেই চিতের ওপর দিয়ে ছাড়ব।

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। মহাভারতকাকা। মহাভারতকাকা।

মহা। কে ? অরুণখুড়ো ? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল) খুড়োঠাকুর, নিজের চিতে ব্যাটা নিজের হাতে জ্বেলেছে।

অরুণ। ছেড়ে দাও, ওঠ বুকের ওপর থেকে।

মহা। উঠব ? ছেড়ে দেব ? আমার ঘর পুড়িয়ে দিলে, আর আমি ছেড়ে দেব ?

অরুণ। (আকর্ষণ করিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঠ ওঠ।

মহা। তুমি বলছ।

অরুণ,। হ্যাঁ, আমি বলছি।

(মহাভারত উঠিল, উঠিয়াও প্রতিহিংসাজর্জর দৃষ্টিতে কালীর দিকে চাহিয়া রহিল। অরুণ কালীকে দেখিয়া বলিল)

অরুণ। পিসীমা, শিগগির একটু জল।

১ম ব্যক্তি। স'রে পড় হে। ঘরে আগুন দেওয়ার মামলা—অনেক হাঙ্গামা।

২য় ব্যক্তি। গোপী মিত্তির দেখতে পেলে মুশকিল হবে। চল চল। (প্রস্থান)

মহা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম খুড়োঠাকুর, এমনই কিছু হবে। তোমাদের পাঠশালা-বাড়ি পুড়ল, দিদিঠাকরুন মমতা-মাকে আমার বাড়ি নিয়ে এলাম। গোপী মিত্তির

ব'লে পাঠালে, ভাল হবে না। কাল আবার লোক পাঠিয়ে শাসালে। এই দুবার হ'ল। এর পরের বারই তিনবার। আমি এই তিনবারের লেগে দিনরাত তক্কে তক্কে রয়েছি। [কেলে বাগদী একা—আগুন দিলে, আমি আসতে আসতে ব্যাটা কাজ সেরে ছুটবার উয্যুগ করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালাম, ব্যাটা ভোঁ করে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল গোয়াল ঘরে। মনে করলে, আমি দেখি নাই। আমি শেকল দিয়ে দিলাম। মরত ব্যাটা পুড়ে। তুমি এসে খুলে দিলে খুড়োঠাকুর। উঃ, তখনও কি ছুট! আমি না ধরলে ব্যাটা পালিয়েছিল।]

[কল্যাণী জল আনিল। সঙ্গে মমতা। অরুণ কালীর মুখে-চোখে জল দিল]

কালী। জল। একটু জল!

[মহাভারত চট করিয়া এক মুঠা পোড়া খড় লইয়া কালীর মুখের সম্মুখে ধরিল]

মহা। নে, খা।

অরুণ। মহাভারতকাকা! (কালীকে জল দিয়া) নাও, জল খাও। উঠতে পারবে?

[কালী উঠিয়া বসিল]

এঃ, কয়েক জায়গাই পুড়ে গেছে! কেটে গেছে! মমতা, দেখ তো—যা জিনিসপত্র বেঁচেছে, তার মধ্যে ফার্স্ট এডের বাক্সটা পাওয়া যায় কি না।

[মমতার প্রস্থান]

কল্যাণী। মহাভারতের মাথাও কেটে গেছে। ওর মাথাও ধুয়ে মুছে দিতে হবে অরুণ।

মহা। দিদিঠাকরুন, তুমি দেব্‌তা, তুমি দেবতা। খুড়োঠাকুর তো আমার মাথার রক্ত দে.লে না। খুড়োঠাকুর দয়া করছে কালীকে—শত্তুরকে, যে ঘরে আগুন দিয়েছে, তাকে।

অরুণ। (হাসিয়া) তুমি যে ঘরের লোক মহাভারতকাকা। নাও, কালী, ওঠ।

মহা। দাঁড়াও খুড়োঠাকুর, আমি ধরি ওকে, নইলে পালাবে। তুমি জান না, ও হ'ল কেলে বাগদী, এখন ও চোট-খাওয়া বাঘ।

কালী। (নিঃশব্দে হাসিয়া) বড় বেকায়দায় ফেলেছিলে মে ল, নইলে ঘাড়টা তোমার আমি ভেঙে দিতাম।

অরুণ। তুমি কেন মহাভারতের ঘরে আগুন দিলে কালী?

কালী। শুধিও না বাবু, তুমি মহাভারতের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ, মুখে জল দিয়েছ। ও-কথা তুমি শুধিও না। তবে হ্যাঁ, দিয়েছি।

অরুণ। বাবুদের হুকুমে এত বড় পাপ করলে তুমি? ছি!

কালী। তিন পুরুষ ধ'রে পরের ভাত তো খাও নাই বাবু, তুমি বুঝতে লারবে। নাও, কোথা নিয়ে যাবে, চল।

মহা। তুই বাবুদের নাম কর্‌ কালী, তোকে বাঁচিয়ে দেব।

কালী। কি যা-তা বলছ মোড়ল? (হা লে) আমার খুশি হয়েছিল তোমার ঘরে আগুন দিয়েছি। থানায় দাও, জেলে দাও, ফাঁসি দাও—যা খুশি তোমার কর কেনে। চল, কোথা নিয়ে যাবে, চল।

(অরুণ ও মহাভারত কালীকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

(জনতা চলিয়া গেলে শূন্য রঙ্গমঞ্চের এক দিক হইতে কালো র‍্যাপারে মাথা ও সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল—ছায়া মূর্তির মত—গোপী মিত্তির। তাহার কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রবেশ করিল সুশোভন ও অরুণ। সুশোভনের বগলে বেহালার বাক্স। সুশোভন ঈষৎ মত্ত)

অরুণ। আপনি এতক্ষণ কোথা ছিলেন? কোথাও আঘাত লাগে নি তো?

সুশোভন। আমি অত্যন্ত অপদার্থ লোক অরুণ। আগুন নিবোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাঁপানি আরম্ভ হ'ল। ওই গাছতলাটায় ব'সে ছিলাম।

অরুণ। আপনার বগলে ওটা কি? বেহালার বাক্স বুঝি?

সুশোভন। হ্যাঁ। অনেক কষ্টে ওটাকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু না বাঁচালেই ছিল ভাল। আমার গান শেখা মিথ্যা হয়েছে দেখলাম—একদম বাজে।

অরুণ। কেন?

সুশোভন। ব'সে ব'সে মেঘমল্লার বাজালাম; জান অরুণ, মেঘমল্লার যদি ঠিক নিখুঁতভাবে বাজানো হয়, তবে আকাশ ভেঙে মেঘ এসে বৃষ্টি নামে। কিন্তু নট এ ড্রপ —গোটা আকাশটা নীল, এক টুকরো মেঘও কোথাও নেই।

(উদ্‌ভ্রান্ত মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। আঃ, ঠাকুরদা আমার শালকাঠ দিয়ে ঘর করেছিল, সব পুড়ে গেল।

অরুণ। সে লোকটাকে কার জিম্মায় রেখে এলে মহাভারতকাকা?

মহা। বেঁধে রেখে এসেছি খুড়োঠাকুর, গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছি।

[অরুণের প্রস্থান]

আঃ, এক ছিলিম তামাক হ'ত এই সময়।

সুশোভন। (পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট লইয়া) ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান, নাও।

মহা। ছোট দাদাঠাকুর!

সুশোভন। (পকেট খুঁজিয়া) যাঃ, দেশলাইটা গেছে।

মহা। (হাসিয়া একটা পোড়া কাঠ লইয়া) নাও। শালকাঠের আগুন এত শিগগির কি নেবে? (নিজেও সিগারেট ধরাইল)

সুশোভন। (পকটে হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া) একটু খাবে মহাভারত? মনটা ভাল হবে।

মহা। না, তার চেয়ে একটা গান, কি বাজনা শোনাতে পার দাদাঠাকুর?

সুশোভন। (বেহালা বাহির করিয়া) শুনবে? খুব করুণ রাগিনী একটা বাজাই, শোন। বাজাইতে আরম্ভ করিল।)

মহা। দূর! কি পান-প্যান ক'রে বাজাচ্ছ তুমি? হয় নাচের বাজনা বাজাও, নয় তেজী বাজনা বাজাও। নাঃ, হারামজাদা বাগদীকে আমি থানায় দিয়ে আসি।

[জনৈক মণ্ডলের প্রবেশ]

মণ্ডল। এই যে মহাভারত।

মহা। জমিদারের মণ্ডল মশাই যে।

মণ্ডল। তোমার সঙ্গে কথা আছে মহাভারত।

মহা। না না না। কথা আমার কারুর সঙ্গে নাই।

মণ্ডল। (কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া) শোন, শোন।

মহা। ওইখানে—ওইখানে, শালকাঠের আগুন এখনও জ্বলছে, ওইখানে গুঁজে দাও।

মণ্ডল। আলক্ষ্মী যখন ভর করে, তখন এমনই মতিচ্ছন্নই হয়।

মহা। আলক্ষ্মীই আমার ভাল দাদা, উনি কখনও ছেড়ে যান না।

মণ্ডল। পাগলামি করিস না মহাভারত, ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহা। চণ্ডাল, কসাই—চণ্ডাল, কসাই। তুমি যাও, তুমি যাও। আমি কেলে বাগদীকে থানায় নিয়ে চললাম, আমার সময় নাই, আমার সময় নাই (প্রস্থান)

মণ্ডল। (সুশোভনকে) ঠাকুর, তোমাকে একটা কথা বলছিলাম

সুশোভন। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া) হোয়াট ইজ দ্যাট কথা ?

মণ্ডল। এই ঘরে আগুন দেবার জন্যে মামলা হবে, তুমি যদি আমরা যা বলব বল, তা হ'লে এই টাকা দেব—

সুশোভন নো।

মণ্ডল আরও পরে ঠাকুর, আরও পরে—

সুশোভন নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট, মানি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট কার্স। নেহি মাংতা হ্যায়।

মণ্ডল। এ-হে-হে, এদের সবারই মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি। (প্রস্থান)

সুশোভন। I had my money and my friends,
I lent my money to my friends,
I asked my money to my friends,
I lost my money and my friends,
I need no money to loose new friends
মহাভারত ইজ মাই ফ্রেণ্ড— [বলিতে বলিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলার সদর-শহরের কোর্টের বারান্দার সম্মুখ

একটা গাছতলায় একটা চেয়ারে বসিয়া দেবনারায়ণ ও উকিল রাজেনবাবু। সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোপী মিত্তির। মধ্যে মধ্যে দুই-একজন লোক চলিয়া যাইতেছে।

দেব। আমি বার বার বারণ করেছিলাম রাজেনবাবু—বাবা, এতটা করবেন না, সে কাল আর নেই। কিন্তু বাপ হয়ে ছেলের কথা শুনলে অপমান হয় যে। তার

ওপর জুটেছে এই গোপী।

গোপী। আজ্ঞে বাবু, বিবেচনা করুন, আমরা হলাম ঢাকীর কাঁধের ঢাক। বিবেচনা করুন, যেমন বাজাবেন, তেমনই বাজব। বলিদানের বাজনা বাজান, বলিদানের বোল বলব ; বিবেচনা করুন, আবার বিসর্জনের বোল বাজান, তাই ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বাজব। বিবেচনা করুন, মহাভারতের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছি, আপনি বলুন, খরচ দেন, আবার দাঁড়িয়ে থেকে পোড়া ঘর ছাইয়ে দিই।

রাজেন। যাক্, যা হয়ে গেছে তার তো উপায় নেই। এখন কর্তব্য ক'রে যান। আমি জামিনের চেষ্টা দেখছি, আপনারা মিটমাট করতে চান, তাই করুন, কিংবা—কি হে গোপী, পারবে তো?

গোপী। এই দেখুন, উকিলবাবু কি বলছেন দেখুন! তবে বিবেচনা করুন, সুতোর সেলাইয়ে চামড়ার মুখ বন্ধ হয় না।, রূপোর সুতো চাই, বিবেচনা করুন, সোনার হ'লে আরও মজবুত হবে। সাক্ষীরা তো মানুষ।

রাজেন। টাকা দিয়ে সব সাক্ষীর মুখ বাঁধতে পারবে?

গোপী। পৃথিবীটা কার বশ রাজেনবাবু? বিবেচনা করুন, পৃথিবী টাকার বশে। টাকা খরচ ক'রে, বিবেচনা করুন, দশ দিক দেওয়াল গেঁথে বন্ধ ক'রে দিন, দশটা সূয্যি উঠলেও দিন রাত হয়ে যাবে। আবার রাত্রে জেলে দিন বাতি লাখ লাখ, বিবেচনা করুন, অমাবস্যার রাতও দিন হয়ে যাবে।

(শিবনারায়ণের প্রবেশ। সঙ্গে একজন বরকন্দাজ)

শিব। কত টাকা খরচ করলে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে গোপী?

দেব। এ কি?' বাবা?

শিব। হ্যাঁ বড় হুজুর, আমি।

রাজেন। আপনার আসবার কোন দরকার ছিল না কর্তাবাবু।

শিব। একবার আসতে হ'ল বইকি রাজেনবাবু। [বড়বাবুকে যৌবরাজে বসিয়ে আজ বছর কয়েক ঘরেই ঢুকেছিলাম রাজেনবাবু। মদ ছেড়ে আফিং ধরেছিলাম। বাইজী ছেড়ে নাতনীদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ক'রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছিলাম।] কেলে বাগদী ব্যাটা ধরা প'ড়ে সব ভেস্তেদিল। হিসেব ক'রে দেখলাম, ঘরে ব'সে ব'সে বারো বছর—একটা যুগ পার হয়ে গেছে ; কেলে ব্যাটা বুড়ো হয়েছে, ব্যাটার ধরা পড়বারই কথা। তাই একবার বেরুতে হ'ল বইকি। (চারিদিক চাহিয়া) তা বেশ, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আর কিছু চেনাই যায় না হে।

[রাজেন। একটা চেয়ার আনিয়া দিই বসুন। কিংবা আমার বাড়িতে—

শিব। উহুঁ, কোমরে বাত আছে, বসলে ওঠা শক্ত হবে রাজেনবাবু। এখন কালীর জামিনের কথা কি বলছেন, বলুন?

দেব। দরখাস্ত করা হয়েছে। তুমি চল বাবা। গাড়িতে বসবে চল।

শিব। ঠারিয়ে হুজুর বাহাদুর, ঠারিয়ে।] গোপী, কত টাকা হ'লে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে?

(হাসিয়া) ওরে বাবা, সেদিন বাক্স খুঁজতে খুঁজতে তোর মায়ের নামের একখানা চিঠি পেলাম, আমিই লিখেছিলাম। তোর মা লেখাপড়া জানে না, তবু তাকে চিঠি লিখছিলাম—এ-ই লম্বা চিঠি। প'ড়ে আর হাসতে হাসতে বাঁচি না। বউমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখবার বয়স হোক তোমার, তখন বুঝতে পারবে আমার কথা। ডর মং করো বড় হুজুর, সব ঠিক হো যায়গা; গোপী মিত্তির খাঁটি কথা বলেছে দেবু, পৃথিবী টাকার বশ। মামলা সাক্ষীর মুখে। আর সাক্ষীগুলি সব পৃথিবীর মনিষ্যি।

দেব। কিন্তু ওই মাস্টারনী আর তার ভাই? ওরাই হবে মামলার প্রধান সাক্ষী।

শিব। হুঁ। এক কাজ কর। মাস্টারনীর মাতাল ভাইকে ডাকাও, মদ খাওয়াও, টাকা দাও। তার মাস্টারনীর মেয়েটার সঙ্গে আমার ছোট হুজুরের বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠাও। মন্দ হবে না। মেয়েটা ভাল হে, আমি শুনেছি। আর ছোট হুজুর তো প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে।

[গোপী মিত্তিরের ব্যস্ত উত্তেজিতভাবে প্রবেশ]

গোপী। হুজুর, নুটু মোক্তার—

শিব। (চকিতভাবে গম্ভীর হইয়া) নুটু মোক্তার?

গোপী। নুটু মোক্তার ফিরে এসেছে।

শিব। নুটু ফিরে এসেছে?

গোপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, উকিল হয়ে ফিরে এসেছে, এসেই মহাভারতকে শহরের বাসায় নিয়ে এসেছে।

শিব। হুঁ। (গম্ভীর চিন্তামগ্ন হইলেন) নুটু মরদ বটে।

দেব। লোকে বলত, নুটু ওকালতি পড়ছে, বিশ্বাস করতে পারি নি। যে লোক তিন বৎসর দেশে না এসে, সংসার স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ ক'রে এমনই ক'রে জেদ বজায় রাখে, তার সঙ্গে পারবে না বাবা। মামলা মিটমাট ক'রে নাও।

শিব। থাক দেবনারায়ণ, থাক। তুমি এই মামলাটা আমার কথামত কর। 'না' ব'লো না। দেবনারায়ণ, কেলে বাগদী ছাড়া আমাদের সবাই চ'লে গেছে। কেলেকে বাঁচাবার চেষ্টায় তুমি বাধা দিও না।

[রাজেন উকিলের প্রবেশ]

রাজেন। হ'ল না কর্তাবাবু, জামিন হ'ল না। নুটু মুখুজ্জে উকিল হয়ে ফিরেছে, সে মহাভারতের পক্ষ থেকে আপত্তি জানালে। হাকিম তার যুক্তির বিপক্ষে যেতে পারলেন না। জামিন হ'ল না।

শিব। গোপী!

গোপী। হুজুর!

শিব। তুমি একবার এই শহরের মহেন্দ্র জ্যোতির্বীকে খবর দাও। আমার কোষ্ঠীখানা একবার দেখাবার প্রয়োজন হয়েছে। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) একটা কথা গোপী, নুটুর সঙ্গে দেখা হ'লে আমাকে যেন সম্মান কর, তেমনই সম্মান

করবে। রাজেনবাবু, নুটু বুঝি আপনাদের রাহু হয়ে এল গো। লোকটা মরদ বটে।

দেব। মামলা মিটমাট ক'রে নাও বাবা, নুটুর সঙ্গে মিটমাট করতে তো তোমার আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

শিব। (ক্রুদ্ধ গম্ভীর ভাবে) না। মামলা চলবে। আমার ঘাড়টা বড় শক্ত দেবনারায়ণ, নোয়াতে গেলে ব্যথা লাগে। রাজেনবাবু, আপনি জজকোর্টে দরখাস্ত করুন আপীলের জন্যে। মামলা চলবে, মামলা চলবে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নুটুর শহরের বাসা

[ঘরের মধ্যে টেবিল-পাশে আমের শাখা দেওয়া পূর্ণ ঘট। বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরনে লালপেড়ে শাড়ী, হাতে একটি থালায় আশীর্বাদ ফুল, সদ্য সে পুজা করাইয়া ফিরিয়াছে, চুল এলো, চুলের উপর অল্প ঘোমটা। উকিলের বেশে গাউন পরিয়া নুটু বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল]

নুটু। (সবিস্ময়ে) আরে বাপ রে। এসব কি ?

বিমলা। পুজো করিয়ে এলাম ঠাকুরদের।

নুটু। (হাসিয়া) ভাগ্যে তোমরা আছ বিমলা, তাই তো দেবলোক আজও বেঁচে আছেন, নইলে বেচারারা শুকিয়ে ভারতলোকের অধীন অবস্থায় উপনীত হতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারপর, কি কামনা করলে ?

বিমলা। তোমার জয় কামনা করলাম। আর কোন কামনা করব ?

নুটু। কত টাকা মানত করলে ?

বিমলা। মানত করেছি, তবে সেটা টাকা নয়।

নুটু। বল কি ?

বিমলা। আজ তোমায় আমি কটু কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কটু কথা বলছি না, ঠাট্টাও করছি না, সত্যি কথাই বলছি—টাকা মানত করি নি, টাকা কামনা করি নি, এমন কি লক্ষ্মীর পুজো পর্যন্ত করাই নি। এতে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ নেই।

নুটু। (অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া) তবে কি মানত করলে ?

বিমলা। বুকের রক্ত মানত করেছি, বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করব।

নুটু। তোমার জয় হোক বিমলা, তোমার জয় হোক।

বিমলা। না। চিরদিন যে পরাজয় মেনেই এল, হঠাৎ তার জয় সহ্য হবে না। (পরমুহূর্তেই হাসিয়া) ওই দেখ, স্বভাব যায় না ম'লে। যা বলব না বললাম, তাই ব'লে ফেললাম। বেশ, আমার জয় হোক; কিন্তু তোমার জয়ই তো আমার জয়।

নুট। দাও, আশীর্বাদ দাও। (মাথা নত করিল)

বিমলা। তুমি কি মানুষ! আমায় কি তোমার মাথায় হাত দিতে আছে? ঠাকুরঝি! কল্যাণী-ঠাকুরঝি! অ-ভাই!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

নুট। এ কি কল্যাণী? এ কি বোন? তোমার এই ময়লা বেশভুষা, জী একখানা—

কল্যাণী। কদিন কাপড়চোপড় ক'রে কাচা হয়ে ওঠে নি দাদা।

নুট। কেন? তুমি কাপড়চোপড়--

বিমলা। দেখ, তুমি কাপড় কাচার নাম ক'রো না বলছি। শুভকাজে যাচ্ছ না?

নুট। যারা তোমার ময়লা-করা মলিকানা পরিষ্কার ক'রে তোমার সংসার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতায় ভ'রে দেয়, তাদের নাম কখনও অশুভ হয় বিমলা? তুমি কি কাপড়চোপড় ধোবার বাড়ি দাও না কল্যাণী?

কল্যাণী। নিজেই এখনো ক'রে নিই দাদা, কেন দাদা—

নুট। না, কিছু নয় বোন। তুমি আমার বোন এতে যে আমার নিন্দে হবে কল্যাণী।

বিমলা। বেশ তো, মামলা জিতে একখানা শাড়ীর গরদ কিনে এনে দিও ঠাকুরঝিকে। অন্য কিছু না দিক ঠাকুরঝি, গরদ আমি নেওয়াব। এখন মাথা নামাও। ও ঠাকুরঝি, আশীর্বাদী দাও তো তোমার দাদার মাথায়।

কল্যাণী। ওরে বাপ রে! আমি কি দাদার মাথায় হাত দিতে পারি বউদি?

বিমলা। বোন সব পারে ঠাকুরঝি, ব্রাহ্মণের বোন পৈতের চেয়েও বড়, পৈতে থাকে গলায়—বোনের ঠাঁই মাথায়।

নুট। (বিমলার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিল) দাও কল্যাণী, আশীর্বাদী দাও।

[কল্যাণী কুণ্ঠিতভাবে আশীর্বাদী মাথায় ঠেকাইয়া দিল]

বিমলা। ও শ্যামা! মমতা! তোরা করছিস কি সব? অরুণ কোথায়?

নেপথ্যে শ্যামা! আসছি মা।

[শ্যামা, মমতা ও অরুণের প্রবেশ। অরুণের কপালে চন্দনের ছাপ, পরনে গেঞ্জি, নূতন কাপড়]

বিমলা। অরুণের আজ জন্মদিন। তোমার তো সকাল থেকে অবসর ছিল না। প্রণাম কর অরুণ।

শ্যামা দাদাকে কি দেবেন বাবা? [অরুণ নুটুকে প্রণাম করিল]

নুট। কি দেব? দেব শুধু আশীর্বাদ। জীবনে যেন আদর্শচ্যুতি না ঘটে। আদর্শের সত্যকেই যেন সকলের চেয়ে বড় করতে পার।

[অরুণ মাকেও প্রণাম করিল]

বিমলা। আমি আশীর্বাদ করি বাবা, সংসারে তুই সুখী হোস। তোর স্নেহে তোর স্ত্রীপুত্র যেন সুখী হয়।

[সুশোভনের-একটা মাছ লইয়া প্রবেশ, মাছটা ফেলিয়া দিয়া]

সুশোভন। নটুদার শুভযাত্রা অ্যাণ্ড্ অরুণের বার্থ-ডে-ফীস্ট্—বোথ পার্পাস উইল বি সার্ভড্।

নুট। আজও তুমি মদ খেয়েছ সুশোভন ? কোর্টে আজ তোমার সাক্ষী দিতে হবে।

সুশোভন। অল্প একটু নটুদা, অত্যন্ত অল্প। মাইরি বলছি। তবে ইউ সী, ভড্কার গন্ধটাই খারাপ।

নুট। মাছ তুমি কোথায় পেলে ?

সুশোভন। সে ভারি মজার কথা নটুদা। তোমার শত্রু—ওই বাবুদের পুকুরের মাছ, তোমার জয়যাত্রা দেখাতে নিয়ে এসেছি।

নুট। নিয়ে যাও এ মাছ।

সুশোভন। মাইরি বলছি, চুরি করি নি। আমায় দিলে, মাইরি বলছি।

নুট। দিলে ? কে দিলে ?

সুশোভন। বুড়ো বড়বাবু হঠাৎ বেহালা শোনবার জন্যে ডেকেছিল। দি ওল্ড ম্যান ইজ রিয়েলি অ্যামিউজিং—এ ফানি ফেলো—এ ডার্লিং। আমায় দুটো টাকা দিলে। ঠিক সেই সময় ওদের মাছ ধ'রে নিয়ে এল ; আমি বললাম, টাকা চাই না, আমায় একটা মাছ দিন। হি গেভ মি বোথ দি মানি অ্যাণ্ড দি ফিশ

নুট। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত সুশোভন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আরও একটা কথা, তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

[যাইবার সময় মাছটা লাথি মারিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

সুশোভন। এটা কি হ'ল ? অ্যাঁ ? হোয়াট ইজ দিস ? চুরি করি নি, ভিক্ষে নিই নি, সে আমায় দিলে। আগে বাদশারা একখানা গান শুনে কত জায়গীর দিয়ে গেছে। এ তো এক মাছ।

[বিমলা বাহিরে গিয়া মাছটা লইয়া আসিল]

বিমলা। ওঁর মেজাজই ওই রকম ভাই। কিছু মনে ক'রো না।

কল্যাণী। না বউদি, নটুদা রাগ করবেন।

বিমলা। ছেলে কি ওঁর একার ঠাকুরঝি ? আমার কি কোনও অধিকার নেই ? এই মাছের মুড়ো দিয়েই অরুণ আজ ভাত খাবে।

সুশোভন। দ্যাট'স লাইক ইউ বউদি। মাইরি বলছি বউদি, আমাকে সম্মান ক'রে দিলে। আমিই বরং বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমায় বললে কি জান ? মমতার সঙ্গে ওদের মাতাল ছেলেটার বিয়ের কথা বললে। আমি বললাম, সে অসম্ভব ; আমি নিজে মাতাল, কিন্তু আই হেট দি মাতালস ; তার ওপর আপনাদের ছেলে আন্কালচার্ড্—মূর্খ ;

[নটুর মুহুরীর প্রবেশ]

মুহুরী। সুশোভনবাবু, আপনি শিগগির আসুন। এখুনি হয়তো ডাক পড়বে। আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আসুন মশায় সুশোভনবাবু।

সুশোভন। ওয়ান মিনিট প্লীজ, একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিই।
(পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া মদ খাইয়া) চলুন এইবার।
(মুহুরী ও সুশোভনের প্রস্থান)

কল্যাণী। এক এক সময়ে ইচ্ছে করে বউদি—

বিমলা। সে ইচ্ছে কি বউদিরই হয় না ভাই? কিন্তু ও-ইচ্ছে দমন করতে হয়।

কল্যাণী। ছোড়দার জীবন বেশিদিন নয়, তাই ওকে বলতে পারি না—তুমি যাও।

বিমলা। তা যদি বলতে ঠাকুরঝি, তবে আমি তোমাকে ঘেন্না করতাম। এস ভাই, রান্নার কাজ অনেক বাকি, এস, একটু হাত দেবে এস।
(বিমলা ও কল্যাণীর প্রস্থান)

শ্যামা। দাদা, মমতা তোমার জন্যে কি এনেছে দেখ।

অরুণ। আগে তোর দেখি। তুই কি দিচ্ছিস?

শ্যামা। আমি কার্পেটের জুতো তৈরি রেখেছি।

অরুণ। শ্রীচরণে শু—এস এইচ ও ই।

শ্যামা। দাদার জুতোয় হাত দিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কারও বেলা বড় জোর জামা-কাপড়টার ভার নিতে পারি। তাই তো মমতা এনেছে নিজের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড়।

নেপথ্যে বিমলা। শ্যামা। শ্যামা।

শ্যামা বাবা। বাবা। যাই। আর কি এনেছে মমতা, তুমি জিজ্ঞেস কর ওকে।
(প্রস্থান)

মমতা। সত্যি। আমার আরও কিছু দেবার আছে।

অরুণ। দাও মমতা। শিব অঞ্জলি পেতেছিলেন অন্নপূর্ণার সম্মুখে, অন্ন দিয়েও অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার শূন্য হয় নি, শিবের অঞ্জলিও পূর্ণ হয় নি। দিয়ে তুমি আমার হাতও ভ'রে দিতে পারবে না।

মমতা। আমি হ'লে শিবের হাতে অন্ন দেবার স্পর্ধা না ক'রে এক টুকরো বেলপাতা তাঁর পায়ে দিয়ে 'নম শিবায়' ব'লে প্রণাম করতাম। আশুতোষের অঞ্জলি যতই বিরাট হোক, এক কণা ভক্তিতেই তা ভ'রে ওঠে। আশীর্বাদ করতে পথ পেতেন না।

অরুণ। আবার আমি হাত পাতছি, আরও দাও মমতা।

মমতা। নাঃ, রুদ্র-দেবতাকেও তুমি হার মানালে দেখছি। বেশ আবার একটা প্রণাম করছি।

অরুণ। প্রণাম তোমার চাচ্ছি না। তোমার ভক্তিতে আমার অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। কিন্তু ভক্তিই কি সব? ক্ষুধা আমার মিটেছে, কিন্তু তৃষ্ণা?

মমতা। তৃষ্ণা?

অরুণ। হ্যাঁ, তৃষ্ণা, জল দাও। তুমি ভক্তি দিচ্ছ, আমি দেবতার মত তুলে নিচ্ছি। কিন্তু ভক্তিই কি সব? আমার অন্তর তো তাতে জুড়িয়ে যাচ্ছে না। তুমি

হাসছ মমতা?

মমতা। হাসছি। লবণাক্ত সমুদ্র আদিকাল থেকে নদীর নির্মল স্নিগ্ধ জল পান ক'রে আসছে, আকণ্ঠ পুরে অহরহ অবিরাম। কিন্তু তৃষ্ণা তার তবু মিটল না। সে বোধ হয় বুঝতেও পারবে না যে, নদী তার জীবন নিংড়ে ঢেলে দিলে।

অরুণ। সে কথা নদী বলে না কেন? সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে না-ই যদি ওঠে তার কণ্ঠস্বর, সে তো কানে কানেও সে কথা বলতে পারে।

[মমতার গান]

মুখে কেন শুধাও মিছে,
চোখের পানে দেখ চেয়ে,
ভীরু যে সুর ভরায় ভাষা,
আঁখির আলোয় ওঠে গেয়ে॥
সারাদিন যা মনে মনে
ভাবে আকাশ সঙ্গোপনে,
যেমন রাতের অন্ধকারে
ফোটে তারা আকাশ ছেয়ে,
তেমনি আমার মনের কথা
আঁখির আলোয় ওঠে নেয়ে॥
মুখের চেয়ে অনেক বেশি মুখর দুটি আঁখি,
অধর যেমন দেয় না ধরা, নয়ন যে দেয় ফাঁকি,
নাই বা শোনা হ'ল কানে,
শুনেছ তো গভীর প্রাণে—গভীর প্রাণে,
ব্যাকুল বাণীর নিঝর যেথা ঝরে ঝরে
ঝরে আমার হৃদয় বেয়ে॥

অরুণ। তোমার মুখর চোখের বাণী অনবদ্য মমতা। তৃষ্ণা মিটে গেল। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তুমি বিজয়িনী হও।

মমতা। তা হ'লে আবার একটা প্রণাম করি।

নেপথ্যে নুটু। বিমলা! বিমলা!

অরুণ। বাবা! (তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল)

মমতা। (প্রস্থান করিতে করিতে) পাওনা রইল, পরে পাবে। [প্রস্থান]

[নুটু ব্যস্তভাবে প্রকাশ করিল, চারিদিকে দৃষ্টি দিয়া খুঁজিয়া]

নুটু। একখানা বই আর নোট-করা কয়েকখানা কাগজ?

[নুটুর ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে অরুণও অনুসরণ করিল। পুনরায় কাগজ ও বই হাতে নুটু এবং তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিল বিমলা]

নুটু। সুশোভনের এজাহারে কোর্টের মধ্যে আমার মাথাটা কাটা গেল বিমলা। একটা মাতাল, অপদার্থ, চোর—আমার মাথাটা ধুলোয় লুটিয়ে দিলে। কুক্ষণে—কুক্ষণে

ওকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম।

বিমলা। ছি! ও-কথা তোমার মুখে সাজে না। বড় বড় গাছ আকাশ ছুঁয়ে থাকে, তাতে ফুল ফোটে, ফল ধরে, কত পাখি আশ্রয় নেয়, আবার কত সাপও এসে বাসা বাঁধে। তাতে কি গাছের মাথা হেঁট হয়? সে চিরদিন আকাশমুখেই বাড়ে। ও-কথা তুমি ব'লো না। কল্যাণী-ঠাকুরঝি শুনলে কি মনে করবে বল তো?

নুট। কল্যাণী! কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ বিমলা, কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

আদালত-সন্নিকটবর্তী শহরে চৌমাথা। খবরের কাগজের হকার হাঁকিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কানে কলম, হাতে কাগজের তাড়া, আদালতের টাউট চলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কোর্টের পিয়নের হাঁক শোনা যাইতেছে—কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ, হাজির হো, মুকুন্দ ঘোষ—কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ। (দুইজন টাউট কথা বলিতেছে)

১ম। ওরে বাপ রে! নুটুবাবু আগুন ছুটিয়ে দিলে! বাবুদের সাজানো খোলস পুড়ে ছাই হয়ে গেল

২য়। রুদুবাবুও ছাড়ে নাই। ওই মাস্টারনীর ভাইকে জেরায় বেশ এক হাত নিয়েছে নুটুবাবুকে। পয়েন্টো ভারি ধরেছিল, বলে—তুমি নুটুবাবুর হবু বেয়াই?

১ম। সে যাই হোক, মাতালই হোক, আর ছ্যাঁচড়াই হোক, আসল মামলায় ওর সাক্ষী খারাপ হয় নি নুটুবাবুর সাহস বটে, দু-তিনটে সাক্ষী খাড়া, সব সাক্ষীকে হস্টাইল ব'লে জেরায় সব ঠিক বার ক'রে নিলে। তুমি দেখো, নুটুবাবু এই মামলাতেই বড় উকিল হয়ে গেল। হিরণপুরের বাবুদের দাঙ্গার মামলা দেবার জন্যে বাবুদের লোক ঘুরছে।

নেপথ্যে কোর্ট-পিয়ন। হেরম্ব পাল -হেরম্ব পাল হাজির হো। হেরম্ব পাল—

২য়। ওরে বাবা, এ যে আমার মক্কেল হে। হেরম্ব, ও হেরম্ব—

(প্রস্থান)

১ম। ও মশায়, ও মশায়, ও হিরণপুরের সরকার মশায়। শুনুন শুনুন।

(প্রস্থান)

(গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ)

দেব। এ যে বিপরীত হয়ে গেল গোপী। সাক্ষীদের একটাও টিকল না। এক-একজনকে এক-এক মুঠো টাকা—সব বরবাদ গেল! বেইমানি করলে সব।

গোপী। আজ্ঞে না। জেরায় টিকল না, বিবেচনা করুন, স্বচক্ষে দেখলেন, জেরায় টিকল

না। নুটু মোক্তার হ'ল অনর্থের মূল। সব হস্টাইল ক'রে জেরা আরম্ভ করলে। আর বিবেচনা করুন, সত্যি জিনিসটাই পাজি জিনিস, বিবেচনা করুন, পারার মতন পাজি জিনিস, কিছুতেই হজম হয় না, ফুটে বেরুবেই।

দেব। এখন উপায় ?

গোপী। হাইকোর্টে আপীল করব, ভাবছেন কেন ? বিবেচনা করুন, বাবারও বাবা আছে।

দেব। এই সব এজাহারের পর হাইকোর্টে কোনও ফল হবে না।

গোপী। ওই কথাটি বলবেন না হুজুর। তবে বলি শুনুন, এই আপনার ১৩১৫ সালে, ইংরাজী ১৯০৮, লাট কমলপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গা, ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, বিবেচনা করুন, আমি বার বার বারণ করলাম, 'যদি পায় রাজ্য দেশ, তবুও না যায় বৃহস্পতির শেষ'—বারণ করলাম, অন্ত থাক। তা সেজোবাবু—

দেব। (বাধা দিয়া) গোপী, তুমি একবার মহাভারতকে দেখ, নুটুবাবুর সঙ্গেও দেখা কর। মামলা মিটমাট কর।

গোপী। মিটমাট করবেন ?

দেব। হ্যাঁ, মিটমাট করব। সাহেব-সুবোর কাছে আমাদের সুনাম একেবারে নষ্ট হবে। ওই মহাভারত যাচ্ছে। তুমি ডাক ওকে। আমি একটু স'রে যাই। ভয় নেই, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। ডাক মহাভারতকে। কথা বল

(প্রস্থান)

গোপী। মহাভারত। মহাভারত। বলি, শোন হে, শোন।

(মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। মিটমাট আমি করব না হে। আর কিছু বলবে তো বল

গোপী। আরে, শোন শোন।

মহা। (গোপীর মুখের কাছে বুড়ো আঙুল নাড়িয়া) খটখট লবডঙ্কা—খটখট লবডঙ্কা। জমি নাই, কাড়বি কি ? ঘর নাই, আগুন লাগাবি কিসে ? খটখট লবডঙ্কা ! আর আমার করবি কি ?

গোপী। জমি ফিরে পাবে, ঘর তৈরি ক'রে দেব। নগদ টাকাও কিছু আদায় ক'রে দেব। (চুপিচুপি) বারো আনা তোমার, সিকি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

মহা। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাকিল) দাদাঠাকুর। ও দাদাঠাকুর।

(নুটু ও তাহার মুহুরীর প্রবেশ)

নুটু। কি মহাভারত ? আরে, আপনি যে মিত্তির মশাই !

গোপী। প্রণাম।

মহা। দাদাঠাকুর, মিত্তির বলছে মিটমাট করতে।

নুটু। মিটমাট।

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবেচনা করুন, মিটমাট।

নুটু। (গোপীর দিকে চাহিয়া) দুটি শর্তে মিটমাট হতে পারে মিত্তির মশাই।

গোপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, দু'শো শর্ত মানতে রাজী আছি। কর্তাবাবু বললেন কি জানেন? বললেন, নুটুবাবু হলেন আমাদের গাঁয়ের গৌরব।

নুট। কর্তাবাবু বয়স্ক লোক, আমার বাপের বয়সী, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।

গোপী। আপনার শর্ত কি বলুন?

নুট। প্রথম শর্ত—এই মিটমাটের কথা, অবশ্য কর্তাবাবুকে বাদ দিয়ে, কাঁধে ঢাক বাজিয়ে শহরে জানাতে হবে। আর, মহাভারতের পোড়া ঘর এখনও ছাওয়ানো হয় নি, সেই চালে উঠে বাবুদের ছাওয়াতে হবে।

গোপী। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, হাইকোর্টের পর সে কথা বিবেচনা করা যাবে। প্রণাম তা হ'লে। (প্রস্থান)

নুট। সুশোভন কোথায় জান মহাভারত?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর আপনার তালে আছে দাদাঠাকুর। আদালত থেকে দু টাকা খোরাকি পেয়েছে, আজ পাকী মদের দোকানে ব'সে গিয়েছে। মদ খাচ্ছে আর তালপাতা নিয়ে কি বুনছে। (মহাভারতের প্রস্থান)

নুট। রাস্কেল।

(কোর্ট-রুমের মধ্যে প্রবেশ করিল)

দৃশ্যান্তর—কোর্ট-রুম

উকিল, আসামী, জজ, দর্শক। আসামীর ডকে কালী বাগদী; নটুবাবু আরগুমেন্ট করিতেছে

নুটু। ইওর অনার, সমস্তই আমি নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করেছি ব'লেই আমার বিশ্বাস কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক অত্যাচারী ধনীর অপরাধে, তারই অন্নপুষ্ট, যে অন্নের প্রভাবে তার বিবেক, তার বুদ্ধি, তার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনই একজন অজ্ঞান দুর্বলের ওপর দণ্ড-বিধান করা ছাড়া ধর্মাধিকরণের আজ গত্যন্তর নেই। বিচারকের অনুমতি নিয়ে আর একবার শেষবারের জন্য আসামীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—কেন সে এ কাজ করলে? মহাভারতের সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা ছিল না—এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। তবু সে যখন এ কাজ করেছে, তখন অন্তরালবর্তী কোন চতুর যন্ত্রীর সুচতুর হাত তাকে এ অন্যায় করতে বাধ্য করেছে। সেই কথা প্রকাশের শেষ সুযোগ আমি হতভাগ্যকে দিতে চাই।

(হাকিম হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন)

(কালীর প্রতি) কালীচরণ, আবার তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি—বল, কার হুকুমে, কেন, তুমি মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়েছ?

কালী। কেন বার বার শুধোচ্ছ মশায়? হ্যাঁ, আমি আগুন দিয়েছি। নিজের খুশিতে আগুন দিয়েছি। বাবুরা আমায় কেন বলবে? কিসের লেগে বলবে? আমি

নিজের খুশিতে আগুন দিয়েছি।

নুট। ইওর অনার, আজ আমার মনে হচ্ছে ভগবানের পুত্র যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার কথা। ভগাবানের পুত্র একবারই মাত্র ক্রুশে বিদ্ধ হন নি, বার বার—নিত্য এই সংসারে ভগবানের পুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন। মানুষ ভগবানের সন্তান, তার মনুষ্যত্ব এই কালী বাগদীর মনুষ্যত্বের মত যেখানেই পিষ্ট হয়, সেইখানেই তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হন। ওই অজ্ঞান আসামীর অন্তরের মধ্যে দাসত্বের ক্রুশে বিদ্ধ মনুষ্যত্বের রক্তাক্ত মূর্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। এর বিচার একজন করবেন। ভগবানের পুত্র মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্রুশে বিদ্ধ করার অপরাধে বিচার করবেন—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্রবিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা, তিনি। তাঁর বিধানে এ অপরাধের দণ্ডও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীসাস ক্রাইস্ট সে কথা আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God। সর্বশেষে বিচারকের কাছে ওই নির্বোধ হতভাগ্য হৃতমনুষ্যত্ব আসামীর জন্যে করুণ প্রার্থনা ক'রে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেন্টলমেন—

জুরী। আমাদের পরামর্শ করবার কোন প্রয়োজন নেই হুজুর, আমরা সকলেই একমত। আসামী দোষী—উই ফাইণ্ড হিম গিলটি।

জজ। I accept your verdict and condemn the accused to five years R.I.। (জজ, জুরী, কর্মচারী প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেল। নুটু কেবল রহিয়া গেল। সুশোভন ও মহাভারতের প্রবেশ। সুশোভনের বগলে বেহালা, হাতে তালপাতার মুকুট)

সুশোভন। লং লিভ নুটুদা। হিয়ার ইজ এ ক্রাউন মেড অব পাম-লীভস।

নুট। জান সুশোভন, আমার যদি তোমার মত ছেলে হ'ত, তবে তার মুখে আমি নিজ হাতে বিষ তুলে দিতাম।

সুশোভন। (চমকিয়া) কেন নুটুদা ?

নুট। কেন, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ সুশোভন। তোমার মরণই মঙ্গল, মরণ না হ'লে তোমার আত্মহত্যা করা উচিত। (প্রস্থান)

সুশোভন। (বসিয়া পড়িল) মহাভারত।

মহা। দাদাঠাকুর।

সুশোভন। নুটুদা ও-কথা বললে কেন ?

মহা। বড় দাদাঠাকুরের কথা ছাড়ান দাও। চল, বাড়ি চল।

সুশোভন। (কাঁধ শ্রাগ করিয়া) মহাভারত, আমার দোষ আমি জানি, আমি অপদার্থ, আমি মাতাল। কিন্তু আমি কারও কোনও ক্ষতি করি না নুটুদা। দু-চার পয়সা, দু-চারটে জিনিসও চুরি করি, কিন্তু তোমার আর কল্যাণীর ছাড়া অন্য কারও নয়—আপন গড, ঈশ্বর জানেন মহাভারত।

[মহাভারত স্তব্ধ হইয়া রইল]

সুশোভন। মহাভারত !

মহা। দাদাঠাকুর !

সুশোভন। বেহালা বাজাব, শুনবে ?

মহা। এই রাস্তার ওপর দুপুরে রোদে ?

সুশোভন। জান মহাভারত, পটাসিয়াম সায়ানাইড ব'লে এক রকম বিষ আছে, সে বিষ জিবে ঠেকাবামাত্র মানুষ ম'রে যায়, কোনও যন্ত্রণা হয় না !

মহা। না না দাদাঠাকুর, ও-কথা তুমি মনে ঠাঁই দিও না। বড় দাদাঠাকুরের রাগ অমনই বটে।

সুশোভন। অনেক সময় ভাবি, এখান থেকে চ'লে যাই। কিন্তু ভয় হয় কি জান ? মরবার সময় বড় কষ্ট পাব। এখানে মরবার সময় কল্যাণী সেবা করবে, কাঁদবে : তুমি কাঁদবে, মমতা কাঁদবে, অরুণ কাঁদবে, বউদিও কাঁদবে মহাভারত—সবচেয়ে বেশি কাঁদবে বউদি, তাতে আমি ম'রেও সুখ পাব।

মহা। দাদাঠাকুর! আজ থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে দাদাঠাকুর। বড় দাদাঠাকুর রাগ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমি চুকিয়ে দেব।

সুশোভন। (উঠিয়া) "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে—তুমি অভাগারে চেয়েছ।" কবি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্টুবাবুর অট্টালিকার ড্রইং-রুম

নন্টুবাবু এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াছে। পূর্বোক্ত ঘটনার চার-পাঁচ বৎসর পর। ইতিমধ্যেই সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে। ড্রইং-রুমে মূল্যবান আধুনিক আসবাব, দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েল-পেন্টিং—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু। প্রাচীন জিনিসের মধ্যে সেই সূচীশিল্প—'ইট ইজ ইজিয়ার ফর এ ক্যামেল"খানি রহিয়াছে—

(অরুণ ও শ্যামা বসিয়া আছে, মমতা গান গাহিতেছে—)

এই তো ভাল এই তো ভাল,
সে তারার পানে তরণী বাই তীরের মায়া সেই ঘুচাল॥
উথলে জল তুফান হাঁকে
তবুও মিছে পিছনে ডাকে,
সকল মন-হরণ-করা জানে যে শুধু একটি আলো॥
শ্যামল কোন সাগরদ্বীপে যদি না ভিড়ে তরী,

স্বপন নীড় রচার সাধ বিফলে যায় ঝরি,
অজানা পথে তিমির-রাতে
হাতটি শুধু রাখিও হাতে,
ঘরের দীপ হ'ল না জ্বালা ঝড়ের মেঘে বিজলী জ্বালো॥

মমতা। এইবার আমায় ছুটি দাও। কঙ্কণায় পাঠিয়ে দাও। নইলে মা হয়তো চ'লে আসবেন।

শ্যামা। ভালই হবে। একবার তাঁর পায়ের ধূলো পড়বে। বাবা এখন বড়লোক হয়েছেন বলে পিসীমা আর আসতেই চান না। না, এ-বেলা তোমার যাওয়া হবে না, ও-বেলা দাদা তোমাকে গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসবে। চল না দাদা। আমিও যাব।

অরুণ। পৌঁছে দিয়ে আসতে রাজী আছি, কিন্তু গাড়ি ক'রে নয়—পায়ে হেঁটে।

শ্যামা। তাই হবে কমরেড মুখার্জি। তোমাদের জ্বালায় অস্থির বাবা। তুমি আজ জেলে যাচ্ছ, কাল বেরুচ্ছ, আবার পরশু যাচ্ছ জেলে। বরুণবাবু তো আজ দু বছর ডিটেনশনে। বাবা মামলা আর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। মা আপনার মনেই আছে। আমারই হয়েছে বিপদ। একা থাকি কি ক'রে বল তো? দয়া ক'রে বিয়ে করবার অবসর ক'রে মমতাকে এনে দিয়ে যা খুশি কর, কিছু বলব না।

অরুণ। তার চেয়ে ভাল একটি সঙ্গী দেখে তার ঘরে তোকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় বল দেখি, মমতা, কি বল? বেটার সাজেশন না? চমৎকার হয় না?

মমতা। নিশ্চয়, চমৎকার হয়।

শ্যামা। চমৎকার হয়! মেয়েরা কক্ষনো পুরুষের সমান হতে পারবে না—এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। হাজার অনিচ্ছে সত্ত্বেও পুরুষের কথায় ডিটো মারতেই হবে। চমৎকার হয়। এদিকে মেয়ের মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মমতা। ঠিক কথা ভাই শ্যামা। এ দেশের মেয়েদের কিছু হবে না। অনিচ্ছে সত্ত্বেও ফ্যাকাশে মুখে আমরা ডিটো মারি, আবার ইচ্ছে বুক তোলপাড় করলেও লজ্জায় মুখ লাল ক'রে আমরা ডিটো দিতে পারি না। আমাদের দেশের মেয়েদের কিচ্ছু হবে না।

শ্যামা। দাঁড়াও না, এক্ষুনি গিয়ে আমি মাকে ধরছি, দাদার বিয়ে দেবে কি না? আজই একটা হেস্তনেস্ত করব। মা! মা! (প্রস্থান)

অরুণ। মমতা!

মমতা। বল।

অরুণ। সত্যিই মমতা, একটা হেস্তনেস্ত না কি ব'লে গেল শ্যামা, করার এইবার প্রয়োজন হয়েছে। তোমার মাও দেখলাম ব্যস্ত হয়েছেন কিন্তু কয়েকটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে আমার।

মমতা। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আজও আছে তোমার?

অরুণ। আমার ব্রত তুমি জান!

মমতা। সে ব্রতের ভাগ কি আমি গ্রহণ করি নি?

অরুণ। যদি আমায় দীর্ঘকাল বন্দী-জীবন যাপন করতে হয়, মমতা?

মমতা। বাইরে থেকে তোমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব আমি।

(বাহিরে মোটরের হর্নের শব্দ)

অরুণ। বাবা এলেন। এস, আমরা ভেতরে যাই। (মমতা ও অরুণের প্রস্থান)

(একজন চাকর কতকগুলি জিনিসপত্র, অ্যাটাচি কেস, ফুলের মালা লইয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার পর প্রবেশ করিল নুটু। নুটু এখন প্রৌঢ়। পরনে দামী খদ্দরের কাপড় জামা চাদর। আসিয়া চেয়ারের উপর বসিল। চাকর চাদর ছড়ি লইল। পায়ের জুতা লইয়া স্লিপার দিল)

নুট। দীজ মীটিংস, উঃ আই অ্যাম টায়ার্ড। খবরের কাগজটা কই রে?

(চাকর খবরের কাগজ দিয়া বাহির হইয়া গেল; নুটু কাগজ পড়িতে লাগিল। চাকর পুনরায় প্রবেশ করিয়া একখানি কার্ড দিল; নুটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল)

নুট। কোথায়? কোথায় তিনি?

চাকর। আজ্ঞে, বাইরে চেয়ারে বসতে দিয়েছি।

নুট। আঃ, ইডিয়ট কোথাকার!

[ব্যস্তভাবে বাহিরে গেল, চাকরও গেল, পুনরায় নুটু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল]

আসুন আসুন। কাশী থেকে কবে ফিরলেন? এই বসুন।

[নিজে দামী আসন আগাইয়া দিল]

বৃদ্ধ। ফিরেছি. আজ চার-পাঁচ দিন হ'ল। শুনলাম সব। ভারি আনন্দের কথা। তুমি এতবড় বাড়ি করেছ, আসেম্‌ব্লির মেম্বার হয়েছ, তোমার ছেলে এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। ভাবলাম, বেটার লেট দ্যান নেভার, যাই, একবার নুটুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এখন বল, কি জানাব—অভিনন্দন, না, আশীর্বাদ?

নুট। (প্রণাম করিয়া) সমস্ত আপনাদের আশীর্বাদ।

বৃদ্ধ। বার্‌ থেকে যখন তোমাকে সাপোর্ট ক'রে আপীলটা আমার সইয়ের জন্যে পাঠালে, তখন প্রথমটা একটু আশ্চর্য হলাম। নুটু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? কংগ্রেস নুটুকে নমিনেশন দিলে না? যাক, বার্‌-লাইব্রেরির এককালে প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তুমি হ'লে বর্তমান প্রেসিডেন্ট, আমি সঙ্গে সঙ্গেই সই করে পাঠিয়ে দিলাম।

নুট। আপনার নামে অনেক কাজ হয়েছে। আপনার নাম—

বৃদ্ধ। না না। বড় উকিল ব'লে পসার ছিল, তাকে কি আর নাম বলে? তুমি কর্মী, কীর্তিমান পুরুষসিংহ; তোমার নিজের গুণেই কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেটকে হারানো সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কেন? কংগ্রেস তোমাকে নমিনেশন দিলে

না কেন?

নুট। পার্টি-পলিটিক্স্ তো জানেন। পার্টি-পলিটিক্স আর কি! আমি যথাসর্ব্বস্ব কংগ্রেসের প্রয়োজনে ঢালতে পারছি না, এবারকার সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স্ মুভ্মেন্টে আমি জেলে যাই নি—এই আমার অপরাধ।

বৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে নুটু, মডার্ণ পলিটিক্সের এই সব আন্দোলন আমি বেশ বুঝতে পারি না বাপু। জেলেই যদি সবাই যাবে, তবে কাজ করবে কে?

নুট। (হাসিয়া) জানেন, থার্টির মুভ্মেন্টের সময় আমার ছেলেকে আমি সেই কথা বলেছিলাম—বলেছিলাম, দেশের অন্নবস্ত্রের আগে সংস্থান কর। জেলে যাওয়ার চেয়ে সেটা বড় কাজ। মুখে সে প্রতিবাদ করলে না, কিন্তু সেই দিনই বিকেলে অ্যারেস্টেড হ'ল। থার্টি থার্টিওয়ান—দু বছর মাটি ক'রে এবার সে একজামিন দিলে। আমার ছোট ছেলে আরও প্রগতিশীল, সে এখনও দেউলীতে। আমার বড় ছেলে ইলেক্শনের সময় কলকাতায় গিয়ে ব'সে রইল, পাছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার জন্যে তাকে কাজ করতে হয়!

বৃদ্ধ। ছেলের বিয়ে দাও হে, ছেলের বিয়ে দাও। সব সেরে যাবে। ওসব হ'ল এক ধরনের হিস্টিরিয়া।

নুট। বিয়ে তো হয়েই যেত এতদিন, কিন্তু জেলে তো আর ছাঁদনাতলা পাতা হয় না! এইবার বিয়ে দেব। কিন্তু ছেলে বলে কি জানেন—উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করব না।

বৃদ্ধ। ভাল কথা নুটু, তুমি কি ছেলের বিয়ের কোথাও ঠিক করেছ?

নুট। হ্যাঁ (ইতস্তত করিয়া) মানে—অনেকদিন আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী, আমিও অবশ্য—

বৃদ্ধ। দেখ, কয়েকদিন আগে আমার বাড়ির সামনেই নর্দমার ধারে একটা মাতাল প'ড়ে ছিল, লোকে বললে—নুটুবাবুর বেয়াই। আজ ও 'র দেখলাম, সে একটা ইতর জাতের মাতালের সঙ্গে মাতলামো করছে। আজও লোকে বললে—নুটুবাবুর বেয়াই। একটি দরিদ্র বিধবা এসেছিল আমাদের বাড়ি, হাতে-তৈরী জামা টেবিল-ক্লথ বিক্রি করতে। মেয়েরা বললে—তোমার বেয়ান। প্রতিশ্রুতি কি তোমার এদের কাছে?

নুট। (মাথা হেঁট করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল) আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমার এদের কাছেই। এ আমার হয়েছে নীলকণ্ঠের বিষ।

বৃদ্ধ। এ বিষ উদরস্থ হ'লে কিন্তু মারাত্মক হবে নুটু। না না, তুমি এ কাজ ক'রো না। কঙ্কণার ন্যায়রত্নের বংশ তোমরা, তুমি নিজে কীর্তিমান হয়েছ ওই বংশের পবিত্রতায়। এ কাজ তুমি ক'রো না।

[মহাভারতের প্রবেশ—ভঙ্গী তাহার সঙ্কুচিত; পূর্বের মত স্বচ্ছন্দ নয়]

নুট। কি মহাভারত?

[মহাভারত প্রণাম করিল]

মহা। আজ্ঞে, দিদিঠাকরুন এলেন, সঙ্গে এলাম। তাই বলি, আপনাকে পেনাম।

নুট। কল্যাণী এসেছে?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। এটি তোমার সেই চাষী বীর নয়, যাকে নিয়ে তোমার কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কীর্তির কন্‌গ্রাচুলেশনই তোমাকে দেওয়া হয় নি। ওইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কীর্তি হে। কঙ্কণার বাবুদের মত অত্যাচারী বাবুদের তুমি জব্দ কর নি, সংশোধন করেছ। কঙ্কণায় আমি গিয়েছিলাম, আমার পুরনো মক্কেল তো, ওঁদের এলাকায় জমি-জেরাত আমার আছে। দেখলাম, সে আমলই আর নেই, ধারা-ধরন সব পালটে গেছে। কর্তাবাবু বললেন—এসব নুটু উকিলের শিক্ষা রাজেনবাবু। ব'লে হা-হা ক'রে হাসলেন। স্বীকার করলেন, আগে যা করতেন, সেসব অন্যায়। তোমার অ্যাসেম্ব্লি-ইলেক্‌শনে ওঁরা তো তোমাকেই সাপোর্ট করেছিলেন শুনলাম। বড়বাবু বললেন—নুটুর ওপর রাগ তো নেই-ই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কত বড় লোক নুটু, আমাদের গ্রামের গৌরব, তাকে আমরা সাপোর্ট করব না?

মহা। আমি বাইরে যাই দাদাঠাকুর। (সসম্ভ্রমে প্রস্থান)

নুট। (মহাভারতের যাওয়াটা গ্রাহ্যই করিল না) হ্যাঁ, ওঁরা আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছেন। অল্পবয়সে মানুষ এক দিকই দেখে, দু দিক দেখতে চায় না। দিনে আলোকে ভাবে একমাত্র সত্যি, আলোই থাকবে চিরকাল; আবার রাত্রে অন্ধকারকেও ভাবে তাই। দোষগুণ নিয়ে মানুষ, কঙ্কণার বাবুদের দোষটাই সে বয়সে আমার চোখে পড়েছিল, দোষ ছাড়া কিছু দেখতে পাই নি; কিন্তু আজ দেখছি, গুণও যথেষ্ট আছে ওঁদের।

বৃদ্ধ। কর্তাবাবু রসিক লোক তো, বললেন—যাব একদিন নুটুবাবুর ওখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তা বললেন—নুটু শুনেছি মস্ত উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকে ডাক আসে, আমি একবার তার সঙ্গে সওয়াল জবাব করতে যাব রাজেনবাবু। নিজের নাতিকে—দেবনারায়ণবাবুর ছেলেকে দেখালেন, ছেলেটি এবার বি. এ. পাস করেছে। ভাল ছেলে। বললেন—একেও আমি উকিল করব। তা তোমার ছেলেটি কই—আমাদের দেশের ভাবী উজ্জ্বল নক্ষত্র?

নুট। অরুণ!

(প্রবেশ করিল শ্যামা)

শ্যামা। দাদা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

বৃদ্ধ। এটি তোমার মেয়ে?

নুট। প্রণাম কর শ্যামা। (শ্যামা প্রণাম করিল)

বৃদ্ধ। রাজরাণী হও ভাই। বাঃ, চমৎকার মেয়ে! মেয়ের বিয়ের ঠিক কিছু করলে? এইবার বিয়ে দাও।

(শ্যামা ভিতরে চলিয়া গেল)

নুটু। পাত্র খুঁজছি, কিন্তু মনের মত যে পাচ্ছি না। বর পাচ্ছি তো ঘর পাচ্ছি না, ঘর মিলছে তো বর মনের মতো হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। এক কাজ কর না! দেবনারায়ণের ছেলেটিকে দেখ না! ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগল হে।

(নুটু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল)

আজ উঠলাম নুটু। তোমার ছেলেকে একদিন পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আলাপ করব।

নেপথ্যে সুশোভন। (জড়িতকণ্ঠে) "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"!

বৃদ্ধ। ওই সেই লোকটি না?

নুটু। (গম্ভীরভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। না নুটু, তুমি এ কাজ ক'রো না। না না না। তোমার মত লোকের—ছি ছি ছি।

(নুটু চুপ করিয়া রহিল। প্রবেশ করিল সুশোভন)

আচ্ছা, আজ আমি আসি। (প্রস্থান)

(নুটু তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল; ক্রুদ্ধ গম্ভীর তাহার মূর্তি)

নুটু। দারোয়ান!

সুশোভন। (অত্যন্ত বিমর্ষভাবে) আমার মুখ দিয়ে আজ রক্ত উঠল নুটুদা। আমায় দশটা টাকা দেবেন? ডক্টর সেন আট টাকার কমে দেখেন না।

(দারোয়ানের প্রবেশ, অভিবাদন করিল)

নুটু। ইস্‌কো নিকাল দো বাড়িসে।

দারোয়ান। (বিস্মিত হইল) হুজুর!

নুটু। নিকাল দো ইস্‌কো। (সুশোভনকে আঙুল দিয়া দেখাইল)

সুশোভন। আমাকে নিকাল দেবে নুটুদা?

নুটু। (দারোয়ানকে) খাড়া হোকে কেয়া দেখতা তুম।

সুশোভন। আমি যাচ্ছি নুটুদা। আই হ্যাভ নো ডিজায়ার টু লিভ, রোগের যন্ত্রণা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্টিল আই ওয়ান্টেড টু লিভ ফর কল্যাণী—সে বড় আঘাত পাবে, দ্যাট ইজ দি রিজ্‌ন আই কেম অ্যাবেগিং। আমি যাচ্ছি। "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। (প্রস্থান)

নুটু। আওর বাড়িমে ঘুস্‌নে মৎ দো। নেহি তো তুমারা নোক্‌রি চলা যায়গা। যাও।

(দারোয়ানের প্রস্থান)

(মুহুরীর ফাইল লইয়া প্রবেশ)

এখন নয়, পরে। যাও এখন

(ফাইল রাখিয়া মুহুরীর প্রস্থান)

শ্যামা!

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাবা!

নুট। মহাভারত বললে, কল্যাণী এসেছে—

শ্যামা। হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

নুট। পাঠিয়ে দাও এখানে।

(শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল)

এক্ষুনি, বলবে, আমি অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এক্ষুনি।

(শ্যামার প্রস্থান)

(নুট দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করিতে লাগিল)

(কল্যাণীর প্রবেশ)

নুট। (স্থির হইয়া দাঁড়াইল) কল্যাণী! আমি সুশোভনকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছি। আর কোনদিন আমার বাড়ি ঢুকতে তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি।

কল্যাণী। (মাথা হেঁট করিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল) আপনি, দাদা, শাসন আপনি করবেন বইকি নুটুদা।

নুট। না, শাসন নয়। তার সঙ্গে কোনও আত্মীয়তা আমার নেই, হতে পারে না। তোমাকেও ওকে ত্যাগ করতে হবে কল্যাণী।

কল্যাণী। (শিহরিয়া) নুটুদা! ছোড়দার মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে রক্ত ওঠে। উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

নুট। তার মরবার জায়গার অভাব হবে না কল্যাণী। হাসপাতাল আছে, গাছতলা আছে, পথ আছে—

কল্যাণী। আপনি কি বলছেন নুটুদা?

নুট। সত্য চিরদিন নিষ্করুণ কঠোর। জ্ঞানহীন শিশু আগুনের শিখায় হাত দিলে জ্ঞানহীন ব'লে আগুন তাকে ক্ষমা করে না। বিধাতার বিচার আগুনের মতই দীপ্ত, পবিত্র, অথচ নিষ্ঠুর। সে বিচারের দণ্ড থেকে অপরাধীকে রক্ষা করতে গেলে তার আঁচ তোমাকেও লাগবে। আরও একটা কথা—তোমাকেও কত গুলো জিনিস ছাড়তে হবে।

কল্যাণী। (স্থিরভাবে নুটুর দিকে তাকাইয়া তারপর ধীর-স্বরে বলিল) বলুন।

নুট। দারিদ্র্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে দারিদ্র্য মর্যাদাহীন নয়, সে দারিদ্র্য মহত্ত্বহীন নয়, তাতে মালিন্য নেই।

কল্যাণী। সেই দীক্ষাই তো আপনার কাছে—

নুট। আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিতে পার নি। কল্যাণী তুমি জামা তৈরি ক'রে বিক্রি করতে যাও ভদ্রলোকের বাড়ি, তারা তোমাকে করুণা ক'রে জিনিসের দাম বেশি দেয়, দয়া করে। সেটা বিনিময় নয়, দান। তোমার বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখ—মালিন্যের ছাপ। ওসব তোমায় ত্যাগ করতে হবে।

কল্যাণী। আর কিছু আমায় বলবেন দাদা?

নুট। তোমার উত্তর শুনতে চাই বোন।

কল্যাণী। না।

নুটু। সময় চাচ্ছ? উত্তর এখন দিতে পারবে না?

কল্যাণী। না। আমার উত্তরই দিচ্ছি—না। আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করি না। দয়া আমি কারও কাছে নিই না। আমার দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার। আর ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই। তা ছাড়া নুটুদা, আপনি যখন তাকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে পারছেন না, তখন মমতার বাপকেইবা 'আত্মীয়' বলে স্বীকার করবেন কি ক'রে? মমতা তো তার বাপকে অস্বীকার করতে পারবে না নুটুদা।

নুটু। (কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি সকল সংস্রব ত্যাগ করলাম। ভবিষ্যতেও—

কল্যাণী। মমতাকে, ছোড়দাকে নিয়ে আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

নুটু। অপেক্ষা কর।

(কল্যাণী দাঁড়াইল, নুটু আলমারি খুলিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীকে দিল) মমতার গহনা—আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে। আর একটা কথা।

কল্যাণী। বলুন!

নুটু। সম্বন্ধ ছাড়বার আগে যদি মমতার মামা হিসাবে তার বিবাহে কিছু যৌতুক দিই, সে কি তুমি নেবে না?

কল্যাণী। (একটু ভাবিয়া) মাথা পেতে নেব নুটুদা।

[নুটু চেক-বই বাহির করিয়া একটা চেক লিখিল]

নুটু। এই নাও। মমতার বিয়েতে যৌতুক দিও।

কল্যাণী। (চেক মাথায় ঠেকাইয়া) শ্যামা-অরুণের আমি পিসীমা। তাদের বিয়েতে আমাকেও কিছু দিতে হয় দাদা। গরিব বোন ব'লে ফিরিয়ে দেবেন না। (প্রণাম করিয়া চেকখানি নুটুর পায়ে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নুটু চেকখানি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়া ফেলিল। চেয়ারে বসিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

(তারপর সিগার ধরাইল)

(মুহুরীর প্রবেশ)

মুহুরী। যে মকদ্দমাটায় আমরা হেরেছি, সেইটের রায়।(রায়ের কাগজ নামাইয়া দিল)

হাইকোর্টে আপীল করবে পার্টি! তাই বলে, পয়েন্টগুলো একবার দেখে—

(নুটু পড়িতে আরম্ভ করিল। মুহুরীর প্রস্থান)

নুটু। (পড়িতে পড়িতে উত্তেজিত ভাবে) অ্যান ইডিয়ট! গর্দভ বিচারকের আসনে বসলে চিৎকারের মূল্য থাকে—যুক্তি হয় মূল্যহীন। (রায়খানা সক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল) 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার'।

(উঠিয়া পদচারণা আরম্ভ করিল। বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিল)

(মুহুরীর পুনঃপ্রবেশ)

মুহুরী। (ব্যস্তভাবে) বাবু, কঙ্কণার বাবুরা—কর্তাবাবু, দেবনারায়ণবাবু এসেছেন।

নুট। (চকিত হইয়া উঠিল) কে? কঙ্কণার বড়বাবু?

(ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। মুহুরী রায়খানা কুড়াইয়া ফাইল সমেত গুছাইয়া লইল। নুটু, শিবনারায়ণ ও দেবনারায়ণের প্রবেশ।

মুহুরীর প্রস্থান)

নুট। আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ। (বড়বাবুকে প্রণাম করিল, দেবনারায়ণকে নমস্কার করিল) বসুন।

শিব। সে তো তুমি না বলতেই এসেছি হে। এখন তাড়িয়ে দেবে কি না বল?

নুট। (পুনরায় প্রণাম করিয়া) তা বলতে পারেন। আপনাদের কাছে আমার অনেক অপরাধ। তবে আমি অমানুষ নই।

শিব। এক শো বার—হাজার বার। শুধু মানুষ নয় হে, তুমি একটা মরদ। মরদ-পুরুষ সংসারে বড় দুর্লভ হে। তুমি একটা মরদ।

দেব। অপরাধ আপনার নয় নুটুবাবু, দোষ আমাদেরও অনেক ছিল।

শিব। (চারদিক দেখিয়া) তাই তো হে নুটু, এ যে তুমি ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! বা—বা—বা! বলিহারি—বলিহারি! 'হুঁ, তুমি-মরদ বটে।

নুট। এখন বসুন।

শিব। শোন হে নুটু, কি জন্যে এসেছি শোন। তোমার সঙ্গে সওয়াল করতে এসেছি। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে সেরা উকিল। এ-জেলা ও-জেলা ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে সওয়াল করব।

নুট। (হাসিয়া) বেশ, বসুন।

শিব। ধর, তোমার বাড়িতে ভিখিরী এসেছে। তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই না দাও তাকে?

নুট। এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা। আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন—এ যে বলির দ্বারে বামনদেবের ভিক্ষে চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

শিব। হুঁ। উপমাটা তুমি বড় ভাল দিয়েছ নুটু। তবে দেখ, বিবেচনা ক'রে দেখ, পাতালে থাকতে যদি ভয় হয় তো ভেবে দেখ। (হা-হা করিয়া হাসিলেন)

নুট। বসুন আগে।

শিব। উঁহু, আগে তুমি দেবে বল; তবেই বসি, নইলে যাই।

নুট। বেশ, মাথাই পাতলাম আপনার পায়ে। এইবার বসুন। বসুন দেবনারায়ণবাবু, বসুন।

শিব। ওকে বলতে হবে না; ওর বাবা বসবে—ও তো ছেলেমানুষ। ঠিক বসবে ও।

(উভয়ে বসিলেন)

নুট। এইবার অনুমতি করুন।

শিব। (বসিয়া) তোমার বড় ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে ; আমার নাতনীকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে—দেবনারায়ণের মেয়ে।

দেব। (নুটুর হাত চাপিয়া ধরিল) আমাকে কন্যাদায় থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

শিব। তোমার ছেলে খুব ভাল, বি. এ.-তে এম. এ.-তে ফার্স্টো হয়েছে। তুমি নিজে একটা মরদ, দেশবিদেশে নামডাক! টাকাও করেছ অঢেল। কিন্তু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে মানে তোমার বাড়ির অযুগ্যি হবে না। আর নাতনীর আমার ভারি লক্ষণ ভাল হে। রূপের কথা আর বলব না, তুমি নিজেই দেখবে ; আমি তো নুটু, ম'জে আছি নাতনীর রূপে। দেবুর যে আমায় জামাই পছন্দ হ'ল না, নইলে—(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

দেব। নুটুবাবু।

নুট। (হাসিয়া) ছাড়ুন, কর্তাকে আগে প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) ভিক্ষে আমি দিচ্ছি ; কিন্তু ভিক্ষে তো শুধু দিতে নেই কর্তা, সে তো আপনাকে বলতে হবে না। দক্ষিণে সমেত ভিক্ষে দেব আমি। 'না' বললে শুনব না। আমার কন্যাও বিবাহযোগ্যা, সেইটিকে দক্ষিণে স্বরূপ আপনাদের নিতে হবে—দেবনা'বুর বড় ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

শিব। বলিহারি। বলিহারি। বলিহারি। এই না হ'লে উকিল। ওরে বাপ রে। উল্টো ছাঁদে গেরো। ও দেবু, নুটু যে হারিয়ে দিলে রে। (হা-হা করিয়া হাসিলেন) আচ্ছা, তাই হ'ল।

নুট। ছেলেমেয়েকে আমি ডাকি।

শিব। না, আজ থাক। দেখাশুনো দিন দেখে। আজ নয়। আচ্ছা আজ তা হ'লে উঠলাম।

নুট। সে কি। একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতেই হবে।

শিব। আজ নয় বাবা। আগে তুমি যাবে কঙ্কণার বাড়ি, আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দেবে, তবে। আজ ব'লো না। সে আমার প্রতিজ্ঞা আছে নুটু, উঁহু সে হবে না।

নুট। (হাসিল) বেশ, আজ বিকেলেই যাব আমি।

(শিবনারায়ণ দেবনারায়ণ অগ্রসর হইল, নুটু অনুসরণ করিল। নুটু ফিরিল)

নুট। বিমলা। বিমলা।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। মা কঙ্কণায় গেছেন।

নুট। কঙ্কণায়? এ কি, তুই যেন কাঁদছিস মনে হচ্ছে শ্যামা।

শ্যামা। না বাবা, না। (প্রস্থান)

নুট। শ্যামা। (অনুসরণোদ্যত)

(মহাভারতের প্রবেশ)

মহা। দাদাঠাকুর !

নুট। এস মহাভারত। বাবুরা আজ কি জন্যে এসেছিলেন জান ? দেববাবুর মেয়ের সঙ্গে—

(মহাভারত প্রণাম করিল)

মহা। আমি চললাম দাদাঠাকুর।

নুট। না। ও-বেলায় আমার সঙ্গে যাবে। আমি ও-বেলা বাবুদের ওখানে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মহা। না।

নুট। তুমি অরুণের খুড়ো, দেবনারায়ণবাবু তোমাকে বেয়াইয়ের মত সম্মান করবেন।

মহা। সম্মান। জুতোর ছাপটা যে বুকের ভেতর এখনও আঁকা আছে দাদাঠাকুর। সম্মানে আমার কাজ নাই। দিদিঠাকরুন কাশী যাচ্ছে, আমিও তেনার সাথে কাশী যাচ্ছি। আর কটা দিন বলেন ? ই কটা দিনের তরে বাবুদের বেয়াই হতে লারব। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপুনি শেষটা এই করলেন দাদাঠাকুর ? (প্রস্থান)

নুট। (দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) মহাভারত ! মহাভারত ! (অগ্রসর হইল, দরজার মুখেই অরুণ প্রবেশ করিল, নুটু থমকিয়া দাঁড়াইল)

অরুণ। সে চ'লে গেল।

নুট। ডাক তো তাকে।

অরুণ। সে ফিরবে না বাবা।

নুট। (হাসিয়া) সে আমার ওপর রাগ করেছে। একজন লোক পাঠাতে হবে ওর বাড়িতে। যাক, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে।

অরুণ। আপনার কাছে আমারও কিছু বলবার আছে বাবা।

নুট। (তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অরুণের আপাদমস্তক দেখিয়া) অরুণ !

অরুণ। বলুন।

নুট। আমার মনে হচ্ছে, আমার বক্তব্যের সঙ্গে তোমার বক্তব্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। নয় কি ? [অরুণ চুপ করিয়া রহিল] বল, কি বলবে বল ? তোমার বক্তব্যই আগে শুনব আমি।

অরুণ। আপনি কি কল্যাণী-পিসীমাকে—

নুট। কল্যাণীর সঙ্গে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছি।

অরুণ। ত্যাগ করেছেন ?

নুট। তুমি কি আমার কাছে তার জন্যে কৈফিয়ত চাও ?

অরুণ। না। ও-কথা আর জিজ্ঞাসা করব না। আমার আর একটা কথা জানবার আছে। আপনি কি কঙ্কণার গাঙুলীদের বাড়িতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন ?

নুট। লজ্জাহীনতা কি মডার্নিজমের প্রধান ধর্ম অরুণ ?

অরুণ। জীবনের অতি গুরুতর সমস্যায় আপনার মত ব্যক্ত করা লজ্জাহীনতা বাবা? সে হ'লে আপনার কথা সত্য, আমি স্বীকার করছি।

নুট। ভাল, এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অরুণ।

অরুণ। বলুন।

নুট। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইন্‌ডিভিজুয়াল হিসেবে তোমার অধিকার আমার চেয়ে কম নয়। তোমার সে অধিকার আমি স্বীকার ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার ঘর—আমার গ'ড়ে তোলা সাম্রাজ্য, সেখানে আমি সম্রাট।

অরুণ। দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যদি আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার অধিকার থাকে, সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি বিদ্রোহ করবার অধিকার আপনার থাকে, তবে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে—

নুট। তুমি বিদ্রোহ করবে অরুণ? তুমি আমাকে অমান্য করবে?

অরুণ। গাঙুলীদের বাড়িতে আমি বিয়ে করতে পারব না—এই কথাটা আপনার পায়ে ধ'রে জানাতে এসেছি বাবা।

নুট। (সরিয়ে গিয়া) থাক্, আমার পা তুমি স্পর্শ ক'রো না।

[অরুণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল]

তোমার বক্তব্যের বোধ করি আরও কিছুটা বাকি আছে। সেটা বোধ করি এই যে, মমতাকেই তুমি বিবাহ করতে চাও?

[অরুণ নীরব হইয়া রহিল]

[নুটু আপন মনেই আবৃত্তি করিল]

I tax not you, you elements, with unkindness,
I never gave you kingdom, called you children;
You owe me no subscription : then let fall
Your horrible pleasure; here I stand, your slave—

অরুণ, আজ কিং লিয়ারকে আমার মনে পড়ছে। অবশ্য কিং লিয়ারের মত সর্বস্বান্ত ইমোশনাল নই আমি। (অরুণের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) তুমি বিদ্রোহ করতে চাও অরুণ?

অরুণ। (নতজানু হইয়া আবেগভরে) আপনার কাছে আমি মিনতি করছি। আজ আপনার গৌরবে আমি যে বিশাল সৌধ গ'ড়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সে সৌধ আপনি ভেঙে দেবেন না। আপনার আদর্শ—

নুট। ইউ মীন টু সে, কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে তোমার বিয়ে দিলে আমি আদর্শচ্যুত হব?

অরুণ। কল্যাণী-পিসিমাকে, সুশোভনবাবুকে, মমতাকে পরিত্যাগ করলে আপনি আদর্শচ্যুত হবেন, সে কি আপনি বুঝতে পারছেন না?

নুট। আমার আদর্শবোধে তোমার সন্দেহ জেগেছে, অরুণ? এত বড় ইম্পার্টিনেন্স্ তোমার? এত বড় স্পর্ধা? গেট আপ, উঠে দাঁড়াও। [অরুণ উঠিল] এত

বড় স্পর্ধা তোমার ? [অরুণ নীরব] উত্তর দাও। এত বড় স্পর্ধা তোমার ?

অরুণ। না, স্পর্ধা আমার নয়, স্পর্ধা আমার আদর্শের, যে আদর্শে আপনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। স্পর্ধা আমার শিক্ষার, যে শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন আপনি।

নুট। সে শিক্ষার আরও কিছু বাকি আছে। শোন। অবাধ্য সন্তান আর দুষ্ট অঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। দুষ্ট অঙ্গের মতই তাকে পরিত্যাগ করতে হয়। (অরুণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল) তুমি জান অরুণ, কত বড় আঘাত তুমি আমায় দিয়ে যাচ্ছ ? (অরুণ একবার দাঁড়াইল। তারপর চলিয়া গেল। পর-মুহূর্তেই সে ফিরিয়া আসিল)

অরুণ। ওইটে আমি নিয়ে যাব। কার্পেটের ওপর লিখেছিলাম আমি, বুনেছিলেন মা। ওটা আমি নিয়ে যাব।

("It is easier for a camel" লেখা সূচীশিল্পের দিকে অরুণ অগ্রসর হইল)

নুট। (সক্রোধে) অরুণ !

অরুণ। না, ওটা আর এখানে থাকবে না, থাকতে পারে না, ওটা রাখবার আপনার অধিকার নেই।

নুট। অরুণ !

অরুণ। আপনি আজ ধনী, দারিদ্র্যকে আজ আপনি ঘৃণা করেন, মিথ্যা মর্যাদার মোহে মানুষকে আপনি আত্মীয় স্বীকার করতে লজ্জা পান। বীর্যে সাহসে গৌরবান্বিত অতীতকে স্বীকার করতে আপনার আজ সঙ্কোচ হয়। আপনার কাছে থাকবে না। এ আমি নিয়ে যাব।

নুট। ওটা তোমার মায়ের হাতের কাজ অরুণ, ওটা তুমি রেখে যাও। তোমার মা আমাকে পরিত্যাগ করেন নি।

অরুণ। আমার আগেই আমার মা চ'লে গেছেন।

নুট। চ'লে গেছেন ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চ'লে গেছেন।

[অরুণ চলিয়া গেল]

নুট। রেখে যাও। ওটা রেখে যাও। অরুণ, ওটা রেখে যাও। (থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) বিমলা ! অরুণ ! মহাভারত ! (দরজা সন্ধান করিতে করিতে) দরজা—দরজা—দরজা কই, দরজা ? গেট অফ হেভেন্‌স কি বন্ধ হয়ে গেল ? স্বর্গদ্বার কি রুদ্ধ হয়ে গেল ? বিমলা ! বিমলা !

[কাঁপিতে কাঁপিতে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া সোফায় পড়িয়া গেল]

[শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা। বাবা ! বাবা ! বাবা ! এ কি ! দাদা—দাদা !

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষান্তর

(অরুণ চলিয়া যাইতেছে, শ্যামা প্রবেশ করিল)

শ্যামা। ফেরো দাদা, ফেরো। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অরুণ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন ?

শ্যামা। হ্যাঁ, শিগগির ডাক্তার ডাক—শিগগির !

অরুণ। এইটে—এইটে—শ্যামা, এইটে নিয়ে যা। আমি পাশের বাড়ির ডাক্তারকে ডাকি।

শ্যামা। মায়ের কাছে লোক পাঠাও দাদা—শিগগির।

[সূচীশিল্পটি লইয়া চলিয়া গেল]

অরুণ। মুহুরীবাবু, শিগগির পাশের ডাক্তারকে ডাকুন। বাবার অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন—শিগগির। দরোয়ান !

নেপথ্যে শ্যামা। জল—জল—কেষ্ট, মাথায় জল ঢাল।

অরুণ। দরোয়ান ! দরোয়ান !

(দরোয়ানের প্রবেশ)

শিগগির তুমি কঙ্কণায় যাও। মাকে গিয়ে বল, বাবার বড্ড অসুখ—শিগগির !

(দরোয়ানের প্রস্থান। অরুণ ভিতরে গেল। পুনরায় ফিরিয়া আসিল)

বরফ—বরফ—মুহুরীবাবু, ডাক্তারবাবু কি এখনও এলেন না ?

[প্রস্থান]

নেপথ্যে নুট। দরজা—দরজা ! বিমলা, দরজা খুলে দাও। বিমলা !

নেপথ্যে অরুণ। এই যে ডাক্তারবাবু !

(ডাক্তার ও অরুণ ঘর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পরমুহূর্তেই অরুণ প্রবেশ করিল)

অরুণ। মুহুরীবাবু ! হরিশ, মুহুরীবাবু কি এখনও বরফ নিয়ে ফেরেন নি ?

(প্রস্থান)

নেপথ্য নুটু। বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল।

নেপথ্যে শ্যামা। সব দরজা-জানলা খুলে দিয়েছি বাবা !

(বরফ লইয়া মুহুরী ভিতরে গেল, বিমলা ও অরুণের প্রবেশ)

বিমলা। রাস্তায় দরোয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল। কি হয়েছে অরুণ, কোনও আশাই কি নেই ? ওরে, ওদের তুই ভেতরে নিয়ে আয়। আমি—

নেপথ্যে নুট। মাই লর্ড—

(বিমলা ও অরুণের বিপরীত দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রইং-রুম

(সোফার উপর নুটু শায়িত। শ্যামা, বিমলা, অরুণ, মহাভারত, মমতা, কল্যাণী প্রভৃতি)

নুটু। It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God.

(নুটুর চেতনা হইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিমলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল)

নুটু। বিমলা, আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বিমলা। না না। তোমার সে দ্বার কি বন্ধ হয়, না হতে পারে? না না।

নুটু। বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুশোভনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কল্যাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছি। মমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মহাভারত চ'লে গেছে। অরুণ— ; কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে— ; আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে বিমলা। সম্মুখে আমার গাঢ় অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিমলা। না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তোমার স্বর্গদ্বার খোলাই আছে। আমি নিজে খুলে দিয়েছি। কঙ্কণার বাবুদের আমি নিজে জবাব দিয়ে এসেছি। কল্যাণী, মমতা, সুশোভনকে ফিরিয়ে এনেছি।

মহা। দাদাঠাকুর।

নুটু। কে? মহাভারত? মহাভারত, ভাই। কল্যাণী কই? কল্যাণী?

(সম্মুখে সূর্যাস্তের রশ্মি ঘরে আসিয়া পড়িতেছিল। নেপথ্যে বেহালা বাজিয়া উঠিল)

নুটু। কল্যাণী।

কল্যাণী। দাদা।

নুটু। মার্জনা—বোন—মার্জনা—

(কল্যাণী কোন কথা বলিল না, নুটুর পায়ে মাথা রাখিল)

একদিন বলেছিলাম, তোমার স্থান আমার মাথায়, যদি কোনদিন প'ড়ে গিয়ে আঘাত পাও, দেহে তোমার ধুলোর মালিন্য লাগে—

কল্যাণী। (মুখ তুলিল, চোখে অশ্রুর রেখা) না না, আঘাত পাই নি, ধুলো লাগে নি। বউদি আমায় কোল পেতে ধরেছেন দাদা।

নুটু। বিমলা!

(বিমলা কথা বলিল না, ম্লান হাসি হাসিল)

মহা। দাদাঠাকুর।

নুটু। মহাভারত, সুশোভন কই? সুশোভন?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর বারান্দায় ব'সে আছেন দাদাঠাকুর। তিনি বললেন, আপনার কষ্ট তিনি দেখতে পারবেন না।

নুট। বেহালা বাজাচ্ছে, নয়? আঃ, চমৎকার! সেই গানটা বাজাতে বল মহাভারত, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চল, একলা চল, একলা চল রে'।

(অরুণ উচ্ছ্বসিতভাবে পায়ের উপর পড়িল)

কে? কে?

অরুণ। বাবা!

বিমলা। অরুণ। মাফ চাচ্ছে তোমার কাছে।

নুট। মাফ! না না, তার তো অপরাধ নয়।

বিমলা। তবে তাকে তুমি আশীর্বাদ কর।

নুট। আশীর্বাদ! স্ট্যাণ্ড আপ মাই বয়, স্ট্যাণ্ড আপ। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও।

(অরুণ দাঁড়াইল)

আমার যাত্রা আজ শেষ হ'ল, তোমার যাত্রা শুরু হ'ল। সে যাত্রায় তোমার জয় হোক। আমার সম্মুখে সন্ধ্যা, তোমার সম্মুখে যেন উদয় হয় নবপ্রভাত। কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং মাই বয়, কিপ দি ফ্ল্যাগ ফ্লাইং!

বিমলা। এইবার তুমি চুপ কর। আর কথা ব'লো না। হাঁপাচ্ছ তুমি।

নুট। (ব্যস্তভাবে) একটা কথা—একটা কথা—তোমায় একটা কথা বলব শুধু।

বিমলা। বল।

নুট। না, কারও সাক্ষাতে নয়—কারও সাক্ষাতে নয়। যেতে বল—সব যেতে বল।

(সকলে চলিয়া গেল)

বিমলা। বল, কি বলছ বল।

নুট। বলবার কিছু তো নেই। দিচ্ছি- তোমায় দিচ্ছি—তুমি গ্রহণ কর—

(বিমলা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

নুট। বুঝতে পারছ না? আমার মন, আমার হৃদয়, আমার সব—সব আমি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

(বিমলা পাথরের মত উপরের দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে বেহালা বাজিতেছে। যবনিকা নামিয়া আসিল।)

গান

এই খেদ মোর মনে—
ভালবেসে মিটল না আশ-কুল'স না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে?

(২)

ভালবেসে এই বুঝেছি, সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদম তলে রে।

(৩)

মধুর মধুর বংশী বাজে
কোথা কোন কদমতলীতে
আমি পথের মাঝে পথ হারালাম
ব্রজে চলিতে।
(কোন মহাজন পারে বলিতে)
পোড়ামন ভুল করিলি
চোখ তুলিলি পথের ধুলা থেকে
রাই যে আমার রাঙা পায়ের
ছাপ গিয়েছে এঁকে,
ঢুকলি ছেড়ে পথের ধুলো
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে॥
অনেক আলোর ঘটায় অনেক
ছটা ঝলোমলো
আমার হাতের মাটীর পিদীম
লাজে নিভাইলো
তখন যে হায় গভীর আঁধার
কোন পথে ঘাট বলো ললিতে॥

(৪)

তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি।
তোমার রাজ কাছারির দেউড়িতে হে—বসে আছি।
চোখের জলই পাওনা কি হায় শুধু
এই জীবনের বিকিকিনির পেশায়।
কি যে আমার পাওনা-দেনা—
তুমি ছাড়া কেউ জানে না—
অপর জনে—তা মানে না—ডিক্রি নিয়ে শাসায়।

খেয়া ঘাটের পারে পারে
মাশুল দিয়ে বারে বারে
শেষ খেয়ার ধারে এবার এলেম দেউলে দশায়
পাওনা যদি না থাকে তো বল অকূলে কূল ভাসাই
অথৈ পাথর সর্বনাশায়।